ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৫

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী

শিল্পী- সৈয়দ সাদেক আলি মিরজা   নবাব সিরাজদ্দৌলা   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আষাঢ়—১৩৫৫

প্রথম খণ্ড | ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

গুপ্ত-সম্রাট বৈন্যগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পিএচ্-ডি

প্রাচীন তাম্রশাসন ও মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে কিরূপে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে—গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাহিনী তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুরাণে প্রসঙ্গক্রমে গুপ্তবংশের নাম এবং প্রয়াগ, মগধ ও সাকেত দেশে তাহাদের রাজ্য বিস্তৃতির উল্লেখ আছে। কিন্তু পুরাণোক্ত বহু রাজার ও রাজ্যের মধ্যে তাহাদের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ গত এক শতাব্দীর মধ্যে প্রাচীন লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে গুপ্ত বংশের রাজ্যকাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক স্বর্ণ যুগ। যে গুপ্ত-সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের বিস্তৃত ভূভাগ জয় করিয়া দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব উপকূল দিয়া কাঞ্চী দেশ পর্য্যন্ত বিজয় যাত্রা করিয়াছিলেন—ইউরোপীয় ঐতিহাসিক যাহাকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করিযাছেন, ভারতবর্ষে তাঁহার স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল, কোন প্রাচীন গ্রন্থ অথবা কিংবদন্তীতে তাঁহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু প্রাচীন লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে তাঁহার জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা জানিতে পারিয়াছি। সমুদ্রগুপ্ত যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সাম্রাজ্যের ছায়ায় যে বিরাট সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছিল এখন তাহার মূল কথাগুলি ভারতের ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু কখন ও কি কারণে এই রাজবংশের পতন হইল তাহার সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। কারণ গুপ্তবংশীয় শেষ সম্রাটগণের ইতিবৃত্ত এখনও গভীর রহস্যে আবৃত। বৈন্যগুপ্ত এই সম্রাটগণের অন্যতম এবং তাঁহার সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব বলিয়াই এই মুখবন্ধের অবতারণা করিতে হইল।

বিশ বৎসর পূর্ব্বেও সম্রাট বৈন্যগুপ্তের অস্তিত্বের কথা কেহ জানিত না। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একখানি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করায় এই রাজার নাম সাধারণে পরিচিত হয়। কুমিল্লার ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গুণাইঘর নামক গ্রামে এই তাম্রশাসন খানি পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় যে ১৮৮ সংবতে (৫০৭ খৃঃ) ক্রীপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে মহাদেবের ভক্ত মহারাজা শ্রীবৈন্যগুপ্ত একটি বৌদ্ধ বিহারকে ১১ পাটক ভূমি দান করেন। এই লিপি প্রকাশিত হইবার পর, মহারাজ বৈন্যগুপ্ত কে, গুপ্তরাজ বংশের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তিনি স্বাধীন অথবা সামন্ত রাজা ইত্যাদি বিষয়ে বহু আলোচনা হয়, কিন্তু কোন মীমাংসা সম্ভবপর হয় না। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রতিপন্ন করেন যে কতকগুলি সুবর্ণ-মুদ্রায়ও বৈন্যগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি পূর্ব্বেই জানা ছিল কিন্তু ইহার উপর রাজার নামের যে দুইটি আদ্যাক্ষর ক্ষোদিত ছিল তাহা 'চন্দ্র' বলিয়া পড়া হইত। মুদ্রাগুলির অপরদিকে 'শ্রীদ্বাদশাদিত্য' লিখিত ছিল। সুতরাং তখন ঐতিহাসিকগণের ধারণা হয় যে চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য নামে গুপ্তবংশে একজন রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নামধারী আরও দুইজন রাজা ছিলেন সুতরাং এই রাজা তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে অভিহিত হইতেন। অধ্যাপক গাঙ্গুলী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন যে, যে দুইটি অক্ষর 'চন্দ্র' বলিয়া পঠিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক 'বৈন্য'—এবং এই মতই সকলে গ্রহণ করেন।

বৈন্যগুপ্তের সুবর্ণ মুদ্রাগুলি হইতে প্রমাণিত হইল যে তিনি একজন স্বাধীন রাজা। কিন্তু আমাদের পরিচিত গুপ্তসম্রাটগণের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহার কোন মীমাংসা হইল না।

কয়েক বৎসর পর নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখানি পোড়া লাল মাটির ছোট একটি টুকরা পাওয়া যায়। ইহার প্রায় সবই গিয়াছে কেবল নীচের দিকে ত্রিভুজাকৃতি একটু অংশ মাত্র আছে। ইহাতে ৪টি পংক্তিতে যে কয়টি অক্ষর আছে তাহা পড়িলে বুঝা যায় যে ইহা বৈন্যগুপ্তের রাজকীয় মুদ্রা। নালন্দায় গুপ্ত ও অন্যান্য রাজবংশের এরূপ বহু মৃণ্ময় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবত চিঠিপত্র পাঠাইবার সময় এগুলি ব্যবহৃত হইত। এই মুদ্রাগুলিতে প্রেরণকারী রাজার নাম ও তাঁহার বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য মুদ্রার টুকরাটিতে "পরমভাগবতো মহারাজাধিরাজ শ্রীবৈন্যগুপ্ত" এই শব্দ কয়টি এখনও বেশ স্পষ্ট পড়া যায়। ইহার পূর্ব্বের পংক্তির প্রথম ও শেষের অনেকখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যেটুকু আছে তাহা এই "...গুপ্তস্তস্য পুত্র স্তৎপাদানুধ্যাতো মহাদেব্যাং শ্রী..."। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বৈন্যগুপ্তের মাতা মহাদেবী অর্থাৎ কোন গুপ্তসম্রাটের প্রধানা মহিষী ছিলেন। সুতরাং গুপ্তসম্রাটগণের বংশে যে তাঁহার জন্ম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গুণাইঘরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তাঁহাকে মহাদেবভক্ত ও মহারাজ বলায় এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল ; কিন্তু এই মুদ্রায় পরমভাগবত ও মহারাজাধিরাজ উপাধি থাকায় তিনি যে গুপ্তবংশীয় সম্রাট ছিলেন এবং স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিল না।

এখন কেবল একটি সমস্যা রহিল—বৈন্যগুপ্তের পিতা কে? নিয়তির এমনি পরিহাস যে ঠিক যে স্থানটিতে তাঁহার পিতার ও মাতার নাম ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চতুর্থ পংক্তির প্রথম অথবা শেষের দিকে যদি মাত্র আর একটি অক্ষরও থাকিত তাহা হইলেই আমরা তাঁহার পিতার নামের শেষ অক্ষর অথবা মাতার নামের আদ্যাক্ষর পাইতাম—এবং অনায়াসে তাঁহার বংশ পরিচয় জানিতে পারিতাম। কিন্তু বোধ হয় পুরাতত্ত্ববিদগণকে পরীক্ষা করিবার জন্যই বিধাতা এ বিষয়ে বাধ সাধিলেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে এই মুদ্রাটির প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে মনে বিধাতার এই রহস্যের কথা ভাবিতেছিলাম। সহসা মনে হইল সে চতুর্থ পংক্তির প্রথমে একটি অক্ষরের একটু সামান্য চিহ্ন আছে। খুব ভাল একখানি লেন্স দিয়া পুনঃ পুনঃ এই জায়গাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, যে অক্ষরটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার নীচে উকারের চিহ্নটুকু বেশ স্পষ্টই পড়া যায়। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে বৈন্য গুপ্তের পিতার নাম জানা সম্ভবপর মনে হইল। কারণ বৈন্য গুপ্তের অল্পকাল পূর্ব্বে যে সমুদয় গুপ্ত সম্রাটের রাজত্ব করার সম্ভাবনা তাহার মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন আছেন যাঁহাদের নামের শেষ অক্ষরে উকার আছে। ইঁহারা

যথাক্রমে পুরু (গুপ্ত) ও বিষ্ণু (গুপ্ত)। এই দুইয়ের মধ্যে শেষোক্ত নামটি যে সম্ভবপর নহে একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যায়। প্রথমত 'ষ্ণু' অক্ষরটি প্রাচীন কালে যে ভাবে লিখিত হইত তাহাতে প্রথমে ষ, তাহার নীচে ণ এবং তাহার নীচে উকার থাকিত। ফলে এই উকারের চিহ্নটি পার্শ্ববর্ত্তী অন্য অক্ষরের অপেক্ষা খানিকটা বেশী নীচুতে থাকিত। বিষ্ণু গুপ্তের মুদ্রায় যেখানে তাঁহার নাম লেখা আছে সেই স্থানটি দেখিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। বৈন্য গুপ্তের মুদ্রায় কিন্তু এই উকারের চিহ্ন পরবর্ত্তী 'গু' এই অক্ষরের তলা হইতে মোটেই নীচু নয়, বরং একটু উপরে। দ্বিতীয়ত বৈন্য গুপ্তের তারিখ ৫০৬ খৃঃ অব্দ, আর সম্রাট বুধগুপ্তের শেষ-জানা তারিখ ৪৯৫ খৃঃ অব্দ। বুধগুপ্ত বিষ্ণুগুপ্তের পিতামহের ভ্রাতা। সুতরাং বুধ গুপ্ত ও বিষ্ণু গুপ্তের পুত্র এই দুয়ের মধ্যে মাত্র দশ বৎসরের ব্যবধান খুবই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

প্রধানত এই দুইটি কারণে বৈন্যগুপ্তকে বিষ্ণুগুপ্তের পুত্র বলিয়া গণ্য করা কঠিন। সুতরাং উকারান্ত নামধারী অন্য গুপ্তসম্রাট পুরুগুপ্তই যে বৈন্যগুপ্তের পিতা ছিলেন—ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পুরুগুপ্তের দুই পুত্র, বুধগুপ্ত ও নরসিংহগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ইহা আমরা জানি। বৈন্যগুপ্তকে পুরুগুপ্তের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে পুরুগুপ্তের মৃত্যুর পর যথাক্রমে তাঁহার তিন পুত্র বুধগুপ্ত, বৈন্যগুপ্ত ও নরসিংহগুপ্ত সম্রাট হন—এবং তাহার পর নরসিংহগুপ্তের পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে সিংহাসন লাভ করেন। এই মত সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ যুগের ইতিহাসের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়।

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

দরজায় খিল দিয়া সাধুর বৌ ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল। তিনুর মা আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। জানালার কাছে মুখ বাড়াইয়া সাধুর বৌ মৃদুস্বরে বলিল—কী বলছিস্?

তিনুর মা বলিল—দরজা বন্ধ করে কী করা হচ্ছে? সোয়ামী ঘরে আছে নাকি?

সাধুর বৌ বলিল—না।···গলার আওয়াজটা কেমন যেন ভারী ভারী।

তাহলে দরজাটা খোল্।

সাধুর বৌ জানালার নিকট হইতে সরিয়া গেল। বাইরে দাঁড়াইয়া তিনুর মা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। দরজা খুলিতে এতক্ষণ লাগে নাকি?

সশব্দে খিল খুলিয়া দরজাটা ফাঁক হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া তিনুর মা তাহার গঙ্গাজলের অবস্থা দেখিয়া থ' হইয়া গেল। শতছিন্ন একটুকরা শাড়ী কোনোমতে সে দেহে জড়াইয়া রাখিয়াছে। বস্ত্রের প্রয়োজন তাহাতে কিছুই মেটে নাই।

কপালে হাত ঠেকাইয়া তিনুর মা বলিল—আ মরণ! এই দশা হয়েছে তোর। তাইতো বলি গঙ্গাজলের ছায়াও আজকাল আর দেখা যায়না কেন। তা আমাকে আগে বলিস্‌নি কেন?

ভ্রূভঙ্গীসহকারে গঙ্গাজলের পানে তাকাইয়া সাধুর বৌ বলিল, *বল্‌লে কী করতিস? নিজের পরণেরখানা খুলে দিতিস?*

—তা না পারি, একটা সুযুক্তিও তো দিতে পারতুম্। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় দত্তবাড়ীতে বাসন মাজতে যাই—দেখি, বাইরের দড়িতে ধুতি শাড়ী সব ঝুলছে—কাছে জনপ্রাণীও নেই। একদিন সন্ধ্যার পর যানা, গিয়ে একখানা—বলিয়া চোখের একটা বিশেষ ইঙ্গিত করিল।

হতাশকণ্ঠে সাধুর বৌ বলিল—রাম বলো! এই তোর সুযুক্তি?

বাঁ হাতখানা কোমরে রাখিয়া তিনুর মা বলিল—কেন? যুক্তিটা মন্দ হলো কিসে শুনি। তুই একটুক্‌রো কাপড়ের অভাবে দোরে খিল দিয়ে আছিস, আর ওদের বাক্সভর্ত্তি কাপড়-চোপড়। তার থেকে এক আধখানা গেলেই-বা কি এসে যায়?

ঘাড় নাড়িয়া সাধুর বৌ বলিল—তবু ও আমি কিছুতে পারবো না; জীবনে কখনো চুরি-চামারি করিনি।

—সে বল্‌লে কী হবে। জীবনে এমন দিন ও তো কখনো আসেনি। তা তোর যদি এতই ধর্ম্মজ্ঞান হয়ে থাকে, না হয় আমিই একখানা এনে দেবো।

শিহরিয়া সাধুর বৌ বলিল—না, না গঙ্গাজল, এমন কাজ করিস্ নে। চুরি করা শাড়ী আমি গায়ে তুল্‌তে পারবো না। বিরক্তিপূর্ণস্বরে তিনুর মা বলিল—এও পারবি না—ও-ও পারবি না, তাহলে উপায়টা কী হবে শুনি?

একটা চাপানিঃশ্বাস ফেলিয়া সাধুর বৌ বলিল—ভগবান যা করেন।

কিন্তু সাধুর বৌ জানেনা যে, দ্বাপর-যুগে যে শ্রীকৃষ্ণ এক দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন—কলিযুগে শত শত দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিতে তিনিও অশক্ত।

সাধুর বৌ বলিল—গেল সন কত কষ্ট গেছে। একমুঠো চাল পাইনি—না খেয়ে তিন চারদিন উপোসে কেটেছে, তবু কোনদিন অন্যের জিনিষে হাত দিইনি—মা কালী জানেন।

তিনুর মা বলিল—খেতে না পেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়, কিন্তু ইজ্জতের ওপর ঘা লাগে না। মেয়ে মানুষের ইজ্জত প্রাণের চেয়েও বেশী।

সাধুর বৌ বলিল—তবু চোর সাজতে পারবো না। একদিকে ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে কি অন্যদিকে ইজ্জত খোয়াবো?

নিরুপায়ের এতখানি বিবেচনা তিনুর মায়ের ভালো লাগিল না বটে, কিন্তু গঙ্গাজলের দিকে চাহিয়া তাহার নিতান্তই করুণা হইতে লাগিল। দুইদিন পরে তাহার অবস্থাও তো অমনি দাঁড়াইবে। কোমর হইতে হাতটা নামাইয়া সনিঃশ্বাসে সে বলিল—তা হলে কাল আমাকে টাকা দিস্। দেখি যদি কণ্ট্রোল থেকে—

কপালে মৃদু করাঘাত করিয়া সাধুর বৌ বলিল—পোড়াকপাল! টাকাই-বা কোথায় পাবো? কাপড়ের অভাবে বেরুতেই পারিনে। ঠিকে কাজগুলোও তো সব বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষটার দিন-মজুরীতে দুটো পেটই চালানো ভার—তা আবার কাপড়ের টাকা।

সাধুর বৌয়ের ক্লিষ্ট মুখখানার দিকে চাহিয়া তিনুর মা তাড়াতাড়ি বলিল—থাক্, থাক্ গঙ্গাজল, টাকার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, আমিই দেখ্‌বো।

নগ্নপ্রায় দেহে স্বামীর কাছে বাহির হইতেও লজ্জা করে। ময়লা, দুর্গন্ধ কাঁথাটায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, এতদিনেও স্বামী একখানা কাপড় জুটাইতে পারিল না। তাই আজ তাহাকে কয়েকটা শক্ত শক্ত কথা শুনাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সাধুর পরিশ্রান্ত করুণ মুখখানা দেখিয়া কড়া কথা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। স্ত্রীর লজ্জায় স্বামীরও কি লজ্জা দুঃখ কম? তাহার নিজেরও তো ধুতি নাই। কোথা হইতে একটা হাফ্‌প্যাণ্ট জোগাড় করিয়াছে, তাহাতেই লজ্জা নিবারণ হইতেছে।

সাধুর বৌ শুধু বলিল—কিছুই হলোনা, না?

মনের সমস্ত ক্ষোভকে কণ্ঠস্বরে ফুটাইয়া সাধু বলিল—নাঃ, রিলিফ-কমিটিতে বাবুদের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল হলোনা। দয়াও ওরা সকলকে করছে না—মুখ দেখে দেখে করছে।

একটু থামিয়া আবার বলিল—সেখানে মুকুন্দর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—বেচারাও কাপড়ের জন্য গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলো আমার মত। তার কাছে শুনলুম, কাপড়ের অর্দ্ধেকই নাকি যাচ্ছে বাবুদেরই বাড়ীতে। মোটা কাপড়ে দোর জানালায় ভালো পর্দ্দা হবে। মুকুন্দর মেয়ে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে, অনেক বাড়ীতে নাকি পর্দ্দা তৈরীও হয়েছে সে কাপড় ছুপিয়ে।···কী যে করবো!

সাধুর বৌ বলিল্—থাক্, তুমি আর অত ভেবোনা। গঙ্গাজল তো বলেছে কণ্ট্রোল থেকে একখানা এনে দেবে। দেখা যাক্।

ঘরের মধ্যে বন্দী হইয়া আর কত কাল থাকিতে পারে মানুষ! বাহিরের আলো-বাতাসকে কতদিন যে অনুভব করে নাই সে। এই ক'দিনে বাহিরের পৃথিবীর চেহারা

আরো কত বদলাইয়া গিয়াছে। পরিচিত পথঘাটের স্মৃতি যেন মনের মধ্যে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ক'দিন ধরিয়া স্নান নাই—আহারও নাই নিয়মিত, নিজের চেহারা দেখিতে পাইলে সাধুর বৌ নিজেই চম্‌কাইয়া উঠে। মনের মধ্যে নিষ্ফল হতাশা ঘনাইয়া আসে। এই কী জীবন? এমন করিয়া আরো কতদিন বাঁচিতে হইবে? একমাত্র ভরসাস্থল তিন্নুর মা। তাহারই পথ চাহিয়া দিন গুণিতে লাগিল সাধুর বৌ।

চার পাঁচদিন পরেই মুখ কালো করিয়া তিন্নুর মা আসিয়া হাজির হইল। কাপড় সে পায় নাই। হতাশকণ্ঠে বলিল—তিন চারদিন ঘুরেও কণ্ট্রোল থেকে একখানা কাপড় জোটানো গেলনা ভাই। সকালবেলা দত্তবাড়ীর কাজ শেষ করে যেতে যেতে দোকানের কাছে ত্রিশহাত লম্বা লাইন হয়ে যায়। অত পেছনে দাঁড়িয়ে কী আর কাপড় পাওয়া যায়? চারপাঁচ ঘণ্টা রোদ্দুরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা আর ঝগড়া মারামারি করাই সার হয়। দেখি কাল যদি—

তিন্নুরমার পরিধেয় বস্ত্রখানির দিকে চাহিয়া সাধুরবৌ বলিল—তোরও তো কাপড় ছিঁড়ে গেছে গঙ্গাজল, এবার তো তোরও দরকার হবে। কণ্ট্রোল থেকে তো আর তোকে দুখানা দেবেনা।

তিন্নুরমা বলিল—তাইতো ভাবছি। কী যে হবে! সাধুরবৌ অকারণে একবার কাশিয়া বলিল—তোর ব্যবস্থাই তুই কর আগে। আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবেনা।

—তার মানে?—তিন্নুরমা বিস্মিত হইয়া তাকাইল।

—আমার ব্যবস্থা আমিই করবো এখন।

তিন্নুরমা চুপ করিয়া রহিল। সে বুঝিতেছিল সাধুরবৌ কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিবেনা, কিন্তু সে নিজেও নিরুপায়।

সকালবেলা বাহিরে আসিয়াই দত্তগিন্নী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কাল সন্ধ্যায় যে গা ধুয়ে এসে এইখানে রঙীন শাড়ীখানা মেলে দিয়েছিলাম, সেখানা কি হলো? ওরে ও মনো, ও সুধা, কমলা! তোরা কেউ তুলেছিস্ শাড়ীখানা? মেয়েরা সবাই আসিয়া বলিল—নাঃ, আমরা তো কেউ তুলিনি। দত্তগিন্নী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—হায়, হায়! নিশ্চয় কেউ চুরি করেছে। এই বাজারে নূতন শাড়ীখানা!—তিন্নুরমা, অ-তিন্নুরমা, ইদিকে শোনতো। তিন্নুরমা কলতলায় বাসন মাজিতেছিল, ডাকাডাকিতে নোংরা হাতেই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দত্তগিন্নী বলিলেন—এখানে রঙীন শাড়ীখানা শুকোচ্ছিল—নিশ্চয় তুমি দেখেছ?

তিন্নুরমা অস্বীকার করিয়া বলিল—নাঃ, আজ সকালে এসে কোন শাড়ী দেখিনি তো এখানে।

—সত্যি বলছো? দেখনি?

তিন্নুরমা এবারে গলাটা একটু বাড়াইল—তবে কি মিথ্যে বলছি ঠাকরুণ! মরণ!

মেজবৌ বলিল—এবারে মনে পড়েছে। কাল সন্ধ্যেবেলা সাধুরবৌকে একবার দেখেছিলাম এদিকে—পরণে টুক্‌রো ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া।

দত্তগিন্নী চীৎকার করিয়া বলিলেন—তা হলে এ তারই কাজ। নিশ্চয়ই সে হারামজাদী—

বাধা দিয়া তিন্নুরমা কহিল—দেখুন গিন্নীমা, না জেনে অনর্থক গাল পাড়বেন না। আমি সাধুরবৌকে জানি, তার দ্বারা কখনো একাজ হয়নি।

ধমক দিয়া দত্তগিন্নী বলিলেন—তুই থাম। চোরের সাক্ষী মাতাল!

তিন্নুরমা একটা কড়া জবাব দিতে যাইতেছিল, সহসা বিষ্টু গয়লা দুধের ভার লইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—ওগো, সাধুরবৌ গলায় দড়ী দিয়েছে। রান্নাঘরের চালের সঙ্গে ঝুলছে লম্বা হয়ে।

তিন্নুরমা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দত্তগিন্নী বলিলেন—ওমা! কী অলক্ষুণে কাণ্ড। চল চল দেখে আসি।

চারিধারে ততক্ষণে ভীড় জমিয়া গিয়াছে। নানাপ্রকার মন্তব্য করিতেছে সকলে। তিন্নুরমা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল। দত্তগিন্নী ও মনোও আসিয়া দাঁড়াইল তার কাছে। সাধুরবৌএর উলঙ্গ দেহটা শূন্যে ঝুলিতেছে। মুখখানি নীলবর্ণ—বীভৎস। জিভটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এলোমেলো চুলগুলি চোখ-কাণ ঢাকিয়া বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। সেদিকে চাহিয়া

দত্তগিন্নী বলিলেন—আত্মহত্যার মত কি আর পাপ আছে? এর আর মুক্তি নেই কখনো।

সহসা মৃতের গলার ফাঁসটার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া মনোরমা বলিল—দেখ, দেখ পিসীমা।

দত্তগিন্নী সেদিকে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন—আ মরণ! এ যে আমাদের সেই রঙীণ শাড়ীখানা। আমি তখনই জানি একাজ আর কারু নয়। স্বভাব যায়না ম'লে। গলায় দড়ী! গলায় দড়ী!

তিনুরমা তখন দোদুল্যমান দেহটার পানে তাকাইয়াছিল। মনে মনে ভাবিতেছিল—বেঁচে থাকবার জন্যে যে কাজ তুই করতে পারলি নে, মরবার জন্যে শেষকালে তাই তোকে করতে হলো হতভাগী।

গোবিন্দরাম জে-ওয়াট্‌মল্

শ্রীগুরুদাস সরকার

যিনি জন্মভূমির হীনতা পঙ্ক মোচনের জন্য বদ্ধপরিকর, যোদ্ধা না হইলেও তিনি শূর বীরেরই সম্মান পাইবার যোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে ওয়াট্‌মল্ বৃত্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় ছাত্রদিগের নাম অনেকেই সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া থাকিবেন। বাল্যকালে তাঁহার ডাক নাম ছিল গোমা। সিন্ধুপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ নগরে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা ঠিকাদারের (Contractorএর) কার্য্য করিতেন। যখন গোমার বয়স আট বৎসর তখন তাঁহার পিতৃদেব উটের পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া চির-জীবনের জন্য অক্ষম হইয়া যান। গোমার অগ্রজ ঝামনদাস উপায়ান্তর না দেখিয়া জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সাগর পারে ম্যানিলা দ্বীপে গমন করিলেন। অপর দুইটি ভ্রাতা দৈনিক আট আনা করিয়া উপার্জ্জন করিয়া পিতা, মাতা, তিনটি ভগ্নী ও নাবালক ভ্রাতা গোমার অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোমা শিশুকাল হইতেই প্রতিভাশালী। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া সে মাত্র দুই বৎসরকাল এক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিল, ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাহার বিদেশবাসী ভ্রাতা। ইহার পর গোমার ত্রিশ টাকা বেতনের একটি কেরাণীগিরি জুটিল। গোমার হৃদয়ে কিন্তু শান্তি ছিলনা। এই সময় একখণ্ড আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জীবনচরিত গ্রন্থ তাহার হস্তগত হয়। এই পুস্তক পাঠ করিয়া সে উপলব্ধি করিল যে এই মহামনা মানবের চেষ্টায় আমেরিকার কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতি কিরূপে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া, আপনাদিগের উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল যে ভারতবর্ষে প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের ন্যায় যদি কেহ জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে অর্দ্ধাহারে শীর্ণ, শাসকশ্রেণীর আজ্ঞাবহ, পরপদানত ভারতীয়েরাও মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া মানবের জন্মাধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সৌভাগ্যের কথা এই যে গোমাকে দেশে বসিয়াই দাসত্বের বিষাক্ত আবহাওয়ায় জীবন কাটাইতে হয় নাই। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে ঝামনদাস তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে তিনি তাঁহার ব্যবসায়ের একটি শাখা হাওয়াই দ্বীপেও সংস্থাপন করিতে ইচ্ছুক। যে ব্যক্তির উপর তাঁহাকে এ কার্য্যের ভারার্পণ করিতে হইবে—তাহার সেরূপ যোগ্যতা নাই। গোমা যদি এই দোকানের ম্যানেজাররূপে হাওয়াই দ্বীপের রাজধানী হনোলুলুতে আসিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে যেন চলিয়া আসে। চাকরী ছাড়িয়া দিয়া অগ্রজের নির্দ্দেশক্রমে সমুদ্র যাত্রা করিতে গোমা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। হনোলুলু আসিয়া পৌঁছিতে তাহার প্রায় তিন মাস লাগিল। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াই সে দেখিল যে একজন কৃষ্ণকায় কনষ্টেবল পথিকদিগের ও যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। একজন সুবেশ শ্বেতকায় ব্যক্তি এই পুলিশ কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া রাস্তা পার হইতে গিয়া প্রকাণ্ড এক ধমক খাইলেন। গোমা নির্ব্বাক বিস্ময়ে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল। ইহার পূর্ব্বে সে কোনও শ্বেতকায় ব্যক্তিকে কালা আদমির নিকট এরূপ ধমক খাইতে দেখে নাই। তাহার পর বাজারে তাহার অগ্রজের দোকানে কিছুকাল বসিতে না বসিতে আরও কয়েকটি বিস্ময়কর ব্যাপার তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। খরিদ্দারই হউক, কি আশে-পাশের দোকানের কোনও মালিকই হউক, কেহই তাহাকে "মিষ্টার" না বলিয়া সম্বোধন করে না। নিকটেই একজন চীনার বড় একটি সোডা লেমনেডের দোকান ছিল। সে দেখিল তাহাতে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ অধস্তন কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত রহিয়াছে। পল্লীতে ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ একটি ভোজনাগার ছিল। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই দ্বিপ্রাহরিক জলযোগের জন্য সমবেত হইত। এই বাজারের মধ্যেই চশমার একটি দোকান ছিল। সেই দোকানের ইউরোপীয় চক্ষু চিকিৎসক সেই হোটেলটিতে যাইবার সময় গোমাকে না ডাকিয়া যাইতেন না। এ দেশে জন-স্বাধীনতার সত্যকার স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া গোমা বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়া গেল। আর ইংরাজ রাজের প্রজারূপে না থাকিয়া যুক্তরাজ্যের নাগরিক-অধিকারপ্রাপ্তি তাহার নিকট শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল এবং ইহার জন্য আবেদন করিয়া সে অচিরে প্রাথমিক অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইল।

ইহারই কিছুদিন পরে এলেন্ জেনসেন্ নামক একজন সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটে। ভারতবর্ষ হইলে সামাজিক ক্ষেত্রে

তাহাদের মিলামিশার কোন সুযোগই হইত না এবং কোন প্রকারে পরিচয় হইলেও সে পরিচয় পরিণয়ে পর্য্যবসিত হইতে পারিত না। এই তাম্রকেশী নীলাঞ্জনয়না মার্কিণ দুহিতাকেই গোমা; জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিল। কৃষ্ণকায় ভারতীয়কে পতিত্বে বরণ করায় শ্রীমতী এলেনকে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হয় নাই। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে গোমার যখন বিবাহ হয় তখনও সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। বিবাহের পর তাহার পত্নীকেও তাই নিজের নাগরিক অধিকার হারাইতে হইল। ভরসা ছিল মাসখানেকের মধ্যে গোমা পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সহধর্ম্মিণীও তাহার স্বকীয় নাগরিক অধিকার ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ আশা ফলবতী হইল না। মার্কিণ দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের নির্দ্দেশে ভারতীয়েরা এ অধিকারে বঞ্চিত হইল। তখন কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দিগের যুক্তরাষ্ট্রে আগমন কৌশল করিয়া নিবারণ করা। হতাশাস হইয়াও গোমা একবারে মুষড়িয়া পড়িল না। সে জন্য চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে তাহার ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় সেইদিকেই সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিল। এই সময় খামনদাস নিজের যৎকিঞ্চিৎ অংশ রাখিয়া মূল ব্যবসায় হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। গোমার আন্তরিক চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। পত্নীর সহায়তায় বাজারের সেই পুরাতন দোকান খানিকে বড় আকারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সমর্থ হইল। সুখের বিষয় এই যে আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও সে সাধারণ পুঁজিপতিদের ন্যায় আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হইয়া উঠিল না। বস্তুতঃ দোকানের কর্ম্মচারীদিগকে সে আপনার বন্ধুজন ও সমশ্রেণীর লোক বলিয়াই মনে করিত। হিসাব রক্ষকেরা প্রতি মাসেই তাহার নির্দ্দেশ মত মুনাফার কতক অংশ আলাহিদা খাতে হিসাব ভুক্ত করিয়া রাখিত। এই অর্থ হইতে প্রতিমাসে ওয়াটমল কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে ভাল একটি হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়া ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা হইত। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের আন্তরিক হিতকামনায় গোমা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে ছিল প্রত্যেককে লভ্যাংশ (Bouns) প্রদান, প্রতি বৎসর কিছুকালের জন্য বেতন সহ ছুটি এবং প্রতিষ্ঠানের কেহ রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা। কর্ম্মীদিগের মধ্যে প্রত্যেকে যাহাতে আপন আপন বসত বাটিতে বাস করিতে পারে ওয়াটমল্ কোম্পানী সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে বিরত হয় নাই।

ক্রমেই কারবারে গোমার এরূপ উন্নতি হইতে লাগিল যে ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে সুবিস্তৃত ব্যবসায়ের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাকে সুন্দর ও সুবৃহৎ একটি সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইল। এই নবনির্ম্মিত বৃহদাকার পরিকল্পনাটি ছিল একেবারেই আধুনিক ধরণের। কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই আরও দুইটি প্রাসাদোপম পণ্যশালা বিনির্ম্মিত হইল—একটি ওয়াকিকিতে ও অপরটি হনলুলুরই অন্য এক প্রান্তে। এই নূতন দোকানঘর দুইটিও যেমন আয়তনে বিপুল, তেমনি দেখিতেও সুদৃশ্য।

ওয়াট্‌মল গৃহিণী শ্রীমতী এলেন্ স্বামীকে কোনও কার্য্যেই সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যেখানে সহধর্ম্মিণী গৃহকর্ত্তার প্রকৃতই সহকর্ম্মিণী, সেখানে সকল দিক দিয়াই ঘর সংসারের উন্নতি অবিলম্বে ঘটিয়া থাকে। প্রধান দোকানটির পরিচালন ভার এলেনের উপরই ন্যস্ত ছিল। শুধু তাহাই নয়, বিক্রেয় দ্রব্যাদি প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন রচনা প্রভৃতি কার্য্যও তিনি সুষ্ঠুভাবে নিজেই সম্পন্ন করিতেন। দোকানের ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীই আপন আপন কার্য্যে মনিব পত্নীর সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ ছিল। অপর দিক্ দিয়া, তাঁহার তিনটি সন্তানের মধ্যে একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। তাহাদের লালন পালনের সম্পূর্ণ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তিনি যোগ্যা পত্নী ও সুমাতারূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল এবং প্রতি বৎসর তাহার একটি দোকান হইতে প্রায় বিশ লক্ষ ডলার মূল্যের দ্রব্যজাত বিক্রয় হইতে লাগিল। গোমা অনেকদিন হইতে মনের কোণে একটি গোপন বাসনা পোষণ করিয়া আসিতেছিল—ভারতবর্ষকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত, উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে সে প্রাণপণে সাহায্য করিবে। ভারতের প্রায় ষষ্টি সহস্র অধিবাসী প্রতিবৎসর কলেরা, আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রতিবিধানক্ষম ব্যাধির প্রতিষেধকল্পে সে কোনও না কোনও প্রকার উপায় অবলম্বন না করিয়া ছাড়িবে না। আট কোটি লোক যে দেশে অন্নাভাবে শীর্ণ ও রোগগ্রস্ত হইয়া জীবন যাপন করে, সে দেশে ক্ষুধিতদিগকে অন্নদানের এবং ব্যাধিক্লিষ্টদিগকে রোগমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা সে আপনার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিল। তাহার মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে কলকারখানার সাহায্যে প্রচুর পণ্য উৎপাদনের দ্বারা জীবনের মান উন্নত না করিতে পারিলে দরিদ্র ভারতীয়দিগকে রক্ষা করার আর কোন উপায়ই নাই। ভারতে ভূগর্ভ মধ্যে খনিজ পদার্থের অভাব নাই। যে পরিমাণ লোহা আছে তাহা নিষ্কাশন করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে শোধন করিয়া লইলে স্নানের টব, কাপড় কাচা বাল্‌তি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে কল কারখানার জন্য বড় বড় ইঞ্জিন তৈয়ারী করাও আটকায় না, অভাব শুধু জ্ঞানের—আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের।

ভারতের নদ নদী দিয়া প্রবলবেগে যে জলস্রোত বহিয়া যায় তাহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিয়া ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে সেই শক্তি সঞ্চারিত করা তাহার নিকট অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে হইত না। ইহা যে ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত করা যাইবে ইহাই ছিল তাহার অন্তরগত সুদৃঢ় বিশ্বাস। গোমা একদিন তাহার এক ব্যবহারাজীব বন্ধুর নিকট এই মানস স্বপ্নের কথা প্রকাশ না করিয়া পারিল না। বন্ধুটি ছিলেন তথাকথিত বাস্তববাদী—আদর্শবাদের কোনও ধারই তিনি ধারিতেন না। তিনি বলিলেন "চল্লিশ কোটি লোকের জন্য তোমার মত এক ব্যক্তি একক কি করিতে পারে? তুমি এ চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া নিরর্থক ভগ্ন হৃদয় হইও না। অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ডলার (এক ডলারের মূল্য প্রায় ৩৲০ টাকা) এবং কোটি কোটি লোকের সাহায্য

ব্যতীত তোমার এ স্বপ্ন সফল হইবার নয়।" গোমা বলিল, "পথ যতই সুদীর্ঘ হউক প্রথমে একবার পদক্ষেপ না করিয়া যাত্রা আরম্ভ করা হায় না।" তাহার পতিব্রতা পত্নীর সহিত এ বিষয় একান্তে আলোচনা করিয়া অবশেষে সে স্থির করিল যে কতকগুলি উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়কে বাছিয়া বাছিয়া বিশেষজ্ঞরূপে গড়িয়া তোলার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইতে হইবে। এজন্ম উচ্চ শিক্ষিত, লব্ধোপাধি, কোনও বিশেষ বিষয়ে অধীতবিদ্য, প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রথমেই আবশ্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকের। ইঁহারা আধুনিক উপায়ে সংক্রামকব্যাধি নিবারণ করিতে শিখিবেন এবং সংক্রামক রোগের ছোঁয়াচ হইতে শিশু ও জননীগণকে রক্ষা করিতে তৎপর হইবেন। অপর কাহারও কার্য্য হইবে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করা, কাহারও বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত করার ব্যাপারে রীতিমত পোক্ত হওয়া।

এইরূপ নানা বিষয়িনী শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা পতি-পত্নীকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইল। এ কার্য্যের জন্ম যে একটি উপযুক্ত ধনভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে এ বিষয়ে উভয়েই একমত হইলেন। এই ভাবে 'ওয়াটুমল ট্রাষ্ট' স্থাপিত হইল, যাহাতে এই ধনভাণ্ডার ক্রমে নিঃশেষিত না হয় সেইজন্ম তাহাদের ব্যবসায়ের একটি বিশেষ শেয়ারের লভ্যাংশ যাহাতে নিয়মিতভাবে ন্যাসরক্ষকের নিকট প্রদত্ত হয়—তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল। প্রথম বৎসরের জন্ম নির্দ্ধারিত হইল চতুর্দ্দশটি বৃত্তি। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে প্রত্যেক ছাত্রের শুধু ভরণপোষণের জন্মই দেড়শত ডলারের কম খরচ হইবে না। ইহার উপর আছে যাতায়াতের জন্ম জাহাজ ভাড়া, আর বিবিধ বিদ্যায়তনে দেয় বেতন ও প্রবেশ ফি প্রভৃতি। দুই বৎসরের সমগ্র ব্যয় ওয়াটুমলের স্বকীয় সঞ্চয় হইতেই বরাদ্দ করা হইল। বৃত্তিগুলি হইল সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক মতনিরপেক্ষ। উপযুক্ত গুণসম্পন্ন যে কোনও ভারতবাসী এই বৃত্তিলাভ করার অধিকারী হইলেন। বৃত্তিধারীরা শিক্ষান্তে নিজ নিজ জ্ঞান ও শক্তিপ্রয়োগ করিয়া স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সাধ্যানুযায়ী উপকার করিতে সমর্থ হইবেন ইহাই ছিল এই দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের একমাত্র কাম্য। এই চৌদ্দটি বৃত্তির জন্ম দরখাস্ত পড়িল দুই হাজার। বিখ্যাত মার্কিণ ও ভারতীয় শিক্ষাবিদ্গণ গুণ বিচার করিয়া নির্দ্ধারিত সংখ্যক বৃত্তিধারী মনোনীত করিয়া দিলেন। বিশ্ববিশ্রুত সিসিল রোডস্ প্রদত্ত বৃত্তিসমূহের সহিত ওয়াটুমল প্রদত্ত এই বৃত্তিগুলি চলিতে লাগিল। বলিয়া রাখি, সিসিল রোডসের এই দানশীলতা ভারতীয়দিগের, তথা কোন অশ্বেত জাতির উপকারার্থ প্রযুক্ত হয় নাই।

প্রথম বৎসরের বৃত্তিধারীদিগের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্র ভাট্ ও তাঁহার পত্নী গ্রামপ্রধান দেশের ব্যাধিসমূহের গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। দুইজন মহিলা চিকিৎসক—ডাঃ লখানি ও ডাঃ নাসিরুদ্দিন—প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে কি ভাবে পরীক্ষা ও পরিচর্য্যা করিয়া মাতৃগণের চিকিৎসা ও পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইবে সেই সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পারদর্শিনী হইলেন। বোম্বাই হইতে আগত লোমাণ্ডে নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিকগণ অধ্যুষিত জনাকীর্ণ স্থানসমূহ হইতে আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সমর্থিত প্রণালীতে নির্দ্দোষ ভাবে মলাপসরণ সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতীয়দিগের খাদ্যে আমিষ পদার্থের মধ্যে মৎস্যের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত। খাদ্যে প্রোটিন্ উপাদান মৎস্যাহারেই অনেকাংশে পরিপূরিত হয়। ভারতের সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপকূল চারি সহস্র মাইলের ন্যূন নয়। প্রায় ছয় লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত নদী ও হ্রদ মৎস্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু ধীবরেরা প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ না করায় যথেষ্ট পরিমাণ মৎস্য ধৃত হয় না। পাশ্চাত্য দেশের জালিকদিগের মধ্যে প্রচলিত মাছধরার আধুনিক পদ্ধতির সহিত ভারতীয় মৎস্যজীবীগণ একবারেই অপরিচিত। তাই এইচ্, ডি, আর্, আয়েঙ্গার নামক একজন ছাত্র এ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্ম ওয়াশিংটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। তিনি এতৎসম্পর্কে যে বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা ভারত সরকার কিম্বা কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে স্বদেশে যদি তাহা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে খাদ্য সমস্যার সমাধান অনেকটা সুসাধ্য হইবে বলিয়াই ধারণা জন্মে।

গোজাতি ও উহার উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতীয়-দিগের মুখে অনেক কিছুই শুনা যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কোনও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে বিশেষ কিছু করা হয় না। এ ব্যাপারে প্রাচ্যখণ্ডের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতই অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, যদিও ভারতে দুগ্ধের চাহিদা বড় কম নয়। যে সকল ভারতীয়েরা মৎস্য মাংস গ্রহণ করে না সেই নিরামিষাশীদিগের জন্ম দুগ্ধ যে কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। সমগ্র জগতে যত গবাদি পশু আছে তাহার এক তৃতীয়াংশ ভারতেই বিদ্যমান। এগুলির মোট সংখ্যা বিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যায় অধিক হইলে কি হয় ইহাদের মধ্যে শতকরা ত্রিশটি উপযুক্ত যত্ন ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় কোনও প্রকারে প্রাণধারণ করে, ইহারা এক ফোটাও দুগ্ধ দেয় না। ওয়াটুমল বৃত্তিপ্রাপ্ত অমর রাঠোর নামক পাঞ্জাবপ্রদেশের পশুপ্রজনন বিভাগের একজন অভিজ্ঞ সরকারী কর্ম্মচারী দুগ্ধ উৎপাদন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার জন্ম আইওয়া ষ্টেট কলেজে প্রবেশ লাভ করিলেন। শিশু পুষ্টির প্রধান উপাদান দুগ্ধের অভাবেই দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের শিশুগণ শীর্ণ ও রোগগ্রস্ত হইয়া অনেকেই যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, এ কথা স্মরণ রাখিলে এ বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কম ছিল না—সহজেই তাহার প্রতীতি হইবে।

গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর না মিলিলে বৈজ্ঞানিকেরাও সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ওয়াটুমল বৃত্তিপ্রাপ্ত দুইজন চিকিৎসক গবেষণা কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া অভিনব চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ডাঃ জে, ডি, ভাট্ পাথরী রোগ নিরাময়ের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে অতি সূক্ষ্ম জীবাণু প্রয়োগ করিয়া মূত্রাশয়ের পাথর গলাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। ডাঃ

আশীর্ব্বাদন্ নামক অপর একজন ওয়াট্মল স্কলার মজ্জার পুষ্টি সাহায্যে শক্তি সঞ্জীবিত করিয়া যে সকল রোগিগণ পূর্ব্বে অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে অক্ষম ছিলেন তাঁহাদের জন্ম চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্যলাভ সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছেন। ওয়াট্মলের অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে ডাঃ আশীর্ব্বাদনের এ আবিষ্কারটি সহজসাধ্য হইত না।

ভারতীয়েরা যাহাতে যন্ত্রসাহায্যে যথেষ্ট পণ্য উৎপাদন করিতে পারে গোড়া হইতে ওয়াট্মলের দৃষ্টি ইহারই উপর সম্বদ্ধ ছিল। কারখানার মালিকদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত হাতে কলমে শিক্ষালাভ বিদেশী শিক্ষার্থী মাত্রেরই নিতান্ত দুঃসাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সুবিখ্যাত কারখানা ও রসায়নাগারে ভারতীয়দিগের প্রবেশলাভ এই

গোবিন্দরাম জে ওয়াট্মল

বদান্য ব্যবসায়ীর চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছে। ওয়াট্মল বৃত্তিপ্রতিষ্ঠার প্রথমভাগেই যে চারিজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার যান্ত্রিক ও রাসায়নিক শিক্ষার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছোট ছোট রকমের যন্ত্র ও মোটর প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছেন আর কেহ বা যন্ত্রাদি চালনের জন্ম ব্যবহার্য্য সুরাসার (alcohol) উৎপাদনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

শুধু বৃত্তিস্থাপন করিয়াই ওয়াট্মল-দম্পতি নিশ্চিন্ত থাকে নাই। তাহাদের বিবাহের পঞ্চবিংশতিতম সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে Beokman Spectrophotometer নামক যে অভিনব যন্ত্রটি উপহার স্বরূপ ভারতে প্রেরিত হয় তাহার সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কলাফল পর্য্যবেক্ষণ সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ ভারতে এ যন্ত্রটি ব্যবহার করার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

পুষ্টিসাধন ব্যতিরেকে দুর্ব্বলদেহ ভারতীয়দিগকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলা কেবল কল্পনা বিলাসেই পর্য্যবসিত হইবার কথা, তাই পুষ্টিতত্ত্বে (nutrition এ) পারদর্শিতা ও পুষ্টিতত্ত্ব প্রচার ভারতে যেরূপ প্রয়োজনীয় সেরূপ বোধ হয় আর কোথাও নয়। তাই মার্কিণ পুষ্টিতত্ত্ব-বিশারদদিগের নিকট এ বিদ্যার শিক্ষালাভার্থ নিয়োজিত হইলেন ডাঃ পুরুষোত্তম ও কুমারী তারা দেবধর। বিশেষজ্ঞরূপে তাঁহারা এ বিষয়ে যে জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহা যথাকালে কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া অসহায় ভাবে কালগ্রাসে পতিত হইবে না।

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে, সব কিছু জানিতে পারিলে সব কিছুই ক্ষমা করা চলে। মার্কিণী ও ভারতবাসীদিগের জ্ঞান পরস্পর সম্বন্ধে নিতান্ত সীমাবদ্ধ। উভয় দেশের বিদ্বজ্জনের সাহায্য ব্যতীত এ অজ্ঞতা দূরীভূত হইবার নয় এবং যতদিন না দূরীভূত হয় ততদিন অজ্ঞতাজনিত নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এই দুইটি জাতির সাংস্কৃতিক মিলন অথবা পরস্পরের বোঝাপড়ার পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া থাকিবেই। তাই ওয়াট্মলের ব্যয়ে বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ এবং মার্কিণ ঐতিহাসিক মের্ল কুর্টি (Merle Curti) ভ্রমণশীল অধ্যাপকরূপে যথাক্রমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও ভারতে প্রেরিত হইলেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতৃবর্গ, ইঁহাদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উভয় দেশের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য তো অবগত হইলেনই, আর ইহার গৌণ ফলস্বরূপ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি পোষণও অনেকটা সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইল। ভারতে এ সহৃদয়তা বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত একটি প্রস্তাবে। অধ্যাপক মের্ল কুর্টি সম্মানার্থ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ও তদ্দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনবৃত্তান্তবিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্ম মের্ল কুর্টি পুরস্কার নামক একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

ওয়াট্মলদিগের দানে ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্ম দুইটি অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—একটি ওয়াশিংটনের আমেরিক্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অপরটি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এতদ্ব্যতীত নানা তথ্য সম্বলিত বিবিধ গ্রন্থরাজি মার্কিণ হইতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এবং ভারত হইতে মার্কিণের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রেরিত হওয়ায় উভয় দেশের উচ্চশিক্ষাকামী ছাত্রদিগের পরস্পরের ঐতিহ্য ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি যে সুবিস্তৃত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল মূল্যবান গ্রন্থাদি সংগ্রহ করার সম্পূর্ণ ব্যয় ওয়াট্মলেরাই প্রসন্ন চিত্তে বহন করিয়াছে। ইহাদিগেরই আর্থিক সাহায্যে ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের পুলিট্সার্ (Pulitser) পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত জি, বি, লাল নামক জনৈক সুধী ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

বিত্তবান ভারতীয়দিগের দানশীলতা কি পথে পরিচালিত হইলে স্বদেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন অবশ্যম্ভাবী, ওয়াটুমল প্রতিষ্ঠিত ধনভাণ্ডারের পরিকল্পনাই তাহার প্রকৃষ্টতম আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমুচ্চ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে ষড়শতাধিক সহস্র (১৬০০) সংখ্যক ছাত্রকে বিদেশে গিয়া শিক্ষালাভের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে বৃত্তিগুলি প্রদান করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকাংশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই নানা লোকবিশ্রুত শিক্ষায়তনে প্রদত্ত হইবে। এত অধিক সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র মার্কিণেই শিক্ষালাভ মনোনীত করায় দানবীর ওয়াটুমল মার্কিণ প্রজারূপে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব না করিয়া পারে নাই।

প্রাচ্য দেশবাসীগণের যুক্তরাষ্ট্রে আগমন নিবারক আইনটি ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে প্রত্যাহৃত হইলে পর ভারতীয়দিগের সমগ্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও উহার অধিকার ভুক্ত স্থান সমূহে নাগরিক অধিকার লাভের সকল বাধা বিদূরিত হয়। এবার স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী গোবিন্দরাম জে, ওয়াটুমল্—আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত গোমা—তাহার নাগরিক অধিকার ফিরিয়া পাইল—তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনীও বঞ্চিত হইল না। এতদিন পরে এই শ্রোত্রসুখ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার বন্ধুগণ নানা স্থান হইতে গোমাকে পুষ্পোপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের উচ্ছসিত আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, সংবাদ পত্রের স্তম্ভগুলি গোমার প্রশংসাবাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই নূতন আইনের বলে মার্কিণ-প্রবাসী ভারতীয়দিগের মধ্যে গোবিন্দরাম ওয়াটুমল্‌ই সর্ব্বপ্রথম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুরা মার্কিণী বলিয়া পরিগণিত হইল। এজন্য তাহাকে প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল দীর্ঘ অষ্টবিংশতি বৎসর।

বিদেশে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া তদ্দেশবাসীদিগের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মানলাভ এবং নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের কষ্টার্জ্জিত অর্থ স্বদেশের মঙ্গল কামনায় হেলায় উৎসৃষ্ট করা—এ দুইটিই বড় দুঃসাধ্য কাজ এবং এই উভয় কার্য্যেই প্রচুর সফলতা লাভ করিয়া গোবিন্দরাম মার্কিণের সভ্য সমাজে বরেণ্য হইয়াছে। কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসীও তাহার এই অক্ষয় কীর্ত্তি সহজে বিস্মৃত হইবে না (১)।

(১) St. Loulds Post—Despatch পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনী অবলম্বনে Reader's Digest এর সংক্ষিপ্তাকার প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

রাজসিক *

শ্রীরমা নিয়োগী

পাত্রগণ

ভীমগুপ্ত	...	...	কাশ্মীরাধিপতি
অত্যয়িক	...	...	দণ্ডনায়ক
নাগ	...	...	নগরাধিপ
শন্মুখ	...	...	কঞ্চুকী
অশ্বসেন	...	...	ভিষগাচার্য

স্থান—শ্রীনগর রাজপ্রাসাদের একটি অলিন্দ।

কাল—আনুমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দের একটি অপরাহ্ন

[কাশ্মীর রাজপ্রাসাদের একটী সুপ্রশস্ত অলিন্দ; সুখাসনাবৃত কয়েকটি রৌপ্যবেদিকা ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে; দক্ষিণপার্শ্বে একটি উচ্চতর চন্দন কাষ্ঠের বেদিকার উপর কয়েকটি স্ফটিক পানপাত্র এবং একটি রৌপ্যময় বৃহৎ পানাধার। অলিন্দে প্রবেশ করিবার এক-মাত্র দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে! লৌহজালিক পরিহিত শস্ত্রভূষিত তিনটি মধ্যবয়স্ক রাজপুরুষ অসহিষ্ণু চরণে অলিন্দ পরিক্রমণ করিতেছেন; তাঁহাদের চক্ষু হইতে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু বিশেষ চেষ্টায় মুখভাব যথাসাধ্য প্রশান্ত।]

নাগ। (অধীর ভাবে একটি বেদিকা পা দিয়া সরাইলেন) আঃ, মহারাজাধিরাজ ভীমগুপ্তের আজ যেন আরও দেরী হচ্ছে।

অত্যয়িক। (অন্য একটি বেদিকার উপর সশব্দে বসিয়া গুম্ফপ্রান্ত টানিতে টানিতে) করুক-করুক—এই ত ওর শেষ স্নান।

শন্মুখ। (অলিন্দের ধারে দাঁড়াইয়া তুষার শীর্ষ পর্বত-মালার দিকে চাহিয়াছিলেন; এইবার মুখ ফিরাইয়া চিন্তিত

* (কাশ্মীর-ইতিহাসের পটভূমিকায় বিদেশীয়ভাবের মবরূপায়ন)

ভাবে) আমার মনে হচ্ছে ভীমসিংহের মনে সন্দেহ জেগেছে।

অত্যায়িক। (অবহেলাসূচক হস্তভঙ্গী করে) জেগেছে? জাগুক। এখন আর সামলাতে পারবে না। আর কয়েকটি মুহূর্ত—তার পরই—

নাগ। (পরিক্রমণের মধ্যপথে সহসা ফিরিয়া অসি বাহির করিয়া কোপ মারিবার ভঙ্গীতে) তার পরেই শেষ। (সবিদ্রূপে) মহারাজাধিরাজের মহানিদ্রা!

অত্যায়িক। (উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন) তলোয়ার? অত সূক্ষ্ম অস্ত্র আমার পছন্দ নয়। (রণকুঠার আন্দোলন করিয়া) এরই এক ঘায়ে ভীমসিংহের একটামাত্র মাথা দুটো হয়ে যাবে।

শম্মুখ। (একটি বেদিকায় বসিয়া অন্যমনস্কভাবে) তলোয়ার বল আর কুঠারই বল—যাহোক একটা হলেই কাজ চলবে। কিন্তু আমি কি ভাবছি জান? (দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে একে একে নাগ ও অত্যায়িকের মুখভাব পর্যবেক্ষণ করিলেন) ভাবছি ভীমসিংহ যোল বছরের বালক না হয়ে পূর্ণ বয়স্ক যুবক হ'লে ভাল হ'ত। তিন জনে মিলে কাপুরুষের মত নিরস্ত্র এক বালককে হত্যা করব!

নাগ। (ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, মুখভাব দেখিয়া মনে হয় তিনি শম্মুখের মস্তিকের সুস্থতা বিষয়ে রীতিমত সন্দিহান) পাগল হয়েছ শম্মুখ! পূর্ণবয়স্ক! পূর্ণবয়স্ক রাজাকে সরান মানে কত প্রাণীহত্যা তা জান? রাজার সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেগুলিকেও একে একে মারতে হয়। এই বেশ। একটিমাত্র যোল বছরের; একটি কোপে একবারেই পথ সাফ।

অত্যায়িক। (উৎসাহে একটি বেদিকা সশব্দে চাপড়াইয়া) ঠিক্ একবারেই পথ সাফ। তারপর তুঙ্গ হবে রাজা—আর আমরা তার মন্ত্রী।

শম্মুখ। সহসা উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পরমুহূর্তেই নিষেধসূচক ভঙ্গীতে) শ্ শ্ শ্—[রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে একটি নিরুদ্বিগ্ন পদশব্দ দূর হইতে ক্রমশঃ নিকট-বর্তী হইতেছে; তিনজনেই সংযতভাবে যথাসাধ্য স্বাভাবিক মুখে দাঁড়াইলেন। দ্বার খুলিল, স্বনামখ্যাতা দিদ্দার পৌত্র কাশ্মীরাধিপতি ভীমগুপ্ত অলিন্দে প্রবেশ করিলেন; ষোড়শবর্ষীয় অজাতশ্মশ্রু বালক, ঈষৎ পাণ্ডুর কঠোর মুখশ্রী। সাজসজ্জার বাহুল্য নাই; পরিধানে শুভ্র রেশম-বস্ত্র ও অঙ্গচ্ছদ, কণ্ঠে মুক্তার মালা। রাজপুরুষত্রয়ের অভিবাদনের উত্তরে মহারাজাধিরাজ সামান্য শির সঞ্চালন করিলেন; চন্দন বেদিকার নিকট যাইয়া পানাধার হইতে একপাত্র দ্রাক্ষাসব ঢালিয়া লইয়া অলস ভঙ্গীতে অলিন্দের ধারে দাঁড়াইলেন; তারপর পানপাত্র অধরের নিকট আনিতে আনিতে অন্যমনস্ক অবহেলার সুরে]

ভীমগুপ্ত। আপনারা এখন যান্, পরে কথা হবে।

[অনিচ্ছুক ভাবে তিনটি রাজপুরুষ দৃষ্টি বিনিময় করিলেন; কিন্তু মহারাজাধিরাজের আদেশ! উপায় কি? অগত্যা উদ্ধত অভিবাদন জানাইয়া বিবিধ প্রকার মুখভঙ্গী করিতে করিতে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

ভীমগুপ্ত তেমনই অন্যমনস্ক ভাবে অলিন্দের বাহিরে গিরিশ্রেণীর দিকে চাহিয়াছিলেন। এইবার ফিরিয়া দেখিলেন অলিন্দে আর কেহ নাই—দ্বার রুদ্ধ। মুহূর্তে তাঁহার মুখে স্বাভাবিক বালসুলভ কোমল রেখায় অপরিসীম হতাশা ফুটিয়া উঠিল; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পূর্ণপ্রায় পান-পাত্র বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন; তারপর একান্ত হতাশ ভাবে একটি বেদিকার উপর বসিয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিলেন।......কয়েকমুহূর্ত পরে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল, পদশব্দে চমকিত ভীমগুপ্ত লাফাইয়া উঠিলেন; প্রৌঢ় ভিষগাচার্য অশ্বসেন প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার যথোচিত অভিবাদনে বাধা দিয়া উৎফুল্ল ভীমগুপ্ত তাঁহার উভয় হস্ত সাগ্রহে ধারণ করিয়া]

ভীমগুপ্ত। আঃ—অশ্বসেন তুমি এসেছ! আস্‌তে যে পারবে তা ভাবিনি।

অশ্বসেন। (অন্তরঙ্গ সুরে) মহারাজাধিরাজ আসতে যে সমর্থ হ'ব তা ত আমিও আশা করিনি। তোমার অসুস্থতার ছল উদ্ভাবন করে বহু কষ্টে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছি, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র তরবারীটি পুরদ্বারে খুলে আস্‌তে হয়েছে। এর অর্থ কি মহারাজাধিরাজ?

ভীমগুপ্ত। (হতাশাক্লিষ্ট স্বরে) আর ও সম্বোধন কেন অশ্বসেন? দেখতে পাওনা এখন আমি প্রকৃতপক্ষে বন্দীমাত্র? নানান ছলে আমাকে অস্ত্রহীন করা হয়েছে। তরবারীতে শান্ দেওয়া হচ্ছে; কুঠারের কাষ্ঠদণ্ডটি ভেঙ্গে গিয়েছে—লৌহজালিক? (তিক্ত হাসিয়া) সেটার

ঠিক কি হয়েছে তা জানিনা, হয়ত মরিচা পরিষ্কার হতে গিয়েছে!

অশ্বসেন। (ভীত-স্তব্ধ মুখে শুনিতেছিলেন ; এইবার উত্তেজিত কণ্ঠে) কি বলছ ভীমগুপ্ত—তুমি নিরস্ত্র? একেবারে নিরস্ত্র! তবে কি ওরা—

ভীমগুপ্ত। (নিরুপায় কিন্তু শান্ত সুরে) হ্যাঁ অশ্বসেন, এতদিনে ওরা আমায় হাতে পেয়েছে। দুবছর থেকে দেখছি—দিদ্দার নবতম প্রিয়পাত্র খশবংশীয় তুঙ্গের এইসব ভাই আর তাদের অনুচরবৃন্দ আমায় হত্যা করার সুযোগে ফিরছে। আমারই চোখের সাম্‌নে একে একে সরিয়ে দেওয়া হল বিশ্বস্ত দণ্ডনায়ক চন্দ্রচূড়কে কঞ্চুকী বসন্তকে আর নগরাধিপ হরিবর্মাকে; তাদের স্থান অধিকার করেছে তুঙ্গের এই তিনটি ভাই। তখন থেকেই ওদের অভিপ্রায় বুঝেছি; বহু সাবধানে থেকে এত দিন ওদের উদ্দেশ্য বিফল করেছি ;—কিন্তু আজ আর পারলাম না অশ্বসেন, আমার হার হল। (দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন)

অশ্বসেন। (চঞ্চলপদে মহারাজাধিরাজের নিকটে আসিয়া স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে) কিন্তু ভীমগুপ্ত, তুমি পুররক্ষী লোহরবাহিনীর কথা ভুলে যাচ্ছ। লোহরবাহিনী তোমার অনুগত। তারা থাক্‌তে তুঙ্গের অনুচরগণ তোমায় স্পর্শ করতেও সাহস করবে না।

ভীমগুপ্ত। (অনুকম্পার হাসি হাসিয়া) ভিষগাচার্য অশ্বসেন—কূটনীতিতে তুমি আজ অবধি নিতান্ত শিশুই থেকে গেলে। যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ লোহরবাহিনীকে সীমান্তরক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে; তার স্থানে পুররক্ষার কাজ করতে এসেছে খশবাহিনী। যেন কোনও মুহূর্তেই লোহরবাহিনী সীমান্তে যাত্রা করবে।

অশ্বসেন। (দুই মুষ্টিতে আপনার কেশ আকর্ষণ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে) ভীমগুপ্ত—ভীমগুপ্ত—তুমি কি পাগল হয়েছ! এমন নিশ্চিন্ত নিরুৎসুকভাবে বলে যাচ্ছ যেন তুমি দর্শকমাত্র। না—না—এমন করে আত্মসমর্পণ করলে ত চলবে না। তোমায় বাঁচতে হবে ভীমগুপ্ত—আত্মরক্ষা করতেই হবে যেমন করে হ'ক।

ভীমগুপ্ত। (শিশুকে বুঝাইবার ভঙ্গীতে শান্ত সহিষ্ণু কণ্ঠে ধীরে ধীরে) তুমি বুঝতে পারছ না অশ্বসেন—পাশার শেষ দান পড়ে গিয়েছে, পরিত্রাণের পথ ত আর নাই। (সহসা উৎকর্ণ হইয়া) ঐ শুনছ তূর্যধ্বনি? আমার লোহরবাহিনী সীমান্তে যাত্রা করছে। আমার সময় হয়ে আসছে, (সস্নেহে) কিন্তু অশ্বসেন এ হত্যার তাণ্ডবে তুমি থেক না। তুমি যাও। (সহসা চঞ্চল হইয়া ভূমিতে পদাঘাত) কাপুরুষ সব—অস্ত্র হাতে মরবার সম্মানটুকুও দেবে না।

অশ্বসেন। (বুদ্ধিহতের মত পরিক্রমণ করিতে করিতে) লোহরবাহিনী চলে গেল! চলে গেল!

ভীমগুপ্ত। (বদ্ধদ্বারের বাহিরে একাধিক পদধ্বনি শুনিয়া সচকিত) ঐ—ওরা আস্‌ছে।

অশ্বসেন। (সহসা ভীমগুপ্তের উর্ধ্ববাস আকর্ষণ করিতে করিতে) খোল – খোল—আঃ—শীঘ্র।

[ভীমগুপ্তের উর্ধ্ববাস খুলিয়া একটি বেদিকার উপর আংশিক ভাবে পড়িল; পরমুহূর্তেই দ্বার খুলিয়া পূর্বোক্ত তিন রাজপুরুষ অলিন্দে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, মহারাজাধিরাজ ভীমগুপ্ত বিবর্ণ মুখে উর্ধ্ববাহু হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং বিচক্ষণ রাজচিকিৎসক অশ্বসেন উদ্বেগসংহত বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে তাঁহার বক্ষ পরীক্ষা করিতেছেন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া অশ্বসেন ইঙ্গিতে আগন্তুকদিগকে নীরব থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন]

নাগ। (কয়েক মুহূর্ত প্রতীক্ষা করিয়া বিস্মিত বিরক্ত সুরে) রাজবৈদ্য মশাই—আপনি এবার একটু সরে পড়ুন। মহারাজাধিরাজের সঙ্গে আমাদের বিশেষ আলোচনা আছে।

অশ্বসেন। (অতি যত্নে পরীক্ষা শেষ করিয়া, বিষণ্ণ-মুখে নগরাধিপের দিকে ফিরিলেন—ইতিমধ্যে ভীমগুপ্ত অলিন্দ প্রাচীরে দেহভার অর্পণ করিয়া অর্ধমূর্চ্ছিতের মত বসিয়া পড়িয়াছেন) বড়ই দুঃসংবাদ নগরাধিপ, রাজকার্য আজ আর হতে পারেনা।

নাগ। (হতবুদ্ধি ভাবে) কি বলছেন আপনি? রাজকার্য হতে পারে না!

অশ্বসেন। (বিষণ্ণসুরে ধীরে ধীরে) না নগরাধিপ, মহারাজাধিরাজ অত্যন্ত অসুস্থ, রাজকার্যে মনোনিবেশের সামর্থ্য তাঁর নেই। (রাজপুরুষত্রয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া

নিম্নস্বরে) আমার গুরুতর আশংকা হচ্ছে যে এক সপ্তাহের বেশী তিনি জীবিত থাকবেন না।

শম্মুথ। (বিস্ময়চকিত কণ্ঠে) কি? কি বলছেন? এক সপ্তাহ? সাতদিন মাত্র!

অশ্বসেন। (গম্ভীর কণ্ঠে) হ্যাঁ কঞ্চুকীমহাশয়, মাত্র সাতদিন। বাহ্যদৃষ্টিতে মহারাজাধিরাজের সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ দেখে আমার ভ্রম হয়েছিল—কখনও বক্ষ পরীক্ষা করিনি। আজ সহসা অত্যন্ত অসুস্থবোধ করে আমাকে ডেকে পাঠান—তাইতেই জান্‌তে পেরেছি—দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগে মহারাজাধিরাজের জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

[রাজপুরুষত্রয় হতবুদ্ধিভাবে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন—তারপর গোপন আলোচনার জন্য দ্বারপার্শ্বে সরিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে অশ্বসেন ক্লিষ্টমুখে ভীমগুপ্তের গাত্রাবরণ তুলিয়া সযত্নে তাঁহার উত্তমাঙ্গ আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন।]

নাগ। (আলোচনান্তে অগ্রসর হইয়া) মহারাজাধিরাজকে আর অসুস্থ অবস্থায় ব্যস্ত করতে চাই না। আমরাই কাজ চালিয়ে নেব।

[রাজপুরুষত্রয় কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি ভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বদ্ধদ্বারের বাহিরে পদশব্দ অবলুপ্ত হইতে না হইতেই ভীমগুপ্ত লাফাইয়া উঠিয়া অশ্বসেনকে আলিঙ্গন করিলেন]

ভীমগুপ্ত। (হর্ষোজ্জ্বল কণ্ঠে) অশ্বসেন—অশ্বসেন—তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে!

অশ্বসেন। (বিষণ্ণক্লান্ত স্বরে) মহারাজাধিরাজ তোমাকে বাঁচাবার শক্তি আমার নেই।

ভীমগুপ্ত। (কর্ণপাত না করিয়া) অশ্বসেন—আর ভয় নেই, এইবার আমি গোপনে লোহররাজকে সংবাদ দিয়ে সাহায্য আনাতে পারব। তুমিই সংবাদ বহন কর অশ্বসেন।

অশ্বসেন। (মস্তক আন্দোলন করিয়া অতি মৃদুস্বরে) ভীমগুপ্ত, লোহররাজ তোমায় রক্ষা করতে পারবেন না; তুমি সত্যই অসুস্থ।

ভীমগুপ্ত। (চমকিত হইয়া) অশ্বপতি! কি বলছ তুমি? আমি সত্যই অসুস্থ? আর সাতদিন মাত্র বাঁচতে পারি? সত্য বলছ? (নীরব অশ্বসেনকে সানুনয়ে) বল।

[অশ্বসেন অলিন্দের বাহিরে চাহিয়া ধীরে ধীরে সম্মতি-সূচক মস্তক আন্দোলন করিলেন; ভীমগুপ্ত বজ্রাহতের মত পুনরায় বেদিকায় বসিয়া পড়িলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে]

ভীমগুপ্ত। (আত্মগতভাবে) একবার আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, আবার সুদীর্ঘ সাতটি দিন পলে পলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে হবে। উঃ—না—না—সে হবে না, হতে দেব না। (উচ্চকণ্ঠে) অশ্বসেন শুনছ? আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষাও করব না। অশ্বসেন তুমি ভিষগাচার্য, আমায় বিষ এনে দাও, মৃত্যু আমায় গ্রহণ করবে না—আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করব।

অশ্বসেন। (সচকিত বেদনার স্বরে) মহারাজাধিরাজ, ভীমগুপ্ত—সে যে আত্মহত্যা!

ভীমগুপ্ত। (উত্তেজিতকণ্ঠে) আত্মহত্যা! আত্মরক্ষা বল। সুদীর্ঘ সাতদিন অসহায়ভাবে শারীরিক মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে করতে প্রতিমুহূর্তে আমার আত্মার কত মৃত্যু হবে তা কি বুঝতে পারছ না? এ সাতটি দিনের আলো আমার কাছে কালো হয়ে যাবে, বাতাস আমার কাছে ভারী ঠেকবে—না—না—অশ্বসেন, পর্বগুপ্তের বংশধর জীবনের কাছে এত বড় পরাজয় মেনে নেবে না। আমায় তুমি বিষ এনে দাও। (অশ্বসেন নীরব, আদেশ-ব্যঞ্জক দৃঢ়স্বরে) অশ্বসেন—আমি তোমার মহারাজাধিরাজ—আদেশ করছি—এখনই আমায় তুমি বিষ দাও।

অশ্বসেন। (যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত কটিবদ্ধ চর্ম-পেটিকা হইতে একটি ক্ষুদ্র স্ফটিক পাত্র বাহির করিয়া ভীমগুপ্তের হাতে দিলেন; স্খলিত কণ্ঠে কহিলেন) দশ-দশ রতি আছে; একজনের পক্ষে—এক-রতিই যথেষ্ট।

(টলিতে টলিতে নিষ্ক্রান্ত)

স্ফটিক পাত্রটিকে বহুমূল্য রত্নের মত হাতের মুঠিতে ধরিয়া ভীমগুপ্ত শান্তমুখে অলিন্দের প্রান্তে আসিয়া তুষারশীর্ষ হিমালয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে চন্দন বেদিকার সম্মুখে আসিয়া ক্ষুদ্র স্ফটিক পাত্রটি চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন—তারপর পানাধারের মধ্যে উহা নিঃশেষ করিয়া সবেগে অলিন্দের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন—তাঁহার হাসি গূঢ় হইল। তারপর বদ্ধ দ্বার ঈষৎ খুলিয়া—

ভীমগুপ্ত। (আদেশ করিলেন) দ্বারপাল, নগরাধিপ দণ্ডনায়ক আর কঞ্চুকীকে এখানে আসতে বল। (ফিরিয়া

স্মিতবদনে অলিন্দ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন, ক্ষণপরেই রাজপুরুষত্রয় সংকুচিত চরণে অলিন্দে প্রবেশ করিলেন) এই যে আসুন। আমার দিন ত শেষ হয়ে এল, আমার পরে কে সিংহাসনে বসবেন সে বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। আপনারা আমার কাছে আছেন তাই আপনাদেরই আহ্বান করলাম।

শম্মুখ। (কুণ্ঠিত স্বরে) মহারাজাধিরাজ এখন অসুস্থ, আলোচনা আজ নাই হল।

ভীমগুপ্ত। (ক্লান্ত স্বরে) না—কঞ্চুকী এই হয় ত আমার শেষ রাজকার্য। এ দুঃসংবাদে আপনারাও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছেন দেখছি। আসুন এক এক পাত্র সুরাপানে শক্তি সঞ্চয় করে আলোচনা আরম্ভ করি। (পানাধারের নিকট যাইয়া চারিটি স্ফটিকময় পানপাত্র পূর্ণ করিতে করিতে) গুপ্তবংশের শেষ বংশধর আমিই, আমার পরে নূতন কোনও বংশ সিংহাসনে আরোহণ করবে। পিতামহীর প্রিয়পাত্র শশধর শায় তুঙ্গ ত অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। (সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে রাজপুরুষত্রয় পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন) তার উপর আপনাদের মত সুযোগ্য রাজপুরুষ তাঁর সহায়। আমার ইচ্ছা তাঁকেই নির্বাচিত করে যাই।

রাজপুরুষ তিনজনই ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, শম্মুখ অগ্রসর হইয়া পানপাত্র গ্রহণ করিয়া অন্য দুইজনের হস্তে দিলেন—একটি নিজে লইয়া এক চুমুকে নিঃশেষ করিলেন।

অত্যাসিক। (ইনিও একচুমুকে পানপাত্র শেষ করিয়াছেন) মহারাজাধিরাজ অতি সুবিবেচক।

নাগ। (একচুমুকে অর্ধাংশ পান করিয়া) মহারাজাধিরাজের মত সর্বগুণান্বিত প্রভু আর আমাদের হবে না।

ভীমগুপ্ত। (আপনার পানপাত্রটি তুলিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে মৃদু হাস্যে) আমার পরে প্রভু আর আপনাদের হবে না।

নাগ। (উদ্বৃত্ত অর্ধাংশ পান করিয়া কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি ভাবে) আর প্রভু হবে না? কেন?

ভীমগুপ্ত। (ধীরে সুস্থে আপনার পানপাত্রটি নিঃশেষ করিয়া, সযত্নে চন্দন-বেদিকার উপর রক্ষা করিলেন—তারপর ফিরিয়া) নগরাধিপ—আপনাদের মত রাজভক্ত প্রজাকে কি আমি ফেলে যেতে পারি? সঙ্গে নিয়ে যাব। দণ্ডনায়ক—এই অলিন্দে আজ হত্যার উৎসব হবে ঠিক ছিল। (তিনজনেই সচকিত হইয়া উঠিলেন) আপনারা পশ্চাৎপদ হলেন, অগত্যা আমাকেই অগ্রণী হয়ে সে উৎসবের অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে।

শম্মুখ। (সহসা মরণান্তিক পরিহাস অনুধাবন করিয়া) বিষ—বিষ—মদে বিষ। (কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে বসিয় পড়িলেন। তীব্র বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে)

অত্যাসিক কুঠার আস্ফালনের প্রচেষ্টায় টলিয়া পড়িলেন, নাগ তরবারী বাহির করিয়া টলিতে টলিতে অগ্রসর হইলেন।

ভীমগুপ্ত। (টলিতে টলিতে নিকটের বেদিকায় বসিয়া শান্তস্বরে) এস এস—কয়েক মুহূর্ত আগে পরে হলে আমার ক্ষতি নেই। (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই নাগও ভূপতিত হইলেন—তাঁহার হাতের তরবারী ছিটকাইয়া মহারাজাধিরাজের চরণপ্রান্তে পড়িল, ভীমগুপ্ত মৃদু হাসিলেন) মৃত্যুর মুহূর্তেও আমার আনুগত্য স্বীকার করে গেলে নগরাধিপ। (মুখে আবার বিচিত্র হাসি ফুটিল) রাজার মৃত্যু কি যে সে ব্যাপার দণ্ডনায়ক—সমারোহ চাই—সঙ্গী চাই, তোমাদের মত রাজভক্ত সঙ্গী। কাশ্মীরাধিপতির সহমরণে যাবার সুযোগ পেয়ে তোমরা আজ ধন্য। (সহসা পরম কৌতুকে আসন্নমৃত্যু কাশ্মীরাধিপতির মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—কিন্তু কথা জড়াইয়া গিয়াছে) অশ্ব—সেন—দেখে যাও—দেখে যাও—মহা—রাজাধিরাজ-এর মৃত্যু—কি প্রচণ্ড-পরিহাস। (বেদিকার উপর টলিয়া পড়িলেন)

যবনিকা

আপোষে স্বাধীনতা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

নীলাকাশে কৃষ্ণমেঘ! ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের কথাটা মনে করিয়া দুঃখ হয়। সেদিন এত পতাকা উড়িয়াছিল, পত্রের এত শোভা, পুষ্পের এত সৌরভ ছড়াইয়াছিল, এত সঙ্গীত গীত হইয়াছিল, এত আলো জ্বলিয়াছিল, অনেকে ভাবিয়াছিল দিনটি উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ দুস্তর জলধি-মধ্যে আলোকস্তম্ভ হইয়া অনাগত সুদূর অনন্ত ভবিষ্যকালকে পথ ও গতি নির্দ্দেশ করিবে। অসীমের দূরযাত্রী কি সুদিনে ও কি দুর্দ্দিনে, কি সুযোগে এবং কি দুর্য্যোগে ঐ আলোকে নয়ন নিবদ্ধ করিয়া যাত্রা সুগম করিতে পারিবে। এতখানি আশা করিবার কারণও কি ঘটে নাই? ঐ দিনটি স্মরণ করুন। বিগত দুইশত বর্ষকাল মধ্যে এমন উল্লাস কি কেহ কল্পনাতেও দেখিয়াছিল? সসাগরা নদনদী গিরিনির্ঝরিণী-সমাকীর্ণ ভারতবর্ষের সেদিনের অঙ্গসজ্জা কি কেহ কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে? সেদিনের বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা ভূলোক অতিক্রম করিয়া দ্যুলোক উদ্ভাসিত করিতে কি আমরাই দেখি নাই? স্বর্গমর্ত্তরসাতল সেদিনের সুললিত সঙ্গীত সুধাধারা কি পান করে নাই? "এত ভঙ্গ 'এই' দেশ, তবু রঙ্গে ভরা" কবির এই উক্তি স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে যেমন খাটে, তেমন আর কোনদিন খাটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিব কি?

আমাদের স্বাধীনতা ত নাটকের স্বাধীনতা ছিল না, তথাপি উৎসব শেষে, নির্ব্বাণদীপ, স্তব্ধকলরব, নীরবসঙ্গীত, নির্জ্জন-নিষ্প্রাণ নাট্যশালার রূপ ধারণ করিল কেন? সন্দেহ জাগে, সেদিনের সেই প্রমোদপ্রমত্ত, প্রাণোন্মাদিনী অভিনয় কি আমরাই করিয়াছিলাম? সন্ধানী-আলোটি আজ আপন অন্তর প্রদেশে প্রয়োগ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। দুই শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে, স্বাধীনতার তরুণ অরুণোদয়ে সেই উৎসব সমারোহ অথবা শুদ্ধমাত্র বৃটিশ সম্পর্ক ছেদনেই সেই উল্লাস-উচ্ছাস? কথাটা ভাবিয়া দেখিবার দরকার হইয়াছে। স্বাধীন দেশ, স্বাধীন জাতি, গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে পারে না। স্বাধীনতা রূপক নহে; সুরম্য উপন্যাসও নহে, স্বাধীনতা সত্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু কোথায় সেই উদ্দীপনা, কোথায় সেই উন্মাদনা, কোথায় সেই আকুলকরা স্বদেশপ্রেম, কোথায় বা সেই পাগলকরা ভালবাসা? গান্ধী বিসর্জ্জনের সঙ্গে আমরা কি এ সকলও নিরঞ্জন দিয়াছি?

একদিন ছিল, যেদিন স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্ম যে কোনও কঠিন ত্যাগ স্বীকারে, নিদারুণ কষ্টবরণে মানুষ পশ্চাদপদ ছিল না। কারাগার ত অতি তুচ্ছ, প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্ম মানুষ ভিড় ঠেলিয়া আগু বাড়িয়া যাইত। এই বিবর্ত্তন একদিনে ঘটে নাই। প্রথমে একদিন ইংরাজের প্রাসাদদ্বারে প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াই আমরা খুসী ছিলাম। রেলের কুলী ও ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের মত কাজিয়া করাই ছিল রাজনৈতিক জীবনাদর্শ। পরবর্ত্তীকালে স্বদেশী যুগে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কালে বৃটিশ বর্জ্জনের বাসনা অঙ্কুরিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তখনও স্বাধীনতার রূপ পরিগ্রহ করে নাই। ব্যবসায়সুলভ লেন-দেন ও আদান প্রদানের রীতি-নীতিতেই আন্দোলন পরিচালিত হইত। বহু বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস এই কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তারপর একদিন ধীর স্থির পদে সৌম্য ভারতবর্ষের মত ধীর স্থির গুরু গম্ভীর রূপ, শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি গান্ধীজী ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রভঞ্জন আনিয়া দিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরে কালবৈশাখী বহিল। অচঞ্চল হিমাচল চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঘনকৃষ্ণাকাশের বক্ষোচ্ছেদ করিয়া সেইদিন বিদ্যুতলিখায় লিখন দেখা গেল, স্বাধীনতা। তবুও শঙ্কিত অন্তর, কম্পিত চরণ! দিন কাটে না ত যুগ যায়; যুগ ও যুগ নয়—কল্প! ১৯২৯ সালে পঞ্চ নদীর সঙ্গমতীর্থ লাহোরে পবিত্র স্বাধীনতার সঙ্কল্প স্বীকৃত হইলেও স্বাধীনতার সম্পূর্ণ রূপ অনুধাবনের প্রয়াস তখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। তা হয় নাই বটে, তবে প্রতিমা নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে, তাহা দেখিলাম।

বাঁশ কাটিয়া কাঠামো প্রস্তুত হইতেছিল; খড় ও দড়ি সংগৃহীত হইয়াছিল; কুম্ভকার মৃত্তিকা বানাইতেছিলেন; মণ্ডপে বড় সমারোহ। বড় ভিড়, ভারী কোলাহল। দালান ঠাকুর-দালান, মণ্ডপ পূজামণ্ডপ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে 'সন্ধি-পূজা'র আয়োজন যে অনিবার্য্য তাহাতে সন্দেহ ছিল না। বৃটিশের জীবন-মরণ যুদ্ধকালে সন্ধি-পূজার কাড়া নাকাড়া যে বাজে নাই, সুভাষচন্দ্রের নির্বন্ধাতিশয্যও নিষ্ফল হইয়াছিল, চার্চ্চিল-কথিত 'শ্বেত-সতর্কতাই' তাহার কারণ কি না বলিতে পারি না বটে, তবে মহাত্মা গান্ধীর সততা ও সত্যপ্রিয়তাই যে তাহার মূল কারণ তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। বিশ্বযুদ্ধান্তে, চরম আত্মবলির প্রয়োজন হইবে ভারতবর্ষে তাহা অবিদিত ছিল না; সাগর পারে নেতাজী যে মহাপূজার উদ্বোধন করিয়াছেন, ভারতে তাহার দক্ষিণান্ত সমাপন, তাহাতেও সংশয়মাত্র ছিল না। এমন সময়ে বৃটিশ মস্ত রসিকতা করিয়া বসিল। অকাল বোধন একবার শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছিলেন, বৃটিশ তাহারই রিপিট্ পারফর্মেন্স করিয়া ফেলিল। সে যেন "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" করিয়া পলায়ন করিল। এত বড় একটা ছেলেখেলার জন্ম বোধ করি (গান্ধীজী ব্যতিরেকে) কেহই প্রস্তুত ছিল না। এটলী তবু রহিয়া বসিয়া, পুঁটলী-পাটলা বাঁধিয়া, তৈজসপত্র গুছাইয়া পাঁজি-পুঁথির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, মাউন্টব্যাটেন অশ্লেষা মঘা-ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রা নাস্তি, যোগিনী ডাকিনী কোন বাধাই মানিতে রাজী ছিলেন না। মাথায় সরিষা রাখিয়া স্নান করিতে পারিলে বাঁচেন। অকালে বিসর্জ্জন। তখন আর মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া "ওগো তুমি যেয়ো না গো" কাকুতি করিলেও সাড়া মিলে না। "সে যে যাবে চলে।"

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ্চ মিষ্টার ক্লিমেন্ট এট্লী বৃটিশ পার্লিয়া-

মেন্টের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠকণ্ঠে ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিলেন। বৃটিশ ধুরন্ধরগণ এমন ত আগেও, পঞ্চমুখে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু "কিন্তু" ও "যদি"র ধূম্রজালে স্বীকৃতি বিলুপ্ত হইতেই দেখা যাইত। কিন্তু এবার দেড় বৎসর কাল মধ্যে স্বাধীনতা দান করিয়া বৃটিশ সাগর লঙ্ঘন করিবে ইহা অনুমান করাও খুব সহজ ছিল না। বহুৎ বায়নাক্কা, হাজার ক্যাঁকড়া উপস্থাপিত হইবে, ইহাই ছিল জল্পনা ও কল্পনা, ধ্যান ও ধারণা; জ্ঞানও তাহার সমর্থন করে। সুতরাং উপপ্লব্যনগর হইতে কুরুক্ষেত্র যাত্রার প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছিল; কিন্তু শক্তিপরীক্ষার তূর্য্যধ্বনি হইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল, বৃটিশ দেশান্তরিত। দানসাগর শ্রাদ্ধে বৃটিশ বিশ্বে তুলনাবিরহিত বলিয়া বিঘোষিত হইল। আমরাও অনায়াসে স্বাধীনতা লভ্য করিয়া উৎসবানন্দে মত্ত হইলাম। বিদায়কালে বৃটিশ অখণ্ড ভারতবর্ষ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গেল যে, বৃটিশের অসামান্য উদারতার পুলকোচ্ছ্বাসে তাহা ও বিস্মৃতির—উপেক্ষার অতল তলে সমাধিস্থ হইল। আশাতীত ও কল্পনাতিরিক্ত ত্বরায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম বলিয়াই ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা উৎসবে কণামাত্র কৃপণতা ছিল না।

যেন দৈব; অসম্ভব সম্ভব; আশার অতীত সাফল্য—সন্তোষ দুকূল প্লাবিয়া গিয়াছিল। কাজেই মানুষ পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বিস্মৃত হইয়াছিল; অনাহার, অর্দ্ধাহার, অল্পাহারের দুঃখ ভুলিয়া উৎসবে মাতিয়াছিল; বিড়ম্বনা-জর্জ্জরিত অন্তর নরনারী সহস্র লাঞ্ছনা ধামা চাপা দিয়া সঙ্গীতে সুর সংযোজনা করিয়াছিল; নিদারুণ দৈন্যের জ্বালা ভুলিয়া, অলিন্দে অলিন্দে আনন্দালোক সজ্জা করিয়াছিল; রুক্ষ, রূঢ়, কঠোর ও কঙ্কালমাত্রসার বাস্তবকে পত্রে পুষ্পে পতাকায় আচ্ছন্ন করিয়া শত জয়রবে স্বাধীনতাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়াছিল। সেদিন সে সুদূর কল্পনাতেও কি ভাবিতে পারিয়াছিল এ আলো আলেয়ার ক্ষণপ্রভা মাত্র; এই গীতিরব থামিবে; পত্রপুষ্প শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে এবং পৃথিবীর সেই চির-পরিচিত আদি ও অকৃত্রিম কঙ্কালমূর্ত্তির বিভীষিকা পুনঃ প্রকটিত হইবে? দিগন্ত বিস্তৃত দৈন্য, অভাব, আধি ব্যাধি, হাহাকার—সেই পুলিশ, সেই আই-সি-এস্, শক্তিমানের আস্ফালন, দাম্ভিকের দম্ভ—অশক্তের ক্রন্দন, অসহায়ের দীর্ঘশ্বাস—ভাগ্যবানের সম্ভোগ, অভাগার হতাশ্বাস, ভোক্তার অয়োদ্গার রব, ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদ, বিত্তবানের বিত্তবৃদ্ধি, বঞ্চিতের ক্রমবর্দ্ধমান বিলাপ, এককণা ইতর বিশেষ হইয়াছে কি?

হ্যাভ্‌ ও হ্যাভ-নটের বৈষম্য সৃষ্টির আদিতেও ছিল, সৃষ্টি রসাতল গমন করিবার কালেও কলহ থাকিবে। ১৫ই আগষ্ট এমন কোন মন্ত্র লইয়া আসে নাই যে হ্যাভ্‌ ও হ্যাভ্‌-নটের দ্বন্দ্বে সমুদ্র মন্থনের ফলে সুধাভাণ্ড হস্তে মঙ্গলময়ী দেবীর আবির্ভাবে জরার জীবনাবসান ঘটিবে। হতভাগা হ্যাভ্‌-নটেরা এরূপ কোন দুরাশা পোষণ করিয়াছিল বলিয়া আমরা শুনি নাই; তবে কি জানি কেন কোন না কোনও রূপ পরিবর্ত্তন প্রত্যাশাপন্ন হইয়া উৎসবানন্দে মাতিয়াছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত না হইতেও পারে। তাই রকেটের তারা-কাটা আলোক শূন্যের ঘনান্ধকারে লীন হইবামাত্র হতাশার গাঢ় অমানিশা যে বিষণ্ণ ও বিভ্রান্ত করিয়াছে তাহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না। আজ স্বাধীনতা শব্দের অর্থ নিরাকরণেও মতানৈক্য দেখিতেছি। আজিকার শাসন বিন্যাস দেখিলে কি ইহাই মনে হয় না যে, ইংরাজ যেন 'লং ও আর্ণড প্রিভিলেজ লিভ্‌' লইয়া 'হোমে' গিয়াছে—ভারতবর্ষে এ্যাক্টিনি শাসন ব্যবস্থা তাহারই মনোনয়ন এবং অবকাশ-অন্তে, ইংরাজ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চার্জ্জ বুঝিয়া পড়িয়া লইবে।

ইংরাজ স্বাধীনতা দিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিল কিন্তু আই-সি-এস্ রাখিয়া গেল। প্রতিমা গেল, চালচিত্র রহিল। বিসর্জ্জন বিধি কি তাহাই? আই-সি-এস্ থাকিলে কনট্রোল থাকে, লাইসেন্স পার্মিট থাকে—অপত্যস্নেহ খণ্ডন কি সহজ কথা গা? অতএব ঐ গুলা থাকিতে বাধ্য। লাঙ্গুলহীন ব্যাঙ্গাচি অজন্মা। ঐ গুলা থাকিলে স্বতঃসিদ্ধভাবে চোরা বাজার ও কালা বাজারও থাকে। বাঘ থাকিলে ফেউ ডাকিবে। চোরাবাজারে হ্যাভের তেলা মাথায় তৈল বৃদ্ধি, হ্যাভ-নটের হাহাকার। ধোঁয়া দেখিলে বুঝিতে হয় অগ্নি আছে। ইংরাজ গতাসু কিন্তু ইংরাজের বিধি অব্যাহত। নাই বা থাকিল পতি-দেবতা, বারুণী পুষ্করিণীর পাড়ে তাম্বুলরাগরঞ্জিতাধর রোহিণীর 'কলস ভাসায়ে জলে' বসিয়া থাকিতে বাধা কি? নিজের দেশে ইংরাজ জাতিবিচার করে না, ভারতবর্ষে ইংরাজ মনুসংহিতা। জাতি বিচার করিয়া আসন দিত, জাতি দেখিয়া চাকরী দিত, জাতির পাঁতিতে মিনিষ্টারী ইংরাজেরই বিধান। ব্যতিক্রম ঘটায় কাহার সাধ্য? ইংরাজ বুদ্ধি দিত, তোমরা মিলিয়া মিশিয়া স্বরাজ সাধনা কর, আমরা তোমাদের হস্তে সুপক্ক কদলী—কাঁদি কাঁদি কদলী—অবশ্যই দিব। সুবুদ্ধিটা বিদেশে ব্রডকাষ্ট হইত, বিনামূল্যে বিতরিত হইত—পৃথিবীর লোক ধন্য ধন্য করিত। ভারতবাসী মিলিতে গিয়া, মিশিতে গিয়া দেখিত, অসংখ্য পায়রার খোপ্‌। বৃটিশের বিধান, ইংরাজ মহামহোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ বটবৃক্ষ! বটের শিকড় বহুদূর বিসর্পিত, বহুল ঝুরি বহুধা বিলম্বিত। উত্তরাধিকারসূত্রে ত্যক্ত বিষয় সম্পত্তিতে যাঁহারা অধিকার পাইয়াছেন, অর্থাৎ হ্যাভস্‌—অহরহ গালভরা বক্তৃতা দিতেছেন—হ্যাভ্‌-নটস্‌দের উদ্দেশে—মিলিয়া মিশিয়া স্বাধীনতা সম্ভোগ করহ। লোকে বলে বটে "আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই, পড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে" কিন্তু আমরা বোধ করি অর্দ্ধশতাব্দী পিছু হটিয়া সেই যুগে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, যে যুগে নীতি ছিল, "আমি যাহা বলি, তাহাই করিও! আমি যাহা করি, তৎপ্রতি, খবর্দ্দার, দৃষ্টি দিও না।" মিলিয়া মিশিয়া স্বাধীনতা সম্ভোগের উৎকৃষ্ট নমুনা অধুনা বঙ্গ দেশের উচ্চস্তরে—দ্বিতলে ত্রিতলে যেমন প্রকট, এমনটি বোধহয় আর কোথায়ও নহে। "উনো"-র ইউরোপীয় শক্তিমানগণ শক্তির সাধনায় মল্ল কক্ষে মল্ল যুদ্ধরত দেখিয়া গান্ধী-জওহর ভক্ত শিষ্য শতমুখে কুখ্যাতি করিতেছেন। কিন্তু, হায় চালুনি, নিজে কেন অন্ধ? পাঁচমাস অন্তর মন্ত্রীসভা পরিবর্ত্তন স্বাধীনতা সম্ভোগেরই সুলক্ষণ

বটে। তবে, নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সের এখনও কিছু বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হইতেছে। স্কুল কলেজে সিফ্‌ট ক্লাস বসিতেছে, মিলে কলেও সিফ্‌ট ডিউটি হইতে উপকার সম্ভবে, সকাল বিকাল স্বতন্ত্র মন্ত্রীসভা গঠিত হইতেই বা হানি কি? আমরা বোকা সোকা, নির্বুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি লোক, শাসন তন্ত্রটন্ত্র বড় বুঝি না, নহিলে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিতাম, "দিও কিঞ্চিৎ, কারেও করো না বঞ্চিত।" আইন সভায় সদস্যপদ যতগুলি আছে, ততগুলি মন্ত্রী হইতে আপত্তি হইবে কেন, তাহা ত আমরা বুঝি না। মন্দোদরীর আদর্শ গ্রহণে বিপত্তি কি?

একটা দুর্ভাবনা হইতে পারে, সকলেই যদি সিংহাসনে বসে, প্রজা পাওয়া যাইবে কোথায়? সকলে শাসক হইলে শাসিত হইবে কে? কথাটা গুরুতর বটে কিন্তু বঙ্গ দেশে সে সমস্যা উদ্ভব হইবার আশঙ্কা নাই। শাসিত হইবার লোকাভাব হইবে না। হা-ভাতে হাভ্‌নটদের হা-ঘরে বংশ বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই সিনেমা গৃহের সিট্ পুড়িতেছিল, মাছের বাজারে 'আজাদ মৎস্য অভিযান' পরিচালিত হইয়াছিল, হোলির দিনে সর্ব্ববর্ণধর্ম্মসম্প্রদায় সমন্বয়ে লালে লাল হইয়াছিল, হুলিগানদের নিন্দায় নেতৃবৃন্দ জনে জনে পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন, মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে পৌনঃপুনিক সাঁড়াশী অভিযান কি সেই হুলিগান-কৃত? ডিমোক্রেসীর চতুর্দ্দশ পুরুষকে ধরিয়া এমন 'শেক্ দি বট্‌ল' আর কে-কবে—কোথায় দেখিয়াছে? মহাজনগণ বলিতেন, বাঙ্গালীর প্রতিভা, অক্লে করে অনুসরণ। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে আজ প্রতিমা আটম বম্বের গুণ প্রাপ্ত হইয়া—অনমুকরণীয়।

আপোষে স্বাধীনতা। ভেড়ির চুল সরে নাই, কাপড়ের পাট্ ভাঙ্গে নাই, জুতার সুখ তলায় অসুখ হয় নাই। যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার হয় নাই। স্বীকার করিলাম, একজন না-হয় পাশ করিয়াছে, কিন্তু অপর ব্যক্তি যতক্ষণ না ফেল্ করিতেছে, ততক্ষণ তাহাকে না-পাশ বলা যায় কোন্ যুক্তি বলে? ইংরাজের সহিত মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাকে পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া ধাপা পার করিতে পারিলে না-হয় নয়, নীল, গয়, গবাক্ষ বুঝিয়া লইয়া গলায় বেলের গোড়ে দুলাইতে পারিতাম। স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন হইল না, তখন যোগ্যতায় কে বড় আর কে দড় নহে, নির্নীত হইবে কিরূপে? স্বর্ণকমলবাবু অস্পৃশ্য জাতির প্রতিনিধি, চন্দ্রে কলঙ্ক বিন্দু, তাঁহার তরে 'বার্থ রিজার্ভড'। মৃত্যুঞ্জয়বাবু খাল বিল পুকুর নদী ছাঁকিয়া রত্ন আহরণ করতঃ ধনকুবের আখ্যা লাভ করিয়াছেন, লোকটি মধুচক্রবিশেষ, সর্ব্বক্ষণ মধুপগুঞ্জন। সীমান্তের হানাদার আসিয়া তাঁহার আসনের হন্তারক হইতে পারিবে না। "উনোতে" রেফারেন্স করিলেও প্রতীতি হইবে, 'শিবলিঙ্গম্ ন চালয়েৎ'।

ঝড় ত হয় নাই যে অপটু বৃক্ষ ও অকর্ম্মণ্য আগাছার বংশ নাশ হইবে; বন্যা ত আসে নাই যে গুল্মলতা শ্যাওলা পানা নিশ্চিহ্ন হইবে? স্ব স্ব মহিমায় ও স্বকীয় প্রতাপে তাহাদের বিদ্যমানতায় সংশয় করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

জেলের সনদের কথাটা না-হয় নাই তুলিলাম। হারু খুড়োর ভাগ্য ভাল, তাঁহার ত্রয়োদশ শালিকা অনুক্ষণের সঙ্গিনী হইয়া তাঁহাকে ধারণ ও বাহন করিত বলিয়া লোকে নামকরণ করিয়াছিল, শালিবাহন। খুড়ো, নামটি মাফ করিয়াছিলেন। একটা ফৌজদারী মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়া মিথ্যা নামের অপরাধে উল্টা বিপত্তি! অতি কষ্টে ও অনেক কান্নাকাটি করিয়া অব্যাহতি প্রাপ্তি। বসির শেখ বাহান্নবার জেল খাটিয়াছে, জজ সাহেব সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া নাম দিলেন, কারা বিহঙ্গ। আমরা স্থির করিয়াছি কোন রাষ্ট্রের রাজপ্রমুখের পদ শূন্য হইলে বসির সাহেবের দরখাস্তখানা বিমানে দিল্লী প্রেরণ করিব।

দেশে দারুণ লোকাভাব। লোকাভাব অর্থ ইহা নহে যে 'ক্রাউডে'র ঘাটতি হইয়াছে। দোহাই ধর্ম্ম! ক্রাউডই ত দেশটাকে দলিত মথিত বিমর্দ্দিত করিয়া ফেলিল। লোকাভাব মানে, কাজের লোকের অভাব। ইংরাজ যাহাকে 'ক্রেডিট' (বাহবা) অথবা 'ক্রেডেন্সিয়াল' (খেতাব) দেয় নাই, সেই ক্রাউড। ইংরাজ রাজত্বে যে ব্যক্তি পংক্তি ভোজনে বসিতে পায় নাই, সেই নগণ্য। কাজেই লোকাভাব। "কত ভালবাসি তায় বলা হোল না। সরমে বাধিল বুক, বলি বলি বলা হোল না।" ইংরাজকে যে কত ভালবাসিতাম, আগে বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি। দাঁত থাকিতে কে কবে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে বল? চন্দ্রগুপ্ত নাটকের চাণক্য বলিয়াছিল দস্যু, তোমার হত্যা করে তোমার স্বর্ণ-মূর্ত্তি গড়িয়ে অক্টারলোনী মনুমেণ্টের মাথায় বসিয়ে রাখবো! অহো প্রেম! ইংরাজ যাহাকে মান দেয় নাই, তাহার মানের গোড়ায় ছাই; ইংরাজ যাহার বিদ্যার তারিফ করে নাই, সুন্দর সহ সে বিদ্যাকে মশানে জয় মা কালী বলিয়া বলি দেওয়াই ভাল। অতঃপর লোকাভাব। এক ব্যক্তিই কর্পোরেশন সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, মেটার্নিটি সংস্কার, ইনক্যাণ্ট সংস্কার প্রভৃতির সংস্কার করিবেন। আমাদের প্রোমোশন যে পশ্চাদ্দিকে দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হইতেছে, তাহার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ—কলিকাতা কর্পোরেশন। ছিয়ানব্বইটি সন্ন্যাসীতে গাজন করিত; গণতন্ত্র গাজন নষ্ট করিত বৈ কি! কিন্তু আমাদের শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতেছে, এক্ষণে একশ্চন্দ্রমোহনাস্তিঃ।

কথায় আছে, বড় গাছে বড় ঝড়। আমরাও দেখি, যত বড় বৃক্ষ, লাটখাওয়া ঘুড়ি তাহাতে তত আটকায়। ফুল বেশী ফুটে, ফল অধিক ঝুলে। রাঘব বোয়ালের পেট চিরিলে, শকুন্তলার আংটি কেন, অনেক ধনরত্ন মিলিতে পারে। কিন্তু আপোষে স্বাধীনতা, আপোষে ভাগ বাটোয়ারা। ইংরাজের সুস্বাদু উপদেশ, বাঁটে দুগ্ধ আছে জানিলে চাট্ খাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিও। চাইকি পূর্ব্বাহ্নে "inner cleanliness comes first." অর্থাৎ ভো ভো বাপু সকল, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশপ সাহেব কথিত সুসমাচার স্মরণ রাখিও! খদ্যোৎ খদ্যোৎ, হস্তী হস্তী থাকিতে বাধ্য। স্বাধীনতা খদ্যোৎকে বেলুন ফুলাইয়া গজরাজ করিতে পারে না। রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ রচনা হয় না।

আপোষে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে বলিয়াই মানুষ এতদিন—এখনও আপোষের সম্মান রাখিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভাতের কাটির ভার

দুর্ব্বহ হইতে বড় দেরী নাই। মিষ্ট কথায় কষ্ট নাই, শ্রমিক কাণ পাতিয়া শুনে, কিন্তু চিঁড়া ভিজে না, দাঁত ভাঙে। বেকারের দলের অসীম ধৈর্য্য, বক্তৃতায় যমুনা উজান বাহিনী দেখিয়া বাহবা দেয়, ট্রামে বাসে হাটে বাটে মেজাজের পট্‌কা ফাটায়; বলে, আরও কতকাল? গৃহহীন ঘর বাঁধিতে চাহে, মনসা, শীতলা, ইতু ঘেঁটু, ইস্তক্ অশথতলার বুড়ী ঠাকুরাণীর দ্বারে দ্বারে ধরণা দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কুটুম্বিতাসূচক ধ্বনি তুলিতেছে। ব্যবসায়ী আবার খেরো বাঁধা খাতা কিনিয়া, ধুনা গুগ্‌গুল আনিয়া, গঙ্গা জল ছিটাইয়া শ্রীশ্রীগণপতি স্মরণ করিতে গিয়া দেখে, ভুঁড়ি পূর্ব্বেই ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে জানু দেশ ও ক্ষয়রোগ গ্রস্ত হইয়াছে। লেখক বহি লিখিয়া ছাপিতে যায়, কাগজ কোথা? প্রকাশক আশ্বাস দেয় বাঁশ বন বসাইয়াছি, কাগজের কল খুলিব। বস্ত্র হরণের কথা বলিয়া কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা নাই বা দিলাম। আর তা'ও বলি, এত হাঙ্গামা হুজ্জত কেনই বা? কাপড় পরিয়া কেহ ধরায় আসে নাই, কাপড় ছাড়াও দূর যাত্রায় বাধা নাই; তবে কেন আর? বাঙ্গালী বড় মাছ ভালবাসে। কলিকাতার পুষ্করিণীগুলি রংবাহার বালা, তাবিজ, চন্দ্রহার পরিধান করিয়া অভয় দিতেছে, মাভৈঃ! হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে একটা কিছু করিতেই হইবে; বীর রসের ড্রেস্ রিহার্স্যাল শুনিয়া কর্ণ বধির হইল। কিন্তু নিন্দা করিলে চলিবে না। আপোষে স্বাধীনতার নজীর সামনেই পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বের সর্ব্বহারারা পশ্চিমে আসিয়া সুদে আসলে পোষাইতে না পারিলে, বলং বলং বাহুবলং দেখাতে চাহে। বাঙ্গলার বহুভাগ্যে, লাট ভাল জুটিয়াছে এবং লাটেরও ভাগ্য ভাল। লোক যখন বড্ড গণ্ডগোল করে, ইংরাজীতে না কুলাইলে সংস্কৃতে, গদ্যে না মিলিলে পদ্যে লাট ঘৃতভাণ্ড উজাড় করিয়া দেন। বলেন, "রহ ধৈর্য্যম্।"

তবু বড় দুশ্চিন্তা—'কথায় রাখিবে কত ঠেলে?' আপোষেরও কণ্ঠশ্বাস উঠিল যে!

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মথুরা-সৈরিন্ধ্রী আমি, আমি কুব্জা, লজ্জাহীনা নারী।
হাতে লয়ে অঙ্গরাগ-গন্ধ-পাত্র, চন্দনের ঝারী
নিত্য প্রাতে রাজপথে অসুরের প্রিয় প্রসাধনে
যাই আমি সাথে লয়ে আমার এ নিষ্ফল যৌবনে।
বুঝিতে পারিনা হায়! কি দারুণ প্রাক্তনের পাপে,
কার মর্ম্ম-দাহোত্থিত সুদুঃসহ গুরু অভিশাপে
সৌন্দর্য-বিহীনা আমি। তবু কেন মোর চিত্ত মাঝে
রূপের নন্দন-বনে সঙ্গীতের আমন্ত্রণ বাজে?
ঔৎসুক্য-চঞ্চল মনে করি যবে সে সুর-সন্ধান
মিলেনা কাহারো দেখা, নিরাশায় চিত্ত হয় ম্লান!
বিশ্বের অঙ্গন-তলে অনঙ্গের মহা-মহোৎসব
চলিতেছে অহরহ, মোর গৃহ নিতান্ত নীরব!
বসন্ত আসিয়া মম উপবন-দ্বারে দেয় দেখা;
অঙ্গে তার অশোকের কিংশুকের রক্ত-রাগ-রেখা,
পিক কণ্ঠ কহে ডাকি, "মিলনের কর আয়োজন।"
জানেনা সে কুব্জা লাগি লুব্ধ নহে কাহারো নয়ন।
প্রাবৃটের মেঘপুঞ্জ পিপাসিত প্রাসাদ-শিখরে
বর্ষা-অভিসার-গান গাহে ধীর সুগম্ভীর স্বরে;
জানে না সে মোর লাগি প্রতীক্ষায় রাত্রি-অন্ধকারে
কেহ নাই দাঁড়াইয়া। যাব আমি কার অভিসারে?
শরৎ সঙ্গিনী-সখা হাতে লয়ে কৌমুদীর ডালা
পরাইয়া দেয় আসি কবরীতে কমলের মালা,
কহে, "সখি বসুধায় এল যোগ্য প্রিয় সঙ্গকাল।"
আমি করি অশ্রুপাত স্মরি মোর এ পোড়া কপাল।
হৃদয়ের ডালে ডালে উঠে ফুটি কামনা-মঞ্জরী
সংখ্যাতীত অগণিত, বন্ধ্যা হয়ে পড়ি যায় ঝরি।

নৈরাশ্যের মসী-মাখা আঁধারের দীর্ঘ অন্তরাল
অকস্মাৎ করি ভেদ, উজ্জ্বলিয়া চিত্ত-চক্রবাল
শ্যামচন্দ্র দিল দেখা, তৃপ্ত হল তৃষিত নয়ন।
মোর প্রতি অঙ্গ তারে দূর হতে করিল বন্দন।
করিল না উপহাস ঘৃণাভরে গেল না সে সরি,
অমৃত-বর্ষিণী দৃষ্টিপাত করি মোর দেহোপরি
কহিল, "সুন্দরি, দাও পরাইয়া আমারে চন্দন।
তোমার উত্তম শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিত করিব সাধন।"
রূপ তার, হাসি তার, মধুঝরা বঙ্কিম নয়ন
জাগাইল মনে মম নব-অনুভূতির স্পন্দন।
আনন্দ কম্পিত করে সে ললিত দেহ স্পর্শ করি
দিনু গন্ধ অনুলেপ, প্রতি অঙ্গ উঠিল শিহরি!
সহসা সুন্দরে ছুঁয়ে নিন্দিতাঙ্গ কোথা হল লয়!
লাবণ্য-হিল্লোলে পূর্ণ দেহ মোর হল রূপময়।
সেই দিন হতে পদে হয়ে আছি পূজা পুষ্পরাশি
যাঁর কৃপাদৃষ্টি লভি পূর্ণ-দেহা হল কুব্জাদাসী।

বনফুল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সদারঙ্গবিহারীলালের হাসি আকর্ণবিশ্রান্ত হয়ে উঠল আবার।

"আমার মতামত কিন্তু সেকেলে—নিতান্ত সেকেলে। আমি আভিজাত্যকে শ্রদ্ধা করি, ঠাকুর দেবতা মানি, অতীতকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবার পক্ষপাতী নই—কুসংস্কারাচ্ছন্নই বলতে পারেন—হা-হা-হা—। আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছি, ভারী আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে তর্কটা বেশ জমবে। কিন্তু তর্ক করবার আপনার সময় নেই হয় তো—"

"দেখুন"—একটু ইতস্তত করে' লঘু হাস্যসহকারে ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"আমি আমার মতামত জোর করে' কারও ঘাড়ে চাপাতে চাই না। এর পর এ-ও আপনি যেন না মনে করেন যে আমি লোক দেখলেই তাড়া করে' তার সঙ্গে তর্ক করি। মোটেই তা নয়। ঘটনাচক্রে এটা হয়ে গেল—"

"না—না—বাঃ মোটেই না"—উচ্ছ্বসিত উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বাস্তবিকই খুশী হয়েছি আমি। বাস্তবিক বলছি। অত্যন্ত। কাউকে স্বমতে আনবার চেষ্টা করা বাতুলতা, তা জানি, কিন্তু আলোচনা করে' একটা সুখ আছে, কি বলেন, অপ্রিয় হলেও বেশ লাগে। অনেকটা ঝাল খাওয়ার মতো, নয়? শিক্ষাও হয়, অনেক সময়। আলো কখন কোন ফাঁক দিয়ে এসে পড়ে কে বলতে পারে। তাছাড়া আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, প্রগতিশীল লোকের নাগাল পাই না তো বড় একটা। তাঁরা কি ভাবেন তা জানবার খুব আগ্রহ আমার। প্রচণ্ড। কাগজে যা পড়ি তাতে তৃপ্তি হয় না, মনে হয় ভেজাল আছে। আজকাল ঘি থেকে আরম্ভ করে' খবর পর্য্যন্ত সব ভেজাল—হা—হা—হা—"

"এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতদ্বৈধ নেই আমার। আসল প্রগতিশীলদের মতবাদ শুনতে পান না আপনারা। যাঁরা প্রকৃত প্রগতিশীল তাঁরা কর্ম্মে আস্থাবান, বাক্যে নয়। তাই তাঁদের কথা শুনতে পান না। কিন্তু এটা জেনে রাখুন সত্যিকার প্রগতিশীল আছেন এবং থাকবেনও চিরকাল"

"বাঃ, চমৎকার!"

সদারঙ্গবিহারীলাল উত্তেজনাভরে চশমটা খুলে পরলেন আবার। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। একটা মোক্ষম কুঠার তো আছে তাঁর হাতে। হ্যাঁ, ঠিক তো। কোপটি মারবার জন্যে প্রস্তুত হলেন পরমুহূর্ত্তেই।

"আপনি আশা করি দক্ষিণপন্থীদেরই প্রগতিশীল বলবেন"

"নিশ্চয়ই"

"আপনি বোধ হয় একটা কথা জানেন না যে দক্ষিণ-পন্থীরা আসলে সুবিধাপন্থী—যেদিকে ছাট সেইদিকে ছাতা—এই হলো তাঁদের মন্ত্র"

"কে বললে আপনাকে একথা!"

"দেখুন আপনাদের জন্যে দুঃখ হয় আমার"—বলে' চললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"সত্যি দুঃখ হয়। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয় তো সাঁচ্চা লোক, কিন্তু আপনাদের নেতারা যে ক্রমাগত আপনাদের ধাপ্পা দিয়ে চলেছেন এ

খবরই রাখেন না আপনারা, রাখা সম্ভবও নয়, কাগজে তো এসব খবর বেরোয় না—"

"আপনি জানলেন কি করে'! নেতাদের মধ্যে এত গলদ আছে আমি তা ঘুণাক্ষরে জানি না তা—"

"জানবার কথাও নয়"—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুচকি হেসে খুব মুরুব্বিয়ানা সহকারে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আমি এত জোর করে' বলতে পারছি কারণ মুরগির ঠিক পেটের তলা থেকেই ডিমটি পেয়ে গেছি কিনা। পেয়ে যাবার সুযোগ হয়ে গেল হঠাৎ। আমার এক দক্ষিণপন্থী বন্ধুর সঙ্গেই কথা হচ্ছিল; তিনি নিজে একজন নামজাদা দক্ষিণপন্থী, তিনি নিজে আমাকে বললেন—দলকে দল তাঁরা ছাতা ঘাড়ে করে' ওৎ পেতে বসে আছেন, যেদিকে ছাট আসবে সেইদিকে ছাতা খুলবেন বলে"

"বলেন কি!"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন ব্রজেশ্বর দে—"আমি তো কিচ্ছু জানি না। দক্ষিণপন্থীদের ভিতরের খবর আমিও রাখি কিছু কিছু। এরকম কথা তো কখনও শুনিনি। আপনার এই বন্ধুটির নাম কি জিগ্যেস করতে পারি কি"

"না, মাপ করবেন, নামটা বলা ঠিক হবে না। ক্ষতি হতে পারে তাঁর। আপনি যদি কাউন্সিলার হতেন তাহলে বুঝতে পারতেন হয় তো, মানে—"

"ও কথা যখন তুললেন তখন আমাকে পরিচয় দিতেই হচ্ছে। আমিও একজন কাউন্সিলার"

"ও!"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে একটু মুখ ফাঁক করে' চেয়ে রইলেন সদারঙ্গবিহারী।

"দক্ষিণপন্থী?"

"হ্যাঁ"

"ও বাবা, তাহলে এ নিয়ে বেশী কথা বলা উচিত হবে না আর"

"যতটা বলেছেন ততটা বলাও কি উচিত ছিল?"

"তার মানে?"

"রাগ করবেন না, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার ভাবা উচিত ছিল না যে আপনার বন্ধুর এই খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন হতে পারে"

"তিনি সাধারণ লোক হলে তাই ভাবতাম। কিন্তু তিনি একজন নামজাদা ব্যক্তি। তিনি নিজের মুখে বললেন আমি শুনলাম। স্বকর্ণে। এতে অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠতেই পারে না"

"আপনার কথা বিশ্বাস করলে এই কথাই আমাকে তাহলে বলতে হয় যে তিনি আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু পার্টির বন্ধু নন"

"আসল কথা বোধ হয়"—বলে উঠলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"অনেকের চেয়ে আপনি একটু বেশী গোঁড়া। যাঁর কথা আমি বলছি, তাঁর সঙ্গে অবশ্য এই আমার প্রথম আলাপ হল। কাল রাত্রে। যদিও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন আগে থাকতেই আলাপ ছিল। তিনি স-স্ত্রীক এইখানে একটা হোটেলে রাত কাটাচ্ছিলেন কাল। আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম সেখানে। তাঁর স্ত্রীই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। চমৎকার লোক, ভারী মন-খোলা, দেমাক অহঙ্কার কিছু নেই। ঢাক ঢাক গুরগুরও নেই—খাশা। অবশ্য তিনি একথাও বললেন যে প্রকাশ্যে তিনি এসব কথা স্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা থেকে যতটুকু বুঝলাম—পার্টির অধিকাংশ লোকেরই উপর আস্থা নেই তাঁর।"

"ও বুঝেছি"—ব্রজেশ্বরবাবুর একটা কথা যেন মনে পড়ে গেল—"বুঝেছি। আপানাকে আর বলতে হবে না। আপনি যাঁর কথা বলছেন তিনি শিগগিরই বোধহয় রিজাইন করবেন"

"কই সেকথা তো কিছু বললেন না"—সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় এবং ক্ষোভ দুইই ফুটে উঠল—"আশ্চর্য্য তো। তাঁর স্ত্রী অন্তত নিশ্চয় বলতেন আমাকে ও কথাটা। বলা উচিত ছিল"

"আপনি মৃন্ময় ঘোষালের কথা বলছেন তো"

"না। আচ্ছা বলছি আপনাকে তাহলে নামটা, কিন্তু দেখবেন যেন কথাটা বেশী চাউর না হয়। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে"

ব্রজেশ্বর দের হাতে একটা লাঠি ছিল। তিনি দুহাত দিয়ে লাঠির মাথাটা চেপে ধরে' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন একটু। তারপর সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আবার। তাঁর গম্ভীর মুখে শানিত ইস্পাতের দীপ্তি যেন চকমক করে' উঠল, চোখের দৃষ্টিতে খেলে গেল

ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ। একটু হেসে তিনি বললেন, "কেউ আপনাকে ঠকিয়ে গেছে। এটা আমি নিশ্চিত জানি যে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে—যিনি কাউন্সিলার—কাল রাত্রে তিনি এ অঞ্চলে ছিলেন না, থাকতে পারেন না"

"আরে কি যে বলেন মশাই আপনি। জলজ্যান্ত আমি তাঁকে দেখলাম স্বচক্ষে, ওকথা বললে শুনব কেন! আমি তাঁদের দুজনকে—"

"সে ভদ্রলোক কেন নিজেকে ব্রজেশ্বর দে বলে' পরিচয় দিয়েছেন তা জানি না, কিন্তু এটা আমি ঠিক জানি কাল রাত্রে ব্রজেশ্বর দে কোলকাতায় ছিলেন"

"কোলকাতায় ছিলেন? বললেই মানব? মানতেই পারি না একথা"—সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে উষ্মার উত্তাপ ফুটে উঠল একটু—"আমি আপনাকে গোড়াতেই বলেছি যে ভদ্রলোক স-স্ত্রীক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে আমি চিনি বহুকাল থেকে—তিনি যখন সান্ত্বনা পাল ছিলেন তখন থেকে। একটা নাইট স্কুলে পড়াতেন বউবাজারে। আমি এম-এ দিচ্ছি যেবার সেইবারই আলাপ—"

"এসব ঠিকই বলছেন। নাইট স্কুলে মাস্টারি করবার সময়ই তাঁর বিয়ে হয় ব্রজেশ্বর দের সঙ্গে—"

"আপনিও তো জানেন তাহলে। ওই সান্ত্বনা দেবীই কালরাত্রে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ফাংনা ফিরিঙ্গিপুরে হরিমটর পান্থনিবাসে ছিলেন। তার স্বামীর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আলাপ হয় নি, কারণ বিয়ের সময় যেতে পারি নি আমি। শুনলাম তাঁরা মোটরে করে' কোলকাতা থেকে আসছিলেন। কিন্তু রাস্তায় মোটর বিগড়ে যাওয়াতে রাত্রে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল গোসাইজির হোটেলে। আজ সকালে তাঁরা মুচুকুন্দকুন্তলেশ্বরী গেছেন রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায়ের বাড়িতে। দেখুন, এত কথা জানি আমি"

বিজয়গর্ব্বে চাইলেন তিনি ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাব দেখে নিজের বিজয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না তাঁর।

ব্রজেশ্বরবাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল ক্রমশঃ। চোখ দুটোও ছোট হয়ে এল। মনে হল মনে মনে হিসেব করছেন তিনি যেন কিছু।

প্রতিপক্ষকে কবলে পেয়ে নিরস্ত হবার লোক সদারঙ্গ-বিহারীলাল নন। রাজনৈতিক তর্ক-দ্বন্দ্বে তিনি একজন দক্ষিণ-পন্থীকে কাবু করে' ফেলেছেন, ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করে' লোকটা হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে, এই উপভোগ্য অনুভূতিটা সঞ্চারিত হতে লাগল তাঁর দেহের শিরায় উপশিরায়।

বক্তব্যটা আরও জোরালো করবার জন্যে তিনি আবার বললেন, "আপনি বলছেন আপনি সান্ত্বনা দেবীকে জানেন। কিন্তু আমি যতটা জানি ততটা যদি আপনার জানা থাকে—তাহলে এটা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে পর-পুরুষকে নিজের স্বামী বলে চালাবার চেষ্টা আর যে-ই করুক, তিনি করবেন না, করতে পারেন না। আন্থিঙ্কেবল্"

"তা ঠিক। তাঁর সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই আমার"

"শুনে সুখী হলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উচ্চ। খুবই। একবার তাঁর বদনাম রটেছিল অবশ্য, কিন্তু সে সব বাজে রটনা। মূলে ছিল বোধহয় ঈর্ষা। সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। এই সব বখেড়ায় পড়ে ভদ্রমহিলা প্রায় সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবার মতো হয়েছিলেন—কারও সঙ্গে মিশতেন না পর্য্যন্ত—একদিন গিয়ে দেখি 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস' পড়ছেন—গোপনে গোপনে জনহিতকর কাজ করে' বেড়াতেন ক্রমাগত। এই সময়ে আমি কোলকাতা থেকে চলে আসি। তারপর 'ফরচুনেট্‌লি' ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। ওয়াণ্ডারফুল লোক। আশ্চর্য্যরকম ভাল লাগল কাল। গুজব শুনে-ছিলাম লোকটা গাধা গোছের, কিন্তু দেখলাম, না, তা নয়, দামী কাকাতুয়া—মানে জানোয়ারে উপমা যদি দিতে হয়"

আবার আকর্ণ হাসি হাসলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

আসল ব্রজেশ্বরবাবু ছড়ি দিয়ে নিজের জুতোর ডগায় টোকা মারলেন দু'একবার অধীরভাবে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন চারদিকে। মনে হল ভদ্রলোক যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন।

সদারঙ্গবিহারীলালের কিন্তু আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোককে নিয়ে এখন যা খুশী করা যায়।

"আমি যা বললাম তাতে যদি আপনার সন্দেহ না ঘোচে তাহলে আমি আরও বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারি"—বলতে লাগলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"ওঁরা কালরাত্রে ফাংনা ফিরিঙ্গিপুরে যে হরিমটর পান্থনিবাসে ছিলেন আপনি

সেখানে খোঁজ করতে পারেন ইচ্ছে করলে। এখান থেকে বেশী দূর নয়। সেখানে অনেক কিছু ঘটেছিল কাল ওঁদের কেন্দ্র করে'। রাতদুপুরে ব্রজেশ্বরবাবুকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছিল তাঁদের কুকুরটাকে খুলে দেবার জন্যে। কুকুরটা গোয়াল ঘরে বাঁধা ছিল। কাঁদছিল খুব। খুলে দেবামাত্র কুকুরটা অন্ধকারে কোথা সরে' পড়ল। রাত্রে তো পেলেনই না, সকালেও পাওয়া গেল না। একটু আগে আমিই সেটাকে পেলাম রাস্তায়, নিয়ে গিয়ে দিয়েও এসেছি তাঁদের। হিন্দু পান্থনিবাসের মালিক গোঁসাইজি রাত্রে অদ্ভুত শব্দ শুনে উঠে পড়েছিলেন—শব্দটা সম্ভবত কুকুরটাই করেছিল—শব্দ শুনে উঠে তিনি ব্রজেশ্বরবাবুদের ঘরে যান। গিয়ে দেখেন ওঁরা দু'জন পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আপনি যখন সান্ত্বনা দেবীকে জানেন বলছেন, তখন এর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে ব্রজেশ্বরবাবুকেও আপনি আমার চেয়ে ভাল করে' চেনেন। সুতরাং—"

একটু হেসে নিজের বাইসিক্‌লের দিকে অগ্রসর হলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

বিস্ফারিতচক্ষে চেয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে যে অমায়িকতা ছিল এতক্ষণ তা যেন 'উপে' গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন তিনি। তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডলে ক্রোধের কোনও চিহ্ন ফুটে উঠল না। বরং মুখের উপর ক্ষীণ হাসির একটা আভাষ ফুটেই মিলিয়ে গেল। মনে হল যেন তাঁর জটিল মনে কৌতুকজনক কিছু একটা জেগেছে। সদারঙ্গবিহারীলালের মনোযোগ পুনরায় আকর্ষণ করবার জন্যে তিনি হাতটা একবার তুললেন; কিন্তু তুলেই থেমে গেলেন এবং ধীরে ধীরে আবার চেপে ধরলেন লাঠির মাথাটা। সদারঙ্গবিহারীলাল ঝুঁকে বেঁকে উবু হয়ে হেঁট হয়ে নানাভাবে তাঁর বাইকটি পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু—লোকে যেমন তীরে দাঁড়িয়ে নিস্পৃহভাবে পালতোলা নৌকো দেখে। তারপর হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন।

"এইবার চলি তাহলে—"

"ও চললেন, আচ্ছা,"—ঘাড় ফিরিয়ে হেসে সদারঙ্গ বললেন—"আমরা পাঁয়তারাই করলুম অনেকক্ষণ ধরে', আসল তর্কটা আর হল না"

ব্রজেশ্বর মুচকি হাসলেন এবং ছড়ি ঘুরিয়ে অগ্রসর হলেন স্টেশনের দিকে।

"দেখবেন মশায়"—দুষ্টুমিভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন সদারঙ্গবিহারী—"ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে যদি দেখা হয় এসব কথা বলবেন না যেন। আর দেখুন পলিটিক্‌সকে অত সিরিয়াসলি নেবেন না, কেউ নেয় না। আচ্ছা, নমস্কার"

"নমস্কার"

ব্রজেশ্বরবাবু এগিয়ে গেলেন এবং স্বগতোক্তি করলেন —"স্বপ্ন দেখছি না কি!"—তারপর সোজা হন হন করে' এগিয়ে গেলেন স্টেশনের দিকে। গিয়েই পেয়ে গেলেন একটা ট্যাক্সি। আর কালবিলম্ব না করে' স্টেশন থেকে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদারঙ্গবিহারীলালও হাজির হলেন স্টেশনে এবং ট্যাক্সি আরূঢ় ব্রজেশ্বরকে দেখতে পেলেন। ট্যাক্সিটা তাঁর চেনা ট্যাক্সি। এ অঞ্চলের সমস্ত ট্যাক্সিওলাই তাঁর চেনা। কৌতুহল হল। কে ভদ্রলোকটি? কাউন্সিলার? গেলেন কোথায়? খোঁজ কর'তেই যে কুলিটা তাঁর জিনিসপত্র ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিল সে বলল—"নাম ঠিক জানি না বাবু"

"গেলেন কোথায়"

"ট্যাক্সিওয়ালাকে তো বললেন ফাৎনা ফিরিঙ্গিপুর যেতে"

"ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর?"

"আজ্ঞে। তাই তো শোনলাম"

নিপুণভাবে একটি বিড়ি ধরিয়ে কুলিটি চলে গেল।

"ফাৎনা-ফিরিঙ্গিপুরে কি প্রয়োজন থাকতে পারে ভদ্রলোকের? অদ্ভুত ঠেকছে তো! মতলব কি ওঁর!"

সদারঙ্গবিহারীলাল পুনরায় আরোহণ করলেন তাঁর মোটরবাইকে। স্টার্ট করতেই পিস্তলের মতো আওয়াজ হল গোটা দুই। কুণ্ডলীকৃত হয়ে একটা কুকুর কাছেই নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিল। চমকে উঠে পালাল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল এই অদ্ভুতপ্রকৃতির কংগ্রেসকর্ম্মীটির পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

(ক্রমশঃ)

বহরমপুরে অধ্যাপক সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বিএল

বাংলা দেশের সমগ্র শিক্ষক সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা স্কুলের শিক্ষক এবং উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই তিনটি শ্রেণীর শিক্ষকদের লইয়া তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে All Bengal Primary Teachers' Association (বর্ত্তমান ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে West Bengal Primary Teachers' Associaton বা WBPTA), All Bengal Teachers' Association (ABTA) এবং All Bengal College and University Teachers' Association (ABCUTA)। এবার বহরমপুরে চৈত্রসংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখ এই দুইদিনের ছুটীতে এ্যাব্‌কিউটা বা নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্মেলনের ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল।

এ্যাবকিউটার বাৎসরিক অধিবেশনের কেমন একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজের বিচিত্র মনমেজাজসমন্বিত বহুবিধ গোপালক ওরফে অধ্যাপকের সহিত দুইতিনদিন একত্র অবস্থান, নানাবিধ অবান্তর ও অযৌক্তিক তর্ককলহ ও বিবাদ গুঞ্জনের দ্বারা মণ্ডিত দু'একটি সারগর্ভ বাণী, পরস্পরের সহিত প্রচণ্ড ও তিক্ত বাগযুদ্ধ এবং কচিৎ হাতাহাতির পরমুহূর্ত্তেই সিগারেটের আদানপ্রদান, যে সহরে অধিবেশন হইতেছে সেই সহরের স্থানীয় অধিবাসীদের অধ্যাপক সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণা ও স্থানীয় ছাত্রদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সেবা, দেশবাসীর চেষ্টা ও সহযোগিতায় আহৃত সঙ্গীত ও নৃত্যকলার সহিত শুভ্র চাদর বিলম্বিত জ্ঞানীমন্য বর্ষীয়ানদের দীর্ঘ ধৈর্য্যপরীক্ষাকারী বক্তৃতা দ্বারা কণ্টকিত সাধারণ জলসা এবং সর্ব্বোপরি পোলাও, মাংস ও দধি সন্দেশের ভুরিভোজের সমন্বয়ে এই সমস্ত অধিবেশনগুলি এমনই মুখর হইয়া উঠে, একবার যে অধ্যাপক এই বিচিত্র পরিবেশের আস্বাদ পান, তিনি পরবৎসরের অধিবেশনের তারিখ জানিবার জন্য অধীর আগ্রহে উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করেন। গত বৎসর এই অধিবেশন হইয়াছিল জলপাইগুড়ী সহরে এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সিরাজগঞ্জে। তৎপূর্ব্ব বৎসর সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের কোন জ্ঞান নাই। আগামী বৎসর শুনিতেছি মালদহে—চতুর্বিংশতি অধিবেশন হইবে এবং মালদহের এই ভাবী অধিবেশন আমাদের সকলকেই যে অলক্ষ্য ইঙ্গিতে এখন হইতে আহ্বান জানাইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধুনা অনুষ্ঠিত অধিবেশনের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া এই আনন্দ-বাসরের সামান্য অংশ আপনাদের মধ্যে বিতরণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

সাধারণতঃ অন্যান্য অখিল ভারত বা প্রাদেশিক অধিবেশন যেরূপ হয়, এ্যাব্‌কিউটাও সেইরূপেই সম্পন্ন হইল। এই জাতীয় প্রত্যেক সমাগম বা অধিবেশনের মধ্যে এক শ্রেণীর কেজো লোক থাকেন তাঁহারা সর্ব্বদাই রেজোলিউসন লইয়া ব্যস্ত, একবার রাম ও পরমুহূর্ত্তেই শ্যামের সহিত কানাকানি করিয়া নানাবিধ দরকারী কথা কহিয়া দল গঠন করেন, উর্দ্ধতন কর্ত্তাদের সহিত নানারূপ গভীর আলোচনা করিয়া নিজেদের প্রাধান্য ও কল্পিত মননশীলতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আমি কি করিয়াছি ও কি বলিয়াছি এবং আমি না থাকিলে কি ভীষণ দুর্দ্দৈব ঘটিত—তাহা বহুলভাবে প্রচার করিতে করিতে ইঁহারা সকলেরই বিরুদ্ধে তীব্র তিক্ত সমালোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সকলের উপর বিরক্ত হইয়া গোটা অধিবেশনের উপরই হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। আর একদল আছেন, যাঁহারা পূর্ব্বতন সভ্যদের অনুকম্পায় তাঁহাদের প্রদত্ত ভোট গ্রহণ করিয়া কর্ম্মকর্ত্তার আসন অলঙ্কৃত করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা স্মিতহাস্যে বাজে লোকদের আপ্যায়িত' করিয়া, ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে ভীতিপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া 'ঐ অবৈতনিক চাকুরী ঘাড় হইতে নামিলেই বাঁচি' এই প্রকার বৈরাগ্যময় অমূলক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দলকে করায়ত্ত রাখিবার বাসনায় সকল প্রকার ন্যায় অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া আগামী বৎসরের নির্ব্বাচনে নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিবার যাবতীয় সৎ এবং অপচেষ্টা সমস্তই সম্পাদন করেন যথা সম্ভব শোভনভাবে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত সত্যকারের রূপ প্রকটিত হইলে আর ভোট পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এ ছাড়া তৃতীয় একদল আছে, যাহারা কোনরূপ মতামত পোষণের ধার না ধারিয়া, যে প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে গিয়াছেন সেই প্রতিষ্ঠানের ভালো মন্দ বিষয়ে নির্ব্বিকার থাকিয়া নামকরা কয়েকজনের সহিত পরিচিত হইয়া ভবিষ্যতে কাজ গুছাইবার তালে তালে ঘুরিতে থাকেন। রাম ও শ্যাম উভয়েই পদস্থ ও ক্ষমতাশালী হইলে ইহারা রামের কাছে শ্যামের নিন্দা করিয়া, পরমুহূর্ত্তেই শ্যামের কাছে রামকে অপদার্থ ও ধাপ্পাবাজ প্রমাণ করিয়া উভয়ের নিকট হইতেই কাজ গুছাইতে চেষ্টা করেন, তবে এই জাতীয় লোকের প্রাদুর্ভাব শিক্ষক সম্মেলনে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু ইহাদের সকলের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া হালকা হাসিখুসির লঘু পক্ষসঞ্চালনে উড়িয়া বেড়ান যাঁহারা, তাঁহারা প্রায় সবটাই দেখেন অনাসক্তভাবে, সেই সঙ্গে যে দেশে অধিবেশন হইতেছে, সেই দেশের আশে পাশের দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া আহারের সময় ভালো একটি আসন সংগ্রহ করিয়া, নিদ্রার সময় ঠাণ্ডা মাথায় নিরিবিলিতে মশারী ফেলিয়া শয়ন করেন এবং পরদিন প্রভাতে নূতন আনন্দলাভ করিবার জন্য অধিবেশনে পুনরায় প্রবেশ করেন এবং যেখানে যে কথা বলা উচিত, অর্থহীন ভাবে সেখানে তাহার বিপরীত কথা বলিয়া রুদ্র 'কেজো' লোককে চটাইয়া দিয়া, তার্কিকের তর্কস্পৃহা বর্দ্ধিত করিয়া উষ্ণ আবহাওয়াকে উষ্ণতর করিয়া, ভোটের সময় অজ্ঞাতসারে হয়ত বা

অজ্ঞাতসারেই উভয় পক্ষের দিয়েই একসঙ্গে দুইটি করিয়া হাত তুলিয়া অবস্থা সঙ্গীন বুঝিয়া কখন যে টুক্ করিয়া সরিয়া পড়েন, তাহা তাঁহার সমশ্রেণীর প্রজাপতি মার্কা সভ্য ছাড়া অন্য কেহ টেরও পান না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অকৃত্রিম সভ্য। প্রথম জীবনে যখন কোনো এক রাজনৈতিক অধিবেশনে যোগদান করার সুযোগ আমার হইয়াছিল, তখন ইচ্ছা ছিল কোন এক মহৎকাজ করিবার, কিন্তু অক্ষম লোকের সৎবাসনা যেমন বাসনাতেই নিবদ্ধ থাকে, বাস্তবে কোনদিনই পরিণত হয় না, সেইরূপ সেইদিনের এক আঘাতেই উপলব্ধি হইয়াছিল, যে স্রষ্টা এই হতভাগ্যকে কোন মহৎ কার্য্য করিবার জন্য একেবারেই সৃষ্টি করেন নাই। অতএব অনাসক্তভাবে কর্ম্মহীন সক্রিয়ের ভূমিকাতে অভিনয় করাই বিধেয়, যেহেতু এই জাতীয় কার্য্যে দায়িত্ব বা বিড়ম্বনা এ সবের কোন বালাই নাই।

অতএব এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র বাহিরের ছবিটাই দিতে পারিব। আমরা বিভিন্ন কলেজের প্রায় একশত প্রতিনিধি ১২ই এপ্রিল সোমবার বেলা দেড়টার সময় শিয়ালদহ হইতে লালগোলা ঘাটের গাড়ীতে রওনা হইয়াছিলাম।

শেষ চৈত্রের দিনশেষের সমস্ত রৌদ্রকে সংযুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় অর্থাৎ একদাঁড়ি ও দুইদাঁড়ির সমন্বয়ে সদাশয় রেল কোম্পানী যে তিনদাঁড়ি দেওয়া কামরা বানাইয়া দিয়াছেন, সেই কামরারূপ ইন্‌কিউবেটারের মধ্যে অন্তর্নিহিত নানারূপ সৎচিন্তাকে এ্যাবকিউটার উপযুক্ত করিয়া ফুটাইতে ফুটাইতে কলিকাতার অধ্যাপক-বর্গ বহরমপুর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। গল্পগুজব, আলোচনা, তাস ক্রীড়া এবং মধ্যে মধ্যে সুধী ও 'কেজো' ব্যক্তিবর্গের দ্বারা লিখিত অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার উপযুক্ত রেজোলিউশনের তদারক সহি করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর এই সব কাজের সম্পূর্ণ অবসান হইল। রাত্রিকে শান্তিপূর্ণ করিবার জন্যই বোধ হয় সদাশয় রেল কোম্পানী তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আলো দেওয়ার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়াছেন। অন্ধকার কামরায় কলিকাতার সেই সমস্ত অধ্যাপক, যাঁহারা ছাত্রদের অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে লইয়া যান, তাঁহারা সিগারেটরূপ জোনাকীর অনির্ব্বাণ বর্ত্তি জ্বালিয়া আকণ্ঠ পিপাসা ও বিপুল ক্লান্তি সত্ত্বেও টানিয়া টানিয়া কথা বলিতে বলিতে আর কয়টা ষ্টেশন বাকী আছে তাহাই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টা নাগাৎ বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া গেল। সেখান হইতে মোটরবাস, সাইকেল-রিক্সা ও খোলা লরীতে করিয়া আমাদের লইয়া যাওয়া হইল বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল ভবনে। ঐখানেই আমাদের থাকা, খাওয়া ও অধিবেশনের আয়োজন হইয়াছিল।

স্কুল বাড়ীটি সত্যই সুন্দর। এরূপ প্রশস্ত সুন্দর ঘর এবং দোতলায় সুবৃহৎ থিয়েটার হল সমন্বিত স্কুল বাড়ী সচরাচর দেখা যায় না। ইহা পরলোকগত দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের অর্থে নির্ম্মিত। যে জমীদার শ্রেণীকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে সকলে মিলিয়া উঠিয়া পড়িয়া কোমর বাঁধিয়াছেন, ইনি তাঁহাদেরই একজন ছিলেন। এই জাতীয় জমীদার ও বিত্তশালীদের আনুকূল্যেই এতাবৎকাল বাংলা তথা ভারতের বহুবিধ উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়, একজন নাথুরাম গড্‌সের জন্য যাহারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘকে বেআইনী ও হিন্দুমহাসভাকে আংশিকভাবে আঘাত করিয়াছেন সেইরূপ কয়েকজন স্বার্থপর জমীদারের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া এবং সম্ভবতঃ 'আমরা গরীব অতএব আর একজন ধনী কেন থাকিবে' অন্তরের এইরূপ লুক্কায়িত ঈর্ষার দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া সকলে মিলিয়া অলক্ষ্মীর রুদ্ধ প্রাঙ্গণে সমবেত হইবার জন্য ব্যাপক আয়োজন করিতেছেন। অবশ্য আমাদের ইহাতে চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ বর্ত্তমান পৃথিবীর ব্যবস্থায় যাহার কিছু নাই, তাহাকে ডাক্তার উকীল হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্‌কম ট্যাক্সের অফিসার বা পাড়ার ক্লাবের অত্যুৎসাহী চাঁদা সংগ্রাহক পর্য্যন্ত কেহই কিছুই করিতে পারে না।

কলেজিয়েট স্কুলের বিরাট ভবনে প্রবেশ করিয়া দোতলার একখানি ঘরের মেঝের বাক্স ফেলিয়া ধপাধপ্ করিয়া ঠুকিয়া ধূলা উড়াইয়া তাহারই মধ্যে একটি স্থানে নিজের সতরঞ্চি ও সুজনী বিছাইয়া সাবানের টুকরা হাতে কোথায় জল পাওয়া যাইবে তাহার সন্ধান করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেলাম। হাত মুখ ধুইয়া চা পানের পর দেখা গেল যে রাত্রে আর কাহারও কোন কাজ করিবার উৎসাহ নাই। অধিবেশনের কর্ম্মসূচীতে ছিল ঐ রাত্রে বিষয়নির্ব্বাচনীসভার অধিবেশন। কিন্তু সারাদিনের উত্তাপ ও রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর আরাম-ভ্রমণে অধ্যাপকবৃন্দ এমনিই পরিক্লান্ত যে, সকলেই নৈশভোজন সমাপ্ত করিয়া শয়ন করাই উচিত বলিয়া মনে করিলেন এবং গণতন্ত্রের যুগে শয্যাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে ভোট বেশী হওয়ায় ঐ সভা ঐদিন স্থগিত রহিয়া গেল।

পরদিন অর্থাৎ চৈত্রের শেষদিনে সকাল সাতটা হইতে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত বহুপ্রকার সভা ও মধ্যে মধ্যে ভোজন। এবার কিছুকম দুইশত অধ্যাপক এই অধিবেশনে যোগদান দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিদেশ হইতে আগত সভ্যের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শতের মত। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায়, রাত্রিতে এবং এইদিন সকালের ট্রেণে ইহারা আসিয়াছিলেন এবং স্থানীয় কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপকই এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এবারের বৈশিষ্ট্য এই যে কলিকাতা হইতে চারিজন অধ্যাপিকাও বহরমপুর অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন এবং স্থানীয় কয়েকজন অধ্যাপিকাও যোগদান করিয়াছিলেন। এ্যাবকিউটার ইতিহাসে অধ্যাপিকাদের যোগদান এই প্রথম।

ঐদিনের অর্থাৎ মঙ্গলবারের কার্য্যসূচীর মধ্যে প্রথম ছিল এ্যাবকিউটার ত্রয়োবিংশতি অধিবেশনের উদ্বোধন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভার উদ্বোধন করিবেন বলিয়া স্থির ছিল, তিনি বহরমপুরে উপস্থিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত এবং হয়ত বা সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য কারণবশতঃই

তিনি সভার উদ্বোধন করিতে বিরত থাকিলেন, তৎপরিবর্তে কংগ্রেস-সেবক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনিশিকান্ত সরকার মহাশয় এক ছাপানো অভিভাষণ এবং সর্ব্বশেষে এ্যাবকিউটার এই বৎসরের সভাপতি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু মহাশয়ের তাঁহার নিজের ছাপানো শ্রীঅভিভাষণ পাঠ করিলেন। স্কুলের থিয়েটার হলে মঞ্চের উপর উভয়বিধ সভাপতি, নৃপেন্দ্রবাবু, কলিকাতা হইতে আহূত বিশেষ অতিথিরূপে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন ছিলেন, আমরা অর্থাৎ ডেলিগেটরা ছিলাম মঞ্চের নীচে ঢালা সতরঞ্চির উপর। আমাদের পাশে ছিলেন স্থানীয় মহিলা দর্শকবৃন্দ ও পিছনে স্থানীয় পুরুষদর্শক। স্থানীয় ছাত্রবৃন্দের সৌজন্য ও সতর্কতায় নিতান্ত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। একটু নড়াচড়া করিলেই ছাত্রের দল ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কি চাই। দুই একবার এইরূপ প্রশ্ন করার পর বাধ্য হইয়া বলিতে হয়—জল চাই এবং তৎপর জল আসিলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উহার কতকাংশ পান করিতে হয়। এইরূপে বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে প্রায় দশটা বাজিল এবং তারপর এই উদ্বোধন সভা ভাঙ্গিয়া আরম্ভ হইল আমাদের নিজস্ব বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা।

বিষয় নির্ব্বাচনী সভা নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। মাত্র ডেলিগেটদের লইয়া এই সভা হয়। সভাপতি শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু ও সম্পাদক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য এবং এ্যাব্‌কিউটার কয়েকজন মার্কা-মারা প্রাচীন সভ্য—যথা রমণীবাবু, ত্রিপুরারীবাবু, নির্ম্মলবাবু, অমৃতবাবু, ক্যাপ্‌টেন নিয়োগী এবং অপর কয়েকজন নবীন ও প্রগতিশীল সভ্য যাহারা প্রাচীনদের নিকট কমিউনিষ্ট নামে পরিচিত তাহারা অর্থাৎ প্রায় দশ বারো জন সভ্যই এই সভার যাবতীয় চিৎকার ও হট্টগোল করিবার একচেটিয়া ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের ন্যায় সাধারণ নগণ্য মধ্যবয়সী ডেলিগেটদের অবস্থা নিতান্তই delicate। প্রাচীন দল আমাদের কামনিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের পরিহার করিয়াই চলিয়াছেন। অপরপক্ষে নবীন কমিউনিষ্টরা (?) আমাদের পরিপূর্ণভাবেই অস্বীকার করেন। মধ্যপন্থী বাদুড় হইয়া প্রাচীন ও নবীনের অনুষ্ঠিত কুক্কুটযুদ্ধ অবলোকন করা ভিন্ন-আমাদের আর গত্যন্তর ছিল না। দেখিতে দেখিতে ইহাই সর্ব্বাগ্রে মনে হইল যে, এই সব সভায় রীতিমত গলার জোর চাই। যে যত গলাবাজি করিতে পারে সে তত বড় জ্ঞানী ও কর্ম্মী বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার চিৎকার বেশী হইলে কোন কোন প্রবীণ এ্যাব্‌কিউটটী ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ছলে দশ মিনিট ধরিয়া বক্তৃতা এবং তৎসঙ্গে ধমক দেন। বক্তৃতার সারমর্ম এই যে, এখানে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র চলিতেছে, অতএব সময় অভাবে তোমাদের কাহাকেও কিছু বলিতে দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু ধৈর্য্য ধরিয়া আমাদের বাণী শুনিয়া আমাদের সপক্ষে চার পা তুলিয়া অর্থাৎ একহাত তুলিয়া ভোট দাও ও মুক্তকণ্ঠে আমাদের গুণগান কর।

আন্দাজ বেলা বারোটার সময় প্রবীণ ও নবীন দলের মধ্যে এমনই প্রেম সম্ভাষণ শুরু হইল যে, অচিরাৎ ছাত্র এবং অ-অধ্যাপক যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল! কারণ অধ্যাপকদের ইত্যাকার ব্যবহার বাহিরের লোককে দেখিতে দেওয়া অযৌক্তিক। দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও প্রায়-হাতাহাতির উপক্রম যে কেন হইল, তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন দর্শক কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। সেখান হইতে চম্পট দিয়া নিচে ভোজনশালায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে আমার অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান কয়েকজন অধ্যাপক সেখানে ইত্যবসরেই দক্ষিণ হস্তের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আমি নিতান্ত বশংবদভাবে তাঁহাদের পথ অনুসরণ করলাম।

বিকালে সাধারণ অধিবেশন। এতগুলি অধ্যাপককে একসঙ্গে পাইয়া বক্তাদের সকলেরই ইচ্ছা তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত ভালো ভালো কথা একসঙ্গে আমাদের শুনাইয়া তবে ছাড়িবেন। মানুষের ধৈর্য্য ত দূরের কথা, মাঝে মাঝে মাইক্রোফোন পর্য্যন্ত ভোঁ ভোঁ করিয়া ডাক্ ছাড়িতে লাগিল। দুষ্ট লোকে বলে, অসংখ্য ভালো বক্তৃতা অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে গুরুপাক বাণী ভোজন করিয়া মাইক্রোফোনের পেট ফাঁপিয়াছে। আমরা খানিকক্ষণ বক্তৃতা শোনার পর এক সময় উৎসাহীদের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সভা সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

এই মিটিংএর পরে পুনরায় বিষয় নির্ব্বাচনী সভা এবং মধ্য রাত্রির আহার শেষ করিয়া আবার ঐ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শুনিলাম রাত্রি দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত ঐ জাতীয় তাণ্ডব কখনও ভাঁটিতে এবং কখনও বা উজানে বহিয়াছিল। মাঝে মাঝে চড়ায় যে ঠেকে নাই এমন নহে।

পরদিন সকালে অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম প্রভাতে এ্যাবকিউটার প্রকাশ্য অধিবেশন। বিষয় নির্ব্বাচনী সভার তালিম মত এক একজন বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন ও রেজোলিউসনের পর রেজোলিউসন গৃহীত হইতেছে। বেলা সাড়ে এগারটার মধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া এ্যাবকিউটার নূতন নিয়মাবলী গঠন ও পরবর্তী বৎসরের জন্য কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচন বিশেষ কারণে তিনমাসের জন্য স্থগিত রাখিয়া সকলে মিলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও বোধ হয় মিটিং-এর তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল লইয়া চিৎকার ও বিতর্ক নিজেদের মধ্যে সমানে চলিতে লাগিল ও নানারূপ অজ্ঞাত কারণে নানাস্থানে বাগবিতণ্ডা ঘনীভূত হইতে লাগিল। শীর্ণকায় তরুণ অধ্যাপক স্ফীতকলেবর প্রবীণ অধ্যাপকের ভুঁড়ির উপর তুড়ি দিয়া গলার শিরা ফুলাইয়া চিৎকার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন, যে ঐ শীর্ণদেহ ব্যক্তিটি না থাকিলে আজিকার সভা নিতান্তই পণ্ড হইয়া যাইত। একজন খঞ্জ অধ্যাপক সকলের নিকট বিশেষ গর্ব্বের সহিত বলিতেছেন যে তিনি ফুটবল খেলিতে গিয়া ঐরূপ হইয়াছিল, অতএব তিনি ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ বিভিন্ন বিচিত্র চীৎকার থিয়েটার হল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভালয় ভবনের প্রাঙ্গণে, কলতলায়, শৌচাগারে এবং রান্নাঘরেও ছড়াইয়া পড়িল। মদনভস্মের পরে মদনস্থ যেরূপ বিষময়

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, মিটিং শেষ হইবার পরে সেইরূপেই মিটিংএর টুক্‌রা সারাবাড়ীতে ছড়াইয়া পড়িল।

দুপুরে আহাদির পর দুইখানি বাসে করিয়া মুর্শিদাবাদ যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শেয়ারে দুই টাকা করিয়া ভাড়া। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীতীরে মেকী-নবাবের বিলাতী প্রাসাদ বা হাজার দুয়ারী, তাহার সম্মুখের পুরাতন ইমামবাড়ী, ফিরিবার পথে মুতিঝিল, গঙ্গার অপর পারে আলিবর্দ্দী, সিরাজদ্দৌলা ও লুৎফাউন্নিসার কবর, পথে কুঞ্জঘাটায় মহারাজা নন্দকুমারের বসতবাটী—এই সমস্ত দর্শন করিয়া পুনরায় স্কুল বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন। সন্ধ্যায় ছিল বহরমপুর ক্লাবে নববর্ষের চা-পার্টির নিমন্ত্রণ।

এই বহরমপুর ক্লাবটি পূর্ব্বে ছিল সাহেবদের সম্পত্তি। ক্লাবের নিজস্ব বাড়ী আছে। যেমন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের নবাব-বাড়ীর ধারে কাছেও কেহ ঘেঁসিতে সাহস পাইত না, অথচ আজ সেখানে আমাদের ন্যায় দর্শকদের অবাধ গতি, যেন আমরাই তাহার মালিক, সেইরূপ সাহেবদের দ্বারা রক্ষিত বহরমপুর ক্লাবের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের ধারে কাছেও এক বৎসর পূর্ব্বেও কোন বাঙ্গালী ঘেঁসিতে সাহস পাইত না। কিন্তু অধুনা ইহা বাঙ্গালীরই অধিকারে। সুসাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় এখন এখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি এই ক্লাবের সভাপতি। ক্লাবের হলঘরে মহাত্মাজীর ছবিতে মালা দেওয়া হইয়াছে, ঘরের মেঝের টানা ফরাস পাতা। সেই ফরাসের সম্মুখে মহাত্মাজীর ছবির নীচে রায় গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানীয় কয়েকজন মহিলাকে দেখিলাম। সঙ্গীতেরও আয়োজন ছিল। ভাবিলাম, সবই যখন দেশী, তখন আর চা-পার্টি কেন, ঘোল-পার্টি হইলেই ত ভালো হইত। যা ভাবিয়াছি ঠিক তাই, কুচা ফল, সন্দেশ ও ঘোল আসিল। বুঝিলাম, মহাপুরুষদের চিন্তাধারা এইরূপেই মিলিয়া যায়। এতগুলি অভ্যাগতকে চায়ের পরিবর্ত্তে ঘোল খাওয়াইতে আমার বিশেষ বাসনা হইয়াছিল, দেখিলাম অন্নদাশঙ্করবাবুও আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঘোলই খাওয়াইলেন। তফাতের মধ্যে এই যে সাহেব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা মানসিক ঘোল খাওয়াইতেন, দেশী ম্যাজিষ্ট্রেট বাস্তব ঘোল ঢালিলেন। যাহা হউক, উল্লেখযোগ্যের মধ্যে ঐ জলশায় সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টকে দেখিলাম।

রাত্রে স্কুলের থিয়েটার-হলে থিয়েটারের আয়োজন ছিল। ক্রান্তি শিল্পীসংঘ নামক স্থানীয় এক সংঘের দ্বারা 'জাগরণ' নামক নাটক অভিনীত হইল। এই নাটকখানি কংগ্রেসী নাটক অভ্যুদয়ের অনুকরণে অতীন্দ্র মজুমদারের দ্বারা রচিত ও ঐরূপেই মাইক্রোফোনের সাহায্যে ইহার মূক মুখর অভিনয় হইয়া থাকে। তফাতের মধ্যে ইহাতে কাস্তে হাতুড়ীর জয়গান করা হইয়াছে এবং ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা সরাইয়া কাস্তে হাতুড়ীর পতাকাকে উত্তোলন করা হইয়াছে।

সকলের কাছেই শুনিলাম, এই নাটকটিকে কেন্দ্র করিয়া আজ কংগ্রেসী ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে খণ্ডপ্রলয় হইবেই। স্কুলের গেটে বিশেষ কড়াকড়ি। টিকিট দেখিয়া প্রত্যেককে ছাড়া হইতেছে। এও শুনা গেল যে বহরমপুরে আর-সি-পি-আই দল খুব প্রবল। প্রয়োজন হইলে তাহারা সকলকে পিটাইয়া ঠাণ্ডা করিতে পারে। অধ্যাপকদের মধ্যেও দু' একজনের মুখে উত্তেজনার ছাপ দেখিলাম, তাঁহারা পূর্ব্বে কি ছিলেন জানি না, কিন্তু বর্ত্তমানে কিছুকাল হইতে নিজেদের কঙ্গ্রসী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় পুরুষ ও মহিলা শিল্পীদের গান ও নৃত্যকলা চলিল। পরে অভিনয়। বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় সবগুলিই খুব সুন্দর হইয়াছিল। মারামারি আদৌ হয় নাই, কারণ কাস্তে-হাতুড়ীর বিরোধী দল যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম তিনিই বলিলেন যে তিনি অভিনয় দেখেন নাই, ও কেহ কেহ বলিলেন যে তাঁহারা গান ও নাচের পর চলিয়া গিয়াছিলেন, অভিনয় দেখিতে ধৈর্য্য ছিল না। একজনকে যখন জোর করিয়া ধরিলাম যে তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তখন তিনি বলিলেন যে তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু সারা দিনের পরিশ্রমের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, অতএব ঘরে থাকা সত্ত্বেও নাটকাভিনয় তিনি দেখেন নাই। বুঝিলাম, 'দেখার মধ্য দিয়া না-দেখা' শুধু কবিদেরই একচেটিয়া নয়, দেশ-প্রেমিকেরও এ বিদ্যা কিছু কিছু আয়ত্ত আছে। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে আমার ন্যায় অনাসক্ত হতভাগ্যেরা নাটক অভিনয় দেখিয়া আনন্দলাভই করিয়াছে, কারণ বইখানির অভিনয় ভালোই হইয়াছিল।

নাটকাভিনয়ের পর আহারাদি শেষ করিয়া ষ্টেশনে রওনা হইলাম। বিকালের ট্রেণে কেহ কেহ ইতঃপূর্ব্বেই রওনা হইয়াছিলেন; তবে আমরা ছিলাম অফিসী দলের সঙ্গে, কারণ সভাপতি ও সম্পাদকের সহিত আমরা গিয়াছিলাম এবং উঁহাদের সঙ্গেই ফিরিয়াছি।

মধ্যরাত্রে ষ্টেশনে আসিয়া খোলা প্লাটফরমের উপর গভীর অন্ধকারে এতগুলি পরিচিত ও অর্দ্ধপরিচিত অধ্যাপক যখন টিকিট কিনিয়া সুটকেশ ও হোল্ড্ অল্ পাতিয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন ঝির ঝির করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। দুইদিনব্যাপী অনিয়ম ও অনিদ্রার গ্লানি যেন সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গেল, তর্ক ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের লেশমাত্রও মনে রহিল না, শুধু এইটুকুই মনে হইতে লাগিল, যে শিক্ষার পাড়ায় একটি সুন্দর সুখী বৃহৎ একান্নবর্ত্তী অধ্যাপক পরিবার যেন গোত্র পিতার নির্দ্দেশে বাংলা দেশের উচ্চ শিক্ষার কৃষিক্ষেত্রে আপন আপন শক্তি ও সামর্থ্য মত হলকর্ষণ করিতেছেন আর সেই হলাগ্রভাগ হইতে সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম ইত্যাদি মন্ত্রের মধুর অনুরণন নিরন্তর আমাদের অন্তরে অন্তরে অজ্ঞাতসারেই অনুভূত হইতেছে। তখন বুঝিলাম তর্ক দ্বন্দ্বের যাবতীয় প্রবাহ বিদেশ হইতে আমদানী করা secular আবহাওয়ার প্রভাব মাত্র, ঐ অবিদ্যাকে সাময়িকভাবে বিস্মৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের "সহ সমানী সমানং মনঃ" তাহার নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, সকল গ্লানিকে অম্লান প্রেমের প্রবাহে ধুইয়া মুছিয়া নির্ম্মল ও সুন্দর করিয়া তোলে।

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

একলিঙ্গজীর মন্দির ও নাথদ্বার

সুরেশবাবু বলেছিলেন সকালে মোটর গাড়ী কিংবা বাস পাঠাবেন। ফতেমেমোরিয়াল থেকে আমাদের তুলে নিয়ে একলিঙ্গজী মন্দির ও নাথদ্বার দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

রাত জেগে শ্রীমতীরা যাত্রার সব আয়োজন করে রাখলেন। স্থির হ'ল কাল একটু সকাল করে ওঠা হবে। ট্যাক্সি কিংবা বাস আসবার আগেই ভোলানাথ আমাদের বিছানাগুলো বেঁধে দেবে।

শ্রীমতী ইতিপূর্বে রাজপুতানা ঘুরে গিয়েছিলেন। তিনি একলিঙ্গজীর মন্দির ও নাথদ্বারের এমন সব চিত্তাকর্ষক লোভনীয় বর্ণনা শোনাতে লাগলেন যে, আমাদের সেখানে যাবার আগ্রহ শতগুণ বেড়ে উঠলো।

কালো কষ্টি পাথরের চতুর্মুখ বিশিষ্ট একলিঙ্গজী শিব বিগ্রহ, তাঁর শৃঙ্গার বেশ ও আরতির সমারোহ শুনতে শুনতে যাবার জন্ম আমরা বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। নাথদ্বারে শ্রীনাথজীর মন্দিরের ঐশ্বর্য্য, তাঁর চিড়িয়াখানা, তেলের কূপ, ঘীয়ের ইঁদারা, চালের পাহাড়, দালের পর্বত এসব শুনে কি আর মানুষ স্থির থাকতে পারে? নবনীতা ব্যাকুল হয়ে উঠলো! ভোর না হ'তে হ'তেই আমরা উঠে ভোলানাথকে তুলে বিছানাপত্র বাঁধিয়ে ফেললুম। তারপর সবাই কাপড় বদলে এক এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে গেলুম একেবারে ফতেমেমোরিয়ালের ফটকে। কত লোকই অবিরত আসছে যাচ্ছে। ভারতের নানা প্রদেশের মানুষ তারা। আসছে বাসে, মোটরে, টংগায়। সেই সব বাস'ও মোটর দেখতে দেখতে যাত্রীপূর্ণ হয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে। আমি প্রত্যেক বাস ও মোটর খানিকে গিয়ে ধরছি। জিজ্ঞাসা করছি—সুরেশবাবু পাঠিয়েছেন কিনা? তারা কি একলিঙ্গজীর মন্দির হয়ে নাথদ্বার যাবে? উত্তরে 'না' শুনে হতাশ হ'য়ে ফিরে আসছি।

ঘরবার করতে করতে বেলা দশটা বাজলো। বুঝতে পারলুম সুরেশবাবু কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন নি। শ্রীমতী চটে উঠলেন। তাঁর বান্ধবী হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে ব্যাপারটাকে লঘু করতে চেষ্টা করলেন। আমি কতকটা অপ্রতিভ হয়েই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি সব শুনে হেসে বললেন—আমাকে জানালে আপনাদের অকারণ এতটা হয়রাণ হ'তে হ'ত না। এখান থেকে কোয়ার্টার মাইল তফাতে বাস্ ষ্টেশন। বেলা চারটের সেখান থেকে নাথদ্বার যাবার একাধিক বাস ছাড়বে। নাথদ্বার এখান থেকে মাত্র ২৮ মাইল। যাবার পথে তারা একলিঙ্গজীর মন্দির হয়েই আপনাদের নাথদ্বারে পৌঁছে দেবে—ঠিক শ্রীনাথজীর আরতির সময় বরাবর। আপনি এক কাজ করুন, একখানা টংগা নিয়ে চলে যান। প্রথমেই যে বাসখানা ছাড়বে তাতে আপনাদের সীট রিজার্ভ করে আসুন। তাহ'লে যথা সময়ে দু'জায়গাতেই ঘুরে আসতে পারবেন।

ম্যানেজার সাহেবের পরামর্শই শিরোধার্য্য করে নিয়ে প্রথম যে বাস খানি ছাড়বে সেখানিতে আমাদের পাঁচটি সীট্ রিজার্ভ করে এলুম।

একলিঙ্গজীর রাজ্যে জাগ্রত রাজপুত প্রহরী

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম করে চারটে বাজবার আগেই দুখানা টংগা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সীট রিজার্ভ ছিল। গাড়ীতে উঠে বসা গেল। ঘনঘন ঘড়ি দেখছি। চারটে বেজে গেল। বাস আর ছাড়ে না। সেই কলকাতার ব্যাপার। বোঝা গেল বাসওয়ালারা সর্ব্বভারতেই একজাত! অর্থাৎ, গাড়ী ভর্তি না হলে ছাড়বে না। চারটে পনেরো হল। তবু বাস নড়ে না! একটু হাঁক ডাক করা গেল। কিন্তু বৃথা। বলে—এখনি ছাড়বে হুজুর?

এক ভদ্রলোক আমাদের বাসের ধারে এসে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কি কেউ নাথদ্বার যাবেন? আমরা সেখানেই যাচ্ছি বলাতে ভদ্রলোক একখানি চিঠি ও একটি পুলিন্দা জানালা দিয়ে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"দয়া করে এটি মন্দিরের পাশেই যে দিল্লীওয়ালা ধর্মশালা আছে তার ম্যানেজারকে দিলে বিশেষ উপকৃত হব।"

ভদ্রলোক বাঙালী। নিলুম তাঁর চিঠি ও পুলিন্দা। বললেন—ওতে কাপড় আছে, আর কিছু না। সুযোগ নিচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমি ওখানকার স্কুল মাষ্টার। আজ আমার যাবার কথা ছিল, কিন্তু যেতে পারলুম না। আটকে পড়তে হল। জিজ্ঞাসা করলুম—ওখানে থাকবার মতো ভাল হোটেল কিছু আছে কি? মাষ্টার মশাই বললেন—হোটেল কিছু নেই। তিন চারটি ধর্মশালা আছে। যাত্রীরা সেখানেই থাকে, আর মন্দিরের প্রসাদ আনিয়ে খায়। প্রশ্ন করলুম—

মীরাবাঈয়ের মন্দির

সবচেয়ে ভালো ধর্মশালা ওখানে কোনটি? যেখানে আরামে থাকা যেতে পারে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যথেষ্ট আলো বাতাস আছে। তিনি বললেন—ঘোড়েওয়ালা ধর্মশালাই সবচেয়ে ভালো।

ধর্মশালার নামটা নোট বইয়ে টুকে নিলুম। মাষ্টার মশাই আমাদের পান এনে খাওয়ালেন। বেলা সাড়ে চারটের পর বাস ছাড়লো।

শ্রীমতী মুখ টিপে হেসে বললেন 'ঘোড়েওয়ালা' নামটা শুনে মনে হচ্ছে সে ধর্মশালাটি ঘোড়ার আস্তাবলের চেয়ে ভাল হবে না। নিশ্চয় গিয়ে দেখবো সেটি মনুষ্য বাসের অযোগ্য।

বললুম, ঐ তো তোমাদের দোষ। না দেখে শুনে আগে থেকেই একটা খারাপ ধারণা ক'রে বোসো।

নবনীতা বলে উঠলো "বাবু, দেখ দেখ কী সুন্দর!" চেয়ে দেখি—দূরে আরাবল্লী পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত পশ্চিমাকাশ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। অস্তরাগের রঙীণ আলোয় পাহাড়ের চূড়ো, গাছের মাথা, সৌধশীর্ষ, শস্য ক্ষেত্র সব যেন সোনালী হয়ে উঠেছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে আমরা সেই রাজস্থানের রমণীয় গোধূলির আশ্চর্য্য ছবির দিকে চেয়ে রইলুম।

বাস্ চলেছে মন্থর বেগে পার্ব্বত্য পথ বেয়ে। ক্রমে নগর সীমান্ত অতিক্রম করে আমরা এসে পড়লুম লোকালয় শূন্য প্রান্তরের মধ্যে। কিছুদূর পর্য্যন্ত রাস্তাটি সরলভাবে প্রান্তরের বুক চিরে চলেছে, তার পরই শুরু হল পার্ব্বত্য পথ। দু'ধারের শৈলশ্রেণী ভেদ করে অগ্রসর হচ্ছি আমরা। প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় মুগ্ধ আমাদের মন। পাহাড়ের কঠিন পাষাণকে তুচ্ছ করে জেগে উঠেছে বিস্তীর্ণ বনানীর শ্যামশ্রী! তারপর আবার খানিকটা শুষ্ক মরুপ্রান্তর, আবার পার্ব্বত্য পথ। একদিকে অভ্রভেদী শৈলমালা, অপরদিকে নেমে গেছে অগভীর খাদ।

দূরে একলিঙ্গজীর মন্দির সীমানার তোরণদ্বার দেখা যাচ্ছে। মহারাণার বিশ্বস্ত দ্বারপাল প্রবেশ পথে পাহারায় রত। কথিত আছে এই সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথেই রাণা রাজসিংহ নাকি ঔরঙ্গজেবকে জব্দ করে ছিলেন। এখানকার অবস্থান সত্যই ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। দুটি পাহাড়ের সংযোগ ঘটেছে এই পথে। আমাদের বাস দ্বারপালের কাছে দেবতার মর্য্যাদা দিয়ে প্রবেশ করলো মন্দির সীমানার মধ্যে। ক্রমে একলিঙ্গজীর আশ্রিতদের বসতির অভ্যন্তরস্থ সঙ্কীর্ণ গলিপথ অতিক্রম করে আমরা মন্দির দ্বারে এসে নামলাম। উদয়পুর থেকে একলিঙ্গজীর মন্দির মাত্র ১২ মাইল পথ। মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রত্যহ তাঁর প্রিয় অশ্ব চৈতকের পৃষ্ঠে এই ১২ মাইল পথ নিত্য অতিক্রম করে আসতেন একলিঙ্গজীর অর্চ্চনা করতে। পূজান্তে আবার ফিরে যেতেন রাজধানীতে।

মন্দিরকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র একটি জনপদ গড়ে উঠেছে দেখা গেল। দুচারখানি দোকান পসারও হয়েছে। বাতাসা, এলাচদানা, ভুট্টার খই, ছাতুর জিলিপী, তিলুয়া, রেউড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়।

খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে বীর বাপ্পারাও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান আক্রমণে সে মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। দীর্ঘকাল পরে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর আবার এই বর্ত্তমান একলিঙ্গজীর মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল। একলিঙ্গ শিব বিগ্রহের পঞ্চমুখ ছিল। কিন্তু মোসলেম আক্রমণকারীরা 'বিগ্রহ মূর্তির অভ্যন্তরে হয়ত মণিরত্ন লুকানো আছে ভেবে বিগ্রহটি চূর্ণ করবার চেষ্টা করে। এই আক্রমণের ফলে একলিঙ্গের একটি মুখ উড়ে গেছে। তিনি চতুর্মুখ হয়ে আছেন। নিকষ কালো কষ্টিপাথরে গড়া এই শিবলিঙ্গ। ভাস্কর্য্য শিল্পের দিক থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বের গঠিত এই মূর্তি প্রশংসনীয়ই বলা চলে। মন্দিরটির অসংখ্য চূড়া। গর্ভ মন্দিরটি প্রশস্ত, নাটমন্দিরও ক্ষুদ্র নয়। পাশেই মীরাবাঈয়ের বিষ্ণু মন্দির। মেয়েরা এখানে দেবতাকে অঞ্জলি দেবার উদ্দেশ্যে যাত্রীদের জন্য অজস্র গোলাপ ফুল নিয়ে বিক্রয় করছে। যৎসামান্য মূল্যে এই ফুল কিনতে পাওয়া যায়।

একলিঙ্গজীর মন্দিরের সন্নিকটেই একটি পুরাতন জৈনমন্দির

আছে। মন্দির মধ্যে তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের এক বিরাট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

উদয়পুরের বর্ত্তমান মহারাণাও মধ্যে মধ্যে একলিঙ্গজীর পূজা করতে আসেন, কাজেই মন্দিরে আসবার পীচ্‌মণ্ডিত পথটি সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।

সন্ধ্যার দীপাবলীতে, মন্দির ঝলমল করছে। পুষ্প চন্দন তিলকে একলিঙ্গজীর সজ্জা হচ্ছে। রাজপুত পুরোহিতেরা সযত্নে দেবতার প্রসাধনে নিবিষ্ট, আরতি আসন্ন। দামামা জয়ঢাক যেন অধীর আগ্রহে গুড় গুড় করে বেজে উঠছে। ঘণ্টার ঘন ঘন অনুরণন ভক্তদের টেনে নিয়ে আসছে মন্দিরের মধ্যে।

বাসের সময় উত্তীর্ণ প্রায়। আর অপেক্ষা করা চলে না। আমরা দ্রুত চলে এলুম। একলিঙ্গজীর মন্দির থেকে বেরুবার মুখে আমাদের দেখা হ'ল সেই যোধপুর মহারাজার এডিকংটির সঙ্গে; শ্রীনাথজী দর্শনে চলেছি শুনে তিনি আমাদের খুব উৎসাহ দিলেন এবং অভয় দিলেন যে আমাদের সেখানে কোনও অসুবিধা হবে না।

একলিঙ্গজীর মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা যখন বাসে উঠলুম, সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে এসেছে। আমাদের বাসখানি হেড লাইট জ্বেলে সেই পর্ব্বত্য অন্ধকার তার তীব্র আলোক বাণে ভেদ করে চললো ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-তীর্থ নাথদ্বারের অভিমুখে।

ভাবছিলুম একদা, শৈব ও শাক্ত রাজপুতের অজেয় শক্তিকে, মল্ল নল্ল সর্দ্দার সিংহের দুর্দ্ধর্ষ বাহুবলকে নিস্তেজ ও নিব্বীর্য্য করে দিয়েছিল এই জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অহিংসা ও প্রেম। অন্ধকারে আশপাশের দৃশ্য আর দেখা যাচ্ছিল না। একলিঙ্গজীর মন্দির ছাড়বার সময় আমাদের বাসে একটি আধাবয়সী বাঙালী ভদ্রলোক উঠেছিলেন। এতক্ষণ বাসের সমস্ত যাত্রীর মধ্যে আমরাই ক'জন ছিলুম সুদূর বাংলা দেশের নরনারী। আর একজন দলে বাড়লো দেখে উৎসাহিত হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলুম। তিনিও একজন স্কুলমাষ্টার। নাথদ্বারেই থাকেন। দীর্ঘকাল সেখানে তিনি শিক্ষকতা করছেন। তাঁর কাছে শুনলুম রাজপুতানার ভিতর নানাস্থানে এই শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী একাধিক বাঙালী আছেন। এঁদের কাছে রাজপুত ছেলেমেয়েরা ইংরাজী ভাষা শেখে। বেতন যে খুব বেশী পান তা নয়, তবে সম্মান ও মর্য্যাদা পান এত বেশী যে অল্প আয়ের জন্ত তাঁরা একটুও দুঃখিত নন। তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনাই হ'ল। মানুষটি বড় ভালো। আমাদের কবিবন্ধু কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ভায় এঁকেও মনে হল একজন মহাপ্রাণ বৈষ্ণব। এঁকে দেখে পর্য্যন্ত বার বার আমাদের কবিবন্ধুর কথাই মনে পড়ছিল। কেবলই বোধ হচ্ছিল, কোথায় যেন এঁদের দুজনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঐক্য, একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রয়েছে। তেমনি বিনয়াবনত, তেমনি নিরহঙ্কার, তেমনি সর্বজীবে প্রেম ও করুণায় এঁরা বহু ধনীর চেয়েও ঐশ্বর্য্যশালী। এঁর কাছেও খবর নিয়ে জানলুম 'ঘোড়েওয়ালা ধর্ম্মশালা' মন্দ নয়। তবে 'দেলওয়ারা' ধর্ম্মশালার দোতলায় জায়গা পেলে আপনারা আরামে থাকতে পারবেন।

বাস চলেছে। তিনি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। শ্রীনাথজীর আরতির আগে তাঁকে নাথদ্বারে পৌঁছতেই হবে। ড্রাইভারকে তাড়া দিলেন। সে বললে—একলিঙ্গজীর মন্দিরে এঁরা বড্ড দেরী করে ফেলেছেন। নইলে নাথদ্বারে এতক্ষণ তো আমরা পৌঁছে যেতুম। ভরসা দিলে যে আরতির আগে সে নিশ্চয় পৌঁছে দেবে।

দিলেও সে পৌঁছে। কুলির মাথায় আমাদের মালপত্র চাপিয়ে আমরা ঘোড়েওয়ালা ধর্মশালায় গিয়ে হাজির হলুম। মাষ্টার মশাই
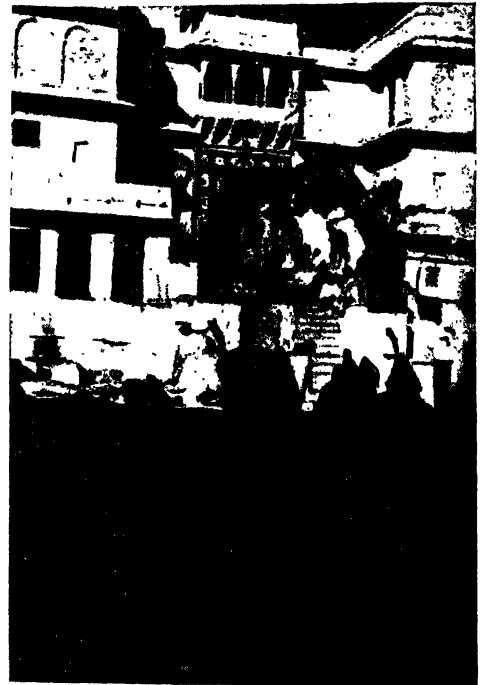
শ্রীনাথজীর মন্দির প্রাঙ্গণ

আমাদের সঙ্গে এলেন। ধর্মশালার ম্যানেজারকে আমাদের জন্ত একখানি ভাল ঘর দিতে বললেন। মাষ্টারবাবু এখানে সকলেরই পরিচিত। ম্যানেজার দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললে—ভাল ঘর একখানিও খালি নেই। যাত্রীর ভীড় বড্ড বেশী। যেখানি আছে সেখানি যদি চলে দেখুন।

দুই হ্যারিক্যান লণ্ঠন নিয়ে ম্যানেজারের দুজন অনুচর এলো আমাদের সঙ্গে ঘর দেখাতে। ঘর দেখে চক্ষু স্থির। ঘোড়ার আস্তাবল এর চেয়ে ভালো। করুণকণ্ঠে বললুম—মাষ্টার মশাই, এ ঘরে মানুষ কেমন করে থাকে? একটি দরজা—আর পিছনে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ। এতগুলি লোক আমরা এর মধ্যে যে হাঁপিয়ে মারা যাবো। মাষ্টার মশাই বললেন—ঠিক কথা, চলুন আপনাদের দেলওয়ারায় নিয়ে যাই।

এখানে যাত্রীরা গুতোগুঁতি করে থাকে। আপনারা পারবেন না। দেলওয়ারায় গিয়ে দেলখোশ হয়ে গেল। চমৎকার দোতলা বাড়ী। ঘরে ঘরে ডেলাইটের আলো জ্বলছে। দেলওয়ারার তত্ত্বাবধায়ক বললেন "বড়ই দুঃখিত মাষ্টার বাবু! একখানিও ঘর খালি নেই।" মাষ্টার মশাই বললেন, এঁরা কলকতা থেকে আসছেন। রইস্ লোক। এঁদের তুমি দোতলার রিজার্ভ কামরা খুলে দাও। তত্ত্বাবধায়ক হাত জোড় করে বললে—এখনি খুলে দেব হুজুর, কিন্তু সেক্রেটারী সাহেবের অর্ডার আনতে হবে যে।

মাষ্টার মশাই বললেন—সে আমি আনিয়ে দিচ্ছি। তুমি ঘর খুলিয়ে ঝাঁট পাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখো। মুখ হাত ধোবার জল, খাবার জল সব পাঠিয়ে দাও।

আমাদের নিয়ে মাষ্টার মশাই চললেন সেক্রেটারীর কাছে। যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা ও অভাব অভিযোগের তত্ত্বাবধান করবার জন্য এখানে একটি সমিতি আছে। সেই সমিতির সেক্রেটারীর অফিসে গিয়ে হাজির হলুম। মাষ্টার মশাই সেক্রেটারীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেক্রেটারী অতি ভদ্র ও শিক্ষিত যুবক। আমাদের খুব খাতির ক'রে বসালেন। বাংলাদেশের অনেক খবর জিজ্ঞাসা করলেন। মাষ্টার মশাই আরতি দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু আমাদের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি যেতে পারছিলেন না। সেক্রেটারী সে কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে বললেন—আপনি চলে যান মাষ্টারবাবু, আমি নিজে এঁদের সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

মাষ্টার মশাই ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। মাষ্টার মশাইকে আমরাও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানালুম! তিনি কাল আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে গেলেন!

সেক্রেটারী আমাদের সঙ্গে নিয়ে নিজে এসে উপরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। কুলিরা মাষ্টার মশাইয়ের আদেশ মতো চকের একটি দোকানে আমাদের মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তারাও এসে পড়লো। সেক্রেটারী বলে গেলেন—আপনারা মুখহাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নিন। আপনাদের জন্য আমি গিয়ে প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দেলওয়ারা ধর্ম্মশালার দোতলার এই ঘরখানি প্রকাণ্ড এক হলঘর। চারখানি নেয়ারের খাটিয়া, সেণ্টার টেবিল ও চারখানি চেয়ার দিয়ে সাজানো। সঙ্গে এ্যাটাচড্ বাথরুম ও স্নানের ঘর। সে ঘর দুখানিও খুব বড়। শুনলুম রাজা মহারাজারা কেউ নাথদ্বারে এলে নাকি এইখানেই আশ্রয় নেন। তা ঘরের বহর দেখে কথাটা মিথ্যা মনে হল না। দু'ধারে প্রায় আটটি বড় বড় জানালা দরজা। রাস্তার দিকে একটি হাওয়াই ঘর—অর্থাৎ কাঁচের শার্সি ঘেরা গাড়ী বারান্দা। এই ঘরে এসে প্রাণটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। বড় বড় ঘড়া ভর্ত্তি ক'রে হাতমুখ ধোবার ও স্নানের জল দিয়ে গেল। তামার সুদৃশ্য এক কলসে পানীয় জল এলো। বাবাজী স্নান করে নিলেন। আমরা মুখহাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হলুম। একখানা খাট বাবাজীকে দিয়ে বাকী তিনখানি খাট পাশাপাশি জুড়ে নিয়ে আমরা চার জনের ঢালা শয্যা বিছিয়ে ফেললুম।

ঘরের দুপাশে দুটি ডেলাইটের আলোয় সমস্ত ঘরখানা যেন দিনের আলোর মতো উজ্জল হয়ে উঠেছিল। আমাদের এই সৌভাগ্যের জন্ম মাষ্টার মশাইয়ের উদ্দেশে আর একবার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে সবাই চেয়ারে বসে সবে গুলতানি শুরু করেছি যে—আরতি দেখা ও ধুলোপায়ে শ্রীনাথজী দর্শন আজ আর ভাগ্যে হল না, এমন সময় তিন চার জন লোক প্রসাদ এনে হাজির। পায়দ পয়মায় মেঠাই পুরি তরকারি চাটনি ডাল, হালুয়া মোণ্ডা, রালুশাই, বড়ি—সে একেবারে রাজভোগ বললেই হয় এবং পরিমাণে এত বেশী যে আমাদের পক্ষে সব খেয়ে ওঠা অসম্ভব। প্রসাদবাহীদের পুরস্কার সহ বিদায় দিয়ে আমরা বসে গেলুম তার সদ্ব্যবহার করতে। ক্ষুধাও পেয়েছিল বেশ। প্রত্যেক জিনিসটি এমন সুস্বাদু ও সুপক্ক যে প্রতি গ্রাস অমৃতবৎ লাগছিল।

আহারান্তে কিছুক্ষণ গল্প করে সবাই শুয়ে পড়লুম। স্থির হ'ল যে কাল সকালে উঠেই মন্দিরে যাবো এবং সমস্ত নাথদ্বার প্রদক্ষিণ করে আসবো। সকালে উঠে খুব তাড়া হুড়ো ক'রেও বেরুতে বেশ বেলা হ'য়ে গেল। ৮টায় মন্দিরের দরজা খুলবে। আমরা প্রায় সেই সময় গিয়ে হাজির হলুম। তখন যাত্রীর ভীড়ে মন্দির ভরে গেছে। আমি নবনীতাকে নিয়ে মন্দিরের প্রবেশ পথে সঙ্গীদের জুতো ওভারকোট মাফ্‌লার ইত্যাদি পাহারা দিতে বসলুম। শ্রীমতীরা বাবাজীর সঙ্গে দেব-দর্শনে গেলেন।

বসে আছি তো বসেই আছি। ফেরবার নাম নেই কারুর। অনেকক্ষণ পরে পত্নী গলদঘর্ম হয়ে ফিরে এলেন। বললেন—অসম্ভব! আমি পারবো না। মন্দিরে ঢোকে কার সাধ্য! ভীষণ ভীড়! জিজ্ঞাসা করলুম তোমার বান্ধবী ও বাবাজীর খবর কি। বললো ভীড়ে তারা কোথায় ছটকে গেছে কিছুই জানি নি।

অগত্যা তাদের ফেরার প্রতীক্ষায় বসে রইলেম। কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের চারপাশে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল—আসছেন! আসছেন! একটা চাপা কণ্ঠস্বরের গুঞ্জন সবার মুখে! কে আসছেন? অধিকারীজী। মন্দিরের যিনি প্রধান মোহন্ত! নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই তাঁর আগমন পথের দিকে সোৎসুক নয়নে চেয়ে আছে।

অবশেষে তিনি এলেন। যে যেখানে ছিল সবাই জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়ে উঠলো। সামনে বরকন্দাজ, পিছনে বরকন্দাজ চোপদার, সিপাই, আশা-শোঁটা, পাখা-পঞা, পতাকা ধারী ও পার্শ্বচর নিয়ে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সে এক রীতিমত মিছিল!

সবাই জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে। প্রবেশ পথের মুখে আমরাই তিনটি প্রাণী শুধু নির্বিকারভাবে বসেছিলুম। আশেপাশের দোকানদার দর্শক এবং যাত্রীরাও অনেকে আমাদের হাত জোড় ক'রে দাঁড়াতে ইসারা ইঙ্গিতে অনুরোধ করেছিল। আমরা তাদের সে কথায় কর্ণপাত করিনি। কঠিন হয়ে বসেছিলুম। অধিকারী মহারাজার দৃষ্টি পড়লো এই বিদ্রোহীদের প্রতি। সহসা তিনি যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেলেন আমাদের সামনে।

মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত। হাতে একটি সোনার লাঠি। ধব ধব করছে সুন্দর রঙ্। আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন। কয়েকটি দাঁত সোনা বাঁধানো। আমরা তখনও বসে আছি। আমাদের সামনে এগিয়ে এসে দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমরাও প্রতিনমস্কার করলুম। জিজ্ঞাসা করলেন, আমরাই কি কালরাত্রে উদয়পুর থেকে এসেছি? বললুম—হাঁা। মনে একটা ভয় হচ্ছিল—কি জানি কি কয়ে? আমরা জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়ে উঠিনি, অসম্মান বোধ করেছে নিশ্চয়ই।

জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় এসে উঠেছি? বললুম। জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে কিনা? উত্তর দিলুম—না, বেশ আরামেই আছি। তারপর প্রশ্ন—দর্শন হয়েছে কিনা? জানালুম, ভীষণ ভীড়ের জন্ম সে আশা পরিত্যাগ করেছি। শ্রীনাথজী আমাদের মতো পাপিষ্ঠদের দর্শন দেবেন না।

শুনে হাসলেন। সেই স্নিগ্ধ মধুর হাসি।

লোকটির সর্ব্বাঙ্গে বিলাস ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন পরিস্ফুট, কিন্তু আশ্চর্য্য, সব কিছুকে ছাপিয়ে একটা সাত্ত্বিকতার জ্যোতি তার চোখে মুখে ছিল।

চলে গেলেন তিনি মন্দিরের মধ্যে। আমরা বসেই রইলুম। আশ পাশের লোকেরা রীতিমতো চঞ্চল হয়ে উঠে বলাবলি করতে লাগলো, আমরা যতই হোম্‌রা চোমরা লোক হইনা কেন, কাজটা নাকি আমরা ভাল করিনি।

মিনিট পাঁচ সাত পরেই মন্দিরের ভিতর থেকে দুই বরকন্দাজ পাইক সঙ্গে নিয়ে একজন কর্ম্মচারী হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাদের বললে—চলিয়ে, হুজুর নে সেলাম ভেজা!"

শুনে বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠলো। আশে পাশের লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে দেখি—কেমন যেন একটা নিষ্করুণ ভাব! যেন বলতে চাইছে—'এইবার! হয়েছে তো? যাও এখন ঠ্যালা সামলাও!'

"দুর্গা" বলে উঠে পড়লুম। স্ত্রী ও কন্যার হাত ধরে কম্পিত পদে অগ্রসর হলুম—দু'পাশে দুই হাতীয়ারধারী বরকন্দাজ সেপাইয়ের সঙ্গে। কর্ম্মচারীটি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ভাবছি আজ অদৃষ্টে কী লাঞ্ছনা কী শাস্তি আছে কে জানে?...মন্দিরের মধ্যে গিয়ে দেখি সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক গর্ভ মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—দেব দর্শন করুন। আপনারা আমাদের অতিথি!

দেখি মন্দির ফাঁক। সমস্ত দর্শনার্থীর ভীড় বলপূর্ব্বক বাইরে বার ক'রে দেওয়া হয়েছে। তারা সেখানে হৈ হৈ করছে দাঁড়িয়ে। মন্দিরের প্রহরীরা প্রবেশ পথ বন্ধ করে তাদের আটকে রেখেছে।

বিস্মিত ও অভিভূত অন্তরে প্রবেশ করলুম গর্ভ মন্দিরে মধ্যে। সুসজ্জিত ও সম্ভপূজিত শ্রীনাথজীও যেন আমাদের দিকে চেয়ে হাসছিলেন! কেউ নেই সেখানে। মুখোমুখী দাঁড়িয়ে শ্রীনাথজী ও আমরা। আর জোড়হস্তে প্রধান পুরোহিত। একটু দূরে গর্ভ মন্দিরের বাইরে দর্শন ব্যাকুল হাজার হাজার যাত্রী উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করছে তখন "জয় শ্রীনাথজী।" (ক্রমশঃ)

সংস্কৃতি ও সংস্কার

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পিএচ্-ডি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথমা পরীক্ষার পাঠ্য তালিকা

(পাঠ কাল ৫ বৎসর)

১। বাংলা ভাষায় জাতীয়তা উদ্বোধক পদ্যাবলী (চারণ সঙ্গীতের পদ্যানুবাদ ও হিন্দী দোঁহাবলীর বাংলা ভাষায় অনুবাদ), বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনা।

২। সংস্কৃত ব্যাকরণ (১ম বৎসর উপক্রমণিকা)।

৩। সংস্কৃত ব্যাকরণ (যাহারা সংস্কৃতে বিশেষজ্ঞ হইবে তাহারা মূল ব্যাকরণ পড়িবে, কিন্তু অন্যে ব্যাকরণ কৌমুদী পড়িবে)।

৪। সংস্কৃত সাহিত্য (হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থ ও পদ্য রামায়ণের নির্দিষ্ট অংশ), অভিধান, ছন্দঃ (সাধারণ জ্ঞান), অলঙ্কার প্রচলিত অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার সাধারণ পরিচয় ও রস সাধারণ জ্ঞান)।

৫। নীতি—সাধারণ মানবধর্ম্মগুলি—সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি, পুরাণ, উপনিষৎ ও অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান সংগ্রহ।

৬। ইতিহাস—ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—বিশেষ করিয়া রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা।

৭। গণিত ও জ্যামিতি (সাধারণ প্রয়োজনমত)

৮। ভূগোল—পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—দেশীয় মতে গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিচয়—প্রাচীন ভারতের দেশ বিভাগ ও তাহাদের বর্ত্তমান নাম, প্রাচীন শহরসমূহের পরিচয়, তীর্থ সমূহের পরিচয়—প্রাকৃতিক বিবরণ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসাও বাণিজ্যের বিশেষ বিবরণ।

৯। তর্ক শাস্ত্র—অনুমান, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান, বাক্য স্বরূপ ও অর্থ, কার্য্য কারণ ভাব ইত্যাদি (বাংলা ভাষায়)

১০। স্বাস্থ্যতত্ত্ব—দেহের অবয়বের পরিচয় (প্রাচীনমতে), দেশীয় পথ্যাপথ্যের বিচার। ঔষধি লতা ও গুল্মের পরিচয় ও দোষগুণ বিচার—

১১। বিজ্ঞানের কথা ও বিদেশের গল্প

১২। বৃত্তি শিক্ষা (পরে লিখিতের মধ্যে যে কোন একটা)

১৩। মনঃ সংযম শিক্ষা

১৪। আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা ও ব্যায়াম

১৫। অনধ্যায়ের দিনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সাধারণ জনহিতকর কার্য্য শিক্ষা। (ক) কৃষির উপযোগী ভূমির সাধন—ফলফুলের চাষ ও শাক সব্জি উৎপাদন (খ) সুতা কাটা ও বয়ন শিক্ষা (গ) চিত্র বিদ্যা ও মূর্ত্তিগঠন শিক্ষা এবং নৃত্য-গীত বিদ্যা ও অভিনয় শিক্ষা (ঘ) ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা শিক্ষা (ঙ) কবিরাজি ঔষধ নির্ম্মাণ শিক্ষা (চ) পাক-প্রণালী ও শুষ্ক খাদ্যোৎপাদন শিক্ষা (ছ) দুগ্ধজাত স্থায়ী খাদ্যোৎপাদন শিক্ষা (জ) মৌমাছির চাষ ও মোম শিল্প (ঝ) মুদ্রণ যন্ত্রের নানা কার্য্য শিক্ষা (ঞ) উদ্ভিদ চিকিৎসা শিক্ষা (ট) ব্যবসা-বাণিজ্য। ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি।

(ক) সন্তান পালন ও রোগীর সেবা (খ) রন্ধন ও গৃহকর্ম্ম (গ) সূচি-কর্ম্ম (ঘ) ধাত্রী বিদ্যা (ঙ) কুটীর শিল্প (অল্পশ্রম সাধ্য) (চ) প্রসাধন দ্রব্যোৎপাদন শিক্ষা (ছ) প্রয়োজনীয় দেশীয় ঔষধ নির্ম্মাণ শিক্ষা।

প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র মধ্যম পরীক্ষা পড়িবার অনুমতি পাইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র রাষ্ট্র ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষায় (বিশেষ) উত্তীর্ণ হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ের কোন একটী বিষয় পড়িতে পারিবে।

(১) কবিরাজি (২) পশু-চিকিৎসা (৩) পৌরোহিত্য (৪) প্রাচীন স্থাপত্যবিদ্যা (৫) প্রাচীন যন্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ শিক্ষা ও তাহাদের সংস্কার (৬) রাস্তা, ঘাট, কাঁচা ড্রেণ নির্ম্মাণ শিক্ষা—তাহাদের সংস্কার, বাঁধ নির্ম্মাণ ও সংস্কার, চালাঘর নির্ম্মাণ, বাঁশের ও দড়ির পুল, জমির মাপ, নক্‌সা প্রভৃতি শিক্ষা ও (৭) মোক্তারি—

মধ্যমা পরীক্ষা—সাধারণ পত্র

(১) বাংলা ভাষায় নিজ বিষয়ের অনুরূপ বিষয়ে গ্রন্থ ও বাংলা সাহিত্য
(২) প্রাচীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও বর্ত্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা
(৩) ভাষা পরিচ্ছেদ অথবা তর্কসংগ্রহ (তর্কশাস্ত্র)
(৪) ধর্ম্মের ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্ত্তন
(৫) সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ শিক্ষা ও অভিধান
(৬) মনঃ সংযম শিক্ষা (একাগ্রতা সাধন—ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষা ইত্যাদি
(৭) বৃত্তির অভ্যাস
(৮) ব্যায়াম প্রভৃতি পূর্ব্বের মত

বিশেষ বিষয়—(ক)

ব্যাকরণ—(১) সংজ্ঞা পরিভাষা শব্দ ধাতু ভ্বাদি (সটীক)

১ম বর্ষ (২) ভট্টিকাব্য নির্দ্দিষ্ট অংশ (৩) নির্দ্দিষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রয়োগ নির্ব্বাচন

২য় বর্ষ :—ধাতু অবশিষ্টাংশ (সটীক) ভট্টিকাব্য (নির্দ্দিষ্ট অংশ) ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রয়োগ নির্ব্বাচন

৩য় বর্ষ :—স্ত্রী প্রত্যয়, কারক ও সমাস ভট্টিকাব্য (নির্দ্দিষ্ট অংশ)

৪র্থ বর্ষ :—তদ্ধিত ও কৃৎ ভট্টিকাব্য নির্দ্দিষ্টাংশ

বাংলা ব্যাকরণের উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব প্রয়োগের তালিকা (ব্যবহারিক পরীক্ষা) সাহিত্য—(খ)

১ম। প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত কাব্য—প্রাচীন গদ্য—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস (নির্দ্দিষ্টাংশ)

২য়। মহাভারত নির্দ্দিষ্টাংশ ও গদ্য

গ্রীক সাহিত্যের অনুবাদ

৩য়। কালিদাসের মহাকাব্য (নির্দ্দিষ্টাংশ) ও ভাসের নাটক

বাংলা কাব্য (নির্দ্দিষ্টাংশ গ্রন্থ)

৪র্থ। ছন্দঃ ও অলঙ্কার (নির্দ্দিষ্ট অংশ), প্রাকৃত ব্যাকরণ (সাধারণ জ্ঞান), প্রাচীন বাংলা কাব্যে সংস্কৃত ছন্দঃ ও অলঙ্কার

তর্ক শাস্ত্র—(গ)

(১) প্রাচীন ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট অংশ (প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান)

(২) বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের চিহ্নিত অংশ।

(৩) তত্ত্ব কৌমুদী, মানমেয়োদয় প্রভাকরবিজয় বেদান্ত পরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট অংশ।

(৪) ব্যাপ্তির স্বরূপ, প্রাচীন সিদ্ধান্ত ও তাহার খণ্ডন ব্যাপ্তিপঞ্চক ; সিংহ ব্যাঘ্রী ও সিদ্ধান্ত লক্ষণ

ধর্ম্ম শাস্ত্র—(ঘ)

(১) প্রাচীন রাষ্ট্রে রাজার কর্ত্তব্য, দেশ শাসন, সমাজ রক্ষা ও দণ্ড ব্যবস্থা, রাজা ও প্রজার পরস্পর সম্বন্ধ—বর্ত্তমান গণতন্ত্র।

(২) সমাজ, জাতিভেদ ও আশ্রম ব্যবস্থা—বর্ত্তমান সমাজ, জাতিভেদ সমস্যা ও আশ্রম ব্যবস্থা, প্রাচীন স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট অংশ

(৩) বিবাহ বিধি (প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমাজ), অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ—

অন্য দেশের বিবাহ প্রথা

(ক) পুত্র—প্রকার ভেদ (প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমাজ), প্রধান সংস্কারসমূহ (প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্র)।

(ইংরাজি আইন গ্রন্থের অনুবাদের পর) ইংরাজ আমলে উক্ত বিষয়ে যে সব আইন হইয়াছে তাহাতে কোন কোন স্থলে শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইয়াছে (ব্যবহারিক পরীক্ষা)

বৈদিক সাহিত্য—(ঙ)

(১) বৈদিক ব্যাকরণ ও স্বর প্রক্রিয়া

(২) নিরুক্ত (নির্দ্দিষ্ট অংশ) ও ছন্দঃ

(৩) যে কোন সংহিতার নির্দ্দিষ্ট অংশ (ভাষ্য সহিত)

(৪) অনুরূপ ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট অংশ

জ্যোতিষ—(চ)

(১) বীজগণিত, জ্যামিতি, পাটীগণিত ও লীলাবতী—

(২) বীজগণিত, জ্যামিতি „ ও „

(৩) ত্রিকোণ মিতি, উচ্চ জ্যামিতি

(৪) উচ্চ পাশ্চাত্য গণিত, গ্রহ ও নক্ষত্রের পরিচয়,

উপাধি পরীক্ষা ৬ বৎসর—সাধারণ পত্র

(১) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (২) বিশেষ বিষয়ের বিস্তৃত ইতিহাস (৩) প্রবন্ধ (৪) রাষ্ট্র ভাষা (৫) বৃত্তি শিক্ষা (৬) একাগ্রতা ও মনঃ সংযম শিক্ষা (৭) সঙ্গঠন শিক্ষা (৮) বিপ্লবের ইতিহাস

ব্যাকরণ

১ম। মুক্তাবলী সম্পূর্ণ—ব্যাকরণের টীকান্তর অথবা পরিশিষ্ট সন্ধি পর্য্যন্ত

২য়। শব্দ, কারক ও সমাস (টীকান্তর) অথবা কারক চক্র ও পরিভাষা গ্রন্থ

৩য়। বাক্য পদীয় ও মহা ভাষ্য (নির্দ্দিষ্ট অংশ) অথবা শব্দকৌস্তুভ

৪র্থ। ব্যাকরণ ভূষণ সার ও পরমলঘু মঞ্জুষা

৫ম। শব্দশক্তি প্রকাশিকা ও ব্যুৎপত্তিবাদ (নির্দ্দিষ্টাংশ)

৬ষ্ঠ। ভট্টচিন্তামণি ও শক্তিবাদ (নির্দ্দিষ্টাংশ)

প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস পড়িয়া বিশেষ পরীক্ষা দিলে অধোলিখিত বিষয়ে উপাধি পড়িবার অনুমতি পাইবে।

কৃষ্টি

১। বৈদিক সাহিত্যে রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজ

২। উপনিষৎ ও আরণ্যক (ঋষি সমাজ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান)

৩। রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন স্মৃতি (সমাজ, রাজনীতি ও ধর্ম্ম)

৪। অর্থ শাস্ত্র ও সংস্কৃত নাটকে (রাজাদের ও সমাজের অবস্থা)

৫। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম, রাজা অশোক ও জাতকে সমাজের চিত্র

৬। তন্ত্র ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, শিল্প ও বিজ্ঞান, আচারের ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন

প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি জানিয়া সামান্য জ্যোতিষ ও দেবালয়ের সাধারণ কার্য্য সমূহ শিখিয়া এই বিষয়ে উপাধি দিতে পারিবে।

পৌরোহিত্য

১। বৈদিক সংস্কারে ব্যবহৃত মন্ত্রসমূহের অভ্যাস ও অর্থজ্ঞান ও সংস্কারের অনুষ্ঠানের ব্যবহারিক জ্ঞান

২। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি

৩। ধর্ম্মের স্বরূপ, আচার, ব্যবহার ও নীতি-শিক্ষা

৪। ভারতের বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় ও তাহাদের অমূল্য উপদেশ সংগ্রহ

৫। জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনের ও পুরাণের মূল কথা

৬। ভাগবত ও ভক্তি রসাত্মক গ্রন্থের সার সংগ্রহ

সাহিত্য

১ম। মুক্তাবলী (প্রথম হইতে শব্দ খণ্ড পর্য্যন্ত) কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্য-দর্পণ, ধ্বন্যালোক, রসগঙ্গাধর নির্দ্দিষ্টাংশ

২য়। গদ্য সুবন্ধু ও বাণ (নির্দ্দিষ্টাংশ), বর্ত্তমান প্রবন্ধাবলী (নির্দ্দিষ্ট), রস বিচার—(ভরত নাট্য শাস্ত্র, কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণের নির্দ্দিষ্টাংশ)

৩য়। মহা কাব্য (ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবির) নির্দ্দিষ্টাংশ ও অলঙ্কার (নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের নির্দ্দিষ্টাংশ)

৪র্থ। খণ্ড কাব্য (অমরু, কালিদাস প্রভৃতি কবির) নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ, স্তোত্র কাব্য ও চম্পূ কাব্য (নির্দ্দিষ্টাংশ)

৫ম। প্রাচীন নাটক, মধ্যযুগের নাটক ও পরবর্ত্তীযুগের নাটক নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ দশরূপক ও সাহিত্য দর্পণ (নির্দ্দিষ্টাংশ)

৬ষ্ঠ। পালি ও প্রাকৃত ভাষার সাধারণ জ্ঞান এবং প্রাকৃত ও পালি গ্রন্থ (নির্দ্দিষ্ট) অথবা—সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্য নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা (নির্দ্দিষ্ট)

তর্কশাস্ত্র

১ম বর্ষ :—ব্যধিকরণ, বিশেষ ব্যাপ্তি, কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী ও পক্ষতা নির্দ্দিষ্ট বিরোধি গ্রন্থের সহিত পরিচয়

২য় বর্ষ :—হেত্বাভাস, অনুমিতি (নির্দ্দিষ্টাংশ) ও অবয়ব (নির্দ্দিষ্টাংশ) পূর্ব্বপক্ষি গ্রন্থের পরিচয়

৩য় বর্ষ :—পরামর্শ, তর্ক, ব্যাপ্তি গ্রহোপায় ও সামান্য লক্ষণা বিরুদ্ধ গ্রন্থের সহিত পরিচয়

৪র্থ বর্ষ :—প্রমা ও অপ্রমা স্বরূপ প্রামাণ্যবাদ (নির্দ্দিষ্টাংশ) বিরোধি গ্রন্থের সহিত পরিচয়

৫ম বর্ষ :—নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ অনুব্যবসায়বাদ ও অন্যথা খ্যাতি বিরুদ্ধ গ্রন্থের সহিত পরিচয়

৬ষ্ঠ বর্ষ :—উপমিতি, শব্দ প্রামাণ্য, শক্তিবাদ, অর্থাপত্তি ও অভাব, নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট অংশ নির্দ্দিষ্ট বিরোধি গ্রন্থের সহিত পরিচয়

প্রথমা পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্র পালি ও প্রাকৃতের বিশেষ পরীক্ষা দিয়া উপাধি পড়িতে পারিবে।

১। সূত্র পিঠক নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ

২। বিনয় পিঠক „

৩। অভিধর্ম্ম পিঠক „

৪। প্রাকৃত সাহিত্য নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ

৫। প্রাকৃত জৈন দর্শন „

৬। গাথা সাহিত্য „

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন

১ম। মুক্তাবলী (সম্পূর্ণ), পক্ষতা ও হেত্বাভাস (মাথুরী টীকা)
২য়। সাংখ্য কারিকা (ভাষ্য, তত্ত্বকৌমুদী ও যুক্তিদীপিকা), সাংখ্য সূত্র (বৃত্তিসহ) ও সাংখ্যসার
৩য়। পাতঞ্জল সূত্র (ভোজ বৃত্তি, ব্যাস্ ভাষ্য বাচস্পতি টীকাসহ ও যোগ বার্ত্তিক)

যোগ সংহিতা

৪র্থ। সাংখ্য সূত্র প্রবচন ভাষ্য, মহাভারত ও ভাগবত (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৫ম। বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য প্রথম হইতে ২য় অধ্যায়ের ২য় পাদ পর্য্যন্ত ও উপনিষৎ (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৬ষ্ঠ। প্রামাণ্যবাদ (নির্দ্দিষ্টগ্রন্থ), খ্যাতিবাদ (নির্দ্দিষ্টগ্রন্থ) বাচস্পতি ও ভিক্ষু মতভেদ বিচার ও অন্য দর্শনে সাংখ্যমত খণ্ডন

প্রাচীন ন্যায় ও বৈশেষিক

১ম। মুক্তাবলী সম্পূর্ণ, পক্ষতা ও হেত্বাভাস (মাথুরী টীকা)
২য়। ন্যায় সূত্র নির্দ্দিষ্টাংশ (ভাষ্য, বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্য টীকাসহ)
৩য়। বৈশেষিক সূত্র উপস্কার সহ নির্দ্দিষ্টাংশ, প্রশস্তপাদ ভাষ্য (ন্যায় কন্দলী ও কিরণাবলীসহ) (দ্রব্য প্রকরণ পর্য্যন্ত)
৪র্থ। কুসুমাঞ্জলি (গদ্য) ও আত্মতত্ত্ববিবেক (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৫ম। ন্যায় মঞ্জুরী (নির্দ্দিষ্টাংশ) ও ন্যায় লীলাবতী (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৬ষ্ঠ। কিরণাবলী (অবশিষ্টাংশ) ও ন্যায় লীলাবতী (অবশিষ্টাংশ)

অদ্বৈত দর্শন

১। মুক্তাবলী, পক্ষতা ও হেত্বাভাস (মাথুরী)
২। বেদান্ত পরিভাষা, উপনিষৎ সংগ্রহ, বেদান্তসার ও পঞ্চদশী (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৩। শাঙ্কর ভাষ্য সম্পূর্ণ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক (নির্দ্দিষ্টাংশ) ভাষ্য সহিত
৪। শাঙ্কর ভাষ্য ভামতীসহ (১ম হইতে আনন্দময়াধিকরণ পর্য্যন্ত— ২য় অধ্যায় ১ম ও ২য় পাদ)
৫। খণ্ডন খণ্ড খাদ্য ও চিৎসুখী (নির্দ্দিষ্টাংশ), খ্যাতিবাদ (ন্যায় মকরন্দ)
৬। ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈত সিদ্ধি (নির্দ্দিষ্টাংশ)

বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত বেদান্ত

১ম। মুক্তাবলী, পক্ষতা ও হেত্বাভাস (মাথুরী)
২য়। মাধ্ব ন্যায় (নির্দ্দিষ্টাংশ) ও ন্যায় সিদ্ধাঞ্জন (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৩য়। উপনিষৎ সংগ্রহ (রামানুজ অথবা মাধ্ব ভাষ্যসহ), সিদ্ধিত্রয় ও মাধ্ব সিদ্ধান্ত সংগ্রহ
৪র্থ। বেদান্ত সূত্র (ভাষ্যসহ)…[রামানুজ, মাধ্ব, বল্লভ ইত্যাদি কোন একটা ভাষ্যসহ] ও ভাষ্য টীকা (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৫ম। তত্ত্ব মুক্তা কলাপ ও শতদূষণী (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৬ষ্ঠ। ন্যায়ামৃত, অদ্বৈতসিদ্ধি ও তরঙ্গিণী (নির্দ্দিষ্টাংশ)

মীমাংসা দর্শন

১ম। ন্যায় প্রকাশ, ন্যায় মালা (নির্দ্দিষ্টাংশ), ভৌতাতিতমততিলক ও (বৈদিক যাগের সাধারণ জ্ঞান ও বৈদিক মন্ত্রের পরিচয়)
২য়। শাস্ত্র দীপিকা ও শবর ভাষ্য (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৩য়। শ্লোক বার্ত্তিক (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৪র্থ। তন্ত্র বার্ত্তিক (নির্দ্দিষ্টাংশ) ও শাস্ত্র দীপিকা (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৫ম। বিধি বিবেক—ভাট্ট দীপিকা (নির্দ্দিষ্টাংশ)
৬ষ্ঠ। ভাট্ট চিন্তামণি ও প্রকরণ পঞ্চিকা (নির্দ্দিষ্টাংশ)

সাধারণ দর্শন

১ম। মুক্তাবলী ও সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (নির্দ্দিষ্টাংশ)
২য়। ন্যায় সূত্র (ভাষ্য ও বার্ত্তিক) নির্দ্দিষ্টাংশ, প্রশস্ত পাদ ভাষ্য ও ন্যায় কন্দলী (দ্রব্য প্রকরণ)
৩য়। সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী, পাতঞ্জল সূত্র (সটীক ব্যাস ভাষ্য) ও সাংখ্যসার
৪র্থ। বেদান্তসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য (১ম হইতে—২য় অধ্যায় ২য় পাদ পর্য্যন্ত) ও শ্রীভাষ্য (১—৪ সূত্র)
৫ম। অর্থ সংগ্রহ, শাস্ত্র দীপিকা ১ম পাদ ও প্রকরণ পঞ্চিকা (নির্দ্দিষ্ট ভাগ)
৬ষ্ঠ। কুসুমাঞ্জলি (হরিদাসী টীকাসহ) ও গীতা (মধুসূদন টীকাসহ)

বৈদিক সাহিত্য

১ম। নিরুক্ত (নির্দ্দিষ্টাংশ) ও প্রাতিশাখ্য
২য়। কোন একটী সংহিতার নির্দ্দিষ্টাংশ ও অনুরূপ ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্টাংশ
৩য়। শ্রৌতসূত্র ও যাগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান
৪র্থ। আরণ্যক (অনুরূপ), উপনিষৎ ও বৃহদ্দেবতা
৫ম। বেদের দর্শন ও মীমাংসা দর্শনের (নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ)
৬ষ্ঠ। পুরাণের উপর বেদের প্রভাব

বৌদ্ধ ও জৈন

১। শূন্যবাদ (নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ)
২। বিজ্ঞানবাদ „
৩। বৌদ্ধ ন্যায় „ ও বৌদ্ধ মত খণ্ডন (নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ)
৪। জৈন দর্শন (পদার্থ বিচার) „
৫। জৈন ন্যায় (বিস্তৃত আলোচনা) „
৬। „ „ ও জৈন মত খণ্ডন

ধর্ম্ম শাস্ত্র

১ম। তিথিতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব এবং একাদশীতত্ত্ব
২য়। মুক্তাবলী ও ন্যায় প্রকাশ, ও নিত্যকৃত্য
৩য়। প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ও শ্রাদ্ধবিবেক (সটীক নির্দ্দিষ্টাংশ) ও মলমাসতত্ত্ব
৪র্থ। দায় ভাগ ও মিতাক্ষরা নির্দ্দিষ্টাংশ
৫ম। প্রাচীন স্মৃতি নির্দ্দিষ্টাংশ (ভারতীয় ও বিদেশীয়)
৬ষ্ঠ। নিবন্ধ গ্রন্থ (নির্দ্দিষ্টাংশ), আইনের মূল সূত্র

জ্যোতিষ

১ম। পাশ্চাত্য উচ্চ গণিত

২য়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও চন্দ্রশেখর কৃত সিদ্ধান্ত দর্পণ

৩য়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ গ্রন্থ (নির্দ্দিষ্ট—যথা এলেন লিও, র‍্যাফেল প্রভৃতির গ্রন্থ)

৪র্থ। এস্ রাডাউ, ডলেনি প্রভৃতির করণ-গ্রন্থ ও গ্রহ লাঘব

৫ম। দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষা, মানমন্দিরের কার্য্যশিক্ষা, করণ প্রণয়ন প্রভৃতি

৬ষ্ঠ। ফলিত জ্যোতিষ (নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ) যথা বৃহৎ পারাশরীয়, জৈমিনি-সূত্র, বৃহজ্জাতক, জাতক পারিজাত (ফলিতাংশ) ও নারীজাতক

প্রচার বিভাগ

আন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র বা শিক্ষিত ভদ্রলোক এই বিষয়ে পড়িতে পারিবেন ; প্রবেশের পূর্ব্বে সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোলে পরীক্ষা দিতে হইবে।

১। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (রাষ্ট্র, ধর্ম্মসমাজ, দর্শন ও সাহিত্য এবং শিল্প ও বিজ্ঞান)

২। অধীন ভারতের ইতিহাস (কৃষ্টির রূপ)

৩। চীন ও মধ্য এশিয়ার ইতিহাস (ভারতের সহিত সম্বন্ধ)

৪। প্রাচীন সভ্যতা ও ভারতের সভ্যতা

৫। সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্ম্ম

৬। ইউরোপের বিপ্লব ও ধর্ম্ম, ধর্ম্মের প্রকৃতরূপ ও রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ

ডিটেকটিভের গল্প

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রবিবারের সকাল···

প্রোফেশর সত্যশরণের ঘরে জমাট আসর···রবিবার-সকালের বাঁধা রুটিন। সে আসরে সদ্য-ফোটা আধুনিক কবি তরুণকান্তি থেকে পেন্‌সনী-ডেপুটি রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত···পদমর্য্যাদা ভুলে সাম্য-মৈত্রীর ঢালা-বিছানা পেতে এক হয়ে মিশে বসেন।

পাশের বাড়ীর পুলিশ অফিসার শান্তি সেন বললেন—কালকের কাগজে ঐ ট্রেণে-খুনের খবর পড়েছেন কেউ? উকিল চিত্তবিহারী বললে—ইয়েস্ ঐ মাচাণ্ট-প্রিন্স তালুকদারের কথা বলচেন তো? ঐ আসাম-মেলে?

—হ্যাঁ।

তরুণকান্তি বললে—কমুনাল ব্যাপার! ভদ্রলোক ছিলেন একা ফার্ষ্টক্লাশ কামরায়। রাণাঘাটে ট্রেণ থামলে একটা কুলি কি করে' তাঁকে দেখে—বেঞ্চের নীচে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছেন। দেখে সে-ই দেয় রেল-পুলিশকে খবর!

কমুনিষ্টদলের বীরেন রায় ভ্রূকুঞ্চিত করে' বললে—কমুনাল বলে রায় দিলে যে···হেতু?

তরুণকান্তি বললে—না হলে দেখুন না, তাঁর কাগজপত্র এতটুকু তছনছ নয়—হাতের ঘড়ি, আংটি, পকেটের পার্শ···কোয়ায়েট ইন্‌ট্যাক্ট! খুনের মোটিভ শুনি?

ললাটে ভ্রূকুটি-রেখা···বীরেন বললে—মোটিভ খুঁজে পেলেনা, অতএব কমুনাল! চমৎকার! তোমরাই আরো এমনি মনের বিষে কমুনাল বিষটাকে জমিয়ে রাখো!

এমনি বাদানুবাদের মধ্যে শান্তিময় সেনকে উদ্দেশ করে' প্রোফেশর সত্যশরণ প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন—ব্যাপারখানা খুলে বলো তো শান্তি!

শান্তি সেন বললে—খবরের কাগজটা আপনি একবার পড়ে দেখুন···তারপর···

—বেশ!

সত্যশরণ কাগজ পড়লেন; পড়ে বললেন—এতে শুধু খবর দেখছি আসাম-মেল রাণাঘাটে পৌঁছুলে একটা কুলি দেখে, কামরার কোণের সীটের নীচে ভদ্রলোক মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছেন। তারপর পুলিশ এলো, এসে দেখে—ভদ্রলোকের ডান-রগে চোট্···অথচ কামরার মধ্যে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি!···এর পরে?

এ প্রশ্নটা তিনি সকলকে লক্ষ্য করেই বর্ষণ করলেন।

শান্তি সেন বললে—আমার অভিজ্ঞতা থেকে নানা

রকম অনুমানই করতে পারি···কিন্তু সে অনুমান মিথ্যা হবে, কারণ প্রমাণের নামগন্ধ এখনো কিছু পাওয়া যায়নি!

প্রোফেশর বললেন—হুঁ! শুধু অনুমান! কিন্তু ফ্যাক্ট ছাড়া কল্পনার উপর অনুমান খাড়া করা চলে না! বাজে অনুমানে পৃথিবীতে নিত্য কত অবিচারই না চলেছে। ···আচ্ছা, আমি কতকগুলো কথা বলি···খবর যা পাচ্ছি তা থেকে বুঝছি যে-খুনী সে ঐ ট্রেণ রাণাঘাটে থামবার আগেই সরে পড়েছে···তার অস্ত্রসমেত। কুলি যখন দেখে, তখন কামরার দরজা বন্ধ ছিল কি খোলা ছিল, সে খবর আমরা পাচ্ছি না। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, ভদ্রলোক কামরার জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে কিছু দেখছিলেন সেই সময় লাইনের ধারে কোনো শক্ত জিনিষের সঙ্গে রগে লাগলো ধাক্কা! মাথার ডানদিকে চোট্···উনি বসেছিলেন এঞ্জিনের দিকে মুখ করে'!···এ পর্য্যন্ত···হুঁ···কিছু না হে, এ থেকে কোনো অনুমান করতে আমি রাজী নই! তুমি কি বলো শান্তি?

মৃদু হেসে শান্তি সেন বললে—আমি ও নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি।···পুলিশ-তদারকীতে কিছু খবর বেরুক তখন আমি চিন্তা করবো।

একটু চিন্তিতভাবে সত্যশরণ বললেন—তা ঠিক। তবে ব্যাপারটা বেশ মিষ্টিরিয়স্ মনে হচ্ছে।

তরুণকান্তি চাইলো গোবর্দ্ধন ঘোষের দিকে। গোবর্দ্ধন ঘোষ এ-যুগের পশারওয়ালা ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখক ···সে-সব উপন্যাস লিখে অজস্র পয়সা রোজগার করছে! উপন্যাসের মালমশলা কতক সংগ্রহ করে শান্তি সেনের কাছ থেকে—তারপর তাতে রঙ চড়ায়,···আইন-কানুন জানে না, ইগনরান্স ইজ ব্লিশ···অবাধে কলমের ডগায় থ্রিল্ করিয়ে চলে! বলে—মানুষ পড়তে পড়তে ভোঁ হয়ে যাবে··· আইন-কানুনের তোয়াক্কা রাখবে না!

গোবর্দ্ধনের দিকে তাকিয়ে তরুণকান্তি বললে—তুমি কি বলো হে গোবর্দ্ধন? তুমি তো ক্রিমিনলজিতে এক্সপার্ট! শ্লেষের জ্বালা দু'চোখে ভরে' গোবর্দ্ধন নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো শুধু তরুণকান্তির দিকে···কোনো জবাব দিলে না!

পরের বুধবার সন্ধ্যাবেলা। প্রোফেশরের ঘরে রেগুলার আসর।

পেন্সনী ডেপুটি রায় বাহাদুর উপনিষদ পড়ছেন··· চাকরি-জীবনে পুলিশকে তুষ্ট রাখতে বিচারের নামে অবিচারের বহু পাপ সঞ্চয় করেছেন, উপনিষদের শ্লোকে সে পাপের কতক যদি স্খালন হয়—পরলোক যদি থাকে, সেখানে এ পাপের জন্য নিগ্রহ ভোগ যদি উপনিষদের ছোঁয়ায় লঘু হয়···

একটি শ্লোকের ছত্র নিয়ে তিনি আলোচনা জমিয়ে তুলেছিলেন, এমন সময় শান্তি সেন এসে দেখা দিলেন—এসেই বললেন প্রোফেশরকে লক্ষ্য করে'—সেই ট্রেণ-মার্ডার!···মার্চ্চাণ্ট-প্রিন্স তালুকদার···মনে আছে?

স্তম্ভিত নিশ্বাসে সকলে তাকালো শান্তি সেনের পানে··· উপনিষদের জটিল অরণ্য ছেড়ে থ্রিলের রোমাঞ্চ রেখা!

শান্তি সেন বললে—আমার উপর তদারকের ভার পড়েছে!

সত্যশরণ শান্তকণ্ঠে বললেন—বটে!

শান্তি সেন বললেন—রেল-পুলিশ যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছে বলি···আগ্রহের ভারে ঘর হলো স্তব্ধ···সকলের চোখে কৌতূহল উজ্জ্বল শিখায় ঝক্‌ঝক্ করে' উঠলো।

শান্তি সেন বললেন—তালুকদারের ঐশ্বর্য্য অগাধ হলেও সংসার প্রায় শূন্য! স্ত্রী নেই,···একটিমাত্র ছেলে···ছেলেকে তিনি কারবারে ঢুকিয়েছেন—তবে ছেলে চলে নিজের গোঁ-ভরে···বাপের ওপর খুব ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, তা নয়, তবে বিরোধও নেই! বহু বিষয়ে বাপের সঙ্গে ছেলের মতবিরোধ··· এ-বিরোধ ব্যবসার ক্ষেত্রে নয়···সামাজিক আচার-ব্যবহারে। ছেলের নাম বিনয়···বয়স ত্রিশ-বত্রিশ—এখনো বিবাহ হয়নি!···ছেলের জবানবন্দী নিয়েছে রেল-পুলিশ। ছেলে বলেছে, ঐ আসাম-মেলেই সে সেদিন বারাকপুরে যায়—সেদিনটা বারাকপুরে থেকে পরের দিনে বেরিয়ে নৈহাটী ব্যাণ্ডেল হয়ে বর্দ্ধমানে যাবার কথা···তারপর বর্দ্ধমান থেকে হাজারিবাগ!···শীকারের উদ্দেশে। বারাকপুর ষ্টেশনে এসে খবরের কাগজ পড়ে বাপের এই অপমৃত্যুর খবর পায়, —তার ফলে বর্দ্ধমানে যাওয়া বন্ধ···ছেলে তখনি বাপের সন্ধানে কলকাতায় আসে···বাপের লাশ তখন কলকাতায় এসেছে পোষ্ট-মর্টেমের জন্য! ছেলে বিনয় আরো বলেছে, বাপ তালুকদার আসাম-মেলে শিলঙ যাচ্ছিলেন—পনেরো

দিনের জন্য···জাষ্ট ফর এ চেঞ্জ!···এ ছাড়া আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি!

সত্যশরণ বললেন—তোমার ফার্ষ্ট মুভ এখন?

শান্তি সেন বললেন—তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সকলকে প্রশ্ন করা···কে শত্রু ছিল? অফিসে কাকেও তাড়া দিয়ে ডিস্‌মিস্ করেছেন, কিম্বা···তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে থ্রিলার লেখক গোবর্দ্ধন বললে—তালুকদার-মশাই উইডোয়ার যখন—নিশ্চয় তখন প্রণয়-ঘটিত কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

গোবর্দ্ধনের পানে তাকিয়ে তরুণকান্তি বললে—তুমি এর মধ্যে তোমার "তালুকদার খুন" উপন্যাস লিখতে সুরু করে' দেছ—এঁ্যা?

এ কথায় চকিতে সঙ্কুচিত হয়ে গোবর্দ্ধন বললে—ঐ তো···সব তাতেই ঠাট্টা! এভরি-ডে লাইফ নিয়ে আমি কস্মিনকালে নভেল লিখিনা।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণকান্তির টিপ্পনী- ঠিক কথা! লাইফের পরিচয় নেবার জন্য যে চোখ আর যে মনের দরকার, তোমার মতো লেখক ও দুটি বস্তু থেকে যে চিরবঞ্চিত!

—তার মানে? গোবর্দ্ধন রুখে উঠলো যেন!

তরুণকান্তি সহজ কণ্ঠে বললে—ফুলস্ রাশ ইন্ হোয়্যার এঞ্জেল্‌স্ ফীয়ার টু ট্রেড!

সত্যশরণ বাধা দিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আঃ, কি ছেলেমান্ষী করো তোমরা!

আর দুদিন পরে···

শান্তিময় এসে আবার রিপোর্ট দাখিল করলেন—তালুকদারের পুত্র বিনয় যখন আসাম-মেলে গিয়ে ওঠে, তখন আসাম-মেল সদ্য প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়তে সুরু করেছে···বিনয় তালুকদার গার্ডের কামরার ঠিক আগে যে থার্ডক্লাশ কামরা, তার ফুটবোর্ডে উঠে দরজা ঠেলে কামরার মধ্যে ঢোকে—তার হাতে ছিল ছোট এ্যাটাচি আর একটা বন্দুকের বাক্স! সে যে ব্যারাকপুরে নেমেছিল, তার কোনে প্রমাণ মেলেনি। বিনয়কে প্রশ্ন করায় সে বলে, ব্যারাকপুরে নেমেছিল, নেমে কোথায় গিয়েছিল এবং সে রাতটা ওখানে কার বাড়ীতে ছিল, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। সে সম্বন্ধে বিনয় কোনো কথা বলবে না—অসম্ভব জেদ,···বলে, না বলার জন্য তাকে যদি পুলিশ খুনের চার্জ্জে সন্দেহবশে গ্রেফতার করে, সে তাতে সাবমিট্ করবে।···আর একটি খবর জানা গেছে, তালুকদারের এক বন্ধু মহেন্দ্র মিত্র তালুকদারের হাতে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে যান···মৃত্যুর সময় এ টাকাটা তালুকদার তার ব্যবসায় খাটাবে বলে। মহেন্দ্র মিত্রের বিধবা স্ত্রী আছেন এবং একটি মেয়ে আছেন···মেয়েটির বিবাহ হয়নি। বিনয় চায় সেই মেয়েকে বিবাহ করতে—বাপ তালুকদার এ-বিবাহ কিছুতে হতে দেবেন না বলে' ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন। ছেলেকে শাসিয়েছিলেন এ বিবাহ করলে বিনয়কে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন—একটি পাই-পয়সা দেবেন না! এবং মহেন্দ্র মিত্রের যে টাকা তাঁর ব্যবসায় খাটছে, সে টাকা তখনি ফেলে দেবেন! এই ব্যাপার নিয়ে বাপে-ছেলেতে বিরোধ—এমন বিরোধ যে দুজনে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ! যেদিন ঐ আসাম যাত্রা, সেদিন বেরুবার আগে মহেন্দ্র মিত্রের মেয়ের ব্যাপার নিয়ে দুজনে ভয়ানক একটা শীন্ হয়েছিল বাড়ীতে। বাড়ীতে যে সরকার আছেন—দীননাথ···বহুকালের পুরোণো কর্ম্মচারী—সেই দীননাথকে বহু জেরা করে' জানা গেছে, কর্ত্তা বিনয়কে বলেছিলেন, মণিমালার সঙ্গে বিনয়ের নিত্য দেখাশুনা চলেছে, এ খবর তিনি পেয়েছেন—এবং মণিমালার বিবাহের জন্য কর্ত্তা একটি পাত্রও ঠিক করেছেন—শিলঙ থেকে ফিরে সেই পাত্রের সঙ্গে তিনি দেবেন মণিমালার বিবাহ! এ কথায় বিনয় যেন ক্ষেপে ওঠে এবং দুজনে ভয়ানক বাকবিতণ্ডা চলে!···

গোবর্দ্ধন প্রশ্ন করলে—মণিমালা বুঝি ঐ মহেন্দ্র মিত্রের মেয়ে?

শান্তিময় বললেন—হ্যাঁ।

তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে গোবর্দ্ধন বললে—হুঁ! তাহলে তো মিষ্ট্রী ইজ ক্লীয়ার···এ্যাজ ক্লীয়ার এ্যাজ ডে লাইট!···প্রণয়ে বিঘ্ন—শিলংয়ের পথে বিনয় তাই বিঘ্ন-বিমোচন করেছে! ঐ যে বন্দুক নিয়ে বেরুলো···এর ঐ একটিমাত্র অর্থ!

পেন্সনী-ডেপুটি রায় বাহাদুর বললেন—বিনয় তালুকদারকে এখনো এ্যারেষ্ট করোনি শান্তি?

শান্তি সেন বললেন—না!

পেন্সনী রায় বাহাদুর যেন আকাশ থেকে পড়েছেন,

এমনি বিস্ময়-বিহ্বল তাঁর ভাব! বললেন—অন্যায়! সেক্সন্ ফিফটী ফোর তোমার সহায় রয়েছে···আর ঘটনা-চক্রও যখন এমন···

সত্যশরণ বললেন—এ থেকে সন্দেহ জাগবার হেতু?

পেন্সনী রায় বাহাদুর বললেন—ছেলের লাভ-এ্যাফেয়ার, বাপের বাধা,···ঘটনার খানিক আগে ঝগড়া··· তারপর এক ট্রেণে যাত্রা···ছেলের হাতে বন্দুক···এবং···

সত্যশরণ বললেন—মানছি, কিন্তু সে বন্দুক থেকে কখন কোথায় গুলি ছুটলো বাপকে লক্ষ্য করে'···তার তো কোনো সন্ধান মিলছে না!

পেন্সনী রায় বাহাদুর বললেন—সে সন্ধান মিলবে ছেলেকে গ্রেফতার করে' হাজতে আটকে রাখলে···মার্ডার চার্চ্চ···নন বেইলেবল্ অফেন্স! ছেলে প্রমাণ দিক, সে মারেনি···তার বন্দুকের গুলিতে বাপের মৃত্যু হয়নি।

রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রীক্ট এ্যাণ্ড সেশন্ জজ মাখন দত্ত দুটি চক্ষু বিস্তারিত করে' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বাট্ দী ওনাস্ ইজ উইথ ইউ···বিনয় আসামী···সে কোনো কথা বলতে বাধ্য নয়···দ্যাট্‌স ল!

পেন্সনী ডেপুটি উষ্মাভরে বললেন—রেখে দিন আপনার ল! সিভিল কোর্টে ল'য়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে' চলেন—ক্রিমিনালে তা চলে না। ক্রিমিনালে শুধু ধরো আর মারো!···পুলিশ যাকে ধরে চালান দিচ্ছে তাকেই আমি চিরদিন সাবড়ে এসেছি···এমন সাবাড় যে আপীলেও সে সাবড়ানির ঘাবড়ানি চলেনি! অত আইন দেখতে গেলে কি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন্ চালাতে পারতো ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট।

তরুণকান্তি বললে—যা বলেছেন রায় বাহাদুর, আপনাদের এমনি বিচার-মহিমার জন্যই সেকালে একটা কথা ছিল বটে ডেপুটিদের সম্বন্ধে যে—নো কনভিকশন, নো প্রোমোশন। কিন্তু কালের চাকা আজ ঘুরে গেছে, রায় বাহাদুর!

সত্যশরণ বললেন—বাজে কথা যাক—তুমি খোলা-মন নিয়ে এ্যাণ্ড উইথ নো প্রেজুডিস্ তদন্ত করো শান্তি! একজন নিরীহ মানুষের জীবন গেছে দুর্বৃত্ততার ফলে সত্য, কিন্তু তা বলে' এর জন্য আর একজন নিরীহের নির্য্যাতন আর হত্যা—এর সমর্থন চলে না!

শান্তি সেন বললেন—নিশ্চয়! পুলিশে চাকরি করছি বলে' কশাই হতে হবে, এর মানে বুঝি না!

তরুণকান্তি চাইলো গোবর্দ্ধনের পানে—গোবর্দ্ধন স্তব্ধ—তার মাথার মধ্যে যেন কল্পনার তরঙ্গ বয়ে চলেছে! তরুণ-কান্তি বললে—তুমি বলে দাও গোবরচন্দ্র···এ-সবের হদিশ তো তোমার নখদর্পণে···চ্যাপটারের পর শুধু চ্যাপটার খুলে যাওয়া!

গোবর্দ্ধন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তরুণকান্তির পানে··· সত্যশরণ দিলেন ধমক—আবার তরুণ!

তরুণকান্তি বললে—কি জানি, আমার ঐ ডিটেকটিভ-নভেলগুলোর উপর কেমন দারুণ আক্রোশ···মানুষের কথা এরা লিখবে, অথচ সে লেখায় না থাকবে এতটুকু সেন্স! যা-তা পাগলের মতো।

সত্যশরণ বললেন—আঃ! তাঁর দুচোখে ভ্রূকুটি। তারপর সত্যশরণ প্রশ্ন করলেন শান্তি সেনকে—হাজারি-বাগে শীকার করার কথাটার সম্বন্ধে?

শান্তি সেন বললেন—বিনয় বলেছেন, বর্দ্ধমানে থাকেন ওঁর বন্ধু শান্তনু···বর্দ্ধমান থেকে শান্তনুকে নিয়ে হাজারি-বাগে শীকার করতে যাবেন—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।—শান্তনুকে সে-সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছো?

—করেছি। শান্তনু বললেন—শীকার করতে হাজারি-বাগে যাওয়ার কোনো কথাই হয়নি বিনয় তালুকদারের সঙ্গে।

পেন্সনী ডেপুটি বলে' উঠলেন—এ লাই···লেম এক্স্‌কিউজ!

শান্তি সেন বললেন—বিনয় তালুকদার বলেন, আগে থাকতে শীকারে যাবার এনগেজমেণ্ট না করলেও বর্দ্ধমানে গিয়ে শান্তনুকে পাওয়া কঠিন ছিল না! কারণ শান্তনুরও শীকারের সখ আছে এবং তাঁর সঙ্গে বিনয় তালুকদার দু-চারবার শীকারে গেছেন—একবার বাদায় পাখী মারতে এবং একবার যশোরের দিকে বরা মারতে।

ডিষ্ট্রীক্ট-সেশন-জজ প্রশ্ন করলেন—তার করোবরেশন্ মিলেছে শান্তনুর কাছে?

শান্তি সেন বললেন—হুঁ···

সত্যশরণ বললেন—তাহলে তো ও-ব্যাপার চুকে গেল!

শীকারের জন্যই বিনয় বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলেন—ইট্‌ এক্সপ্রেন্‌স্‌!

পেন্সনী রায় বাহাদুর বললেন—কিন্তু ঐ ব্যারাকপুর?

সত্যশরণ বললেন—তুমি যে মণিমালার কথা জেনেছো, সেই মণিমালা কোথায় থাকেন?

শান্তিময় সেন বললেন—তিনি আর তাঁর মা থাকেন ভুবনেশ্বরে। তালুকদারের সরকার দীননাথ মণি-অর্ডারের রসিদ দেখালেন এই মাসের টাকা তিনি রিসিভ করেছেন ভুবনেশ্বরে···দেড়শো টাকা—এ টাকাটা তালুকদার মাসে মাসে পাঠান, মহেন্দ্র মিত্রের যে-টাকা কারবারে খাটছে, তারি লাভের অংশ!

সত্যশরণ বললেন—তাহলে ঐ ব্যারাকপুরই হলো মিষ্ট্রী!

শান্তিময় বললেন—হুঁ!

বিনয় তালুকদারের ধনুর্ভঙ্গ পণ···ব্যারাকপুর সম্বন্ধে কোনো কথা বলবেন না—তার জন্যে যা ঘটে, ঘটুক।

বড়কর্ত্তার আদেশে শান্তিময় করলেন বিনয় তালুকদারকে গ্রেফতার। কাগজে কাগজে সে খবর বিরাট-সমারোহে প্রচারিত হলো···আদালতে জামিন মিললো না···খুনের চার্জ···প্রত্যক্ষ প্রমাণ না মিললেও ঘটনাচক্রে বিনয়কে কেন্দ্র করেই সন্দেহ ঘনায়িত···কাজেই···

শুনে সত্যশরণ বললেন—অন্যায় হলো শান্তি···

শান্তিময় সেন বললেন—কি করি, বলুন? আই হ্যাভটু ওবে···

নিশ্বাস ফেলে সত্যশরণ বললেন—এতে রহস্য-ভেদ হবে না···একজন নিরীহকে অনর্থক নিগ্রহ করা! কেস যদি কোর্টে যায়, কনভিকশন্‌ হবে?

—অসম্ভব!

কানুনের চাকা যাঁরা চালান—চালানোটুকু নিয়েই তাঁদের কারবার—ঠিক পথে কি ভুল পথে চাকা চলেছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন আছে, ভাবেন না! তার ফলে···কিন্তু এ হলো দর্শনের কথা—আমরা দার্শনিক আলোচনা করছি না, আমরা বলছি কাহিনী।

দশ বারো দিন শান্তি সেনের দেখা নেই···প্রোফেসরের ঘরে আসর বসে নিয়মিত,—সে-আসরে পেন্সনী-ডেপুটি থেকে থ্রিলার লেখক গোবর্দ্ধন—সকলে আসেন—গল্প হয়, আলোচনা হয়—তার সঙ্গে কত চায়ের পেয়ালা হয় খালি, কত সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে যায়···দেখা নেই শুধু শান্তিময় সেনের!

সেদিন আসর ভাঙ্গবার ঘণ্টাখানেক পরে শান্তিময় সেন এসে উপস্থিত···ভারী ক্লান্ত ভদ্রলোক!

সত্যশরণ বললেন—কি খবর শান্তি?

শান্তিময় সেন বললেন—বাইরে গিয়েছিলুম···অনেক তথ্য আছে—বলি:

তথ্য যা বললেন, তার মর্ম্ম: ভুবনেশ্বরে মণিমালার মায়ের সন্ধানে গিয়েছিলেন—সেখানে কারো দেখা পাননি, না মণিমালার, না তাঁর বিধবা মায়ের। সেখান থেকে খবর সংগ্রহ করে' শান্তিময় গেছলেন নবদ্বীপ—নবদ্বীপ থেকে ব্যারাকপুর। ষ্টেশনের পূব-দিকে মাঠবাট ভেঙ্গে তিন ক্রোশ দূরে বিজন গ্রাম—সেই গ্রামে থাকেন যদু ভট্টাচায্যি—মণিমালার মায়ের দীক্ষাগুরু···তাঁর ওখানে মণিমালা আর তাঁর মা বাস করছিলেন ভুবনেশ্বর ছেড়ে। এখানে বাসের হেতু—তালুকদার শিলং যাবার মাসখানেক আগে আলটিমেটাম জানিয়ে ছিলেন, বিনয়কে গ্রাস করা চলবে না···ছেলের বিবাহ-সম্বন্ধে তাঁর আকাঙ্ক্ষা স্বতন্ত্র রকম···বন্ধুর কন্যা বলে' মণিমালার উপর তালুকদারের স্নেহ গভীর হলেও তাঁর ছেলের বিবাহ তিনি এমন-ঘরে দিতে চান, যে-ঘরের নাম দেশের বুকে হীরকাক্ষরে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করচে—এবং সে-বিবাহের ব্যবস্থাও তিনি করে' রেখেছেন। বিনয় সম্বন্ধে দুরাশা ত্যাগ করে' তালুকদারের নির্দ্দিষ্ট পাত্রে মণিমালাকে অর্পণ না করলে তালুকদার তাঁদের সমস্ত টাকা প্রত্যর্পণ করবেন এবং তাঁদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না।···এতে কঠিন প্রতিবাদ উঠলো বিনয়ের তরফ থেকে···বিনয় বললে—বাপের সব আদেশ শিরোধার্য্য করতে রাজী থাকলেও এ ব্যাপার আমি মানতে পারবো না—তার জন্য যদি বিষয়-সম্পতি থেকে বঞ্চিত হই—সহ্য হবে! মণিমালাও বললেন—বিবাহ না হয় হবে না, তা বলে' যাকে উনি ধরে এনে দেবেন, তাঁকে? কখনো না! এ অবস্থায় বিনয়ের পরামর্শে ওঁরা ব্যারাকপুরে আসেন—গুরু যদু ভটচায্যির গৃহে। নবদ্বীপ হলো মহেন্দ্র মিত্রের পৈত্রিক বাসভূমি—কিন্তু

ব্যারাকপুর কলকাতার কাছে—মনে করলে যাতায়াত চলে—তাই ব্যারাকপুরে আসা। বিনয় এখানে প্রায় আসা-যাওয়া করছিলেন—এবং তালুকদার যে-আলটিমেটাম দিয়েছিলেন শিলঙ থেকে ফিরেই মণিমালার গতি—তা থেকে রক্ষা পাবার জন্ম বিনয় ব্যবস্থা করেন, বাপ শিলঙে থাকতে থাকতে মণিমালাকে বিবাহ করবেন···

সত্যশরণ বললেন— বুঝলুম—কিন্তু একটা বিষয় এখনো রহস্তে রয়ে যাচ্ছে। তাই যদি স্থির হয়ে থাকে তো হাজারিবাগে শীকার অভিযান ?

শান্তিময় বললেন—বিনয়কে প্রশ্ন করেছিলুম জবাব মেলেনি। তিনি কোন কথার জবাব দেবেন না পণ করেছেন।

সত্যশরণ বললেন—এখনো তাঁর জামিন মেলেনি ?

—না···

সত্যশরণ কি ভাবলেন, তার পর বললেন—মণিমালা এখন কোথায় ?

—ব্যারাকপুরেই আছেন। তবে মা আর মেয়ে এমন হয়ে আছেন যে দেখলে চমকে উঠবেন।

সত্যশরণ বললেন—তোমার সুপিরিয়র অফিসার কি বলেন ?

—তিনি বলেন, চালান লিখে কোর্টে পাঠাও কেশ··· কতদিন আর ঐ নিয়ে মাথা ঘামাবো! কোর্টের বিচারে যা হয় হোক!···

সত্যশরণ বললেন—বিচারে খালাশ পাবে···কারণ এটুকু প্রমাণে···প্রমাণ মানে অনুমান মাত্র···মানুষের সাজা হতে পারে না।···তবে খালাশ পাওয়াই তো কথা নয়—কোর্টে চালান দিলে সম্মান-মর্য্যাদাটুকু জন্মের মতো খোয়া যাবে!···সাধারণে ভাববে, খুন করেছিল ঠিক···উকিল ব্যারিষ্টারের জোরে ফশকে বেরিয়ে গেছে!

শান্তিময় বললো—হুঁ···

তারপর আসর বসলো না ক'দিন···বিশেষ কাজে সত্যশরণকে কদিন ছুটোছুটি করতে হলো—কেষ্টনগর আর কলকাতা, কলকাতা আর কেষ্টনগর!···

শেয়ালদার ট্রেণে চড়ে বারাকপুর আর রাণাঘাট পেরিয়ে কেষ্টনগর যাতায়াত! তালুকদারের অপমৃত্যু, বিনয়ের গ্রেফতার···এগুলো বুকে ফুটে আছে কাঁটার মতো! অবসর পেলে মনে ঐ এক চিন্তা···হাজার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়! ট্রেণের কামরায় বসেন পশ্চিম-দিক ঘেঁষে···এঞ্জিনের দিকে মুখ করে'···তালুকদার তাঁর ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরায় যে-ভাবে বসেছিলেন বলে' শুনেছেন—সেই পোজিশনে! বরাবর লাইনের ধারে নজর রাখেন,—লাইনের ধারে কোনো রকম কিছু যদি···! মনে হয়, ব্যারাকপুরের আগেই যদি গুলি ছুটে থাকে? সবটাই তো অনুমান···এমন প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি যে মৃত্যু ঘটেছে ব্যারাকপুর ষ্টেশন পার হবার পর!···

একটা জিনিষ চোখে পড়েছে ক'বারই···পলতা আর ইছাপুর ষ্টেশনের মধ্যে ফাঁকা একটা মাঠ···সেই মাঠের পূবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে পোঁতা বন্দুক-প্রাকটিশের টার্গেট পোষ্ট···কাঠের থাম্বায় গাথা বড় বোর্ড···বোর্ডের গায়ে কালো কালো চক্র আঁকা···সেই আঁকা-গণ্ডীর মধ্যে তাগ করে' গুলি লাগানো চাই! হঠাৎ সেদিন মনে হলো, ঐ টার্গেট-প্রাকটিশ করতে এসে যদি···

মাথার মধ্যে মস্ত-এক সম্ভাবনার বিদ্যুৎ চমক দিয়ে গেল যেন···এবং সেদিন বাড়ী ফিরেই তিনি দেখা করলেন শান্তিময়ের সঙ্গে। তাঁকে বললেন···মনে যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত জেগেছিল! এবং···

পরের দিনই বেরিয়ে পড়লেন শান্তিময়কে নিয়ে। ট্রেণে চড়ে এসে নামলেন পলতা-ষ্টেশনে। নেমে লাইন ধরে গেলেন টার্গেট প্রাকটিশের মাঠে! সেখানকার অফিসে দেখা হলো মালীর সঙ্গে, বেয়ারার সঙ্গে। তাদের জিম্মায় ছিল লগ-কেতাব—এ কেতাবে কে কবে এলো প্রাকটিশ করতে, কতক্ষণ প্রাকটিশ চললো···কটা গুলি কবে খরচ হলো—সে গুলি-চালানোর ফলাফল···সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখা থাকে।

লগ-বুক পরীক্ষা করলেন বেশ হুঁশিয়ার হয়ে। পরীক্ষায় খবর মিললো, যেদিন তালুকদারের মৃত্যু ঘটেছে, ঐদিন বেলা সাড়ে বারোটায় এসেছিল হপকিন্স বলে' এক সাহেব টার্গেট-প্রাকটিশ করতে। হপকিন্স মাঠে নামে পৌনে একটায়—প্রাকটিশ করেছিল সমানে বেলা একটা চল্লিশ মিনিট পর্য্যন্ত। খবর মিললো, পাচটা ট্রাই করেছিল···তার মধ্যে একটি লাগে বোর্ডে, তিনটে আশে-পাশে

—টার্গেট-পোষ্টের পিছনে কাঁটাল গাছে···তাতে একটা লাইনের ধারে একটা বাছুর ঘাস খাচ্ছিল, সেই বাছুরের পায়ে একটা, আর একটা লাইনের গায়ে উঁচু মাটীতে—বাকী পাঁচ-নম্বরটা কোথায় লাগলো তার হদিশ মেলেনি!

সত্যশরণ বললেন—হদিশ মেলেনি?

বেয়ারা বললে—জী নহি!

সত্যশরণ চাইলেন শান্তিময়ের পানে, বললেন—মেডিকেল রিপোর্টগুলির পার্টিকুলার্স পেয়েছো?

—নিশ্চয়।

সত্যশরণ বললেন বেয়ারাকে—সাহেব কি গুলি ব্যবহার করেছিল, বলতে পারো?

—জী! সে সব ষ্টোরের কিতাবে লিখা থাকে।

—দেখাতে পারো?

—জী!

দেখে নোট করা হলো···শান্তিময় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সত্যশরণের দিকে। সত্যশরণ বললেন—মেডিকেল রিপোর্টে যে-গুলির খবর পেয়েছো, মিলিয়ে দেখো তো তার সঙ্গে···আমার মনে হয়···

শান্তিময় সেন বললেন—কি মনে হয়?

সত্যশরণ বললেন—খুন নয়···এ্যাক্সিডেণ্ট···হপকিন্সের প্রাকটিশ গুলি গিয়ে লেগেছে অতর্কিতে তালুকদারের রগে—তিনি কামরার এদিক ঘেঁষে বসে-ছিলেন খোলা জানালার ধারে···এ্যাণ্ড আই অ্যাম সিয়োর ইট ওয়াজ হপকিন্স-বুলেট ছাট হ্যাড···

বেয়ারার কাছে আরো খবর মিললো। হপকিন্স ভয়ানক আনাড়ি···ওর তাগা কোন দিকে লাগবে—ঠিক-ঠিকানা থাকে না কোনো কালে। তিন চার মাস প্রাকটিশ করছে সাহেব—তবু যেমন আনাড়ি তেমনি রয়ে গেছে।···সেবারে এমন গুলি ছুঁড়লো, পোল্ তো এদিকে—গুলি গিয়ে লাগলো ওদিকে এক কুলি ঘাস কাটছিল, তার পায়ে একেবারে!···

এ লাইনে সমস্যা-পূরণ হলো! গুলির মেক্ আর মাপ দুই গেল মিলে—হপকিন্স প্রাকটিশ করছিল যে-সময়ে, ঐ সময়েই আসাম-মেল ফীল্ড পাশ করছিল—হপকিন্স স্বীকার করলো, তার ছোঁড়া একটি গুলির সন্ধান মেলে নি।

লালবাজারেই মামলার ফয়শালা হলো—বিনয় পেলেন মুক্তি এবং তার পর কিন্তু বিবাহের কথা লেখবার আমাদের প্রয়োজন সেই—সে হলো প্রজাপতির নির্বন্ধ। খুশী হলেন সকলে—আমার থেকে এত বড় সমস্যার মীমাংসা···

গোবর্দ্ধন শুধু বিচলিত···ইতিমধ্যে সে এই মৃত্যু-রহস্য নিয়ে দুশো পাতার এক থ্রীলার লিখে ফেলেছে—সে লেখার ছত্রে ছত্রে দারুণ সাস্‌পেন্স···বেচারী সগর্ব্বে বলেছিল সে যা লিখেছে—

শুনছি, সে-লেখা রোমাঞ্চ-শিহরণ-সিরিজের ১৪৭ নম্বর উপন্যাস-রূপে ছেপে বেরুবে চাঁপাতলা পাবলিশিং হাউস থেকে। যাঁদের রুচি হয় পড়ে দেখবেন!

আঁখি দুটি ছল ছল—

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আঁখি দুটি ছল ছল—
ঝরিয়া পড়িল পুঞ্জিত ব্যথা
তপ্ত অশ্রু জল!

কেমনে বলিব, নয়নে কি জাগে—
বিরহ-মলিন—প্রেম-অনুরাগে;
বলি বলি করি, বলিতে পারি না—
বেদনায় টলমল!

আজো ফোটে নাই দয়িত-অধরে
মরমের মধু-বাণী
তরু-মর্ম্মরে কুঞ্জে সমীরে
মিলনের গানখানি।
কত দিবসের সঞ্চিত আশা
কত রজনীর মিলন-পিয়াসা—
কি জানি কাহার পরশে জাগিল
কামনার শতদল!

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(১)

বিমানঘাঁটীর ঘরের ভিতর ঢুকতেই স্বাস্থ্যবিভাগের একজন ডাক্তার এসে সকলের মুখে একটি করে থারমোমিটার পুরে দিলেন—এই হল স্বাস্থ্য-পরীক্ষা। তারপর গেলাম কাষ্টাম অফিসে। শেষে পাশপোর্ট দেখিয়ে এবং আইনকানুনের হিসাব চুকিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। সেখানে একপেয়ালা গরম কফি ও একখানা মিঠা-পিঠা (কেক) খেয়ে প্রাণ বাঁচালাম। যাত্রীদের কাজ সারা হলে বিমানদার Limousine এ করে সহরের ষ্টেশনে সোজা উপস্থিত হলাম। সামনেই Capitol Holl—সাদা ধবধবে গম্বুজওলা বিরাট একটি অট্টালিকা।

৮৬ তলার ছাদে

আমরা ট্রেনে চড়ে নিউইয়র্কের দিকে রওনা হয়েছি। ষ্টুয়ার্ড ও ষ্টুয়ার্ডেসরাও সঙ্গে আছেন। বিমান কোম্পানী সকল খরচা বহন করে যাত্রীদের নিউইয়র্ক অবধি পৌঁছে দেবে। প্রায় ১৫ ঘণ্টা উপোসের পর আমরা ট্রেনের ডাইনিং কারে ঠিকেল ৬টায় খেতে বসলাম, শরীর তখন ঝিমঝিম করছে, হাত আর ওঠে না, অবসাদে ও ক্লান্তিতে কিছুই ভালো লাগছে না। অনাহারে মানুষের যে কি অবস্থা হয় কতকটা জ্ঞান হল। খাওয়া সেরে পুলম্যানের (Pullman) কামরায় গিয়ে সোফায় বসলাম। একজন আমেরিকাবাসী বিমান-সহযাত্রীর সাথে আলাপ পরিচয় হল, লোকটি সারাপথ গল্প করতে করতে চললেন। তাঁর কাছে শুনলাম—আজকে আমাদের এই বিমানে বেশ একটু বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল, যাত্রীদের সে সকল অবস্থা বলা বারণ বলে ষ্টুয়ার্ডরা আমাদের তখন কিছু বলেনি। বিমান নিউইয়র্কের বিমান ঘাঁটীর উপর অনবরত চক্রাকারে ঘুরেছে কিন্তু কিছুতেই নামতে পারেনি। যতবার নীচে নামে ততবার কুয়াশায় কিছু দেখতে না পেয়ে—বিমানঘাঁটীর উল্টো পথে প্রবেশ করে। ভুল হচ্ছে জানবামাত্র তখনই আবার উপরে উঠে আসতে বাধ্য হয়। এমনি করে Baltimore, Philadelphia, Boston এবং কাছাকাছি আরো অনেক সহরের বিমানঘাঁটীতে নামতে চেষ্টা করে, কিন্তু কুয়াশার মাঝে কিছুই দেখতে না পেয়ে কোথাও ভূমি স্পর্শ করতে পারেনি। তারপর বেতার মারফৎ খবর পায় যে Washington এ আকাশ পরিষ্কার আছে। সুতরাং সেখানে গিয়ে বিমানঘাঁটীতে নামে। শুনলাম একবার নাকি একটি সাংঘাতিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। নিউইয়র্কে

হোটেল প্লাজা

১০২ তলা উঁচু Empire State Building কুয়াশায় ঢাকা ছিল। একটি বিমান সজোরে ধাক্কা খেয়ে ৭৫ তলার ভিতর ঢুকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়, বহু লোক তাতে প্রাণ হারায়।

আমরা পূর্ব্বেই খবর পেয়েছিলাম যে নিউইয়র্ক পৌঁছতে আমাদের অনেক দেরী হবে। তারপরে এই কুয়াশার জালে পড়ে ঘুরতে ঘুরতে আরো ৫ঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। পেট্রোল কম পড়লে যে কি হত তা ভাবলেও ভয় করে। যাহোক, ভাগ্যের জোরে শেষ অবধি সব বিপদ কাটিয়ে আমরা নিরাপদে মাটিতে নেমেছি। ভগবানকে ধন্যবাদ। খুকু ভীষণ ক্লান্ত হয়ে আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেল। ট্রেনের কামরাগুলি এয়ারটাইট, ভিতরে শব্দ ও ধুলোবালির বালাই নেই।

রকফেলার সেণ্টার

পুলমানের গাড়ীতে দামী কারপেটের উপর সোফা কৌচ পাতা, কামরাটি সাজানো গোছানো ঝকঝকে! ইলেকট্রীক ট্রেন বিদ্যুৎবেগে ছুটেছে, আমরা আমেরিকার বাড়ীঘর মাঠ পথ দেখতে দেখতে চলেছি। প্রায় ৯টার সময় নিউইয়র্ক পৌঁছলাম। দেখছি এখানে ট্রেনের সকল কাজকর্ম্ম নিগ্রোজাতির উপরই ন্যস্ত। ষ্টেশনে নেমে দেখি State Dept থেকে একজন মহিলা কর্ম্মী আমাদের নিতে এসেছেন। আমাদের মালপত্তর গাড়ী থেকে নামানো থেকে ট্যাক্সি ঠিক করা পর্য্যন্ত সবই তিনি করেছিলেন। নতুন জায়গায় নিয়মকানুন আমাদের জানা নেই, সুতরাং সারা দিনের ক্লান্তির পর এই সাহায্যটুকু খুবই কাজে লাগল। তিনি বল্লেন যে সারাদিন তাঁরা আমাদের বিমানের খোঁজেই কাটিয়েছেন, বিমানের খবর কোথাও সঠিক মেলে না। আকাশে বিমানের গতিবিধি কোথায় কি রকম কেউ তা বলতে পারে না। চারিদিকে phone আর ছোটাছুটি করে শেষে খবর পেলুম যে বিমান ওয়াশিংটনে নেমেছে এবং যাত্রীরা সব ট্রেনে করে আসছে।

এত কষ্ট করেছেন শুনে অশেষ ধন্যবাদ জানালাম। আমরা সহরের রাজপথে দু'ধারে দোকান দেখতে দেখতে চলেছি। চারিদিক আলোয় আলো। বিজ্ঞাপনের নানা রকম কায়দা। বড় বড় গ্লাস্ লাইট আর Neon (নিয়ন) আলোয় রাস্তা ঝলমল করছে। রাতকে

আমেরিকার প্রবেশ দ্বারে "স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি"

দিন করে ফেলেছে। Fifth Avenueতে Hotel Plazaর সামনে ট্যেক্সি এসে দাঁড়ালো। State Dept থেকে এই হোটেলে আমাদের ঘর রিজার্ভ করা ছিল, তাঁরা আবার খবরও দিয়ে রেখেছিলেন যে আমাদের আসতে দেরী হবে। শুনলাম এখানকার নিয়ম নাকি ৬টার ভিতর ঘর দখল না করলে বা খবর দিয়ে না রাখলে রিজার্ভ বাতিল হয়ে যায়। যাহোক, আমাদের আর সে সকল হাঙ্গামায় পড়তে হয় নাই। ৭তলায় দুটো ঘর আমাদের নামে রিজার্ভ ছিল। ঘরে গিয়ে দেখি ভিতরে জাঁকজমকের অন্ত নেই। এক একটি ঘরে

অন্তত ১৫।১৬টি করে আলোর ঝাড় জ্বলছে। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, সুতরাং তাড়াতাড়ি শয্যায় বিশ্রাম নিলাম।

পরদিন ১৮ই মে। চোখ খুলে দেখি আমরা আমেরিকায়। মনে বেশ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে—আমেরিকা দেখব! তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোটেলের একদিকে 5th Avenue, অন্যদিকে 57th Street, তার পাশ থেকেই Central Park আরম্ভ হয়েছে। হোটেলটি মাত্র ২০ তলা উঁচু, রাস্তার দু'ধারে বড় বড় সব অভ্রভেদী অট্টালিকাগুলির পাশে হো.টলটি খুবই ছোট দেখাচ্ছে। এখানকার বিশ্ববিখ্যাত Sky scraperগুলি ৫০।৬০ তলা করে উঁচু। নিউইয়র্কের এই Manhattan দ্বীপটি হল নূতন আধুনিক সহর। এখানকার Fifth Avenue রাস্তাটি বড় বড় দোকানের জন্য বিখ্যাত। প্রগতিশীল সমাজের নিত্য নূতন আধুনিক রুচির সাজ-সরঞ্জামে দোকানগুলি সাজানো— এরা বলে, Fifth Avenue হল ফেসানের রাজা।

রকফেলার সেণ্টারের প্রবেশ পথ

আমরা প্রথমে State Dept-এ গিয়ে আমাদের তত্ত্বাবধায়িকা (Miss Mann) তুলে নিয়ে Rockefeller Centre দেখতে গেলাম। এদেশে ট্যাক্সিকে 'Cab' বলে, ট্রামকে 'Street Car' ও Liftকে 'Elevator' বলে। Rockefeller Centre-এ Radio City Building ৭০ তলা উঁচু! আমরা Elevator-এ করে ৭০ তলার Observatory Roof-এ উঠলাম। এখান থেকে শহরের দৃশ্য অতি চমৎকার। তিনটি ব্লক জুড়ে Rockefeller Centre, এই Centre-এ নেই এমন জিনিষ আমেরিকাতে নেই। সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট থেকে আরম্ভ করে সার্ব্বজনীন বাণিজ্যকেন্দ্র, ব্যবসায়ীদের বড় বড় অফিস, বেতার ষ্টেশন ইত্যাদি সবই রয়েছে, প্রায় দু'মাইল ব্যাপী বড় বড় দোকান রয়েছে;—তাই বলা হয়—A city within a city! Rockefeller Centre-এ Radio City MusicHall হল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় থিয়েটার হল—ছয় হাজার লোকের বসবার আসন এখানে রয়েছে। আমরা Cab-এ করে হোটেলে ফিরলাম।

এখানকার একদিকের রাস্তাগুলিকে (উত্তর হতে দক্ষিণের) নম্বর দিয়ে 'ষ্ট্রীট' বলে, আর অপরদিকের রাস্তাগুলি (পূব হতে পশ্চিমের) Avenue নামে পরিচিত, সেও নম্বর দিয়ে। কারুর নামে রাস্তার নাম নেই। শহরের মাঝে চওড়া একটি বাঁকা রাস্তা চলে গেছে,—নাম Broadway, এই Broadway রাস্তাটি বিজ্ঞাপনের আলোয় ভর্ত্তি, দিন রাত এখানে আলো জ্বলে। কোন সময়ই লোকের ভীড় কম হয় না।

আমরা বিকেলে Radio City Music Hall-এ সিনেমা দেখতে গেলাম। খুব বড় একটি হল, মহামূল্যবান আসবাব ও কারপেট দিয়ে সাজানো, বৈদ্যুতিক আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। প্রকাণ্ড একটি অর্গান কি মধুর সুরে ঝঙ্কার তুলে বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ৪০টি এক ছাঁচে গড়া মেয়ে ষ্টেজে এসে নাচ সুরু করে দিল—এমন সুসঙ্গতভাবে একতালে একঢংয়ে নাচছে তারা যে পাশ থেকে দেখায় যেন একটিমাত্র মেয়ে নাচছে। তারপর আরো ২।৩টা খেলা-ধুলা ও ব্যালেন্সের কায়দা
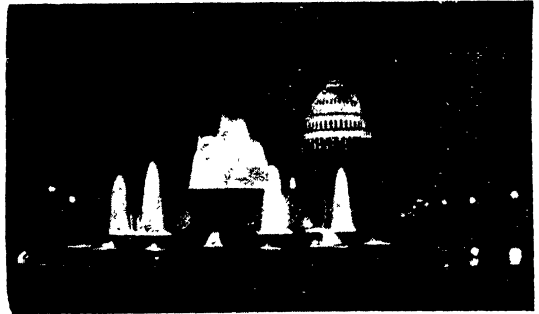
ক্যাপিট্যাল হল (রাত্রের দৃশ্য)

দেখানোর পর সিনেমার পরদা উঠল। এতো বড় হলে এমন সুন্দর এ্যাকাষ্টিকের ব্যবস্থা রয়েছে যে সব জায়গা থেকেই মৃদু আওয়াজও সুস্পষ্ট শোনা যায়। ফিরতে আমাদের অনেক রাত হল।

পরদিন ২০শে মে, সকালে উনি গেলেন হাসপাতাল দেখতে, আমি ও খুকু প্রাতরাশ সেরে রাস্তায় একটু হাঁটতে বেরোলাম। রাস্তায় এসে দেখি নানা দেশের নানারকম চেহারার নানা জাতের মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। —সাদা, কালো, চেপ্টামুখ, উঁচুমুখ, বেঁটে, লম্বা, রোগা, মোটা ইত্যাদি। সকল দেশের মানুষ নিয়ে এই আমেরিকান জাতের সৃষ্টি। 'আমেরিকা' বল্লেই আমাদের মনে হয়—এক স্বর্গরাজ্য—প্রচুর ধনদৌলত ও ঐশ্বর্য্যে ভরা ধনীর আবাসভূমি। এখানকার ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে চোখ ঝলসে যায়। মানুষের তৈরী জিনিষের কৃত্রিম সম্ভারে দেশটা ভর্ত্তি! পৃথিবীর ভোগ বিলাসের কেন্দ্র। এই নূতন জাতির উৎপত্তি বেশ একটু নতুন ধরণের, কথায় বলে "From log cabin to skyscrapers." আমেরিকা আবিষ্কার হবার পর দেশ-বিদেশের বাস্তহারা লোক এসে

এখানে বাসা বাঁধলো, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ হল ইউরোপের দরিদ্র সমাজের নির্য্যাতিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক। নিজেদের দেশে সুযোগ সুবিধার অভাবে নিরাশ ও ব্যর্থ জীবন যাপন না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন দেশ, নতুন জীবনে, নতুন আশা নিয়ে। আমেরিকায় এসে যেন তাদের নবজন্ম হ'ল। তাদের স্বপ্ন ও সাধনা হ'য়ে উঠলো ক্রমে নতুন আদর্শে নতুন দেশ গড়ে তোলা,—যেখানে মানুষ সকল সুযোগ ও অধিকার লাভ করে গড়ে তুলবে এক নূতন আদর্শ জাতি;—জগতের মাঝে যারা অধিকার করবে প্রথম স্থান। আজ এরাই হল বিশ্বযুদ্ধে রণজয়ী শ্রেষ্ঠবীর, পৃথিবীর রাষ্ট্র নেতা, প্রতিভাবান সাহিত্যিক, বরেণ্য বৈজ্ঞানিক ও কোটিপতি মালিক।

আমেরিকান ছাড়া আরেকটি ভিন্নজাতির মানুষকে এখানে দেখতে পাই, সে হচ্ছে নিগ্রোজাতি। বহুকাল পূর্ব্বে ক্রীতদাসরূপে আফ্রিকা থেকে এদের ধরে আনা হয়। আজ তারা সংখ্যায় অনেক। এরা দীর্ঘকাল ধরে দাসত্বের আইনে বদ্ধ থেকে নির্যাতিত জীবন-যাপন করেছে। তারপর সে আইন হতে মুক্ত হয়ে নাগরিকের অধিকার লাভ করে। আমেরিকার দক্ষিণে তুলা ও তামাকের চাষে এই শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন বেশী, তাই উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণের মালিকরাই অত্যাচার চালিয়েছিলেন বেশী দিন। উদারপন্থী উত্তর বাসিন্দারা দাসত্বে আইনের বিরোধীতা করেন। সেই সময় Illinois থেকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে এলেন Abraham Lincoln। তিনি দাসত্ব মোচনের পক্ষে তীব্র আন্দোলন সুরু করলেন। ১৮৬০ সালে তিনি স্বয়ং President নির্ব্বাচিত হন। সেই সময় আবার গৃহ বিবাদের আগুন দেশে জ্বলে উঠে। ১৮৬৫ সালে President Lincoln-এর নেতৃত্বে আমেরিকা দাসত্বের কলঙ্ক হতে মুক্ত হয়। এরপর থেকে আমেরিকার সুদিন এল, জাতির আদর্শপথ উন্মুক্ত হল, ধাপে ধাপে উন্নতির সোপানে দেশ উঠে গেল। মরুভূমি শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হল, দলে দলে লোক এসে বসবাস আরম্ভ করল। আজও আমেরিকার উত্তরে Republican

নিউইয়র্ক শহরের রাজপথে

Party এবং দক্ষিণে Democratic Party স্ব স্ব দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেও একত্র হয়ে দেশের শাসন কার্য্যে পরস্পরের সহযোগিতা করছে। উদারচেতা মহামানব লিংকনের নামে আজও সবাই মাথা নত করে। (ক্রমশঃ)

নব-পরিণীতা

জসীম উদ্‌দীন

নব-পরিণীতা মোর সে শালীকা, নাম না বলাই ভাল,
অতি সুরসিকা সুচারুভাষিকা তিমির-নাশিকা আলো।
উঠিতে বসিতে হাসিতে-খুশীতে ভুবিছে দেহের লতা,
অধর বাঁশীতে রাশিতে রাশিতে ঝরিছে রঙিণ কথা।

হাতের বলয়ে কি জানি বলয়ে, কেশের কুলয়ে ভুলি,
ঝুমকে-বিহগ-যুগল হাসিছে কাণের দোলায় দুলি।
চলিতে বলিতে হেলিতে দুলিতে দেহের তুলিতে শত
রঙিণ মুরতি গড়িয়া গড়িয়া ভাঙিয়া ফেলিছে কত।

পিয়ন আসিতে রঙিণ খামেতে তাহার নামেতে নিতি
দূর দেশ হ'তে আখরের স্রোতে আসে সে মধুর প্রীতি।
তারি সাথে সাথে কত শতপথে ছড়ায় রঙিণ ফুল,
সে ফুল তুলিতে মনের তুলিতে কেবলই সে আঁকে ভুল।

বাহুরে ঘুরাতে দেহেরে হেলাতে বাঁশীর মতন বাজে
কত কৌতুক ফুটিয়া টুটিয়া রঙিতেছে শত কাজে।
গহন নিশিতে মনের খুসীতে মসিতে আঁকিয়া রেখা,
চিঠির কথায় প্রদীপ জ্বালিয়া জেগে থাকে সে যে একা।
আকাশে কুমুদী হাসে খলখল, তারারা লুটায়ে পড়ে,
জোছনা-লতায় ফোটে সে কুসুম তাহার জানালা ধরে।
চামেলী চাহিয়া মিটিমিটি হাসে শিশিরে করিয়া স্নান,
বউ কথা কও বউ পাখী দূরে ডেকে ডেকে হয়রাণ।
চিঠির প্রদীপ তবু নেবেনাক, রবি এসে উঁকি মারে
ভোরের শেফালী রাঙাঘড়া-কাঁখে কৌতুকে ডাকে তারে।
কুমুদীর মত চিঠি কুসুমের গুটাইয়া দলগুলি,
প্রভাত বেলায় অতি স-যতনে লয় সে খামেতে তুলি।
নব-পরিণীতা মোর সে শালীকা নাম না বলাই ভাল,
অতি সুরসিকা সুচারুভাষিকা আঁধারে চাঁদের আলো।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

২০

নৌকা ছাড়িল—অনুকূল বাতাসে স্ফীত পালে কপিষার তরঙ্গের বক্ষে নাচিয়া নাচিয়া চলিল। কূলে কূলে পূর্ণা নদী—কৌমুদী মণ্ডিতা। বীচিভঙ্গের উপর জ্যোৎস্না শতধা বিচ্ছুরিত হইতেছে—ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তরঙ্গিণী মদনোৎসবে অলঙ্কার-বিভূষিতা নর্ত্তকীর মত নাচিয়া গাহিয়া চলিয়াছে। দাঁড়ীগণ ধীরে ধীরে দাঁড় বাহিতেছে। দাঁড়ের জলে রজতকণা ঝরিতেছে। আমাদের নৌকার পশ্চাতে পণ্যবাহীনৌকাগুলি আনন্দ ও তীর্থকের তত্ত্বাবধানে আসিতেছে।

আমি নৌকায় মুক্ত আকাশতলে বসিয়া নীরবে আমার আজন্ম-পরিচিত আমাদের ঐ থট্টা ও কপিষার তটভূমির দিকে চাহিয়া আছি। জ্যোৎস্নার অনাবিল শুভ্রতায় একটা অবাস্তব স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। কপিষার উভয় তীর যামিনীর এই প্রমুগ্ধ বিমল উৎসবে কোনও অবাস্তব চিত্রের রেখার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

কপিষার দক্ষিণতীরে আমাদিগের গৃহ—আমার জন্মভূমি। অদ্য তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম—আমার গৃহীত ব্রতোদ্‌যাপন কল্পে। যবনের অত্যাচার, অবিচার ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতা নির্ম্মূল করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া জীবনপণ করিয়া, আজ অকূলে ঝাঁপ দিলাম। জানিনা, আমাদের এই আশা ও প্রচেষ্টা সফল হইবে কিনা। জানিনা, জাতি ও জনসাধারণকে এক নীচ বিজাতীয় স্বার্থপর শাসনতন্ত্রের নির্ম্মম নিষ্ঠুর পরিহাস হইতে মুক্ত করিতে পারিব কিনা।—আমার মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া তাহাকে সেই তাহার চির ঈপ্সিত স্বাধীনতার গৌরবান্বিত সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব কিনা।—ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে—কে বলিয়া দিবে? ভবিষ্যতের তমসাভেদ করা কাহারও সাধ্য নাই। তবে, আমাদের সাফল্যের জন্ম আমাদের প্রচেষ্টার ও সাধনার ত্রুটী হইবে না। আজ গৃহত্যাগ করিয়া এক অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্ম প্রবাসে চলিলাম। সাধনায় সাফল্যলাভ কতদিন পরে যে হইবে, হইবে কিনা, সে বিষয়েও কোনও নিশ্চয়তা নাই। গৃহীত ব্রতোদ্‌যাপনে যদি বিফল হইতে হয়—যদি সঙ্কল্পিত অনুষ্ঠানে আমাদিগের অনবধানতা বা ত্রুটী কোনও দুরপনেয় বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া আমাদের সকল অনুমান ও সঙ্কল্প বিপর্যস্ত করে, যদি ক্ষণিক ভ্রান্তি বা চাঞ্চল্য আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদিগের কর্ম্মপন্থা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করে ও আমাদের সকল কল্পনা ও চিন্তা মোহাবিষ্টের দিবাস্বপ্নে পর্য্যবসিত হয়—তাহা হইলে হয়ত আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হইবে না—আমাদের প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এক নিমেষের ভুল আমাদিগকে বিপথে নীত করিতে পারে এবং আমাদিগের পথের আলোক নিভাইয়া দিতে পারে। সে নিষ্ফলতায় মূল্য আমাদের জীবন, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগের প্রাণ দিয়া করিতে হইবে। আমাদের স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আচরিত ত্রুটী-বিচ্যুতি আমাদের দেহের রক্তে ধৌত করিতে হইবে। হয়ত আর কখনও ফিরিব না। জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে পরিচিত—স্নিগ্ধস্মৃতি-বিজড়িত আমার জন্মভূমি, সেই গৃহ, সেই প্রাঙ্গণ, ঐ নদীতট, কল্যাণী কপিষা, ঐ সুদূরবিসর্পিত শৈলমালা—ঐ দূরদিগন্তে চিত্রিত গিরিশিখর—ইহাদের সকলের সহিত—আমার একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন-প্রীতি বিজড়িত আছে। বসন্তের প্রারম্ভে কপিষার উভয় তটের বনভূমিতে বিহগসমাগম হয়! কলকাকলীতে আমাদের উদ্যান, উপবন ও প্রাঙ্গণ মুখর হইয়া উঠে! তাহাদের প্রত্যেকের কূজন আমি জানি, মানবের ভাষার মত বুঝি। সেই দূরাগত অতিথিদের প্রত্যেকের সহিত আমার ঘনিষ্ট পরিচয় আছে। কতপ্রকার প্রজাপতি তাহাদের বিচিত্র ক্ষুদ্র পক্ষ মেলিয়া উড়িয়া উড়িয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়! কপিষার তীরে, আমাদিগের ঐ সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে, শৈশবে, চিত্রলেখার সহিত কত প্রজাপতি ও পতঙ্গের পশ্চাতে ছুটিয়াছি! থট্টার মর্ম্মর সোপানের শিলাপট্টের উপর বসিয়া, আমাদের শৈশবে, আমরা দুইটি ক্ষুদ্র বালকবালিকা—চিত্রলেখা ও আমি—প্রস্ফুট পুষ্পসমূহ নদীর জলে ভাসাইয়া খেলা করিতাম! —কত দিনান্তে কপিষার গলিত স্বর্ণের উপর বৃক্ষপত্রের ক্ষুদ্র নৌকা রচনা করিয়া ভাসাইয়াছি! সে আজ কতদিনের কথা!—এতদিন সে সকল কথা বিস্মৃতির কোন অতলগর্ভে ডুবিয়াছিল; আজ সেই সব অতীতের সুপ্ত স্মৃতিগুলি সহসা জাগরিত হইয়া আমার মনের কোন রুদ্ধ কারাগার হইতে বাঁধন ছিঁড়িয়া—একে একে আমার নয়ন সম্মুখে আপনাদিগকে ধীরে ধীরে পরিব্যক্ত করিতে লাগিল! যেন সব গতকল্যের ঘটনা! এমনি তাহারা প্রস্ফুট—অনাবিল—ভাস্বর! কুসুমের সংবাদ লইয়া বায়ুর সমাগম হইলে আমি সহজেই বুঝিতে পারি যে কোন পুষ্পসৌরভভারে বায়ু মন্থরগতি। তাহার স্পর্শে অনুভব

করিতে পারি কোন পুষ্পিত কিসলয়-মঞ্জরীর পেলব-স্নিগ্ধতা সে বহন করিয়া আনিয়াছে। অজ্ঞাতসারে দুইবিন্দু অশ্রু গণ্ড বাহিয়া পড়িল—চকিতে তাহা মুছিয়া ফেলিলাম। ছি!—ছি!—এ দুর্ব্বলতা কেন?—আমার গৃহীত ব্রতের কথা মনে করিলাম, আমার জীবনের উদ্দেশ্যের বিষয় স্মরণ হইল, আপনাকে ফিরিয়া পাইলাম, আমার ধ্রুবতারা ক্ষণিক মেঘ হইতে মুক্ত হইয়া ভ্রষ্টলক্ষ্যের দিকে পথ-নির্দ্দেশ করিল। হৃদয় সংযত হইল। জগতের আনন্দ কলরোলের মধ্যে দুঃখের আর্ত্তনাদের মত, পরিপূর্ণ তৃপ্তির বিকট অট্টহাস্যের মধ্যে আশাহতের গভীর অথচ অপরিস্ফুট দীর্ঘশ্বাসের মত—আমাদের গৃহীত ব্রতের স্বার্থহীন মহত্ত্বের মধ্যে—আমাদের সাধনার পথে সকল সুমহান অবদান ও আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যে—আমাদের নিজস্ব ও চিরন্তন ক্ষুদ্রতাকে লইয়া আমাদের জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ি! আমাদের নির্দ্দিষ্ট ব্রতানুষ্ঠানের শিখরে দাঁড়াইয়া আবার যখন জীবনের দিগন্তের পানে দৃষ্টি প্রসারিত করি, তখন মনে হয়—ঐখানে—ঐ যেখানে জীবনের সমতল আকাশের নীলিমার সহিত নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ—ঐ যেখানে তাহাদের তৃপ্তিহীন চুম্বনের অরুণিমা অর্দ্ধাস্ফুট বিকাশের আভাব ক্ষীণপ্রতিভাত—ঐখানে বুঝি সকল সুখ, সকল শান্তি—ঐখানে বুঝি সকল ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার শেষ—সকল চাঞ্চল্যের—সকল বেদনার অবসান—মুক্তি—চরম-নির্ব্বাণ কেন্দ্র!

এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতার অবসাদ ও মানসিক ক্লান্তি হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রজ্ঞার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম।

প্রজ্ঞা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কি?—অমন করিয়া বিমর্ষ হইয়া বসিলে কেন?—মনটা বড় খারাপ হইয়াছে না?"

—হাঁ—একটু হইয়াছে বটে—গৃহ ও জন্মভূমি ছাড়িয়া এক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রবাসে চলিলাম—কবে ফিরিব তাহার কোনও স্থিরতা নাই; আর ফিরিব কিনা তাহাই বা কে বলিতে পারে? তাই মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র। আমরা শ্রেষ্ঠী—বিদেশে গমন ত আমাদের করিতেই হয়—তাহার পর প্রবাস যাত্রা আমার নূতন নহে—এইত প্রায় দেড় বৎসর হইল পিতার সহিত পণ্টসে গমন করিয়াছিলাম।

—কিন্তু বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে হইয়া থাকে। আশা থাকে যে একটা সুনির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে পুনর্ব্বার স্বগৃহে ও স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।—এ অভিযানের মধ্যে সে নিশ্চয়তা নাই; আর ইহার বিশেষত্বও অন্যরূপ।

—হাঁ, তাহাই বটে। একটা ক্ষণিক অবসাদে মনটা একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা আমাদের ব্রত ও সাধনার কথা স্মরণে বাত্যাতাড়িত মেঘের মত অপসৃত হইয়াছে।

—কর্ত্তব্যের পথে এইপ্রকার ক্ষণিক চাঞ্চল্য ও অবসাদ অনেক সময় বিপত্তি ঘটায়। হৃদয়ের সকল কোমল ভাবকে নির্ম্মমতার সহিত মুছিয়া না ফেলিলে, বোধ হয়, সাধনার পথ মুক্ত হয় না। অনেক সময়ে ইহাতে বিচলিত হইয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।

—অসংযত হৃদয়ের পক্ষে কর্ত্তব্য-বিচ্যুতি সম্ভব—কিন্তু আমাদের ব্রত ও সাধনার বিষয় আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকিলে আমরা আর ততটা অভিভূত বা বিপর্য্যস্ত হই না এবং আমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয় না।

—না হইতেও পারে, কিন্তু হওয়াও অসম্ভব নয়। হৃদয়ের মধ্যে এইরূপ চাঞ্চল্যের স্থান দেওয়া কি নিরাপদ?

—সংযত হৃদয়ে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইলে সকল বাধা-বিঘ্ন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়—দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ আমাদিগকে আমাদের সাধনার সাফল্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে।

—কিন্তু আমাদের মন-প্রাণকে নির্ম্মম শাসনের কঠোরতার দ্বারা তাহার ভাবাবেশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিলে আমরা নিরাপদ থাকিতে পারি, কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না।

—কঠোর শাসনের কারাগারে রাখিয়া মানব মনের ভাবোচ্ছ্বাসকে একেবারে নির্ম্মূল করা যায় না। মন তাহার চিরন্তন অভ্যাস হইতে আপনাকে সহসা মুক্ত করিতে সক্ষম হয় না।

—সত্য, মন তাহার পুরাতন পথে চলিতে চাহে; তাহার চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারা বর্জ্জন করিয়া নূতন পথে চলিতে সে প্রথমে একটু দিশাহারা হইয়া পড়ে, নূতনকে অভ্যাস করিয়া লইতে তাহার কিছু বিলম্ব হয়, কিঞ্চিৎ বিপর্য্যস্তও হইতে হয়।

—তাহা, বোধ হয় আমাদের অভ্যাসগত ও স্বভাবতঃ সঙ্কীর্ণতার ফল।—আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আমাদের সযত্ন অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের চিন্তার প্রসারতা বাড়াইয়া দেয়—আমাদের ক্ষুদ্রতাকে বিনষ্ট করিয়া কর্ত্তব্যের মুক্ত উদার পথে আমাদিগকে নীত করে।

—কিন্তু জীবনের এই অপ্রসারতা—এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতাই আমাদের সকল বন্ধনকে মধুর করে। মানব হৃদয়ের ভাবের প্রসার যত ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহার স্নেহ-মমতা তত নিবিড় হয়—তাহার অসীম জগৎকে তত মধুময় করিয়া দেয়।

—সাধারণ মানব জীবনে তাহা সত্য বটে।—এই অপ্রসার ক্ষুদ্রতার প্রশ্রয়ে কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আবিল হইয়া পড়ে। আমাদের প্রাণ তাহার স্বরচিত পিঞ্জরের কঠিন শলাকাগাত্রে তাহার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল পক্ষ দ্বারা আঘাত করে, তাহার স্বার্থের নির্জ্জন কারাগার হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া অনন্ত আকাশে ভাসিয়া যাইতে চায়, কিন্তু অক্ষম দুর্ব্বল সে—পারে না—তাহার ক্ষমতায় কুলায় না।

—হাঁ, তাহাই বটে; কিন্তু এই ক্ষুদ্রতায় আমাদের জীবনটা বড় সরস ও মধুময় হয়।

প্রজ্ঞা নীরব হইল, কেবল নীরবে কপিবার রজতধারার দিকে

চাহিয়া রহিল ; আমিও আর কিছু বলিলাম না। আমাদের গৃহের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, নদীতীরে ঘটার সোপানের উপর তখনও যেন সকলে দাঁড়াইয়া আছেন।

এইবার কপিথা বক্রগতিতে বনানী-শোভিত ক্ষুদ্র শৈলমালা বেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা হইয়াছে ; এ নদী এখন উত্তরমুখী। আমাদের নৌকার গতি নদীপ্রবাহ অনুসরণ করিল। এখন আমাদের গৃহ, আমার আশৈশব পরিচিত, আমার বাল্যের ক্রীড়াস্থল বনপরিবৃতা শৈলময়ী উচ্চ তটভূমির অন্তরালে অদৃশ্য হইল। আর, তাহার সহিত, একটা বিষাদের ঘনান্ধকার অতর্কিত ভাবে আমার প্রাণের মধ্যে জমাট বাঁধিয়া গেল ! এতক্ষণ কত অতীত সুখস্মৃতি আমার প্রাণের মধ্যে তাহাদের স্বপ্নময় লীলাক্ষেত্র রচনা করিতেছিল ! তাহা সব এই অন্ধ তমসায় ঢাকিয়া একাকার করিয়া দিল !—আমার মনের তখনকার অবস্থাটা লিপিবদ্ধ করিবার বা অপরকে বুঝাইবার মত ভাষা বোধ হয় নাই ! এক গাঢ় কালিমা যেন আমার সকল মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া দিল ! আমার স্বপ্নের সকল মাধুরী অবলুপ্ত হইল ! যেন সব শূন্য ! সব ফাঁকা ! ভাবহীন ! চিন্তাহীন ! মন-প্রাণ অবসন্ন ! চিন্তার ক্ষমতাও যেন অপহৃত হইয়াছে !

আমি নৌকার একটা কক্ষের দ্বারে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া লীন হইয়া উপবিষ্ট ছিলাম—কখন অজ্ঞাতসারে আমার নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিল—আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে নৌকাযাত্রা নামক বিংশ বিবৃতি।

(ক্রমশঃ)

মৃত্যুর পারে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(৩)

বেদান্ত বলেন চৈতন্য ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহার ব্যবহারিক সত্তা থাকিলেও, পারমার্থিক সত্তা নাই ; চৈতন্যই একমাত্র সত্তাবান পদার্থ। আধুনিক জড়বাদিগণও একাধিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ; কিন্তু তাহাদের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়ই সেই পদার্থ, চৈতন্য জড়েরই কার্য্য, জড়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা তাহার নাই। কিন্তু জড়ের বিশ্লেষণ করিতে করিতে বৈজ্ঞানিকগণ এখন তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে যে ধারণায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা চৈতন্যের অতি নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে ; জড়ের স্থূলরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার স্থলে যে রূপ কল্পিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলেও অতীন্দ্রিয়। গবেষণা আরও অগ্রসর হইলে সূক্ষ্মীভূত জড় ও চৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান ক্ষীণ সীমারেখা অবলুপ্ত হইয়া যাইতেও পারে। হয়তো জড় ও চৈতন্য একই পদার্থের দুই রূপ। কিন্তু এখনও ইহা অনুমান মাত্র ; উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রেখা এখনও বর্ত্তমান। বৈজ্ঞানিকের ইথার এবং তাহার তরঙ্গ জড়ত্বের প্রান্তদেশে হইলেও তাহার সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। সুতরাং জড় ও চৈতন্যের একত্বের ভিত্তির উপর বর্ত্তমানে কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রতিষ্ঠা সঙ্গত নহে।

জড়ের সঙ্গে আমাদের প্রতিক্ষণে সাক্ষাৎ হইতেছে, তাই জড়কে আমরা জানি, অথবা জানি বলিয়া মনে করি। চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইলেও—বস্তুতঃ আমরা স্বরূপতঃ চৈতন্য হইলেও, তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো পরিচয় নাই। চৈতন্যের কার্য্য আমরা দেখি, চৈতন্যকে দেখিতে পাই না। আমরা আমাদের আপনাকে জানি না। তাই জড়ের বিনাশ নাই, একথা আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলি, কিন্তু যাহার সাহায্যে জড়কে আমরা জানি, জড়ের বিনাশ নাই এই সত্য যে আবিষ্কার করিয়াছে, চৈতন্যস্বরূপ সেই জীবাত্মারও যে বিনাশ নাই, একথা আমরা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে সাহস পাই না। চৈতন্যরূপী জীবাত্মা নিজে জড় দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যত্রও জড়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত চৈতন্যের সঙ্গেই তাহার পরিচয়। জড়বিমুক্ত চৈতন্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাই জড়-দেহের সংযোগ-বিযুক্ত চৈতন্যের কল্পনা নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনার মতই কষ্টসাধ্য। কিন্তু কষ্টসাধ্য হইলেও সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং সে কল্পনায় অযৌক্তিকও কিছু নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আকস্মিক অভিব্যক্তিবাদীদিগের মতে চৈতন্য প্রাণ হইতে ভিন্ন, এবং প্রাণ ভৌতিক পদার্থ হইতে ভিন্ন। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন পদার্থের উদ্ভব কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা অজ্ঞাত। কিন্তু সত্তা যাহার নাই, তাহার উৎপত্তি কল্পনা করা অসম্ভব।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

সুতরাং জড়পরমাণুর সংযোগবিশেষের সঙ্গে যখন প্রাণের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হয়, তখন হয় বলিতে হইবে প্রাণ পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল, উপযুক্ত বাহন প্রস্তুত হইলে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, নতুবা পরমাণুসমূহের সংযোগবিশেষের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণে যাহার অস্তিত্ব নাই, কার্য্যে তাহার আবির্ভাব অসম্ভব। সুতরাং প্রাণকে যদি পরমাণুসমূহের কার্য্যের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে পরমাণুর মধ্যে প্রাণ বীজরূপে বর্ত্তমান ছিল, এবং উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে। একই যুক্তিতে

চৈতন্যকেও জড়ে নিহিত বলিতে হয়। সুতরাং অভিব্যক্তি-ধারায় ক্রমশঃ নূতন নূতন পদার্থের উদ্ভবের কথা যুক্তিসহ নহে। প্রাণও চৈতন্য নিত্য দ্রব্য। পৃথিবীর অভিব্যক্তির ইতিহাসে প্রথমে যদি তাহাদের দেখা পাওয়া না গিয়াই থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে নূতন সৃষ্টি বলিবার সঙ্গত কারণ নাই। বলা যাইতে পারে, তখন তাহারা প্রকাশিত হয় নাই। হয়ত তখন তাহারা অপ্রকাশিত অবস্থায় পৃথিবীর অণুপরমাণুর সহিত সংযুক্ত ছিল। এমনও হইতে পারে যে অনুকূল অবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অন্য গ্রহ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে। কিন্তু অভাবের মধ্যে তাহাদের উদ্ভবের কল্পনা—অভাবের মধ্য হইতে জড়ের উদ্ভবের কল্পনার মতই অসম্ভব। Alexanderএর মতে আদিতে দেশ কালই একমাত্র সৎ পদার্থ ছিল। এই দেশ কাল (Space-Time) হইতে ভৌতিক পদার্থ, ভৌতিক পদার্থ হইতে রাসায়নিক শক্তি, পরে প্রাণ এবং সর্ব্বশেষে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়াছে। দেশ—কাল ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থের অস্তিত্ব যদি আদিতে না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে চৈতন্যকে দেশ-কালের বিকার বলিতে হইবে, নূতন পদার্থ বলা যায় না। দেশ-কালকেও চৈতন্য-গর্ভ বলিতে হইবে। তাহা হইলে দাঁড়ায়, এক সর্ব্বব্যাপী সনাতন চৈতন্য-গর্ভ দেশ-কাল হইতে চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা ও দৃশ্যতঃ চৈতন্যবিহীন জড়পদার্থের উৎপত্তি। এখানে "চৈতন্য গর্ভ" বিশেষণের পরিবর্ত্তে "চৈতন্য স্বরূপ" ব্যবহার করিতে পারিলে Alexanderএর দেশকাল (Space-Time) ও ব্রহ্ম একার্থ-বোধক হইত। কিন্তু দেশকালে চৈতন্য আদিতে ছিল, একথা Alexander বলেন নাই, তাঁহার দেশকাল অচেতন। অচেতন হইতে চেতনের উদ্ভব কল্পনা করা অসাধ্য। এখন প্রশ্ন এই সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন অনন্ত দেশ-কাল, অথবা জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কি ক্ষণিক অথবা চিরস্থায়ী?

যাঁহারা জীবাত্মার জন্মপূর্ব্ব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, উৎপত্তি হইলেই বিনাশ অবধারিত। সুতরাং জীবাত্মা নশ্বর, অনন্ত সমুদ্রে বুদ্‌বুদের মত উঠিয়া সেই সমুদ্রেই বিলীন হইয়া যায়। একথা যে কেবল আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরাই বলেন, তাহা নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক-সংবাদে যাজ্ঞবল্কও জীবাত্মার—অবিনশ্বরত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। আত্মার সর্ব্বব্যাপত্ব বর্ণনা করিয়া যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন সমুদ্র যেমন জলের "একায়ন" অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয়, চক্ষুরসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন রূপরসাদির একায়ন, তেমনি আত্মা যাবতীয় বস্তুর একায়ন। "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ—সমস্তই সেই মহাভূত (মহান্ আত্মা) হইতে নিশ্বসিত হইয়াছে। এই মহাভূত অনন্ত, অপার, বিজ্ঞান-ঘন। তারপরে "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি, ইতি অরে ব্রবীমি," অর্থাৎ "মহান্ আত্মা এই সমুদায় ভূত হইতে (জীবাত্মারূপে) উত্থিত হইয়া ইহাতেই আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর আর তাহার সংজ্ঞা থাকে না। আমি ইহাই বলিতেছি।" শুনিয়া তো মৈত্রেয়ী বিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। যে অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছায় তিনি বিত্ত গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, এই কি সেই অমৃতত্ব? মৃত্যুর পরে আর সংজ্ঞা জাগিবে না? তিনি বলিলেন "ভগবান, মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকিবে না বলিয়া আমাকে মোহগ্রস্ত করিলেন।" যাজ্ঞবল্ক বলিলেন "মোহজনক তো কিছুই বলি নাই। বিজ্ঞান-লাভের জন্য ইহাই পর্য্যাপ্ত।" "উৎপত্তি হইলেই বিনাশ হইবে" এই সংস্কার লোকের মনে দৃঢ়-মূল হইয়া আছে, এবং এই জন্যই জীবাত্মার অ-বিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী ইমানুয়েল ফিক্‌তে (Fichte) জীবাত্মার জন্ম-পূর্ব্ব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু "আরম্ভ থাকিলেই যে শেষ থাকিবে" ইহা তো সব সময়ে সত্য বলিয়া বিজ্ঞানেও স্বীকৃত হয় নাই। নিউটনের গতির প্রথম নিয়ম অনুসারে কোনও গতিহীন দ্রব্যে গতি সঞ্চারিত হইলে যতক্ষণ কোনও বাহিরের শক্তি দ্বারা প্রতিহত না হয়, ততক্ষণ সে দ্রব্য চলিতে থাকিবে। জড় পদার্থে সংক্রমিত গতির পক্ষে এই নিয়ম যদি সত্য হয়, তাহা হইলে চিৎ-স্বরূপ জীবের পক্ষে তাহা সত্য না হইবার কারণ কি?

জীবাত্মার অবিনাশিত্বের বিরুদ্ধে আর একটী আপত্তি স্পিনোজার (Spinoza) সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। আপত্তিকারিগণ বলেন "জীবাত্মা অর্থ ব্যক্তিত্ব (personality)। ব্যক্তিত্ব সসীম। যাবতীয় সসীম পদার্থই অনিত্য এবং তাহাদের আধার অসীমে বিলীন হওয়াই সসীমের নিয়তি।" উপরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্কের যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও অংশতঃ এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম-সত্তায় বিলীন হইয়া যাওয়াকে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর সাধক পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই মুক্তি সাধনা-সাপেক্ষ এবং কোটীজনের মধ্যে একজনও হয়তো সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন না। যত দিন পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভ না হয়, ততদিন তাহাদের মতে জীবাত্মা জন্ম-মৃত্যুর অধীন থাকে। ভক্তি-মার্গের সাধকেরা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অনন্তকাল তাঁহার প্রেমে মগ্ন থাকাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু সান্ত হইলেই যে অনন্তে বিলীন হইতে হইবে ইহার যুক্তি কোথায়? ইহাতো স্বতঃসিদ্ধ নয়। বর্ত্তমানে সান্ত হইয়াও আমরা অনন্তের পার্শ্বে যদি স্বতন্ত্র-ভাবে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে এবং স্বতন্ত্র-ভাবে স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে মৃত্যুর পরেও অনন্তের পার্শ্বে আমাদের স্থান হইবে না কেন, তাহার কোনও সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে জড়ের সঙ্গে জীবের কোনও সাদৃশ্য নাই। কোনও জড়দ্রব্যই প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নয়, অনন্ত প্রকৃতির অঙ্গ প্রত্যেক সান্ত দ্রব্য, একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ; বিভিন্ন দিকে প্রবহমান হইলেও, এক প্রকারের শক্তিকে প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভবপর এবং প্রত্যেক শক্তিই কালে কেন্দ্রীয়-শক্তি-ভাণ্ডারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিশ্বের সর্ব্বত্র তাপের সমত্ব—সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব এক মৃত জড়পিণ্ডে পরিণত হইবে। আমাদের শাস্ত্রে যে প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের কথা আছে, তাহার মূলেও এই ধারণা। কিন্তু প্রত্যেক জীব স্বতন্ত্র শক্তির

ক্ষেত্র এবং সৃষ্টি করিতে সমর্থ। জড়ের নিয়তি ও তাহার নিয়তি এক হইবার কথা নয়। যে ব্যক্তিত্বকে জড়ের সঙ্গে এক শ্রেণীতে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে একই পরিণামের অধীন বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর পদার্থ আমাদের জানা নাই। তাহা সান্ত ও ক্ষুদ্র হইলেও, অনন্ত চিৎ হইতে ভিন্ন, সান্ত জ্ঞান জ্ঞানও ভ্রান্তির সমবায়, অনন্ত জ্ঞানে ভ্রান্তির অবকাশ নাই। ভ্রান্তিসংবলিত জ্ঞান ও ভ্রান্তিমুক্ত জ্ঞান, উভয়েই জ্ঞানশব্দবাচ্য হইলেও বিভিন্ন। সান্ত জ্ঞানের প্রত্যেক অংশই অপূর্ণ, ভ্রান্তি বিজড়িত। অনন্তজ্ঞানের প্রত্যেক অংশই পূর্ণ ও ভ্রান্তিহীন ও নির্মল। সুতরাং সান্ত জ্ঞানকে অনন্ত জ্ঞানের অংশ বলা চলে না। স্বতন্ত্র ইচ্ছাও সৃজনশক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই যে সান্ত জ্ঞান জীবরূপে প্রকাশিত, তাহা অনন্তের অন্তর্ভূত হইলেও, অনন্ত হইতে বিভিন্ন। অনন্তেরই মত ইহা কালাতীত। বিশেষ বিশেষ ঘটনা দ্বারা তাহার স্থায়িত্ব প্রভাবিত হয় না। সুতরাং মৃত্যুতে তাহার বিনাশেরও কারণ নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আমাদের স্বকীয় অনুভূতি হইতে জীবাত্মার ধারণার উৎপত্তি হয়। আমাদের যাবতীয় অনুভূতির পশ্চাতে যে একত্বের অনুভূতি আছে, যে তত্ত্ব যাবতীয় অনুভূতির একত্ব বিধান করে, "আমারই অনুভূতি" বলিয়া যে তত্ত্ব পৃথক পৃথক অনুভূতির মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠা করে, সেই তত্ত্বই আত্মা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞেয়ের অবর্ত্তমানে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মৃত্যুতে বিলুপ্ত হয়। জ্ঞানের বিলোপের সঙ্গে জীবাত্মার বিলোপ আমরা কল্পনা কেন করিব না, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাতে জ্ঞানের বিলোপ হইলেও জ্ঞানের শক্যতা (possibility) বর্ত্তমান থাকে সত্য, কিন্তু সেই শক্যতার পুনরায় বাস্তবরূপে প্রকাশের প্রমাণ না পাইলে, তাহার স্থায়ী অস্তিত্ব অনুমান সম্ভব হয় না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার পরেও যদি জ্ঞাতার অস্তিত্ব মানিতে হয়, তাহা হইলে বিচ্ছেদকালের একটা সীমারেখা কল্পনা করিতে হয়, সে সীমা অতিক্রান্ত হইলে জ্ঞাতার বিনাশ মানিতে হইবে। এ কথা সত্য, কিন্তু উক্ত সীমারেখা খুব নিকটস্থ নয়, এবং সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাতে সে রেখা অতিক্রান্ত তো হয়ই না, পরন্তু মৃত্যুতে বাহ্যিক প্রমাণের অভাব হইলেও লোক-চক্ষুর অন্তরালে যে জ্ঞাতা—জ্ঞেয়ের সংযোগ সাধিত এবং তাহার ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহা বলা যায় না।

প্রত্যেক বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে "আমি জানিতেছি" এই বোধটা জড়িত থাকে ইহা সত্য। কিন্তু বিষয়-জ্ঞান যখন থাকে না, (যেমন মূর্চ্ছায় ও সুষুপ্তিতে) তখন "আমি বিষয় জানিতেছি" এ বোধ না থাকিলেও, আত্মার স্বরূপের একটা উপলব্ধি হয়, একথা অনেকে বলিয়া থাকেন। "যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি" (শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৬।২০) ইহা সেই অবস্থারই কথা। কিন্তু আমরা সাধারণ লোক, সে অবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। জ্ঞাতার সেই অবস্থা কালাতীত। আমরা যাহাকে 'জ্ঞান' বলি তাহা কালাবচ্ছিন্ন। কোনও জীব-শরীরে যখন জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন জীবাত্মার বাহ্যপ্রকাশ আমরা জানিতে পারি। কিন্তু বাহ্যপ্রকাশ না থাকিলেও জ্ঞাতার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। যাহা কালাতীত, তাহার সম্বন্ধে উৎপত্তি, বিনাশ প্রভৃতি কালবাচক শব্দের প্রয়োগ করা যায় না।

আর কত দিন ?

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

(গ্রহ নক্ষত্র কী বলে ?)

সকলের মুখে ঐ একই কথা। মানুষ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। পেটে অন্ন নেই, আচ্ছাদনের বস্ত্র নেই, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। তার সহ্য সীমা অতিক্রম ক'রে চলেছে।

চিন্তাশীল যাঁরা, তাঁরা পৃথিবীব্যাপী এই অশান্ত আলোড়নের মূল অনুসন্ধান করতে চাইছেন এবং নানাজনে নানা রকমের ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন। কিন্তু কোন কিছুই কাজে লাগছে না। সারা জগতে দুর্ভিক্ষ, হানাহানি, দ্বন্দ্বহিংসার অরাজক রাজত্ব। কর্ম্মের স্থিরতা নেই, উপার্জনের নিশ্চয়তা নেই, জীবন পর্য্যন্ত অনিশ্চিত। অধিকাংশ লোকের প্রত্যেক দিন কাটছে বিভীষিকাপূর্ণ একটা দুঃস্বপ্নের মত।

আমার কাছেও মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন আসছে অসংখ্য—"আর কত দিন ? গ্রহ নক্ষত্র কী বলে ?"

ফলিত জ্যোতিষের দিক দিয়ে এর উত্তর যতদূর সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করব। আমার মনে হয়, ফলিত জ্যোতিষের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে, জগৎ-জোড়া এই অস্থিরতার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারব।

আজ যে এই জগদ্ব্যাপী দুর্দ্দশা আমাদের পীড়িত করছে—ফলিত জ্যোতিষের যাঁরা চর্চ্চা করেন তাঁরা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে, এটা একটা আগন্তুক ব্যাপার নয়। সন ১৩৪৭ ইংরাজি ১৯৪০-৪১ সালের গ্রহের সমাবেশই হচ্ছে এর মূল কারণ। এই বর্ষে যে একটি বিচিত্র সমাবেশ হয়েছিল তারই ফলে আজ পৃথিবীর বুকে এই অশান্ত তাণ্ডব চলেছে।

সন ১৩৪৭ (ইং ১৯৪০।৪১) সালে শনি ও বৃহস্পতির সংযোগ হয়েছিল তিনবার। ১ম ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট) ২য় ৩০শে কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর), ৩য় ৩রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী)। দুটি গ্রহের একত্র সংযোগকে জ্যোতিষের পরিভাষায় গ্রহযুদ্ধ বলে। শনি বৃহস্পতির

সংযোগ প্রায় ২০ বৎসর অন্তর হ'য়ে থাকে। কিন্তু এ সংযোগটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, একই রাশিতে এই দুটি গ্রহের তিন তিনবার সংযোগ হ'য়েছিল—যা গত তিন চার হাজার বৎসরের মধ্যে হয় নি। শনি বৃহস্পতির মধ্যে গ্রহযুদ্ধ কম বেশী গুরুত্বপূর্ণ ফল সূচনা করে, যেহেতু দুটিই মন্দগামী গ্রহ। এক্ষেত্রে মেষ রাশিতে এই সংযোগ হওয়ায় এবং এই তিনবারের সংযোগের মধ্যে দুটি গ্রহই বক্রী হওয়ায় এই প্রভাবের ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী হয়েছে। বস্তুতঃ শনি ও বৃহস্পতি যতদিন না আবার সংযুক্ত হয়, ততদিন এই প্রভাবের ফল পৃথিবীর উপর অভিব্যক্ত হবে। এদের আবার সংযোগ হবে সন ১৩৬৭ (ইং ১৯৬১) সালের মাঘ মাসে মকর রাশিতে। সুতরাং ঐ ১৩৬৭ সাল পর্য্যন্ত এই প্রভাব চলবে।

পাঠক চমকে উঠবেন না। প্রভাব থাকবে বটে, কিন্তু আজকার মত অবস্থাই যে অতদিন সমানে চলবে তা নয়। এই প্রভাব কুড়ি বৎসর থাকবে, কিন্তু প্রথম দশ বৎসর হচ্ছে তার জোয়ারের মুখ এবং শেষের দশ বৎসর ভাটার টান। প্রভাবটির আসল মর্ম্ম বুঝতে পারলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে।

বৃহস্পতি ও শনির একরাশিতে সংযোগের ফলে এই দুটি গ্রহের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হচ্ছে, তার অর্থ কী? তার অর্থ এই দুটি গ্রহের বা ভাবধারা সেই ভাবধারা দুটির মধ্যে সংঘাত বা সংঘর্ষ। এখন দেখা যাক্, এই ভাবধারা বৃহস্পতির বা কী, শনিরই বা কী।

(২)

যাঁরা আমার লেখা "ফলিত জ্যোতিষের মূল সূত্র" গ্রন্থে গ্রহের স্বরূপগুলি পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে, বৃহস্পতি পূর্ণ স্বাধীনতা সূচনা করে এবং শনি নির্দ্দেশ করে পরিপূর্ণ বন্ধন। তা ছাড়া বৃহস্পতি বিশ্বমানবতার পোষক, শনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। বৃহস্পতি জ্ঞানী গুরু, শনি জড়বাদী ভৃত্য ; ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং শনি ও বৃহস্পতির এই দ্বন্দ্বের আসল মর্ম হচ্ছে স্বাধীনতার সঙ্গে বন্ধনের সংঘর্ষ, ব্যক্তিত্ব-বাদের সঙ্গে বিশ্বমানবতার দ্বন্দ্ব, আদর্শবাদের সঙ্গে জড়বাদের সংঘাত। এবং এই দুই ভাবধারার দ্বন্দ্ব নানা ক্ষেত্রে নানারূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। এ যেন দেবাসুরে দ্বন্দ্ব—দেবতারা সেই একই, অসুর কিন্তু নানা বেশ ধারণ ক'রে তাদের পীড়ন করছে। কোথাও বা মধুকৈটভ, কোথাও বা মহিষাসুর, কোথাও বা শুম্ভ—নিশুম্ভ। এখানেও জ্ঞানী দেবগুরুর (বৃহস্পতির) আদর্শ সেই একই আছে—তাঁর বিশ্বমানবতা, স্বাধীনতা, নিঃস্বার্থ সহযোগিতার ধারণা মোটেই বদলায় নি ; শনির স্বার্থপর জড়বাদ নানা আকার নিয়ে বৃহস্পতির আদর্শকে ব্যাহত করতে চাইছে। কোথাও বা ফ্যাসিজ্‌ম্‌ বা একনায়কত্ব, কোথাও বা ক্যাপিট্যালিজিম্‌ বা পুঁজিবাদ, কোথাও বা ইম্পিরিয়্যালিজ্‌ম্‌ বা সাম্রাজ্যবাদ, কোথাও বা জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি বা ধর্ম্ম ভেদে সাম্প্রদায়িকতা, ইত্যাদি কত রকমের রূপ নিয়ে যে বদ্ধ জড়বাদ স্বাধীন আদর্শ বাদকে নিপীড়িত করছে তার সীমা নেই।

এইখানে একটা কথা বিবেচনা করা দরকার। বৃহস্পতি স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ সূচনা করে এবং শনি চায় সব বিষয়ে ধরা-বাঁধা নিয়মের বাঁধন। কিন্তু এই পৃথিবীর মানুষ ও তার সমাজের গঠন এমনি যে, অবাধ স্বাধীনতা বা গতিরহিত বন্ধন এ দুয়ের কোনটারই স্থান তার মধ্যে নেই। সংবদ্ধ জড়তাও তার যেমন অসহ্য, একেবারে বন্ধন-মুক্ত স্বাধীনতাও তেমনি তাকে পীড়া দেয়। ঠিক যেমন হাওয়ার অভাবে তার দম বন্ধ হ'য়ে আসে আবার প্রচণ্ড ঝড়ে সে হাঁপিয়ে ওঠে। সে চায় খানিকটা স্বাধীনতা এবং খানিকটা বন্ধন। স্বাধীন আত্মা যখন দেহের মধ্য দিয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত করতে চান, তখন যেমন তাঁকে কম বেশী দেহের অধীনতা স্বীকার করতে হয়, তেমনি স্বাধীন ব্যক্তি যখন সমাজ আশ্রয় করে, তখন সমাজের সংহতি রক্ষা করার জন্ত তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খানিকটা খর্ব করা ছাড়া উপায় থাকে না। সমাজে বা রাষ্ট্রে যখন স্বাধীনতা ও বন্ধনের মধ্যে সহযোগিতা হয় যখন তাদের সঙ্গত ও সমঞ্জস অভিব্যক্তি দেখা যায়, তখন সমাজ বা রাষ্ট্র সার্থক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এই দুয়ের সংঘর্ষ যেখানে, সেখানে অশান্তি ও বিপ্লবে সমাজ-সংহতি ভেঙে পড়ে।

বর্ত্তমান সময়ে বৃহস্পতি শনির মধ্যে সহযোগিতার বদলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে এবং তারই ফলে সর্বত্র সমাজ ও রাষ্ট্রের সংহতি ভেঙে পড়ছে। বৃহস্পতি চাইছে সবরকমের বাঁধনকে চূর্ণ করতে এবং শনি চাইছে স্বাধীনতার ক্ষুদ্রতম অভিব্যক্তিকেও অস্বীকার করতে। তাতে দাঁড়াচ্ছে এই যে সাধারণ ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন রীতি, নীতি বা শৃঙ্খলা মানতে চাইছে না, ভাল মন্দ সব শ্রেণীর নিয়ম বা আইন চূর্ণ করতে চাইছে, সে মনে করছে স্বেচ্ছাচারই স্বাধীনতা। অপর দিকে সমাজ বা রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা—তাঁরা শনির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে নূতন নূতন বিধানের কঠিনতর নিগড় দিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চাইছেন। তাঁরা মনে করছেন, এই দিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের সংহতি অটুট থাকবে। তাতে ক'রে উভয় পক্ষে দ্বন্দ্ব ও হানাহানি বেড়েই চলেছে।

(৩)

মেষ রাশি উত্তেজনার রাশি। মেষ রাশিতে এই সংযোগ হওয়াতে উভয় পক্ষই একটা উত্তেজনায় ভেসে চলেছে, শান্ত সুবিবেচনার পরিচয় কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

শনি ও বৃহস্পতির এই দ্বন্দ্বের আর একটা বড় ফল হচ্ছে এই যে, এতে সব সমাজের আর্থিক অবস্থা এক বড় ধাক্কা খাবে এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভিত্তি ন'ড়ে উঠবে। উৎপাদনের সঙ্গে বিনিময়ের বা বণ্টনের সামঞ্জস্য থাকবে না, কোথাও বা অর্থ পুঞ্জীকৃত হ'য়ে ব্যবহারের ক্ষেত্র খুঁজে পাবে না—আবার কোথাও বা অর্থের দারুণ অভাবে সব রকমের কর্ম প্রচেষ্টা পঙ্গু হ'য়ে যাবে। সুতরাং সর্বত্র অর্থনৈতিক ভার-সাম্য রক্ষার জন্ত একটা প্রবল আন্দোলন ও দ্বন্দ্ব চলবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এটা যেমন প্রকট হবে, প্রত্যেক দেশের জনগণের মধ্যেও তেমনি তার অভিব্যক্তি দেখা যাবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর ফলে অনেক দেশেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে এবং প্রত্যেক দেশের কয়েকজন

পুঁজিপতির হাতে অর্থ পুঞ্জীকৃত হ'য়ে জনগণ দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করবে। এর প্রতিক্রিয়ায় ধনসাম্যের জন্য বিপ্লবাত্মক আন্দোলন যেমন মাথা খাড়া করবে, তেমনি তা দমন করবার জন্য পুঁজিপতিদের দিক থেকে উদ্যোগ আয়োজনেরও অন্ত থাকবে না। কিন্তু পুঁজিবাদ বা ধন-সাম্যবাদের কোনটাই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না যতদিন না বৃহস্পতি শনির এই দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

এই বিশৃঙ্খল উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব প্রথম দশ বৎসর অর্থাৎ বাংলা ১৩৫৭ (ইং ১৯৫০) সাল পর্যন্ত ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এবং এর মধ্যে কোন রকম রফা বা আপোষের চেষ্টা সফল হ'বে না। পৃথিবীতে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন চলবে, তেমনি দেশের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব ও বিরোধে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হ'য়ে উঠবে। এর মধ্যে দেশেই হোক্ আর পৃথিবীতেই হোক্, কোন রকমের স্বাচ্ছন্দ্য বা শৃঙ্খলা নিয়ে আসা কঠিন হবে।

মেষ রাশিতে শনি বৃহস্পতির এই তিনবার সংযোগের শেষটিতে বৃহস্পতির শর উত্তরবর্তী (North latitude) হওয়ায় এবং তা রবি-মার্গের অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ায় এই গ্রহযুদ্ধে বৃহস্পতির জয় সূচিত হয়। সুতরাং আশা করা যায় যে, এখনকার অশান্ত অবস্থা যখন শান্ত হ'য়ে আসবে তখন পৃথিবীর জন সমাজ অধিকতর স্বাধীনতা পাবে এবং সর্বত্র মানুষ বিশ্বমানবতার দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু ১৩৫৭ (ইং ১৯৫০) সাল পর্যন্ত একটা ওলট পালটের বিষম দুর্ভোগ মানুষকে সর্বত্র ভোগ করতে হ'বে।

গো-রক্ষা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতে গো-রক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এমন অনেক কার্য্য করিয়াছেন যাহাতে প্রজাদের মনে কষ্ট হইয়াছে এবং আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। গোবধ এইরূপ একটি কার্য্য। হিন্দুগণ গোজাতির পূজা করে, গোবধ হইলে, গোমাংস বিক্রয় হইলে হিন্দুদের ধর্ম্মভাবের উপর নিদারুণ আঘাত হয়। সুতরাং হিন্দু-প্রধান ভারতবর্ষে কখনই গোহত্যা হইতে দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে মুসলমানদের ধর্ম্মসংক্রান্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় না। কারণ কোরাণে এরূপ আদেশ নাই যে বকরীদ উপলক্ষে বিশেষ করিয়া গরুই কাটিতে হইবে। অন্য কোনও প্রাণী বধ করিয়াও বকরীদ করা যায়। এই সকল কারণে বাবর, আকবর প্রভৃতি বুদ্ধিমান বাদশাহগণ গোবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আফগানিস্তানের আমির যখন ভারতে আসিয়াছিলেন এবং তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গোবধ করা হইবে, তখন তিনি তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক ব্যবস্থার দুইটি দিক আছে—একটি ইহলোকের মঙ্গল, আর একটি পরলোকের কল্যাণ। গো-সেবাও সেইরূপ একটি নিয়ম। গো-সেবা করিলে পরলোকে পুণ্য সঞ্চয় করা যায়। আবার ইহলোকেও প্রভূত মঙ্গল হয়। কারণ গোজাতির ন্যায় মানবের হিতকারী জন্তু নাই। দুধ ও ঘি অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। শিশু, রোগী ও বৃদ্ধের পক্ষে দুধ অপরিহার্য্য। সুতরাং গোবধ নিষিদ্ধ হইলে, দুধ ও ঘি প্রচুর হইলে, তাহাতে হিন্দুর যেমন কল্যাণ হইবে, মুসলমানেরও সেইরূপ কল্যাণ হইবে। Sir John Woodroffe যখন গো-রক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন তখন যুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানজাতির কল্যাণের জন্য গো-রক্ষা বেশী প্রয়োজন, কারণ মুসলমানদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বেশী; মুসলমান শিশুদিগকে বেশী দুধ দিতে পারিলে তাহাদের অনেকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিতে পারে। চাষের জন্য বলদ অতি প্রয়োজনীয়, গোবর ও গোমূত্র জমির অতি উৎকৃষ্ট সার, বলদ সুলভ হইলে গোবর ও গোমূত্র প্রচুর উৎপন্ন হইলে হিন্দু চাষীর যেরূপ উপকার হইবে, মুসলমান চাষীরও সেইরূপ উপকার হইবে। সুতরাং ইহা মনে করা ভুল যে গো-রক্ষা আন্দোলন মুসলমান সমাজের অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

সম্প্রতি অনেকগুলি প্রকাশ্য সভায় গোবধ নিষেধ করা হউক এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড—তাহাদের মধ্যে কলিকাতা করপোরেশন এবং বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির নাম উল্লেখযোগ্য—ঐ মর্ম্মে মত প্রকাশ করিয়াছে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক যখন হিন্দু, তখন রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকের যে এইরূপ মত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশে গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং দেশের অধিকাংশ লোকের মত অনুসারে আইন প্রণয়ন করা উচিত। ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন হিন্দুরা বাধ্য হইয়া গোহত্যা হইতে দিয়াছে। এক্ষণে স্বাধীন ভারতে হিন্দুগণ আশা করে যে এইরূপ কার্য্যে যখন তাহাদের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগে তখন ইহা নিষেধ করা হইবে। বাঙ্গলা দেশ অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। এ বিষয়েও আইন করিয়া যদি পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পথ প্রদর্শন করে তাহা হইলে বিশেষ সুখের বিষয় হয়।

খাদ্যশস্যনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্ট
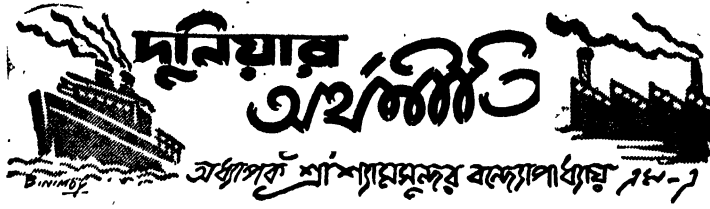
১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতিসাধন সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ভারতসরকার স্যার থিয়োডোর গ্রেগরীর নেতৃত্বে একটি খাদ্য কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে সরকারকে বিদেশ হইতে যথাসম্ভব খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া ও দেশে খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইয়া সব সময় অন্ততঃ ১০ লক্ষ টন খাদ্য হাতে মজুত রাখিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। গ্রেগরী-কমিটির পরামর্শ অবশ্যই মূল্যবান ছিল, কিন্তু সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ কিছুই হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ভারত সরকারের হাতে মজুত খাদ্যের পরিমাণ একলক্ষ টনও ছিল না। যুদ্ধ শেষ হইবার পর নানা কারণে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি আবার শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং এই অবনতি সহজে দূর হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। কিছুদিন অবস্থা লক্ষ্য করিবার পর ভারত সরকার নিরুপায় হইয়া অবশেষে এদেশের খাদ্যনীতি নির্দ্ধারণ সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য নূতন একটি জনপ্রিয় কমিটি গঠনে বাধ্য হন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই কমিটি গঠিত হয় এবং ইহার সভাপতি মনোনীত হন বিখ্যাত শিল্পনায়ক স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস। কমিটির সদস্য মনোনীত হন শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা, স্যার শ্রীরাম, ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া, ঠাকুর দীপনারায়ণ সিং, মিঃ হুসেন ইমাম, ডাঃ ভি কে আর ভি রাও, মিঃ ডি এন মেটা ও মিঃ আর এ গোপালস্বামী। ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে কি কি বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে, খাদ্যাভাব দূর করিতে হইলে এদেশের উৎপন্ন শস্য ছাড়া বাহির হইতে কি পরিমাণ খাদ্য আমদানী করিতে হইবে, সরকারী খাদ্যনীতি কোন পথে পরিচালিত হইলে দেশবাসীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর হইবে, এই সব ছিল কমিটির বিবেচ্য বিষয়। সম্প্রতি কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন এবং ইহাতে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করিয়া খাদ্যের দিক হইতে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার অনেকগুলি মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতে কৃষির উন্নতিসাধনের বিপুল সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও অতীতে এই উন্নতিসাধন সম্ভব হয় নাই। বলা নিষ্প্রয়োজন, এজন্য এদেশের আর্থিক স্বার্থরক্ষায় বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের উদাসীনতাই সবচেয়ে বেশী দায়ী। কৃষিজীবী ভারতে কৃষির উন্নতিসাধনের অর্থ জনসাধারণের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি—এই সহজ সত্যটি বিদেশী শাসনকর্তৃপক্ষ যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জাতীয় সরকারের পক্ষে অবশ্য এধরণের উদাসীনতা দেখানো অসম্ভব। এই জন্যই ভারতে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধানের জন্য জাতীয় সরকারের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

ভারতসরকার এখন নিশ্চিতভাবে বিনিয়ন্ত্রণনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অস্বাভাবিকও নয়। তিন বৎসর হইতে চলিল যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চিরকাল চালু থাকিতে পারে না। অথচ দেশকে খাদ্যের দিক হইতে স্বাবলম্বী না করিয়া বিনিয়ন্ত্রণনীতি সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইলে যোগান ও চাহিদার অসামঞ্জস্য ঘটিয়া খাদ্যাদির মূল্যরেখা সাধারণ দেশবাসীর আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং ফলে সারা দেশে ১৩৫০ সালের পুনরাবৃত্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে খাদ্যাদি বিনিয়ন্ত্রণের ঠিক আগে খাদ্যশস্য নীতি-নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে বলা চলে। নানা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারতে ইতিপূর্ব্বে বহু কমিটি-কমিশন বসিয়াছে, এই সব কমিটি মূল্যবান পরামর্শও দিয়াছেন অনেক, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক প্রাক্তন ভারতসরকারের আমলে এই সব অমূল্য পরামর্শ সমন্বিত রিপোর্ট শেষ পর্য্যন্ত রেকর্ডরুমে বস্তাচাপা পড়িয়াছে, সেগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই হয় নাই। এই চেষ্টা যদি সত্যই হইত, তাহা হইলে এতদিন আর্থিক ভারতের কাঠামোই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। আশা করা যায়, অতঃপর জাতীয় সরকারের আমলে আলোচ্য রিপোর্টের পরিণতি এইরূপ শোচনীয় হইবে না।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর সরকারী পরিচালনাধীনে ভারতে অধিকতর খাদ্য ফলাইবার একটি আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় আন্দোলনটি বলিতে গেলে সংবাদপত্রে আর সহরের বক্তৃতামঞ্চে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ—এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে 'অধিকতর খাদ্য ফলাও' আন্দোলন যে আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই একথা খাদ্যশস্যনীতি নির্দ্ধারণ কমিটিও স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর খাদ্যশস্যের জমি বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি জমিতে বাড়তি ফসল উৎপাদন যাহাতে আনুপাতিক হারে হয় সরকারকে সেদিকে নজর দিতে হইবে। 'ফসল ফলাও' আন্দোলনের দায়িত্ব বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই সর্ব্বাধিক, যাহারা জমি চাষ করে বা যে সব জমি কর্ষিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সব খবর রাখা সম্ভব নয়। ভারতে সমবায় আন্দোলন পরিচালনায় ভারও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল বলিয়া এই আন্দোলন সে সময় লক্ষণীয় সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। 'অধিকতর ফসল ফলাও

আন্দোলনে খাদ্যশস্যের অনুকূলে পাট ও কার্পাস জমির পরিমাণ হ্রাস করিয়া খাদ্যশস্যের জমি বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলও সন্তোষজনক হয় নাই বলিয়া অনেকে উপরিউক্ত দুইটি অর্থকরী ফসলের জমি কমাইবার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। কমিটি এই অভিযোগের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন বটে, তবে এই প্রসঙ্গে তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, পাট ও কার্পাসের জমি হ্রাসের অনুপাতে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে নাই একথা সত্য হইলেও এই নীতি বর্ত্তমানে সরাসরি বাতিল করা সঙ্গত হইবে না। সমগ্রভাবে দেশে অধিকতর ফসল ফলাইবার ব্যবস্থা যখন দেশীয় রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারের মারফৎ করিতে হইবে, তখন এ সম্বন্ধেও যে কোন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের একা গ্রহণ করা উচিত নয়। এ বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করিয়া নীতি নির্দ্ধারণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। মোটের উপর কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এদেশের বর্ত্তমান খাদ্য-উৎপাদন-নীতি একান্ত ত্রুটিপূর্ণ, ভারতবর্ষকে খাদ্যের দিক হইতে স্বাবলম্বী করিতে হইলে এই নীতির আমূল পরিবর্ত্তন না করিয়া উপায় নাই।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে বৎসরে এক কোটি টন হিসাবে বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, কমিটি সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছেন। আমাদেরও ধারণা, বৎসরে এককোটি টন খাদ্যশস্য বাড়াইবার যে সুপারিশ খাদ্যশস্যনীতি নির্দ্ধারক কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে করিয়াছেন, বর্ত্তমান অভাব-অসুবিধার হিসাবে তাহা নিম্নতম। বাৎসরিক এককোটি টন খাদ্যশস্য আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাড়াইবার কথা বলা হইয়াছে; তবে ঠিক পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যে এই লক্ষ্যে পৌঁছান যাইবে, এমন কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। ভারতে বৎসরে গড়পড়তা ৪৫ লক্ষ লোক বাড়িতেছে, কাজেই লক্ষ্য হিসাবে উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যবর্ত্তী সময়ে বহু লক্ষ লোকবৃদ্ধি হইয়া ভারতে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বাড়িয়া যাইবে। ভারতের কতকগুলি অঞ্চলে খাদ্যাভাব চিরস্থায়ী। বর্ত্তমানেই ভারতে বাৎসরিক ঘাটতির পরিমাণ ৪০ লক্ষ টনের বেশী। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী ভারতসরকারের তৎকালীন খাদ্যসদস্য ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের একটি খাদ্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিসাব করিয়া বলেন যে, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ঘাটতির পরিমাণ অন্ততঃ ৭০ লক্ষ টন হইবে। খাদ্যশস্যনীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ঠিক মত কাজ হইলেও লক্ষ্যে পৌঁছাইতে অন্ততঃ ১৯৫৩।৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইবে, কাজেই এ সময় ভারতে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৭০ লক্ষ টনের বেশী না হইয়া পারে না। সুতরাং কমিটি যে বৎসরে এককোটি টন খাদ্য-শস্য বাড়াইবার সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা প্রয়োজনের হিসাবে অত্যধিক বলা যায় না।

আগেই বলা হইয়াছে কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যসমূহ ও প্রদেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ সাধনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সকলের সমবেত চেষ্টা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ছাড়া ভারতের সুতীব্র খাদ্যাভাব দূরীকরণের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এই অর্থ ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কৃষি উন্নয়নের উপযোগী জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারীদের মধ্যে সেগুলি প্রয়োজনানুযায়ী বণ্টন করিতে হইবে। সমগ্র দেশে খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য কমিটি একটি কেন্দ্রীয় কৃষি উন্নয়ন পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদকে প্রকৃত অবস্থা জানাইবার ও প্রাদেশিক কার্য্যাবলী সুনিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক কৃষি পরিষদ স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি কর্ষণযোগ্য পতিত জমী সংগ্রহের উপর বিশেষ-ভাবে জোর দিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন যে, উপরিউক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলি পতিত জমীতে চাষ আবাদ দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কর্ষণযোগ্য জমি যাহাতে বেকার পড়িয়া না থাকে, তজ্জন্য কমিটি পতিত জমি পুনরুদ্ধারের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ৫০ কোটি টাকা মূলধন যোগাইবার সুপারিশ করিয়াছেন।

তিনটি বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদন বাড়াইয়া খাদ্যশস্য নীতিনির্দ্ধারক কমিটি এদেশে আগামী পাঁচ বৎসরে বাৎসরিক মোট এক কোটি টন খাদ্যশস্য বাড়াইবার আশা করিয়াছেন। এই তিনটি উপায়ের প্রথম হইল সরকার বর্ত্তমানে কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে নদনদীর সংস্কারাদি বহুবিধ উদ্দেশ্যমূলক (Multipurpose Projects) যে ২৫টি পরিকল্পনা করিয়াছেন সেগুলি যথাসম্ভব কার্য্যকরী করা। এইভাবে ১ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং বৎসরে ৪০ লক্ষ টন বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে দেশীয় রাজ্যগুলিতে শস্যোৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে অধিকতর উৎকর্ষতার সহিত চাষ আবাদ করা (Intensive cultivation)। ইহাতে বৎসরে ৩০ লক্ষ টন বাড়তি উৎপাদন হইবে বলিয়া কমিটি আশা করিয়াছেন। কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় উপায় হইল পতিত জমি সংগ্রহ করিয়া সেগুলি সংস্কারান্তে চাষ করা। এইজন্যই ৫০ কোটি টাকা মূলধনে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ৬ কোটি ৫২ লক্ষ একর (পাকিস্তানে ইহা ২ কোটি ৯০ লক্ষ একরের মত)। কমিটি আশা করিয়াছেন, পতিত জমি সংগ্রহ করিয়া আশানুরূপ চাষ আবাদ হইলে বৎসরে অন্ততঃ ৩০ লক্ষ টন বাড়তি খাদ্যশস্য অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

ভারতের চাষের জমি খারাপ নয়, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার জন্যই এদেশের ফসল উৎপাদনের হার অত্যন্ত কম। জাপানী চাষীরা ভারতের এক দশমাংশ জমিতে চাষ করিয়া এক তৃতীয়াংশ ফসল

উৎপাদন করে। ভারতবর্ষে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক নীতিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা হইলে শস্যোৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। দামোদর কোশী প্রভৃতি পরিকল্পনায় প্রায় দু কোটি একর জমিতে জলসেচের সুবিধা হইবে, বিহারের সিন্দ্রিতে রাসায়নিক সার এ্যামোনিয়াম সালফেটের যে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চালাইতে প্রভূত সাহায্য করিবে। সুতরাং সবদিক হইতে বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হইলে ভারতে বৎসরে এককোটি টন খাদ্যশস্য বাড়ান অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এদেশের কৃষিশিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির যে সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই বিরাট সম্ভাবনাময় দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনেককিছু আশা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এতকাল ভারতসরকার ভারতের কৃষি উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন আগ্রহই দেখান নাই। যখন কৃষি উন্নয়নের জন্য বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ৮ টাকা, ক্যানাডায় ২০ টাকা ও ব্রিটেনে ২ টাকা সরকারী তহবিল হইতে খরচ করা হয়, তখন ভারতে এজন্য খরচ হয় মাথাপিছু মাত্র ১ আনা।

কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি যতদিন না কার্য্যকরী হয়, ততদিন খাদ্যনীতি নির্দ্ধারণ কমিটি ভারতসরকারকে বিদেশ হইতে যত বেশী সম্ভব খাদ্যশস্য আমদানী করিতে এবং অন্ততঃ ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য হাতে মজুত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আগেই বলা হইয়াছে, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তরের পর গ্রেগরী কমিটিও অনুরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ কিছুই হয় নাই। আমরা আশা করি খাদ্যনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশসমূহ কার্য্যকরী করিয়া এই নিরন্ন দেশকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে ভারতসরকার অতঃপর জাতীয় সরকারের উপযুক্ত নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইবেন।

নদ-নদীসংস্কার, সেচ-ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন

ভারতের অসংখ্য নদনদী সংস্কারের অভাবে দিন দিন মজিয়া যাইতেছে। এইভাবে নদী নষ্ট হইয়া যাইবার ফলে নদীতীরস্থ গ্রামগুলির সমৃদ্ধি লোপ পাইতেছে এবং ম্যালেরিয়াদি রোগের প্রকোপ বাড়িতেছে। নদীগুলি স্রোতস্বতী থাকিলে ব্যবসাবাণিজ্য ও যাতায়াতের সুবিধা হয় এবং তীরস্থ বহু জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। আশার কথা পল্লীভারতের স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি সম্প্রতি ভারতসরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাঁহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে সম্ভাবনাসম্পন্ন নদীগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেছেন। এইভাবে নদনদী সংস্কার হইলে শুধু যে কৃষি, বাণিজ্য বা যাতায়াতের সুবিধা হইবে তাহা নয়, সেই সঙ্গে অনেক নদীর জলধারা বাঁধে আটকাইবার ব্যবস্থা করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। এই জলবিদ্যুতের সাহায্যে গৃহাদি আলোকিত করা যাইবে এবং কলকারখানা চালান যাইবে। উৎপাদন ব্যয় সামান্য হইবে বলিয়া এবং সরকারী পরিচালনাধীনে ব্যক্তিগত মুনাফাভোগের প্রশ্ন থাকিবে না বলিয়া এই বৈদ্যুতিক শক্তি খুব সস্তায় বিতরণ করা সম্ভব হইবে। নদী হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া তদ্বারা কিরূপ সাফল্যজনকভাবে কলকারখানা চালান যায়, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহীশূরের কাবেরী নদীর উপর 'শিবসমুদ্রম' বাঁধ। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা ৭০ হাজার ভোল্ট গতিতে ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী কোলার স্বর্ণ খনিতে বিতরিত হইয়া খনি চালু রাখে। বর্ত্তমানে পাকিস্তান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের যে সব সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য :—

বাংলা—(১) দামোদর পরিকল্পনা, (২) মোর পরিকল্পনা,

বিহার—(১) কোশী পরিকল্পনা, (২) সিন্দ্রির রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানার সংলগ্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ;

উড়িষ্যা—(১) মহানদী পরিকল্পনা, (২) গঞ্জাম থারমাল পরিকল্পনা, (৩) মাচকুন্দ পরিকল্পনা, (৪) কটক থারমল পরিকল্পনা, (৫) সম্বলপুর থারমাল পরিকল্পনা ;

মধ্যপ্রদেশ—(১) নাগপুরের নিকট খাপানখেদা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ;

মাদ্রাজ—(১) পাইখারা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, (২) মোয়ার জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, (৩) পাপানাশম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্প্রসারণ, (৪) মেত্তুর পরিকল্পনার সম্প্রসারণ, (৫) মেচ্ছকুন্দ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, (৬) বেজওয়াদা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, (৭) নেলোর থারমাল পরিকল্পনা, (৮) পেরিকার্ড জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, (৯) তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা ;

যুক্তপ্রদেশ—(১) নায়ার বাঁধ, (২) মারদা খাল পরিকল্পনা, (৩) রিহান্দ বাঁধ, (৪) গিরি বাঁধ, (৫) মহম্মদপুর পরিকল্পনা ;

পাঞ্জাব—(১) রসুল জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, (২) মিয়ানওয়ালী জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, (৩) নঙ্গল জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, (৪) মঙ্গলা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, (৫) ভাক্রা বাঁধ জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা ;

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—(১) মালাকান্দ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্প্রসারণ ;

সিন্ধু—রোহরি খাল পরিকল্পনা।

ভারতের সম্ভাব্য জলশক্তির পরিমাণ ২ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোওয়াট বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে এই সম্ভাব্য শক্তির শতকরা মাত্র ৬ ভাগ কাজে লাগান সম্ভব হইয়াছে, বাকী শতকরা ৯৪ ভাগ নষ্ট হইতেছে। উপরিউক্ত সরকারী পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হইলে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের কৃষি এবং শিল্পের প্রভূত কল্যাণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নদনদী সংস্কার পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে সেচ ব্যবস্থা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাবে ভারতবর্ষ কিরূপ লাভবান হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি পরিকল্পনার হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পরিকল্পনা	সেচ ব্যবস্থা (একর হিসাবে)	জলশক্তি (কিলোওয়াট হিসাবে)
(১) দামোদর পরিকল্পনা (বাংলা)	৮০০০,০০০	৩,০০,০০০
(২) কোশী পরিকল্পনা (বিহার ও নেপাল)	৩০,০০,০০০	১০,০০,০০০
(৩) মহানদী পরিকল্পনা (উড়িষ্যা)	২৫,০০,০০০	২,০০,০০০
(৪) তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা (মাদ্রাজ)	৩,০০,০০০	১,২০,০০০
(৫) রিহান্দ বাঁধ (যুক্তপ্রদেশ)	—	—

৩০।৫।৪৮

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রংপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রফুল্ল চাকী ছিলেন ছাত্রদের নেতা এবং গুপ্ত-সমিতির সহিত তিনি ছিলেন গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। রংপুর জেলা স্কুলের তিনি ছাত্র ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকার অপরাধে জেলা স্কুল হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত হইতে হয় এবং অতঃপর তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

প্রফুল্লের পিতার নাম নীরদচন্দ্র চাকী এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। তাঁহাদের মূল বাস ছিল বগুড়া জেলায়। জাতিতে তাঁহারা কায়স্থ।

পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করিবার আয়োজনে ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ যখন রংপুরে যান, তখন প্রফুল্ল চাকীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। পরেশচন্দ্র মৌলিক এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত নামক অপর দুইজন সহপাঠীর সহিত ইহার কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং এখানকার গুপ্ত-সমিতিতে প্রবেশলাভ করেন। পরেশচন্দ্র ও নলিনীকান্ত পরবর্ত্তীকালে আলিপুর বোমার মামলায় জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৯০৬ সাল হইতে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যে সময়—সেই সময়ের মধ্যে প্রফুল্ল বহু বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে যোগদান করিয়াছিলেন। ফুলার-হত্যার উদ্যোগ-আয়োজন নেহাৎ সামান্য ব্যাপার ছিল না—তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের অভাব মিটাইবার জন্য রংপুর সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামে এক ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়। স্থির হইয়াছিল যে, নরেন্দ্র গোস্বামী, হেমচন্দ্র দাস, প্রফুল্ল চাকী ও পরেশচন্দ্র মৌলিক প্রভৃতি সেই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর ডাকাতি করা সম্ভব হয় নাই ; কারণ ঘটনাচক্রে সেখানকার থানার দারোগা ডাকাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতেই কার্য্যবশতঃ উক্ত গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। কাজেই ডাকাতির পরিকল্পনা ফাঁসিয়া গেল।

ফুলার সাহেবকেও বধ করা শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিল না। বিপ্লবীরা সংবাদ রাখিয়াছিল যে, ফুলার সাহেবের ট্রেণ রংপুর ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া যাইবে। তাহারা স্থির করিল, উক্ত ষ্টেসনেরই খানিকটা দূরে লাট সাহেবের ট্রেণ ধ্বংস করিয়া দিবে। তদনুযায়ী লাইনের নীচে ব্যাটারীযুক্ত বোমা স্থাপিত হইল। আয়োজনের কোনও ত্রুটি বিপ্লবীরা এক্ষেত্রে রাখে নাই। বোমা দৈবক্রমে না ফাটিলেও ফুলার সাহেব যাহাতে পরিত্রাণ না পান—তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। রিভলবার ও লাল লণ্ঠন লইয়া অপর একজন সঙ্গীসহ প্রফুল্ল ষ্টেসনের নিকট অপেক্ষা করিবেন বলিয়া ঠিক হয়। বোমা না ফাটিলে লাটসাহেবের ট্রেণখানি যদি নিরাপদে নির্দ্দিষ্টস্থল অতিক্রম করিয়া আসে, তাহা হইলে সে অবস্থায় প্রফুল্ল ষ্টেসনের নিকটে ট্রেণখানিকে লাল আলো দেখাইবেন। ইহাতে বিপদজ্ঞান করিয়া ট্রেণখানি যখন থামিয়া পড়িতে বাধ্য হইবে, তখন রিভলবার সহ ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করিয়া প্রফুল্লর পক্ষে ফুলার-হত্যা অসম্ভব হইবে না। ধুবড়ী হইতে লাট সাহেবের ট্রেণখানি রংপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেই যাহাতে খবর পাওয়া যায় সেইজন্য টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠাইবার নির্দ্দেশ দিয়া একজন বিপ্লবীকে পাঠান হইয়াছিল ধুবড়ীতে ; কিন্তু সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। রংপুর না গিয়া বিপ্লবীদের ফাঁকি দিয়া ফুলার সাহেব গোয়ালন্দ হইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং শীঘ্রই চলিয়া গেলেন বিলাতে। রংপুর-গোয়ালন্দ-কলিকাতায় পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও বিপ্লবীদিগকে ফুলার-হত্যায় নিরাশ হইতে হইল।

এইরূপে দেখা যায়, যে, তখনকার দিনের অনেকগুলি বড় বড় কাজে প্রফুল্ল উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারায়ণগড়ে অ্যানড্রু ফ্রেজারের ট্রেণ ধ্বংসের প্রচেষ্টায় এবং আরও কতকগুলি স্বদেশী ডাকাতিতেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এইভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়া প্রফুল্লের কর্ম্মকুশলতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছিল এবং বিশ্বাসী ও দক্ষব্যক্তি হিসাবে মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য বারীন্দ্রকুমারের দ্বারা তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের জন্ম হইয়াছিল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার মোহবনী গ্রামে (মতান্তরে মেদিনীপুর সহরের উত্তরস্থ হবিবপুরে)। তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ছিলেন নাড়াজোল রাজ-কাছারীর তহশীলদার। ক্ষুদিরামের জননীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার দুইটি ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ত্রৈলোক্যনাথের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না—ছিল কেবলমাত্র তিনটি কন্যা। ক্ষুদিরামের জন্মের পরই সেইজন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিয়া তাঁহাকে কিনিয়া লইয়াছিলেন—তাহার ফলে তাঁহার নাম হইয়াছিল ক্ষুদিরাম। শৈশবেই ক্ষুদিরাম পিতৃ-মাতৃহীন হইলে তাঁহার বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু লেখা-পড়ার অপেক্ষা খেলা-ধূলাতেই তাঁহার আগ্রহ ছিল অধিক। ক্ষুদিরামের ভগ্নীপতি অমৃতলাল রায় যখন জজকোর্টের হেডক্লার্করূপে মেদিনীপুরে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন সেখানে আসিয়া ক্ষুদিরামের বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত হইল।

একবার মেদিনীপুর পরিদর্শনকালে বাংলার ছোটলাট ক্ষুদিরামের ব্যায়াম কৌশল দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে উহার প্রতি আসক্ত হইয়া ১৯০৫ সাল হইতেই ক্ষুদিরাম বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। মেদিনীপুরের বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিখ্যাত অধিনায়ক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও হেমচন্দ্র দাসের সহিত তাঁহার পরিচয়

হইয়াছিল। তমলুকে ক্ষুদিরামের সহাধ্যায়ী পূর্ণচন্দ্র সেন পরবর্ত্তীকালে আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রনাথের বাটীর সংলগ্ন একটি স্থানে বিপ্লবীদের গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং ক্ষুদিরাম তাহার একজন সদস্য ছিলেন। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন আন্দোলনের সময় ক্ষুদিরাম অক্লান্তভাবে কার্য্য করিতেন। দোকান হইতে বলপূর্ব্বক বিদেশী বস্ত্র ছিনাইয়া আনিয়া তাহার দ্বারা বহ্ন্যুৎসব করিতেও তিনি দ্বিধা করিতেন না।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে ক্ষুদিরাম রাজদ্রোহাত্মক "সোনার বাঙলা" পুস্তিকা বিতরণ করেন। প্রবেশদ্বারে উক্ত পুস্তিকা বিতরণ করিবার সময় পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে পুলিশের উপর তিনি ঘুসি চালান। সেই সঙ্কটজনক সময়ে সহসা সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে হাজির হন।

সত্যেন্দ্র দেখিলেন যে, ব্যাপার বড় গুরুতর। তিনি ছিলেন সেই প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক এবং ডেপুটিবাবুর আদালতের একজন কেরাণী। পুলিশটি তাঁহাকে চিনিত। পুলিশের হাত হইতে ক্ষুদিরামকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ক্ষুদিরামকে ডেপুটিবাবুর পুত্র বলিয়া পুলিশের নিকট পরিচয় দেন এবং ইহার ফলে ভয় পাইয়া পুলিশটি ক্ষুদিরামকে ছাড়িয়া দেয়।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এই চাতুরী শীঘ্রই ধরা পড়িয়া গেল। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে তখন জারি হইল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং কিছুদিন লুকাইয়া থাকার পর তিনি ধরাও পড়িলেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন ধরিয়া মামলা চলিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবিয়া কর্তৃপক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। সত্যেন্দ্রনাথ কেরাণীগিরি চাকুরিটি হারাইলেন।

গুপ্ত-সমিতির টাকার অভাব দূর করিবার জন্য ক্ষুদিরামের দ্বারা একটি স্বদেশী ডাকাতিও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে পূজার সময় তিনি যখন হাটগেছ্যা গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে একদিন সন্ধ্যার সময় সেখানকার ডাকহরকরার মেলব্যাগ তিনি লুণ্ঠন করেন।

হেমচন্দ্র দাসের সহিত ক্ষুদিরামের পরিচয় হইয়াছিল অতিশয় অভিনব পরিস্থিতির মধ্যে। হেমচন্দ্র একবার মেদিনীপুরের কোনও পথ দিয়া সাইকেলে চাপিয়া যাইতেছিলেন। বালক ক্ষুদিরাম তখন তাঁহার নিকট একটি রিভলভার পাইবার প্রার্থনা জানান। দুইজনের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সুতরাং একটি ক্ষুদ্র বালকের এই আকস্মিক অদ্ভুত প্রার্থনায় তিনি বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। ক্ষুদিরামকে তিনি উহা চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষুদিরাম বলিলেন,—"আমি একটা সায়েব মারতে চাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ একবার ক্ষুদিরামকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"তুই দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পারবি?" ক্ষুদিরাম তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় জানাইয়াছিলেন—তিনি পারিবেন।

এই হেমচন্দ্র দাস এবং সত্যেন্দ্রনাথের সুপারিশে ক্ষুদিরাম মিঃ কিংসফোর্ডকে মারিবার জন্য প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মিঃ কিংসফোর্ড যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখনই একবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। একখানি মোটা বই-এর পাতা কাটিয়া মাঝখানে একটি গোল করিয়া গর্ত্ত করা হয় এবং সেই গর্ত্তের ভিতর একটি বোমা রাখিয়া পুস্তকের মলাট চাপা দেওয়া হয়। বইখানি উপহার পাঠান হয় কিংসফোর্ডকে। এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, যাহাতে বইখানি খুলিলেই বোমা বিস্ফোরিত হইত; কিন্তু বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দেওয়া কিংসফোর্ডের ললাটলিপি নহে। সেইজন্য ভাগ্যক্রমে তিনি বইখানি না খুলিয়াই আলমারিতে উহা রাখিয়া দিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল চাকী

তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার কোনও বন্ধু বোধ হয় তাঁহারই নিকট গৃহীত পুস্তক পাঠ সমাপনান্তে তাঁহার নিকট ফেরত পাঠাইয়াছেন—সেইজন্য উহা খুলিয়া দেখা আর তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আলিপুর বোমার মামলা চলিতে থাকার সময় বিপ্লবীদের এই গুপ্ত-চক্রান্তের বিষয় ফাঁস হইয়া যায় এবং মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডের আলমারি হইতে বোমাসহ বইখানি উদ্ধার করা হয়।

বারীন্দ্রকুমারের রচনা হইতে জানা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক এবং চারু দত্ত মহাশয়ের আদেশে মিঃ কিংসফোর্ডের হত্যার বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের মধ্যে পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা পরস্পরের আসল নামও অবগত

ছিলেন না। ক্ষুদিরাম ছদ্মনাম লইয়াছিলেন দুর্গাদাস সেন আর প্রফুল্ল চাকী নাম লইয়াছিলেন দীনেশচন্দ্র রায়। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে ঐ নামেই চিনিতেন।

৩২নং গোপীমোহন দত্তের লেনে হেমচন্দ্র দাস এবং উল্লাসকর দত্ত কাঠের হাতলযুক্ত একটি বোমা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বারীন্দ্রকুমার উক্ত বাটীতে প্রফুল্লকে লইয়া গিয়া ঐ বোমাটি একটি ব্যাগে রক্ষিত করিয়া প্রফুল্লকে উহা প্রদান করেন এবং তৎপরে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ৩৮।৫নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের বাটীতে লইয়া যান। হেমচন্দ্র দাস ও ক্ষুদিরামের সহিত সেখানে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকে আবশ্যক উপদেশ দান করিয়া সেখান হইতেই তাঁহাদিগকে পাঠান হয় সুদূর মজঃফরপুরে।

ক্ষুদিরাম বসু

তিনটি পিস্তল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। দৈবক্রমে বোমা নিষ্ফল হইলে তাঁহাদিগকে পিস্তল ব্যবহারের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের দুইজনকে বেশ কয়েকদিন মজঃফরপুরে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। সেখানে ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিবার সময় তাঁহাদের অর্থের প্রয়োজন হয় এবং কলিকাতা হইতে মনি অর্ডারে ২০৲ আনাইয়া লন। কিংসফোর্ডের গতিবিধির উপর তাঁহারা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। কিংসফোর্ড সাধারণতঃ রাত্রি আটটার সময় প্রতিদিন ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়া ক্লাব হইতে আপনার বাস-ভবনে ফিরিতেন; সুতরাং ঐ সময়েই প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত করেন।

৩০শে এপ্রিল—১৯০৮ সাল। রাত্রির ঘনান্ধকারে যথারীতি একখানি ঘোড়ার গাড়ী—দেখিতে যাহা ঠিক কিংসফোর্ডের গাড়ীরই অনুরূপ—নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিংসফোর্ডের বাটীর ফটকের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল অপেক্ষা করিয়াই ছিলেন। গেটের একধার হইতে ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করিবেন—এইরূপ ঠিক হইয়াছিল। বোমা না ফাটিলে দুইজনে গাড়ীর দুইদিক হইতে রিভলভার লইয়া একই সময়ে কিংসফোর্ডকে আক্রমণ করিবেন; কিন্তু গাড়ীখানি দ্রুত আগাইয়া আসায় আর বিলম্ব না করিয়া ক্ষুদিরাম বাংলোর গেটের একটু দূরেই একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রনিনাদে দিক্-বিদিক্ প্রকম্পিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষ মধ্যে গাড়ীখানায় আগুন ধরিয়া গেল।

কিন্তু বিপ্লবীদের দুর্ভাগ্য! সেই গাড়ীতে সেদিন কিংসফোর্ড ছিলেন না—ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ কেনেডীর নিরপরাধিনী পত্নী ও কন্যা। বোমার প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহারা দুইজনেই গুরুতররূপে আহতা হইয়াছিলেন। সকল চিকিৎসা সত্ত্বেও কেনেডী সাহেবের কন্যা তৎপরদিন দুপুর রাত্রিতে এবং তাঁহার পত্নী আরও একদিন পরে দিবা দ্বিপ্রহরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এদিকে বোমা নিক্ষেপের পর প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পৃথক হইয়া গেলেন। ক্ষুদিরাম চলিলেন সমস্তিপুরের দিকে—আর প্রফুল্ল চলিলেন বাঁকীপুরের পথ লক্ষ্য করিয়া।

বিশ-পঁচিশ মাইল হাঁটার পর ক্ষুদিরাম অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ওয়াইনি ষ্টেসনে একটি মুদীর দোকানে তিনি বিশ্রামলাভের আশায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের গল্প চলিতেছিল। দুইজন পুলিশকে সহসা সেইদিকে আসিতে দেখিয়া ক্ষুদিরাম যখন স্থানত্যাগের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন একজন পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে নানারকম প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। উত্তর পাইয়া তাহাদের সন্দেহ হইল এবং ক্ষুদিরামকে তাহারা ধরিবার চেষ্টা করিল। সেই সময় প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তিতে বড় পিস্তলটি গেল নীচে পড়িয়া এবং ছোট পিস্তলটিও পকেট হইতে বাহির করিবার পূর্ব্বেই পুলিশ দুইজন তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিল। ১লা মে তারিখে সকালের দিকেই শ্রান্ত ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলেন।

মজঃফরপুর হইতে প্রফুল্ল গিয়া সমস্তিপুরে পৌঁছিলেন এবং সেখান হইতে বস্ত্র ও জুতা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিলেন। মোকামা ঘাটের একখানি টিকিট কাটিয়া প্রফুল্ল যখন গাড়ীতে উঠিলেন, তখন তাঁহার হাব-ভাব ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সিংভূমের পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টর নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের (বন্দ্যোপাধ্যায়?) কিছু সন্দেহ হইল। তিনিও তখন ঐ ট্রেণেই নিজ কর্ম্মস্থলে ফিরিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া কথায়-বার্ত্তায় তিনি প্রফুল্লের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিলেন এবং এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি একজন মস্তবড় দেশ-

প্রেমিক ! প্রফুল্ল তাঁহার কপটতা বুঝিতে পারিলেন না। নানা আলাপে প্রফুল্লের প্রতি নন্দলালের সন্দেহ দৃঢ় হইল এবং একটি ষ্টেসন হইতে গোপনে তিনি মজঃফরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ তারযোগে আনাইয়া লইলেন প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম।

মোকামা ঘাটে পৌঁছাইয়া প্রফুল্ল যখন হাওড়ার টিকিট কাটিয়া ট্রেণে উঠিবার জন্ম অগ্রসর হইতেছিলেন তখন নন্দলাল একজন পুলিশকে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম আদেশ দিলেন। প্রফুল্লের ইহাতে বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। একটু আগেই তিনি নন্দলালের জিনিষ-পত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজে বহিয়া ষ্টেসনে আনিয়াছিলেন—ইহাই কিনা তাঁহার প্রতিদান ! দারুণ ঘৃণায় প্রফুল্লের অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল এবং আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি বাঙালী হ'য়ে আমায় ধরিয়ে দিচ্ছ ?"

প্রফুল্ল দৌড়াইতে লাগিলেন। একজন পুলিশ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেই তিনি ভীমবিক্রমে তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন। তাহার পর তিনি পিস্তল বাহির করিয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বৃথা চেষ্টা ! চতুর্দ্দিক হইতে পুলিশের দল তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে। প্রফুল্ল একজনের দিকে গুলি ছুঁড়িলেন—কিন্তু উত্তেজিত হস্তে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত্রি তাঁহার পদব্রজে কাটিয়াছে—তাহার উপর দুশ্চিন্তা। স্নানাহার হয় নাই—পদদ্বয় ফুলিয়া উঠিয়াছে। বিনা নিদ্রায় তিনি অবসন্ন ও ক্লান্ত। প্রফুল্ল দেখিলেন, তাঁহার পলাইবার উপায় নাই। ইহা বুঝিয়া তিনি অবিচলিত চিত্তে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। ধরা তিনি কিছুতেই দিবেন না। পুলিশকে যে কি করিয়া ফাঁকি দিতে হয়—তাহা তাঁহার মত অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত তরুণের ভাল করিয়াই জানা আছে পুলিশকেও তিনি তাহা আজ সমঝাইয়া দিবেন।

সেই একই তারিখ—১লা মে, ১৯০৮—ক্ষুদিরাম যেদিন ধরা পড়িয়াছিলেন। প্রফুল্লের পিস্তলের মুখ তাঁহার নিজের দিকেই ফিরিল, তাহার পর দুইবার উহা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট গোঙানী শুনা গেল এবং তাহারই মধ্যে একবার সুস্পষ্ট "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি ! তাহার পর সবই শেষ ! দুইটি গুলিই কণ্ঠ ও মুখমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে। সতের বৎসরের তরুণ কিশোর স্বাধীনতার যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।

ক্ষুদিরামের দ্বারা প্রফুল্লের দেহ সনাক্তকরণের পর আরও তদন্তের জন্ম তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্পিরিটের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পরবর্ত্তীকালে প্রফুল্লের সেই ছিন্ন মস্তক ৫৭-বি, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের বাটীতে ভূপ্রোথিত করা হইয়াছিল। উক্ত বাটীতে বর্ত্তমানে ডানলপ কোম্পানির কার্য্যালয় অবস্থিত।

ধরা পড়িবার পর ট্রেণে করিয়া ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুরে লইয়া আসা হইল। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে ট্রেণের কামরা হইতে ক্ষুদিরাম অবতরণ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বাস-ভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার জবানবন্দী গৃহীত হইল।

ক্ষুদিরাম ধৃত হওয়ায় বিপ্লবীরা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, পুলিশ তাঁহার নিকট হইতে বোধ হয় বহু গুপ্ত তথ্য জানিয়া ফেলিবে ; কিন্তু পুলিশের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কোনও খবরই পুলিশ ক্ষুদিরামের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

ক্ষুদিরামের বিচার আরম্ভ হইল ৮ই জুন এবং ১৩ই জুন তারিখে রায় প্রকাশিত হইল। এই বিচারকার্য্য চালাইবার জন্ম বাঁকীপুরের অতিরিক্ত সেসন্‌স জজ মিঃ কার্ণডফ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিচারক নিযুক্ত হইয়া মজঃফরপুরে আসেন। বাঁকীপুরের ব্যারিষ্টার মিঃ ম্যান্নুক এবং সরকারী উকিল বিনোদবিহারী মজুমদার গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মামলা পরিচালিত করেন।

ক্ষুদিরামের পক্ষে প্রথমতঃ কোন উকিলই ছিল না। মজঃফরপুরের উকিল কালিদাস বসু এবং রংপুরের উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি শেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করেন।

সশস্ত্র পুলিশে পরিবেষ্টিত অবস্থায় আদালতে আসিয়া মিঃ কিংসফোর্ডও এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম অপলক দৃষ্টিতে তখন তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

নিক্ষিপ্ত বোমাতে দৈবক্রমে দুইজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হওয়ায় ক্ষুদিরাম মনে মনে যথেষ্টই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। মুক্তকণ্ঠে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করিলেন। বিচারে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইল।

ক্ষুদিরাম মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন। বিচারক ভাবিলেন যে, অবোধ বালক বোধ হয় দণ্ডের গুরুত্ব সম্যকরূপে বুঝিতে পারে নাই। প্রশ্ন করিলেন,—"তোমার প্রতি প্রদত্ত দণ্ড তুমি বুঝতে পেরেছ ?"

ক্ষুদিরাম ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, বুঝেছি।"

তাঁহার ধীর স্থির ভাব লক্ষ্য করিয়া জজও যেন খানিকটা বিচলিত হইলেন। ক্ষুদিরামকে যেন খানিকটা আশ্বাস দিয়াই জানাইলেন, তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করিতে পারেন এবং বিনা খরচে রায়ের একটা নকল তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

ক্ষুদিরাম তখন কিছু বলিতে চাহিলেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় জজসাহেব তাঁহাকে আর কিছু বলিবার অনুমতি দিলেন না। বিচারক জানাইলেন, তাঁহার বক্তব্য তিনি জেলারের নিকট পরে নিবেদন করিতে পারেন। ক্ষুদিরাম তথাপি বলিলেন,—"আর কিছু নয়, শুধু বোমা তৈরীর কৌশলটা সকলকে জানিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।"

বিপদ্ বুঝিয়া জজ তাঁহাকে তাড়াতাড়ি জেলে লইয়া যাওয়ার আদেশ দিলেন।

হাইকোর্টে আপিল ব্যর্থ হইল—ছোটলাটও ক্ষুদিরামকে জীবন ভিক্ষা দিলেন না। অচঞ্চল ক্ষুদিরাম ফাঁসির প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিলেন।

দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির পর জেলে ক্ষুদিরাম গীতা, মহাভারত ও রামকৃষ্ণের উপদেশ পাঠ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সকলও তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। মজিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবন-চরিত পাঠ করিতেও তিনি আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজপুত রমণীরা যেমন নির্ভয়ে অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করিয়া জহরব্রতের অনুষ্ঠান

করিত—তিনিও চাহিয়াছিলেন সেইরূপ সাহসের সহিতই জীবন বিসর্জ্জন দিতে। চতুর্ভুজার প্রসাদ খাইয়া ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১ই আগষ্ট—১৯০৮। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষুদিরাম প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ঈশ্বরের নিকট তাঁহার শেষ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত এবং চক্ষু বস্ত্রাচ্ছাদিত ও হস্তদ্বয় পিছন দিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় চলিলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে।

ঘাতক তাঁহার সোনার গলায় ফাঁসির রজ্জু দিল পরাইয়া। রজ্জু সম্বন্ধে তিনি হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"ফাঁসির দড়িতে এত মোম দেওয়া হয় কেন?"

একটু পরেই সব শেষ। পদদ্বয়ের নিম্ন হইতে মঞ্চ অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুদিরামের দেহ ঝুলিয়া পড়িল। পুলিশ, মিলিটারী পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ এবং দর্শকরূপে উপস্থিত দুইজন সাহেব, দুইজন বাঙ্গালী ও দুইজন বিহারীর সম্মুখে মজঃফরপুর জেলে ১৯ বৎসরের তরুণ যুবক ক্ষুদিরাম জীবন দিয়া মৃত্যুকে জয় করিলেন।

বিপুল জনসমাগমের মধ্যে গণ্ডক নদের তীরে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। তাঁহার ফাঁসির খবর পাইয়া কলিকাতার ছাত্র ও যুবকগণ শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করেন এবং নগ্নপদ হন। অনেকে সেদিন নিরামিষ আহার করেন।

এইভাবে আজ হইতে পূর্ণ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশ হইতে বহু দূরে বাংলার দুইটি তরুণ কিশোর পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের সেই শোচনীয় পরিসমাপ্তিতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী যে শোকোচ্ছ্বাস সেদিন উত্থিত হইয়াছিল—আজও তাহার বেগ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয় নাই। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—দুইজনের স্মৃতিতে আজও বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা হাহাকার করিয়া উঠে, নূতন করিয়া যেন আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিয়া থাকে।

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে "কেশরী" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মার আকাঙ্ক্ষা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক এম-এ, বি-এল

(অনুবাদ)

১

হতে নাহি চাই দ্বিজ
জন্মান্তর যদি লেখে ভালে
হতে চাই অন্ত্যজ।
চাই ভাগ নিতে তাদের ব্যথার,
অপমান আর শত বেদনার,
চেষ্টা করিতে মুক্তি তাদের,
মুক্ত হইতে নিজ।
প্রার্থনা তাই লভি যদি পুনঃ জন্ম
নাহি যেন হই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রজ,
বৈশ্য, শূদ্র হতে সাধ নাই মোর
ফিরি যেন হয়ে দীন অতিশূদ্রজ।

২

দেখি যবে কারো ভুল,
মনে মনে বলি, আমিও করেছি'
—ভ্রান্তিতে মোরা ভুল।
দেখি যবে কারে রিপু পরবশে,
'আমিও ছিলাম' এই মনে আসে,
এ ভাবে বুঝেছি জগতে সকলে
একই জাতি ও কুল।
তাই জানি মনে নাই সুখ মম
যাবৎ না হয় ক্ষুদ্রতমেরও
দুঃখের নির্ম্মূল।

৩

আকাঙ্ক্ষা নাই প্রতিষ্ঠার—
রাজদরবারে আসবার সেত
আমার তাতে কি দরকার?
আমি দীনতম ভৃত্য:
সম্মানে তার নাই প্রয়োজন
চায় প্রীতি শুধু নিত্য।
এই ভালোবাসা নিশ্চিত পাবো জানি,
যতদিন মোর সেবার হবে না গ্লানি।

(১) (২) (৩) ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯২১, ১৯২৭, ১৯২৫ (The mind of Mahatma Gandhi, Prabhu and Rau, P. 169 2. 8)

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—নয়—

দেখতে দেখতে যেন পুরো ছটা মাস হাওয়ায় ভর দিয়ে উড়ে গেল।

ছমাসের ভেতর দিয়ে যেন পার হয়ে গেছে ষাটটা বছরের অভিজ্ঞতা। তরুণ-সমিতি আর তার জিমন্যাষ্টিক ক্লাবের ব্যাপার এখন আর দুর্বোধ্য রহস্য নয়। সুড়ঙ্গপথের গোপন দরজাটি মুক্ত হয়ে গেছে দৃষ্টির সম্মুখে, আকাশ-গঙ্গার ছায়াপথে সেও আজ জ্যোতির্ময় মানুষগুলির সহযাত্রী।

ভোনা, কালী, খাঁদু— এদের সম্বন্ধে করুণা হয় এখন। চোখের সামনেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে এরা, কিন্তু কোনো সত্যিকারের সত্তা নেই এদের, নেই কোনো স্বীকৃত মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব। তোমার আমার এই দেশ—কিন্তু এ কোন দেশ? এর বুকের ওপর দিয়ে হাড়পাঁজরা গুঁড়ো করে গড়িয়ে চলেছে একটা হাজার মণী রোলারের মতো ইংরেজের শাসন; শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর শক্তি হরণ করে নিয়ে এরা দেশজোড়া কোটি কোটি নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ড সৃষ্টি করেছে, আর কোথায় দুটি একটি জাগ্রৎ প্রাণ বেঁচে আছে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে, তাদের সন্ধানে লাগিয়েছে টিক্‌টিকির ঘৃণ্য-বাহিনীকে। বোবা দেশ—পুতুলের দেশ। দিন আনে দিন খায়, পাপের বোঝার মতো জীবনের ভার বয়ে বেড়ায়। ইস্কুলের ক্লাসে পড়ানো হয় 'ইংরেজের সুশাসন', ভারত-সম্রাট আর লাট-সায়েবদের সুখ্যাতির কোলাহলে ইতিহাস পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেয়। পাড়ার ছেলেরা খেলার মাঠে হৈ হৈ করে, অশ্লীল আলোচনা করে, সাদা দেওয়ালে লেখে কুৎসিৎ কথা, প্রেমপত্র তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে পাশের বাড়ির মেয়ের দিকে, আর গার্লস্‌ স্কুলের ঘোড়ার গাড়ি দেখলে আকুল কণ্ঠে লায়লা-মজনুর গান ধরে।

এই কি দেশ? এ কাদের দেশ? অবিনাশবাবুর শেখানো গানের কলিটা স্মৃতির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসে: "স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এদেশ-তোদের নয়—"

কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার যখন ছিল তখন রাস্তায় একদিন গান গাইতে গাইতে বেরিয়েছিল, "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।" আজ উল্টো কথাটাই মনে আসে। মনে আসে সমস্ত দেশের দিকে তাকিয়ে, ভোনা-কালী-খাঁদুর সমান উৎসাহে বিম্‌লি-প্রসঙ্গ আলোচনা আর মনসাতলায় মার্বেল ফাটানো দেখে।

—উড্ডু কিপ—

—হাত-ইস্টেট্—

পাশাপাশি মনে আসে: Freedom is our birth-right!

—জন্ম হইতেই আমরা মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত—

যেতে যেতে যখন দলটার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে যায়, তখন একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ, একটা আলাদা গৌরবে সমস্ত প্রাণটা যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে রঞ্জুর। ওরা জানেনা, ওদের পাশাপাশি থেকেও রঞ্জু আজ কোন্‌ একটা আশ্চর্য অপরূপ জগতে বাস করছে। কোন্‌ দুর্গম দুরূহ পথ দিয়ে আজ তার জয়যাত্রা, মৃত্যু অতিক্রান্ত হয়ে, নবজীবনের তীর্থ-তোরণের অভিসারে। ওপরে আগুন-ঝরা আকাশ, সামনে রক্তের ফেনিল সমুদ্র। মনে হয় একটা নতুন, অতি প্রখর দীপ্তিতে আজ সে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে—সে বিদ্রোহী সে বিপ্লবী। ওদের ক্ষুদ্রতার পাশাপাশি সে যেন সীমাহীন গৌরবে আকাশে তুলে ধরেছে তার জয়োদ্ধত মস্তক, তার পায়ের চাপে পাতালে টলমল করে উঠেছে বাসুকীনাগের সহস্রশির। কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' আবৃত্তি করে বলে ইচ্ছে করে:

"মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ রাজটীকা দীপ্ত-জয়শ্রীর'

বল বীর,

চির উন্নত মম শির।"

কিন্তু এ গৌরব সহজেই অর্জিত হয়নি তার।

পড়ার টেবিলে বসে ছয় মাসের হিসেব করছিল রঞ্জু—বাতাসে অ্যাল্‌জেব্রার খোলা পাতাগুলো উড়ে চলছিল।

'পথের দাবী' এল, 'সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব কাহিনী' এল, এল 'মৃত্যুবিজয়ী গদর দল'—এল আরো অজস্র, আরো রাশি রাশি বই। তারপর সেই বইগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লাগল পরিমল, যেন বাজিয়ে দেখতে চাইল তাকে। তারও পরে একদিন সন্ধ্যার সময় জিমনাষ্টিক ক্লাবের ছেলেরা যখন ফিরল বাড়ির দিকে, তখন বেণুদা বললেন, একটু দাঁড়িয়ে যেয়ো রঞ্জু, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ভূতুড়ে জমিদার বাড়ির সেই নির্জনতায়, অন্ধকার হয়ে আসা চাল্‌তে গাছের তলায় সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন বেণুদা। মনে আছে বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পিটছিল, শরীরে প্রতিটি কণাকেও সজাগ আর প্রখর করে রেখেছিল রঞ্জু, একটি কথাও শুনতে ভুল না হয়, একটি কথাও হারিয়ে না যায় এক পলকের অমনোযোগে।

—আমাদের এই যুগান্তর পার্টি। মানিকতলা বোমার মামলার ইতিহাস পড়েছ তো? সেদিনের সেই বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয়ে যায়নি। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, বাঘা যতীনের পার্টি মরতে পারেনা, আমরা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, যতদিন স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ না হয় :ততদিন বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও বাঁচিয়ে রাখব। এই পার্টির সভ্য হওয়ার গৌরব কি তুমি চাওনা?

—নিশ্চয়ই চাই।

—ভয় পাবেনা?

—না।

—মনে রেখো, এ শুধু বোমা-রিভলভার নিয়ে মৃত্যুর রোমাঞ্চ নয়। এর দুঃখ অনেক, দায় অনেক। চারদিকে শত্রু, বাতাসেরও কান আছে। বিশ্বাসঘাতকতা পদে পদে। পুলিশের হাতে পড়লে টর্চারের সীমা থাকবেনা, বেত থেকে শুরু করে নাকের ভেতরে পাইপ বসিয়ে পাম্প করা পর্যন্ত কোনো কিছু বাদ দেবেনা ওরা। সে নির্যাতন সয়ে থাকতে পারবে, দলের খবর বলে দেবেনা?

—না।

—আচ্ছা, পরীক্ষা হবে। ছেলেমানুষ, ছোটখাটো কাজই দেব এখন। আর মনে রেখো অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করবেনা, যতটুকু তোমাকে জানতে দেওয়া হবে তার বেশি কখনো জানতে চাইবেনা। যে কাজ তোমাকে দেওয়া হবে তার অতিরিক্ত কোনো কিছুতে হাত দিতে চেষ্টা করবেনা। আর সবচেয়ে বড় কথা হল ব্রহ্মচর্য—বিপ্লবীদের চরিত্র থাকবে খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল। চরিত্রহীন আর বিশ্বাসঘাতকের একই বিচার করি আমরা, একই দণ্ড দিই—সে হল মৃত্যু!

মৃত্যু। অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় বেণুদা কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু যে আশ্চর্য নেশা তখন রক্তের মধ্যে দপদপ করছে, হৃৎপিণ্ড ফুলে ফুলে উঠছে যে উদগ্র উত্তেজনায়, তার কাছে মৃত্যু কথাটার কোনো গুরুত্বই বোধ হয়নি রঞ্জুর। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন—এই তো এ পথের সংকল্প বাক্য। ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়া কিংবা পুলিশের গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত মৃত্যুশয্যাশায়ী বীর নলিনী বাগচীর মতো বলতে পারা: "Don't distmb plea-e, let me die peacefully"—এ তো এ পথের সব চেয়ে বড় প্রলোভন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুর প্রশ্ন রঞ্জুর কাছে অর্থহীন, চরিত্র সম্পর্কে সাবধান বাণী সম্পূর্ণই অনাবশ্যক।

আসলে ছেলেমানুষ কথাটাই আপত্তিজনক। ছেলেমানুষ বলেই কি সে শুধু ছোটখাটো কাজের অধিকারী? সামসুল আলমকে মেরেছিল যে বীরেন গুপ্ত সে তার চাইতে কবছরের বড়ই বা? চট্টগ্রামের টেগরা তো তারই সমবয়সী। তবে হাতে একটা রিভলভার পেলে সেই বা কেন ওদের মতো একটা অক্ষয়কীর্তি রেখে যেতে পারবে না, একটা পাঁচঘরা রিভলভার উজাড় করে শেষ করে দিতে পারবে না টিকটিকিদের সর্দার বিপ্লবীদের চিরশত্রু সেই পেটমোটা আর হুলোমুখো ধনেশ্বর বর্মাকে? অথবা তাদের জিলা-স্কুলে যখন কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাদা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এসে উপস্থিত হন, তখন সেও কি নিতে পারে না জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধ, দিতে পারে না বিদ্রোহী চট্টগ্রামে আর কাঁথি লবণ-আন্দোলনে সত্যাগ্রহী মেদিনীপুরে অকথ্য নির্যাতনের প্রতিহিংসা?

কিশোর রঞ্জু, ছেলেমানুষ রঞ্জু। তার মনের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা নেয় চট্টগ্রামের রক্তাক্ত শহীদদের মূর্তি, কানে আসে তাদের মায়েদের উতরোল কান্না। ছবি চোখে আসে পাঞ্জাবের প্রকাশ্য রাজপথে কাঠের ফ্রেমে হাত-পা বেঁধে ছেলে বুড়োকে নির্বিচারে বেত মারা হচ্ছে—

যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলে চোখে মুখে জল দিয়ে সচেতন করে আবার বেত মারবার পালা—ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠে আসছে শরীরের চামড়া; রাস্তা দিয়ে পুরুষ মেয়েকে জানোয়ারের মতো হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, আপত্তি করলেই পিঠে পড়ছে কাঁটাওলা বুটের লাথি। মাঘের প্রচণ্ড শীতের রাত্রে মেদিনীপুরের গ্রামশুদ্ধ নিরীহ নরনারীকে তাড়া করে নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ডুবিয়ে রাখা হচ্ছে পচা পুকুরের জলে, বারো বছরের ছেলেকে বস্তায় পুরে নদীর জলে চুবিয়ে চুবিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

এই শাসন—এরা শাসক! ছেলেমানুষ রঞ্জুর মনে হয়, তার সমস্ত শরীর যদি বিস্ফোরক দিয়ে তৈরী হত তাহলে একটা বোমার মতো ফেটে সে চৌচির হয়ে যেত, উড়িয়ে নিয়ে যেত এই পাপের ঝাড়শুদ্ধ। সে ছেলেমানুষ। তার হাতে যদি একটা রিভলভার থাকে তাহলে সেও প্রমাণ করে দিতে পারে যে সে আর কারো চাইতেই কোনো অংশে ছোট নয়, হেয়ও নয়!

তার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বেণুদা হেসেছিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা দেখা যাবে সব।

—আমাকে আগে রিভলভার ছোঁড়া শিখিয়ে দিতে হবে বেণুদা।

—রিভলভার?—বেণুদা আবার হেসেছিলেন: সে তো অত সহজ নয় ভাই। বিপ্লবী দল বলেই কি অত কথায় কথায় রিভলভার জোগাড় করা যায়? অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় একটা রিভলভার সংগ্রহ করতে, ঢের রিস্‌ক নিতে হয়, বিস্তর তার দাম। আচ্ছা, সময় হলে দেখা যাবে সে সব, ও শিখিয়ে দিতে আধঘণ্টা সময়ও লাগবে না। এখুনি তো আর মানুষ মারতে যাচ্ছ না, অন্য কাজ শেখো তার আগে।

অন্য কাজ! হ্যাঁ, দিন তিনেক পরেই কাজ পেয়েছিল রঞ্জু। বেণুদার আদেশ পরিমলই জানিয়ে গেল এসে। আজকের কাজ পারা না পারার ওপরেই সমস্ত পরিচয় নির্ভর করছে রঞ্জুর।

বেণুদা একখানা চিঠি দিয়েছেন খামে করে। এই চিঠিখানা নিয়ে রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে গোমেজ সাহেবের কুঠির পেছনকার পুরোনো সাহেবী কবর খানাটায় যেতে হবে রঞ্জুর। ঠিক মাঝখানে যে শাদা কবরটার ওপরে একখানা শ্বেত পাথরের বই খোলা আছে, তারই ওপরে বসে রঞ্জুর প্রতীক্ষা করতে হবে অন্তত দুঘণ্টা সময়। এর মধ্যে কোনো লোক যদি এসে তার কাছে চিঠি চায় তবে রঞ্জু সে চিঠি তাকে দেবে, আর নইলে বইয়ের ওপরে একটুকরো ইট চাপা দিয়ে রেখে আসবে। ইচ্ছে করলে একটা আলো নিতে পারো সঙ্গে—কিন্তু পারতপক্ষে সে আলো জ্বালাতে পারবে না।

রাত সাড়ে বারোটায় গোমেজ সাহেবের কুঠির কবরখানায়। মৃত্যু-বিলাসী বীরের বুকও ছম ছম করে উঠল একবার, গেঞ্জীর তলায় ঘাম ফুটে বেরুতে চাইল শরীরে।

পরিমল মুখ টিপে হাসল, কি-রে পারবি না? ভয় করছে নাকি? তাহলে বরং আমি বেণুদাকে গিয়ে বলি—

পৌরুষ দপ দপ করে জ্বলে উঠল রক্তের মধ্যে: নিশ্চয় পারব।

মৃদু ব্যঙ্গভরা গলায় পরিমল বললে, থাক্ না, কাজ কি বাপু! কুঠির ও কবরখানাটা ভূতের আড্ডা, বহু লোকে ওখানে ভয় পেয়েছে।

—তা থাক, আমি পাবো না।

—বলা ওরকম সোজা কিনা! আমি শুনেছি বছর তিনেক আগে একটা চৌকিদার যাচ্ছিল ওরই পাশের রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ দেখল মেটে মেটে জ্যোৎস্নায় ওই কবরখানায় দাঁড়িয়ে উঠল তালগাছের সমান উঁচু একটা সাহেবের মূর্তি! আরো কী ভয়ানক, তার কাঁধের ওপরে মাথাই নেই!

অনর্থক কতগুলো আবোল তাবোল গল্প বলে ভয় ধরিয়ে দিতে চাইছে পরিমল। মুহূর্তের জন্যে বুকের ভেতরে ছ্যাৎ করে উঠলেও সে ভাবের বিন্দুমাত্রও মুখে ফুটতে দিলে না রঞ্জু। জোর গলায় বললে, মাথা থাক বা না থাক তাতে আমার বয়েই গেল।

—কিন্তু তোর মাথাটা যেন থাকে—ভেবে দেখিস্ ভালো করে—

পরিমল চলে গেল। যাওয়ার সময় চোখের এমন একটা ভঙ্গি করে হাসল যে অপমানে পিত্ত পর্যন্ত তেতে উঠল রঞ্জুর। যেন ওর মুখ দেখেই পরিমল বুঝে নিয়েছে এ কাজ ওকে দিয়ে সম্ভব নয়।

না, ভূত মানবে না সে, ভয় করবে না। কিসের ভূত,

কোথায় ভূত ? ওসব কতগুলো আজগুবী গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃষ্টির বিভ্রম থেকেই এই সব এলোপাথাড়ি গল্প মানুষ ছড়িয়ে বেড়ায় চারদিকে। আর যদি সত্যি সত্যিই ভূত বলে কিছু থাকে, তাহলে সাহসী মানুষকে সে চিরকাল সেলাম ঠুকেই এড়িয়ে চলে, ভূতেরও তো প্রাণের ভয় বলে জিনিস আছে একটা !

তারপরে সেই রাত্রি। জীবনে তার কথা ভোলবার নয়।

বাইরের পড়ার ঘর থেকে বেরুতে রাত্রে অবশ্য অসুবিধে হল না। সে আর দাদা—দুজনে এঘরে শোয়। দিন তিনেক আগে কী একটা কাজে দাদা কলকাতায় গেছে, কাজেই পালাতে কোনো বিঘ্ন হবে না। আরো বাইরের ঘর—ভেতরের দরজায় খিল দিয়ে রাখলে বাড়ির কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না কাণ্ডটা।

আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরকার সাড়া-শব্দ থেমে এল, শব্দ এল ঘরে ঘরে হুড়কো পড়ার। মা একবার ডাক দিয়ে গেলেন, জল লাগবে রঞ্জু ?

—না মা।

ঘরে টিম টিম করে লণ্ঠন জ্বলছে, মশারির ভেতর দিয়ে রঞ্জু তার সজাগ প্রখর দৃষ্টি মেলে রেখেছে টেবিলের ওপরকার টাইমপিস্‌টার দিকে। টিক্ টিক্ টিক্। ঘড়ি চলছে, সময় চলছে। সাড়ে এগারোটা ছাড়িয়ে ছোট কাঁটাটা ঝুঁকেছে পৌনে বারোটার দিকে, বড় কাঁটাটা যেন ছিটকে ছিটকে এগিয়ে যাচ্ছে সম্মুখের দিকে। সময় এগিয়ে আসছে—ঘড়ির শব্দটা মিশছে রঞ্জুর হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে।

—টিক্ টিক্ টিক্—

বারোটা বাজতে দশ মিনিট।

বালিশের নীচে হাত দিলে রঞ্জু। চ্যাপ্টা ফ্ল্যাশ লাইটটা ঠিক আছে সেখানে, ইস্কুলের টিফিনের পয়সা জমিয়ে সখ করে কিনেছিল সেটা। আজ ব্যাটারী বদলেছে, কিনেছে একটা নতুন বাল্‌ব। আজকের এই কঠোর দুর্গম অভিযানে এইটেই তার পথের সাথী—তার নির্ভরযোগ্য সহচর।

—টিক্ টিক্ টিক্—

রঞ্জু নেমে পড়ল বিছানা থেকে। ভয়ের থেকে উত্তেজনা এখন বেশি হয়ে উঠেছে, রক্তের মধ্যে মাতলামো শুরু করেছে অ্যাডভেঞ্চারের একটা অত্যুগ্র নেশা। সন্ধ্যের সময়েই বড় ঘরের আলনা থেকে এক ফাঁকে নিজের জামাটা হাত সাফাই করে এনেছে, তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল চিঠিটা ঠিক আছে সেখানে। তারপর অতি নিঃশব্দে সে জামাটা সে গায়ে পরে নিলে, ফ্ল্যাশ লাইট নিলে হাতে, অতি সাবধানে লণ্ঠনটাকে আরো কমিয়ে দিয়ে বেড়ালের মতো সতর্ক নিঃশব্দ পায়ে চলে এল বাইরে।

থমথমে রাত। একটু দূরেই যে কেরোসিনের আলোটা ছিল, সেটা কখন নিবে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ধূলোভরা পথ অন্ধকারে লুটিয়ে আছে মূর্ছিতের মতো। জ্বলজ্বলে তারায় ভরা কালো আকাশ—চাঁদ নেই। সন্ধ্যার সময় একটা ফালি উঠেছিল, কখন পশ্চিমের গাছ-গাছালির আড়ালে ডুব দিয়েছে।

নির্জন রাস্তা, একেবারেই নির্জন। নিজের জুতোর শব্দেও বুক চমকে চমকে উঠছে। পথের ধারের গাছগুলোর ভূতুড়ে ছায়া বাতাসে দুলছে। রঞ্জুর পায়ের আওয়াজে ঝট্‌পট্ শব্দে টেলিগ্রাফের তার থেকে প্যাঁচা উড়ে গেল একটা। পথের এদিক থেকে ওদিকে ছুটে চলে গেল শেয়াল। একবার থেমে দাঁড়িয়ে যেন জিজ্ঞাসাভরা দৃষ্টিতে তাকালো রঞ্জুর দিকে, অন্ধকারে কী ভয়ঙ্কর একটা নীলচে আলোয় চোখদুটো জ্বলছে তার !

সহরের এদিকটা প্রায় ফাঁকা ফাঁকা। এলোমেলো ছড়ানো সাদা সাদা কোঠা বাড়িগুলো, টিনের চালা, অন্ধকারের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে আছে, কোথাও একটা আলো জ্বলছে না। শুধু এখানে ওখানে ঝলমলে জোনাকির রাশ। তারই মাঝখান দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো হেঁটে চলল রঞ্জু। কোথা থেকে একটা কুকুর তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে যেন তাকে সতর্ক করে দিলে।

কিন্তু আজ পৃথিবীকে ভয় হচ্ছে না রঞ্জুর, প্রকৃতিকেও না। আজ ভয় মানুষকে। কোটপরা সাইকেলে চড়া সেই লোকটাকে। ওরাও নিশাচর, ওরাও রাত্রির আড়ালে শেয়ালের মতো শিকার খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু শেয়ালের চোখের চাইতে ওদের দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ, আরো ভয়ানক। পাথর-চাপা দেশের বুকের আড়ালে কোথায় একটুখানি আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠেছে, কোথায় একটি প্রাণের ভেতরে জেগেছে প্রতিবাদ, দিনরাত তাই

তাদের একমাত্র সন্ধান। সেই আগুনকে নিবিয়ে দেবে, সেই প্রাণটিকে রোধ করে দেবে ফাঁসির দড়িতে। তার বিনিময়ে পাবে কিছু কালো রঙের টাকা, আর রক্ত-মাখানো কয়েক টুকরো রুটি।

খোয়া-ওঠা পথ শেষ হয়ে গেছে—দৃষ্টির আড়ালে সরে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির শেষ ল্যাম্প-পোষ্টটাও। এবার শুধু ধুলো-ভরা রাস্তা, দুপাশে ঘন জঙ্গলের মতো বাগান। বাতাসে ঘর ঘর শর শর করে একটা অস্বস্তি-জাগানো শব্দ উঠছে বাঁশবনে। রাত্রির অন্ধকারে বাঁশবনগুলোকে কেমন খারাপ লাগে। ছেলেবেলার শোনা গল্প মনে পড়ে। রাস্তার ওপর লম্বা হয়ে মস্ত একটা বাঁশ পড়ে আছে, অসতর্ক পথিক যেই সেটা পার হতে যায়, অমনি ভূতুড়ে বাঁশটা তীরের মতো উঠে পড়ে ওপর দিকে, মানুষটাকে ধনুক থেকে ছুটে বেরুনো একটা তীরের মতো ছুঁড়ে দেয় আকাশে, তারপর—

দুত্তোর—ভয় পাচ্ছে নাকি রঞ্জু? বিপ্লবী রঞ্জু—'ঝড় বাদলে আঁধার রাতে' একলা চলার পথিক রঞ্জন। পরিমলের সেই উদ্ভট গল্পগুলোর রেশ কি এখনো ছড়িয়ে আছে মনের মধ্যে? জোরে, আরো জোরে হাঁটো। Cowards die many times—

শোঁ—শোঁ—শোঁ—

শরীর-কাঁপানো কন্‌কনে বাতাস এল একটা। পথটা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়ে একটা বিস্তীর্ণ বালির ডাঙায় নেমে পড়েছে। তারার আলোয় ঝিকঝিক করছে বালি, ঝিক-ঝিক করছে অভ্রের কুঁচি। ঘন বঁইচির বনে জোনাকির রোশনাই। জলের একটা দীর্ঘরেখা উঠছে ঝিলিক দিয়ে। কাঞ্চন।

কাঞ্চন! এর জলে কালী বাস করেন। নরবলির তৃষ্ণা এখনো মেটেনি তাঁর। ফাঁপা একটা লোহার চোঙ গুম গুম করে বসে যাচ্ছে জলের অতল গভীরতায়—শেষবারের মতো ভেসে এল কতগুলো মানুষের আর্তকান্না। পায়ের হাড়গুলোতে হঠাৎ কেমন যেন একটা ঝাঁকানি লাগল রঞ্জুর।

না—এও দুর্বলতা। 'আমরা করবনা ভয়, করবনা—' জিমন্যাষ্টিক ক্লাবের ছেলেদের মার্চিং সং মনে পড়ল। আরো জোর-পায়ে হাঁটতে হবে। বিপ্লবীকে ভয় পেলে চলবেনা

এত অন্ধকার, তবু আশ্চর্যভাবে স্বচ্ছ হয়ে গেছে চোখের দৃষ্টি। বেশ চেনা যায় পথ, অনেকটা অবধি চোখ চলে। দূরে পাহাড়ের মতো কী যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, জমা হয়ে আছে, জমা হয়ে আছে পুঞ্জিত অমাবস্যা। বুঝতে বাকী রইলনা। গোমেজ সাহেবের কুঠির উঁচু প্রাচীর।

আর একবার কলরব জেগে উঠল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। আর একবার শুরু হয়ে গেল রক্তের চঞ্চলতা। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে ওঠে ওখানে। পরিমলের সেই বিশ্রী গল্পটা। ছেলেবেলায় তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে-ছিলেন অবিনাশবাবু—

রঞ্জু স্থির দাঁড়িয়ে গেল। অবিনাশবাবু! কিন্তু আজ তো অবিনাশবাবুকে চিনেছে সে! আজ তো বুঝেছে তাঁর কথার অর্থ। সেদিন তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার অর্থ এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। না—ভয় নেই। আজ যদি তার পথের সঙ্গী কেউ থাকে তবে অবিনাশবাবুই আছেন।

আরো জোর পা—আরো জোরে চলো। ভয়ের শেষ সীমাটা পৌঁচেছে বলেই আর ভয় নেই। রঞ্জু এগিয়ে চলল।

যেন ঘুমন্তের মতোই চলেছিল এতক্ষণ। চলেছিল একটা নেশার মধ্যে। যখন থামল তখন একেবারে সেই ভয়ঙ্কর কবরখানার ভাঙা গেটটার সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছে।

চারদিকে নানা আকারের ভাঙা সমাধি। কতদিনের কত মৃত্যু এখানে নিস্তব্ধ হয়ে আছে কে জানে। তাদের নিশ্বাস যেন গায়ে লাগে। প্রতিটি কবরের মধ্য থেকে যেন এখনি উঠে আসবে তারা।

ওখানে ওগুলো কি জ্বলছে? জোনাকি না কতগুলো চোখ?

—'আমরা করবনা ভয়, করবনা'—

জপ করতে লাগল রঞ্জু। কিন্তু শ্বেতপাথরের সে কবরটা কোথায়?

হাতের ফ্ল্যাশ-লাইটটা জ্বালাতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল। মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল চকিতের মধ্যে। একটা সাদা কবরের ওপর থেকে সাদা একটা মূর্তি আস্তে আস্তে উঠে আসছে। তার হাত দুটো সামনের দিকে—রঞ্জুর দিকেই প্রসারিত!

রঞ্জু কী বলে চীৎকার করে উঠেছিল, কী ভাবে টলে পড়ে যাচ্ছিল মনে পড়ে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কে তাকে পেছন থেকে বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয় দিলে।

—ভূত?

না, বেণুদা।

পাঁচ সাত মিনিট পরে যখন রঞ্জু প্রকৃতিস্থ হল, তখন লজ্জায় আর অপমানে সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বিপ্লবী রঞ্জুর চোখ দিয়েও জল নেমে এসেছে।

—বেণুদা, আমি কাপুরুষ।

বেণুদা হাসলেন, তাই নাকি?

—আমি ভীরু, ভয় পেয়েছিলাম। আমাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিন।

অন্ধকারকে উচ্চকিত করে দিয়ে বেণুদা হেসে উঠলেন: দূর পাগল।

—আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে বেণুদা।

বেণুদা সস্নেহে রঞ্জুর ঘাড়ে হাত রাখলেন: ভয় পাওয়াটা লজ্জার নয় ভাই, মানুষমাত্রেই ভয় পায়। যে বলে আমি কখনো ভয় পাইনি, সে মিথ্যেবাদী।

—কিন্তু—

ততক্ষণে ফিরে চলেছে দুজনে। বেণুদা বললেন, তোমার ভয় আছে কিনা এ আমি পরীক্ষা করতে চাইনি, কতটা সাহস আছে তাই পরখ করতে চেয়েছিলাম। পরীক্ষায় উতরে গেছ তুমি। লজ্জার কিছু নেই, তোমার মতো বয়েসে এতটা পথ আমিই এভাবে আসতে পারতাম না।

কথাটার ভেতরে সান্ত্বনা আছে, আশ্বাসও আছে। তবুও কোথায় খোঁচা লাগে রঞ্জুর। সে ছেলেমানুষ, আর তারই একটা নির্দিষ্ট সীমা মেনে নিয়ে বেণুদা বিচার করেন তাঁকে। তাই তার এতটুকু ভয়ের জন্যে তিনি ক্ষমা করতে পেরেছেন রঞ্জুকে। কিন্তু তিনি নিজে যে এভাবে একা চলে এসেছেন, কই, তাঁর তো ভয় করেনি। ছেলেমানুষি কবে কেটে যাবে রঞ্জুর, কবে সে পাবে টেগরার মতো বীরের মর্যাদা? কবে সে টেগার্টের মতো শত্রুর ওপরে গুলি ছুঁড়ে অমর মৃত্যুর গৌরব লাভ করতে পারবে?

অনেকটা পা নিঃশব্দে এগিয়ে এল দুজনে। রঞ্জু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, বেণুদা?

—অ্যাঁ?

—চট্টগ্রামের মতো কী আমরাও পারি না?

—পারি বইকি।—বেণুদা সস্নেহে বললেন, কিন্তু তার জন্যে তো তৈরী হওয়া চাই। অকারণে কতগুলো প্রাণ দিয়ে তো কোনো লাভ নেই ভাই। দেশের জন্যে মরতে পারা নিশ্চয় গৌরব, কিন্তু মরাটাই তো আমাদের আসল লক্ষ্য নয়। ভালো করে আমরা বাঁচতে চাই বলেই তো এই রক্তের পথ বেছে নিয়েছি।

রঞ্জু আবার চুপ করে গেল। বেণুদাকে ঠিক ধরতে পারে না, মাঝে মাঝে যেমন উল্‌টো পাল্‌টা মনে হয় তাঁর কথাগুলো।

হঠাৎ বেণুদা বললেন, গান জানো রঞ্জু?

—গান!—রঞ্জুর আশ্চর্য লাগল। ঠিক এমনি একটা অবস্থায় গান জানা না জানার প্রশ্নটা যেন অশোভন আর খাপছাড়া বলে মনে হল তার।

বেণুদা আবার বললেন, হাঁ গান। রাত্রির অন্ধকারে এমনি পথ চলার সময় গানের চেয়ে বড় পাথেয় আর কী আছে? একেবারেই গাইতে পারো না তুমি?

তেমনি বিহ্বল বিস্মিতভাবে রঞ্জু বললে, না।

—আচ্ছা, তবে আমিই গাই। আমার গলা ভালো নয়, তাই বলে সমালোচনা কোরো না কিন্তু।—চাপা কণ্ঠে বেণুদা গান ধরলেন:

সকল কলুষতামস হর
জয় হোক তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন কর
নিখিল ভুবনময়—

এবার রঞ্জুর বিস্ময় আর সীমা মানল না। অন্ধকার পথ। কাঞ্চন নদীর দিক থেকে শোঁ শোঁ করে আসছে বাতাসের ঝলক। পথের দুধারে গাছের ঘন ছায়ায় রাত্রি আছে সঞ্চিত হয়ে। নিষিদ্ধ পথচারণার একটা রোমাঞ্চ জাগানো অপূর্ব উন্মাদনা দুলে দুলে ফিরছে রক্তের মধ্যে—এমন সময় একি গান, এ কেমন গান?

আবেগ-আকুল কণ্ঠে বেণুদা গেয়ে চললেন:

করুণাময় মাগি শরণ
দুর্গতিভয় করহ হরণ

দাও দুঃখ বন্ধ-তরণ

মুক্তির পরিচয়—

একটা আশ্চর্য গভীরতা এই গানে, একটা নিবিড় আর গভীর মাদকতা। রঞ্জুর চেতনা যেন অভিভূত হয়ে এল। অন্ধকারে বেণুদাকে ভালো করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না তাঁর কালো পাথরে গড়া পেশল দীর্ঘ শরীরকে, সংকল্পে আগ্নেয় চোখের দৃষ্টিকেও। একি সেই মানুষ, যিনি তরুণ-সমিতির বাছা বাছা ছেলেগুলোকে গড়ে তুলছেন অসঙ্কোচে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে, দুর্গম সংকটে-ভরা রক্তাক্ত পথে এগিয়ে চলবার জন্যে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল অবিনাশবাবুকে। এমনি বিভোর হয়ে গান গাইতেন—ঝাপসা ছবির মতো মনে আসে এমনি করে গভীর আর নিবিড় হয়ে আসত তাঁর গলা। তাঁর মুখেই তো রঞ্জু শুনেছিল, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে'। সে গানের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল আছে এই গানের। শুধু এইটুকুই নয়, আরো মিল আছে। সেই অবিনাশবাবুই যখন স্বেচ্ছায় মরণের দিকে এগিয়ে গেলেন তখন কোনো ভয়, কোনো সংযম তো তাঁকে ফেরাতে পারেনি।

রঞ্জু যেন চমকে গেল। কার পাশে পাশে, কার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে সে? একি বেণুদা না অবিনাশবাবু? একজন শ্মশানের বুকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে, আর একজন শ্মশানের মধ্য থেকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। অবিনাশবাবুর পুনর্জন্ম হয়েছে কি বেণুদার মধ্যে, স্বরাজের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন তিনি?

—কী ভাবছ?

ঘোরটা কেটে গেল। লজ্জিতভাবে রঞ্জু জবাব দিলে, কিছু না।

—গানটা ভালো লাগল না তো?

—চমৎকার।

বেণুদার আজ যেন কী হয়েছে। অত গভীর, অমন কঠিন মানুষটার মধ্যে এসেছে একটা ছেলেমানুষি খুশির জোয়ার। বললেন, তুমি কম্‌প্লিমেণ্ট দিলেই কি আমি বিশ্বাস করব? নিজের ভীমসেনী গলা আমি নিজেই চিনি।

—না, সত্যিই চমৎকার।

—যাক, অন্তত একজন গুণগ্রাহী পাওয়া গেল—বেণুদা তরল গলায় বললেন: বাড়িতে তো গান গাইবার উপায় নেই। আমি সুরু করলেই করুণা তেড়ে আসে। তবু সুযোগ পেয়ে তোমাকে খানিকটা শুনিয়ে দেওয়া গেল।

—করুণাদি বুঝি ভালো গাইতে পারেন?—রঞ্জু উৎসাহী হয়ে উঠল।

—আমার চাইতে ভালো নিশ্চয়ই। ও আমার শত্রু হলেও সেটা অস্বীকার করা যাবে না।—বেণুদা হাসলেন, রঞ্জুও হাসিতে যোগ দিলে।

—মিউ মিউ—

রাস্তার পাশ থেকে ক্ষীণ কান্নার মতো আওয়াজ ভেসে এল একটা। বেণুদা থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

—মিউ মিউ—

রঞ্জু বললে, ও কিছু না, বেড়াল ছানা।

বেণুদা বললেন, দাও তো তোমার টর্চটা।

টর্চ জ্বালতেই চোখে পড়ল পথের ধারে শুকনো একটি কাঁচা ড্রেনের মাঝখানে ছাই রঙের একটি বেড়ালের বাচ্ছা। একেবারেই শিশু, এখনো মায়ের দুধ ছেড়েছে কিনা বলা শক্ত। টর্চের আলোয় কেমন অভিভূত হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে কেমন করুণ অসহায় দৃষ্টিতে। ক্ষীণভাবে আবার কান্নাভরা গলায় যেন বললে, মিউ! চারদিকের এই অন্ধকার, এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে বুঝেছে নিজের নিরুপায় অবস্থা, ক্ষুধায় কাতর হয়ে হয়তো বা ভয়ার্ত নিষ্ফল কান্নায় খুঁজে ফিরছে নিজের হারানো মাকে। যে মার বুকের ভেতর ওর আশ্রয় আছে, আশ্বাস আছে।

বেণুদা ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ালেন বাচ্ছাটার দিকে। পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বেণুদা ধরে তাকে একেবারে নিজের বুকের কাছে তুলে আনলেন।

—আহা, একেবারে কচি বাচ্ছা! শেয়ালে কেন যে এতক্ষণ খায়নি তাই আশ্চর্য!

রঞ্জু বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন করল, আপনি কী করবেন ওটা দিয়ে?

—বাড়িতে নিয়ে যাব।—শান্ত কোমল গলায় উত্তর এল: অন্তত বাঁচাবার চেষ্টা করব। কিন্তু এখন আর নয় ভাই। শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছি; এক রাস্তা দিয়ে দুজনে পাড়ায় ঢোকাটা ঠিক হবে না। আমি এই বাগানটা দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সোজা চলে যাও।

পরক্ষণেই রঞ্জু দেখল—বাগানের কালো ছায়ার মধ্যে আরো কালো একটা ছায়ার মতোই বেণুদা মিলিয়ে গেলেন। (ক্রমশঃ)

নবজীবনজাগরণম্

তাল—ত্রিতাল

কথা সুর ও স্বরলিপি :— শ্রীদিলীপকুমার রায়

(জহরলাল তাঁর Discovery of India-য় বলেছেন ভারতের সংস্কৃতির ঐক্যের মূলে—সংস্কৃত ভাষার ইন্দ্রজাল। স্বাধীন ভারতে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার হবেই হবে। সংস্কৃতে গাইতে শেখা ভারতীয় গায়ক মাত্রেরই একটি মহাকর্ত্তব্য। তাই জাতীয় সঙ্গীতটির তর্জমা ও স্বরলিপি প্রকাশিত হ'ল। ইতি—সুরকার)

ভারতনিশান্তমিহাগতং নবভানুশঙ্খমাঘ্মাতং ভোঃ।
গায়তি নবপ্রভাতং ভোঃ॥

প্রোজ্জ্বলদীপে ভবনে গ্রথিতাঃ সুন্দরসুগন্ধিমালাঃ।
ফুল্লাঃ সান্দ্রস্বপ্নভুরাশাঃ পুরনরনারীবালাঃ॥
ধমতি প্রবলং যৌবনসূর্য্যো গগনে গৌরবতূর্য্যম্।
প্রতন্বন্তি কবিগুণিনঃ সুভগা অমৃতগীতমাধুর্য্যম্॥
সুখঝঙ্কারে প্রাণবিতানে বিলুপ্তমশিবং শিবতমগানৈ-
র্দক্ষিণনাম খ্যাতং ভোঃ।
ধাবতি পুরতো মানবজাতির্দীব্যতি জীবনজাগরভাতি-
র্বিপুলং প্রেমায়াতং ভোঃ॥

অধর্মশঙ্কা-মৎসরমিথ্যা-বিক্লব মাহাৎ পাতং ভোঃ।
গায়তি নবপ্রভাতং ভোঃ॥

অমরধ্যানাসীনা ভবাম মুগ্ধং স্বার্থং মুক্ত্বা।
জপাম যুগর্ষি মন্ত্রবরাভয়মিহ চিরতরণং বুদ্ধা॥
ভাবী কালো বিনম্য বরদাং কমলাং ভবিতা ধন্যঃ।
নববিজয়ধ্বনিবাণীং বৃত্বা তরিতা হি নির্বিষণ্ণঃ॥
সুখঝঙ্কারে প্রাণবিতানে বিলুপ্তমশিবং শিবতমগানৈ-
র্দক্ষিণনাম খ্যাতং ভোঃ।
ধাবতি পুরতো মানবজাতির্দীব্যতি জীবনজাগরভাতি-
র্বিপুলং প্রেমায়াতং ভোঃ॥

পাদটীকা : ফাল্গুনের ভারতবর্ষে যে-জাতীয় সঙ্গীতটির স্বরলিপি দেওয়া হয়েছিল এটি তারই ভাবানুবাদ তথা সুরানুবাদ। বিখ্যাত ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত La Marseillaise-এর সুরের অনুভাবে রচিত। গান্ধি-স্মৃতি-ফাণ্ডের জন্য ত্রিচিনপল্লীতে শ্রীদিলীপকুমার তদীয় তামিল ছাত্রী খ্যাতনামা শ্রীমতী কান্তিমতীর সঙ্গে এটি গান করেন এপ্রিলে।

\+ ২ ০ ১
II সা -া সা সা | মা মা -া মা I পা পা -া পা | র্সা -া ধা মা I
ভা - র ত নি শা ন্ ত মি হা - গ ত ঃ ন ব
অ ধ র্ ম শ ং কা - ম ৎ স র মি - থ্যা -

\+ ৩ ॥
মা ধা পধপা মা | -া রা ণা -া I ধা পধা পা গা | মা -া -া -া I
ভা - নু শ ং খ মা ধ্ মা - ত ং ভো : - -
বি - ক্ল ব মো - হা ৎ পা - ত ং ভো : - -

সা -া সা সা | মা মা -া মা I মা ধা মা ধা | ধর্া র্সর্সা -া -া II
গা - য় তি ন ব - প্র ভা - ত ং ভো : - -
গা - য় তি ন ব - প্র ভা - ত ং ভো : - -

মা পা পা ধা | ধা ণা ধা ণা I ধা ধা পা -া | পা পা পা ধা I
প্রো - জ্জ্ব ল দী - পে - ভ ব নে - গ্র থি তা -
অ ম র - ধ্যা - না - সী - না - ভ বা - ম

ণা -া ণা ণা | ণা ণা র্সা ণর্সণা I ধা -া ধা -া | -া -া -া -া I
সু ন্ দ র সু গ ন্ ধি মা - লা : - - - -
মু গ্ ধ ং স্বা র্ থ ং মু ক্ ত্বা - - - - -

র্সা -া ধা মা | র্সা -া ধা মা I র্সা -া ধা মা | সা -া সা -া I
ফু ল্ লা : সা ন্ দ্র - স্ব প্ ন ছু রা - শা :
জ পা - ম যু গ মৃ র্ষি ম ন্ ত্র ব রা - ভ য়

সা সা গা গা | পা -া ধা ণা I মা -া মা -া | -া -া -া -া I
পু র ন র না - রী - বা - লা : - - - -
স্নি হ চি র ত র ণং - বু দ্ ধবা - - - - -

সা মা সা মা | সা মা সা মা I পা -া পা দা | পা দা পা দা I
ধ ম তি - প্র ব ল ং যৌ - ব ন সু মৃ যো -
ভা - বী - কা - লো - বি ন - ম্য ব র দা ং

ণা ধা ণা ধা | ণা ধা ণা র্সা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
গ গ নে - গৌ - র ব তু মৃ য ম্ - - - -
ক ম লা ং ভ বি তা - ধ - ন্ধ : - - - -

র্সা র্সা -া র্সা | -া র্সা র্সা র্সা I পা দা পা ণা | দণদা পা মা গা I
প্র ত - স্ব ন্ তি ক বি গু ণি ন : সু ভ গা -
ন ব বি জ য় - ধ্ব নি বা - ণী ং বৃ - ত্বা -

মা পা দা পদপা | মা গা মা পা I দা সা সা -া | -া -া -া -া I
অ মৃ ত গী - ত মা - ধ মৃ য় ম্ - - - -
ত বি তা - হি নি মৃ বি ষ ণ্ ণ : - - - -

কোরাস

র্সা র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সর্রা র্সর্সা I মা পা পা পা | পা -া পা -া I
সু খ ঝ ং কা - রে - প্রা - ণ বি তা - নে -

র্সা র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা র্সর্সা I মা পা পা পা | পা -া পা -া I
বি লু প্ ত ম শি ব্ ম্ - শি ব ত ম গা - নৈ মৃ

সা -া সা সা | মা -া মা -া I মা ধা মা ধা | ধর্রা র্সর্সা -া -া I
দ - ক্ষি ণ না - ম - খ্যা - ত ং ভোঃ - - -

সা -া সা সা | মা মা মা -া I পা -া পা পা | ধা -া ধা ণা I
ধা - র তি পু র তো - মা - ন ব জা - তি মৃ

পধা -া ধা ধা | ণা -া র্সা র্রা I র্রা পা পা পা | পা -া পা -া I
দী - ব্য তি জী - ব ন জা - গ র ডা - তি মৃ

র্রা র্রা র্রা -া | র্সা -া ধা -া I ণা ধণা পা গা | মা -া -া -া II
বি পু ল ং প্রে - মা - য়া - ত ং ভো : - -

বাঙ্গালার বিপদ—

বাঙ্গালা দেশ আজ নানাভাবে বিপন্ন। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙ্গালা দেশ বিভক্ত হইয়াছে, তাহার দুই তৃতীয়াংশ পাকিস্থানের মধ্যে গিয়াছে—আর মাত্র এক তৃতীয়াংশ লইয়া নূতন পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালার যে সকল স্থানে অধিক পাট ও ধান উৎপন্ন হইত, সে সকল স্থানের অধিকাংশই পাকিস্থানের মধ্যে পড়িয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার প্রায় সকল স্থানই অনুর্ব্বর—সে সকল স্থানে ফসল ফলাইতে কৃষকদিগকে বিশেষ কষ্ট করিতে হয়। মেদিনীপুর জেলার একটা বড় অংশ অনুর্ব্বর—সে অঞ্চলে শক্ত মাটি ও জঙ্গল অধিক। দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ী জেলা পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ—কাজেই সে অঞ্চলে অধিক ফসল করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার নদী, খাল, বিল প্রভৃতি মজিয়া যাওয়ায় ঐ দুইটি জেলার অধিকাংশ স্থান ম্যালেরিয়ার ফলে বাসের অযোগ্য হইয়াছে—অধিবাসীরা গৃহত্যাগ করায় বন, জঙ্গল ও পতিত জমিই অধিক। ২৪ পরগণা জেলার কতকাংশ ম্যালেরিয়া প্রভৃতির জন্য জনশূন্য —আর অধিকাংশ স্থান সুন্দরবনের অন্তর্গত—সে সকল স্থলে সমুদ্রের লোনা জল আসে বলিয়া ভাল ফসল হয় না। মোটের উপর পশ্চিম বাঙ্গালায় যেটুকু চাষের জমি পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে বহু অর্থব্যয়ে অনেক নূতন নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে জন্য এ অঞ্চলে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা গিয়াছে। নূতন সরকারী পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে অন্ততঃ ৫ বৎসর সময় লাগিবে—ততদিন পশ্চিম বাঙ্গালার বর্ত্তমান খাদ্যাভাব দূর হওয়া অসম্ভব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি—

ইহার উপর পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যা গত ১০ মাসে এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছে যে—সে সমস্যা সমাধানে সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। বাঙ্গালার যে দুই তৃতীয়াংশ স্থান পাকিস্থানের অন্তর্গত হইয়াছে, সে স্থানে হিন্দু অধিবাসীদের পক্ষে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া বাস করা অসম্ভব হইয়াছে। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম ৬ মাসে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক তাহাদের পূর্ব্ববাসস্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় চলিয়া আসিয়াছে। সরকারী অব্যবস্থার ফলে প্রায় সকল হিন্দু সরকারী কর্ম্মচারী পশ্চিম বাঙ্গালায় চাকরী লইয়াছেন ; সে জন্য পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের চাকুরিয়ার সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে তাহাদের উপযুক্ত কাজ দেওয়া সম্ভব নহে। পাকিস্থানী মুসলমানদের অনাচারের ফলে ও ভয়ে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রায় সকল হিন্দু অধিবাসীই পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। গত আন্তর্দেশিক চুক্তির পর পূর্ব্ব-পাকিস্থানে হিন্দু অধিবাসীদের প্রতি একটু নরম ব্যবহার দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে কোন হিন্দু অধিবাসীই স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে বাস করা নিরাপদ মনে করেন নাই। তাহা ছাড়া পূর্ব্ববঙ্গে রাতারাতি শিক্ষা ব্যবস্থার এমন পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে যে, হিন্দু ছেলেমেয়েদের পক্ষে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। সে জন্য পূর্ব্ববঙ্গের স্কুল কলেজগুলি প্রায় সবই ছাত্রশূন্য হইয়াছে। শিক্ষকগণ বেকার হইয়া চাকরীর চেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অরাজকতা—

যে সকল হিন্দু নিজ নিজ বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, পাকিস্থানী মুসলমানগণ নির্ভয়ে সে সকল গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে, এমন কি বাড়ীর টিনগুলি পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া নিজ নিজ কাজে লাগাইয়াছে। খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা প্রভৃতি বড় বড় সহরের অধিকাংশ বড় বাড়ীর মালিক ছিল হিন্দু—পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সরকার সরকারী প্রয়োজনে সে সকল হিন্দুদের বাড়ী প্রায় জোর

করিয়া দখল করিয়া লইয়াছেন ও দখল করার সময় ২৪ ঘণ্টার নোটীশ দিয়া সে সকল বাড়ীর মালিককে গৃহচ্যুত করিয়াছেন। ঐ সকল গৃহে, হয় সরকারী অফিস বসিয়াছে, না হয় সরকারী মুসলমান কর্ম্মচারীদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদিগকে তাহাদের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষগুলি পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া পশ্চিম বঙ্গে আসিতে দেওয়া হয় নাই—তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কতক মুসলমানরা জোর করিয়া দখল করিয়াছে —কতক স্থানাভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমন কি মুসলমানরা জোর করিয়া গাছ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, ক্ষেতের ফসল ও গাছের ফল লইয়া গিয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াও তাহার কোন ফল হয় নাই। পাকিস্থানের বহু হিন্দু ব্যবসায়ী তাহাদের ব্যবসা বন্ধ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। হিন্দু দোকানীর নিকট মাল লইয়া মুসলমান ক্রেতা—হয় আদৌ দাম দেয় না—বা হয় সামান্য মাত্র দাম দিয়া চলিয়া যায়—এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে। তাহার প্রতিবাদ করিলে মুসলমান জনতা দোকান লুঠ করে। সর্ব্বত্র হিন্দুর দেবমন্দিরগুলি কলুষিত হইতেছে ও দেবসেবায় বাধা দান করা হইতেছে। পাবনা, রাজসাহী, বগুড়া প্রভৃতি জেলার প্রায় সকল ধনী, জমীদার, ব্যবসায়ী, প্রভৃতি নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।

প্রাদেশিকতা—

এই ত গেল পূর্ব্ব পাকিস্থানের পক্ষ হইতে বিপদের কথা। বাঙ্গালা দেশ নূতন ভারতীয় রাষ্ট্রে তাহার সীমান্তবর্ত্তী যে সকল প্রদেশ হইতে সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিবে আশা করিয়াছিল, সে সকল প্রদেশে দারুণ প্রাদেশিকতা দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে বাঙ্গালী অধিবাসীদিগকে অকারণ নির্য্যাতন ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। ইহার পর ঐ সকল প্রদেশে বাঙ্গালীর পক্ষে নিরাপদে বাস করা সম্ভব হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। নূতন স্বাধীন ভারতে আমরা, সকল প্রদেশের অধিবাসীরা—এক জাতি, এক প্রাণ হইয়া বাস করিবার আশা করিয়াছিলাম—কিন্তু যে ভাবে দ্রুত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছি।

উড়িষ্যা—

গত ৫ শত বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যার সহিত বাঙ্গালার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ফলে উড়িষ্যায় বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা দেশে উড়িষ্যাবাসীরা নিরাপদে ও বন্ধুত্বের সহিত বাস করিয়াছে—একে অপরের অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছে। উড়িষ্যায় বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা কম নহে। বিশেষ করিয়া পুরী তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পুরীতে বহু বাঙ্গালী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর 'উড়িষ্যা উড়িয়াদের' এই ধুয়া তুলিয়া একদল লোক উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালী বিতাড়নের আন্দোলন করিতেছেন। তাহার ফলে বাঙ্গালীদের পক্ষে উড়িষ্যায় বাস করা কষ্টকর হইয়াছে—পুরীর সমুদ্রতীরে বহু বাঙ্গালী ভ্রমণকারী নিগৃহীত ও প্রহৃত হইয়াছেন। বাজারে উড়িষ্যাবাসী বিক্রেতা উড়িয়া ক্রেতার নিকট জিনিষের যে মূল্য দাবী করে, বাঙ্গালী ক্রেতার নিকট তদপেক্ষা অধিক মূল্য দাবী করিয়া থাকে। পুরীতে বাঙ্গালীর কোন খালি বাড়ী পাইলেই উড়িয়ারা তাহা বলপূর্ব্বক দখল করিতেছে। বালেশ্বর, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানেও বাঙ্গালী বিতাড়ন আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করায় উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীরা আতঙ্কিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে লক্ষ লক্ষ উড়িয়া নানা কাজের জন্য বাস করে—তাহাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া উড়িষ্যার রাষ্ট্রপরিচালকদের এমন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, যাহার ফলে উড়িষ্যায় বাঙ্গালীরা যেন নিরাপদে বসবাস করিতে পারে।

আসাম—

আসাম বাঙ্গালার সন্নিহিত প্রদেশ—বর্ত্তমানে যে ভাবে আসাম প্রদেশ গঠিত, তাহার কয়েকটি জেলায় অসমিয়া অধিবাসীর অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষাভাষী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। তাহা ছাড়া বাঙ্গালার সংস্কৃতির সহিত আসামের সংস্কৃতির বিশেষ পার্থক্য নাই। বহু বাঙ্গালী বহু শত বৎসর ধরিয়া আসামে বাস করিতেছে। মৈমনসিংহের বহু অধিবাসী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসামের বন জঙ্গলে যাইয়া নূতন বসতি স্থাপন করিয়া চাষ করিতেছে। চা-

বাগানগুলিও অধিকাংশ স্থলে বাঙ্গালীর সৃষ্টি। সম্প্রতি রেলের কাজের জন্ত বহু বাঙ্গালী যাইয়া আসামে বাস করিতেছে। আসামেও একদল অসমিয়া প্রাদেশিকতা প্রচারে অগ্রসর হইয়া গত কয়মাস হইতে বাঙ্গালী বিতাড়ন আন্দোলন পরিচালন করিতেছে। সম্প্রতি গত ৫ই মে হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত ১৫ দিনে আসামের একটি সহরে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী আসামীদের হাতে নিগৃহীত হইয়াছেন ও অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির ফলে তাহাদের কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। আসামকে নানা বিষয়ে বাঙ্গালার মুখাপেক্ষী হইতে হয়। এ অবস্থায় যদি আসামে বাঙ্গালীরা এই ভাবে নির্য্যাতীত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে সর্ব্বত্র প্রাদেশিকতা বাড়িয়া যাইবে ও অসমিয়াদিগকে অযথা বিপন্ন হইতে হইবে। এই প্রাদেশিকতা দমনে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

বিহার—

বিহারের বহু জেলায় বাঙ্গালা ভাষাভাষী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। মানভূম ও সাওতাল পরগণা জেলার অধিকাংশ লোক বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করে। সিংহভূম, হাজারিবাগ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলারও অনেক স্থানেই বাঙ্গালাভাষাভাষী লোকের সংখ্যা অধিক। পাকিস্থান পৃথক হওয়ার পর পশ্চিম বাঙ্গালা আয়তনে অত্যন্ত ছোট হওয়ায় বাঙ্গালীরা বিহারের বাঙ্গালাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করার দাবী করিতেছে। এ দাবী নূতন নহে—১৯১১ সালের কংগ্রেসের প্রস্তাবে, ১৯২৮ সালের নেহরু রিপোর্টে ও ১৯৪৬ সালের কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে ভাষা হিসাবে প্রদেশ বিভাগের দাবী স্বীকৃত হইয়াছিল। এখন বিহারের কংগ্রেস-মন্ত্রীরা ও বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ (বিহারবাসী) বাঙ্গালার এই দাবী যাহাতে অগ্রাহ্য হয়, সে জন্ত বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভায় বর্ত্তমানে বাঙ্গালার প্রভাব প্রতিপত্তি কম বলিয়া বাঙ্গালার এই দাবী সর্ব্বত্র উপেক্ষিত হইতেছে। কাজেই বাঙ্গালাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি যাহাতে পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করা হয়, সে জন্ত প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবহিত হইয়া আন্দোলনে যোগদান করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিতে হইলে পশ্চিম বাঙ্গালার আয়তন বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা না করিলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত এত লোকের চাষবাসের স্থান সঙ্কুলান হইবে না—লোক বাসগৃহের অভাবে ও খাদ্যাভাবে মারা যাইবে।

সেরাইকেলা ও খরসোয়ান—

সেরাইকেলা ও খরসোয়ান দুইটি রাজ্য বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রান্ত-দেশে অবস্থিত। উভয় রাজ্যেই বাঙ্গালা-ভাষাভাষী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। এতদিন রাজ্য দুইটি উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল। সম্প্রতি স্থানীয় অধিবাসীরা রাজ্য দুইটিকে বাঙ্গালার সহিত একত্র করিবার আন্দোলন করায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এক অনুসন্ধান কমিশন গঠন করিয়া কমিশনের নির্দ্দেশ মত রাজ্য দুইটিকে বিহারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এ ব্যবস্থা যে কিরূপে সম্ভব হইল তাহা বুঝিবার উপায় নাই; এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে উড়িষ্যায় যেমন সর্ব্বত্র আন্দোলন চলিতেছে, তেমনই বাঙ্গালা দেশেও আন্দোলন হওয়া উচিত। কি করিয়া তদন্ত কমিশন বিহারের পক্ষে মত দিয়াছেন, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনরায় তদন্ত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি-বিশেষের মুখ চাহিয়া যদি এ ভাবে স্বাধীন ভারতে প্রাদেশিকতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাহার ফল কখনই শুভ হইতে পারে না।

মিথ্যা প্রচার—

বিহারে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার কার্য্য চলিতেছে। সম্প্রতি পাটনার একখানি ইংরাজি দৈনিক পত্রের কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি ঐ পত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে কলিকাতায় বাঙ্গালীরা বিহারীদিগকে পথে ঘাটে সর্ব্বত্র ধরিয়া মারিতেছে ও বিহারীয়া যাহাতে বাঙ্গালায় আর বাস না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছে। এইরূপ নির্জ্জলা মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়া বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যাহারা বিহারীদিগকে উত্তেজিত করিতেছে, তাহাদের শাস্তি-বিধান না করিলে উভয় প্রদেশেই প্রাদেশিকতা ক্রমে বাড়িয়া যাইবে ও তাহার ফলে দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

শিল্প ও শিল্পী

মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিনির্মাণরত মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট-আর্ট-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

মানভূমের কথা

মানভূমের বাঙ্গালা ভাষাভাষীদিগকে জোর করিয়া হিন্দী শিখাইয়া তাহাদের হিন্দী ভাষাভাষী করিবার জন্য স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ঐ সকল অনাচারের প্রতিবাদ করিয়া মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ ও সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত বহু সদস্য সমেত জেলা কংগ্রেসের সদস্য পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতুলবাবু ঐ অঞ্চলে সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁহার পক্ষের কথা ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিকার ব্যবস্থা করা উচিত। বিহারবাসী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি বলিয়া যদি বিহার নানারূপ অনাচার করিয়াও দণ্ডিত না হয়, তবে তাহা দেশের পক্ষে কলঙ্কের বিষয় হইবে।

দুর্নীতি দমন—

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত ৬ই জুন নয়াদিল্লীতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন—কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ সমস্যার মত সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে দুর্নীতি বিতাড়ন সমস্যা তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখিয়াছে। দুর্নীতি গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতের সর্ব্বত্র এমন ব্যাপক হইয়াছে যে তাহার ফলে কোন ব্যবস্থাই জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারিতেছে না। সম্প্রতি কলিকাতায় বহু বড় বড় সরকারী চাকুরিয়া দুর্নীতির জন্য ধৃত হইয়াছেন। পুলিস প্রভৃতি বিভাগেও দুর্নীতি দমন আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে দুর্নীতি তাড়াইবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। বিশেষ করিয়া অসামরিক সরবরাহ বিভাগে দুর্নীতি অধিক। শ্রীযুক্ত

প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের মত নির্ভীক, তেজস্বী লোক ঐ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর লোক ঐ বিভাগ হইতে দুর্নীতি দূর হইবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু সে আশাও ফলবতী হয় নাই। পণ্ডিত জহরলাল এ বিষয়ে যত কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, দেশবাসী বিনা দ্বিধায় তাহা সমর্থন করিবে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ উপযুক্ত কার্য্যকরী হয় নাই—আরও কঠোরতার সহিত যাহাতে দুর্নীতি দমন কার্য্য পরিচালিত হয়, আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

পাকিস্থানে ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর—

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অধ্যাপক শ্রীযুত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতি-সভা হইয়া গিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত গ্রন্থরাজি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইলেও দেশে সেগুলির এখন পর্য্যন্ত ব্যাপক প্রচারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এ বিষয়ে স্বাধীন বাঙ্গালা দেশে চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই—

এই বিদেশী কোম্পানী কলিকাতা সহরে ইলেকট্রিক সরবরাহ করিয়া থাকে। অন্যান্য সহরের তুলনায় এই কোম্পানী জনগণের নিকট অধিক মূল্য গ্রহণ করে। সে জন্য বাঙ্গালা সরকার উক্ত কোম্পানী ক্রয় করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করেন। গভর্ণর মিঃ কেসির আমলে কোম্পানীকে তাহাদের জিনিষপত্রের মূল্য বাবদ ৩০ কোটি টাকা প্রদান করা স্থির হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ঐ টাকা অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এখন আবার নূতন করিয়া মূল্য স্থির করিয়া উক্ত কোম্পানী কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

কলিকাতা মণিমেলায় আচার্য্য জে-বি কৃপালনী, রাষ্ট্রপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি

ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

নূতন বিভাগ—

গত ৬ই জুন দিল্লীতে এক বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ সমস্যার মত সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি দমনও একটি বড় সমস্যা বলিয়া ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ৮ই জুন পশ্চিম বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এ প্রদেশে সরকারী দপ্তরখানায় একটি দুর্নীতি দমন বিভাগ খোলার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সকলের মধ্যে, বিশেষ করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি এত বাড়িয়াছে বলিয়াই আজ দেশের অবস্থা এত শোচনীয়

হইয়াছে। প্রকাশ্য ভাবে ঘুস-গ্রহণ বা প্রকাশ্য স্থানে চোরা-কারবার পরিচালন যেন রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই দেশের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিবে। কঠোরতার সহিত দুর্নীতি দমন বিভাগকে কাজ করিতে দেখিলে দেশের নিপীড়িত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণ স্বস্তি অনুভব করিবে।

কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ—সঙ্গে নেতা শ্রীবিপিন গাঙ্গুলী ফটো—তারক দাস

জাতীয় সঙ্গীত—

ভারত গভর্ণমেণ্ট কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও পশ্চিম বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের বাংলা গান জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছে—ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের সংবাদ হইলেও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের যে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে জাতীয়তা ও শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত না হওয়ায় বাঙ্গালী মাত্রই দুঃখিত হইবেন। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের সহিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু স্মৃতি জড়িত থাকায় তাহাই জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গৃহীত হইলে ভাল হইত। এখনও গণপরিষদে এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই—সে সময়ে যেন সকলে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের ইতিহাস ও তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া যাহাতে উহার দাবী উপেক্ষিত না হয়, ইহাই দেখেন এ বিষয়ে পশ্চিম বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও বিবৃত্তি প্রকাশ করিয়া সকলকে দেশবাসীর মনোভাব জ্ঞাপন করিতে দ্বিধা করেন নাই।

বাঙ্গালায় কম্যুনিষ্ট অনাচার—

গত ২রা জুন পশ্চিম বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় এক বিবৃতি প্রচার করিয়া কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীরা কি ভাবে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অরাজকতা সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সে বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কম্যুনিষ্টরা বিদেশ হইতে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়া এবং এ দেশের সকল কারখানার শ্রমিকদের দ্বারা ধর্ম্মঘট করাইয়া এ দেশের শাসন যন্ত্র অচল করিবার চেষ্টা করিতেছে। শিশু রাষ্ট্রের পক্ষে

বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের পর ভিতরের এই শত্রুদের দমন করা সত্যই কঠিন কার্য্য। সেজন্য কিরণবাবু এ বিষয়ে বাঙ্গালার জনগণের সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট দলকে দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যত কঠোর ব্যবস্থাই কেন অবলম্বন করুন না, আমাদের বিশ্বাস, দেশবাসী সকলেই গভর্ণমেণ্টের সে ব্যবস্থা সমর্থন করিবেন।

জোড়াসাঁকো রবীন্দ্র গৃহে—রবীন্দ্র উৎসবের সভাপতি শ্রীরাজশেখর বসু (বক্তৃতারত) ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটী হলে অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে সদ্ভাব-শতকের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ১১২তম জন্মবার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে কৃষ্ণচন্দ্রের এক জীবনী সভায় পাঠ করেন। খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে ১২৪৪ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ কবি জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যে সৌন্দর্য্যবোধ ও ভগবৎ প্রীতিই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ দান। শ্রীযুত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত সভার উদ্বোধন করেন এবং নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি অনেকে সভায় কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

জমীদারী প্রথা বিলোপ—

পশ্চিম বঙ্গে জমীদারী প্রথা বিলোপের নীতি ও কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য নিম্নলিখিত ৪ জন মন্ত্রীকে লইয়া পশ্চিম বঙ্গে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। বিমলবাবু এই কমিটীর সভাপতি হইবেন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের রিজানাল ফুড কমিশনার শ্রীযুত এন-এন খান্না
(ইনি ভারতের জন্য খাদ্য সংগ্রহ কাজে কায়রো গিয়াছেন)

পঞ্চম বাহিনী—

হিন্দুস্থানের কর্তৃপক্ষ হিন্দুস্থানবাসী সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার ফলে অনেক সময় স্থানীয় শাসকগণ হিন্দুদের প্রতি অনাচার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অথচ হিন্দুস্থানে প্রায়ই দলে দলে মুসলমান পঞ্চম বাহিনীর দল ধরা পড়িতেছে। সেদিন কানপুরে যে ১৫ জন সম্ভ্রান্ত ও ধনী মুসলমানকে ‘পঞ্চম বাহিনী’ বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের নিকট বহু প্রচার-পত্র এবং অস্ত্রও পাওয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় হিন্দুস্থানের কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত কাজ করিতে হইবে। দলে দলে মুসলমানগণও পাকিস্থান ছাড়িয়া হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কি, তাহারাই জানে।

সুরাবর্দ্দী গ্রেপ্তার—

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দ্দী পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রচারের জন্য

গমন করিলে পূর্ব্ব পাকিস্থানের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তিনি উভয় বঙ্গের মিলনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মিঃ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন—যদি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সকল হিন্দু হিন্দুস্থানে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে হিন্দুস্থানেও কোন মুসলমানের পক্ষে বাস করা সম্ভব হইবে না। হিন্দুস্থানে যে সকল মুসলমান বাস করে, তাহাদের পাকিস্থানে বাসস্থানের উপযুক্ত স্থানও নাই। কথাগুলি পাকিস্তানী মুসলমানদের ভাবিয়া দেখা উচিত।

ধানবাদে ট্রেণ দুর্ঘটনার দৃশ্য ফটো—পান্না সেন

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নৈহাটী শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষা কল্পে পশ্চিম বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন—(১) ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে সরকারী পুরস্কার ঘোষণা (২) তাঁহার জন্মদিন সরকারী ছুটী বলিয়া ঘোষণা ও (৩) তাঁহার জন্মভূমি নৈহাটী-কাঁঠালপাড়ায় ঋষি বঙ্কিম জাতীয় মেলা প্রবর্ত্তন। তাহা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি ও নৈহাটী সহরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্কিম-নগর করারও প্রস্তাব হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইলে তদ্দ্বারা দেশবাসীরই গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

নোয়াখালি পরিক্রমা -

মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালির পল্লী-পরিক্রমা পৃথিবীর বৈচিত্র্যবহুল ইতিহাসে এক সুদুর্লভ কাহিনী সংযোজিত করিয়াছে বলিলে বেশী বলা হইবে না। নোয়াখালি একদিন হিন্দুর পক্ষে শ্মশান ও মশান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট নৃশংস ও বিষাক্ত বায়ু হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। ঠিক সেই দুর্য্যোগক্ষণে মহাত্মা তাঁহার 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্রের সাধনে সেই মহাশ্মশানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন,

জীবিত হিন্দুর অস্তিত্ব না থাকিলেও অস্থিস্তূপে পথ ও প্রান্তর বিভীষিকাপূর্ণ করিয়াছিল। গৃহ ভস্মীভূত, ধন সম্পত্তি লুন্ঠিত, নারীর মর্য্যাদা বিধ্বস্ত—হিন্দুর দেবমন্দির নীরব, নিঃশব্দ। নির্জ্জন গৃহদ্বারে যত্নপালিত কুকুর বিড়ালকে শোকাশ্রু মোচন করিতেই দেখা গিয়াছিল। প্রায় চার মাস কাল গান্ধীজী এই শ্মশানে শব সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিশ্বের নরনারী বিস্ময়বিমুগ্ধ অন্তরে, অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব নোয়াখালির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অবরুদ্ধশ্বাসে দিন গণনা করিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এতাদৃশ দুর্গম যাত্রার কাহিনীও যেমন লিখিত হয় নাই, এত বড় তীর্থাভিযানের ইতিবৃত্তও কেহ শুনে নাই। ১৯৩০ সালে, ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে ষষ্ঠি বৎসর বয়স্ক লবণাভিযাত্রী বৃদ্ধের পদধ্বনিতে পৃথিবীর বক্ষে একদিন ভূমিকম্পের অনুভূতি বিপুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯৪৭এর প্রারম্ভে অশীতিপর বৃদ্ধের নোয়াখালি পরিক্রমা মানব সভ্যতার ইতিহাস আমূল আলোড়িত করিয়া দিল। ভাষার সাহায্যে বর্ণনার চেষ্টা হইয়াছে, সম্পূর্ণ হয় নাই; চিত্রকরের নিপুণ তুলিকা সে চিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই; সুগায়কের সুগীতও অর্দ্ধপথে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। মানবতার এই দুর্ম্মদ অভিযান একমাত্র সিনেমায় রূপায়িত হইতে পারিত এবং তাহাতেই মানুষ তাহার বিশালত্ব ও মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। কিন্তু নিদারুণ দুঃখের বিষয়, যে সিনেমা শিল্পের অগ্রগতি দেখিয়া আমরা বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হই, মনুষ্যত্বের এই জয়যাত্রা সম্যক মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই। ইংলণ্ডে হইলে, এতদিনে বিশ্বজগৎ এই "অত্যদ্ভূত জয়যাত্রা" দর্শনে ধন্য হইয়া যাইত; নোয়াখালি আমেরিকায় হইলে এই "একক যাত্রী" কোটী কোটী ডলার রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া আনিত; কিন্তু হায় আমাদের বঙ্গদেশ, ততোঽধিক অভাগ্য ভারতবর্ষ, মহাভারতের হস্তিনা অভিযান অপেক্ষাও বৃহৎ ও সুমহৎ অভিযানের মানবিক তথা আর্থিক সম্ভাবনা অজ্ঞাত রহিয়া গেল। "আনন্দবাজার" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের" কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সুদূর দৃষ্টি ও বাস্তব অনুভূতির উচ্চ
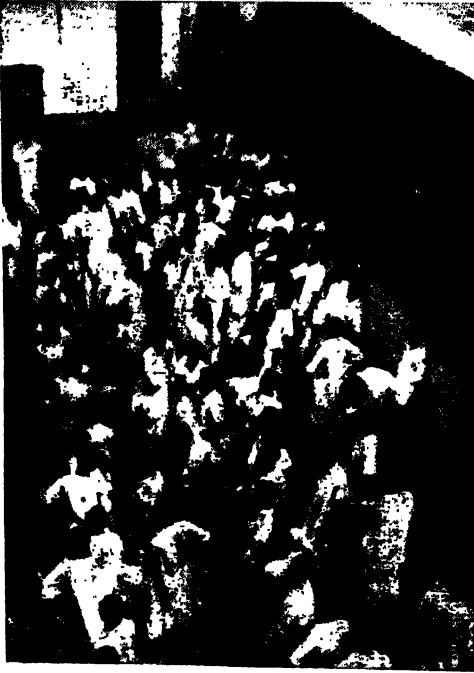
পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত চাকরীপ্রার্থীদের কলিকাতায় সরকারী ক্ষেত্রে চাকরীর জন্ত চেষ্টা ফটো—পান্না সেন

চূড়ামণিযোগে গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীর ভিড়
ফটো—গৌড়েন্দুবিকাশ রায়

প্রশংসা করিতে হইবে যে, তিনি—একমাত্র তিনি, ব্যবসায়ের দিক হইতে না দেখিলেও নোয়াখালি পরিক্রমার মানবিক মহৎ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া একটি সহজ, সরল, স্বয়ং-সম্পূর্ণ সিনেমা-চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যেদিন নির্জ্জীব নিষ্প্রাণ শ্মশানতুল্য নোয়াখালিতে মহাত্মা পদার্পণ করিয়াছিলেন, আবার যেদিন দুঃস্থ ও ক্ষতবিক্ষত বিহারের আকুল আহ্বানে, সন্ধ্যাদীপোজ্জ্বল গৃহ, শঙ্খঘণ্টানাদিত দেবমন্দির, সুখে রোমন্থনরত গো-গৃহ ও হরিধ্বনি মুখরিত নোয়াখালি ত্যাগ করিয়াছিলেন, চিত্রখানিতে সেই বিশাল বিবর্ত্তন চিত্রিত হইয়াছে। পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রীর গৃহে এই প্রাণময়, উদ্দীপনা-উজ্জ্বল, প্রেরণা-সঞ্জীবিত চিত্র

কলিকাতায় প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী উৎসবে সভাপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু (বক্তৃতারত)

ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

দেখিয়া আমরা হর্ষবিষাদে অভিভূত হইয়াছি। হর্ষের কারণ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না ; শুধু বলিতে ইচ্ছা হয়, সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের সাংবাদিক জীবনের সার্থকতা ধন্য হইয়াছে, আর দুঃখ করি এই জন্য যে অশান্তি তাপিত বিপর্য্যস্ত-অন্তর পৃথিবীর নরনারী মহামানবের এই মহান শান্তি-দৌত্যের কাহিনী হইতে বঞ্চিত থাকিতেছে বলিয়া! ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান, তাই বা কেন, সমগ্র পৃথিবীর পল্লীতে পল্লীতে বিভ্রান্ত মানবের উন্মুখ দৃষ্টির সম্মুখে এই গীতা-সম কাহিনী প্রতিবিম্বিত করিবার কি কোন উপায় নাই ?

পূর্ব্ব আফ্রিকায় হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার—

কলিকাতাস্থ ভারত সেবাশ্রম সংঘের ৮জন কর্ম্মী জুন মাসের প্রথম ভাগে হিন্দু সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই হইতে পূর্ব্ব আফ্রিকায় গমন করিয়াছেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ ঐ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন—তাঁহার সঙ্গে স্বামী পরমানন্দ, স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ, স্বামী অক্ষয়ানন্দ, ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ, ব্রহ্মচারী মৃত্যুঞ্জয়, ব্রহ্মচারী রামদাস ও সেবক কেশব গিয়াছেন। বোম্বায়ের বাঙ্গালী সমিতি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী প্রভৃতির পক্ষ হইতে তাঁহাদের বিদায়

আফ্রিকা-যাত্রী ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীবৃন্দ

সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বোম্বায়ের প্রধান মন্ত্রী বি-জি-খের, বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বিহারের গভর্ণর এম-এস-আনে, গণ-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুত মবলঙ্কর, পণ্ডিত নেহরুর সেক্রেটারী, পশ্চিম ভারতের হাই কমিশনার সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের পরিচয় পত্র ও প্রশংসাপত্রাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আমরা সংঘের এই নূতন উদ্যমের সাফল্য কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক চিকিৎসা ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট দুই কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক চিকিৎসা ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট বেসরকারী সাহায্য হিসাবে এই কার্য্যের জন্য ৮ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন ও ১৬ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি

পাইয়াছেন। প্রদেশের ৬৪০টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া ৪টি বেডসহ চিকিৎসালয় ও ৬০টি থানার প্রত্যেকটিতে ৫০টি বেডসহ চিকিৎসালয় পরিচালিত হইবে। স্থান নির্ব্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে ৬ জন ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশে একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হইবে—কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উন্নয়নের পরিকল্পনা এই বোর্ড স্থির করিয়া দিবেন।

ডাঃ বিমান মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতার খ্যাতনামা দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ বিমান মুখোপাধ্যায় গত

ডাঃ বিমান মুখোপাধ্যায়

২৭শে মে বিমানযোগে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। তিনিও তথায় দন্ত-চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। তিনি সাহিত্যিক কানন মুখোপাধ্যায় ও অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

তারাশঙ্কর সম্বর্দ্ধনা—

গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামের অধিবাসীরা ঐ গ্রামবাসী খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এক মানপত্র দান করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে তারাশঙ্করবাবুর দান চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তথাপি তাঁহার গ্রামবাসীরাও যে তাঁহার এই দানের জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়াছে, ইহা অবশ্যই আনন্দের কথা। তারাশঙ্করবাবু তাঁহার লেখার মধ্যে ঐ অঞ্চলের স্থানগুলিকে অমরত্ব দান করিয়াছেন।

পরলোকে কবিরাজ সতীশচন্দ্র সেন—

দক্ষিণ কলিকাতা নিবাসী খ্যাতনামা কবিরাজ সতীশচন্দ্র

কবিরাজ সতীশচন্দ্র সেন

সেন গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পরিণত বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বিধানে আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ও বাঙ্গালার দাবী—

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ২৭শে মে দিল্লী হইতে জানাইয়াছেন—বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষি অঞ্চলকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে কোন নূতনত্ব নাই। কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির সহিত এই দাবীর পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। আজ পশ্চিম বঙ্গে সকলেই এই দাবী সম্পর্কে একমত। বঙ্গ বিভাগের ফলে এই যৌক্তিকতা বাড়িয়া গিয়াছে। কেবল সমৃদ্ধির জন্য নহে, পশ্চিম বঙ্গের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ইহা অপরিহার্য্য। তবে পারস্পরিক আলোচনা ও সখ্যতার ভিতর দিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল প্রসঙ্গ ঃ

ইংলণ্ডের অলিম্পিক খেলায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ফুটবল দল ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড পূর্ব্বের থেকে বহুলাংশে নিম্নগামী হওয়া সত্ত্বেও দেশের ফুটবল খেলার পরিচালকমণ্ডলী কি মহৎ উদ্দেশ্যে যে বহু সহস্র টাকা ব্যয় ক'রে দলটি শেষ পর্য্যন্ত পাঠালেন তা জনসাধারণের ধারণাতীত। এই ফুটবল দলের খেলার নিম্নগামী ষ্ট্যাণ্ডার্ড উল্লেখ ক'রে বিভিন্ন সংবাদ এবং সাময়িক পত্রের খেলাধূলা বিভাগে কর্ত্তৃপক্ষমহলকে বর্ত্তমানে দল পাঠানো থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষমহল দলটি শেষ পর্য্যন্ত পাঠিয়ে জনমতই উপেক্ষা করলেন। এই জনমত উপেক্ষা করার এতখানি সাহস তাঁরা কোথা থেকে পেলেন অনেকের মনে এ প্রশ্ন উঠবে। সারা ভারতবর্ষের ফুটবল খেলার কেন্দ্রস্থল হ'ল বাংলা দেশের এই ক'লকাতা সহর। বহুদিন থেকে আই এফ এ-র কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা দেশের ফুটবল খেলা সরকারীভাবে পরিচালনা করে আসছেন। এই আই এফ এ-র পরিচালক-মণ্ডলী গঠন এবং খেলা পরিচালনা সম্পর্কে বহু অভিযোগ সংবাদপত্র মারফৎ জনমত হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মূল নীতির কোন আমূল পরিবর্ত্তন হয়নি কারণ আই এফ এ-র প্রতিষ্ঠা থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের উপর শ্বেতাঙ্গ বণিক ক্লাবগুলির প্রবল প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে। ফুটবল সম্পূর্ণ বিদেশী খেলা সুতরাং বিদেশীদের পক্ষে এই খেলা পরিচালনা এবং খেলার উৎকর্ষ সাধনের যে একচেটিয়া অধিকার বলবৎ থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক।

কার্য্যক্ষেত্রে আমরা সে সমস্তই দেখতে পেয়েছি। মিলিটারী এবং ইউরোপীয় দলগুলির মধ্যে যে ফুটবল লীগ খেলা হ'ত সে খেলায় ভারতীয় দল প্রথমে স্থান পেত না। এই বিদেশী ফুটবল খেলায় ভারতীয় দলের দক্ষতা অর্জ্জন করতে সময়ের প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু একমাত্র খেলার নিম্নগামী ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিচার করেই ভারতীয় ফুটবল দলকে লীগের খেলায় স্থান দিতে বাধা ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং রাজমহিমাজনিত আভিজাত্যই ভারতীয় দলের বিপক্ষে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বহুদিন খেলার পর ভারতীয় দল ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ডে যোগদানের অধিকার লাভ করে। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব এবং বর্ণবৈষম্য থেকে ভারতীয় দল রেহাই পায়নি। বিভিন্ন লীগ এবং শীল্ডের খেলা পরিচালনার ভার ছিল আই এফ এ-র উপর। এই প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় ক্লাবের এবং তাদের দলভুক্ত সভ্যসংখ্যা বেশী থাকায় প্রতিষ্ঠানের নীতি তাদের দ্বারাই পরিচালিত হ'ত। ক্রমশঃ ভারতীয় ক্লাব যোগদান করলেও আই এফ এ-র পূর্ব্ব মূল নীতির আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়নি। এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম হ'ল ভারতীয় ক্লাবের প্রতিনিধি সংখ্যা ইউরোপীয় সভ্য সংখ্যার অনেক কমছিল এবং ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় নীতি সমর্থন করে এমন সভ্যেরও অভাব ছিল না। রাজসম্মান ও নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আবেদন নিবেদনের মধ্যে তাঁরা ইউরোপীয় দলের কৃপার পাত্র হয়ে থাকতেন এবং করুণা লাভে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। আই এফ এ-র দীর্ঘকালের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। একমাত্র ফুটবল খেলা পরিচালনা এবং ফলাফল ঘোষণা করা এবং একাধিক চ্যারিটি খেলায় বিক্রয়লব্ধ অর্থ বণ্টন এবং ভোগ করা ছাড়া আই এফ এ-র আর কোন

গঠনমূলক কার্য্য তালিকা হাতে কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। অপরদিকে ইংলণ্ডের এবং অপরাপর দেশের ফুটবল খেলার একমাত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান 'The football Association' একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। খেলার নিয়মাবলী প্রস্তুত এবং সেই নিয়মানুসারে খেলা পরিচালনা করা ছাড়া কি উপায়ে ফুটবল খেলার উৎকর্ষ সাধন হয় তার জন্য এফ এ (F. A.) যথেষ্ট গবেষণা এবং গঠনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। আদর্শ ফুটবল খেলোয়াড় তৈরীর উদ্দেশ্যে ফুটবল খেলা শিক্ষার একটি ফিল্ম তৈরী করিয়ে সেই ফিল্মটি নামমাত্র ভাড়ায় স্কুল কলেজের ছাত্রদের দেখানোর ব্যবস্থা এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলী করেছেন। এই ফিল্মে খেলার বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি দেখিয়েছেন ইংলণ্ডের এবং অপরাপর স্থানের বিখ্যাত আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলোয়াড়রা। অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ক্লাবকেও ফিল্ম সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। ফুটবল খেলা সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ ক'রে এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলী ফুটবল খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদীদের যথেষ্ট আগ্রহ বৃদ্ধি করেছেন। ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকের নাম পাঠকদের অবগতির জন্য উল্লেখ করলাম। পাঠকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের গঠনমূলক কর্ম্ম প্রচেষ্টা কিরূপ।

১। A coaching Manual—যে সমস্ত ফুটবল খেলোয়াড় স্কুল কলেজের ছাত্রদের ফুটবল খেলা শিক্ষাদান করবেন তাঁদের জন্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে এই বইখানি লেখা।

২। Recreative Physical Exercises and Activities—ফুটবল খেলার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হ'লে ফুটবল খেলোয়াড়দের কয়েক শ্রেণীর বিশেষ ধরণের ব্যায়ামের প্রয়োজন। সেই ব্যায়াম সম্পর্কেই এই পুস্তকখানি লিখিত এবং বহু চিত্র সহযোগে মুদ্রিত।

৩। An Instructional Book—ফুটবল খেলার টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে তথ্যবহুল পুস্তক। এগুলি ছাড়া আরও অনেক বই আছে। ইংলণ্ডের পুস্তক ব্যবসায়ীরা ফুটবল খেলার সম্বন্ধে বিবিধ পুস্তক প্রকাশ করে থাকেন। আমাদের দেশে আই এফ এ একখানি 'ফুটবল খেলার আইন পুস্তক' ছাপাও প্রয়োজন মনে করেন না। সাত আট বছর উক্ত পুস্তকখানি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে আছে। জনসাধারণ ফুটবল খেলা সম্বন্ধে যে অন্ধকারে আছে এবং এর জন্য আই এফ এ-র কোন কর্ত্তব্য আছে বলে মনে হয় না; কিন্তু জনসাধারণের একাংশ যখন রেফারীর অজ্ঞতার জন্য অথবা নিজেদের অজ্ঞতা বশতঃ খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের দ্বারা ফুটবল খেলার নিয়ম ভঙ্গ হচ্ছে মনে ক'রে প্রতিবাদ জানায় কিম্বা রেফারীর মারাত্মক ভুলের প্রতিকার হচ্ছে না বলে উত্তেজিত হয়ে অন্যায় কিছু করে বসে অমনি কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যবোধ জেগে উঠে; সমস্ত জনতাকে পুলিসের ব্যাটন এবং ঘোড়ার ক্ষুরের তলায় ফেলে দিতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন না। অখেলোয়াড়ী আচরণের জন্য কটুক্তিপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে কর্ত্তব্য পালন করেন। কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কোনপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল কার্য্য সমর্থন করেন না, আমরাও করি না। কিন্তু কোন উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যের কারণ হিসাবে যদি অপর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি থাকে এবং তা সংশোধনের কোনপ্রকার চেষ্টা না থাকে তাহ'লে এই ত্রুটিই বেশী নিন্দনীয় হবে এবং ত্রুটির মূলোৎপাটন না করলে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বৃদ্ধি ছাড়া দমন করা কোনদিনই সম্ভব হবে না—এ সত্য ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত। আই এফ এ এমন একটি দলগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠান জনমতের অপেক্ষা রাখে না, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভোটের জোরে পরিচালিত হয়। জনসাধারণের অসহায় অবস্থা এবং দুর্ব্বলতার সুযোগ ভাল ভাবেই গ্রহণ করেন। আমাদের জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই এক ফুটবল খেলার মাঠ ছাড়া। জীবনের অপরদিকে নানাভাবে আমরা বঞ্চিত হয়েছি বলেই শত অপমান উপেক্ষা ক'রে পয়সা ব্যয় ক'রে খেলার মাঠে যাই একটু জীবনে আনন্দ উপভোগ করতে। সেখানে আমরা কি পাই? কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা; প্রখর রোদ এবং প্রবল বারিপাত উপেক্ষা করেও যার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি সেই ফুটবল খেলাও শেষ পর্য্যন্ত দর্শকদের কম বঞ্চনা করে না। কি নিম্নশ্রেণীর খেলা! খেলায় একদল হারবে, অপর দল জিতবে একথা খুবই সত্য কিন্তু খেলাধূলার বহুবিধ সাধু উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হ'ল দর্শকদের

নির্দ্দোষ আনন্দ দান করা; তা না হ'লে খেলার উপর আকর্ষণ ক্রমশঃ কমে গিয়ে খেলাটাই লোপ পেয়ে বসবে দর্শক এবং খেলোয়াড়ের অভাবে।

* * * *

অলিম্পিকগামী ভারতীয় ফুটবল দলের সাহায্যের জন্য পশ্চিম বাংলার আই এফ এ প্রথমে ৩০ হাজার টাকা চ্যারিটি ম্যাচ থেকে তুলে দেয়। আই এফ এ-র দানের পরিমাণই বেশী, অন্যান্য প্রদেশ প্রতিশ্রুতিমত টাকা দিতেও পারেনি; ফলে ইংলণ্ড যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় আর কি। পুনরায় আই এফ এ-র সভায় ১০ হাজার টাকা ইংলণ্ডগামী ভারতীয় ফুটবল দলকে আই এফ এ-র রিজার্ভ তহবিল থেকে মঞ্জুর করা হয়; সর্ব্বসমেত আই এফ এ-র দানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ হাজার টাকা। আই এফ এ-র অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৮ জনখেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছে অন্যান্য প্রদেশ থেকে এই ভাবে খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছেঃ মহীশূর ৬; বোম্বাই ৩। ইংলণ্ড যাত্রার ঠিক শেষ সময়ে অনিল দে (মোহনবাগান), সুনীল ঘোষ (ইষ্টবেঙ্গল) এবং রবি দাসকে (ভবানীপুর) দলে নির্ব্বাচিত করা হয় এবং এই মর্ম্মে তাঁদের চিঠি পাঠানো হয়, তাঁরা প্রত্যেকে ৪ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা না দিলে তাঁদের দলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এর সোজা অর্থ, তাঁদের নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে খেলতে যেতে হবে। অপরাপর নির্ব্বাচিত খেলোয়াড় সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থা না করে এই তিনজনের সম্বন্ধেই কেন পৃথক ব্যবস্থা করা হ'ল এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ এখনও কোন বিবৃতি দেন নি। এই তিনজন খেলোয়াড়কে দলে নির্ব্বাচিত করা হয়েছে নিশ্চয় দলকে সাহায্য করার জন্য সুতরাং অপরাপর খেলোয়াড়ের সাহায্যের বিনিময়ে যখন টাকা জমার প্রশ্ন উঠে নি তখন এদের খেলাতেই বা সে প্রশ্ন উঠে কোন রীতিনীতিতে তা আমাদের সভ্যজগতের কোথাও খুঁজে পাই না। ইংরাজিতে 'Consolation Prize' বলে একটি কথা আছে। সেই বিশেষ পুরস্কার বিতরিত হয় বিশেষ অবস্থায় অর্থাৎ দায়ে পড়ে; এ পুরস্কার যোগ্য ব্যক্তির জন্য নয়। ইংলণ্ডগামী ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচনী-মণ্ডলী যে ভাবে শেষ সময়ে এই তিনজন খেলোয়াড়কে নির্ব্বাচন ক'রে যে সর্ত্তে তাঁদের দলে নিতে রাজী হয়েছেন তা উক্ত পুরস্কারের সামিলও হয় নি। এ অপমান ব্যক্তিগত এবং ক্লাবের পক্ষেও। মনে রাখা উচিত—আমাদের দেশে প্রকাশ্য ভাবে ফুটবল খেলা পেশাদারী নয়। এদেশে খেলোয়াড়রা দলের জন্যই সখের খেলোয়াড় হিসাবে খেলে থাকেন, অন্ততঃ এই ভাবেই আইনের চোখে দেখানো হয়। সেই সখের খেলোয়াড়রা বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট সময়ে এতগুলি টাকা কোথা থেকে পাবেন? আমাদের দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দের কি ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন ক'রতে হয় তা কারও অজানা নয়। আমাদের দেশের লোকের গড়পড়তা বার্ষিক আয় মাত্র ৬৮ টাকা। মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিশে এক কথায় প্রত্যেকের জন্য ৭ হাজার টাকা বের করে পৌঁছে দেওয়া এ তিনজনের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে না এরূপ ধারণা করা কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায়। এবং এ ধরণের টাকার চুক্তিতে তাঁদের দলে স্থান দেওয়ার প্রস্তাব খুবই অশোভন ও নিন্দনীয় হয়েছে। সুনীল ঘোষ এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়ে ইংলণ্ড দলে যোগদানের অক্ষমতা জানিয়েছেন। কোন আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা যে সম্ভব নয় এ কথা স্বীকার করার লোকের অভাব হবে না। প্রথমে যে কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হ'লেন তাঁদের টাকা দিতে হ'ল না অথচ যে তিনজন শেষে নির্ব্বাচিত হলেন তাঁদের বেলাতেই ঘরের থেকে টাকা বের করে দলে যোগ দিতে হবে, এর অর্থই হ'ল খেলোয়াড়দের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা, যোগ্যতাকে উপেক্ষা করা। আই এফ এ-র সভায় কোন বিশিষ্ট ক্লাবের প্রতিনিধি প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর ক্লাবের নির্ব্বাচিত কোন খেলোয়াড়ের কাছে এই মর্ম্মে চিঠি গেছে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকা যথাসময়ে জমা দিতে তিনি অক্ষম হলে তাঁকে দলে পাঠানো সম্ভব হবে না; এরূপ ব্যবস্থা তাঁরই উপর একমাত্র প্রযোজ্য না দলের অপর সকল খেলোয়াড়ের উপরও সমভাবে প্রযোজ্য। এ প্রশ্নের উত্তর দলের ম্যানেজার এবং আই এফ এ-র সম্পাদক শ্রীযুক্ত এম দত্তরায় (বেচুবাবু নামে পরিচিত) দিতে না পেরে মৌন ছিলেন। আই এফ এ-র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঙ্কোজ গুপ্ত উত্তরে কি বলেছিলেন তা 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।

"...the A. I. F. F. had bungled the whole thing and the I. F. A. should not have

written to the East Bengal club asking Sunil Ghose, the selected player to pay Rs 4000|-"। এই টাকা কেবল সুনীল ঘোষের কাছ থেকেই চাওয়া হয়নি অনিল দে ও রবিদাসের কাছ থেকেও চাওয়া হয়েছিল। আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা এবং বিবেচনার অপর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ২৬শে মে তারিখের চিঠিতে তাঁরা উল্লিখিত খেলোয়াড়দের সরকারী ভাবে জানালেন যে, তাঁরা অলিম্পিকগামী ভারতীয় ফুটবল দলে স্থান পেয়েছেন। এই সরকারী চিঠি ২৭ তারিখে খেলোয়াড়রা পান। চিঠিতে লেখা আছে ২৮ তারিখের মধ্যে চার হাজার টাকা জমা দিতে এবং কলকাতা থেকে দল রওনার তারিখ ২৯শে মে সুতরাং খেলোয়াড়দের সেই মত প্রস্তুত থাকতে নির্দ্দেশ ছিল। আমাদের দেশের ফুটবল খেলোয়াড়রা রাজা মহারাজা নয়, হয় চাকুরী কিম্বা ব্যবসায় জীবিকা উপার্জ্জন করতে হয়। এই তিনজন খেলোয়াড় সেই গতানুগতিকভাবেই জীবিকা উপার্জ্জন করেন। দলের ম্যানেজার নাকি বহু পূর্ব্ব থেকেই ছুটীর দরখাস্ত ক'রেও ছুটী পান নি বলে দলের সঙ্গে যেতে পারেন নি; আকাশে উড়ে যাবেন। সুতরাং হাতে মাত্র দু'দিনের সময় পেয়ে এই তিনজন খেলোয়াড় কি ভাবে ইংলণ্ড যাওয়ার জন্য ছুটী এবং পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করতে পারেন সেকথা একবার কর্ত্তৃপক্ষ ভেবেও দেখেন নি।

অনিল দে এবং সুনীল ঘোষ স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন কিন্তু দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকার জন্য একটা ব্যবস্থা করার সময়েরও তো তাঁদের প্রয়োজন।

* * * *

ফুটবল খেলার চ্যারিটি ম্যাচের দিন যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট মাঠে আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষ বিক্রী করতে সক্ষম তা সংবাদপত্রের মারফৎ জানিয়ে দিলে মানুষের বৃহৎ লম্বা সারি হয় না, দর্শকদের সকাল ৮টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে সারাদিন রোদে ক্লান্ত এবং বৃষ্টিতে ভিজে মেজাজ খারাপ করতে হয় না। তা না করায় দর্শকরা টিকিট পাওয়ার একটা অলীক আশার মধ্যে থাকে। ফলে এই দাঁড়ায়, ঠিক সময়ে গেট না খুললে, দর্শকরা গেট ভেঙ্গে ঢুকবার চেষ্টা করে, অল্প পরিমাণ টিকিট অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হলেই এত কষ্টের পর খেলা না দেখতে পাওয়ার জন্য উত্তেজিত জনতার অংশ বিশেষ জোর ক'রে মাঠে ঢুকবার সুযোগ খুঁজে; এর জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কিছু করবার নেই এমন ভাব দেখানো হয়। পুলিশ তার ব্যবস্থা করেন। এই অপ্রিয় ঘটনার জন্য যদি দোষ দেবার থাকে তা আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষের। তাঁদের কাছ থেকে কি পরিমাণ টিকিট মাঠে বিক্রী হবে এরূপ জানতে পারলে লোক এত কষ্ট ভোগের জন্য সারি দেয় না, পুলিশও সেই মত লোকের সারি বাঁধার পর লাইনে বৃথা দাঁড়িয়ে কষ্টভোগ থেকে বিরত হ'তে দর্শকদের পরামর্শ দিতে পারেন। এ সমস্ত সুব্যবস্থার পরও যদি দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য পুলিশ লাঠি বা কাঁদুনে গ্যাস চালায় তাহলে তা অন্যায় হয়েছে বলে কেউ রব তুলবে না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, খেলার মাঠে একশ্রেণীর মুষ্টিমেয় দর্শক হাঙ্গামার উৎস। বিনা খরচায় মাঠে খেলা দেখাই একমাত্র এদের উদ্দেশ্য নয়, এ দলে আছে একশ্রেণীর খেলার মাঠের জুয়াড়ী, যারা লোকসানের সম্ভাবনা দেখলেই গণ্ডগোল বাধিয়ে সরে যায়, মারা পড়ে নিরীহ দর্শকবৃন্দ। জনসাধারণই কেবল সৌজন্য দেখাবে এবং খেলোয়াড়চিত মনোভাবের পরিচয় দিবে এবং কর্ত্তৃপক্ষের ত্রুটির কারণে তার ব্যতিক্রম হলে পুলিশের লাঠি চলবে এ কাজির বিচার বর্ত্তমান সময়ে চলতে পারে না। কর্ত্তৃপক্ষের দিক থেকে অনেক কিছু করবার আছে যাতে দর্শকদের কুপ্রবৃত্তি বৃহদাকারে দানা বাঁধতে না পারে। জন কল্যাণের দিক থেকে আই এফ এ-র কর্ত্তৃপক্ষমহল এখন থেকেই যদি সচেতন না হ'ন তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ক'লকাতায় ফুটবল খেলা গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ বন্ধ করতে যে বদ্ধপরিকর হবেন তার পূর্ব্বাভাষ দেখা দিয়েছে। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষগণ নিশ্চয় সংবাদ রাখেন ফুটবল খেলার জন্মভূমি ইংলণ্ডেও বহু বৎসর ধরে রাষ্ট্রের নিরাপত্ত রক্ষার জন্য ফুটবল খেলা বে-আইনী করা হয়েছিল।

ডেভিস কাপ ঃ

ডেভিস কাপ টেনিস টুর্ণামেণ্টের ইউরোপীয় জোনে ভারতবর্ষ ৩-২ গেমে বৃটেনের কাছে পরাজিত হয়েছে। পাকিস্থান ৩-২ গেমে পরাজিত হয়েছে সুইজারল্যাণ্ডের কাছে। ভারতবর্ষের পক্ষে বৃটেনের বিরুদ্ধে যোগদান করেছিলেন সুমন্ত মিশ্র, দিলীপ বসু, এস এল আর সোহণী।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগে উঠানামা ঃ

আই এফ এর সভায় স্থির হয়েছে এ বছর থেকে ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগে পুনরায় উঠা-নামা আরম্ভ হবে।

হকি চ্যাম্পিয়ান সীপ ঃ

ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভূপাল ১-০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করেছে। বাঙ্গলা প্রদেশ ৪-২ গোলে ফরিদকোটের কাছে চতুর্থ রাউণ্ডে পরাজিত হয়েছিল।

খেলা-ধূলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ফুটবল ঃ

বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে নানা দল লণ্ডনের দিকে যাত্রা করেছে এবং আরও কতকগুলি যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যোগদানকারী দলগুলির খেলোয়াড় মনোনয়নের বিরাট অধ্যায় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খেলোয়াড় মনোনয়ন ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখা গেছে ফুটবল দলের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে ফুটবল খেলা এখনও সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়ে আছে। তাই অলিম্পিকগামী ফুটবল দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন কলিকাতায় হওয়ায় উৎসাহীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটী ট্রায়ালখেলা দেখার পর উৎসাহীদের সে উৎসাহ হতাশায় পরিণত হল। এই আশাহত দলের অনেকেই তখন বলতে লাগলেন, এ রকম টীম না পাঠানোই ভাল, এরকম তৃতীয় শ্রেণীর দল পাঠালে ভারতবর্ষ বিশ্বের ফুটবল মহলে হেয় প্রতিপন্ন হবে—ভারতের সম্মান নষ্ট হবে। দলটি যে তৃতীয় শ্রেণীর তা ঠিক এবং এই দল বিশ্ব-অলিম্পিকে ভারতের সম্মান যে কিছুমাত্র বাড়াতে পারবে না তাও সত্য; কিন্তু এ কথাও সত্য যে দল না পাঠালেও ভারতের সম্মান কিছুমাত্র বাড়বে না। পাশ্চাত্য দেশের কাগজগুলিতে ভারতবর্ষের খবর খুব অল্পই থাকে, খেলাধূলার খবর ত প্রায় থাকেই না। শোনা যায় বিশ্বজয়ী ভারতীয় হকিদলের সম্বন্ধেও প্রায় কোন খবরই সেখানকার কাগজে দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদানকারী ভারতবর্ষের ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধেও দেশের লোকের কোন ধারণা নেই বলেই মনে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দল না পাঠানো এবং দল পাঠিয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করা এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই বলেই মনে হয়। বরঞ্চ দল পাঠালে খেলোয়াড়রা খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাবে এবং অলিম্পিকের ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধেও কিছুটা জ্ঞানলাভ করতে পারবে। পরাজয়ের ভয়ে, তা সে পরাজয় শোচনীয়ই হোক বা গৌরবজনকই হোক, প্রতিযোগিতায় যোগদান না করা খুবই ভুল। যে কোন খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়াতে হলে বড় বড় প্রতিযোগিতায় সাহস করে যোগদান করা উচিত। আর কিছু না হোক খেলোয়াড়দের নার্ভ ও অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্যও যোগদান করা দরকার। প্রথম প্রথম হয়ত পরাজয় আসবে এবং শোচনীয় ভাবেই আসবে, কিন্তু তাতে দমলে চলবে না; সাহস করে এগুতে হবে, আবার যোগ দিতে হবে প্রতিযোগিতায়। এমনি করে আসতে আসতে বাড়াতে হবে খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড। তা না করে নিজের দেশে বসে অল্প একটু খেলা শিখে খুব খেলছি মনে করলে কোনদিনই খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়ান যাবে না।

অলিম্পিকে এই দল পাঠানোর উদ্দেশ্য যদি স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়াবার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তা হলে আমরা ফুটবল কর্তৃপক্ষকে এই দল পাঠানোর জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করব। কিন্তু যদি খালি ম্যানেজার ট্রেনার প্রভৃতির দেশ ভ্রমণের সুবিধার জন্য এই রকম দল পাঠানো হয়ে থাকে, তা হলে আমরা উচ্চকণ্ঠে এর নিন্দা করছি। তবে আশা করি আমাদের ফুটবল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য খেলোয়াড়োচিতই হবে এবং তার প্রমাণও অদূর ভবিষ্যতে পাব।

ভারতীয় দলের রক্ষণভাগের উপর খানিকটা আস্থা আমাদের আছে। ব্যাকে মান্না ও তাজ মহম্মদ, হাফে অধিনায়ক টি, আও ও মহাবীর এবং গোলে ভরদ্বাজ একেবারে হতাশ করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আক্রমণভাগের উপর আমাদের বিশেষ কোন আস্থা নেই। একে ভারতীয় দল নানাদিক দিয়ে দুর্ব্বল তার উপর খেলোয়াড়দের নার্ভেরও যথেষ্ট অভাব আছে। নার্ভ যদি খেলোয়াড়রা ঠিক রাখতে না পারেন এবং অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলতে নেমেই, আমরা আর এদের কাছে কি খেলব, এই মনে করে গোড়ার থেকেই নার্ভাস হয়ে পড়েন তা হ'লে যেটুকু বা খেলতে পারতেন তাও পারবেন না। পরাজয়ের ভয়ে মনকে দুর্ব্বল না করে যদি তাঁরা নিজেদের খেলা খেলে যেতে পারেন তা হ'লেও কিছুটা খেলা দেখাতে পারবেন বলে আশা হয়।

যে দেশে ভাল খেলোয়াড় নেই সে দেশে হাজার

চেষ্টা করে এবং ট্রায়ালের পর ট্রায়াল খেলিয়েও ভাল টীম করা যায় না। শুধু নিজের ক্লাবে কি করে অপর ক্লাবের ভাল খেলোয়াড়কে নিয়ে এসে ক্লাবের শক্তি বৃদ্ধি করব ও অপর ক্লাবকে শক্তিহীন করব, এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব নিয়ে খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়ানো যায় না। খেলোয়াড় তৈরীর দিকে যতদিন না সমস্ত ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ ঝোঁক দিচ্ছেন ততদিন আমাদের দেশের ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়াবার কোন সম্ভাবনাই নাই। খেলোয়াড়দের ভালভাবে তৈরী করতে হলে চাই উন্নত ধরণের ট্রেনিং এবং তার জন্য দরকার হয় শিক্ষিত ট্রেনারের। তাছাড়া খেলোয়াড়দের ভাল স্বাস্থ্য ও প্রচুর দমও থাকা চাই। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় এইগুলির প্রত্যেকটিরই অভাব। এখানে ভাল ট্রেনারের অভাবে উন্নত ধরণের ট্রেনিং খেলোয়াড়রা পায না। তার উপর বেশীরভাগ খেলোযাড়ের স্বাস্থ্য ভাল নয় আর দমও ওদেশের খেলোয়াড়দের তুলনায় আমাদের খেলোয়াড়দের অনেক কম। তাছাড়া ফুটবল খেলায় শারীরিক শক্তি এবং 'বডি ওয়েট'এরও অল্পবিস্তর প্রয়োজন আছে। ভাল খেলোয়াড় তৈরী করতে হলে তার দেহের গঠন ও শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া খেলার পদ্ধতিরও উন্নতি হওয়া দরকার। 'সর্ট পাসিং গেম' যাতে আমাদের খেলোয়াড়রা বেশী অভ্যস্ত তা সব সময় চলে না, বিশেষ করে ভিজামাঠে। সেজন্য 'লং পাসিং'এও খেলার অভ্যাস রাখা বিশেষ দরকার। তা ছাড়া আমাদের দেশের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের খেলা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে বিপক্ষগোলের সামনে গিয়ে ফাঁক পাওয়া মাত্র গোলে সট্ না মেরে অনাবশ্যক 'ড্রিবল' করা। বিপক্ষগোলের সামনে এই অনাবশ্যক ড্রিবলিংএর কু অভ্যাস যে সব সময়ে 'গ্যালারি-প্লে' বা দর্শকদের হাততালি পাবার জন্যই করা হয়ে থাকে তা নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এটা আসে নার্ভাসনেসের জন্য। যদি গোলে সট্ করলে গোল না হয় বা বল বাইরে চলে যায় এই ভয়েতেই অনেক খেলোয়াড় ফাঁক পাবামাত্র গোলে সট্ করে 'ট্রাই' নেবার দায়িত্ব নিতে দ্বিধা বোধ করেন। তাঁরা মনে করেন 'ড্রিব্‌ল' করে করে আর একটু সুযোগ করে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে গোলে সট্ করবেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে সুযোগ আর ঘটে উঠে না। অযথা বিলম্ব করে বিপক্ষের রক্ষণভাগকে প্রস্তুত হতে সময় দিলে গোল করা দুরূহ হয়ে উঠে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের পক্ষে এই ত্রুটী অত্যন্ত মারাত্মক। গোল করার উপরেই খেলার জয় পরাজয় নির্ভর করে, মধ্য মাঠে চমৎকার 'ড্রিব্‌লিং'এর উপর নয়, এই কথাটা প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই মনে রাখা দরকার। অবশ্য 'ড্রিব্‌লিং'এরও যে আবশ্যক নেই একথা বলা যায় না। ভাল ড্রিব্‌ল করার ক্ষমতা প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই আয়ত্ত করা উচিত। কারণ এই 'ড্রিব্‌লিং'এর সাহায্যেই প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে বল নিয়ে গিয়ে অনেক সময় গোল করা সম্ভব হয়। 'ড্রিব্‌লিং' বিপক্ষকে কায়দা করারও একটি সহজ উপায়। কিন্তু বিপক্ষের গোলের সামনে গিয়ে যেখানে সট্ মারার দরকার সবচেয়ে বেশী সেখানে 'ড্রিবল' করে করে অযথা বিলম্ব করা একটি মারাত্মক বদ অভ্যাস। ফাঁক পাবামাত্র বিপক্ষ গোলে তীব্র সট্ মেরে 'ট্রাই' নেওয়া দরকার। তাতে অনেক সময় সফলতা আসে। তাই প্রথম সুযোগেই নির্ভুলভাবে বিপক্ষ গোলে প্রচণ্ড সট্ মারার অভ্যাস আক্রমণভাগের প্রত্যেক খেলোয়াড়ারের রাখা অত্যন্ত দরকার।

রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দেরও নিজ পক্ষের গোলের সামনে থেকে প্রথম সুযোগেই বিলম্ব না করে বল 'ক্লিয়ার' করে দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা গোলের সামনে থেকে বল 'ক্লিয়ার' করতে অযথা বিলম্ব করেন। তাতে বিপক্ষের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা এই বিলম্বের সুযোগ নিয়ে রক্ষণভাগকে একেবারে চেপে ধরে, তখন আর বল 'ক্লিয়ার' করবার সুযোগ থাকে না। শেষে কর্ণার করে গোল বাঁচাতে হয় কিংবা অনেক সময় গোলও খেতে হয়। তাছাড়া এই অযথা বিলম্বে খেলার গতিও শিথিল হ'য়ে পড়ে। যে মুহূর্ত্তে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বিপক্ষের আক্রমণভাগের কাছ থেকে বল কেড়ে নিতে পারল সেই মুহূর্ত্তেই উচিত হচ্ছে লং পাস করে নিজ পক্ষের আক্রমণভাগকে বল যোগান। যাতে বিপক্ষের আক্রমণের পরমুহূর্ত্তেই এবং বিপক্ষের রক্ষণভাগ প্রস্তুত হবার আগেই তাদের গোলে নিজ পক্ষের খেলোয়াড়রা হানা দিতে

পারে। এতে খেলার গতিও দ্রুত হয় এবং খেলার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারও হয়। এসব ছাড়াও প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই বুট্ পরে খেলার অভ্যাস রাখা উচিত। এদেশে সব সময় বুটের দরকার না হলেও বিদেশে খেলতে গেলে বুট্ অপরিহার্য্য হয়ে উঠে। তখন বুট্ পরে খেলার অভ্যাস না থাকার জন্য স্বাভাবিক ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখাতে পারা যায় না।

আশা করি ভারতীয় ফুটবলের কর্তৃপক্ষগণ এই সব বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রেখে ভারতীয় ফুটবলের স্ট্যাণ্ডার্ড যাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

কলিকাতার ফুটবল ঃ

কলিকাতার ফুটবল মরশুম সুরু হয়েছে। লীগের খেলা পুরাদমেই চলেছে। কিন্তু যাঁরা খেলার মাঠে যান তাঁরা জানেন যে খেলা চলছে বটে কিন্তু তা নামেই শুধু খেলা। তার মধ্যে না আছে প্রাণ, না দেখা যায় খেলোয়াড়দের কোন ক্রীড়াচাতুর্য্য। যাঁরা ১৯১১ সালের আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ী ভারত-বিখ্যাত মোহনবাগানের বা তার অনেক পরের দুর্দ্ধর্ষ শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারছেন যে আজ বাংলাদেশের ফুটবল খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড কোথায় নেমেছে। যে স্ট্যাণ্ডার্ড বেড়ে আজ পাশ্চাত্যের তুল্য হবার কথা, তা আজ এত নেমেছে যে ভবিষ্যতে আর কখনও উঠবে কি না তা বলা শক্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব যে এই পড়তির একটি প্রধান কারণ তাতে কোন সন্দেহই নেই। পুনরায় যুদ্ধের আগুন যদি প্রজ্বলিত না হয় এবং দেশে আভ্যন্তরিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে তা হলে চেষ্টা করলে হয়ত স্ট্যাণ্ডার্ড আবার উঠতে পারে। কিন্তু এই স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়ার দায়িত্ব নির্ভর করছে আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন ক্লাবের কর্তাদের উপর। তাঁরা যদি ঐকান্তিক চেষ্টা করেন এবং খেলোয়াড়রাও যদি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন তা হ'লে বাংলা দেশের ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড নিশ্চয়ই উঠবে বলে মনে হয়।

একে ত খেলার স্ট্যাণ্ডার্ডের এই অবনতি হয়েছে, এর উপর আবার একশ্রেণীর দর্শকদের মনেরও অবনতি হয়েছে বলে মনে হয়। খেলা দেখার উত্তেজনাবশে তাঁরা ভুলে যান যে তাঁরা খেলার মাঠে খেলা দেখছেন এবং যেখানে খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেখানেই তাঁরা অখেলোয়াড়োচিত ও অতি নিন্দনীয় ব্যবহার করে থাকেন। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, খেলার শেষে বা খেলার মধ্যেই রেফারী বা খেলোয়াড়রা এই শ্রেণীর দর্শকদের হাতে নির্য্যাতিত হয়েছেন। এই নিন্দনীয় ও অখেলোয়াড়ী মনোভাবের এবং ব্যবহারের আশু পরিবর্তন ও প্রতিকার প্রয়োজন। তা না হলে খেলার মাঠের সুস্থ আবহাওয়াকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। 'আই, এফ, এ'র কর্তৃপক্ষ ও গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ তাঁরা যেন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই অসংযত আচরণের প্রতিকার করেন।

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ খুব সম্ভব এবার মহমেডান স্পোর্টিংই পাবে। মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের মধ্যে বোধ হয় প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলবে 'রানার্স-আপ' হওয়া নিয়ে। খেলার স্ট্যাণ্ডার্ডের অবনতির কথা আগেই বলেছি। এর উপর সব কয়টি ভাল খেলোয়াড় অলিম্পিকে খেলতে যাওয়ায় বড় বড় ক্লাবগুলি যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। তবে অনেক নূতন খেলোয়াড় প্রথম বিভাগে খেলবার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের মধ্যে কাহাকেও বিশেষ প্রতিভাশালী বলে মনে হচ্ছে না। কয়েকটি ক্লাব তাঁদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বাংলার বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানী করেছেন কিন্তু তাতেও খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বিশেষ বেড়েছে বলে মনে হয় না। বাইরের খেলোয়াড়দের খেলা যদি স্থানীয় খেলোয়াড়দের চেয়ে যথেষ্ট ভাল হত তবে তাঁদের বাইরে থেকে আনার সমর্থন করা যেত। কেন না এই বিদেশী খেলোয়াড়দের কাছ থেকে এখানকার খেলোয়াড়রা অনেক কিছু শিখতে পারত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্থানীয় খেলোয়াড়দের চেয়ে বাইরের খেলোয়াড়রা এমন কিছু উঁচুদরের নয় যাতে তাঁদের খেলা থেকে এখানকার খেলোয়াড়রা বিশেষ কিছু শিখতে পারেন। তাই মনে হয় এই সব বিদেশী খেলোয়াড়দের পিছনে অর্থ নষ্ট না করে স্থানীয় খেলোয়াড়দের তৈরী করার দিকে মনোযোগ দিলেই ভাল হত। যাই হোক আমরা চাই খেলার স্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতি। বাইরের খেলোয়াড়দের সাহায্যে যদি তা কিছুটাও হয় তা হলেও মন্দের ভাল বলতে হবে।

হকি ঃ

বিশ্বজয়ী ভারতীয় হকিদল পুনরায় বিশ্বজয়ের আশায় *লণ্ডনের দিকে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।* গত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ফলাফল থেকেই বুঝা যায় ভারতীয় হকি দলের পুনরায় বিশ্বজয়ী হবার সম্ভাবনা আছে। তবে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারে চ্যাম্পিয়নসীপ লাভ করা তত সহজ হবে বলে মনে হয় না। প্রথমতঃ এবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ ভারতীয় দলের সঙ্গে যাচ্ছেন না। তার উপর পাকিস্থান হকিদলে কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড় যোগ দিয়েছেন। মনে হয় অলিম্পিকে এই পাকিস্থানই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে এবং এদের পরাজিত করতেও হয়ত বেগ পেতে হবে। ভবিষ্যতে পাকিস্থান দলের শক্তি আরও বর্দ্ধিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে ভবিষ্যতের এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে। ভারতীয় হকি এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন এখন থেকেই খেলোয়াড় তৈরীর দিকে মনোযোগ দেন এবং প্রতি বৎসরই ভারতের বাইরে যে কোন দেশে একটি বাছাই দলকে সফরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এতে করে খেলোয়াড়দের নার্ভ ও স্ট্যামিনা বাড়বে। তা ছাড়া সফরের এবং বিদেশে খেলার অভিজ্ঞতাও কিছু হবে। উঠতি খেলোয়াড়দের এই সব সফরে বিশেষ করে সুযোগ দেওয়া দরকার তাঁদের ফর্ম দেখবার জন্যে। বাংলার হকি এসোসিয়েশনকেও এই সঙ্গে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন তৎপর হন এবং বাংলা থেকে যাতে ভবিষ্যতে বাঙালী হকি খেলোয়াড়রা ভারতীয় অলিম্পিক দলে স্থান পান তার জন্য চেষ্টা করেন। বাঙালী হকি খেলোয়াড়দের এখন যা স্ট্যাণ্ডার্ড তাতে তাঁদের ভবিষ্যতে অলিম্পিক দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যদি তৎপর হন এবং খেলোয়াড়দেরও যদি আন্তরিক চেষ্টা থাকে তা হলে সুযোগ তাঁরা নিশ্চয়ই পাবেন বলে মনে হয়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়রা অবশ্য বাংলা থেকে ভারতীয় অলিম্পিক দলে স্থান পেয়ে আসছেন, কিন্তু বাঙালী হকি খেলায় অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। ফুটবল ও সাঁতারে বাঙালী এখনও ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তিতেও পিছিয়ে নেই। কিন্তু বিশ্বজয়ী ভারতগৌরব ভারতীয় হকিদলে একজনও বাঙালী খেলোয়াড় না থাকা বাংলার পক্ষে খুবই লজ্জার কথা। পুরান খেলোয়াড়, প্রভাস দাস, এ, দেব, নির্ম্মল মুখার্জি প্রভৃতির মত খেলোয়াড়ও এখন আর খেলার মাঠে দেখতে পাওয়া যায় না। কলিকাতায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা বাইটন কাপের খেলা হয়ে থাকে এবং এখানকার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের স্ট্যাণ্ডার্ডও বেশ উঁচু। বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ, রূপসিং প্রভৃতির খেলার সহিতও বাঙালীর যথেষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু তবুও বাঙালী হকি খেলায় উন্নতি করতে পারছে না কেন? মনে হয় স্ট্যামিনা ও প্র্যাকটিসের অভাবই এর কারণ। যাই হোক, এর প্রতিকার করতে না পারলে বাঙালীকে হকি খেলায় চিরকালই পিছিয়ে থাকতে হবে। আশা করি বাংলার হকি কর্ত্তৃপক্ষ এবং খেলোয়াড়রা এবার থেকে সচেষ্ট হবেন বাংলার হকি স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়াবার জন্য।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় মানভঞ্জন ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রাবণ—১৩৫৫

প্রথম খণ্ড | ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সোমনাথ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, ডি-লিট্

স্বাধীন ভারত "বৈরাগ্য ক্ষেত্রে" আবার সোমনাথের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছে। পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথ যাত্রী ভারতের ভাগ্যবিধাতা সোমনাথ ক্ষেত্রে তাহার রথচক্রের গভীর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বারবার বিধর্ম্মীর হস্তে দেবতার অবমাননা হইয়াছে, মন্দিরের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে, যুগেযুগে ভক্তের নিষ্ঠা ভগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর আবার নূতন দেউল রচনা করিয়াছে। সোমনাথের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন মহেশ্বরনগরের মহিয়সী রাণী অহল্যাবাই।

কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণ উপকূল এক হিসাবে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নিকট পবিত্র। এইখানে কৃষ্ণ দেহধারী বিষ্ণুর নশ্বর শরীরের অবশেষ প্রভাসের মৃত্তিকায় লীন হইয়াছে। এইখানে কলঙ্কমুক্ত সোমদেব সোমেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। ইহারই অদূরে রৈবতক গিরিগাত্রে রাজর্ষি অশোক তাঁহার চতুর্দ্দশ অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছেন। আবার জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ, নেমিনাথ ও ঋষভনাথের মন্দিরও এইখানেই নির্ম্মিত হইয়াছে। শাক্তের নিকটও প্রভাস ক্ষেত্র উপেক্ষণীয় নহে। সোমনাথের মন্দিরের অদূরে আছে ভদ্রকালীর মন্দির। শক্তি ও ভক্তির এখানে অপূর্ব্ব সমন্বয়। এই কাথিয়াবাড়ের উপকূলেই সিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম পুণ্যক্ষেত্র হুসেন টেকরী। জুনাগড়ের ভ্রান্ত নবাবকে নাকি হজরতের মহম্মদের দৌহিত্র হুসেন এখানে স্বীয় বিভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।*

সোমনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। কবে এই তীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কবে এখানকার প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থে তাহার খবর পাওয়া যায় না। সোমনাথ সম্বন্ধে প্রাচীনতম প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, মুসলমান পণ্ডিত আবু রিহীন অলবিরুণী। অলবিরুণী গজনীর সুলতান মামুদের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার লুণ্ঠনের অংশ লাভের জন্য নহে, প্রাচীন হিন্দুদিগের দর্শন ও জ্যোতিষ অনুশীলন করিবার অভিপ্রায়ে। মামুদের ধন রত্ন কবে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অলবিরুণীর বিভার বৈভব এখনও নষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন, আজিও অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা তাহা যত্ন সহকারে পাঠ করেন। অলবিরুণী সোমনাথ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী শুনিয়াছিলেন তাহা এইরূপ। প্রজাপতি তাহার নক্ষত্র নন্দিনীদিগকে বিবাহ

দিয়াছিলেন চন্দ্র দেবের সহিত। স্বভাবতঃ সকল স্ত্রীই তাঁহার সমান আদর ও ভালবাসা দাবী করিতে পারিতেন, কিন্তু চন্দ্রদেব তাঁহার পরিণীতা পত্নীদিগের প্রতি সমদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই, রোহিণীর প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল একটু বেশী। ভগ্নীর স্নেহ সপত্নী-বিদ্বেষ দূর করিতে পারিল না। রোহিণীর ভগ্নীরা পিতার নিকট স্বামীর অন্যায় আচরণের কথা নিবেদন করিলেন। প্রজাপতি জামাতাকে ভৎর্সনা করিলেন, কন্যাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু গৃহ কলহের শান্তি হইল না। শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি শাপ দিলেন—অসমদর্শী জামাতার মুখ কুষ্ঠে বিকৃত হইবে। অনুতপ্ত জামাতা শ্বশুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু প্রজাপতির বাক্যের অন্যথা হইবার উপায় নাই। তিনি চন্দ্রদেবকে আশ্বাস দিলেন যে মাসের মধ্যে পক্ষকাল তাঁহার কলঙ্ক চিহ্ন অদৃশ্য থাকিবে। চন্দ্র দেব বিগত পাপ ক্ষালনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে প্রজাপতি তাঁহাকে মহাদেবের লিঙ্গ স্থাপনা করিয়া উপাসনা করিতে বলিলেন। সোমদেব প্রভাস ক্ষেত্রে সোমনাথ বা সোমেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র সম্বন্ধে অলবিরুণী এই উপাখ্যান শুনিয়াছিলেন।

সোমনাথের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। চৌলুক্যবংশীয় মূলরাজ (৯৪২—৯৯৭ খৃঃ অঃ) বনস্থলীর রাজা গ্রহরিপুকে পরাজিত করিয়া সোমনাথ পত্তনে গমন করেন এবং সেখানে সোমনাথ দেবের অর্চ্চনা করেন। গ্রহরিপুর অপরাধ ছিল, তিনি সোমনাথের তীর্থযাত্রীদিগকে নির্মম ভাবে হত্যা করিতেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে নিরীহ যাত্রীদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিয়া বনস্থলীর রাজা সিংহাসন ও প্রাণ হারাইলেন। ইহার পরের সর্ব্বপ্রধান এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা মামুদের অভিযান।

মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে হিন্দু ও জৈনগণ একেবারেই নীরব। সুতরাং সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বিবরণই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। হয়ত সে বিবরণ পক্ষপাত ও অতিরঞ্জন দুষ্ট, কিন্তু অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহা একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না। মুসলমান পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন যে সোমনাথের প্রাচীন মন্দির—যে দেবায়তন মামুদের হস্তে কলুষিত হইয়াছিল—সরস্বতী নদীর মোহান হইতে তিন মাইল পশ্চিমে সাগরতীরে অবস্থিত ছিল। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে মন্দিরের সোপান ডুবিয়া যাইত। বিগত নয়শত বৎসরের মধ্যে সরস্বতীর মোহানা সরিয়া গিয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারীরা অলবিরুণীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে বড় বড় শিলাখণ্ড লক্ষ্য করিয়াছেন। এখনও জোয়ারের জলে এই পাথরগুলি ডুবিয়া যায়। সম্ভবতঃ এই বিশাল প্রস্তর ফলকগুলিই সোমনাথের আদিমন্দিরের ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ। এই বিশাল মন্দিরের বহুরত্নখচিত ৫৬টি স্তম্ভ ছিল। ইহার ত্রয়োদশ তল উচ্চ শিখরের উপরস্থ ত্রয়োদশটি স্বর্ণ গোলক বহুদূর হইতে দেখা যাইত। মন্দিরের ঘণ্টার স্বর্ণ শৃঙ্খলের ওজন ছিল প্রায় দুইশত মণ। যাত্রীদিগের ভক্তি প্রদত্ত অর্থ ব্যতীত মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত দশ সহস্র পল্লীর রাজস্ব হইতে। দেবতার সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তিনশত বাদ্যকার ও পাঁচশত নর্ত্তকী। যাত্রীদিগের মস্তক মুণ্ডন করিবার জন্য প্রত্যহ তিনশত ক্ষৌরকারের প্রয়োজন হইত। দেবতার অভিষেকের জন্য প্রত্যেক দিন ভাগীরথীর পবিত্র সলিল আসিত, আর অর্চ্চনার জন্য আসিত কাশ্মীরের অপূর্ব্ব পুষ্প সম্ভার। শেষের কথাটি বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবার কারণ নাই। জনবল ও ধনবল থাকিলে প্রত্যহ গঙ্গোদক আনয়ন করা অসম্ভব হইত না, মোগল বাদশাহেরা গঙ্গাজল পান করিতেন এবং তাহাদের শিবিরে নিয়মিত গঙ্গাজল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কাশ্মীর হইতে কাথিয়াবাড়ের মন্দিরে পূজার ফুল প্রত্যহ লইয়া আসিবার ব্যবস্থা একালে সম্ভব হইলেও সেকালে মোটেই সম্ভব ছিলনা।

মামুদ সোমনাথ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন ধনলোভে। উত্তর ভারতের বহু মন্দিরই তাহার ধনলিপ্সার ফলে ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বোধ হয় এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ধর্ম্মানুরাগের আবরণে গোপন করিতে চাহিতেন। পরবর্ত্তী কালে ইরাণের কবি সাদী মামুদকে ইসলামধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে চিত্রিত না করিয়া অপরিতৃপ্ত লোভের দৃষ্টান্ত স্বরূপই ব্যবহার করিয়াছেন। সাদীর কবিতায় মামুদের আত্মা মৃত্যুর পরেও পরিত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা প্রায় সকলেই মামুদের অনুগ্রহজীবী মনে করিতেন, নিজেদের ইসলামের গৌরব বর্দ্ধন ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মামুদ বারবার হিন্দুর মন্দির আক্রমণ করিয়াছেন। মন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছেন। সোমনাথ আক্রমণও তাহাদের মতে সুলতানের ধর্ম্মানুরাগের পরিচায়ক। সিন্ধু ও রাজপুতানার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সোমনাথ আক্রমণ করা সহজসাধ্য ছিলনা। সুতরাং মন্দিরের পুরোহিতেরা নাকি বলিয়া বেড়াইত যে অন্যান্য দেবতাদিগের প্রতি সোমনাথ বিরূপ ছিলেন বলিয়াই মামুদের হস্তে তাহাদের নিগ্রহ সম্ভব হইয়াছে, কোন বিধর্ম্মীর সাধ্য নাই যে সোমনাথ দেবের অবমাননা করে। এই স্পর্দ্ধার প্রত্যুত্তরেই নাকি মামুদের সোমনাথ অভিযান। এই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে আর একটি আখ্যায়িকা প্রচারিত হইয়াছিল। সত্য না হইলেও ঐতিহাসিকের নিকট অন্য কারণে তাহার কিছু মূল্য থাকিতে পারে।

মামুদের আক্রমণের পূর্ব্বেই কাথিয়াবাড়ে মুসলমানদিগের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছিল, হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সোমনাথ পত্তনের অদূরেই একটি বাণিজ্য বন্দর ছিল, এখনও আছে। বিদেশযাত্রী বণিক ও নাবিকদিগের উপহারে যেমন দেবতার মন্দিরের সমৃদ্ধি হইয়াছিল সেইরূপ তাহাদের সহিত ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশীদের মধ্যে এই অঞ্চলের খ্যাতিও বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং নানা দেশ হইতে নানা সম্প্রদায়ের লোক এখানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন মুসলমান সাধু ছিলেন, তাহার নাম মঙ্গরুলী কাহি বা হাজি মামুদ। হাজি মামুদের আদি নিবাস মক্কায়। তিনি নাকি স্বপ্নে হজরতের হুকুম পাইয়াছিলেন—সোমনাথের উৎপীড়িত মুস্লিমদিগের

রক্ষার্থে তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে। তখন নাকি মন্দিরে প্রত্যেক দিন একটি করিয়া মুসলমান বলি দেওয়া হইত। হাজি মামুদের আমন্ত্রণেই নাকি সুলতান মামুদ সোমনাথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিব তীর্থে নরবলি কেন পশুবলিরও বিধান নাই। সুতরাং এই কাহিনী যে একেবারেই কাল্পনিক তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই অমূলক কিম্বদন্তী হইতে প্রমাণ হইতেছে যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিপন্ন ইসলামের ধুয়া একেবারে আধুনিক নহে।

মামুদের সোমনাথ অভিযান সম্বন্ধে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। ধর্ম্ম যখন বিপন্ন, তখনও স্থানীয় হিন্দু রাজারা বিধর্ম্মী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতে পারেন নাই। মামুদ অনায়াসে ভট্টি রাজপুত-দিগকে পরাজিত করিলেন। গুজরাটের শোলাঙ্কী (চৌলুক্য) রাজা ভীমদেব রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ পাস্থ প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মন্দির রক্ষী সৈন্যদল, মন্দিরের পরিচারকবর্গ, দেবতার জন্য নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। রক্ষী সৈন্যদলের সংখ্যা আমরা জানিনা, মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভক্ত সোমনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে ও অভ্যন্তরে নিহত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পেশাদার যোদ্ধার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়াই সম্ভব। মামুদ ত্রিশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া সোমনাথ যাত্রা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাহার দলে অনেক ধর্ম্মোন্মত্ত স্বেচ্ছাসৈনিক ও ছিল। হয়ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা, মন্দিরের পরিচারকেরা আশা করিয়াছিলেন যে রাজপুত শৌর্য্যে যাহা সম্ভব হয় নাই দেবতার মাহাত্ম্যে তাহা সম্ভব হইবে, সোমনাথই রুদ্রশক্তি প্রকাশ করিয়া মন্দির রক্ষা করিবেন। কিন্তু দেবতার শক্তির প্রকৃত প্রকাশ ভক্তের ভুজদণ্ডে। দেবতা নিজে যুদ্ধ করেন না, এখানেও করিলেন না। যুদ্ধ করিয়াছিল যাহারা তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সাহস ছিল কিন্তু সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল না। একদল যখন শত্রুদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত, অপর দল তখন ভূলুণ্ঠিত দেহে দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিতেছিল। তারপর নূতন উদ্দীপনায় আবার যুদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিতেছিল। মন্দিরের অলিন্দে অলিন্দে, কক্ষে কক্ষে যুদ্ধ হইয়াছে। উপাসনা গৃহ ভক্তের রুধিরে রঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে বহু রণক্ষেত্রে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা ও যুদ্ধ নৈপুণ্যই নির্ভীক অপটুতার উপর জয়লাভ করিল।

সোমনাথ লুণ্ঠনের বহুকাল পরে মুসলমান কবি সেখ ফরিদুদ্দীন আত্তর সোমনাথের বিগ্রহ সম্পর্কিত কাহিনী রচনা করেন। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জানিতেন, মন্দিরে সোমনাথের বিগ্রহ ছিল না, ছিল লিঙ্গরূপ। মামুদ এই লিঙ্গ ভগ্ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের সহিত লিঙ্গ বিগ্রহের কোন আলোচনার কথা সমসাময়িক ইতিহাসে নাই। অলবিরুণী বলিয়াছেন—সোমনাথ পত্তনের শিবলিঙ্গ ও থানীশ্বরের চক্রস্বামীদেবের পিত্তল বিগ্রহ মামুদ গজনীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সোমনাথ মন্দিরের দরজা গজনীতে লইয়া যাইবার গল্পও বোধ হয় অমূলক। মন্দিরের কক্ষে কক্ষে যখন ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে তখন আক্রমণকারীদিগকে দ্বার ভাঙ্গিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কোন বৃহদায়তন দরজা এরূপ অবস্থায় অভগ্ন থাকা সম্ভব নহে।

মামুদের বিজয়ী-বাহিনী সোমনাথ হইতে চলিয়া যাইবার পর রাজা ভীমদেব আবার মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, নূতন মন্দিরে আবার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধরাজ সোমনাথ গমন করিয়াছিলেন। ব্রোচের সন্নিহিত নর্ম্মদার কোন ঘাটে সোমনাথ যাত্রীদিগের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করা হইত। ইতিপূর্ব্বে মাতার অনুরোধে সিদ্ধরাজ তাহা রহিত করিয়াছিলেন। তিনি যে সোমনাথের মন্দিরের কোন সংস্কার করিয়াছিলেন এরূপ কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং মনেকরা অনুচিত হইবে না যে সিদ্ধরাজের সময় পর্য্যন্ত ভীমদেবের নির্ম্মিত মন্দিরই বিদ্যমান ছিল। ভদ্রকালীর মন্দিরে একটি উৎকীর্ণলিপি হইতে জানা যায় যে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমারপাল সোমনাথের নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে গুজরাটের মুসলমান রাজা মামুদ বেগড়া অথবা দ্বিতীয় মুজফরের শাসনকালে এই মন্দির মসজিদে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বেই কুমার-পালের মন্দির ও বিধর্ম্মী বিজেতার হস্তে কলুষিত হইয়াছিল। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির আদেশে তাহার ভ্রাতা উলুখ খাঁ ও সেনাপতি এসরত খাঁ গুজরাট আক্রমণ করেন। তখন বাঘেলা বংশের শেষ রাজা কর্ণদেব গুজরাট শাসন করিতেছিলেন। তাহার পত্নী কমলা দেবী ও কন্যা দেবলা দেবীর কথা সকলেই জানেন। কর্ণদেবের পরাজয়ের পর দিল্লীর সেনাদল কাথিয়াবারে প্রবেশ করিয়া আবার সোমনাথ লুণ্ঠন করিল। কুমারপাল বোধ হয় ভীমদেবের মন্দিরের ভিতের উপরই নূতন মন্দির গঠন করিয়াছিলেন। খিলজী সৈন্যেরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু গিরনারের একটি লিপি হইতে জানা যায় যে ইহার অল্পদিন পরেই স্থানীয় হিন্দুরাজা মহীপাল দেব (১৩০৮-১৩২৫) সোমনাথের জন্য একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মহীপালদেব তাহার আরব্ধ কার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র চতুর্থ খঙ্গার (১৩২৫-৫১) মন্দির নির্ম্মাণ শেষ করিয়া আবার নূতন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানেই কিন্তু সোমনাথের দুর্দ্দশার পরিসমাপ্তি হয় নাই।

এত কাল সোমনাথের লাঞ্ছনা হইয়াছে বহিরাগত আক্রমণকারীর হস্তে। ১৩১৮ সালে গুজরাটেরই একজন শাসনকর্ত্তা মহীপাল-দেবের মন্দির নষ্ট করিলেন। মুজফর খাঁ মুসলমান হইলেও বিদেশী ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষেরই অধিবাসী, তাহার জন্ম হইয়াছিল রাজপুত বংশে, তাহার পিতা পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। তুগলক বংশের পতনের সময় মুজফর গুজরাটে এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মত্যাগী পুত্রের হস্তে যে দেবমন্দিরের দুর্গতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মুজফর

সোমনাথ পত্তনের সকল হিন্দু মন্দির ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার স্থলে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বোধ হয় অহল্যাবাইর পূর্ব্বে আর কোন হিন্দু রাজা বা রাণী সোমনাথের জন্ত নূতন মন্দির রচনায় প্রয়াস পান নাই।

দেবতার সঙ্গে মানুষ কতদিন হইতে ভাঙ্গা গড়ার খেলা খেলিয়া আসিতেছে। যাহা নশ্বর তাহা নষ্ট হইবেই। কিন্তু যাহা শাশ্বত কোন সামরিক শক্তিরই সাধ্য নাই যে তাহা লোপ করে। মন্দির গিয়াছে কিন্তু মন্দিরের দেবতা চিরকাল জাগ্রত রহিয়াছেন ভক্তের হৃদয়ে। সেই ভক্তির নব নব প্রকাশ পাইয়াছে নূতন দেবায়তনে। সেই ভক্তি সেই নিষ্ঠাই আবার নবজাগ্রত ভারতের মনে প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষের উপর নূতন সৃষ্টির প্রেরণা আনিয়াছে। সোমনাথের নূতন মন্দির হইবে সেই নূতন সৃজনী শক্তির প্রতীক।

মজন্তালী-চরিত

রায় বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

মানুষ নাকি বৈতরণী পার হয় গরুর ল্যাজ ধরে'। পলিটিক্সে ফটিকের তেমনি জুটলো ভবেশ—গরু নয়, গাধা নয়, দস্তুর মত সেয়ানা একটি মানুষ। নানা অবস্থার ভেতর বুদ্ধির পাক ধরেছে। গোড়ায় গুণ্ডাগিরি, মাঝে ড্রিল মাষ্টার, শেষকালে ঝানু মেরে গেছে মোক্তারি করে'। চন্দনে চালাক ভাব। চালাকির ভেতর চালবাজি, যেমন কৌটোর ভেতর সিন্দুর। কপালে পরলে শোভা বাড়ে, নৈলে চাপাই থাকে।

নবীনবাবু ফটিকের বাবা—গ্রামের জমিদার, শহরের বাসিন্দা। শহরে এক পা, আর এক পা গ্রামে। শহরের পা তোলেন ত গ্রামে পা ফেলেন। জীবন কেটেছে মহা আরামে—ফুর্ত্তি আমোদ করে'। সন্ধ্যে বেলা কখনো মজলিস বসে। ইয়ার বক্সিরা এসে পান তামাক খায়—আরো অনেক কিছুই চলে।

ছেলের সখ পলিটিক্স্, বাপ দিলেন সায়। নিজের ছিল একদিন রকমারি বদখেয়াল, তার ভেতরও এ-সমিতির সভাপতি, ও-সমিতির সেক্রেটারি হয়েছেন—নিজে না হলেও লোকে তাঁকে তুলে ধরেছে, যেমন ক'রে ধরে মেশিনের ঝণ্ডা। ছেলের যদি একটা ভাল খেয়ালই হয়ে থাকে—মন্দ কি? উড়নচণ্ডী নয় ফটিক, বেশ হিসেবী। এরই ভেতর সব দেখতে শুনতে সুরু করেছে। হাজার হোক ছেলেমানুষ—তার ওপর ঘাড়ে চেপেছে ভবেশ। বোড়েল লোক প্রায়ই আসে তার আড্ডায়। ভারি খাতির করে তাকে। নল'চে আড়াল দিয়ে খায় তামাক, গেলাস আড়াল করে তরল নেশা। কেমন ফিটফাট ছিম-ছাম চেহারা—কেতা-দোরস্ত। ছাঁটা ছাঁটা গোঁফ—দেখেই বোঝা যায়, শিকারী লেড়াল।

ফুরসৎ মত ভবেশ এসে বলে, আছে—সব ঠিক করে দেব। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরবো ফটিককে নিয়ে।

জেলা বোর্ডের ইলেকশন। নবীনবাবু ভাবেন, তা ঠিক। ফটিক ভারি ভালো ছেলে। একবার যদি ঢুকতে পারে জেলা বোর্ডে, হয়ত একদিন চেয়ারম্যানই বা হবে। হেঁ হেঁ—কথায় বলে, ছুঁচ হয়ে ঢোক—আর ফাল হয়ে বেরোও।

ভরসা পান তিনি ভবেশের কথায়। আবার চমকেও ওঠেন সে যখন বলে—পুরো দস্তুর কমরেড্ সাজিয়ে তুলবো'খন। তখন দেখবেন, পায় কে ওকে।

কমরেড! সে কি হে।

কিছু নয়। একটা পরিচয় থাকা চাই ত। নৈলে লোকে ভোট দেবে কেন?

মনে মনে হাসেন নবীন বাবু। জমিদারের ছেলে কমরেড। এই নৈলে পলিটিক্স্!

হাসি মুখে বলেন, কি জানি বাপু। আমাদের সময় বাপের পরিচয়ই কাজে লাগতো।

বয়সে কাঁচা হলেও বুদ্ধি রাখে ফটিক। লেখাপড়া শেখেছে, সাহিত্য চর্চায় ঝোঁকও দেখা যায়। সাহিত্যকে ঘিরে আছে, দেশের আবহাওয়া—তার পরশ এড়িয়ে সাহিত্য-সেবাকে ফটিক মনে করে অর্থহীন। দেশের স্বাধীনতার জন্ত পড়ে মার খাচ্ছে যারা, পুলিশের গুলিতে

মরেছে, না হয় জেলে যাচ্ছে, সে তাদের শ্রদ্ধাই করে, বলে—তারা সব শহীদ। বাপ জমিদার—সক্রিয় পলিটিক্সে বিপদ ঢের। একবার কাগজে লিখেছিল সে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন বিষয়ে ভ্রম, ত্রুটি, পক্ষপাত দেখিয়ে। অমনি পড়লো সরকারি চাপ—বাস্ রে বাস। সেই থেকে ভেঁড়ে নি আর পলিটিক্সে। ময়রার দোকানের বন্ধ কাঁচের আলমারির বাইরে ভোমরার মত ঘুরতে ঘুরতে সে শুধু জিলিপির পাকই গুণে গেল।

মরশুম এল এবার জেলা-বোর্ডের ইলেকসনে। ভবেশ বলেন—ঠোক তাল। লড় ইলেকসন। হোক জেলা বোর্ড—পলিটিকস্ ত বটে।

কে কে দাঁড়াচ্ছেন?

দাঁড়ান নি। উড়ছেন। তিন তিনটে জাপানী বিমান। কংগ্রেস, হিন্দু সভা—লীগের কথা ছেড়ে দাও। তাক মাফিক লাগাও—ব্যস। তিনটেই ভূপাতিত।

আর যদি না লাগে। মিস্ ফায়ার—হাসতে হাসতে কটিক জিজ্ঞেস করে।

ঈস্। লাগবে না আবার। উকিল না হয়ে মোক্তার হলুম কেন বল ত? সাধ করেই গ্রাজুয়েট হই নি, তা জান?

কি রকম?

সে এক মজার কথা, শোন বলি। কলেজে ছিল একজন ইংরেজ প্রফেসর। বাংলা হিন্দী কিচ্ছু জানেন না। মনে মনে ধারণা, তিনি একজন বড় ফাইললজিষ্ট। এক একটি ইংরেজি কথা ধরেন, আর ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেন সেটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ। জ্বালাতন! একদিন জিজ্ঞেস করলেন, অ্যালির প্রতিশব্দ বলতে পার কেউ। বলে উঠলুম—গলি। তবু ছাড়েন না—কি বিপদ। বলেন, এগজাম্পল্? সংস্কৃত একটি পদ বল ত।—পিছপাও হবার পাত্তর নই বাবা। সঙ্গে সঙ্গে দিলুম উদাহরণ—কোন গলিসে গেয়া মেরি শ্যাম।—আর যায় কোথা? হাসির হর্‌রা উঠলো ক্লাশ শুদ্ধ ছেলের। সায়েব ত চটে লাল—এই মারে ত এই মারে। উঠেই দিলুম চম্পট। দূর থেকে দণ্ডবৎ করলুম গ্রাজুয়েটের খুরে।

হাসপাতালের ধারেই লেডি ডাক্তার সুজাতা দেবীর কোয়ার্টার। নামের আগে নিজে লেখে সে, শ্রীমতী—লোকে বলে, মিস্—ওয়াকিব-হাল মহলের খবর, মিসেস্। বয়সে যুবতী সে, বর্ণে শ্যাম, কথায় কৃপণ। হামেশা ভবেশ যায় তার বাড়ি, তাই নিয়ে কানা ঘুষাও শোনা যায়। সেবার ধর্মপুজোয় মেলায় পাড়ার ধুরন্ধর ছেলের দল তামাসা করে' একটা সং বের করেছিল। মাথায় পরচুলা, কালো কস্তাপেড়ে শাড়ি পরণে, গলায় ষ্টেথেস্কোপ ঝুলিয়ে একটি ছেলে সাজলো লেডি ডাক্তার। আর একজন পরলে, কোট প্যান্ট নেকটাই, যেমন পরে ভবেশ। লেডি ডাক্তার জিজ্ঞেস করে, ব্যারাম কি? কোট প্যান্ট বলে, জরায়ুর।—হেসে জিজ্ঞেস করে লেডি ডাক্তার, কার? আপনার নয় নিশ্চয়।—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে, তা হলে ত ভালই হতো। আপনার ক্যাবিনেই পড়ে থাকতে পারতুম। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যারাম আমার স্ত্রীর।—প্রশ্ন, আপনি এলেন যে?—তড়িঘড়ি জবাব, প্রক্সি। অনেক কাজ প্রক্সিতেই সারতে হয় কি না।

সিগারেট টানতে টানতে সুজাতার ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের সামনের চেয়ারের ওপর বসে পড়লো ভবেশ। কদিন আসতে পারে নি, তার কৈফিয়ত দিয়ে বললে, ইলেকসনের হুজুগ চলেছে। ছুটোছুটি করতে হচ্ছে বিস্তর।

সুজাতার চোখের ভুরু কুঁচকে ওঠে। ঠোঁট দুটো চেপে আক্রোশভরা দৃষ্টির খোঁচা দিয়েই বলে, আচ্ছা—নবীনবাবুর ছেলেটিকে পেয়ে বসেছ কেন বলত?

কেন—ঈর্ষা হয় বুঝি?

ঈর্ষা নয়—দুঃখ। তোমায় চিনি কিনা, তাই বলছি। ভরাডুবি না করে' ত আর তুমি ছাড়বে না।

ভবেশ হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, কি যে বলিস্—মাইরি। যদি পারি একটু উপকার করতে—বোর্ডের মেম্বর, সম্মান ত বড় কম নয়। হাঃ হাঃ—

তুমি করবে উপকার? তা হলেই হয়েছে। আমার কি উপকারটা তুমি করেছ ভেবে ভাখো ত। লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি নে। কোথাও যে চলে যাব, তারও জো নেই। তুমি লাগবে পেছনে।—বলতে বলতে সুজাতার চোখ দুটো ছল ছলিয়ে উঠলো।

আদর করে' ভবেশ বলে, থাম্ থাম্। লোকে বলে ত

হয়েছে কি? লোকের কথায় খিদেও পায় না, পেটও ভরে না।

মাথা হেঁট করে সুজাতা ভাবে তার অদৃষ্টের কথা। গরীব ভদ্রঘরের মেয়ে সে, বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। স্বামী দেখতে পারে না তাকে, শ্বশুর শাশুড়িও নয়—নানা কারণে স্বামীর সঙ্গে লাগলো তার ঝগড়া, স্বামী করলে আর একটি বিয়ে। শেষে নিজের পায়েই ভর করে দাঁড়ালো সুজাতা, ডাক্তারি পড়ে পাশ করল সে। চাকরি পেয়ে এখানে এসে পড়লো ভবেশের খপ্পরে। খপ্পর্ বলে খপ্পর—উঠ্ কিস্তির চালে দেয় একেবারে বসিয়ে। কলের ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত অবস্থা, একদিকে পাকা কলা, আর একদিকে নাকানি-চুবুনি। বাপরে বাপরে—কী মানুষ! সুরসুরি দিয়ে হাসায়, হাতে তুলে দেয় আকাশের চাঁদ—আবার দরকার হলে, শাসিয়ে কাজ হাসিল করে। সেই গল্পে আছে না—বানে ভেসে কম্বল আঁকড়ে ধরেছিল কে, কমলি আর ছাড়ে না। সুজাতারও তাই—চাল নেই, চুলো নেই, যায় কোথা? তবু সবটুকু শক্তি দিয়ে রুখেছিল একদিন ভবেশকে, সহজে ধরা দেয় নি। হাঁসপাতালের সেক্রেটারী নবীনবাবু, তার কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়েছিল—আপনি আমার বাবা, বাঁচান আমায়। নবীনবাবু হাসলেন মনে মনে—আহা, যেন সতী সাবিত্রী। বয়েসকালে কত দেখেছেন অমন প্রেমের কলহ, বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। নির্বিকার উদারভাবেই বলেন তিনি, এসব বিষয় গোপন রাখতে হয়। চলাচলি কি ভাল? ওটা তুমি ভবেশের সঙ্গেই মিটিয়ে ফেল বাছা।

দশ চক্রের পলিটিক্সে বোর্ড গঙ্গা পায় নি, পেয়েছে তাকে ভূতে। ইলেকসান প্রপাগ্যাণ্ডা চলে, আরে—আগে নামাও ভূত, গঙ্গাযাত্রা পরে। গাঁয়ে গাঁয়ে সভা সমিতি। কাতারে কাতারে লোক এসে জমে বক্তৃতা শুনতে। অবাক হয়ে ভাবে তারা—ভূতই বা কে, মানুষই বা কে? ইলেকসনের বেলা সবাই বলে লম্বা চওড়া কথা, তাদের বেলা ঢুঢু। এই ত সেবার, ভানুবাবু দাঁড়ালেন—বললেন কিনা পেজাপতি হয়েছেন—

পেজাপতি? ও—প্রজা পার্টি। তাই বল—

কে জানে মশায়, আপনাদের পাত্তি নাত্তির খবর। জল নেই, গরমিকালে তেষ্টা মেটাই। ব্যামোর মন্নি, চিকিচ্ছে আর হয় না। নতুন রাস্তা ইঁদারা চুলোয় যাক, যে কটি আছে তাও যেতে বসেছে। বাবুদের শুধু কথায় ভেলকি বাজি। বিশ্বেস করতে হয় মেয়েমানুষকে করবো—বাবুদের নয়।

পাশে বসে ভবেশ টেপে ফটিককে। কানে কানে বলে, বল না হে—তুমি একজন কমরেড। আর সেই ডেরি প্রথার কথাটা—

ফটিক দাঁড়িয়ে উঠে বলে, দেশের দশের কাজ করবো বলেই ত দাঁড়িয়েছি। বিশেষ করে চাষী প্রজার কাজ। নিরন্ন দেশ। লুটে পুটে খাচ্ছে ভণ্ড প্রতারকের দল। উঠুন—জাগুন। প্রতিজ্ঞা করুন, যাকে তাকে ভোট দেবেন না। বাজিয়ে নিন্, দেখুন,—দেশের জন্তে কে কি করেছে। এই শুনুন, আজ থেকে ডেরি প্রথা উঠিয়ে দিলুম। প্রজা যে ধান ধার নেয়, তার দেড় গুণ ফেরত দিতে হয় তাকে। এখন দেবে সওয়া গুণ; দেড় গুণ আর দিতে হবে না।

সাবাস! হাততালি পড়লো চারদিকে। জয় ফটিকবাবুর জয়।

ফিরবার পথে ফটিকের পিঠ চাপড়ে বললে ভবেশ, বেড়ে স্পীচ দিয়েছ হে—ফাইন। এইবার চারে ভিড়বে মাছ। টোপ ফ্যালো আর তোল।......

পরদিন সকালবেলা ভবেশ গেল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলায়। আপিস কামরায় বসে কাজ করছিলেন সায়েব। কার্ড যেতে তলব পড়লো।

সেলাম করে বলে ভবেশ, দেশটা উচ্ছন্ন গেল হুজুর। সরকার দাবিয়েছেন কংগ্রেসকে। ঠিকই করেছেন। এবার উঠেছে কম্যুনিজমের ধুয়ো।

ফাইল ঠেলে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন ম্যাজিষ্ট্রেট, —কি হয়েছে বলুন তা—

আজ্ঞে—জেলা বোর্ডের ইলেকসন, সেখানেও কম্যু-নিজম। ফটিকবাবু হয়ে উঠেছেন মস্ত একজন কমিউনিষ্ট। ওর বক্তৃতা যদি শোনেন—একেবারে আগুন।

ও আর শোধরালো না দেখছি। কি সব লিখেছিল, সেজন্ত ওয়ার্ণ করা হয়েছিল একবার।

শোধরাবে ও? এমন বে-আক্কেলে মানুষ ভূভারতে

পাবেন না স্তর। বলে কি না ডেরি প্রথা আর চলবে না—উঠিয়ে দিলুম। ভদ্দর গেরস্তর সম্বল জমি-জেরাত। ডেরি গেলে এই আক্কাল্লার দিনে বাঁচে কেমন করে?

রাইট। এ আন্দোলনটাকে মাথা তুলতে দেওয়া হবে না।

ফটিকবাবু ভোটে জিতলে সর্বনাশ। নমিনেশনটা একটু দেখে শুনে দেবেন স্তর।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

আইনের শাসন ম্যাজিষ্ট্রেটের। আইন অর্থে কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখা। ওর নড়চড় করতে গেলেই শান্তি-ভঙ্গ। নবীনবাবুকে ডেকে পাঠালেন ম্যাজিষ্ট্রেট; জরুরি তলব, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি।

সমাদর করে বসিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলে না কি কম্যুনিষ্ট হয়েছে?

নবীনবাবু জিব কাটলেন। রাম বলুন। তবে ইলেকসান কিনা। একটু ভড়ং দেখাতে হয় বৈকি।

ডেরি প্রথা উঠিয়ে দিলে যে?

এবার হাসলেন নবীনবাবু। বললেন, আমার জমিদারি থেকে তুলে দিলেই কি প্রথা উঠে যায় কখনো? কথায় বলে—যার পাঁঠা সে যদি ল্যাজে কাটে।

ঘাড়ে কোপ দিতে পারেন, জবাই করলেও আপত্তি নেই। কিন্তু ল্যাজে কাটলে, সেটা হয় ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যাল। আইনের আমলে আসে। যান, ছেলেকে সাবধান করে দিন গে। ও সব চলবে না।

স্ফুর্তিবাজ মানুষ নবীনবাবু। প্রাণ খুলে আমোদ কর। পলিটিক্স্ করতে চাও, তাতেও আপত্তি নেই—তবে চামড়া বাঁচিয়ে। ভেবেছিলেন, ইলেকসানে আছে পলটিকিস্—নেই জেল। ওরে বাবা, এখানেও যে সেই জুজুর ভয়!

ফটিককে বললেন তিনি; ভাখো ত—কি ফ্যাসাদে ফেললে। কাজ নেই আর ইলেকসান, ফিলেকসান—

মাঝ-দরিয়ার ঘোড়া বদলে ফিরে আসবে তেমন আনাড়ি ঘোড়সওয়ার ফটিক নয়। নেমেছে যখন, তখন এস্পার কি ওস্পার। ভবেশকে বললে সে, শুনেছ ভবেশদা'। বাবাকে শাসিয়েছেন ম্যাজিষ্ট্রেট। নিশ্চয় পুলিশ একটা বাজে রিপোর্ট করেছে।

বুড়ো আঙুলটা তুলে ধরে' ভবেশ বললে, করেছে ত বয়ে গেছে। থোড়াই কেয়ার। ছুটো বাস, গোটা ছুই ট্যাকসি আর পেট্রোল দিও আমায় ছিলিমপুর পোলিং সেনটারে। দেখো, কেমন চড়াই আর নামাই ভোটারকে। ভোটের উনুন কামাই যাবে না একরত্তি সময়।

আপ্যায়িত হয়ে ফটিক বলে, তোমার ওপর ভর করে আছি। দেখো দাদা—

ব্যস্। আর বলতে হবে না। নিশ্চিন্দি থাক।

ছিলিমপুর পোলিং সেনটার। ভোটের তোড়জোড় চলছে। পাকা ইস্কুল ঘরের সামনের জমিটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে। বেড়ার গায়ে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে নির্বাচন-প্রার্থীদের নাম বিবরণ, আবেদন নিবেদন! রং বেরংএর ছাপানো হ্যাণ্ডবিল বিলি হচ্ছে—হরেক রকমের। গোছা গোছা জমে উঠছে লোকের মুঠোর ভেতর, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে ভেবে পায় না কেউ—শেষে গোবিন্দায় নম করে' পকেটে ভরে, নয় রাস্তায় ফেলে দেয়। ভোর থেকেই দলে দলে ইস্কুলের ছেলেরা বেরিয়েছে কংগ্রেস-দলের প্রার্থী হিমাংশুবাবুর ভোটের ক্যানভাস করতে। ফটিকের নেই চেলা-চামুণ্ডের দল। ভবেশ বলেছে, সে একাই একশ'। নিশান হাতে ছেলেরা টহল দিচ্ছে, আর চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে—কংগ্রেসকে ভোট দিন। বন্দে মাতরম।

ভবেশ এল ট্যাক্সি করে, সঙ্গে বাসে ভরা ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার, শালপাতা, হাঁড়ি মালসা। ভোটার নয় ত—বাপের ঠাকুর। বাসে করে আন, খাতির করে' বসাও, পেট ভরে খাওয়াও—তবে তিনি দেবেন ভোট, কাকে দেবেন তাও জানেন ভগবান। খাবার, পেট্রোলের টিন সবই তুলে রাখলে ভবেশ গুদাম-ঘরে। দরকার হবে যখন নিজের হাতে বের করে দেবে—কাউকে বিশ্বেস নেই বাবা। বাইরে এসে ঘরে কুলুপ লাগালে সে।

ছেঁকে ধরলে, ভবেশকে ছেলেরা। হল্লা সুরু করলে—গো ব্যাক্। ডাউন উইথ ফটিকবাবু—

অমায়িক ভাবে হেসে বলে ভবেশ, এসব তোরা কি বলছিস ইংরেজি মিংরেজি। ছড়া বাঁধ—রাস্তায় রাস্তায় ছড়া গান করে বেড়া।

কি রকম ছড়া ?

এই যেমন—ফটিকবাবু জমিদার, ভোটে তার কি অধিকার।

ব্রেভো। হুররে—জিতা রও বাবা। ফটিকবাবু জমিদার—পরমানন্দে তখনি ছড়া গাইতে সুরু করলে ছেলেরা।

ভোট সুরু হয়েছে কখন। পোলিং বুথ ইস্কুল ঘরের ভেতর। সেখানে চেয়ারে বসে সরকারি কর্মচারি। তালিকাটি খুঁজে বের করেন ভোটারের নাম। একটি একটি ব্যালট-কাগজ ছিঁড়ে দেন ভোটারের হাতে। স্রোত বয় তির্ তির্ করে—জলোচ্ছ্বাসও নেই, কল্লোলও নেই। ছাত্রদের সকালবেলার উত্তম কেমন মিলিয়ে এসেছে। বাধা প্রতিবন্ধক কোথাও নেই যে উত্তেজনা জাগিয়ে তুলবে। চড়চড়ে তালু-ফাটা রোদে টহল দিয়ে অনেকেই সরে পড়েছে এখন। গান্ধি-টুপি মাথায়, খদ্দরের জামা-পরা দু চারটে ছেলে বাঁশের কেয়ারির ধারে দাঁড়িয়ে ভোটার দেখলেই জিজ্ঞেস করছে—কার ভোট ? অমনি জবাব আসে—কংগ্রেসের। ভোটের ব্যাপার দাঁড়িয়েছে বিলকুল একতরফা—একঘেয়ে।

সারাদিন আসে নি ফটিক। ভবেশ বলেছিল, কিছু দেখতে হবে না তোমায় এ-সেনটারে। বিকেলের দিকে ফটিক এল ট্যাকসিতে, ভোট তখন বন্ধ হয় হয়। এসেই চক্ষু স্থির। দেখে, তার বাস ট্যাক্সি সব দাঁড়িয়ে—ড্রাইভারেরা সব গাছের তলায় ছায়ায় বসে গুলতান করছে আর বিড়ি ফুঁকছে। সুধু কংগ্রেসের একখানা ভাঙা গাড়ি জনকতক ভোটার নিয়ে আনাগোনা করছে।

ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করলে ফটিক, তোমরা সব বসে আছ যে ?

তারা বলে, কি আর করবো ? দু খেপ দিতে পেট্রোল গেছে ফুরিয়ে।

সে কি ! অতগুলো টিন—

একজন আঙুল দিয়ে দেখালে গুদাম ঘর। বললে, সব বন্ধ। ঐ দেখুন।

ভবেশদা' কোথা ?

তিনি ত দুপুরের আগেই সহরে ফিরেছেন। তাঁর কাছে গুদামের চাবি।

ফটিক অবাক হয়ে গেল। কী ধাপ্পা-বাজিটাই খেলল ভবেশ তার সঙ্গে !

ট্যাক্সি করে সহরে ফিরেছিল ভবেশ ভোট সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। বলে গেল, এই আসছি। গেল ত গেলই, আর ফিরলো না।

গাড়ি দাঁড়ালো লেডি ডাক্তারের বাড়ির সামনে। বড় বড় দুটো হাঁড়ি দুহাতে ঝুলিয়ে অন্দরে ঢুকলো ভবেশ। সুজাতার কাছে গিয়ে বললে, এই নাও।

ও আবার কি ?

সন্দেশ—মিহিদানা। জলযোগ বিলি করছি কিনা—ভোটারের বাড়ি বাড়ি।

জলযোগ বিলি ! সে কি !

ঘরে বসে জলযোগ। কষ্ট করে কারু আর ভোট দিতে যাবার দরকার হবে না। একেই বলে ভোট-রঙ্গ। —ভবেশ হো হো করে হেসে উঠলো।

দৃষ্টি পাকিয়ে চেয়ে থাকে সুজাতা। বলে, এমন সর্বনাশও কেউ কারু করে ? তুমি কি মানুষ ?

দুটো হাত দুটো পা—মানুষ ত বলতেই হবে। তোকে বলি, মাইরি—মানুষ হওয়া ঝকমারি। আমি চাই, তোর কোলের পুসি বেড়ালটি হবে পড়ে থাকতে।

আচ্ছা—এর পর নবীনবাবুর কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে' বলত ?

রাবণের দশটা মুখ। একটা গেলে থাকে ন'টা। বাজি রাখ—ঠিক দেখিয়ে আসবো। কিচ্ছু আটকাবে না।

অজগরের হাঁ-করা বীভৎস মুখ, চোখা চোখা বাঁকা দাঁত দেখেও, তার দৃষ্টির কি যেন মোহিনী শক্তি যেমন খরগোসটিকে টানতে থাকে, তেমনি কোন আকর্ষণ ছিল সুজাতার এই লোকটির ওপর—ঘৃণা বিরক্তি মুখে ফুটলেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে নি। ভেবে পায় না সে, এ তার কি রকম ব্যাধি।

চক্ষু-লজ্জা কাটিয়ে সত্যি ভবেশ গিয়ে সেদিন নবীনবাবুর কাছে হাজির হল। বিবর্ণ মুখে কাঁচু মাচু ক'রে বললে সে, দেখুন ত, কোথা থেকে কি হয়ে গেল। এমনটি যে হবে—

ভারি ভদ্রলোক নবীনবাবু। বাধা দিয়ে বললেন, তার আর কি হয়েছে। ছাড় ও কথা।

দোষ আমার—একশবার বলবো, আমার দোষ। কাউকে বিশ্বাস করি নি। চাইলুম, সব একা করতে। অন্যায়—আরও দু'চারজন সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল। মানুষের ব্যামো আছে, আকস্মিক দুর্ঘটনা আছে। এমনি গ্রহের ফের, ঠিক পোলিংএর সময়টিতে হল ভেদ বমি—আগেও নয়, পরেও নয়। কলেরা না কি—ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরলুম বাড়িতে।

চোপরাও—রাসকেল।—ও ঘরে ফটিক তার কথাগুলো শুনেছিল। মার মার শব্দে ছুটে এল।

শশব্যস্তভাবে নবীনবাবু বলে উঠলেন, ছি ছি ফটিক। ভদ্র লোকের অপমান—

মজন্তালীর আবার অপমান! হঃ—উল্লুক কোথাকার। —রাগে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল।

ধীর গম্ভীর ভাবে ভবেশ বললে, সাহিত্যিক—ব্যাকরণ ভুল ক'র না ফটিক। মজন্তালী বেড়াল, উল্লুক নয়।

থাক থাক—আর রসিকতার কাজ নেই। গেট আউট—নিকালো।

বরদাস্ত করতে পারেন না নবীনবাবু। ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ফটিক। না—উনি যাবেন না। তুমি যাও এখান থেকে।

যাচ্ছি। আপনি ওকে চেনেন নি বাবা। ভবেশের পানে চাইলে সে কটমটিয়ে। চোখ দুটো ইঁটের ভাঁটার আগুনের মত জলছিল।

নবীনবাবুর যেন মাথা কাটা গেছে, এমনিভাবে ভবেশের হাত ধরে বললেন তিনি—আজকালকার ছেলেরা সব অশিষ্ট—অবাধ্য। তুমি কিছু মনে ক'র না ভবেশ।

কিছু না, কিছু না। আর রাগ ত হবারই কথা ওর। যে রকমটা হয়ে গেল—সব পণ্ড।

শোন—

কানের কাছে মুখ এগিয়ে এনে—যেন মস্ত একটা গোপন কথা এমনিভাবে—ফিস্ ফিস্ করে বললেন নবীনবাবু —ইলেকসান চুকেছে, না আপদ গেছে। তোমার বলতে কি ভবেশ, আমি ভারি খুশি হয়েছি—ফটিক হেরেছে। ওসব কমরেড্ ফমরেড্ হতে যাওয়ার ফ্যাসাদ ঢের।

তা আর বলতে। সরকারের যে কড়া আইন—জেল, না হয় ইনটার্ণ।

একটু ইতস্ততের ভাব দেখিয়ে ভবেশ বললে, একটা কথা বলব ভাবছিলুম—কিছু যদি মনে না করেন।

না না। বল, কি বলবে।

আজ্ঞে, লেডি ডাক্তারও আর থাকতে চায় না। চারদিক থেকে অফার আসছে বেশি মাইনের। যুদ্ধের বাজার বোঝেন ত?

তা বেশ ত। মাইনেটা না হয় বাড়িয়েই দেওয়া যাবে।

একটুখানি অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন তিনি, অমন লেডি ডাক্তার আর পাবে না ভবেশ।

বগল বাজিয়ে ফিরলো ভবেশ। সুজাতাকে গিয়ে বললে, দেখলি ত। মুখ দেখিয়ে সুধু হাতে ফিরি নি। দক্ষিণাও কিছু সঙ্গে এনেছি। তোর মাইনে বেড়ে গেছে।

সুজাতা অবাক। কী ভয়ানক লোক! দৃষ্টি শনির, বুদ্ধি বৃহস্পতির। ঝাঁঝালো গলায় রসান মিশিয়ে বললে সে—আচ্ছা, তোমার মত ক'টি মানুষ এদেশে আছে বলতে পার?

তা আছেন বৈ কি দুচারজন।

ব্যঙ্গের লোভ ছাড়তে পারে না সুজাতা। বলে, বলেছ মন্দ নয়। ডাক্তারদের মতে, জিনিয়সের সঙ্গে পাগলের তফাৎ খুবই কম। তুমি কিন্তু পাগল নও—শয়তান।

ভবেশ হেসে কুটি কুটি। বললে, ওরে—শয়তানও স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেবতা। বরাতে থাকলে সে-ই একদিন ঈশ্বর হয়ে বসতে পারতো।······

দিন কত পর ভবেশের হাতে পড়লো একখানা চিঠি। সুজাতার চিঠি সেখানা, হাসপাতালের একজন বেয়ারা এনে দিলে ভবেশকে। পত্রে লেখা ছিল:

বিশ্বের চোখে ধুলো দিয়ে চলেছ তুমি। এবার তোমার চোখে ধুলো দিয়ে আমিও চললুম। চিঠি যখন পাবে, আমি আর তখন এখানে নেই। কোথা চলেছি বলব না। কোন কাজে, তাও বলব না। তুমি যাতে আর আমার নাগাল কখনো না পাও—সেই হবে আমার সারা জীবনের চেষ্টা।

পৃথিবীর মানুষকে ঠকানোই যার নেশা, নীতির কথা তাকে বলা মিছে। তবু বলতে হয়—পৃথিবী বোকা নয়! গোটা পৃথিবীকে যারা মনে করে বোকা, তাদের নিজেদের

বুদ্ধির দৌড় বেশি দূর নয়। যাত্রা দলের যুধিষ্ঠিরকে ছেলেরা জানে যুধিষ্ঠির বলেই—আসরের বাইরেও সে যুধিষ্ঠির। ছেলে বড় হলে বোঝে, ওটা সুধু একটিং। তোমার যাদুও একদিন ভাঙবে। লোকে তোমায় চিনবে।…… :

চিঠিখানা হাতে করে ভবেশ থ হয়ে বসে রইলো। সুজাতা চলে গেছে, আর দেখা হবে না তার সঙ্গে। কয়েক বছরের মাথামাথি তাকে কেমন যেন তার মনের টানায় পড়েনের মতই বুনে দিয়েছিল। হঠাৎ বুঝলে সে—কখনো নিজ থেকে আলাদা করে দেখে নি। সবাই দেখেছে তার বহুরূপী বেশ, আদৎ রূপ তার প্রকাশ করেছে সে এই মেয়েটির কাছে। সুজাতা যেন তার শোবার ঘরের আরসীর কাঁচ। দেহের শেষ আচ্ছাদনটুকু ছেড়ে ফেলে তারই ভেতর দেখেছে সে নিজের প্রতিবিম্ব। সুজাতা তাকে ঘৃণা করেছে, বিরক্তির ভাব দেখিয়ে কাটা কাটা কথা শুনিয়েছে। এখন মনে হল, সেগুলি তার নিজের ওপর নিজেরই ঘৃণা, নিজের ওপর বিরক্তি—সুজাতার মুখ দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে, তারই বিবেকের গঞ্জনা। কথাগুলি বিঁধেছে তাকে সূচের মত, সে রাগ করে নি—চেয়েছে উড়িয়ে দিতে হাসি ঠাট্টা করে, জালা যায় নি কিন্তু।

এ কি! কি এসব ভাবছে সে? কোথা থেকে এল আজ তার এই দুর্বলতা? ভবেশ লাফিয়ে উঠলো। রাগে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাতের চিঠিখানা দলা-মোচা করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সে।

যা—যা। মর গে—

ছুটলো তখনি সে ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েবের কুঠিতে।

সেবার পেল সে একটি খেতাব—তার সঙ্গে জেলা-বোর্ডের নমিনেশন।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

তৃতীয় স্তবক

* * * *

আমি শুনছি প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর, অনবদ্য ভাষায় তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন যবনিকার অপর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে, সে যবনিকা ভাগ্যপ্রাচীরের মতন আমাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। আমি দণ্ডায়মান হয়ে প্রিয়তমকে অভিনন্দন জানালাম তিনি যে বিশ্বজগতের সম্রাট। তাঁরই ভাষায় আমি তাঁর আগমনের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। তিনি উত্তর দিলেন—

"সম্রাটনন্দিনী কি আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন?" তাঁর দৃষ্টিতে ছিল সূর্য্যের দীপ্তি, সমুদ্রের প্রাচুর্য্য, আমি ঝারোখার মধ্য দিয়ে দেখতে পেলাম স্বর্ণাভ সন্ধ্যাকাশের প্রচ্ছদপটে প্রিয়তমের শুভ্র উষ্ণীষ, অতীতের চেয়েও উচ্চ তাঁর শির। তিনি যে অনেক যুদ্ধের বিজয়ী বীর। আবার তিনি বল্লেন—"সম্রাটকুমারী, আপনার শ্রদ্ধাস্পদ পিতা একদিন তাঁর দুঃসময়ে (১) উদয়পুরে এসেছিলেন—তাঁর অভ্যর্থনার জন্য আমরা একটী সম্মান তোরণ রচনা করেছিলাম। সেই তোরণে জ্বলছে নিশিদিন দীপশিখা, যতদিন একটী রাজপুত্র জীবিত থাকবে, ততদিন সেই দীপশিখা অনির্ব্বাণ। যতদিন আমার বাহুতে শক্তি থাকবে, আমার তরবারী সম্রাটকুমারীর সম্মানের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।"

ঝারোখার উপর আমার অধরপুট ন্যস্ত করে আমি উদ্বেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলাম—"কিন্তু রাজপুতের সম্মান!"

প্রিয়তমের অধরপুট থেকে হাসির রেখা মলিন হয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেন "দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণই এই দেশের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। বাদশা বেগম, আপনার কি মনে পড়ে যে আপনার রক্তে রয়েছে রাজস্থানের রক্তবিন্দু, একদিন রাণা সমর সিং অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে দিল্লী আজমীর রক্ষার জন্য সংগ্রাম কত্তে। সেই বীরকুমারের কীর্ত্তি-গৌরবে আপনিও সমুজ্জ্বল। যুদ্ধের সময় একদা গভীর নিশীথে সমর সিং দেখলেন—এক অবগুণ্ঠিতা নারী। অকস্মাৎ তাঁর অবগুণ্ঠন খুলে গেল—অপূর্ব্ব সেই মুখশ্রী, সমর সিংহ শুনলেন ভবিষ্যৎ বাণী—"বীর! তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরব লুপ্ত হয়ে যাবে" দিল্লীর পতন হ'ল; বহু শতাব্দী অতীত হয়ে গেছে—দিল্লীর গৌরব ধুলায় অবলুণ্ঠিত! আমরা রাজপুত—আমাদের উপর হিন্দুস্থানের গিরি

---

(১) শাহজাদা সাহজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে চিতোরে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন, চিতোর-রাণা আশ্রিতকে সাহায্য দান করেছিলেন।

নদী রক্ষার ভার, অথচ আমরা আজও আত্মকলহে নিমজ্জিত হয়ে আছি।"

আমি উত্তর দিলাম—"আপনার পূর্ব্বপুরুষ কনোজকুমারী সংযুক্তার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর প্রিয়তম পৃথ্বিরাজ যুদ্ধযাত্রায় পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সংযুক্তা কি বলেছিলেন তা' আপনার স্মরণ আছে ত—"বীরের মৃত্যু মানুষেরে করে অমরত্ব দান।" তোমার জন্য চিন্তিত হয়ো না প্রিয়তম, অমরত্বের কথা চিন্তা কর। শত্রুকে দ্বিখণ্ডিত কর, মৃত্যুর পরপারে আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হবো।' যখন পৃথ্বিরাজ যুদ্ধে নিহত হলেন, সংযুক্তা সহমরণের চিতায় আরোহণ করে বলেছিলেন—'তোমায় আমায় আবার মিলন হবে পরপারে স্বর্গে, যোগিনীপুরে (২) তোমার সাক্ষাৎ পাব না।' আমার প্রিয়তম 'দুলেরা' কি বিশ্বাস করেন যে ইহলোকে যাদের মিলন হয় নি পরলোকে তাদের মিলন সম্ভব।"

আমার যুগ যুগ সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা একটীমাত্র প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

প্রিয়তমের মুখে ভেসে উঠল এক অপূর্ব্ব সস্মিত হাসির রেখা, সেই হাসির রেখার মধ্যেই আমি খুঁজে পেলাম আমার প্রশ্নের উত্তর। সেই উত্তর হ'ল "চিতার অগ্নিশিখা মানুষের আত্মাকে নির্ম্মল করে দেয় না, জটিল সমস্যার উত্তরে একটী মাত্র শব্দ যেমন সমস্ত সমাধান করে দেয়, তেমনি একটী হৃদয়ের স্পর্শ অন্য একটী হৃদয়কে সংসারের মায়াবন্ধন থেকে ভগবানের পথে মুক্তি দেয়। সে মুক্তি ইহলোকেই হউক, বা পরলোকেই হউক।"

এই কয়টি শব্দ আমার মনকে আশীর্ব্বাদ বারি সিঞ্চিত করে দিল। আমি ঝারোখার অতি নিকটে অগ্রসর হয়ে এলাম—এই ঝারোখাই আমাকে আনন্দলোক থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বিজেতার পদপ্রান্তে যেমন অবলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে দুর্গপ্রাচীর, তেমনি যদি এই ঝারোখা আমার সম্মুখে লুটিয়ে পড়ত! আনন্দের শিহরণে আমি কম্পিত হয়ে উঠলাম। আমি ভাষার আভরণ দিয়ে আমার সরমের আবরণ রচনা করলাম। আমি দেখলাম দুলেরার অধরে সস্মিত হাসি।

ললাটের লিখন কে খণ্ডন করবে? নক্ষত্রের গতি কে রোধ করতে পারে?

আলোর মালা জ্বলে উঠল, আকাশের বুকে তারার মালা কে সাজিয়ে দিল? দেওয়ান-ই-আমের সঙ্গীত থেমে গেছে, একমাত্র জলকলতান শ্রুতিগোচর হচ্ছিল। আমার বক্ষ স্পন্দনের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। আমরা অতি মৃদুস্বরে অন্যের অগোচরে আলাপ করলাম।

আমরা ভবিষ্যতের বিষয় জল্পনা করলাম—"আপনি আমরণ আমার পিতা সাহজাহান এবং ভ্রাতা দারার প্রতি অনুরক্ত থাকবেন?

তিনি হেসে বলে উঠলেন—"একদিন সম্রাট আকবর দিগন্তবিস্তৃত ভারতের সম্রাট ছিলেন। আর প্রতাপ ছিলেন বহু যুদ্ধের নায়ক, ক্ষুদ্র রাজ্য মেবারের রাণা। রাণা প্রতাপ ছিলেন সমর সিংহের বংশজ সন্তান। চিরস্মরণীয় আকবর স্বপ্ন দেখলেন ভারতবর্ষ জয় করবেন, নিখিল ভারতের ঐক্য স্থাপন করবেন। প্রতাপ সিং স্থির করলেন—নিজের জন্মভূমি রক্ষা করবেন, তাঁর বংশানুক্রমিক রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখবেন, চিরন্তন হয়ে থাকুক প্রতাপ—যতদিন ভারতবর্ষে একটী ক্ষত্রিয় বেঁচে থাকবে ততদিন রাণা প্রতাপ বেঁচে থাকবেন......।"

সন্ধ্যার বাতাসে ধীরে অতি ধীরে ভেসে আসছিল দূর উদ্যান থেকে গোলাপের গন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল আমার স্মৃতিতে আমার শৈশবের আনন্দক্ষণগুলি। এমনি এক সন্ধ্যায় এক বৃদ্ধা রাজপুতানী আমায় মহলে বসে মেবার, বুঁদী, অম্বর রাজবংশের কীর্ত্তিগাথা শুনিয়ে যাচ্ছিল; শুনতে শুনতে আমি আমার পরিচয় বিস্মৃত হয়ে গেলাম, আমি বিশ্বাস করলাম আমি হিন্দুস্থানের রাজবংশের সন্তান, আমি আগ্রহের সঙ্গে বললাম "আমার পিতামহের পিতা ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বাদশাহ বাবর, প্রতাপ সিং ছিলেন বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাণা সংগ্রামের পৌত্র। তৈমুরের "ফরগণা" থেকে বিতাড়িত হয়ে বাদশাহ বাবর ভারত সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর রাজ্য জয় করলেন; একটী ক্ষুদ্র বাহিনী মাত্র সম্বল করে বাবর রাজস্থানের সম্মিলিত সৈন্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন, আপনার মনে আছে প্রিয়তম, বাবর পরাজয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁর স্বর্ণ রৌপ্য খচিত সুরাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—"আর সুরা স্পর্শ ক'রবো না," তাঁর মন পবিত্র হ'য়ে গেল। তাঁর তিনশত হতাশ অনুচর প্রতিজ্ঞা করল—"আর সুরা স্পর্শ করবো না।" নূতন উন্মাদনায় ভরে উঠল তাদের প্রাণ। কোরাণ স্পর্শ করে শপথ ক'রল—"জয় অথবা মৃত্যু।" "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি ক'রে তারা বিরাট রাজপুত বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাণা সংগ্রাম সিং বিজয়ের মুহূর্ত্তে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে রইলেন। রাণা তখনও কিসের অপেক্ষা করে আছেন? বাবর বিজয়ী বীর রূপে অভিনন্দিত হলেন, বলুন ত' রাণা সংগ্রাম কার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন?"

প্রিয়তম ঝারোখার মধ্য দিয়েই আমার চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বল্লেন—"আমরা ভারতবাসী, আমরা হিন্দু, অদৃষ্টকে বিশ্বাস করি, শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টের পেষণে অন্ধ হয়ে যাই। আমার মনে হয় একমাত্র রাণা সংগ্রাম সিংহ সর্ব্বশেষবার ভারতের মোহন স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তাঁকে ছলনা করেছিল। তিনি ছিলেন বিরাট যোদ্ধা, তাঁর শরীরে ছিল আশিটী যুদ্ধ ক্ষত, তিনি একচক্ষু, একহস্ত, ভয়ে বা আশঙ্কায় তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।"

হঠাৎ "দুলেরা" হেসে উঠলেন—গম্ভীর উচ্ছ্বসিত হাসি সমুদ্রের ঢেউএর মতন, হাসি নির্ভীক। বেলাভূমিতে সমুদ্রের ঢেউ এলে যেমন ক'রে আঘাত করে—তাঁর কঠিন হাসি আমাকে তেমনি আঘাত করল, আমি চোখ দুটি দিয়ে ঝারোখার প্রান্ত দেশ স্পর্শ করলাম, যেন তাঁর নয়ন আমার নয়ন স্পর্শ করে। আমার মনে পড়ল চারণ বরদাই এর গাঁথা—

স্বপ্নের মতন ফেলি দিয়া জীবনের পাত্রখানি
সমর তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িল বীর পুঙ্গব
চলি গেল রণ-তীর্থ ভূমে।

(২) যোগিনীপুর রাজধানীর নাম।

আমি বল্লাম—"প্রিয়তম, রাজপুত মৃত্যুভয়ে ভীত, এই অপবাদ কেউ তাকে দেয় না"! আমরা তারপর সম্রাট আকবর এবং বীর প্রতাপ সিংহের কাহিনী আলোচনা করলাম।

তারপর প্রিয়তম বলে চল্লেন—"একাকী রাণা প্রতাপ তাঁর সামন্তদের নিয়ে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। রাজস্থানের সমস্ত নরপতি দিল্লীর বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তাঁরাই ত দিল্লীর অবলম্বন ও অলঙ্কার। তাঁরা সকলেই দিল্লীর সাহায্যে অগ্রসর হলেন। পঁচিশ বৎসর ধরে চল্ল সেই ভীষণ সংগ্রাম—আরাবল্লী পর্ব্বতমালা হ'ল রাণা প্রতাপের দুর্গ, আর বনানী হল রাণার রাজপুরী। রাণার শয্যা হ'ল তৃণাস্তরণ। যবের রুটী হ'ল তাঁর রাজভোগ। সম্রাট আকবর বাপ্পারাওয়ের রাজধানী চিতোর নিষ্করুণ ভাবে লুণ্ঠন করলেন, আজও রাজপুতনার চারণ গেয়ে বেড়ায়—চিতোর ধ্বংসের কাহিনী।

আজ আর চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে না; আজ রাজপুরীর দামামা ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেছে। আগে রাণার দুর্গ প্রবেশ ও নিক্রমণ দামামা ধ্বনি দ্বারা ঘোষণা করা হ'ত। সালুম্বাধিপতি (৩) যেদিন সূর্য্যদ্বারের সাম্মুদেশে নিহত হলেন তার পর বাপ্পা রাউয়ের কোন স্বাধীন নরপতিই সেই দ্বার অতিক্রম করে নি।

"তারপর সংবাদ এল রাণা প্রতাপ সন্ধি-প্রত্যাশী। রাণা প্রতাপ সমস্ত দৈন্য সহ্য করতে পারলেন, কিন্তু অরণ্যে সন্তানের উপবাস ক্লিষ্ট দেহের চিত্র সহ্য করতে পারলেন না।

আকবরের রাজপুত সামন্তগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। যদিও তাঁরা সকলেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার-করেছিলেন, তবু তাঁরা রাণা প্রতাপের অকলঙ্ক চরিত্র স্মরণ করে গৌরব অনুভব করতেন, রাণাকে রাজপুতবংশের গৌরব বলে সম্মান করতেন। যোদ্ধা কবি পৃথ্বিরাজ লিখেছিলেন:—"হিন্দুই হবে হিন্দুর আশা।" এই লিপি পাঠ করে প্রতাপ আবার উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন নূতন প্রেরণায়। এবারের অভিযান তাঁকে আরও মহিমামণ্ডিত ক'রে তুল্ল। রাণা যেমন স্বাধীন জীবন যাপন করেছেন মৃত্যুর সময়ও তেমনি স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যু বরণ করলেন চিতোর দুর্গের বাইরে। রাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ শত্রুবিতাড়িত হয়ে আমাদের সম্রাট শাহজাহানের নিকট অবনমিত করলেন রাজপুতের নীলপতাকা—সেই পতাকা কত যুগ ধরে রক্তরঞ্জিত হয়ে চিতোর গৌরব ঘোষণা করেছিল। রাণার চিতাভস্ম সূর্য্যদ্বারের মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল—সে যে চিতোরের শেষ স্বাধীন রাণার চিতাভস্ম—সামন্ত নরপতির নয়......"

চিতোর সামন্ত নরপতি!! সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'ল উদ্যান-বাটিকার স্তব্ধ বীথির মধ্য দিয়ে—সে স্বর কিন্তু দুলেরার কণ্ঠস্বরের মতন নয়। মনে হ'ল যেন সেই ধ্বনি অন্য কোন জগৎ থেকে এসেছিল।

তারপর দুলেরা বলে চল্লেন—যেন বহুদূরাগত কণ্ঠস্বর—"আজও চিতোর দুর্গে রাজপুতনারী অর্ঘ্য নিয়ে আসে দেবতার চরণে যেমন নিয়ে আসত অতীত যুগে। আজও রাণী পদ্মিনীর ভগ্নপ্রাসাদ প্রাচীরের উপরে বসে কোকিল বসন্তের গান গেয়ে বেড়ায়। ভগ্ন স্তম্ভের উপর বসে ময়ূর তার বহুবর্ণচ্ছটাময় পুচ্ছ মেলে নৃত্য করে, রক্তগ্রীব সবুজ হিরামণ ভগ্ন মন্দিরের চূড়ায় বসে কল স্বরে ডাক দিচ্ছে। রাণা কুম্ভের মেঘচুম্বী বিজয় স্তম্ভ (৪) অতীত যুগের বহু গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে আনছে। তারা চিতোর ধ্বংসের কোন কাহিনীর সাক্ষী নয় অথচ বিজয়স্তম্ভ গুলি বিজয়েরই মৌন সাক্ষী। বিজয়স্তম্ভের পাদদেশে চারণ কবি তার বীণার সুরে সুর মিলিয়ে বীর পুট্টা ও জয়মলের (৫) কাহিনী কীর্ত্তন করে। তাঁরা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে চিতোর রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। বীর পুট্টার জননী ও জায়া তরবারী হস্তে সৈন্যের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাঁরা স্বয়ং যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। আজও চারণ চিতোরে জহরব্রতের কাহিনী গেয়ে বেড়ায়। মহীয়সী রাজপুত মহিলা শত্রুর হস্তে বন্দিনী হয়ে আত্মরক্ষার জন্য অগ্নিশিখা আলিঙ্গন করে আত্মবিসর্জ্জন করেছিলেন। আলাউদ্দিনের চিতোর অবরোধের দিনে পদ্মিনী সমস্ত পুরনারীর পশ্চাতে ভূ-নিম্নে দুর্গ পথে চিতায় আরোহণ করেছিলেন। চারণের মুখে আজও শুনতে পাই সেই মরণের বাণী, সেই জীবনের কাহিনী—

"সবাই মরে—সবাই বেঁচে থাকে!"

"বহুদূরে গহন বনে সিদ্ধ মহাপুরুষ বসে ছিলেন ধ্যাননিমগ্ন। তাঁর নয়ন থেকে অজ্ঞতাঞ্জন অপসারিত হয়ে গেছে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে—মানুষ যার জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে, যার জন্য সংগ্রাম করে, যার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তার কোন মূল্যই নাই। তিনি সেই বিরাট ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন যিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং"—সমস্ত সুর তাঁর কাছে একটা মাত্র সঙ্গীতে লীন হয়ে যায়, সমস্ত বর্ণ বৈচিত্র্য একই আলোক-শিখায় মিলিত হয়ে যায়। সেই বিরাট আলোক শিখা সিদ্ধ মহাপুরুষের আত্মাকে সমুজ্জ্বল করে দিয়েছে। তিনি এখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রশান্তির মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি করেছেন। সেই সিদ্ধ পুরুষই ভারতের প্রকৃত সম্রাট।

এই সত্য সম্রাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি একলিঙ্গের মন্দিরের বেদী উত্তোলন করে মসজিদে স্থাপন করেছিলেন—তার উপর কোরাণ রেখেছিলেন। তিনি চন্দ্রতারকাখচিত বিরাট আকাশের নীচে বসে উপাসনা করতেন। তাঁর বাসনা ছিল সেই বিরাট পূজামণ্ডপে এসে বিশ্বের প্রতি মানব তার পূজাবেদী রচনা করুক। সেই পরম বিদেশী

(৩) চিতোরের প্রধান সামন্ত নগর।

(৪) রাণা কুম্ভের বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ যে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেছিলেন, তা চিতোরে এখনও বর্ত্তমান রয়েছে।

(৫) চিতোর অভিযানে আকবরকে বিভ্রান্ত করেছিল দুইজন রাজপুতবীর পুট্টা এবং জয়মল। তাঁদের মৃত্যুর পরে সম্রাট আকবর তাঁদের স্মরণে বিরাট স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর সমস্ত রাজপুত নারী জহরব্রতে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিলেন।

আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের জন্ত গৃহদ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন, প্রাচীন যুগের ঋষির মতন তাঁর মধ্যে ছিল এক সুবিশাল অসাধারণ শক্তি। প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তিকে সংহত করে তিনি হিন্দুকে দিলেন মুসলমানের পার্শ্বে সমান অধিকার।

রাণা প্রতাপের সঙ্গে রাজপুত স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী ভারতের মহিমার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আবিষ্কার করেছিল, যতদিন সম্রাট আকবরের আদর্শ তৈমুর বংশকে উদ্বোধিত করবে, ততদিন রাণা প্রতাপের বংশধরগণও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। আমি আমার পূর্ব্বপুরুষের তরবারী সাক্ষী করে শপথ করছি, যতদিন জীবিত থাকব রাজকুমারী জাহানারার জন্ত, শাহজাদা দারার জন্ত, সম্রাট সাহজাহানের জন্ত জীবন উৎসর্গ করব……।"

এই কথা বলে ছুলের৷ তাঁর তরবারী উর্দ্ধে উত্তোলন করলেন। তাঁর তরবারী মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে যেন জ্যোতিরেখার মতন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"সেই শুভদিনের জন্ত ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করতে পারে। একদিন নিশ্চয় সেই দিন আসবে……।"

উচ্চতা ও তার বৃদ্ধি

শ্রীনীলমণি দাশ (আয়রণম্যান)

জীবনের প্রায় সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে কোন অল্প উচ্চতাবিশিষ্ট ব্যক্তির স্থান নেই। আই-সি-এস, বি-সি-এস্, সৈনিক, পুলিশ, ফায়ার-ব্রিগেড্ ইত্যাদি সমস্ত সরকারী বেসরকারী চাকরীতে নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা-সম্পন্ন না হ'লে স্থান পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে যত বড় চাকুরী

২(ক)

আছে—যাতে মনুষ্য-সমাজের সেবা করা যায়, এমন সব চাকুরীতে অনুপযুক্ত, কারণ তোমার বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নয়—তোমার শারীরিক শক্তির অভাব নয়, অভাব—তুমি হয়ত তোমার চেয়ে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বা অল্পশক্তিমান কোন ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চতায় ২৷১ ইঞ্চি ছোট। ব্যায়াম উচ্চতা বৃদ্ধির দ্বারা এই পার্থক্য দূর করিতে পারে।

প্রায় দেখতে পাওয়া যায়, একজনের উচ্চতা আর একজনের চেয়ে বেশী। তার অনেক কারণ আছে—তন্মধ্যে বিশেষ কারণ তিনটি —(১) বংশধারা, পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের উচ্চতার উপর তার পুত্রকন্তা ও বংশধরদের উচ্চতা নির্ভর করে, (২) বাল্যকালে নানা অসুখ বিসুখের দরুণ শরীরের বৃদ্ধি না হওয়া এবং (৩) খাদ্যাভাব।

এইগুলি ছাড়া আর যে সব কারণ আছে, সেগুলি পরে বিশেষভাবে বর্ণিত হবে। কারণ যা হোক না কেন, উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই প্রবন্ধের প্রদত্ত ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করা যায়, তা হ'লে দেহের উচ্চতা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে যে সকল ছেলেমেয়ে মুক্ত বাতাসে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করে, ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি ও হামাগুড়ি দেয়, পরে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে, তাদের শরীর স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে সব ছেলেমেয়ে মায়ের বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অতিরিক্ত আদরে কেবল কোলে কোলে লালিত পালিত হয়—আত্মীয়, স্বজন, দাসদাসী আদরের ধন ননীগোপালকে প্রকৃতি মায়ের কোলে নামতে দেয় না, বা ভূমিতে একবার শুলেই 'হা' 'হা' করে ছুটে আসেন—সেই সব ছেলে মেয়ে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে না।

প্রবেশ করেছে, যাতে ক'রে ছেলেরা রাতারাতি বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূতত্ত্ব, ইতিহাস ও গণিত ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু পুস্তকের ভারে তাদের মেরুদণ্ড যে বেঁকে গেল—ডেস্কে হেলান দিয়ে সারাদিন বসে বসে পড়ে তারা যে কোলকুঁজো হ'য়ে পড়ল, সেদিকে কারও দৃষ্টি নেই। বাল্যকাল থেকে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের ছোটাছুটি লাফালাফি ক'রে স্বাভাবিকভাবে যথেষ্ট খেলাধুলা করবার ব্যবস্থা করা উচিত।

ছেলেবেলায় আঁটসাট জামা, কাপড় বা জুতা পরা উচিত নয়। কোমরে শক্ত করে কোমর-বন্ধ (Balt) বাঁধা খুব খারাপ অভ্যাস। জামা, কাপড়, জুতা বা কোমর-বন্ধ ইত্যাদির নাগপাশে বদ্ধ থাকায় দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হতে পারে না। ফলে এই সব ছেলেদের শারীরিক বৃদ্ধি তেমন হয় না।

২(খ)

৩

বাল্যকালে ছেলেদের প্রশস্ত বিছানায় শুতে দেওয়া উচিত—যাতে ক'রে তারা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রসারিত করে ইচ্ছামত শুতে ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে পারে। একবিছানায় অনেকগুলি শিশুকে একসঙ্গে শুতে দেওয়া কোনক্রমে উচিত নয়। ক্রমবর্দ্ধমান শিশুর পক্ষে (১) হামাগুড়ি দেওয়া (২) চেয়ারে, বেঞ্চে প্রভৃতি উচু স্থানে উঠা, (৩) নৃত্য করা (Dancing for Balance) এবং সামান্য উচু যায়গা থেকে ঝোলা খুব ভাল অভ্যাস—এইগুলি শিশুর উচ্চতাবৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক।

বিশ্ববিদ্যালয় আজকাল ছেলেদের অল্প বয়সেই সব বিষয়ে পণ্ডিত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন—রাজ্যের বই পাঠ্য তালিকার মধ্যে

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। ইহা উচ্চতাবৃদ্ধির প্রতিরোধক। বার্দ্ধক্যে ধূমপান করা তত মারাত্মক নয়, যত কৈশোরে অর্থাৎ ১৪ বৎসর বয়স থেকে ২০ বৎসরের মধ্যে। চিকিৎসকদের মতে ধূমপান যে শুধু হৃদযন্ত্রের ক্ষতিকারক তা নয়, উহা কিশোরদের ও যুবকদের দৈহিক গঠনের প্রতিবন্ধক। সুতরাং ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত ধূমপান করা উচিত নয়।

মেরুদণ্ডে বা কশেরুকা স্তম্ভে (Vertebral Column or Spine) মোট ৩৩খানি ক্ষুদ্র অস্থি বা কশেরুকা (Vertebral) আছে। এই ৩৩খানি কশেরুকার মধ্যে ৯খানি মানুষ পূর্ণবয়স্ক হবার পর পরস্পর সংযুক্ত হ'য়ে ২খানি স্বতন্ত্র অস্থিতে যথা—ত্রিকাস্থিতে (Socrum)

এবং অনুত্রিকাস্থিতে (Coccyx) পরিণত হয়। সুতরাং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মেরুদণ্ডের অস্থির সংখ্যা মোট ২৬টি। মেরুদণ্ডের সমস্ত কশেরুকাগুলি সংযুক্ত হলেও উহারা ঠিক পরস্পরের উপর স্থাপিত নহে—উহাদের মধ্যে সামান্য ছেদ (Gap) আছে। ঐ ছেদগুলি তরুণাস্থির (Cartilage) দ্বারা পূর্ণ। হাতে ও পায়ে তিনটি করে ছয়টি সংযোগস্থল আছে। প্রতি সংযোগস্থলে সামান্য ছেদ আছে, এ ছাড়াও শরীরের প্রত্যেকটি অস্থির মধ্যে বিশেষ ক'রে হাতের ও পায়ের লম্বা লম্বা অস্থিগুলির দুই প্রান্তে দুইটি করে ছেদ (Epiphyseal Cartilages) ২৫ বৎসর বয়সের আগে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। মেরুদণ্ড, হাতে ও পায়ের এই সকল ছেদগুলি সামান্য প্রসারিত করতে পারলেই উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।

বৈকালের চেয়ে সকালে মানুষ অধিক লম্বা থাকে, তার কারণ রাত্রে নিদ্রাকালে মেরুদণ্ডস্থিত কশেরুকার ও অন্যান্য স্থানের তরুণাস্থির উপর শরীরের ভার না পড়ায়, তরুণাস্থি স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত থাকে; কিন্তু দিনের বেলায় উহার উপর দেহের ভার পড়ায়, উহা পেষিত ও সঙ্কুচিত হয়। ফলে, মেরুদণ্ড দিনের বেলায় সামান্য ছোট হ'য়ে যায়। সুতরাং বসা, দাঁড়ান, বা চলার সময় আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, যাতে শরীরের ওজন মেরুদণ্ডের উপর না পড়ে। মাথা উচু ক'রে ঘাড় সোজা রেখে বুক সামান্য চিতিয়ে দাঁড়ান বা চলা অভ্যাস করা উচিত। অঙ্গ সংস্থাপনের ছবি (Postural chart) দেখুন। ইহা উচ্চতা বৃদ্ধির সহায়তা করে।

ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যায়ামের কোন প্রয়োজন নেই। তাদের লাফালাফি ছোটাছুটি করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু বয়স্কদের জন্যে—

এডেনবারার Royal College of Surgeons এর মিউজিয়ামে একটা ২১ ফুট লম্বা মনুষ্যকঙ্কাল আছে। এক ডাক্তার তার ছেলেকে মাথায় ও পায়ে দড়ি বেঁধে প্রত্যেকদিন একটা নিয়মিত সময় ধরে টানাটানি করতেন—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—যাতে উপরি উক্ত ছেদগুলি বড় হয়—ফলে ছেলেটি ২১ বৎসর বয়সে ২১ ফুট লম্বা হ'ল। এক্স-রে ক'রে দেখা গেল যে তার হাতের ও পায়ের লম্বা লম্বা অস্থিগুলি অস্বাভাবিক লম্বা হ'য়ে গেছে। পরে ছেলেটি অসুখে মারা যায়। তার কঙ্কালটি মিউজিয়ামে থেকে আজও আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে এরূপভাবে উচ্চতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু নিম্নে উচ্চতা বৃদ্ধির যে পদ্ধতি প্রদত্ত হ'ল, তা সম্পূর্ণ অন্য এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত।

যাদের উচ্চতা নানাকারণে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবার সুযোগ পায়নি তাদের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামের একান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শরীরের বৃদ্ধি হয়। ১৪ বৎসর থেকে ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধে প্রদত্ত ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করলে খুব দ্রুত দেহ সুগঠিত হবে ও উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যাদের বয়স ২৪ বৎসর ছাড়িয়ে গেছে, তাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই—তারাও চেষ্টা করলে—মনোযোগ দিয়ে ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করলে দেহের গঠন ও উচ্চতা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নরনারীর মেরুদণ্ডে ২৬টি এবং হাতে ও পায়ে ৬টি; মোট ৩২টি ছেদ আছে। ব্যায়ামের সাহায্যে প্রত্যেক ছেদটি যদি ১/৮ ইঞ্চি প্রসারিত করা যায় তাহলে উচ্চতা মোট

২ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়। খর্ব্বকায় নরনারীর পক্ষে ২৷১ ইঞ্চি বৃদ্ধি অবহেলার নয়।

নিম্নে যে ব্যায়ামপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, উহার প্রত্যেক ব্যায়ামের উদ্দেশ্য—দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ করে মেরুদণ্ডের বা কশেরুকা স্তম্ভের, হাতের ও পায়ের যতদূর সম্ভব প্রসারণ। সুতরাং এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাসকালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য—দৃষ্টি রাখা, যাতে করে এই সমস্ত অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ প্রসারিত হয়।

গভীর অথচ স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস দূষিত রক্তধারাকে পরিশোধিত করে,—পরিশোধিত রক্তধারা তন্তর (Tissue) ক্ষয় পূরণ করে এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির সহায়তা করে।

ব্যায়াম নং ১

খোলা জায়গায় হাত মাথার উপর তুলে, সোজা হয়ে ১ নম্বর ছবির মত দাঁড়ান। পরে দম নিতে নিতে গোড়ালি তুলে পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে শরীর উপর দিকে প্রসারিত করুন। এই সময় যাতে

১

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—যেমন হাত, মেরুদণ্ড ও পা যতদূর সম্ভব উপরের দিকে প্রসারিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখুন। (এই অবস্থায় মেরুদণ্ড উপরের দিকে প্রসারিত করবার সহজ উপায়—ঘাড় সোজা রেখে মাথা উপর দিকে ঠেলে তোলা) এই অবস্থায় দুসেকেণ্ড থাকুন। পরে দম ফেলতে ফেলতে গোড়ালি নামিয়ে পূর্ব্বের মত দেহভার পায়ের পাতার উপর দিয়ে দাঁড়ান। প্রত্যহ ১০ থেকে ১৫ বার অভ্যাস করুন।

ব্যায়াম নং ২

পা প্রায় ১ হাত ফাঁক রেখে, হাত মাথার উপর তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ান। পরে দেহের নিম্নভাগ অর্থাৎ কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত সোজা রেখে দেহের উপরিভাগ অর্থাৎ কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব নীচে নামিয়ে দুপায়ের মধ্যস্থ ফাঁকে হাত দুটি ঢুকিয়ে দিয়ে হাত, মাথা ও মেরুদণ্ড যতদূর সম্ভব পিছনের দিকে ঠেলুন এবং ২(ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এইবার দম নিতে নিতে দেহের উপরি ভাগ কোমর থেকে বেঁকিয়ে পিছনদিকে প্রসারিত করুন ও ২ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। (এই অবস্থায় যাতে হাঁটু না ভাঙ্গে এবং হাত মাথার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখুন) এই ভাবে দু-সেকেণ্ড থাকুন। পরে দম ফেলতে ফেলতে ২ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই ভাবে ১০ বার অভ্যাস করুন।

ব্যায়াম নং ৩

হাত মাথার উপর তুলে পা একটু ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়ান। পরে দম নিতে নিতে কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত সোজা রেখে, দেহের উপরিভাগ ডান দিকে বেঁকিয়ে হাত দিয়ে ডান পা স্পর্শ করুন এবং ৩

২(ক)

নম্বর ছবির আকার ধারণ করুন। (এই অবস্থায় যাতে হাত মাথার সহিত সংযুক্ত থাকে এবং হাঁটু না ভাঙ্গে, সেদিকে দৃষ্টি রাখুন) এই ভাবে দু-সেকেণ্ড থাকুন। পরে দম ফেলতে ফেলতে হাত তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান। এইবার ঠিক আগের মত দম নিতে নিতে বাঁ দিকে বেঁকে হাত দিয়ে বাঁ পা স্পর্শ করুন এবং দু-সেকেণ্ড থাকুন। পরে দম ফেলতে ফেলতে হাত তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান। এই ব্যায়াম ক্রমান্বয়ে পাঁচবার করে উভয় দিকে ১০ বার অভ্যাস করুন।

ব্যায়াম নং ৪

পা প্রায় দু-হাত ফাঁক করে, এমন ভাবে দাঁড়ান, যাতে দেহের উপরি-

ভাগ অর্থাৎ কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেহের নিম্নভাগের প্রায় সম কোণ (Perpendicular) থাকে। এই অবস্থায় দু হাত প্রসারিত করে ৪ নম্বর ছবির নির্দ্দেশ মত দেহের উপরি ভাগ কোমর থেকে ডান দিকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ডান পায়ের কোড়ে আঙ্গুল স্পর্শ করুন।

এইবার দম নিতে নিতে কোমর থেকে দেহের উপরি ভাগ বাঁ দিকে বেঁকিয়ে ডান হাত দিয়ে বাঁ পায়ের কোড়ে আঙ্গুল স্পর্শ করুন। পরে দম ফেলতে ফেলতে ডান দিকে বেঁকুন এবং পূর্ব্বের ন্যায় ৪ নম্বর ছবির আকার ধারণ করুন। এই ব্যায়াম একবার বাঁ দিকে বেঁকে, আর একবার ডান দিকে বেঁকে ক্রমান্বয়ে ১০ বার অভ্যাস করুন। এই ব্যায়াম অভ্যাস কালে স্মরণ রাখতে হবে—শিক্ষার্থী যখন যেদিকে দেহের উপরি ভাগ বক্র করবেন, তখন যেন দেহের উপরি ভাগ সেদিকে সম্পূর্ণ বক্রীভূত হয়।

ব্যায়াম নং ৫

পায়ের সংযোগস্থলস্থ ছেদের প্রসারণের জন্য নিম্নের ব্যায়ামটি বিশেষ ফলপ্রদ :—

৭(খ)

চেয়ারে সাধারণভাবে বসুন। বাঁ পা (হাটুর কাছে না ভেঙ্গে) উপরে তুলুন। এই অবস্থায় শ্বাস নিতে নিতে পায়ের আঙ্গুল, পায়ের পাতা, গোড়ালি, হাটু এবং পা ও পাছার সংযোগস্থল (Hip-joint) সামনের দিকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করুন ও ৫ নম্বর ছবির আকার ধারণ করুন! এই অবস্থায় দু-সেকেণ্ড অপেক্ষা করে দম ফেলতে ফেলতে পা নামান। এই ভাবে ডান পা তুলে অভ্যাস করুন। এই ব্যায়াম প্রতি পায়ে ১০।১৫ বার অভ্যাস করুন।

ব্যায়াম নং ৬

হাতের সংযোগস্থলের ছেদের প্রসারণের জন্য এই ব্যায়ামটি বিশেষ উপকারী :—

চেয়ারে সাধারণভাবে বসুন। বাঁ হাত উপরে তুলে সামনে প্রসারিত করুন। পরে দম নিতে নিতে হাতের আঙ্গুল, চেটো, কব্জি, কনুই এবং হাত ও কাঁধের সংযোগস্থল (Shoulder-joint) যতদূর সম্ভব সামনে প্রসারিত করুন ও ৬ নম্বর ছবির আকার ধারণ করুন। এই অবস্থায় দু সেকেণ্ড থেকে দম ফেলতে ফেলতে হাত নামান। এইভাবে ডান হাতেও অভ্যাস করুন। এই ব্যায়াম প্রতি হাতে ১০ বার অভ্যাস করুন।

ব্যায়াম নং ৭

দেওয়াল থেকে প্রায় দুই হাত দূরে দাঁড়িয়ে, কোমর থেকে দেহের উপরিভাগ পিছনে বেঁকিয়ে, হাত দিয়ে দেওয়াল স্পর্শ করুন। পরে দম নিতে নিতে এবং হাত নামাতে নামাতে দেওয়াল থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যান। ৭(ক) নম্বর ছবিতে দেখুন—ব্যায়াম-প্রদর্শনকারী কেমন করে হাত নামাতে নামাতে পা গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এইরকম ভাবে ক্রমান্বয়ে পা সামনে গড়িয়ে এনে এবং হাত নামিয়ে শেষে ৭(খ) ছবির খিলানের (Arch) আকার ধারণ করুন। পরে দম ফেলতে ফেলতে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। এই ব্যায়াম প্রত্যহ ৫।১০ বার অভ্যাস করুন।

ব্যায়াম নং ৮

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত পার্শ্বে রাখুন। পরে দম নিতে নিতে পা ও পাছা ভূমি হতে তুলে, মাথার পিছনে এনে, পা যতদূর সম্ভব দূরে

৮

প্রসারিত করুন ও ৮ নম্বর ছবির আকার ধারণ করুন। (এই অবস্থায় হাটু যেন না ভাঙ্গে, লক্ষ্য রাখুন) এই ভাবে দু সেকেণ্ড থাকুন। পরে দম ফেলতে ফেলতে পূর্ব্বের আকার ধারণ করুন। এই ব্যায়াম প্রত্যহ ৫।১০ বার অভ্যাস করুন।

ব্যায়াম নং ৯

উপুড় হয়ে শুন। হাত মাথার উপর রাখুন। পরে দম নিতে নিতে দেহ (হাতের আঙ্গুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত) প্রসারিত করে ৯ নম্বর ছবির মত ধনুকের ন্যায় বক্র করুন। এই ভাবে দু সেকেণ্ড থাকুন। (এই সময় দৃষ্টি রাখতে হবে—যাতে দেহ বক্র করবার সময় দেহের প্রসারণ কমে না যায়) পরে দম ফেলতে ফেলতে পা ও হাত নামিয়ে ভূমি স্পর্শ করুন। এই ব্যায়াম প্রত্যহ ৫।১০ বার অভ্যাস করতে হবে।

ব্যায়াম নং ১০

চিৎ হয়ে শুন। হাত মাথার উপরে রাখুন। পরে দম নিতে নিতে দেহ (হাতের আঙ্গুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত) প্রসারিত করুন। দেহ প্রসারণকালে পাছা ও পৃষ্ঠদেশ ভূমি হতে শূন্যে তুলুন এবং ১০ নম্বর ছবির আকার ধারণ করুন। (পাছা ও পৃষ্ঠদেশ শূন্যে তোলবার সময় যাতে দেহের প্রসারণ না কমে যায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখুন এবং লক্ষ্য করুন—দেহের ভার এখন হাত, কাঁধ ও পায়ের গোড়ালির উপর আছে) এই ভাবে ছ সেকেণ্ড থাকুন। পরে দম ফেলতে ফেলতে পাছা ও

পৃষ্ঠদেশ নামিয়ে ভূমি স্পর্শ করুন। এই ব্যায়াম ৫।১০ বার অভ্যাস করতে হবে।

সাধারণতঃ প্রথমে ব্যায়াম আরম্ভ করবার সময়ে উপরে বর্ণিত ব্যায়ামগুলি নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ৫ থেকে ১০ বার অভ্যাস করা উচিত। পরে প্রতি সপ্তাহে শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ২।১টি করে সংখ্যা বাড়িয়ে প্রত্যহ ২০।২৫ বার পর্য্যন্ত অভ্যাস করা যেতে পারে। প্রাণহীনের মত ধীরে ধীরে এই সকল ব্যায়াম অভ্যাস করলে কোন ফল হবে না। সমস্ত শক্তি দিয়ে এই প্রবন্ধে লিখিত নির্দ্দেশমত ব্যায়াম অভ্যাস করলে নিশ্চয় ফললাভ হবে—দেহের গঠন ও উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যায়ামকারীর খাদ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের এই গরীব দেশে খাদ্য-বিশেষজ্ঞদের কর্ত্তব্য—যতদূর সম্ভব অল্প মূল্যের পুষ্টিকর খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা। দুধের মত পুষ্টিকর খাদ্য আর নেই। ইহা উচ্চতা বৃদ্ধির সহায়ক। সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের প্রত্যহ অর্দ্ধ সের, অন্ততঃ ১ পোয়া দুধ পান করা উচিত। মাছ, মাংস, ছানা, ডাল ইত্যাদি ছানা জাতীয় (Protein) খাদ্য কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় আহার করা বিশেষ ফলপ্রদ।

উচ্চতা বৃদ্ধি করতে হলে একটু বেশী বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন। প্রত্যহ ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রার একান্ত আবশ্যক। রাত্রি ১২টার আগে ১ ঘণ্টা নিদ্রা রাত্রি ১২টার পর ২ ঘণ্টা নিদ্রার সমান।

সাধ্যমত ও পরিমিত ভারোত্তোলন উচ্চতা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক নহে।

বয়স অনুযায়ী বাঙ্গালীর দৈহিক উচ্চতা ও ওজন নিম্নে প্রদত্ত হল :—

বয়স	দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)	ওজন (পাউণ্ড)
১০ বৎসর	৫১'৭	৬৫'৩
১১ "	৫৩'৩	৭০'২
১২ "	৫৫'২	৭৬'৯
১৩ "	৫৭'২	৮৪'৮
১৪ "	৫৯'৯	৯৪'৯
১৫ "	৬২'৩	১০৭.১

বয়স	দৈর্ঘ্য	৫'-০"	৫'-১"	৫'-২"	৫'-৩"	৫'-৪"	৫'-৫"	৫'-৬"	৫'-৭"	৫'-৮"	৫'-৯"	৫'-১০"	৫'-১১"	৬'-০"
২০ বৎসর		১০৬	১০৮	১১১	১১৪	১১৭	১২০	১২৪	১২৮	১৩২	১৩৬	১৪০	১৪৪	১৪৮
২৫ "		১০৯	১১১	১১৩	১১৬	১১৯	১২২	১২৫	১২৯	১৩৫	১৩৭	১৪২	১৪৭	১৫২
৩০ "		১১৩	১১৬	১১৯	১২২	১২৫	১২৮	১৩১	১৩৫	১৩৯	১৪৪	১৪৮	১৫৩	১৫৮
৩৫ "	ওজন	১১৬	১১৯	১২২	১২৫	১২৮	১৩১	১৩৪	১৩৮	১৪২	১৪৬	১৫০	১৫৫	১৬০
৪০ "		১২০	১২৩	১২৬	১২৯	১৩৩	১৩৭	১৪১	১৪৫	১৪৯	১৫৪	১৫৯	১৬৪	১৬৯
৪৫ "		১২৪	১২৭	১৩০	১৩৩	১৩৭	১৪০	১৪৩	১৪৭	১৫১	১৫৫	১৬০	১৬৫	১৭১
৫০ "		১২৫	১২৭	১৩০	১৩৪	১৩৮	১৪১	১৪৫	১৫০	১৫৪	১৫৯	১৬৪	১৬৯	১৭৪

বনান্তরাল

শ্রীহাসিরাশি দেবী

ছোট কয়েকখানা ঘর—···যাকে বস্তিও বলা চলে এবং এইটারই তদারক ক'রে যে মানুষটা ভাড়া খাটিয়ে খায় তার নাম পশুপতি—পশুপতি কর্ম্মকার।

পশুপতির বয়সের অঙ্ক কষা মূর্খতা, তবে দেহটা সবল, সুস্থ ও সম্পূর্ণ। মুখখানা কঠিন, আর ওরই মধ্যে থেকে কোঠরাগত চোখ দুটো এমন উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে মাঝে মাঝে যে, মনে হয় এক নজরেই যেন মানুষের সমস্ত অন্তরটাকে আবিষ্কার ক'রে ফেলবে। অন্ততঃ সে ক্ষমতা ওর আছে।

এই পশুপতির বেশ-বাসের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। সদা সর্ব্বদা গায়ে থাকে একটা হাতকাটা বেনিয়ান, কাঁধে একটা গামছা, পকেটে পান বিড়ির কৌটা—সে আগে লুঙ্গিই প'রতো, উপস্থিত প'রছে হাপপ্যাণ্ট্।

মোটামুটি ভাবে সাজ-পোষাকের বহর ওর এই-ই, কিন্তু বিচার ক'রতে গেলে, প্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষটাকে নেহাৎ মন্দ বলা চলে না। কারণ, আশ্রয় সে যাদেরই দিক—কোনওদিন যে তাদের ওপোর কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি একথা হলফ্ ক'রে ব'লবে সবাই।

এ হেন পশুপতি কর্ম্মকারের সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্যে সেদিন যে লোকটি এসে দাঁড়ালো সে তারুণ্যের সীমা অতিক্রম না ক'রলেও, অসুস্থতায় যেন জর্জ্জরিত। চোখে মুখেও যেন একটা অসহায় কাতরতার ভাব। বাইরে থেকেই ও দরোজার কড়া নেড়ে ডাক দিলে:

—"কে আছেন বাড়াতে?···শুনছেন?···ও—"

খোলা জানালাপথে পশুপতির তামাটে বিশ্রী মুখখানা ভেসে ওঠে একবার—তারপর বেরিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করে:

—"কাকে—চাই?"

পশুপতির সবল স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহটার দিকে তাকায় নবাগত; তারপর একটু কেশে গলাটাকে পরিষ্কার ক'রে বলে:

—"চাই, এ বাড়ীর বাড়ী-ওয়ালাকে। খবর পেলাম নাকি ঘর খালি আছে—মানে তাই···"

পশুপতির চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ ক'রে ওঠে একবার। বলে—

—"ঘর খালি আছে কিনা, এই তো শুধোচ্ছ?—"

—"আজ্ঞে।"

—"তা আছে। কিন্তু তুমি তো দেখ্ছি ভদ্দরলোকের ছেলে! লেখাপড়াও কিছু শিখেছো ব'লে মনে হয়—আর কথা হ'চ্ছে কি—এখানে খোলার বস্তি। যত সব ছোটলোকের বাস এখানে!···"

—"ছোট লোক?—"

লোকটা তাকায় যেন একটা ক্ষীণ আপত্তি উত্থাপনের ভঙ্গিতে!

কিন্তু, সে ভঙ্গি গায়ে না মেখেই একটু উপেক্ষার হাসি হাসে পশুপতি। বলে:

—"হ্যাঁ, তা ছোটলোক বৈকি! লেখাপড়া না শিখ্লেই লোকে তাকে ছোটলোক ব'লে থাকে। তারপরে, কেউ মিস্তিরা, কেউ কামার, কেউবা ছুতোর।···অনেক জায়গায় অনেক খিট্কেল ক'রে তবে পেটের ভাত যোগাতে হয়! কাজেই এসব লোককে ছোটলোক ছাড়া কি বলা যায়, তুমিই বলো!···কিন্তু সে কথা থাক্—ঘরগুলোও বাসের উপযুক্ত নয়—মাইরি! এঘরে কি তুমি—মানে তোমার মত নিরীহ মানুষ কি বেঁচে থাকতে পারবে দাদা?—"

কেমন একটা মমতার স্পর্শ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে পশুপতির কণ্ঠে।···

মানুষটিও সচকিত হ'য়ে ওঠে। কাতর কণ্ঠে বলে:

—"পারবো, খু—উব—পারবো। আর না পারলেও তো আমার আর কোনও উপায় নেই। কাজেই—"

নিরুপায়ের যে সমস্যাটা ওর সে কণ্ঠস্বরে মুখর হ'য়ে উঠতে চায়, পশুপতি তাকে ফিরাতে পারলে না। ব'ললে:

—"বেশ, পার তো এসো। আপত্তির কোনও কারণ নেই, তবে—"

হঠাৎ মুখ তুলে সে প্রশ্ন ক'রলে :—

—"তা হ'লে ভাই তোমার নামটা ?—"

—"নাম !—"

একটুখানি থেমে ও জবাব দিলে :

—"আমার নাম অশ্বিনী, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী।"

হাত বাড়িয়ে পশুপতি বাইরের দিক্‌কার একখানা ঘর দেখালে। ঘরখানার ওপোরে খোলার চাল, আর নিচে ছাঁচের বেড়ার ওপোর চুণবালি ধরিয়ে, যার ওপোর চুণকাম করা হ'য়েছে হালফিল—সেই ঘর।

আলো, আর হাওয়া-হীন ঘরখানা ইঙ্গিতে দেখিয়ে পশুপতি ব'ললে :

—"কিন্তু, ঘর ব'লতে তো মাত্তর খালি আছে ঐটেই —ওতে হবে তোমার ?…"

অশ্বিনীর মুখে নিশ্চিন্ততার আভাষ প্রকাশ পায়। জবাব দেয় :

—"খু-উ-ব। আপনি কিছু ভাববেন না পশুপতিবাবু। ভাড়া আমি ঠিক রেগুলার দিয়ে যাব, ওর জন্যে কিছু গণ্ডগোল হবে না কোনওদিন। তবে কিনা…মেয়েছেলে থাকবে !……"

চিন্তার স্রোতটা যে ওর কোনখানে আঘাত পাচ্ছে তা বুঝতে বিলম্ব হ'লোনা—পশুপতির। হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠে সে ব'ললে…

—"ওঃ—তার কিছু ভাব্‌না নেই দাদা! মেয়েছেলে, মানে ইজ্জত নিয়ে সব ব্যাটাছেলেকেই ঘর ক'রতে হয়! আর বাইরের ঘর ?· তাতে হ'য়েছে কি ?— এই পশুপতির: বাড়ী এ তল্লাটের কোনও লোক মাথা গলাতে আসবে না এখানে, এ তুমি জেনে রেখ !—"

বুকের ওপোর পেশীবহুল হাত দু'খানা আড়াআড়ি ভাবে রেখে ও হাসে—রহস্যজনক হাসি।

অশ্বিনী ওর সে হাসির অর্থ বুঝ্‌লো কিনা, বোঝা গেল গেল না কিছু, কেবল চোখ দুটো একবার মিট্‌ মিট্‌ ক'রে ব'ললে :

—"আচ্ছা, আমি তাহ'লে ওদের নিয়ে আসি এখনি। আপনি যদি দাদা কাইণ্ডলি—মানে ঘরটা খুলে একটু ধুয়ে টুয়ে…মানে…"

পশুপতি আবার হাসে। বলে :

—"এতে আর দয়ামায়ার সম্বন্ধ কোতায় দাদা ? বাড়ী ভাড়া দিয়েই থাচ্ছি—'যকন্‌…মানে তকন' আর ওসব ক্যানো ?…আরে হ্যাঁ…"

সংসার আর সভ্যতার সঙ্গে যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাল ঠুক্‌তে চায় ও !…

অশ্বিনী বার হ'য়ে যায় চিন্তাক্লিষ্ট মুখে।…

বেশীক্ষণ নয়, বোধহয় আধঘণ্টার মধ্যেই একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ীর দরোজা খুলে নামে অশ্বিনী। সঙ্গে একটা ঘোমটা টানা মেয়েছেলে, আর একটা টিনের ফুল্‌দার স্যুট্‌কেশ !…

স্যুট্‌কেশটা নিজেই হাতে উঠিয়ে নিয়ে এগিয়ে এলো অশ্বিনী।…পেছনে এলো বৌ-টা।…

বারান্দায় উবু হ'য়ে ব'সে বিড়ি টানছিল পশুপতি, আর পাশে দাঁড়িয়েছিল যোগমায়া।…

দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, রংটা শ্যাম। ভ্রু দুটি ললাটের মাঝখানে প্রায় নিশ্চিহ্ন, কেবল সুগোল মুখখানির মধ্যে সুপুষ্ট অধরোষ্ঠ দুখানিই আকর্ষণীয়। নাকের একপাশে একখানা ওপেল বাঁধানো নাকচাবী, নিচের হাতে সোনার রুলী, গলায় মোটা বিছে, পরণে বিচিত্র পাড়ের ছাপানো শাড়ী।

কর্ম্মকারের বিবাহিতা স্ত্রী সুখদার স্বর্গারোহণ হ'য়েছে প্রায় বারো বৎসর আগে, আর যোগমায়া এসে পশুপতির ঘর সংসার আলো ক'রেছে মাত্র সাত মাস।…

সম্বন্ধটা এই রকমই।…তা হ'লেও পশুপতির ওপোর যোগমায়ার মমতার অন্ত নাই।

নিজের কাঁচাপাকা চুলের ওপোর মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে শুধোলে…

—"বাইরের ঘরখানা পর্য্যন্ত ভাড়া দিলে, তো বন্ধুবান্ধব এলে বসাবে কোতায় ?…"

পশুপতি মিট্‌মিটিয়ে হেসে জবাব দিলে :

—"কেন,—শোবার ঘরে !…"

ঠোঁট ওল্টালে যোগমায়া…

—"এঃ—আমি কি যত তোমার ইয়ার বক্সিদের সামনে বেরুব নাকি ?—ও আমি পারবো না।…"

যোগমায়া আরো যেন কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল কিন্তু পারলে না, দেখলে বিদ্রূপের হাসিতে বঙ্কিম হ'য়ে উঠেছে পশুপতির ভ্রূ।…

—কলতলায়—মানে জল আনতে এসে আলাপ জ'মে উঠলো।

কমল শুধোলে :

—"তা তোমার বাপের বাড়ী কোতায় ভাই ?…"

—"বাপের বাড়ী ?…"

একটু অন্যমনস্ক হ'য়েই মেয়েটি জবাব দেয়…

—"সে—অনেক দূর-গাঁয়ে।…বাঁকুড়া জেলায়—কিন্তু সেখানে আমরা থাকিনি কোনওদিন।"

—"কতদিন বে' হ'য়েচে ?…"

—"বছরখানেক হবে।…"

—"আহা! তা বাপ মাকে ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হ'য়েছিল নিশ্চয় !"

—"হুঁ!…"

—"বর কি কাজ করে ?"…

এবার এসে দেখা দেয় গুইরামের পরিবার। বলে :

—"সর্ সর্ তোরা, আমায় জল নিতে দে! একুনি খেয়ে আপিসে যাবে। সর্…"

কলসীতে জল ভরা হ'য়েছিল নবাগতার, কাঁখে উঠিয়ে নিয়েই সে যাকে দেখে মুখের ওপোর ঘোমটা টেনে দিলে, সে আর কেউ নয়, অশ্বিনী। অশ্বিনী বাজার ক'রে ফিরছে ;—

একহাতে ওর একটা মস্ত ইলিশ, অন্যহাতে বাজারের ব্যাগ থেকে উঁকি মারছে পুঁইশাকের একপ্রান্ত, আর কুমড়ো ফালির একটুকু।…

ওপাশের বারান্দা থেকে কুড়ুনে হাঁক দেয়—

—"কি দাদা, মাছটা কত হ'লো ?…"

চ'লতে চ'লতে মুখ ফিরিয়ে অশ্বিনী যে কি উত্তর দিলে, তা ভালো বোঝা গেলনা। তার বদলে কোণের ঘর থেকে গর্জ্জন শোনা গেল যোগমায়ার :—

—"কি আমার সংসার রে!…এটা আনতে ওটা নেই! আবার আনতে ব'ললেই চোখ রাঙানো! কেন গা বাপু ?…আমিইবা এত সইতে যাই কেন ? কার জন্যে ? পারবোনা, এ সংসারে সংসার ক'রতে পারবোনা আমি, এই ব'লে দিচ্ছি!…"

কিন্তু যাকেই উদ্দেশ্য ক'রে সে কথা বলুক, তার তরফ থেকে কোনও জবাব শোনা গেল না।

তাস পেটাতে পেটাতে রাখোহরি শুধোয় :—

—"বলি, ঘর তো ভাড়া দিলে, কিন্তু মানুষটা তোমার চেনা তো ?"

হুস্ হুস্ ক'রে হাতের মধ্যেকার জলন্ত বিড়িটায় টান দিতে দিতে জবাব দেয় পশুপতি :

—"কেন, কি আবার হ'লো তোর ?…"

—"ঐ তোমার এক কথা।"

রাখোহরি টেনে টেনে বলে :

—"রাগ ধরে মাইরি। ভালো কথা ব'লতে গেলেও মন্দ ভেবে নাও তুমি। নেহাৎ তোমায়, মানে একটু ভালোবাসি ব'লেই ভাবনা হয়! নইলে দুনিয়ায় কে কার তারই ঠিক নেই, তার আবার ভাড়াটের সঙ্গে বাড়ীওলার ভাব।…"

—"তা যা ব'লেচিস্ দাদা,…একখানা কথা!"

টেনে টেনে হাসতে থাকে কমলের স্বামী ষষ্ঠি! তারপরে জোরে তাস পিটিয়ে চেঁচায় !—

—"লেঃ লেঃ,—খেল্‌বি তো খ্যাল্! আর না খেলিস্ তো উটে যা!…"

নেশাখোর নিতাই তার একথায় চ'টে ওঠে। বলে :

—"উটে যাব, মাইরি আর কি ? ভাড়া দিয়ে তবে একানে থাকি ; উট্‌বো ব'ললেই উট্‌বো ? আমি উটে গেলেই ঘরখানা বুঝি এসে দকল করবে, কারবারটা মন্দ নয়! এঃ…"

শুয়ে প'ড়ে সে গান ধরে :—

—ও সই, ভোমরা তোমার ফুলের বনে—
এ ভোমরা…

তাস্ খেলা চ'লতে থাকে ওকে বাদ দিয়েই। অবকাশে অবকাশে কথাও চলে নবাগত অশ্বিনীর সম্বন্ধে !

—"কোথায় যেন দেখেছি ওকে।"

—"ঠিক্! আমিও মনে ক'রতে পারছিনে, তবু মুখটা যেন চেনা!…"

—"আর, বৌ ব'লছিল…"

জীবন বলে—"নতুন বিয়ে ক'রেছে সে, তাই বৌয়ের কথায় তার অনন্ত আস্থা।"

উদ্‌গ্রীব বন্ধু মহলকে আর একটু উৎসুক ক'রে তুলে জীবন বলে:

—"বৌ ব'ল্‌ছিল, অশ্বিনীবাবু লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোক হ'লে কি হয়—বৌটা'র সম্বন্ধে কেমন কেমন ঠেকে যেন! মনে হয় বিয়ে করা বৌ নয় ওর!"

জীবন আর ওর বৌয়ের এই আবিষ্কারে সকলে একটু উৎসাহিত—একটু চকিতও হয় বোধকরি। কেবল পশুপতি হাতের বিড়িটাকে আছড়ে ফেলে বলে:

—"দুত্ত্ শালা!…"

বেলা হ'য়েছে।…

উনুনে ভাতের হাঁড়িটাকে চাপিয়ে দিয়ে যোগমায়া সবেমাত্র গোটাকুড়ি পানের খিলি সেজে বাটায় তুলছে, এমনি সময়ে দরোজার বাইরে থেকে অস্পষ্ট একটা আহ্বান কানে এলো,—

—"ও মা, মাগো!…"

চম্‌কে উঠে তাকালো যোগমায়া; দেখলে, দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্বিনীর সঙ্গে আসা সেই মেয়েটা। কপালের কাপড় ওর চোখের ওপোর পর্য্যন্ত ঢাকা, গায়ে একটা ছেঁড়া সেমিজ, নিচের হাতে শাঁখা। হাত দুখানা মেলে ধ'রেছে ও—সে হাতের মুঠোয় কয়েক আনা পয়সা। ব'ললে:—

—"ওনার জ্বর এসেছে; তাই ব'ললেন, যদি তুমি একটু সাবু কি বার্লি আনিয়ে দাও…"

ঘোমটা স'রে দেখা যায় অশ্বিনীর বৌয়ের উজ্জ্বল শ্যাম মুখখানা।…যোগমায়া দেখে—পশুপতি সেইদিকেই তাকিয়ে আছে…সে তাকানোটা কেমন যেন অসহ্য—বোধহয় যোগমায়ার কাছে। বিকৃত মুখে জবাব দেয়:

—"তা আমার কাছে ক্যানো, আরো তো লোক র'য়েচে বাসায়।"

উঠে এসে পশুপতি বলে—

—"তোর এক কতা যোগা, জ্বর এয়েচে, অসুক মানুষটার একটু উবগারে লাগবোনা?…ওগো, তুমি পয়সা রেখে যাও—রেখে যাও…ও অশ্বিনীর বৌ—"

অশ্বিনীর বৌ একটু আশ্চর্য্য হ'য়েই ঘোমটার ভেতর থেকে যুগলমূর্ত্তির দিকে তাকায় যেন, কিন্তু পয়সা রেখে যেতে ভোলেনা।…

রুদ্ধ আক্রোশে আহত অজগর একটা যেমন ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে—তেমনি একটা ফোঁশ ফোঁশানীর আওয়াজ আসছিল অশ্বিনীর ঘর থেকে।…

রাত্রি অনেক।…দূরে, কোথায় যেন কোন একটা কুকুর চীৎকার ক'রেই চুপ ক'রে গেল। পুলিশের বাঁশীর ধ্বনিও কানে এলো একবার—কিন্তু পশুপতি সেদিকে মন দিলে না; দরোজা খুলে বাইরে এসেই সে থমকে দাঁড়িয়েছিল ঐ শব্দটা শুনে। কিন্তু আগিয়ে যেতে পারলেনা আর। সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সেখানে সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রগুলো যেন সংখ্যাতীত হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই তাকিয়ে থাকার সঙ্গে জিজ্ঞাসার চিহ্নে আত্মপ্রকাশ ক'রছে সপ্তর্ষির দল। ওরা যেন একযোগে ওর কাছে জানতে চায়—ঐ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দের ইতিবৃত্ত! যা আজ কানে আসতেই পশুপতিও কেমন যেন থ'ম্‌কে গেছে! মনে প'ড়ছে ওমনি ক'রে—হাঁ, ওমনি ক'রে একদিন আর একজনও তার পায়ের কাছে আছড়ে প'ড়ে কেঁদেছিল।

…সে তার স্ত্রী, যে স্ত্রী হঠাৎ একরাত্রে মারা গিয়েছিল; …লোকে ব'লেছিল—মরেছে হার্টফেল্ ক'রে। কিন্তু সে কথা যাক্।…

আজ, আজ অশ্বিনীর বৌ কাঁদছে কেন?…তবে, তবে কি! অসম্পূর্ণ একটা প্রশ্ন মনে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে পশুপতি। কিন্তু বাধা পায় তখুনি। পেছন থেকে যোগমায়ার মাংসল' বাহু দুখানা ওকে বেঁধে ফেলে কঠিন বন্ধনে। বলে:

—"তবে রে মিন্সে! লুকিয়ে পরের ঘরের পরিবার দ্যাকা! আমি বলি গ্যালো কোতায়, আর উনি কিনা… হেঃ হেঃ…" নিষ্ঠুর একটা হাসি অর্দ্ধ পথেই থেমে গেল যোগমায়ার মুখে। ফিরে দাঁড়িয়ে শক্ত হাতের মুঠিতে

যোগার মুখখানা চেপে ধরলে পশুপতি—তারপর তাকে হিড় হিড় ক'রে ঘরে টেনে এনে দরোজা বন্ধ করে দিলে।…

দিন দুই কেটে গেল।…পশুপতির ঘর থেকে যোগমায়ার আর কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায় নি বটে, কিন্তু বাইরে, অশ্বিনীর ঘরের ফোঁস্ ফোঁসানীটা যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে।…

বৌটার অসুখ। বিছানায় প'ড়ে সে কাৎরায়। বোধহয় কাঁদেও—তবু কাউকে ডাকে না।…পশুপতিও আর এ পথে হাঁটে না—প্রতিবাদীরাও নয়—!

সবাই যেন ওদের এড়িয়ে চলতেই চায়।…

কাজ সেরে দুপুরে ফিরছিল গুইরাম। অশ্বিনীকে তাড়াতাড়ি বার হয়ে যেতে দেখে—শুধোলে:

—"কোতায় চলেছো অশ্বিনীবাবু?…

অশ্বিনী জবাব দিলে:

—"আর বল কেন ভাই, পরিবারের অসুখ, তাই ডাক্তার ডাকতে।—জেরবার হ'য়ে মলাম একেবারে। একমাস হ'লো না ঘর ভাড়া নিয়েছি, এরই মধ্যে একেবারে …মানে যাকে বলে…"

হঠাৎ সে ডান হাতখানা মেলে ধরে গুইরামের সামনে; প্রার্থনার সুরে বলে:—

—"কিছু আছে ভাই? ধার দিতে পারো উপস্থিতের মত? মাইনেটা পেলেই শোধ দিয়ে দেব!"…

"ধার?"—

গুইরাম ছেঁড়া পকেট হাতড়িয়ে পাঁচসিকে পয়সা বার ক'রে দেয়। বলে:

—"আর তো নেই।—"

—"না থাক্।"—

চ'লতে চ'লতে অশ্বিনী বলে:

—"এখন এতেই হবে।…"

দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় সে, ক্রমে মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে। কেবল ওর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে গুইরাম। মনে পড়ে ওর—কাল—গত কাল কে যেন ঐ লোকটার কাছে পাওনা টাকা চাইতে এসেছিল! তা ছাড়া পথের মোড়ের ঐ মুদির দোকানে ওর মাসকাবারের জিনিস এসেছে ধারে—মুদি টাকার কথাটা সেদিন তুলেছিল—গুইরামেরই সামনে।…সমস্ত কথাটা ভাবে গুইরাম।…কিন্তু এর শেষ পায় না। নেকাপড়া জানা নোক, ভদ্দর নোক…কিন্তু, কিন্তু…সমস্ত অন্তরে যেন একটা বিক্ষোভ জাগে…!…

ভোর হ'য়ে এসেছে, শীতের ভোর।…

দরোজার বাইরে থেকে করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে বিছানার ওপোরে উঠে ব'সলো পশুপতি। তারপরে দরোজা খুলে বার হ'য়ে এলো।…

কিন্তু একি?…চারিদিকে লাল পাগড়ী দেখা যায় কেন? পশুপতি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু স'রে যাবার সুযোগ পায় না। সামনে এসে দাঁড়ায় ওদের বড়কর্ত্তা। শুধোয়:

—"তোমার নাম পশুপতি কর্ম্মকার—'

—"আজ্ঞে!—"

—"হরিহর সাহু ব'লে কাউকে ভাড়া রেখেছিলে? তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে—নাম—মীরা গুহ!—

বিস্মিত পশুপতি জবাব দেয়:

—"কই স্যার? না…"

—"মিথ্যে কথা ব'ল্‌ছো, আমি জানি…"

কর্ত্তা হুম্‌কী দেন। অপ্রস্তুত হ'য়ে পশুপতি বলে:

—"হুজুরের দিব্যি—মাইরি নয়। তবে অশ্বিনী চৌধুরী ব'লে একজন ভদ্দর নোক তার পরিবারকে নিয়ে ভাড়া আচেন বটে—ঐ ঘরে…"

ঘরখানা আর দেখিয়ে দিতে হ'লো না, বড়কর্ত্তা নিজেই এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ঘরের দরোজা খোলা—কেউ কোথাও নাই—কেবল কয়েকখানা ছেঁড়া জামা, জুতো আর কাগজের টুক্‌রো এধারে ওধারে ছড়িয়ে সকালের আলোয় পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে ক্রমশঃ।…

গুইরাম বলে:

—"ন্যাও ঠ্যালা! গরীবের কথা বাসি হ'লেই মিষ্টি লাগে।…তথন ব'লেছিলুম কিনা…"

ষষ্ঠি বলে…:…

—"হ'লো তো!…"

কেবল চুপ ক'রে ব'সে থাকে পশুপতি—আর দূর থেকে হাসতে থাকে যোগমায়ার চোখ-দু'টো।…

জীবনের টিপ্পনী কানে আসে। সে বলে:

—"বৌ ব'লেছিল ঠিকই, ও ওর বিয়ে করা বৌ নয়। নেকাপড়া জানা মেয়েমানুষ, বৌ হয় কখনো?—"

পশুপতির চোখ দুটো জ্বালা ক'রে ওঠে হঠাৎ!… একটা কথা ওর ঠোঁটের কাছে এগিয়ে আসে যেন, কিন্তু বলে না। উঠে যায়—; যেতে যেতে শোনে ওরা এক-যোগে ব'ল্‌ছে:

—"দেখতে একদিন পাবই, তখন টাকা আদায় ক'রবো কেমন ক'রে তা…"

পশুপতি তা জানে। কিন্তু ভাবে…অশ্বিনী যেই হোক, আর যে অপরাধেই সংসারের শান্তিভঙ্গ ক'রে বেড়াক, সঙ্গিনী সে পেয়েছে তারই যোগ্য। তাই তার নালিশ নেই—কৈফিয়ৎও দেবার নেই কারো কাছে।

মৃত্যুর পারে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

৪

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী-পত্রিকায় শ্রীযুত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "প্রেত-তত্ত্ব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির বক্তব্য এইরূপ: "তোমরা তো ঢাকঢোল পিটাইয়া প্রেতাত্মার সহিত কথোপ-কথনের বিবরণ প্রকাশ করিতেছ। কিন্তু জীবাত্মার অস্তিত্বই যে প্রমাণিত হয় নাই, সে খবর রাখ? জলের বুদ্‌বুদ জলে মিশিয়া যায়, দানাবাঁধা মিছরি জলে গলিয়া যায়; তেলের অভাবে আলো নিবিয়া যায়, ইহা কি দেখ নাই? আত্মা তো দেহের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলও হইতে পারে এবং যে সকল দ্রব্যের রাসায়নিক কার্য্যের ফলে তাহার উৎপত্তি হয়, মৃত্যুতে যে তাহাদের মধ্যেই তাহা বিলীন হইয়া যায় না, তাহা কে বলিবে? ইহা বাদে জন্মান্তরবাদ ও জাতিস্মরত্বের সঙ্গে তোমার প্রেততত্ত্ব যে খাপ খায় না, তাহা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ? পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে, তোমাদের প্রেতদের কোনও এক মানুষের দেহের সাহায্য লইতে হয়। ইহা হইতে মনে হয় প্রেতদের দেহ নাই। আবার তোমাদের কেহ কেহ নিখুঁতভাবে প্রেতের দেহের ও তাহার পরিহিত বস্ত্রাদিরও বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছ। এত উদ্ভট কথাও তোমরা বলিতে পার! দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তোমাদের কথার কোনও মিল নাই।"

আধুনিক প্রেত-তাত্ত্বিকদিগের অনেক কাহিনীতে সহজে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না, ইহা সত্য। অনেক মিডিয়ামের চাতুরী ধরা পড়িয়াছে। যেখানে মিডিয়ামের সাধুতায় সন্দেহ করিবার কোনও কারণ পাওয়া যায় না, সেখানেও তাহার স্বকীয় চিন্তা তাহার অজ্ঞাতসারে কতটা তাহার হাত হইতে যে লিখন বাহির হয়, তাহার সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, ইহাও সত্য। কিন্তু প্রেত-তত্ত্বই যে বিশ্বাসের অযোগ্য এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত তাহার আত্যন্তিক বিরোধ আছে, ইহা সত্য নহে। কঠোপনিষৎ হইতে উমেশবাবু যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, পুরাকালে দেবতাদের মনেও প্রেত-সম্বন্ধে বিচিকিৎসা (সংশয়) ছিল, সুতরাং বর্ত্তমানকালে মানুষের মনেও যে সংশয় থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও সে সংশয়ের নিবৃত্তি অনেক সময় হয় না। কিন্তু তত্ত্ব-হিসাবে প্রেত-তত্ত্বের মধ্যে দর্শন বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কিছুই নাই।

উমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, দেহের মৃত্যুর পর আত্মার আর কোন ভবিষ্যৎ নাই, ইহা কি কল্পনা করা যায় না? কল্পনা শক্তি সকলের সমান থাকে না। কেহ কেহ ঐরূপ কল্পনা করিতে পারেন, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু সে কল্পনার মূলে কোনও যুক্তি নাই, এবং তাহার সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। বুদ্‌বুদ, মিছরি ও আলোর মত জীবাত্মা মৃত্যুতে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে প্রেত-তত্ত্বের ভিত্তিই যে ধ্বসিয়া যায়, প্রেত-তাত্ত্বিকগণ তাহা ভালোই জানেন এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতেই তাঁহাদের যত চেষ্টা। তাহাদের প্রমাণ সত্য কি না এবং তাহা দ্বারা দেহান্তরিত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে দেহের মৃত্যুর সঙ্গে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার বিনাশ কল্পনাকরা অসম্ভব। জড়পদার্থের আত্যন্তিক বিনাশ যেমন কল্পনা করা যায় না, চৈতন্যের বিনাশও তেমনি কল্পনা করা যায় না। কেন না চৈতন্য 'সৎ'পদার্থ, এবং সৎপদার্থের বিনাশ অসম্ভব। আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে জড় ও চৈতন্য এতই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ, যে জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভবের কল্পনাও অসম্ভব। যদি কেহ বলেন, এক মণ গুড় হইতে তিনি অর্দ্ধমণ দুগ্ধ এবং ১০ হাত দীর্ঘ পাঁচ হাত প্রস্থ তক্তির উৎপত্তির কল্পনা করিতে পারেন,

তাহা হইলে তাঁহার অসাধারণ কল্পনাশক্তির তারিফ আমাকে করিতেই হইবে, কিন্তু শুড় যে দয়া ও ভক্তিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব না। বুদবুদ, মিছরি, আলো সকলই জড়পদার্থ, জড়পদার্থে তাহাদের মিশিয়া যাওয়ার সঙ্গে চিৎপদার্থের জড়ে বিলীন হওয়ার কোনও সাদৃশ্যই নাই। সাধারণ লোকে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেও, উমেশবাবু বলিয়াছেন, তাহা সংশয়ের অতীত নহে। জগতে সংশয়ের অতীত, এমন কিছু আছে কি? যে বিজ্ঞান যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা কি সংশয়াতীত? ঈশ্বর কি সংশয়াতীত? বিজ্ঞান ও ঈশ্বরের আলোচনায় তো সেজন্য কেহ আপত্তি করে না!

কিন্তু সংশয়ের অবকাশ আছে কি? প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি, আমাদের প্রতি চিন্তায়, প্রতি বেদনায়, প্রতি কর্ম্মে যে উচ্চরবে আপনাকে ঘোষণা করিতেছে, তাহার অস্তিত্বে যুক্তিসঙ্গত সংশয়ের অবকাশ কোথায়? প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে যে অনবরত দেহকে চালিত করিতেছে, তাহাকে অস্বীকার করিব কিরূপে? কোনও জড়পদার্থ যদি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া আপনা হইতে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা—Miracle—বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের অধীন দেহকে যখন টানিয়া আমরা উঠিয়া দাঁড়াই, মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে জয় করি, তখন তাহাকে Miracle বলি না। প্রতি মুহূর্ত্তে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করি বলিয়া তাহার গূঢ় ইঙ্গিত আমরা দেখিতে পাই না। ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগে প্রতি মুহূর্ত্তে যে আত্মা Miracle সংঘটন করিতেছে, আমাদের প্রত্যেকের অনুভূতিই তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ, অন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা তাহার নাই। জড়কে যে শাসন করে, সমগ্র প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য যে বিজয়যাত্রায় বাহির হইয়াছে, প্রকৃতি হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রকৃতিতে তাহার বিলয় হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে।

জন্মান্তরবাদের সহিত প্রেত-তত্ত্বের বিরোধ নাই। মৃত্যুর পরক্ষণেই জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে, এমন কথা কেহই বলে না। যতদিন পুনর্জ্জন্ম না হয়, ততদিন জীবাত্মার সহিত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টায় কোনও যুক্তির বাধা নাই। মৃতের শ্রাদ্ধ বহুদিন পর্য্যন্ত করা হয়। মৃতের পরেই যদি পুনর্জ্জন্ম হইত, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ নিরর্থক হইত। সুতরাং তাহা শাস্ত্রকারদিগের মত নহে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

জাতিস্মর সকলে হয় না। বহু সাধনায় কেহ কেহ জাতিস্মরত্ব লাভ করিতে পারে। বিনা সাধনায় কচিৎ কখনও কাহারও পূর্ব্বজন্মের কথার স্মরণ হয় শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার সহিত প্রেত-তত্ত্বের বিরোধ কোথায় বুঝিতে পারা গেল না।

একজন "উগ্র প্রেত-তাত্ত্বিকের" লেখা পড়িয়া উমেশবাবু এমন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন, যে তিনি কেবল তাহার উদ্ভট কথাগুলিরই আলোচনা করিয়াছেন। প্রেত-তত্ত্বের অন্যদিক দেখিবার ইচ্ছা অথবা অবকাশ তাঁহার হয় নাই। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধের সমালোচনা করিবার স্থান এই প্রবন্ধে নাই, ইচ্ছাও নাই। কিন্তু একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। তাহা এই, যে Sir Oliver Lodge সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা" প্রদর্শন সত্ত্বেও তাহা নিতান্তই অসঙ্গত। Sir Oliverএর প্রেত-তত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোন গ্রন্থে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই, উমেশবাবু তাহা দেখাইয়া দিলে পাঠকগণের পক্ষে তাঁহার উক্তির যৌক্তিকতার বিচার করা সম্ভব হইত।

সাধু হরিনাথ

৺প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আমাদের চোখে পাগল তাহারা
পাগল যাহারা জ্ঞানের তরে।
আমাদের চোখে পাগল সে জন
পাগল যে যাত্রা-চরণ তরে।
আমরা খুঁজিব বিত্ত ও সুখ,
পাগল চাহিছে তপের ক্লেশ।
পাগল চাহিছে অন্তর জ্যোতি,
চাহে না অন্ন, ভূষা বা বেশ।
আমরা খাদ্যে তৃপ্ত ঘুমাই,
পাগল খেয়েও কাঁদিয়া ভাসে।
উপবাসে তার কোন দুখ নাই,
মারিলে পাগল তবুও হাসে।

আহারে বসনে নাহি মনোযোগ,
মনোযোগ শুধু উর্দ্ধপানে;
মনোযোগ শুধু জীবে ও জগতে
যে রয় লুকায়ে তার সন্ধানে।
"ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর"
সে ক্ষ্যাপারে আমি পেয়েছি খুঁজে।
সে যে গো কাঙ্গাল হরিনাথ সাধু
প্রেম সাধে শুধু চক্ষু বুজে।
প্রণাম প্রণাম হে ত্যাগী ভক্ত,
তোমারে প্রণাম শতেক বার।
বাঙ্গলার গুণী কবিদের গুরু,
উচ্চ মহান্ সত্যাধার!

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(কাঁকরৌলী)

মাটির প্রতিমা, শিলাবিগ্রহ ও দেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তিকে বিদগ্ধ মন প্রত্যক্ষ দেবতা বলে সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয়। অবশ্য যাঁরা সংস্কারের প্রভাবে আচ্ছন্ন, স্বাধীন চিন্তা বর্জ্জিত এবং মন্দিরে মন্দিরে পূজারতি প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণের গতানুগতিক পুণ্যস্রোতে গা ভাসিয়ে চলাই স্বর্গলাভের সনাতন পথ বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা বেশ সুখী। এই সব তীর্থস্থানে আসবার সৌভাগ্য লাভ করলে দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা দিয়ে তাঁরা জন্ম ও জীবন ধন্য হ'ল বলে মনে করেন। আমার কাছে কিন্তু এটা বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় বলেই

দ্বারকানাথের মন্দির তোরণ (তোরণশীর্ষে অনেকগুলি ময়ূর খেলা করছে)

মনে হয়। আমি এ বিষয়ে কালাপাহাড়। সমস্ত মন্দির ভেঙে ফেলার আমি পক্ষপাতি; কারণ, আমি মনে করি এগুলো ধর্ম্মের ব্যবসা। কিন্তু আমার সঙ্গিনীরা সব পূর্ব্বোক্ত দলের ভক্তিমতী ভারতনারী। তাঁরা পুরোহিতের সাহায্যে শ্রীনাথের যথারীতি পূজা দিলেন। আমাকেও সঙ্গদোষে 'এডিং এণ্ড এ্যাবেটিং'এর অপরাধে অপরাধী হ'তে হল।

দর্শন ও পূজা শেষ করে মোহন্ত মহারাজকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে শুনলুম তিনি প্রাসাদে ফিরে গেছেন। একজন পাণ্ডা আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল। তার মুখে শোনা গেল মেবারের ঝালাবংশীয় এক সর্দ্দারের দিলবারা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—এই নাথদ্বার। এর প্রাচীন নাম ছিল শিয়ার। শ্রীনাথজীর নামানুসারে এখন শিয়ারের নাম হয়েছে 'নাৎদোয়ারা' বা নাথদ্বার। শ্রীনাথজীর বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত আদি বিষ্ণু মূর্ত্তি। মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের আশঙ্কায় রাণা রাজসিংহ এই মূর্ত্তি মেবারে নিয়ে এসেছিলেন। বোম্বাই, গুজরাট, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি অঞ্চল থেকে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হয় এখানে সারা বৎসর ধরে। মন্দিরের আয় শোনা গেল বার্ষিক বিশলক্ষ টাকারও বেশী। জমিদারীও বিশাল। নবনীতার তাগাদায় পাণ্ডাকে নিয়ে আমরা শ্রীনাথজীর চিড়িয়াখানা ও ভাণ্ডার দেখে এলুম। গল্প কথা নয়। সত্যই তৈল ও ঘৃতের কূপ! ডাল চাল ও ধান গমের পাহাড়। পূজারতির সোনা-রূপার সরঞ্জাম ও দেবতার বহুমূল্য হীরা জহরতের অলঙ্কার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নামে দেবতার সম্পত্তি হলেও মোহন্ত মহারাজই এ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক। অফিস, কাছারি, আদালত, পুলিশ, সিপাই, শাস্ত্রী, সৈন্যসামন্ত যথেষ্ট আছে তাঁর। তিনি একটি ক্ষুদে মহারাণা বললেও চলে।

আমরা পাণ্ডাজীর হাতে ভোগের জন্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে তাঁকে বিদায় করলুম এবং মন্দিরের চার পাশ ঘিরে যে চক বাজার, ঘুরে ঘুরে তাই দেখে বেলা ১২টা নাগাদ দিলবারা পান্থশালায় ফিরে এলুম। মেয়েরা যা মনোহারী বাজার করলেন সে বিবিধ বস্তু বহন করে আনবার জন্য একটি কুলি করতে হয়েছিল। এখানকার প্রসিদ্ধ জিনিস হল 'বাণ্ডী' বা তুলোর জামা। যে যেখানে আত্মীয়স্বজন ছিল সবার ছেলেমেয়ে মায় চাকর-বাকরদের পর্য্যন্ত হিসাব করে এক একটা জামা কেনা হল। শোনা গেল আগে দশ আনা থেকে পাঁচসিকের মধ্যেই একটি ভাল জামা পাওয়া যেতো, এখন ছোট জামা একটি পাঁচটাকার কম নয়। প্রমাণ মাপের নিলে আট দশ টাকা পড়বে। তাইই অসংখ্য বিক্রী হচ্ছে! গরম কাপড়ের অভাবে এখন খরিদ্দার অনেক।

বাসায় ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নানের আয়োজন করছি এমন সময় হম্ হম্ করে বাঁক কাঁধে দুই ভারী এসে হাজির। মোহন্ত মহারাজ আমাদের জন্ত শ্রীনাথের প্রসাদ পাঠিয়েছেন। প্রসাদের বহর দেখে আমাদের চক্ষুস্থির! কে খাবে এত? এর উপর আবার সেই পাণ্ডাকে অর্ডার দেওয়া প্রসাদও এসে হাজির হ'ল! দু'টাকা চার আনা অকারণ দণ্ড গেল ভেবে মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল। আমরা যা পারলুম খেলুম, বাকী যা রইল তা কাঙালীদের ডেকে বিতরণ করে দিলুম।

আহারাদির পর দুপুরে একটু বিশ্রাম করে মাষ্টার মশাইয়ের পরামর্শ মতো বেলা ৪।০টের বাস ধরে কাঁকরৌলী রওনা হয়ে গেলুম। মাষ্টার মশাইয়ের পরই ভার দিয়ে গেলাম মোহন্ত মহারাজকে তাঁর এই রাজকীয় অতিথি সৎকারের জন্য আমাদের হ'য়ে ধন্যবাদ জানাবার। মাষ্টার মশাই বললেন—ওর জন্ত ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই। আমি খবর পেয়েছি—উদয়পুর রাজদরবার থেকে কাল রাত্রেই টেলিগ্রামে মোহন্ত মহারাজার কাছে আদেশ এসেছিল আপনাদের সেবা যত্ন ও আদর অভ্যর্থনা করবার জন্য। সকালে মোহন্তর লোক এসেছিল দিলবারায় আপনাদের খোঁজ করতে। আপনারা তখন বেরিয়ে পড়েছেন মন্দিরের দিকে। সমস্ত চটি ও ধর্ম্মশালাতেই আপনাদের খোঁজ হয়েছে।

শুনে মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ববোধ করলুম। উদয়পুরের চীফ্ মিনিষ্টারকে লেখা ডাঃ বিজয়কিশনের চিঠিতে কাজ হয়েছে বোঝা গেল। একলিঙ্গজীর মন্দিরে যে যোধপুরের এডিকংয়ের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়েছিল সেটাও ব্যর্থ হয়নি। আমরা কোন পথে চলেছি এখবর রাজদরবারে নিশ্চয়ই তিনিই বহন ক'রে নিয়ে গেছেন।

নাথদ্বারের শোভা ও সৌন্দর্য্য ভক্তের চক্ষে কত সুন্দর লাগে তা জানি না। তবে আমার মতো পাষণ্ডের চখে যে খুব ভাল লাগেনি একথা অকপটে স্বীকার করছি। মন্দিরে কোনও স্থাপত্যকলার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেল না। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে একটা উঁচু চাতালে উঠে সেখান থেকে সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর বসবাসের ঘরের মতই পাশাপাশি ছোট বড় দুখানি ঘর। বড়টি নাটমন্দির ও ছোটটি গর্ভ-মন্দির। চাতালের উপর পূজার ফুল ফল বিক্রী হচ্ছে। দেয়ালের গায়ে যে সব রঙীণ ছবি আঁকা সেগুলি আনাড়ীদের হাতের ছেলে খেলা বলে মনে হয়। নাথদ্বারের দেবস্থানটুকুও খুব সংকীর্ণ। সরু সরু
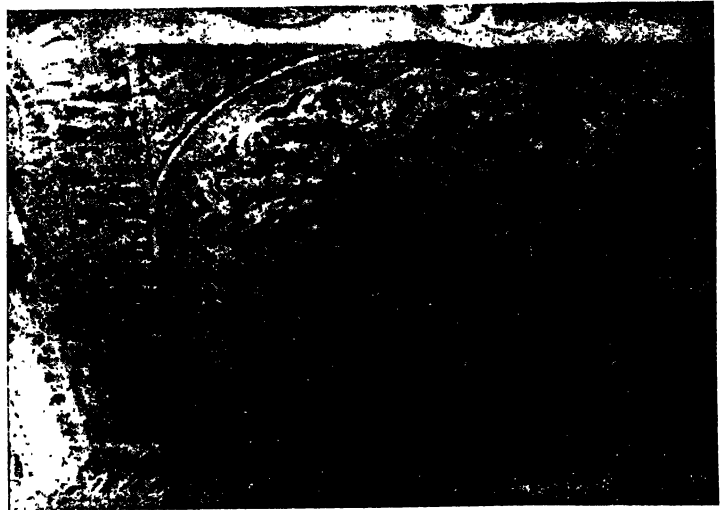
রাজসমুদ্রের তীরে। (ন'চৌকীর প্রথম চৌকীটি দেখা যাচ্ছে)

ন'চৌকীর ছত্রতলের কারুকার্য্য (দেবদেবী ও নৃত্যপরা অপ্সরীদের উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি লক্ষ্যণীয়)

গলি, নোংরা পথ। ঘরবাড়ী ভাল নয়। মন্দিরের চারপাশে শুধু পাণ্ডাপল্লী আর দোকানদার।

বাস দু'সারি এই ঘরের মাঝখান দিয়ে পাণ্ডাদের বাড়ী বাড়ী যাত্রী তুলতে তুলতে কাঁকরৌলির দিকে চললো। কাঁকরৌলী এখান থেকে মাইল দশ দূরে। কিন্তু পৌঁছতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। বাসে আমাদের সঙ্গী ছিল অধিকাংশই গুজরাটি মেয়ে পুরুষ। পথে আমাদের বাস একটি বেশ প্রশস্ত নদী পার হয়ে এল। নাম শোনা গেল—বানশ নদী! নদীটি আরাবল্লী পর্ব্বত থেকে বেরিয়ে চম্বল নদে গিয়ে মিশেছে।...সারা মেবারের মধ্যে এইটিই নাকি

ন'চৌকীর মর্ম্মর তোরণ।
(রাজসমুদ্র তীরে এই রকম একাধিক তোরণ আছে)

সবচেয়ে বড় নদী। নদী মোটেই গভীর নয়। গর্ভ তার বালুরাশি আর উপল খণ্ডে ভরা। মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে খানিক খানিক ক্ষীণ জলস্রোত প্রবাহিত। আমাদের মোটরবাস নির্ভয়ে নদী গর্ভে নেমে গেল এবং স্রোতের উপর দিয়ে জলোচ্ছ্বাস তুলে ওপারে গিয়ে উঠলো। কারণ নদীর উপর কোনও সেতু নেই! এই ওঠা নামায় ঝাঁকুনি যে একটু আধটু খাইনি তা নয়, তবে সে দুঃসহ কিছু নয়।

মাইল তিনেক দূর থেকেই পর্ব্বত ও প্রান্তর ভেদ করে কাঁকরৌলির ঘর বাড়ী মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। অস্তগামী সূর্য্য কিরণে কাঁকরৌলী যেন ঝলমল করছিল। কাঁকরৌলীও বৈষ্ণবদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানে ভারতের পশ্চিম সাগরকূলের দ্বারকার অনুকরণে দ্বারকানাথজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'রাজ সমন্দ' বা রাজ সমুদ্র নামে এক বিশাল পার্ব্বত্য হ্রদের তীরে। শোনা গেল এও নাকি রাণা রাজসিংহের কীর্ত্তি। দ্বারকানাথকেও তিনি মোগল অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্ত বৃন্দাবনে থেকে তুলে এনেছিলেন নিজ রাজ্যের মধ্যে।

মাষ্টার মশাই বলে দিয়েছিলেন, মন্দিরের পাশেই রাজসমুদ্রতীরে যে দ্বিতল ধর্ম্মশালাটি আছে আপনারা তারই উপরের বড় ঘর খানি যদি পান আরামে থাকবেন। তবে সব সময় সেখানি খালি থাকে না। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী আমরা সেই আগ্রেওয়ালা ধর্ম্মশালায় গিয়ে উঠলুম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শুনলুম নীচেকার একটি ছোট ঘর ভিন্ন অন্ত কোনো ঘর খালি নেই। ঘরখানি দেখলুম। এত ছোট যে একজন লোকের বাসেরও অনুপযোগী। প্রবেশ দ্বার আর তারই রুজুরুজু পুবদিকে একটি ছোট জানলা। বাস্! ঘরে আর কোনও আলো বায়ু প্রবেশের রন্ধ্র নেই! জানলা খুলতেই দেখি রাজ সমুদ্র ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ছে। পড়ুক সে আছড়ে, তবু এখানে যে থাকা চলবে না এটা স্থির করেই ফেলা গেল। অদূরে আর একটি একতলা ধর্ম্মশালা আছে এবং শোনা গেল পাণ্ডাদের যাত্রীনিবাসেও আশ্রয় মেলে। তখন আমাদের সঙ্গে যৎসামান্ত যা জিনিসপত্র ও বিছানা ছিল সেগুলো সব সেই ঘরে তুলে রেখে ম্যানেজারের জিম্মা ক'রে দিয়ে আগে আমরা ধুলোপায়ে শ্রীদ্বারকানাথজীকে দর্শন করতে চলে গেলুম। কারণ, শোনা গেল এখনি সন্ধ্যারতি শুরু হবে। দেবদর্শন সেরে এসে তারপর রাত্রিবাসের ডেরা খোঁজা যাবে স্থির হল।

মন্দিরটি দেখে খুশী হলুম। মন্দিরের মতোই আকৃতি এবং ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে স্থাপত্যকলায়। তখনও ভীড় জমেনি বেশী। আমরা ঢুকে পড়লুম মন্দিরের মধ্যে। চতুর্ভুজ দ্বারকানাথ কালোরূপে আলো করে রয়েছেন মন্দির। অল্পক্ষণ পরেই আরতি শুরু হ'ল। বাসা খোঁজার কথা ভুলে গিয়ে আরতি সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মন্দিরেই থেকে গেলুম।

বেরুবার মুখে এক পাণ্ডা জুটে গেল। তার পরামর্শ মতো মোহন্তর গদীতে ভোগরাগ ও প্রসাদের জন্ত দক্ষিণা জমা দিয়ে রসীদ নেওয়া হল। পাণ্ডা ঠাকুর আমাদের ভাল বাসার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে ভরসা দেওয়াতেই আমরা তাঁর অনুগত হ'য়ে পড়েছিলুম।

ধর্ম্মশালায় ফিরে দেখি অকস্মাৎ ম্যানেজারের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। সেকি সবিনয় শ্রীচরণেষু ভাব! 'আসুন! আসুন!' এ অভ্যর্থনার সুরই আলাদা। বললেন—চলুন আপনাদের জন্ত উপরের বড় হলঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের জিনিস পত্র সব সেখানে তুলিয়ে দিয়েছি। মোহন্ত মহারাজের গোমস্তা এসেছিলেন আপনাদের খোঁজ করতে। আপনারা উদয়পুর থেকে আসছেন শুনলুম। মহারাণার অতিথি। আগে যদি একটু জানাতেন। চলুন চলুন উপরে চলুন। মুখহাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন। "মোহন্ত মহারাজার বাড়ী থেকে এখনি আপনাদের জন্ত প্রসাদ আসবে।" বলতে বলতে

তিনি একটি হ্যারিকান লণ্ঠন নিয়ে পথ দেখিয়ে আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন।

ঘরখানি দেখলুম ভালই। তবে লম্বা যতটা চওড়া ততটা নয়। পাথের কাজকরা ধবধবে সাদা মেজে। পুব পশ্চিমের দেওয়ালে রুজু রুজু দুটি ক'রে জানলা ও একটি করে দরজা। ঘরের কোলে টানা বারান্দা। ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম রয়েছে দেখে মনটা বেশ খুশী হয়ে উঠলো। দেয়ালের গায়ে ধর্ম্মশালাসুলভ একাধিক কুলুঙ্গি বা খোপ আছে।

মোহন্তর লোক এসে হাজির। সঙ্গে চাঙ্‌ড়া ভরা প্রসাদ নিয়ে এক ঠাকুর। ডে-লাইট হাতে এক ভৃত্য এবং মেঝের পাতবার উপযোগী দুখানি বড় বড় শপ, তার একপিঠ লাল, একপিঠ হলদে। তিনি বললেন—আপনারা যদি এখানে থাকার অসুবিধা বোধ করেন তবে মোহন্ত মহারাজ বলেছেন তাঁর বাড়ীতেই আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বললুম, "তাঁকে বলবেন এবার যে ঘর পেয়েছি এখানে থাকতে আমাদের কোনও অসুবিধা হবে না। একটা রাত্রি মাত্র। কাল সন্ধ্যায় আমরা উদয়পুরে ফিরে যাবো।" তিনি বললেন "যাবার আগে এখানকার জৈনমন্দির, শিবালয়, রাণার প্রাসাদ, বাগিচা ও চিড়িয়াখানা দেখে যাবেন। রাজসামন্দের তীরে মেবারের প্রাচীন কীর্ত্তি 'নচৌকী' না দেখে যাবেন না।"

বললুম—কেমন ক'রে একদিনে এত সব দেখা হবে? আপনাদের এখানে কি ট্যাক্‌সি পাওয়া যায়? তিনি হেসে বললেন—সবই খুব কাছাকাছি, একখানা ভাল ফার্ষ্ট ক্লাশ টংগা ঠিক করে দেবো—বেলা ১২টার মধ্যে আপনাদের সব দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

বাথরুমে মুখহাত ধোবার জলটল দেওয়া হয়েছে কিনা, খাবার জলের সুব্যবস্থা হয়েছে কিনা সব দেখেশুনে তদ্বির করে ম্যানেজারকে বাথরুমে সারারাত একটি হ্যারিকান রাখবার হুকুম দিয়ে তিনি আবার কাল সকালে আসবেন বলে বিদায় নিলেন। আমরা মুখহাত ধুয়ে সবেমাত্র খেতে বসেছি, এমন সময় পাণ্ডাঠাকুর সেই মন্দিরে জমা দেওয়া টাকার দরুণ আর এক প্রস্থ ভোগ নিয়ে এসে হাজির। আমরা একটু কৌতুহলী হয়ে উভয় ভোগ মিলিয়ে দেখলুম। পাণ্ডাঠাকুর এনেছেন যাত্রীদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট অত্যন্ত সাধারণ প্রসাদ, কিন্তু মোহন্ত মহারাজ যা পাঠিয়েছেন—তা' একেবারে রাজ-ভোগ!

অগত্যা পাণ্ডাঠাকুরের প্রসাদ ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলুম কোনও গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিন গিয়ে। তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে ভোগ ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন—কাল ভোর পাঁচটায় আসবেন, আমাদের মন্দিরে উষারতি দেখতে নিয়ে যাবেন।

আহারাদির পর বিছানা পেতে নিয়ে আমরা যে যার শুয়ে পড়লুম। রাত্রে বেশ শীত ছিল। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প করতে করতে আমরা একে একে ঘুমের মধ্যে হারিয়ে গেলুম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো যখন—বেলা তখন ৭টা। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য উঠেছে। অল্প অল্প রোদ দেখা দিয়েছে।

ম্যানেজার এসে জানালেন পাণ্ডাঠাকুর ভোরে এসে ফিরে গেছেন। আপনারা তখনও ঘুমুচ্ছেন বলে আমি আর ডাকতে দিইনি।

'বেশ করেছেন' বলে তাঁর বুদ্ধির তারিফ দিয়ে গরম চায়ের ব্যবস্থা করতে বললুম। তিনি কৃতার্থ হয়ে চলে গেলেন।
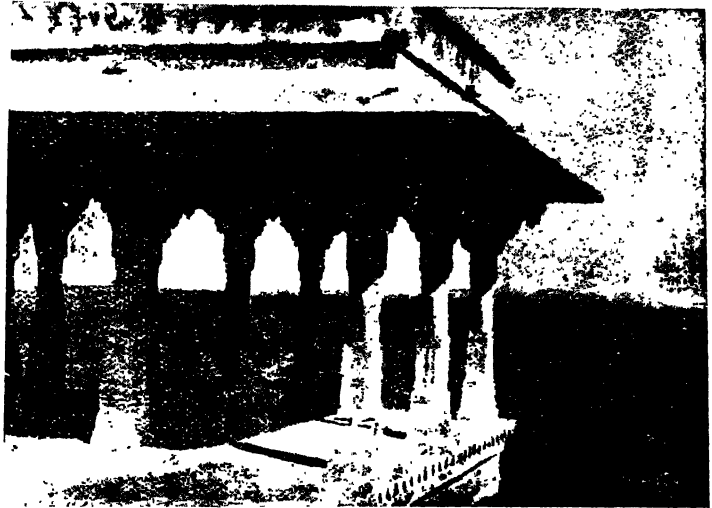
ন'চৌকীর একটি চৌকীর একাংশ

মুখহাত ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে কাপড় বদলে প্রস্তুত হ'তে না হ'তেই চা' এসে হাজির। চা-পর্ব্ব সমাপনান্তে তখনও টংগা আসেনি জেনে আমরা একটু মন্দিরে দেবদর্শনে গেলুম। মন্দির ঘুরে রাজসমুদ্রের ঘাটে ঘাটে একটু বেড়িয়ে এলুন। সমুদ্রই বটে। বিশাল জলরাশি একুল ওকুল দেখা যায় না। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ঘাটের অগণিত দীর্ঘ পাষাণ শিলায় আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের মতই তার গর্জ্জন! কিন্তু কাকচক্ষু জল। তলদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়। নানা আকারের ছোট বড় অজস্র মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। মাছ-ধরা ও মাছ খাওয়া এখানে একেবারে নিষেধ! দ্বারকানাথের বৈষ্ণবপুরীতে জীবহত্যা চলবে না। মাছেদের খাওয়াবার জন্য এখানে একরকম গুলি বিক্রী হচ্ছিল। দু'আনার গুলি কিনে ফেললে নবনীতা। মহা উৎসাহে মাছের ঝাঁককে খাওয়াতে সুরু করে দিলে। ভারতের নানা প্রদেশের অসংখ্য তক্তযাত্রী নান

করছেন ঘাটে। স্তোত্র পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত সারা ঘাট। কাল রাত্রের সেই পাণ্ডাঠাকুর এসে পাকড়াও করলে আমাদের। দর্শন হয়ে গেছে শুনে একটু ভগ্নমনোরথ হলেন। স্নান দান শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করবো কিনা জানতে চাইলেন। বললুম, আমরা 'নচৌকী' প্রভৃতি দেখতে যাবো বলে টংগার জন্ম অপেক্ষা করছি। ফিরে এসে যা হয় হবে। পাণ্ডাঠাকুর খবর দিলেন, আমাদের টংগা এসে অপেক্ষা করছে। আর কথাবার্তা নয়। ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে ফ্লাস্কে চা' ভরে, জলের কুঁজো নিয়ে এবং কাল রাত্রের প্রসাদ থেকে সঞ্চয় করে রাখা মিষ্টান্ন কিছু টিফিন-বাক্সেটে পুরে বেরিয়ে পড়া গেল।

আমাদের টংগাওয়ালাটি বৃদ্ধ এবং ভয়াবহ রকমের রসিক। অর্থাৎ যাত্রীদের ভয় দেখানোই তাঁর রসিকতা। আমাদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হ'তে না হ'তেই তিনি ঘোড়াকে সম্বোধন করে বলতে

ন'চৌকীর খিলানের আভ্যন্তরীণ কারুকার্য্য

লাগলেন—শয়তানী, হুঁসিয়ার! জান্‌সে মারো মৎ! পাহাড়ী পথ—কদম কদম বাড়ায়ে যা। গাড়ী উল্টে ফেলে দিলে তোকে ফাঁসিতে লট্‌কে দেবো।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—এমন ওলটায় নাকি মাঝে মাঝে?

নির্ব্বিকারভাবে বললে—হরদম! পাহাড়ী রাস্তা, বিলকুল খাড়াই উৎরাই! ধীরে চলনেসে কুছ্ নেই ডর। আউর ঘোড়া ছুটে তো শান্‌পর লুটে!

মেয়েরা বলে উঠলেন—'আস্তে চল্ বাবা, তোর ঘোড়া ছুটিয়ে কাজ নেই।

বুঝলুম—এই হুকুমটাই আমাদের মুখ দিয়ে বুড়ো বার করিয়ে নিতে চাইছিল। শয়তানী ঘোড়া নয়, শয়তান হ'ল বুড়ো গাড়োয়ানটাই!

পথের মাঝে কী একটা প্রয়োজনে বুড়ো গাড়ী থামিয়ে আমার হাতে রাশ দিয়ে নেমে গেল। কারণ আমি তার পাশেই বসেছিলুম। বলে গেল এক মিনিট হুজুর! হাম আভি আতা!

বুড়ো নেমে গেল। পিছন ফিরতে না ফিরতেই আমি রাশ ধরে জোরসে ঝাঁকুনি দিয়ে একবার চাবুক হাঁকড়াতেই ঘোড়া লেজ তুলে ঘাড় বেঁকিয়ে চার পায়ে ছুটতে শুরু করলে। একেবারে যেন তুফান্ মেল!

বুড়ো হৈ হৈ করে পিছনে পিছনে ছুটে এল—"সবুর! সবুর!" তার মুখের কি একটা সাংকেতিক শব্দ—'হো হোঃ হু হুঃ' এই ধরণের কিছু—শুনেই ঘোড়া স্থির! একেবারে স্থাণুর মত অচল।

বুড়ো এসে পড়লো। হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—হুজুর! শালী শয়তানী—তুফানী! ছোটালে আর সামলাতে পারবেন না। জান্‌সে মারেগা! পাহাড়ী পথ, সাবধানে যাওয়াই ভাল। 'নচৌকী'তে আপনাদের নিশ্চয়ই দেরী হবে। আমি শয়তানীর জন্যে কিছু টাটকা তাজা ঘাস সঙ্গে নিই, নইলে ওকে ঠাণ্ডা রাখতে পারবো না।

শয়তানীর জন্ম কিছু ঘাস সংগ্রহ ক'রে আমরা আবার রওনা হলুম। বুড়ো বেটা একটা ঘুঘু গাইড। পথের দুধারের প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তু এবং ভাঙাচোরা পাথরগুলোর ইতিহাস বলতে বলতে চললো। মাঝে মাঝে ঘোড়ার উপর তার সমানে তাইস্ চলেছে—শয়তানী—তুফানী—বাঘিনী—আরও কত কি!

রাজসমুদ্রের রাজনগর ঘাটে এসে আমরা নামলুম। মনে হ'ল পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি যেন! এর পর আর মানুষের বসতি নেই কোথাও। যতদূর চেয়ে দেখ—জল আর জল। মরু বালুবেরা সেই পাহাড়ের বুকে এই উত্তালতরঙ্গময়ী বিশাল জলরাশি কোথাথেকে এলো?

রাজসমন্দের পরিধি প্রায় বারো মাইল। এরই পূর্ব্ব ধারে বাঁধ দিয়ে কাঁকরোলীর জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাঁধটি লম্বায় প্রায় তিন মাইল হবে। দক্ষিণ থেকে সুরু হয়ে উত্তর পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকারে হ্রদটি বেষ্টন করেছে। রাজনগর ঘাট থেকে এই বাঁধ সুরু হয়েছে, আগাগোড়া সমস্তটাই বহুমূল্য মর্ম্মর শিলায় নির্ম্মিত। বরাবর প্রশস্ত সোপান শ্রেণী হ্রদের তলদেশ পর্য্যন্ত নেমে গেছে। দক্ষিণদিকের বাঁধের উপর রাজসিংহের তৈরী রাজনগর প্রাসাদ ও দুর্গ। এটিকে নূতন করে মেরামত করা হচ্ছে দেখলুম। মেবারের সূর্য্যবংশীয় রাণাদের রাজকীয় ধ্বজ-চিহ্ন সূর্য্য প্রতীক উৎকীর্ণ করা রয়েছে তোরণে তোরণে।

ইতিহাস বলে রাজসিংহ যখন মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাজস্থানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাদের অন্নসংস্থানের জন্য তিনি পার্ব্বত্য মরুভূমির বুকে এই বিশাল হ্রদ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন। গোমতী নদীর জল-স্রোতকে বাঁধ বেঁধে রুদ্ধ করে, দীর্ঘ সাত বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে এই বিশাল হ্রদ সৃষ্টি হয়েছিল। এই হ্রদ নির্ম্মাণে মহারাণা রাজসিংহ প্রায় এক কোটী টাকা ব্যয় করেছিলেন। তাঁরই নামে এই কৃত্রিম সাগরের নাম রাখা হয়েছিল 'রাজসমুদ্র'।

মরিতে চাহি না আমি…

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

কিন্তু অমর কে কোথা কবে? না চাহিলেও মরিতে হয়।

নব নব জীবনের রূপ-রস-গন্ধ ও বর্ণে মানুষ যখন বিকসিত হইয়া উঠে, বিজয় গৌরবের সমারোহে, ঔজ্জ্বল্যে, চারিদিক যখন ডগমগ হইয়া যায়; মরণ তখনই চুপিসাড়ে, অলক্ষিতে, বক্ষশোণিত অবশ করিয়া হিমশীতল কোলে তুলিয়া লয়। বিবাহবাসরে ক্ষ্যাপা ত্রিলোচনের বরবেশ দেখিয়া গৌরীর তনু পুলকিত, মিলন আবেগে বক্ষ তাহার দুরু দুরু—কিন্তু ক্ষ্যাপা বরকে বরণ করিতে আসিয়া কন্যার মাতা মাথায় হাত দিয়ে পড়েন, যক্ষরাজ প্রমাদ গণিয়া বসেন। মাধবী ফুলের মঞ্জরীতে অঞ্চল পূর্ণ হইবার মুহূর্ত্তেই বসন্ত বিদায় লইয়া বসে, ব্যাকুল মালঞ্চের সামনেই দক্ষিণা বাতাস মঞ্জরীর ছিন্নদল উড়াইয়া বহিয়া যায়। "ধরাতলে সঙ্কীর্ণ, অন্ধ-অমরতাকূপে" একরূপে কেহই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে না। কিন্তু কেন? নূতন জীবনের নানা ছন্দে অক্ষয় তৃপ্তির জন্যই কি তাহারা সকলেই মৃত্যু পথের নিত্য যাত্রী?

> 'জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
> মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে,'…

কিছুদিন থেকে নিয়তির এই ভাঙ্গাগড়া, জীবন ও মৃত্যুর খেলা, এক আষাঢ়ে চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি যে দিকে তাকাই পরিণতি একই, জন্ম, উৎসব ও মৃত্যু, ধরাতলে শুধু একরূপে কেহই থাকিতে রাজী নহে। কেন এমন হয়? এই সুন্দর সমাজ ও জীবনের ক্ষয়রোগ কি বন্ধ করা যায় না? জীবনের মালা থেকে যে বীজ ঝরে পড়ে তার অমর অঙ্কুরকে বাঁচাইয়া রাখা কি অসম্ভব? সমাজ সংসার কি একেবারে মিথ্যা, জীবনের কলরবের কি কোনও মূল্য নেই?

জীবনপ্রবাহের বিচিত্র ছন্দে, উত্থান পতনের মধ্যে প্রেমময়ের লীলা জীবনসায়রের খেলাঘরে তাদের যে অবিরাম ও অন্তঃহীন ফল্গুধারা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহাও ত মিথ্যা নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদের উত্থান ও বিলয়, রূপ ও অরূপের মিলন ও বিচ্ছেদ, মুক্তি ও বন্ধনের নিত্য আবর্ত্তন, সৃষ্টির দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত এই যে নিত্য যাওয়া আসা, অসীম সমুদ্রের কোলে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় ক্ষিতির অক্ষয় বিকাশ কি নিশার স্বপন! সন্দেহ জাগে মনে প্রাণে সমুদ্রজনিত এই পৃথ্বীও কি কালের অমোঘছন্দে একদিন ঘুমিয়ে পড়বে? জীবনের খরস্রোতে সকল কিছুই যখন ভাসিয়া চলিয়াছে পুষ্পগন্ধময় এই প্রকৃতি ও একদিন মহামরণের মধ্যে বিলুপ্ত হইবে। রূপহীন মরণের মধ্যে মৃত্যুহীন কেবলমাত্র কি অনন্ত জীবন?

দর্শনশাস্ত্রের কথার মারপ্যাঁচে গীতার অমর জীবনের কথাই বলা হইল, অচলায়তন ঐ উত্তরে বাকরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু মনের "কালো" ঘুচিল না।

বৈজ্ঞানিক এক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নলের মুখে চোখ রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কাচের উপরে আবছা আবছা যে সামান্য পদার্থটুকু দেখিতেছেন, ইহার মধ্যেই উপস্থিত আছে লীলাময়ের অন্তঃহীন জীবনের এক ক্ষুদ্র কোষপ্রাণ, একে দিল প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও খাদ্য এবং বাহিরের বিপরীত ধর্ম্মীয় কোষপ্রাণের আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিল, তখন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবনেও আসিবে প্রবাহ, প্রাণধর্ম্মের পরশমণির ছোঁয়াচে বংশবৃদ্ধির জোয়ার এনে দিবে তুফান, তারপরে বিস্তৃতির সীমায় পৌঁছিয়ে যখন নিষ্ক্রিয়তা এসে পড়বে, মৃত্যু তখন এঁকে দিবে ইহারও কপোলে জয়টীকা, তুহিন শীতল কুঙ্কুম পরিয়ে তাহার অসাড় অঙ্গে বিছাইয়া দিবে। প্রকৃতির ইহাই সনাতন রীতি। কিন্তু সুরা, খমীর প্রভৃতি প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় "এনজাইম" অথবা "ইষ্ট"কে বিজ্ঞানী যেমন নিত্য নূতন খাদ্যের পরিবেশে বাঁচাইয়া নিয়া চলে এবং বিশ্বাস করে এই ভাবেই জীবকোষ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও কৌলীন্য রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব, ঠিক সেই ভাবেই নিত্য নূতন যুগোপযোগী চিন্তাধারা আদর্শ ও খাদ্যের নির্ব্বাচনের দ্বারা "পুরাতন" মৃত অথবা অর্দ্ধমৃত জীবনপ্রবাহকে মহাকালের আক্রমণ এবং জরার স্পর্শ হইতে বাঁচান সম্ভব।

ঐতিহাসিক সোল্লাসে সায় দিয়া বলিয়া উঠিলেন—যুগে যুগে জাতির জীবনে জোয়ার ভাটার যে কাহিনী রচিত হইয়া চলে পাথরের বুকে তাহার "দাগ" পড়িয়া যায়, তাই বোবা পাথরের কাছে যুগ যুগান্তের প্রাণোচ্ছ্বাসের মর্ম্মরগাথার নীরব বীণা শুনিতে পাওয়া যায়। "ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান" লয় নাই তার লয় নাই। মানুষ কিম্বা জাতির জীবন যখন তুমুল ঝড়ঝঞ্ঝায় ক্ষত বিক্ষত হয় তখন যাহারা দরদী ও সত্যের পতাকাধারী তাহারা ঐ বোবা পাথরের কাছ হইতেই পথ চলিবার নির্দ্দেশ, দুঃখদহনে সান্ত্বনা ও

আশার বাণী শুনিতে পায়। দস্যুদের নির্মমতায় সাজান মন্দির বিখণ্ডিত হয়, সেবক শুধুই তাহার প্রাণ উজাড় করিয়া বৃথা ডালি দেয়; কিন্তু ভাবীযুগের হয়তো আবার কেহ ঐ ভগ্ন মন্দিরের শুক্‌নো কাঠ ও ভাঙ্গা ইঁট দুরীভূত করিয়া মূর্ত্তিগুলির কঙ্কাল বিগলিত প্রেমে পরিচ্ছন্ন করিয়া মিউজিয়াম সাজাইয়া বসে, তখন কি বুঝিতে পারা যায় না যে পুরাতন কালের সেবকদের ত্যাগ ব্যর্থ হয় নি।

দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের গোড়ার কথা—ধ্বংসশীল প্রাণপ্রবাহের মধ্যে কালজয়ী আগুনের পরশমণির কথা শুনিয়া প্রাণরস রসাক্ত হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম, সমাজ ও জীবনে আগুনের পরশমণির স্পর্শ যদি পাওয়া ও দেওয়া না যায়, তবে ভাবীকালের প্রবাহে অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হইবে, ফলে ধ্বংস অনিবার্য্য। জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামে কালজয়ী একমাত্র আদর্শের আগুন। কাল পরিপূর্ণ হইলে জীর্ণ দেহরথকে ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া মণিকোঠার অভ্যন্তরের মনের মানুষ অচিনদেশে চলিয়া যায়। জাতি কিম্বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সত্য একই। আদর্শহীন সংসারে যশ ও কীর্ত্তি স্বয়ম্ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

অবতরণিকার গাম্ভীর্য্যে ব্যাপারটী ভারী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনায় পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। অতীতকাল হইতে আধুনিক যুগ অবধি একটী সত্য বড় স্পষ্ট করিয়া মনে হয় যে মানুষ সত্যই বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, আদিম বন্যতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন তাহার চরিত্রে এখনও সুস্পষ্ট। জগতের উন্মুক্ত আনন্দ কোলাহলের আবর্ত্তনে পশুত্ব তাহার বিলুপ্তি পাইলেও দেবত্ব তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। এই জন্য যুগে যুগে সভ্য মানুষের পক্ষেও দেবত্ব, চারিত্রিক মাধুর্য্য, তাহার অনায়াসলব্ধ বস্তু নহে, সাধ্যও পালনীয় কর্ত্তব্য। এই জন্য সভ্যতার রাজপথ মসৃণ ও কুসুমাস্তীর্ণ নহে। তিমির কুহেলী রাতের অন্ধকার আকাশপটে অমল ধবল জ্যোৎস্নার ন্যায় অসীম বিশ্বে তীব্র জ্বালাময়ী ধ্বংস ও হুতাশনের মধ্য দিয়া সভ্যতা আস্তে আস্তে আগাইয়া চলিয়াছে।

আবার কখনও মনে আসে ধ্রুব ও অধ্রুব, এ দুই মতবাদের দ্বন্দ্বে এই পোড়াদেশে কিছুই স্থায়ী হইয়া গড়িয়া উঠে নাই। পলিমাটীর দেশে বনিয়াদ কি কখনও শক্ত হয়? যে ভাববন্যায় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, জলতরঙ্গের সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মৃতিতে তাহার ভাটা পড়ে। জীবনের আলো দেখে যারা ছুটে আসে, বৃহত্তর আদর্শের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় নূতন জীবন লাভে যারা ধন্য হয়, ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, শতেক ঝোরার মিলিত উচ্ছ্বাসে বেগবতী নদীতে পরিণত হয়, কিন্তু যৌবন-মত্তা আনন্দলহরী মাঝ পথে হারাইয়া ফেলে তাহার আবেগ, যেখানে দুকূলপ্লাবিনী মহানদীর কল্লোলগীত ধ্বনিত হইবার কথা সেখানে অকালে ঘুমিয়ে পড়ার পালাগান গাহিতে শোনা যায়। কেন এমন হয়? কুসুমকীট কুসুমের মর্ম্মস্থলেই তাহার আবাস নির্ম্মাণ করে। ঠিক এমনি ভাবে জলতরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাসের সাথে সাথে বিষের অঘোরধারা ও কি বহিতে থাকে?

মহান বুদ্ধ আনিলেন প্রেমের বাণী, সেবার বার্ত্তা, মুক্তির সুসমাচার। দেশ-দেশ-মন্দ্রিত করিয়া তাঁহার বাণী নগরে সহরে, পল্লীগ্রামে, পাহাড় পর্ব্বত পার হইয়া দূর সাগরের জানা অজানা সভ্য অসভ্য মানব সমাজে শান্তির বাণী, আশার কথা, মুক্তির আহ্বান লইয়া ছুটিয়া চলিল। লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণের পশরা সম্বল করিয়া দেশ বিদেশে শ্রীবুদ্ধের বাণী বহন করিয়া চলিল। রাজা নামিয়া আসিলেন রাজসিংহাসন হইতে। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজপুত্র, রাজকন্যা প্রব্রজ্যা লইয়া ছুটিল বুদ্ধং শরণম্, সংঘং শরণম্, ধর্ম্মং শরণম্ বলিয়া। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নূতন পাতা পুনরায় যুক্ত হইল—শঙ্করাচার্য্যের সোহম্ ধ্বনি। বৌদ্ধবাদ যে দেশে জন্মলাভ করিয়াছিল সেখানে মাথা লুকাইবার ঠাঁই ও তাহার মিলিল না।

বৌদ্ধ, জৈন ও শৈবধর্ম্ম ভারতের সীমারেখার বহুদূরে মহাসাগরের অপর পারে জাভা, বালী, কম্বোজ ও চম্পা দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। রামচরিত অবলম্বনে গীতাবলি ভারত সাগরের সুদূরকূলে জনসাধারণের চিত্তে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা স্থানীয় ভাব ও ভাষায় সংস্কৃত হইয়া আজও বাঁচিয়া আছে কিন্তু যে গগনস্পর্শী ওঙ্কার বট কিম্বা বরবুদুরের স্থাপত্য যাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কোথায় বিলীন হইলেন? চম্পাদেশে (Anam) স্থাপিত বাল্মীকির গুণাবলীমুগ্ধ ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বাল্মীকিমন্দির পুনরায় আজ বিস্মৃতির রাজ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু কোথায় মিলাইয়া গেল সেই ভক্তবৃন্দ—যাহাদের সততা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারলাভ ঘটিল, ভক্ত ও ভাবের অন্তরলপ্রেমে সৌধ ও মন্দির নির্ম্মিত হইল। শতেক দেশের নাম-না-জানা অযুত ভক্তের অর্ঘ ও আহুতি থরে বিথরে ভারত ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিল। তবু এঁরা কি জনসাধারণের কেহই ছিলেন না যে বুদ্‌বুদের মতন হাওয়ায় বিলীন হইয়া গেলেন। দুনিয়ার বুকে সাক্ষ্য বাঁচিয়া আছে, কিন্তু সাক্ষীর মৃত্যু কেমন করিয়া সম্ভব হয়?

ধর্ম্ম যেমন বিশেষ অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ সমষ্টিগতক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ঠিক তেমনি। ভারতীয় সভ্যতার গগনস্পর্শী হোমানল সুদূর প্রাচ্যে প্রজ্বলিত না থাকিলেও ভারতের মর্ম্মবাণী সাধারণের জীবন ধারায় এখনও ওতপ্রোতভাবে বাঁচিয়া আছে। এমন কি রামায়ণের জন্মস্থান লইয়া জাভা, বালিদ্বীপ কিম্বা চম্পা দেশের ধারণায় প্রতিযোগিতা আজও তীব্র।

একে একে ভারতের উপর দিয়া কত ঝড় ও প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইল। যে দুর্ব্বার মরুবাসী এদেশের স্বাধীনতা হরণ করিল সেও সাগরপারের অপর বৈদেশিকের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। প্রশ্ন আসে মনে, কেন এমন হয়? যে ধর্ম্ম, যে আদর্শ এককালে মানুষের ভাবরাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাহার খাত কেন শুষ্ক হইয়া যায়। দুরন্ত নদীর জলধারা শুখাইয়া গেলে তট দেশের উঁচু নীচু পাথর গুলিকে যেমন চোয়াল বাহির করিয়া বিকট দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে দেখা যায় তেমনি ভাবরাজ্যে ফাটল ধরিলে ধর্ম্মতন্ত্রের নীরস নিয়ম নিষ্ঠা শুখ্‌নো ও নোংরা হয়ে পড়ে। তখন থাকে শুধু আনুষ্ঠানিক হিং টিং ছট্। প্রাণের দৈন্য গুজরাণ না হয়ে যখন বাড়িতেই থাকে তখন

মানুষের আত্মা অস্থির হইয়া উঠে, সরলতার ভিখারী মন অন্ত জীবনাদর্শের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আসলে মানবাত্মা চিরকালই ক্ষুধার্ত্ত, দৈন্ত, নীচতায় ক্ষুব্ধ হইলে পুরাতনী চিরকেলে জীবনাদর্শ খাত পাল্টাইয়া নুতন প্রবাহের সহিত মিলিত হয়। পুরাতন ধারা নুতন প্রবাহের সহিত মিলিত হইলেই দুর্ব্বার গতি ফিরিয়া পায়, রবীন্দ্রনাথ "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতন্ত্র" প্রবন্ধে এই বিষয়ে চমৎকার আলোক সম্পাত করিয়াছেন। তাঁহার মতে মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে পার্থক্য থাকে সামান্তই, সকল ধর্ম্মেই ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনার উপদেশ আছে! ধর্ম্মকে পাতিত করে প্রতিদ্বন্দ্বী অনুচরেরা। ধর্ম্ম বলে—মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না করো তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না; কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে মানুষকে নির্দ্দয় ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মানো তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক বিধবা-মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন, কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে কেবল নিজের নয় চৌদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ—সে যে ঘরেই জন্মাক—পুজনীয়। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।" ধর্ম্ম চিরদিনই প্রগতিবাদী ও বিপ্লবী, কিন্তু তন্ত্রকারের ষড়যন্ত্রেই সুবিধাবাদী শোষণকারীদের অস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ব্বল জ্ঞানহীন তন্ত্রধার যখন উপবাসী আত্মাকে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান দিতে না পারিয়া বিশাল মন্দিরের অতীত গৌরবের মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর করিয়া রাখিবার ক্ষীণ প্রয়াসী হয় তখনই মৃত্যু আসে তাহার যত অনাচার দৈন্ত ও কলুষ লইয়া। যুগে যুগে ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাসে ধর্ম্মের নাম নিয়ে ধর্ম্মতন্ত্রের পতাকাবাহীদের নির্ম্মম অত্যাচারে বিপ্লবী মনের প্রচুর খোরাক যোগায়। সংসারের ছোট ও বড় সকল ক্ষেত্রেই জীবন ও মৃত্যু, উত্থান ও পতন, প্রকৃতির নিষ্ঠুর এই খেলা সর্ব্বত্র। ক্ষুদ্র জীবকোষ হইতে সাম্রাজ্য গঠনের সকল ছন্দে একই লীলা, জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা ভবে" এই নিষ্ঠুর সত্য জানা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন প্রতি কাজে ইহা অবহেলিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র নক্সা, অহরহ যেগুলি চোখের সামনে ঘটিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার আলোচনায় সত্য অনেকটা পরিষ্কার হইবে। সামনেই ধরুন একটী তরুশাখা, ক্ষুদ্র ছিল তাহার ক্ষমতা, আরও ক্ষুদ্র ছিল তাহার বনিয়াদ—কিন্তু প্রাণশক্তি যিনি সঞ্চার করিয়াছিলেন তাঁহার ছিল না কোনও কার্পণ্য। প্রতিদিনের সিঞ্চিত প্রাণরসে ক্ষুদ্র তরুশাখা ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পাদপে পরিণত হইল। কত রাজ্যের কত জাতীয় পাখীর কুলায়, আতপতাপ-ক্লিষ্ট পান্থের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াল; ক্ষুদ্র যে মৃত্তিকা প্রতিবৎসর রৌদ্র ঝড় ও বর্ষায় ধৌত কিম্বা স্থানান্তরিত হইয়া নালা ডোবায় গড়িয়ে পড়তো সেও হাঁফ ছেড়ে স্থিতি হয়ে বসলো। হয়তো কোন ধর্ম্মার্থী আপন মনের ক্ষুধায় পাথরের নুড়িতে তেল সিন্দুর মাখিয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া কালক্রমে গঞ্জ, গঞ্জ থেকে সহরই গড়ে উঠলো। কিন্তু এই সার্থকতার গোড়ার কাহিনী কি ছিল? ক্ষুদ্র বটবীজের ভবিষ্য পাদপজীবনের সম্ভাবনা তখনই, যখন প্রাকৃতিক যোগাযোগ তাহার পক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু এই বৃহৎ পাদপের দিকে দৃষ্টিপাত করে কবে কে ইহাকে নিত্য জলধারায় রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পুরাণ কথা কি? তাঁহার স্মৃতিসমুদ্রে ভেসে উঠে এই পাদপের নিজের জল শোষণ করিবার শক্তি যখন অর্জ্জিত হইবে তখন কি তাহারই কর্ম্মব্যস্ত জীবনে প্রাণদাতার কথা স্মরণে আসিবে? "ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি"। উচ্ছল যৌবন চাঞ্চল্যে সে তখন ভরপুর। যে প্রাণ শক্তি তাহার মধ্যে কাজ করিতেছে তাহার আবেগেই সে চলমান। ডালপালায় চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত করিতেই সে ব্যস্ত। মাকড়সা যে তাহার নিজের জালেই জড়াইয়া পড়িতেছে—ইহা যদি বুঝিতে পারিত তবে বোনার আনন্দে কি সে জাল বুনিতে পারিত? জন্ম দেওয়ার আনন্দে প্রাণযজ্ঞে বোধনের কথা তখন বাহ্য।

আরও স্থুল হিসাবে যে কোন সংঘের সাফল্যময় জীবনকথা আলোচনায় একই আলোক সম্পাত হয়। সংঘের জীবনপ্রভাতে আর্থিক সম্বল হয়তো ছিল সামান্ত, কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার অন্তঃহীন ত্যাগ, আগ্রহ ও পরিশ্রমে দৈন্য সীমারেখা পরাভূত করিয়া ভিত্তি তাহার গড়িয়া উঠে। দক্ষিণা সামান্ত, কাজেই সামান্ত লোকই সেখানে আসে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার জীবন্ত সৃজনীশক্তি সেখানে রোমাঞ্চকর সৃষ্টি করিয়া বসে। সামান্য লোক আশায় আনন্দে গঠনের প্রেরণায় দুর্ব্বার গতি লাভ করিয়া বসে। বাঁধনহারা প্রীতি সামান্ত জীবের মনেও সৃষ্টির কামনা প্রবাহিত করে। সোজা কথায় আগুনে আগুন জ্বালাইয়া দেয়, হয় নবীন সূর্য্যোদয়, নিমেষে মহানিশার ঘনান্ধকার দূরীভূত হইয়া ইটপাথরের প্রতিষ্ঠানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়! নায়কের প্রেমাগ্নি সৃষ্টি করে আত্মভোলা কর্মী, কর্মীর প্রেরণা, ত্যাগ ও সৃষ্টির আনন্দ বিজয়রথের পাকা সড়ক নির্ম্মাণ করে। পান্থপাদপের ন্যায় দিকে দিকে শাখা প্রশাখায় সংঘ ছড়িয়ে পড়ে। বিপুল প্রেরণা ও কর্ম্মশক্তিই তাহাকে আগুয়ান করে দেয়। ভাবী মহাজীবনের সম্ভাবনা ইহাকে আরও উত্তোগী, আরও কর্ম্মব্যস্ত করিয়া তোলে। কর্মীর উদাত্ত জীবনে সংসারের ছোটখাট গ্লানি স্পর্শ করিতেই সক্ষম হয় না। নব-অরুণ-উদয়ের স্নিগ্ধ কিরণ, প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত দীপশিখার মত আসল জীবনের স্বাদ, করুণা স্নেহ ও সহানুভূতিতে সাধারণ জীবনেও শিবত্ব আনয়ন করে। তাই সকলের সম্মিলিত ছোট বাঁশির মিলিত সুরে উৎসবের ঐক্যতান সৃষ্টি হয়।

তারপরে প্রকৃতির অমোঘবিধানে নুতন উত্তরাধিকারী নেতৃত্বপদ লাভ করেন। সহজাত নেতৃত্ব পাইয়াই তিনি দেখেন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, অর্থে, কৃতিত্বে ও প্রতিষ্ঠায় জমজম্। চলন্ত রজত রথের বল্গা হাতে

নিয়ে সবুজ চালকের মনে আসে প্রগলভতা, ভাবে চলমান রথের কৃতিত্ব তাহারই, ভুলে যায় জগন্নাথের রথের চাকায়ও তৈল দিতে হয়, তাই দিনের পর দিন শুষ্ক রথচক্র তাহার সহজ ঋজুতা হারাইয়া ফেলে। যে রথচক্রের গতি ছিল সাবলীল, ছন্দ ছিল লঘু ও মসৃণ, সেই চক্রের কর্কশ ঘর্ঘরতায় চালকের চিত্ত দোলায়মান হয়। অনায়াসলব্ধ, জন্মগত নেতৃত্ব, বিপুল ঐশ্বর্য্য, প্রলোভন, অহঙ্কার এবং স্বার্থের সংঘাত জানিতে দেয় না অতীত গৌরবের কী কারণ! চতুর্দ্দিকে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও অসূয়া ছড়াইয়া পড়ে; পুরাতন কর্মীদের দক্ষতায় সন্দেহ জাগে। তক্‌মাধারী নূতন লোকে সংঘ পূর্ণ হয়, কারণ সংঘের কোষাগারে এখন অচেল মুদ্রা, রজতমুদ্রার প্রীতিতে মধুচক্র অলির গুঞ্জনে গম্‌গম্। কিন্তু মধু কৈ—অতীতে যে ত্যাগের আগুন সকলকে এক ডোরে, একদেহে, এক প্রাণে পরিণত করিয়াছিল, সে আগুন কৈ? সে ত্যাগ ও সাধনা কৈ? যেখানে ছিল শান্তি, একতা ও আদর্শপ্রিয়তা, সেখানে আজ রাজত্ব করে হিংসা ও অসূয়া, রুটীর টুকরা নিয়ে কাড়াকাড়ি ও মন কষাকষি। তপোবনের শান্ত সুশীতল কুটীরের স্থানে আজ কত হর্ম্ম্য বিরাজিত। কিন্তু পূজার্থী কৈ? জগন্নাথের রথ নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে, চক্রে তৈল দিবে কে? জন্মের পরে মিত্যুতির-কি আজ পূর্ণ পরিণতি? মনো-চরকার আওয়াজ যে নিস্তব্ধ হইতে চলিল, কোন প্রাণের আগুন আনিয়া মনোবীণায় রবাব তুলিবে? "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে" ইহা কি শুধু কবির কাব্যেই অলঙ্কার হইয়া রহিবে?

কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে কোন পুরাতনী চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিল, কেন এমন হয়? জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা ও প্রেম কি দুনিয়ার সকল কিছু দিয়েও বন্ধ করা যায় না?

ভারতের জাতীয় পতাকার মর্ম্ম ও অর্থ

ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় এম, আর, সি, ও, জি (লণ্ডন)

পরমব্রহ্ম যিনি সর্ব্বব্যাপ্তির গর্ভ-স্বরূপ বিন্দুরূপে পরিজ্ঞাত—যিনি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব রূপে সর্ব্বদা ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বগতির অতীত হইয়াও সদা গতিশীল—"তৎ এজতি তৎ ন এজতি"—

ইতি উপনিষৎ

—সেই পরমব্রহ্মের নির্দ্দেশক বিন্দুগর্ভ চতুর্ব্বিংশতি অর্ বা কলা সমন্বিত চক্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা রূপে দেদীপ্যমানা, এই পতাকা সমগ্র ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞাপক।

পতাকাস্থ ত্রিবর্ণ—গৈরিক, শুক্ল ও শ্যামল

এই ত্রিবর্ণ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক সত্ত্ব, রজ, তমঃ গুণময়ী ব্রহ্মশক্তির ঘোষণা করিতেছে।

১। গৈরিকবর্ণ—সৃষ্টিশক্তির নির্দ্দেশক।

২। শুক্লবর্ণ—স্থিতি-ভোগ বা প্রকাশ শক্তির নির্দ্দেশক।

৩। শ্যামলবর্ণ—লয় ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টি শক্তির নির্দ্দেশক।

পতাকার শুক্লবর্ণস্থ চক্র

চক্রকেন্দ্রস্থ বিন্দু, চতুর্ব্বিংশতি অর্ বা কলা ও চক্র-পরিধি যে বিজ্ঞান ঘোষণা করিতেছে তাহা এই—

১। কেন্দ্রস্থ বিন্দু—অনির্ব্বচনীয় পরমব্রহ্মের জ্ঞাপক। এই বিন্দু তত্ত্ব হইতে জাত হইয়াছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

২। চতুর্ব্বিংশতি-অর্—আদি ব্রহ্ম হইতে প্রসূত—পরমব্রহ্ম হইতে জাত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যথা—

পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম্।

পঞ্চ মহা-প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।

চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়

দশবহিরিন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।

চতুরন্তরিন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশ অর্ দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

চক্রের পরিধি

চক্রাকারে পরিভ্রাম্যমাণ ব্রহ্মগতির নির্দ্দেশক।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু প্রকাশিত বা জাত হইয়াছে তৎ সমস্তই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-রূপ গতির দ্বারা চক্রাকারে নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। এই তত্ত্বই চক্রের পরিধি রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শুক্লবর্ণে চক্রস্থাপনের উদ্দেশ্য

শুক্লবর্ণ প্রকাশধর্ম্মী—ব্রহ্মের প্রকাশ। সুতরাং বিন্দুতত্ত্ব ও তাহা হইতে জাত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব শুক্ল-বর্ণে স্থাপন করাই বিজ্ঞান সম্মত।

পতাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্য

সৎকর্ম্মের বা শুভকর্ম্মের প্রারম্ভে পরমব্রহ্মের প্রতীক স্বরূপ এই জাতীয় পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে স্মরণ পূর্ব্বক যে কিছু কর্ম্ম সম্পাদিত হয় তৎ সমস্তই ব্রহ্মার্পণ বা ব্রহ্ম যজ্ঞে পরিণত হয়। এই জ্ঞানে কৃত সকল কর্ম্মই সুফলপ্রদ হয়। এই জন্য কর্ম্মের প্রারম্ভে পতাকা উত্তোলন বিধেয়।

"বন্দে মাতরম্"

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

কিন্তু—

ছ মাস পরে আজ টেবিলে বসে রঞ্জু ভাবছে—পাথরে গড়া বোধ হয় মানুষের মন। স্নেহ নেই, প্রীতি নেই, দুর্বলতাও নেই এক বিন্দু। চোখের দিকে একবার তাকালেই আর বলে দিতে হয়না যে সামান্য অপরাধেও এর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। বেণুদাকে সম্পূর্ণ করে জানবার আগে যে প্রীতি জেগেছিল তাঁর সম্পর্কে, জেগেছিল যা কিছু মোহ, সেগুলো সব কেটে গিয়ে যেন বৈশাখী সূর্যের খানিকটা ধারালো আলো এসে পড়েছে চোখে। এখন ভয় করে রেণুদাকে। মনে হয় একটা অদ্ভুত আর অসহ্য অস্থিরতা জেগেছে তাঁর মধ্যে। দুর্নিবার প্রবল খানিকটা শক্তির উচ্ছ্বাস আর বাগ মানতে চাইছে না তাঁর বুকের ভেতরে, যেন অন্ধ আবেগে ঘুষি মারতে চাইছে একটা পাথরের দেওয়ালে। হয় সেটাকে ভাঙবে, নইলে এই আপ্রাণ প্রয়াসে রক্তাক্ত করে দেবে নিজের হাতের মুঠোটাকেই। চট্টগ্রামের রক্ত ডাক পাঠাচ্ছে, উনিশ শো তিরিশ সালের অহিংস সত্যাগ্রহ পরাজয়ের একটা কুৎসিত অপচ্ছায়া—এই ছায়াটাকে দূর না করা পর্যন্ত শান্তি নেই, বিশ্রামও নেই।

গোষ্ঠের মেলায় একখানা সাবান চুরির অপরাধ একদিন সমস্ত বোধকে রেখেছিল বিষাক্ত করে। অথচ আজ—এই তো মাত্র সাতদিন আগেকার কথা। মনে পড়লে এখনো বুক ধ্বক করে ওঠে। দৈবাৎ রক্ষা পাওয়া গেছে, আর একটু হলেই কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।

বিকেলবেলা কাজীপাড়ার পথ দিয়ে আসবার সময় বিধুবাবু ডাকলেন। বললেন—কিরে, পথ দিয়ে যাস অথচ বাড়িতে একবার পা দিতে নেই নাকি?

কেমন দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হন বিধুবাবু। তিরিশ বছর ধরে মোক্তারী করছেন এই শহরে, পশারও যে করেছেন তার প্রমাণ মেলে পরিপুষ্ট ভুঁড়ি আর তৈলাক্ত গোলালো মুখে। নতুন কোঠাবাড়ি একখানা তুলেছেন সংপ্রতি—বেশ সুখেই আছেন। কিন্তু পারিবারিক যোগাযোগটা ওঁদের সঙ্গে ক্ষীণ—বাবা মনের দিক থেকে বিধুবাবুকে পছন্দ করেন না।

রঞ্জুও না। কেমন হ্যা হ্যা করে হাসেন বিধুবাবু, কেমন বিশ্রী করে চেঁচিয়ে কথা বলেন। সাহেব আর আদালত ছাড়া কোনো আলোচনা করতে চান না, করতে পারেনও না। তা ছাড়া মোটা নাকের ভেতর দিয়ে সব সময়ে নস্যির লালচে লালচে রস পড়ায়, সেদিকে তাকালে কেমন গা বমি বমি করতে থাকে রঞ্জুর।

তবু বিধুবাবু ডাকলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও রঞ্জুকে তাঁর বাড়িতে পা দিতে হল।

বিধুবাবু বললেন, আসতে হয়, খবরটাও নিতে হয়। পথ দিয়ে প্রায়ই তো যাস দেখি, আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি সেটাও তো জানা দরকার।

অভিমানভরে কথাটা বলে কোঁচার খুঁটে নস্যির রস মুছে ফেললেন বিধুবাবু, গা ঘিন ঘিন করে উঠল রঞ্জুর।

—আয় আয়, ভেতরে আয়—

ভেতরে ঢুকতেই কানে এল ভয়ঙ্কর একটা শব্দ—যেন আছাড় দিয়ে দিয়ে কাঁসার বাসন ভাঙছে কেউ। কিন্তু না—বাসন ভাঙছে না। চীৎকার করছেন বিধুবাবুর স্ত্রী—রঞ্জুর মাসিমা।

বিধুবাবুর স্ফীতি দেখে যদি তাঁর পশার অনুমান করা চলে, তবে তাঁর স্ত্রীর চেহারা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের বহরটারই ইঙ্গিত করে বোধ হয়। ভদ্র মহিলা মুটিয়েছেন একটা গজহস্তীর মতো, দরজা দিয়ে অনেক কষ্ট করে বোধ হয় ঘরে ঢুকতে হয় তাঁকে। গলার আওয়াজে হৃৎকম্প হয়।

সংপ্রতি আছেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে। তাঁর নতুন কোঠাবাড়ির দেওয়াল থেকে খানিকটা চুণ বালি খসে পড়েছে, কী করে ভেঙে ফেলেছে চাকর। মাসিমা হিন্দী

করে বলছেন, তোমরা তন্‌খা কাট্‌কে চুণ ঔর বালিকা দাম হামি আদায় করেঙ্গা—

রঞ্জুকে দেখে গলার স্বর নামল। খাটো কাপড়ের আঁচলটা টেনে মাথায় একটা ঘোমটা দেবার বৃথা চেষ্টা করলেন, তারপর সস্নেহে বললেন, এতদিন পরে বুঝি মাসিমাকে মনে পড়ল? আয় আয়—বোস্—

'বোস্' তো বটে, কিন্তু বসবার জায়গা কই? খাটখানার প্রায় সবটা জুড়ে তিনি বসে আছেন, রঞ্জু ইতস্তত করে পাশে একটুখানি জায়গা করে নিলে।

বাইরে মক্কেল বসেছিল, রঞ্জুকে ঘর-জোড়া স্ত্রীর কাছে জিম্মা করে দিয়ে বিধুবাবু তাদের শিকার করতে গেছেন। সুতরাং আপাতত চাকরকে রেহাই দিয়ে মাসিমা রঞ্জুর দিকে মনোনিবেশ করলেন।

—বাড়ির সবাই কেমন?

রঞ্জু সংক্ষেপে জবাব দিলে, ভালো।

—সরোজের শরীর কেমন আজকাল?

—মা ভালোই আছেন।

মাসিমা গজর গজর করতে লাগলেন: একদিনতো আসতেও পারে বেড়াতে। আমি না হয় গতর নিয়ে নড়তেই পারি না, তাই বলে কি আত্মীয়-কুটুমকে অমন করে ভুলে থাকে? বলিস সরোজকে, একদিন যেন আসে।

—আচ্ছা বলব।

—আর তা ছাড়া—মাসিমা আবার আরম্ভ করলেন এবং ফিরে এলেন নিজের স্বধর্মে: এই তো নতুন বাড়ি করলাম। কর্‌করে পাঁচটি হাজার টাকা বেরিয়ে গেল—বুকের রক্ত জল করা টাকা। অথচ একটু কি দয়া মায়া আছে হতচ্ছাড়া চাকর-বাকরগুলোর? এর মধ্যেই সিমেণ্টের চটা উঠিয়েছে, চুণ-বালি খসিয়েছে, পানের পিক ফেলেছে পাঁচিলে; দেওয়ালে লাগিয়েছে মাথার তেলের দাগ। আমার কি আর মরণ আছে, সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়।

—হুঁ।

মাসিমা বললেন, ওই—আবার ওই পোড়ারমুখো কয়লা ভাঙতে গিয়ে দিলে বুঝি উঠোনটা শেষ করে। তুই একটু বোস বাবা, আসছি আমি। সুস্থির হয়ে কথাবার্তা বলব তোর সঙ্গে।

রঞ্জুর মনে পড়ছিল পরিমলদের কথা। বনেদী বড়লোক, আর হঠাৎ বড়লোক। পার্থক্যটা কাউকে বলে দিতে হয় না, এক নজরেই সেটা চোখে পড়ে। কোথায় একটা কুশ্রী কাঙালপনা আছে এদের, টাকা যেন আরো প্রকট করে তুলেছে সেটাকে। এই জন্যেই কি বাবা এদের দেখতে পারেন না?

কিন্তু চিন্তাটা হঠাৎ চমকে গেল। শুধু দুটো চোখই নয়, রঞ্জুর সমস্ত মনটাও যেন আকুল লুব্ধতায় গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল ঘরের কোণে বড় আলমারীর নীচেকার খোলা বড় টানাটার ওপরে।

টানাটার মধ্যে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে একটা দোনলা বন্দুক—পালিশ করা নলটা ঝকঝক করছে তার। খোলা বন্দুকটার চারপাশে ছড়ানো আছে 'ইলি' আর 'ম্যাণ্টনের' একরাশ কার্তুজ।

রক্তাক্ত উত্তেজিত মুখে চারদিকে তাকালো রঞ্জু। ঘরে কেউ নেই। দূরে উঠোনে রঞ্জুর দিকে পিঠ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে মাসিমা—হাত পা নেড়ে বাসন-ফাটানো গলায় বক্তৃতা দিচ্ছেন চাকরকে। বাইরের ঘর থেকে চ্যাঁচানো গলাও ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে বিধুবাবুর: দেওয়ানী মামলায় একটা ছেড়ে অমন দশটা তারিখ নিতেই হয়। আরে সাক্ষী-সাবুদকে তৈরী করতে হলেও—

রঞ্জুর মনের সামনে ভয়ঙ্কর একখানা মুখ দেখা দিল যেন বায়স্কোপের ছবির মতো। চোখে আগুন, চাপা ঠোঁটে বিপ্লবী চট্টগ্রামের রক্তাক্ত প্রতিশ্রুতি।

—অস্ত্র চাই আমাদের, প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র চাই। বন্দুক, রিভলভার, কার্ট্রিজ। প্রত্যেকটি বিপ্লবীর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে না পারলে দুটো একটা চোরা-গোপ্তা খুন করে কোনো লাভ নেই। সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে যদি আমরা চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে পারি তা হলে দু ঘণ্টায় ইংরেজ পালাতে পথ পাবে না। দরকার শুধু অস্ত্র, যেমন করে হোক সে অস্ত্র আমাদের জোগাড় করতেই হবে।

হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। নিজের রক্ত ফুটছে, তার শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে রঞ্জু। অতি সন্তর্পণে দেরাজের দিকে এগিয়ে গেল সে, দু-হাতে মুঠো করে দশ বারোটা টোটা তুলে নিয়ে জামার দু পকেটে ভরে ফেলল। তারপর

তেমনি নিঃশব্দে নিজের জায়গায় এসে বসল। মাথার ভেতর রক্ত গরম হয়ে উঠেছে অথচ মনে হচ্ছে একটা আশ্চর্য ঠাণ্ডায় হাত পা যেন কালিয়ে আসছে তার।

মাসিমা ফিরে এলেন। এখুনি হয়তো দেরাজের দিকে নজর পড়বে তাঁর, এখুনি হয়তো বলে বসবেন টোটাগুলো কেমন কম কম বলে বোধ হচ্ছে না? তারপর রঞ্জুর পকেটের দিকে তাকিয়ে যদি—

এর পরে মাসিমা কী বলেছিলেন এবং রঞ্জু কী জবাব দিয়েছিল, ভালো করে সে কথা মনেও নেই তার। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কাটা ঠেলে ঠেলে উঠছে, যেন একটা শক্ত থাবার মতো তার গলাটা টিপে টিপে ধরবার চেষ্টা করছে—কথা কইতেও কষ্ট বোধ হচ্ছে তার।

হঠাৎ এক সময় সে নিতান্তই আচমকা উঠে দাঁড়ালো: আচ্ছা, আজ যাই—

—একটু চা খেয়ে যাবি না? জল চাপাতে বললাম যে।

—চা তো আমি খাই না!

—ওঃ, খাস্ না?—মাসিমা যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যেন এক পেয়ালা চায়ের বাজে খরচের হাত থেকে বেঁচে গেলেন তিনি, চুণ বালির নতুন আস্তর বসানোর খানিকটা খরচ উঠে আসবে এর থেকে। বললেন, তা বেশ বেশ, ছেলেবেলায় ও সব বদ্ অভ্যেস না থাকাটাই ভালো!

—আমি চলি তা হলে—

—আচ্ছা আয় তবে। সরোজকে আসতে বলিস—

—বলব—

দুর্বল পায়ে বেরিয়ে এল রঞ্জু। শরীরটা কেমন ঝিম ঝিম করছে উত্তেজনায়, প্রথম সন্ধ্যায় সবে জ্বলে ওঠা মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের আলোটাকে কেমন ঝাপসা লাগছে, যেন ওর ওপরে জমেছে বৃষ্টির গুঁড়ো। জামার নীচের পকেট দুটোকে অতিরিক্ত ভারী মনে হচ্ছে, কার্তুজগুলোর পেতলের ক্যাপে ক্যাপে ঘষা লেগে কেমন একটা অস্পষ্ট ক্লিচ ক্লিচ শব্দ শোনা যাচ্ছে, থর্ থর্ করে অল্প অল্প আওয়াজ দিয়ে উঠল ভেতরকার ছররাগুলো। সভয়ে দুটো পকেটকে চেপে ধরে রঞ্জু এবার জোরে চলতে আরম্ভ করল। বিধুবাবু মক্কেল নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে আছেন, ওকে দেখতে পেলেন না। দেখা দেবার মতো অবস্থাও নয় তার—দীর্ঘজীবী হোক বিধুবাবুর দেওয়ানী মামলার মক্কেলরা।

পথের দুধারে ঘর বাড়ি মানুষগুলো যেন ছায়াবাজীর মতো নাচছে। কারো চোখের দিকে রঞ্জু তাকাতে পারছে না, মনে হচ্ছে সকলে যেন তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে তারই পকেট দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ যেন শরীরের ওজনটা অতিরিক্ত হালকা হয়ে গেছে তার, মনে হচ্ছে পা দুখানা তার নিজের ইচ্ছেয় চলছে না—হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে কাগজের টুকরোর মতো। অতিরিক্ত উত্তেজনায় সমস্ত মস্তিষ্কটাই তার ফাঁকা হয়ে গেছে, তাই শরীর থেকে লোপ পেয়েছে মাধ্যাকর্ষণ বোধ?

সাইকেল চড়া সেই লোকটা। এতদিনে নামটাও জানা হয়ে গেছে তার, আই-বি কন্স্টেবল ইয়াদ আলী। ভাগাড়ের সন্ধানে উড়ন্ত শকুনের মতো চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ এসে যদি পথরোধ করে দাঁড়ায়, যদি বলে, দাঁড়াও, তোমার পকেট দুটো একবার সার্চ করে দেখব?

দিশেহারার মতো রঞ্জু চলতে লাগল। ধাক্কা লেগে গেল একজন পথচারীর সঙ্গে, সে ধমক দিয়ে উঠল: অমন করে হাঁটছ কেন খোকা, একটু চোখ চেয়ে চলতে পারো না?

গোষ্ঠের মেলায় চুরির অংশ নিয়েছিল, আজ সে নিজেই চুরি করেছে। চুরি করেছে রঞ্জু—একটা মিথ্যা কথা বলতেও যার বুক থর থর করে কেঁপে ওঠে। আশ্চর্য, বদলে গেছে জীবনবোধ, বদলে গেছে জীবনের দৃষ্টি। আজ জেনেছে বৃহত্তর, মহত্তর সত্যের জন্যে এ সমস্ত ছোট কাজ করায় কোনো অপরাধ নেই। এ তার দায়িত্ব, এ তার কর্তব্যের অঙ্গ। হত্যার চেয়ে বড় পাপ নেই, কিন্তু 'পথের দাবী'র সব্যসাচী তো সেই হত্যারই রুদ্র বন্দনা গেয়েছেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত দিয়েই গড়ে ওঠে স্বাধীনতার আসবার পথ। তাই নিজের জন্যে যা অপরাধ, দেশের জন্যে তাইই পরমপুণ্য। একদিন চুরি করে নিজেকে কলঙ্কিত বোধ করেছিল, আজ গৌরবান্বিত মনে হচ্ছে, আজ মনে হচ্ছে মহাসাগরে তুফান তুলতে একটুখানি ঢেউয়ের দোলা সেও জাগিয়ে দিতে পারে হয়তো।

—এমন হন্ হন্ করে কোথায় চললি গঙ্গাফড়িং?

পাথরের মতো পা থেমে গেল রঞ্জুর। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিরও একটা নিশ্বাস পড়ল। ভোনা। গলায় একটা রুমাল বেঁধেছে গুণ্ডার মতো করে, একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

—কোন্ লঙ্কা জয় করতে যাচ্ছ বৎস?

সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ালো ভোনা। পাকামি-ভরা মুখটা বুড়ো মানুষের মুখের মতো দেখাচ্ছে এখন, যেন একেবারে ভবেন মজুমদার। আশ্চর্য, আট্ ন মাস আগে এই ভোনাই বেরিয়েছিল নন্-কো-অপারেশন আর বিদেশী বয়কট করতে, এই ভোনাই সিগারেটের স্তূপে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শুধু ভোনাই নয়, আবার তো লোকের মুখে মুখে তেম্নি করে সিগারেট জ্বলছে, মদের দোকানে তেম্নি করেই তো চলেছে লোকের আনাগোনা। তা হলে?

বেণুদার কথাই ঠিক। সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিজেকে ফাঁকি, দেশকেও ফাঁকি। বেনোজলের মতো তা এসেই মিলিয়ে যায়, চিহ্নও রাখে না। বানের ঘোলা জল নয়, রক্ত সমুদ্রের দোলা চাই এবারে।

কিন্তু নীচের দুটো পকেটভরা তার টোটা। আর সাইকেলে চড়ে ইয়াদ আলী সারা সহরটা চষে বেড়াচ্ছে। রঞ্জু আরো জোরে এগিয়ে চলল।

—বেণুদা, বেণুদা?

বাড়ির দরজায় যখন পৌঁছুল তখন হাঁপাচ্ছে সে। সদর দরজা খুলে হাসিমুখে করুণাদি এসে হাজির: এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে যে? ব্যাপার কী?

—খুব জরুরি দরকার।

—কী দরকার?

সত্যি কথাটা বলা যাবে না, কিন্তু মায়ের মতো দৃষ্টি যার চোখে সেই করুণাদির কাছে মিথ্যেও বলা চলে না। রঞ্জু উত্তর দিল না, দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে।

করুণাদি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কী দরকার?

—বেণুদাকে বলব।

—ওঃ—করুণাদি কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রঞ্জুর দিকে। বললেন ভেতরে এসো ভাই।

রঞ্জু ভেতরে ঢুকতে করুণাদি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর একখানা হাত রাখলেন ওর কাঁধের ওপর। আস্তে আস্তে বললেন, তোমাকে আমার ছোট ভাইয়ের মতো বলেই জানি। একটা সত্যি কথা বলবে?

সন্দেহে রঞ্জুর বুকটা টিপ টিপ করতে লাগল, কপালে ঘাম দেখা দিলে।

—বলুন।

—তুমিও কি শেষ পর্যন্ত ওই দলে গিয়ে ভিড়েছ?

রঞ্জু নির্বাক।

ব্যথায় হঠাৎ করুণাদির স্বর ভারী হয়ে উঠল: রঞ্জু, ভাই?

—বলুন।

—ও পথে যেয়ো না, ও ছেড়ে দাও।

বেণুদার বোনের মুখে কথাটা নতুন রকম শোনালো। বিস্মিত চোখের দৃষ্টি তুলে ধরল রঞ্জু। এ কার কাছে কী শুনছে সে।

—হ্যাঁ ভাই, ছেড়ে দাও।—সন্ধ্যার অন্ধকারে, একটু দূরের লণ্ঠনের ক্ষীণ আবছায়া আলোতেও রঞ্জু দেখতে পেল করুণাদি'র চোখ অশ্রুতে চক চক করছে: কেন এ সর্বনাশা খেলায় নেমে পড়েছ ভাই? এ যজ্ঞে কি সবাইকে বলি দিতে হবে—কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না?

রঞ্জু ভয়ঙ্কর চমকে উঠল। কী একটা বলতে গিয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট। তার কপালের ওপর করুণাদির এক ফোঁটা চোখের জল এসে পড়েছে।

সীমাহীন বিস্ময় আর বেদনায় রঞ্জুর সারা বুকটা যেন মোচড় খেয়ে গেল। আপনি কাঁদছেন করুণাদি?

—হাঁ, কাঁদছি। করুণাদি আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন: কেন যে কাঁদছি আজ তুমি তা বুঝতে পারবেনা। এই আগুনে কত ফুলের মতো ছেলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যাদের বাঁচা উচিত ছিল, তারাই মরেছে সব চেয়ে আগে। কী লাভ হল এতে?

বিস্ময়-ব্যাকুল হয়ে রঞ্জু বললে, করুণাদি, আমি তো—

—না, কিছু বুঝতে পারবে না। তুমি বুঝতে পারবে না আজ কেন আমার স্বামী থেকেও নেই, কেন আমি দিন-রাত এমন করে তুষের জ্বালায় জ্বলছি। শুধু তোমাকে একটা কথা বলব ভাই। তুমি কবি—তুমি গুণী। তুমি বাঁচবার চেষ্টা করো, মরার লোভকে জয় করতে চেষ্টা

করো। ঢের বেশি তাতে কাজ হবে। এ তোমার পথ নয় ভাই, এ রক্তের পথে তুমি যেয়ো না।

আশ্চর্য—এ কী হল! করুণাদি হঠাৎ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে গেলেন। রঞ্জুর সামনেই উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে শুরু করে দিলেন তিনি, কান্নার বেগে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল।

আর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জু। কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু বিধুবাবুর ড্রয়ার থেকে চুরি করা যে কার্তুজগুলোকে এতক্ষণ নিজের বিজয়ের প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল, হঠাৎ যেন একটা অর্থহীন ব্যর্থতায় তারা সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, আকীর্ণ হয়ে গেছে কলঙ্কিত শূন্যতায়।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আলো ও ছায়া

এই গল্পটি যেন খুব একটা বড় গল্পের সংক্ষিপ্তসার। গল্পের আখ্যান বস্তুতে বৃহত্তর হইয়া গল্পের উন্মেষলাভের যথেষ্ট অবকাশ ছিল—শরৎচন্দ্র যথাযথভাবে উন্মেষ সাধন করেন নাই। নায়ক যজ্ঞদত্ত ও সুরমাকে সমাজ সংসার ও সর্ব্ববিধ সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। এইরূপ অসাধারণ জীবনের অঙ্কনে পূর্ব্বসূচনায় একটা অসাধারণ কিছুর প্রত্যাশা করা গিয়াছিল—কিন্তু তাহা সাধারণ্যের গণ্ডীর বাহিরে গেল না। যজ্ঞদত্তের তিনকুলে কেহ নাই, সে এম-এ পাশকরা যুবক, শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত অধিকাংশ যুবক চরিত্রের মত তাহার অর্থের অভাব নাই; সুরমারও কেহ নাই, সে কুড়ানো মেয়ে, বাড়ীতেও দ্বিতীয় পরিজন নাই। এক্ষেত্রে প্রণয় লইয়া একটা গল্পের সৃষ্টি বর্ত্তমান যুগে হয় না। কারণ, বিবাহ অনিবার্য্য এবং সুখে স্বচ্ছন্দের ঘরসংসারও অনিবার্য্য—তাহাতেই কথা টি ফুরায়—নটে গাছটি মুড়ায়। শরৎচন্দ্র যে যুগের গল্প লিখিতেছেন, তখন যজ্ঞদত্তের মত সমাজসংসারের বাহিরের লোকের পক্ষেও সাহস দেখানো সঙ্গত মনে হইত না—কাজেই গল্পের রূপ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শরৎচন্দ্র কাহাকেও সংস্কারমুক্তরূপে অঙ্কিত করিতে পারিতেন না। তাহাতে এই সুবিধা হইত—সংস্কারের সঙ্গে প্রণয়ের দ্বন্দ্বপ্রদর্শন।

যজ্ঞদত্ত সুরমার উপদেশে যে হাবাগোবা অনাথা মেয়েটিকে বিবাহ করিল সে যজ্ঞদত্তের পত্নী হইবার উপযুক্ত নয়। পত্নীত্বের জন্ম যজ্ঞদত্ত তাহাকে বিবাহ করেন নাই। যজ্ঞদত্ত বলিয়াছিল—"দেখ ছায়া, বিবাহে প্রবৃত্তি নেই, কিন্তু তোমার যদি একজন সাথীর প্রয়োজন হয়ে থাকে ত বিবাহ করব।" সত্যই সুরমার একটি সাথীর জন্যই যজ্ঞদত্ত বিবাহ করিল—এমন মেয়েকে যাহার তিনকুলে কেহ নাই, অনাথা—পরগৃহপালিতা, জন্মদাসীকে। সুরমাও ভাবিয়া চিন্তিয়াই এইরূপ বধু নির্বাচন করিয়াছিল। এই বিবাহ শুধু সমাজের চোখে একটা যবনিকা সৃষ্টির জন্য—নিজেদের প্রণয়ের পুষ্টির জন্য। প্রণয়কে কোন প্রকারে সঙ্কুচিত বা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য নয়। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল, অনাথা কাঙালিনীরও হৃদয় আছে—সে জড়বস্তু নয়, তাহার নারীত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সপত্নীও নিজের স্বাভাবিক সদ্‌গুণে ও নিরন্তর সহিষ্ণু সাধনায় সপত্নীর হৃদয় জয় করিতে পারে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রেও নানা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইতে পারে—তাহার ফলে সুখের কুলায়ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন একটি বিশিষ্ট মনস্তত্ত্বের ধারা ধরিয়া বিপর্য্যয়টির ক্রমোন্মেষ দেখানো হয় নাই। সুরমা চাহিয়াছিল একটি সাথী, কিন্তু পরে বুঝিল তাহারই সাথী হইয়া থাকিবার কথা নূতন বধুর, বধুর সমস্ত অধিকার নিজে অধিগত করা ধর্ম্মসঙ্গত নয়, নীতিসঙ্গত নয়, রুচিসঙ্গত নয়। ইহাতেই বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি। যজ্ঞদত্তের মনেও প্রণয় ও করুণার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ঘটিতেছিল। অনন্ত তুষার শৈলের মত গল্পের অধিকাংশই নিগূহীত।

এই গল্পটিতে শরৎচন্দ্রের ভাষার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি অত্যন্ত ঘন ঘন উপমার ব্যবহার করিয়াছেন। আর একটি বৈশিষ্ট্য পাত্রপাত্রীর মিতভাষণ। ভাষার কার্পণ্যের জন্য ভাবধারা অনেকস্থলে অপরিস্ফুট।

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ অপরিসীম দরদের সৃষ্টি এই গল্পটি। গল্পটির দুইটি দিক আছে, একটি দিক হৃদয়বৃত্তিমূলক। আর একটি দিক সমাজতত্ত্বমূলক। প্রথম দিকটাই দ্বিতীয় দিক্‌টাকে অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই টানিয়া আনিয়াছে।

দুলের মেয়ে অভাগী—ঘটাসমারোহের মধ্যে বামুনমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিয়া, পুত্রের হস্তে মুখাগ্নিলাভ করিতে দেখিয়া ভাবিল—তিনি রথে চড়িয়া স্বর্গে গেলেন। তাহারও সাধ যাইল—ঐ ভাবে স্বর্গে যাইতে। কিন্তু অভাগী সত্যই অভাগী। সে ছোট জাতের মেয়ে, সে অত্যন্ত কাঙাল, স্বামী পর্য্যন্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া ভিন্ন গ্রামে চলিয়া গিয়াছে—তাহার সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য কোথায়? সকলের মধ্যে তাহার আছে

একটি দশবছরের ছেলে। ছেলের হাতের মুখাগ্নি সে অন্ততঃ পাইতে পারে। সেই ভাবনায় সে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করিল। মৃত্যুও প্রসন্ন হইলেন—কিন্তু তাহার সাধ মিটিল না। অভাগীর ধারণা ও বাসনা দুইই ভ্রান্ত—কিন্তু অভাগীর পক্ষে পরম সত্য—বিশেষতঃ তাহার বেদনায় কোন অসত্য নাই। তাহার বেদনাটুকু পরম সত্য—ইহাই একটা দেশ-কালাতীত বিশ্বজনীন আবেদন লাভ করিয়া গল্পটিকে অপূর্ব্ব সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। শরৎচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, বামুনমা সেখানে গেলেন কি না বলা শক্ত, তবে অভাগী যে খড়ের ধোঁয়ার রথে চড়িয়া সেখানে গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অক্ষুণ্ণ সতীধর্ম্ম পালনের জন্ত যদি একটা সতী স্বর্গ থাকে তবে দুলের মেয়ে সেখানে রাজরাজেশ্বরী। আমরা বলি—"শরৎচন্দ্র, তোমার স্নেহের দুলালী, বাঙ্গালী পাঠকের মানসস্বর্গে চিরদিনই বিরাজ করিবে।"

অভাগীর বাসনা পূর্ণ হইল না—কেন পূর্ণ হইল না—তাহা বলিতে গিয়া শরৎচন্দ্র আমাদের সমাজের হৃদয়হীনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার ফলে আসিয়াছে জমিদারী কাছারি ও উচ্চবর্ণের লোকদের নির্ম্মম আচরণের কথা। পাশাপাশি দুইটি সমাজের চিত্র আঁকিয়া শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন—উচ্চতম সমাজ নিম্নতম সমাজের লোকগুলিকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। অভাগীর আকাঙ্ক্ষাকে দেখিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে, কিন্তু দরিদ্রের দাবিকে দাবাইয়া রাখিতে যাহারা চায়—তাহারা কি মানুষ? শরৎচন্দ্র অভাগীর স্বর্গে যে সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন করুণায় বিগলিত হইয়া, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তাহারই মীমাংসা প্রার্থনা করিতেছে।

শরৎচন্দ্র এই হিসাবে এদেশে সাম্যতন্ত্রীয় সাহিত্যে জগতের অগ্রদূত। যেখানেই মানুষের, সে যতই দীন দুর্ব্বল হোক, তাহার দাবি অস্বীকৃত হইয়াছে—যেখানেই মানবহৃদয় পদদলিত হইয়াছে—মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা যেখানেই উপেক্ষিত হইয়াছে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব যেখানেই দম্ভভরে অনাদৃত হইয়াছে—শরৎচন্দ্রের হৃদয় সেখানেই বিগলিত হইয়াছে—দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিয়াছে কখনও কখনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যত্বের প্রতি এই অবিচার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সমাজগত। হৃদয়হীন অবিচারক সমাজে যেই জন্মে—যেই প্রতিপালিত হয়—সেই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে এই নিষ্ঠুর ও সংকীর্ণ প্রবৃত্তির অধিকারী হয়। সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতির মূলেই দোষ। মেঝে ও দেওয়াল খুঁড়িয়া একটি একটি করিয়া সাপ ধরিবার চেষ্টা না করিয়া সমগ্র গৃহটিকেই ধ্বংস করিয়া নূতন করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করাই উচিত। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যও তাহাই বলে। তাই তাহা সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এই অভিযান হৃদয়ের প্রেরণায় পরিচালিত না হইয়া মস্তিষ্কের প্রেরণায় পরিচালিত হইতেছে। তাই শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের অভিযান হইয়াছিল সাহিত্য, বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধির অভিযান প্রকৃত সাহিত্য হইয়া উঠে না—একপ্রকারের নীতিতন্ত্র হইয়া উঠিতেছে।

"মা মরেচে? যা নীচে গিয়ে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্‌রে এখানে, একটু গোবর জল ছড়িয়ে দে। কি জাতের ছেলে তুই? দুলে? দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি? মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুতে ফেলগে যা, কার বাবার গাছে তোর বাবা কুড়ুল ঠেকাতে যায়, পাজি হতভাগা নচ্ছার।"

"তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে! যা মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে।"

"দেখেছেন ভট্টাচায্যি মশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হ'তে চায়।"

এই উক্তি জমিদারের নায়েব বা ভট্‌চাজের একার নয়। হাজার বছর ধরিয়া এই দেশের উচ্চবর্ণের সমাজ হাজার হাজার কাঙাল-দুঃখীকে এই কথা বলিয়া আসিয়াছে। এই উক্তিতে সকলেই সায় দিয়াছে—কেহ কোন অসঙ্গতি আছে মনেও করে নাই। শরৎচন্দ্রের আগে কোন সাহিত্যিকেরও ইহা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। আজ সকলেই জানেন, ইহা মানুষের মুখের উপযুক্ত কথাই নয়—সকল সাহিত্যিকই আজ এই নিষ্ঠুর উক্তির প্রতিবাদ জানাইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা যেন তাঁহাদের শিক্ষাগুরুকে না ভুলেন।

গল্পের বিষয়বস্তু লইয়া আর কিছু বলিবার নাই। গল্পটির রচনা-ভঙ্গী আগুন্ত অনবদ্য। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নীরন্ধ্র গল্প জগতের সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। কাঙালীর মা অভাগীর ধীরে ধীরে জীবনাবসানটা যেন শরৎচন্দ্রের চক্ষুর সমক্ষেই হইয়াছে। শরৎচন্দ্র তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে ও চরিত্রে কতটা জীবন (vitality) সঞ্চার করিয়াছেন—নিম্নোদ্ধৃত অংশ নিদর্শনস্বরূপ উৎকলিত হইল—

৪

পরদিন রসিক-দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের উপরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে। চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গেছে।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, "মাগো, বাবা এসেচে, পায়ের ধুলো নেবে যে।"

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীরসঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথযাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল। রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে, তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসী দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, "দাও, বাবা দাও, একটু পায়ের ধুলো।"

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজ-খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু ধুলো দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত। পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সম্মুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল,

কিন্তু তাহার তাই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, "এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস্, বাবা ?"

কাঙালী জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকে মা ?"

"ওই যে রে, ও গাঁয়ে যে উঠে গেছে।"

কাঙালী বুঝিয়া কহিল "বাবাকে ?"

অভাগী চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী বলিল, "সে আস্‌বে কেন মা ?"

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, "গিয়ে বলিস্, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।"

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে মা তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "একটু কাঁদাকাটা করিস্, বাবা, বলিস্ মা যাচ্ছে।"

সতী—কেহ কেহ বলেন—শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রগুলি সবই এক ধরণের—একথা যে সত্য নয়, সতী গল্পের নির্ম্মলা চরিত্র তাহার অন্যতম প্রমাণ। আমার মনে হয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু সংসারের সকল শ্রেণীর নারীচরিত্রই শরৎচন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায়। হিন্দু সংসারে সতীর অভাব নাই, তবে সতীত্বের অহঙ্কারে বিকৃত বুদ্ধি খুব অল্প নারীই আছে। নির্ম্মলা সতী সন্দেহ নাই—যেমন তাহার আর পাঁচজন আত্মীয়রাও সতী। কিন্তু নির্ম্মলা সতীত্ব গৌরবে অপ্রকৃতিস্থা —একটা Superiority Complex তাহার চরিত্রকে উৎকেন্দ্রিক করিয়া তুলিয়াছে। মেয়েদের মধ্যে শুচিবাই নামে একটা রোগ আছে—এই রোগটা সাধারণতঃ বাহ্য শুচিতাকেই আশ্রয় করে—এক্ষেত্রে তাহা চারিত্রিক শুচিতাকে আশ্রয় করিয়াছে। উৎকেন্দ্রিক চরিত্রা পত্নী হইলেই জীবন দুর্বহ হইয়া উঠে—দাম্পত্য জীবন অহিনকুলের জীবনে পরিণত হয়। এই উৎকেন্দ্রিকতা অসূয়াকে আশ্রয় করিলে পতির জীবন দুর্বিবহ হইয়া উঠে, শরৎচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন।

সতীত্বের প্রধান লক্ষণ পতিতে আত্মসমর্পণ—পতির মনে কোন ব্যথা সতী নারী দিতে প্রস্তুত নয়—পতির সুখের জন্য সে সর্ববিধ আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। ইহাই হইল তদীয়তাময় সতীত্ব। ইহা সাধনার বস্তু। আর একপ্রকারের সতীত্ববোধ সংস্কারগত, উত্তরাধিকার ও পারিবারিক আবেষ্টনী হইতে প্রাপ্ত—ইহাতে বিকৃতরূপ ধরলে সতীর ধারণা হয় আমার তুল্য সতী জগতে নাই, আমি পতিরও পূজ্য, আমার যেমন অক্ষুণ্ণ সতীত্ব, স্বামীরও হইবে তাহাই। ইহা মদীয়তাময় সতীত্ব! ইহাতে স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কল্যাণটাই বড় হয়—তাহার পত্নীর সতীগৌরবটাই বড়। প্রেমকেও সে গতানুগতিক সংস্কারগত পতি ভক্তির বেদীতে বলিদান দিতে প্রস্তুত। নির্ম্মলার সতীত্ব সেই শ্রেণীর—সে প্রেমের বিনিময়ে গার্হস্থ্য সুখের বিনিময়েও নিজের সতীত্ব শুচিতা রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করে না। সে স্বামীকে ভালবাসে না—সে স্বামীত্বের abstraction এর পূজা করে মাত্র।

নির্ম্মলার সতীত্ব গৌরবকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে অসূয়ার অশুচিতা। স্বামী সম্বন্ধে তাহার কেবল অশুচি চিন্তাই মনে আসে। তাহার মনে স্বামিত্বের আবেষ্টনীতে বিন্দুমাত্র শুচিতা নাই—অতি জঘন্য অশুচিতার আবেষ্টনীতে সে স্বামিত্বকে পোষণ করে। এই অশুচিতা—প্রত্যহ পতির পাদোদক পানে যাইতে পারে না—এই পাদোদক হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

শরৎচন্দ্রের গল্পটি প্রথম শ্রেণীর গল্প। সতীর ভয়ে পতির মিথ্যা কথা বলা এবং সেই মিথ্যা ধরা পড়ার একাধিক বার অবতারণায় গল্পের আর্ট বেশ জমিয়াছে। সব থেকে গল্পটি জমিয়াছে—শীতলা মায়ের মন্দিরে সতীর ধরণা প্রসঙ্গে। বলা বাহুল্য, বসন্ত রোগ অনেকের হয় এবং সে রোগ হইতে অনেক লোকই চিকিৎসায় অথবা বিনা চিকিৎসায় সারিয়া উঠে। সতীর ধরণার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু সতী সংকল্পের কাক-তালীয়তার অবতারণা করিয়া শরৎচন্দ্র গল্পটিকে চমৎকার জমাইয়াছেন। নির্ম্মলাকে অহিফেন সেবন করানোর প্রয়োজন ছিল। গল্পটির আবহাওয়া একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—একটি লোক সমাজই চারিপাশে আবহাওয়ার রূপে বিদ্যমান—ফলে এই গল্পটিতে একটি সমগ্র সমাজের লোকেরই মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। ফলে গল্পের নায়কের স্বাভাবিক জীবন সতী-তীর্থে ভৌতিক দেহত্যাগ করিয়া দশচক্রে ভূত বনিয়া গেল।

পনেরোই আগষ্ট

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ঝর ঝর ঝর শ্রাবণ ধারায় তোমার অভ্যুদয়—
বিজলী-ঝলকে করে বিঘোষিত তোমারি দিগ্বিজয় !
রচিল জীবন মরণের তীরে, নাশিল অন্ধকার—
প্রেম-তর্পণে ধ্বনিবে মন্ত্র যুগে যুগে অনিবার !
মোদের গর্ব্ব জাতীয় পতাকা উড়িছে ভারতময়—
যার মাঝে ঐ অশোক-চক্র জগতের বিস্ময় !
মুক্ত-ভারতে উচ্ছলে নব-জীবনের ইঙ্গিত ;
জাগিয়া উঠিল রাখী-বন্ধনে মিলনের সঙ্গীত।
স্বাধীনতা লাগি' ক'রেছিল যারা সংগ্রাম দুর্জ্জয়—
দিয়ে গেছে তারা সাধনা-লব্ধ এ জাতির পরিচয় !
নির্জ্জীব প্রাণে বিদ্যুৎ হানে অরবিন্দের বাণী,—
তরু-মর্ম্মরে কুঞ্জে সমীরে রোমাঞ্চ দিল আনি' !
বিরাট বিশ্ব চমকি' চাহিল—নবীন সূর্য্যোদয়—
বিপুলা পৃথ্বী গাহিল আবার—জয়তু ভারত জয় !

বনফুল

১৯

ছিপছররামারি সন্নিহিত সেই পোষ্টাফিসে সুশোভন হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল পুনরায়। দেখে মনে হল যেন ডাকাতে তাড়া করেছে তাকে। পোষ্টমাস্টার তার দিকে এক নজর চেয়ে যখন তাকে সেই তার্কিক মেয়েটির এবং গুঁফো ড্রাইভারটির সঙ্গী বলে' চিনতে পারলেন তখন তাঁর মনোভাব বেশ একটু উষ্ণ হয়ে উঠল। মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু চোখের কোণে আগুনের ঝলক দেখা গেল।

"কোলকাতায় আমি এক্ষুণি একটা ফোন করতে চাই। কোলকাতা পেতে সাধারণত কত দেরি হয় বলুন তো—"

পোস্টমাস্টার যে আড়ময়লা খাতাটির মধ্যে টিকিট রাখেন সেটি তুলে টেবিলের ড্রয়ারে ঢোকালেন। ড্রয়ারটা বন্ধ করতে গিয়ে আটকে গেল সেটা, টানাটানি করে' আবার খুললেন, আবার ঢোকাবার চেষ্টা করলেন, আবার আটকে গেল। আবার টানাটানি করে' খুললেন। সম্পূর্ণ ড্রয়ারটাই বার করে' ফেললেন এবার। ড্রয়ারের ভিতরের প্রত্যেকটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেন, গোছালেন, তারপর টেবিলের যে ফাঁকে ড্রয়ারটা বসানো ছিল সেখানে ফুঁ দিলেন বারকয়েক। তারপর ড্রয়ারটাকে ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কয়েকবার চেষ্টা করে' সফলকাম হলেন অবশেষে। ঝড়াস্ করে' ড্রয়ারটা ঢুকে বসে গেল স্বস্থানে। আবার টেনে দেখলেন 'জাম্' হয়ে গেল কিনা। 'জাম্' হয়েছে। আবার টেনে বার করলেন, আবার ঢোকালেন, আবার টানলেন। বেশ সড়গড় হয়ে যাবার পর টিকিটের খাতাটি পুনরায় বার করে' টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর চোখের কোন থেকে আর এক ঝলক উষ্ণতা বিকীরণ করে' চাইলেন সুশোভনের দিকে।

"দেরী···?"

"হ্যাঁ, কোলকাতা পেতে কত দেরী হয় সাধারণত"

"কি ভাবে পেতে চান?"

"ফোনে, মশাই। তা ছাড়া আর কি ভাবে পাব? আপনি কি ভাবছেন আমি এখান থেকে সুড়ঙ্গ কেটে কোলকাতা যেতে চাইছি? দোহাই আপনার, দাঁড় করিয়ে রাখবেন না আমাকে, আমার তাড়া আছে—"

পোস্টমাস্টার টিকিটের খাতাখানি ঘুরিয়ে অন্যভাবে রাখলেন আবার।

"ফোনে কোলকাতা কতক্ষণ লাগে বলছেন?"

"হ্যাঁ মশাই। এই সোজা কথাটা আপনার বুঝতে এত দেরি হচ্ছে?"

"বুঝেছি। ঢুকেছে মাথায়, কিন্তু কি জবাব দেব তাই ভাবছি। কত দেরি হয় তা কি বলা যায়? কখনও সাঁৎ করে' চলে' যায় আবার কখনও যুগযুগান্ত কাটে—। কত দেরি হবে তা কি বলা যায় ঠিক?—যায় না। অথচ প্রত্যেকেই এসে ওই এককথা জানতে চাইবে। আমার যদি জানাবার সামর্থ্যই থাকবে—"

আর অধিক বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়ে সুশোভন এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলে। ভয়ানক দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। তার নিজের গাফিলতির জন্যে অনীতা বেচারী হয়তো কত কষ্ট পাচ্ছে, এই চিন্তাটা পাগল করে' তুলেছিল তাকে। অনীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যে সব সম্ভাব্য দুর্গতি তার কপালে নাচছে সে কথা মনেই হচ্ছিল না তার। অনীতা হয়তো তার একটি কথাও বিশ্বাস করবে না, এ কথা জেনেও সে ফোন করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ঠিক করেছিল, তার সঙ্গে কথা না কওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই

সে দাঁড়িয়ে থাকবে। স্থানটা যদিও সুখকর নয়—তার উপর ওই পোস্টমাস্টার—সাংঘাতিক লোক—বেণীক্ষণ ওর সাহচর্য্যে থাকলে ক্ষেপে যেতে হবে, ক্ষেপে হয়তো খুনও করে' ফেলতে পারে—কিন্তু না, আত্মসম্বরণ করা দরকার। যে চিঁড়ে সে মেখেছে, তাই তোলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে—সেটাকে আর জটিলতর করে' লাভ নেই। পোস্টমাস্টারের কথায় কর্ণপাত না করে' সে ফোনে কর্ণ সংলগ্ন করে' দাঁড়িয়ে রইল ধৈর্য্যভরে।

ফোনে নানা রকম আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেনেরি পাখী ডাকছে···ফট ফট করে' পিস্তলের মতো আওয়াজ হ'ল বার কয়েক···সোঁ সোঁ সোঁ···আবার কেনেরি···।

অনেকক্ষণ পরে সুশোভন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে একটা। ক্ষীণ হলেও স্পষ্ট। অনীতার সেই চাকরানিটি। যে সব ক্ষমা-স্নিগ্ধ চরিত্র পৃথিবীতে মানব জাতির মর্য্যাদা-বৃদ্ধি করেছে অনীতা দেবীর দাসী ক্ষান্তমণির চরিত্র ঠিক সে ধরণের নয়। সুশোভনের সম্বন্ধে তার নিজস্ব এমন একটি ধারণা আছে যার তুলনায় স্বয়ম্প্রভা দেবীর ধারণা নিতান্ত নিষ্প্রভ। সুশোভন যে তাকে ফোন করতে পারে এ আশা ক্ষান্তমণি করে নি অবশ্য। কিন্তু যখন সুযোগটা পেয়ে গেছে তখন নিজের কেরামতিটুকু নিজস্ব ঝাঁজ-সহযোগে জাহির করতে সে ছাড়লে না। আনাড়ি পল্লীবালা নয় সে, কোলকাতার ঘাগী ঝি। ফোন-ধরা অভ্যাস আছে।

নিজের মনোভাব সরাসরি প্রকাশ না করে' সে সুশোভনকে বেশ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলে ফিরে এসে তাকে কি নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। একাকিনী ভগ্ন-হৃদয়া অনীতার হৃদয-বিদারক প্রত্যাবর্ত্তনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করলে সে। স্বয়ম্প্রভার আবির্ভাবের কথা জানালে সবিস্তারে। তিনি কি কি অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করেছেন তা বললে এবং পরিশেষে নিপুণ ভাবে বর্ণনা করলে সমস্ত পরিবারের উত্তেজিত অভিযান-কাহিনী। টেলিফোনের তার বাহিত হয়ে শ্রীমতী ক্ষান্তমণির জিঘাংসা—ক্রুর কণ্ঠস্বরে যে উল্লাস উদ্বেলিত হয়ে উঠল তা অবর্ণনীয়।

সে কোথায় আছে তা স্বয়ম্প্রভা জানলেন কি করে? তিনি জানবেন না তো কে জানবে! তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে কি পার পেয়েছে কেউ আজ পর্য্যন্ত? স্বয়ম্প্রভা দেবীর মহতী বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য ক্ষান্তমণির কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরও ধ্বনিত হল যেন। কি করে' স্বয়ম্প্রভা তার গতি-পথ আবিষ্কার করেছেন তার সাড়ম্বর বর্ণনা করে' গেল সে।

টেলিফোন রেখে দিলে সুশোভন। পোস্টমাস্টারের দিকে দশটাকার একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল সে পোস্টাফিস থেকে। ওরা আসছে! সর্ব্বনাশ। রাস্তার এ মোড় থেকে ও মোড় পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করে' বেড়ালে যদি একটা ট্যাক্সি পেয়ে যায়। পাওয়া গেল না। একজন খবর দিলেন, এখানে 'বাইক' ভাড়া পাওয়া যায়!

কোথায়? ওই যে দোকানটায়। ছুটল সে দিকে সুশোভন। দরদস্তুর করবার সময় ছিল না। সুশোভন এ অঞ্চলে পরিচিত ব্যক্তিও নয়। বাইক-ওলা বেশ একটু চড়া দরই হাঁকলে। ঘণ্টা পিছু দুটাকা। বাইকের দামটাও দোকানে জমা করতে হবে। তাতেই রাজি হয়ে গেল সুশোভন। বাইকের 'সীট্'টি উষ্ট্রাকৃতি। তা হোক, তার উপরই চড়ে বসল সে অবিলম্বে এবং ধাবিত হল হরিমটর হিন্দু পান্থনিবাসের উদ্দেশে। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু সে সব দিকে মন দেবার অবসর ছিল না তার। সে ছুটছিল যদি স্বয়ম্প্রভাকে এড়িয়ে কোনক্রমে অনীতার দেখা পেয়ে যায় এই আশায়। স্বয়ম্প্রভার সঙ্গেই যদি যাওয়া মাত্র দেখা হয়ে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। অনীতার সঙ্গে দেখা হলে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারে, যদি বোঝান সম্ভব না হয় কাকুতি-মিনতি করতে পারে। অনীতাকেই যে সে ভালবাসে, তাকে ভালবাসবার পর অপরকে ভালবাসা যে অসম্ভব, এ কথাটা কি অনীতা বুঝবে না? অক্ষয় অকৃত্রিম প্রেম কি কেতাবেরই বুলি কেবল? তাকে বোঝাতেই হবে যেমন করে' হোক···। প্রাণপণে 'বাইক' চালিয়ে ছুটে চলল সুশোভন। তার মানসপটে কিন্তু স্বয়ম্প্রভার ছবিটাই ফুটে উঠতে লাগল কেবল। 'অ্যাডমিশন রেজিস্টার' পর্য্যবেক্ষণ শেষ করে' সিঁড়ি দিয়ে এইবার উঠছেন হয়তো শয়নকক্ষ পরিদর্শন-মানসে। কি ভয়ানক! যথাসম্ভব দ্রুতবেগে 'প্যাডল' চালাচ্ছিল সে, মাঝে মাঝে 'ফ্রি-হুইল'

করছিল ক্লান্ত পদদ্বয়কে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেবার জন্য, আবার খুব জোরে চালাচ্ছিল দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হ'য়ে। ভাগ্যে রাস্তায় ভীড় ছিল না বিশেষ। সঙ্কীর্ণ উবড়ো-খাবড়ো রাস্তা, কাদায় ভরতি, কিন্তু ভীড় ছিল না। একটু পরে সুশোভন দেখতে পেলে কে একজন আসছে যেন তার দিকে। তাকে দেখতে পেয়ে রাস্তার একধারে ঘেঁসে সরে' দাঁড়াল লোকটা। দ্রুতগামী বাইক থেকে আত্মরক্ষা করবার অন্য কোন উপায় ছিল না আর। সুশোভন তাকে যখন অতিক্রম করে' গেল, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তার দিকে চেয়ে। আরে, এ যে ফদকা! বাইক থেকে নেবে পড়ল সে।

"ফদকা না কি—"

আসবার সময় সুশোভন প্রচুর বখশিস দিয়ে এসেছিল তাকে।

দন্তপাতি বিকশিত করে' ফদকা এগিয়ে এল।

"হাঁ বাবু"

"কোথা যাচ্ছিস"

"গোঁসাইজিকে ডাকতে"

"কেন? কোথায় তিনি"

"নিতাই বৈরিগির বাড়ি"

"তাহলে হোটেলে নেই তিনি?"

"বললাম যে তিনি নিতাই বৈরিগির বাড়ি গেছে। তেনাকে ডাকতেই তো যাচ্ছি"

গোঁসাইজি হোটেলে নেই শুনে সুশোভন আশ্বস্ত হল খানিকটা।

"তাঁকে ডাকতে যাচ্ছিস কেন"

"বুড়ি ডাকছে?"

"বুড়ি? অ্যাঁ?"

সুশোভন সম্মুখে প্রসারিত কর্দ্দমাক্ত রাস্তাটার দিকে চাইলে একবার সভয়ে।

"কোথায় আছে সে বুড়ি"

"ওপরে শোবার ঘরে"

"ওপরে শোবার ঘরে! সর্ব্বনাশ! গোঁসাইজিকে ডাকছে কেন? শোন ফদকা, গোঁসাইজিকে কষ্ট দিয়ে আর কি হবে আমিই তো যাচ্ছি সেখানে, বুড়িকে যা বলবার আমিই বলব এখন"

মনোভাব প্রকাশ করবার মতো মুখ যদিও ফদকার নয়, তবু তাতে যেন বিস্ময়ের একটু আভাস ফুটে উঠল।

"আজ্ঞে না বাবু, আপনাকে দিয়ে হবে না। গোঁসাইজি ছাড়া তেনাকে সামাল দিতে পারবে না কেউ। গোঁসাইজি নেই শুনে যা কাণ্ড করছে—"

"তা'তো করবেই। কিন্তু আমি দেখিই না কি করতে পারি। আমাকে দিয়েই যদি হয়ে যায়, তাহলে গোঁসাইজিকে আর কষ্ট দিবি কেন শুধু শুধু। হাজার হোক বুড়ো মানুষ তো। তোকেও আবার যেতে হবে এতটা। বুড়ি কি চায় আমি জানি। গোঁসাইজিকে পেলে ভয়ানক কাণ্ড করবে ও। গোঁসাইজি যে হোটেলে নেই, ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

"আজ্ঞে না, গোঁসাইজিকে ডাকতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে, বুড়ি হয়তো বাঁচবে না। দেখে ভয় লাগছে বাবু"

"বাঁচবে না? যাঃ—কি বলছিস যা তা। যদিও আমি—মানে, ওকে দেখে ওই রকমই মনে হয়, মনে হয় বুঝি মাথার শিরটির ছিঁড়ে যাবে এখনই—ও কিছু নয়"

"আজ্ঞে না বাবু, গতিক সুবিধার লয়। বিড়বিড় করে' কি বকছে, চোখ দুটো ঘুরপাক খাচ্ছে"

"ওরে বাব্বা! ভয়ানক কাণ্ড করছে তো তাহলে! তোকে কিছু জিগ্যেস করেছিল?"

"আমাকে? না তো। কেবল বললে গোঁসাইজি কোথা, বাইরে চলে গেছে কেন, ডেকে আন এক্ষুণি গিয়ে, এক্ষুণি যাও—"

সুশোভন গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট খানেক।

"বুঝেছি। ওই রকমই করে। চিনি তো"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যবে থেকে এসেছেন তবে থেকে ওই রকমই"

"তার আগে থেকেও। তুই সবটা তো জানিস না। অসুখ টসুখ নয়। ধরণ-ধারণই ওই রকম"

"আজ্ঞে না। অসুখ করেছে, সেটা মিথ্যে নয়। আমার ভয়ে মরে না যায় শেষটা"

"কি বলিস যে! মরবে কেন"

"একদিন না একদিন তো মরতে হবেই ওনাকে"

হঠাৎ দার্শনিক উত্তর দিয়ে ফেললে ফদকা।

"তাতো হবেই। কিন্তু এখন ভগবান তা কি করবেন?

ছোট ছেলেদের গল্পের বইতে ও সব হয়, বুঝলি। আজ উনি কিছুতেই মরবেন না, আমার ভাগ্যই সে রকম নয়"

"আমাকে ডাক্তার ডেকে আনতে বলছে যখন—"

"ডাক্তার? কে ডাক্তার ডাকতে বলছে?"

"তিনি। ওই বুড়ী"

"তিনি বললেন, তাঁর একজন ডাক্তার চাই? তাহলে নিশ্চয় হয়েছে কিছু। অ্যাঁ, বলিস কি? কষ্টটা কি?"

"তা তো আমায় বললেন না। হাঁপ বোধ হয়"

"হাঁপ? হাঁপাচ্ছে? সর্ব্বনাশ। এসে থেকেই হাঁপাচ্ছে; না আসবার পর হয়েছে? ওঁর সঙ্গে আরও দু'জন আছে নয়? গোঁপ-ওলা ভদ্রলোক একটি, আর মেয়েছেলে একজন—"

"না, উনি তো একাই এসেছেন, একাই আছেন। ওঁর আপন লোক কেউ নেই বোধ হয়"

"তা' না থাকাই সম্ভব। কিন্তু তাঁর স্বামী, মানে জিতুবাবু বলে' একটি ভদ্রলোক সঙ্গে নেই?"

"না"—ফদকা সজোরে মাথা নেড়ে বললে—"কেউ নেই ওঁর সঙ্গে"

"ওঁর মেয়ে? ওঁর মেয়ে আমার, মানে—আচ্ছা, ক'টার সময় এসেছিল বল্ তো"

ফদকা ভুরু কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করলে একটু।

"সন্ধ্যে হয়ে গেছল। সাতটা বোধ হয়"

"কি বলছিস যা তা। সে সময়ে আসতেই পারে না"

"ঠিক মনে নেই"—দাঁত বার করে' বললে ফদকা—"অনেক দিন হয়ে গেল কি না। তবে সন্ধে—"

"অনেক দিন? মানে?"

"আজ্ঞে, তা মাস খানেক হবে বই কি"

"কে এসেছে মাসখানেক আগে"

"ওই দোতলায় আছেন যে মা ঠাকরুণ। আপনি যে ঘরে ছিলেন, ঠিক তার পাশের ঘরেই তো আছেন"

"ও…"

সুশোভনের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ভ্রূ সেইভাবেই স্থির হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"তাঁর অসুখ করেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"ও, যাক্—আর কেউ আসে নি তাহলে?"

ফদকা মাথা নাড়লে শুধু।

"বাঁচা গেল"—বাইকের উপর চড়ে বসল আবার সুশোভন—"তুই গোঁসাইজিকে গিয়ে বেশী ঘাবড়ে দিস না যেন। গোঁসাইজি বেরিয়ে গেছেন বলেই বুড়ি চটেছে সম্ভবত। তিনি ধীরে সুস্থে এলেও চলবে। তুই বরং ডাক্তারকে খবর দে আগে"

ফদকা ঘাড় নেড়ে চলে গেল। তার দৃঢ়বিশ্বাস, গোঁসাইজি না এসে পড়লে বুড়ি বাঁচবে না।

"যাক্—কেউ তাহলে আসেনি এখনও পর্য্যন্ত"—বাইকে ভাবতে ভাবতে চলল সুশোভন—"গোঁসাইজিও নেই। ফদকাও চলে গেল। গুড্। আমিই বোধহয় প্রথমে হাজির হব সেখানে। এক ঘরে শোওয়ার ব্যাপারটা কোনরকম যদি চাপা দিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে বাকিটা সামলে নিতে বেগ পেতে হবে না বিশেষ। গোঁসাইজি এসে পৌছবার আগে যদি ওদের এখান থেকে বার করে ফেলতে পারি তাহলে তো কথাই নেই। ইতিমধ্যে তাদের আবার সেই সৎরঙ্গবাবু না কি—তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই তো হয়েছে। যাক আপাতত যতটা দেখা যাচ্ছে, হতাশজনক নয় খুব—"

প্রাণপণে বাইক চালাতে লাগল সে।

(ক্রমশঃ)
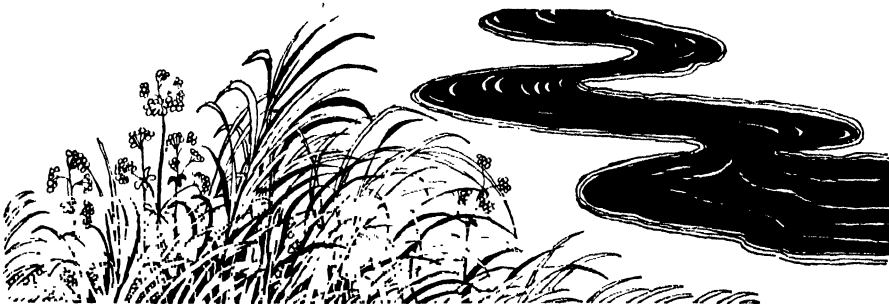
উন্মাদ মুকুন্দমঞ্জুমুরলী *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(গল্প—কিন্তু গল্প নয়)

আশ্রম থেকে ফিরে সেবার যখন অসিত কাশী যায়, তখন কাশীতে গানোৎসাহীরা ওকে ধরল কোনো রকমে ছায়াকেও কলকাতা থেকে ডাক দিতেই হবে—কাশীর লোককে গান শোনাবার জন্যে। ছায়া এল। ওরা ছিল ওখানকার একজন বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপকের বাড়িতে। সেদিন বিজয়া দশমী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের গান হ'ল সকালে। বিকেলে চা খাবার সময়ে ছায়া বলল: "আচ্ছা ভাই, আজ ঐ যে কীর্তনটা গাইলে সকালে, সেটা কিছুতেই তুমি শেখাবে না তো? বে—শ।" একারের উপর সেই চিরপরিচিত মিড়—একবারে ওর স্বকীয়—অতঃপর মুখভার—যথাবিধি।

অসিতও ছাড়বার পাত্র নয়, বলল: "ভদ্রলোকের কি দুকথা হয় কখনো? আমি তো বলেই দিয়েছি ও কীর্ত্তনটা মূল সংস্কৃতে না শিখলে বাংলা তর্জমাটা কিছুতে শেখাব না।"

ছায়ার মুখ অভিমানে কালো হ'য়ে গেল: "তোমার এ অন্যায় আবদার অসিদা। আমাকে কিছুতে ছাড়লে না—লাহোরে গাইয়ে তবে ছাড়লে ঐ গজলটা—'নিভাও উল্‌ফৎকা ইন্দো লাজুকোঁমে সখ্‌ত মুস্কিল হৈ'—উঃ আগে মনে ক'রে গা কাঁপে। ঐ সব সাংঘাতিক উচ্চারণ—" কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস—"এ অকর্মও করলাম তোমার পাল্লায় প'ড়ে? কিন্তু বলে না—ছেলে যত পায় তত নালায়?—আজ তুমি বায়না ধরেছ আমাকে খাস সংস্কৃতে গান গাইতে হবে। তোমার ঐ নিকষ কুলীন সংস্কৃত উচ্চারণ কি আমার হরিজন জিভের ডগায় ফুটতে পারে কখনো?"

অসিত টেবিলে ঘুঁষি মেরে বলল: "আলবৎ পারে। আর হাতে হাতে প্রমাণ দিচ্ছি—বল্ দেখবি পারবি খাসা—সত্যং জল্পসি দুঃসহা খলগরঃ—"

ছায়া ওর মুখ চেপে ধ'রে বলল: "চুপ্ চুপ্—উর্দ্দুর চড়াইয়ে তবু কোনোমতে ওঠা যায় হাঁপাতে হাঁপাতে—কিন্তু এ একেবারে খাড়া পথ—তার উপর সিঁড়ি তো দূরের কথা একখানা মৈ পর্যন্ত নেই।"

অসিত ওর হাতটা মুখ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চেপে ধ'রে বলল: "মৈ নেই—যার এহেন স্মৃতিশক্তি? না, উঠ্‌লই যখন কথাটা—গাইতেই হবে তোকে—নিয়ে আয় হার্মোনিয়মটা—বোস্ এক্ষণি, শুভস্য শীঘ্রং।"

ছায়া খুব রাগ ক'রে হার্মোনিয়মটা এনে অসিতের সাম্‌নে বালিশের ওপর দুম্ ক'রে ফেলে দিয়ে বলল: "আচ্ছা, এবার মেনে নিলাম—কিন্তু এই শেষবার—যাকে তোমার সাহেব পুরাণে বলে positively the last night—আর যদি কক্ষণো তোমাকে ফর্মাস করি—এই নাক কাণ মলছি।"

অসিত করুণকণ্ঠে বলল: "তাহ'লে আমাকে নাক খৎ দিতে হ'ল, নৈলে মান থাকে না—"

ছায়া ফের ওর মুখ চেপে ধ'রে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল: "তুমি বড় দুষ্টু অসিদা—জানো কি না কিসে আমার অপরাধের বোঝা বাড়ে—তাই যখন তখন এম্‌নি ক'রে অ্যাডভান্টেজ নাও। কিন্তু কেন যে থেকে থেকে তোমার মাথায় এমন ভূত চাপে সংস্কৃত গান শেখাবার—বুঝি না।"

অসিতের তখন মন খুসি—বলল: "ভুল। ভূত চাপে কখনো দেবতার ছোঁয়াচ পেতে? সংস্কৃতকে বলেছে দেবভাষা—এমন ভাষা কি ভূভারতে আর দুটি আছে রে? অবোধ বালিকা! গানে এই যে গুরু স্বরের উদার বোলন্দ উচ্চারণ—একবার এর রস পেলে আর ছাড়তে চাইবি না। তা ছাড়া তোকে বলি নি আমি যে হিন্দুস্থানি গানে কাব্যের দুর্ভিক্ষে বাঙালীর কবিপ্রাণ অনাহারে অস্থিচর্মসার হ'য়ে

* অসিত কাশ্মীরের দুমেল আশ্রমে স্বামী স্বয়মানন্দের শিষ্য। কুমারী ছায়া তার গানের ছাত্রী—কলিকাতার ধনী কন্যা—প্রতিভাময়ী। ছায়া কয়েক বৎসর অসিতের কাছে গান শেখার পর ইহলোক ত্যাগ করে। তার কথা "ছায়ার আলো" উপন্যাস প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে লেখা হয়েছে। ইতি ভূমিকা।

পড়ে? সংস্কৃত ধ্বনির কল্লোলিনী হ'ল শুধু অমৃতমন্দাকিনী নয়—তার ওপর ওজসের অলকনন্দা। বাঙালী কাণ ও জিভ পেটরোগা হ'য়ে পড়ছে দিনে দিনে—তাকে চাঙ্গা করতে হলে একটু গুরুপাক ধ্বনিসংঘাত চাই। এ-সংঘাত আনবে—প্রাণের দোলে আলোর হিল্লোল জাগাতে—সংস্কৃতের কি জুড়ি আছে রে? ধর্‌ না কেন এই গানটাই—ছন্দটার নামও যেমন গালভরা—শার্দূলবিক্রীড়িত—"

ছায়া ব'লে ওঠে সভয়ে: "বাবা গো!"

অসিত শাসিয়ে বলল: নামঞ্জুর—জপ্ কর্—কে বলে আমারে অবলে? ছন্দটা একটু রপ্ত হ'য়ে গেলেই দেখতে পাবি—শক্তির সঙ্গে ভক্তি কেমন সহজে মিল খায় এ অপূর্ব ছন্দে। একাধারে বিদ্যুতের ঝিলিক তথা মলয় হিল্লোলের chiaroscuro—আলো ছায়া—একটু গাইতে না গাইতে তোর ঘুমন্ত মনে উঠবে নব জাগরণের ঝঙ্কার—ধর্—আর দেরি নয়—না, আর একটিও কথা নয়।" ব'লেই হার্মোনিয়ম বাজিয়ে অসিত সুর ধরল:

সত্যং জল্পসি দুঃসহাঃ খলগিরঃ সত্যং কুলং নির্মলং।
সত্যং নিষ্করুণোঽপ্যয়ং সহচরঃ সত্যং সুদূরে সরিৎ॥
তৎসর্বং সখি বিস্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্জায়তে।
চেতুন্মাদমুকুন্দমঞ্জুমুরলী নিস্বানরাগোদ্ গতিঃ॥

গাইতে না গাইতে ছায়া বিশ্ব ভুলে যায়—উচ্চারণ তো উচ্চারণ!—কয়েক মিনিটের মধ্যেই গানটা শেখা হ'য়ে গেল নিখুঁৎ।

অসিত সোৎসাহে বলল: "এ হেন প্রতিভা যে-মেয়ের সে কি না বলে—সংস্কৃত উচ্চারণ তার কাছে অপার সিন্ধু! তোর মুখে সংস্কৃতের এ-নিখুঁৎ লঘুগুরু উচ্চারণ যে কী অপরূপ শোনায় বুঝবি—যখন এটা গ্রামোফোনে দেওয়াব তোকে দিয়েই।"

ছায়া বাধা দিয়ে বলল: "হয়েছে গো দাদা হয়েছে। জয়ধ্বনি ঢের শুনেছি—অরুচি হ'য়ে গেছে—এখন শেখাও এর বাংলাটা, যার ঘুষের লোভে এ হেন অপকর্ম করতে আমি রাজি হয়েছি—মনে রেখো।"

অসিত ওর পিঠে দিলাশা দিয়ে বলল: "তবু মেয়ের বলাটি আছে থেকে থেকে মিড় দিয়ে যে উনি বো—ঝাতে পারেন না। যাহোক—আমি এবার শিষ্যা-দক্ষিণা দিতে বাধ্য—মান্‌ছি। গা' সঙ্গে সঙ্গে।" ব'লে অসিত গাইল, ছায়াও গুণ গুণ ক'রে শিখল:—

কুজনের কথা দুঃসহ—জানি, কুল রাখা ভালো—
মানি লো মানি,
মানি সে-চপল বঁধু অকরুণ, যমুনা সুদূর জানি লো জানি।
শুধাস নে সখি, সব ছেড়ে তবু কোথা ধাই, কেন ভুলি সকলি
হরি' মন প্রাণ যেমনি উজান সুরে "আয় আয়" ডাকে মুরলী।

অতঃপর অসিত শুধু শোনে—ছায়া ওর অতুলনীয় কণ্ঠে যখন তান দেয় আঁখরের সাথে:

(যখন) ডাকে বাঁশি "আয় আয়"
(তখন) ঘরে থাকা যে কী দায়,
(বল্) কী ক'রে বোঝাবো তোকে সখি
(আজো) শোনে নি যে বাঁশি হায়!

গাইতে গাইতে ছায়ার ডাগর চোখ দুটি বাষ্পাভাসে চিক চিক ক'রে ওঠে। সে হঠাৎ থেমে বলে: "আচ্ছা অসিদা, এ সব গানের মানে তো একফোঁটাও বুঝি না, অথচ বুকের মধ্যে এমন ক'রে ওঠে কেন বলতে পারো?"

অসিত (উৎসুক কণ্ঠে)—কেমন?

ছায়া (কুণ্ঠিত স্বরে)—জানি না। তবে মনে হয়—কী যেন পাবার আছে—অথচ—

অসিত: অথচ—কী?

ছায়া (একটু চুপ ক'রে থেকে): কী ক'রে বোঝাবো বলো? ঐ—ফের তুমি হাস্‌ছ। যা—ও। তুমি ভা—রি দুষ্টু। বেশ জানো এ বো—ঝানো যায় না—তাছাড়া—

অসিত: ও বাবা! এর পরেও 'তাছাড়া'?

ছায়া (রাগতঃ): তাছাড়া মানি—ঐ দেখ, তোমার বাঁকা হাসিতে ঘুলিয়ে গেল—কী বলতে যাচ্ছিলাম—রোসো, মনে পড়েছে। আমার বলবার উদ্দেশ্য—এ ধরণের ভাবভঙ্গি আমাদের মতন মনিষ্যির কাছে বেবাক্ অর্থহীন নয় কি?

অসিত: কী দুঃখে?

ছায়া (রাগতঃ): যা-ও জেগে ঘুমুলে জাগাবে কে?

অসিত: জেগে—?

ছায়া: নয়ত কী? বাক্যবাণ হানা ছেড়ে একটু ভেবে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে যে এ আমাদের মতন

সংসারীদের মনের কথা নয়—নয়—নয়। এ হ'ল উদাসীদের প্রাণের কথা—জন্ম-বৈরিগি যারা—তোমার মতন। কিন্তু এ-ছাঁচে গড়া যারা, তারা মাথা-গুন্তিতে কজন বলবে আমাকে? তোমারই শেখানো কীর্তনের ভাষায়—কোটিতে গোটিক—হ্যাঁ।

অসিত: ফের ডুবলি বিজ্ঞ হ'তে গিয়ে। কারণ উদাসী নয় কে? মনে কর যে বাউল গানটা গাইলি আজই সকালে: 'আমার মনের মাঝে মন রয়েছে সেথায় ফোটে খালি ফুল' (যদিও) 'সবাই বলে ওরে পাগল, এ শুধু তোর মনের ভুল।' (হেসে) কেবল মজা এই যে এখানে উল্টোটাই সোজা—কিনা আসামী পাগলই সুস্থ—মনের ভুল বলে যে ফরিয়াদি সে-ই পাগল।

ছায়া: তোমাকে নিয়ে পারবে কে ভাই? যেই সোজা কথায় কোন্ঠাশা হবে, সেই ধরবে তোমার ঐ হেঁয়ালির ভাষা—

অসিত: হেঁয়ালিটা কোন্‌খানে? তুই এইমাত্র বলছিলি না এসব গানে বুকের মধ্যে তোরও কেমন ক'রে ক'রে ওঠে, স্বচক্ষে দেখলাম—চোখ তোর জলে ভ'রে এল, সামলাতে পর্যন্ত পারলি নে—অথচ মেনে নিতে হবে এ গান তোর মনের ভাবের কোনো নাগালই পায় না?

ছায়া: থাক্ থাক্—হয়েছে। চোখে জল আসা এক, আর ঐ—ধরো তোমার এই গানটাতেই—'কোথা ধাই কেন ভুলি সকলি' গাওয়ালে তো আমাকে দিয়ে? আচ্ছা, কিন্তু আমরা কি সত্যি সংসার ছেড়ে যেতে চাই কখনো কোথাও—না, পারি যেতে—ইচ্ছে করলেও? তুমি দেখেছ কোনো অল্পবয়সী ছেলে কি মেয়েকে তোমার ঐ পাগলা বাঁশির ডাকে পাগল হ'য়ে ঘরছাড়া হতে?

অসিত একটু চুপ ক'রে চেয়ে থাকে ছায়ার চোখের দিকে। তারপর বলে: "যদি বলি দেখেছি?"

ছায়া চোখ মিট মিট ক'রে বলল: "আয়নায়?"

অসিতের মুখে ঈষৎ বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল: "না রে আমি যদি অত কম বয়সে যেতাম, তাহ'লে আজ কি এত পেছিয়ে থাকি? না, আমি বলছি আমার এক বন্ধুর ছেলের কথা। ছেলেটি হঠাৎ একদিন ভোরে চিরদিনের মত ঘর ছেড়ে এক কাপড়ে চলে এসেছিল—আমারই কাছে। আর মস্ত বড় মানুষের ছেলে সে—এমন নয় যে নিরন্ন হ'ল কৌপীনধারী।

ছায়া (উৎফুল্ল কণ্ঠে): কে অসিদা? বলো না ভাই? এর কথা তো কই বলো নি আমায় কক্ষণো?"

অসিত: তোকে কি আমি আমার দীর্ঘ বিচিত্র জীবনের সব কিছুই ব'লে ফেলেছি ভেবে ব'সে আছিস? তাছাড়া ছেলেটি আমাকে বলতে বারণ করেছিল যে।

ছায়া [অভিমানে): তা ব'লে আমাকেও বলবে না? যা—ও।

অসিত ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল সুর নামিয়ে: "আচ্ছা, বলি শোন্—যখন তুই শুনতে চাচ্ছিস এত ক'রে। কেবল কথা দে যে তুই বিশ্বাস করবি—মানে, ভাববি নে আমি বাড়িয়ে বলছি।"

ছায়ার চোখ জলে ভ'রে এল: "যাও অসিদা, তোমার সঙ্গে আর কথা কব না।" ব'লে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে যায় আর কি।

অসিত ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে কাছে টেনে বলল: "আহা, ঠাট্টাও বুঝিস নে? শোন্। ছেলেটির কথা ভাবলে এত বয়সেও আমি যে আমি—তোদের ভাষায় নির্মম উদাসী—তার পাষাণ প্রাণও ভিজে টস টস ক'রে ওঠে। তাছাড়া কি জানিস দিদি, এসব কথা বলার লগ্নটি খুব সহজে বেজে ওঠে না আমাদের দৈনন্দিন জীবনে।"

ছায়া আদর পেলেই গঙ্গাজল: অভিমান ভুলে অসিতের চোখে চোখ রেখে বলে: "কিন্তু কেন ওঠে না অসিদা—যদি আমাদের প্রত্যেকের মনের মাঝে যে উদাসী মনটি লুকিয়ে আছে সে—তোমার ঐ গানের ভাষায়—'অচিন ফুলের' পথ চেয়েই দিন গোণে?"

অসিত ছায়ার দিকে চেয়ে একটু হাসে হাসে: "হুঁ। বেশ বড় হয়েছিস দেখছি এরি মধ্যে।"

ছায়া রাগ করে ফের: কেবল ঠাট্টা! না অসিদা, যতই বলো না তুমি—আমাদের তুমি মানুষের মধ্যেই ধরো না।

অসিত ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে বলে: "এমন কড়া কথা কি মানায় দিদি, অমন নরম জিভে?—বিশেষ আমার এই মাত্র বলবার পরে যে আমি তোকে বলছি তার কথা।"

ছায়া রাগ ভুলে বলে: "তা হবে না—আগে প্রশ্নের উত্তর চাই—ভালো কথা বলতে এত খারাপ লাগে কেন মানুষের?"

অসিত বলে: "গল্পটা বললে এক ঢিলে দুই পাখিই মরবে—শোন্।" ব'লেই চুপ। ঘরে শুধু ঘড়ির টিক্ টিক্ টিক্—আর ছায়া সতৃষ্ণ নেত্রে চেয়ে থাকে অসিতের মুখের পানে।

(ক্রমশঃ)

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছি, দেখি পথের ধারে দু'সারি লোক নানারকম সেজেগুজে চলেছে, মেয়েরা পরেছে মোটা মোটা দৃষ্টি আকর্ষণকারী গহনা, জমকালো রঙের পোষাক ও রংবেরংএর রকমারি টুপী—যেন রাস্তাভরা বহুরূপী। ঘুরে বেড়িয়ে ১টার সময় হোটেলে ফিরলাম। লিফ্‌টম্যান্‌ আমাদের দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে যে সে ভারতবর্ষে গিয়েছিল, কোলকাতা দেখেছে, সেখানকার ব্যারাকপুর, "ক্যাচড়েপাড়া" ও কাঁপো সবই জানে; সুতরাং ভারতবর্ষের বিষয়ে মস্ত authority। এখানকার যত লিফ্‌টম্যান, পোর্টার, দোকানদার, ট্যাক্‌সি-চালক ইত্যাদি helper শ্রেণীর লোক আছে, সবাই তারা এই মহাযুদ্ধে সৈনিকের কাজে নেমে পড়েছিল। যুদ্ধের সময়কার কল্‌কাতার দৃশ্য মনে পড়লো, যখন এই সব বীর যোদ্ধার দল সহরের পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াত, সহরবাসীদের অতিষ্ঠ করে তুলে। আজ বিকেলে রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী নিখিলানন্দের সংগে আমরা দেখা করতে গেলাম। স্বামিজী ১৭ বৎসর এইখানে আছেন, মানুষটি বড়ই ভালো। সেখানে কয়েকজন আমেরিকান ভক্তবৃন্দের সাথে আলাপ পরিচয় হ'ল, তাঁরা খুব যত্ন করে আমাদের চা খাওয়ালেন। একজন বর্ষীয়সী মহিলা (Mrs. Davidson) মোটর চালিয়ে আমাদের সহর দেখাতে নিয়ে গেলেন। পথে Empire State Building দেখলাম, আমেরিকার skyscraper অট্টালিকাগুলির মধ্যে এই বাড়ীটিই হ'ল সবচেয়ে উঁচু, ১০২ তলা। Manhaltam দ্বীপে, নদীর ধারে, চওড়া বাঁধান রাস্তাগুলিতে বেড়াতে আমাদের খুব ভালো লাগছিল। Speedway রাস্তাটি অতি সুন্দর। হাড্‌সান, ইষ্ট ও হায়লেম নদীগুলি এই দ্বীপটিকে ঘিরে রয়েছে। থাকে থাকে সাজান রাস্তাগুলি একটার পর একটা উপরে উঠে গেছে; অসংখ্য মোটর গাড়ী এক রাস্তায় চলেছে, ফিরছে অন্য রাস্তায়। বিনা বাধায় গাড়ী ছুটেছে, দুর্ঘটনার ভয় নেই। আমি Mrs Davidsonএর পাশে বসে গল্প করছি; কথায় কথায় হাসপাতালের কথা উঠতে তিনি বল্লেন যে নার্স সমস্যা এখানে বড় জটিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুনলাম এখানে নার্সদের শিক্ষার দু'রকম ব্যবস্থা রয়েছে,—প্রথম শ্রেণীর নার্সদের সমস্ত কিছু শিক্ষার সাথে ডাক্তারী বিদ্যাও কিছু শিখতে হয়। হাসপাতালে অপারেশনে সাহায্য করা, এনেস্থেসিয়া দেওয়া ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এরাই করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নার্সরা সেবিকা-বিশেষ, রোগ পরিচর্য্যা করা ও রোগীকে সেবাশুশ্রূষা করাই হ'ল এদের প্রধান কাজ। এরা হাসপাতালেও কাজ করে এবং গৃহস্থের বাড়ীতেও রোগীর সেবা করতে যায়। এদের বেতন অপেক্ষাকৃত কম। যন্ত্রযুগের কল্যাণে মেয়েরা সব নার্সিংএর কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকারখানার কাজে ও অফিসে যোগ দিয়েছে, যেহেতু সেখানে পয়সা বেশী ও খাটুনী কম। ফলে হাসপাতালে আর নার্স মেলে না।

নিউইয়র্কের বন্দর থেকে বাইরের দৃশ্য

২১শে মে। আজ দুপুরে রামকৃষ্ণআশ্রমে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ। Mrs Davidson বাংলা রান্না রেঁধে খাওয়াবেন। বেলা প্রায় ১০টার সময় Miss Hilde, আশ্রমের অন্যতম শিষ্যা, আমাদের সাথে নিয়ে Subway trainএ করে Museum of Natural History দেখাতে নিয়ে গেলেন। এদেশে Subway train Tram ও Busএ টিকিট কেনার ঝামেলা নেই, নির্দ্দিষ্ট Slotএ একটি Dime (১০ সেণ্ট) ফেলে দিলেই হ'ল। আমরা Museumএ এসে প্রথমে আফ্রিকার জীবজন্তু-কক্ষে ঢুকলাম। ঘরের দেয়ালে কাচের শো কেসে মরা জীবজন্তুগুলি তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জীবন্তের মত সাজান রয়েছে। এই দৃশ্যগুলিতে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার চিত্র পরিষ্কার দেখান

হয়েছে। পাশে দেয়ালের গায়ে আফ্রিকার ম্যাপ আঁকা ও প্রাণীগুলির জীবনেতিহাস লেখা। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীতে হল্ ভর্ত্তি। আমরা আরও কয়েকটা দেশের জীবজন্ত দেখে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আশ্রমে বাংলা রান্না খেয়ে যে কি আনন্দ হ'ল তা' বলতে পারি না। বিকেলে Mrs Davidson সহরের অপরদিকটা দেখাতে নিয়ে গেলেন।
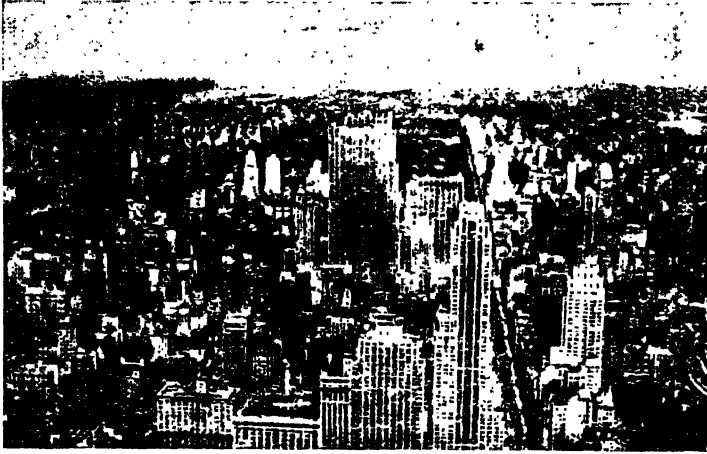
১০২ তলার ছাদ থেকে নিউইয়র্ক শহরের দৃশ্য
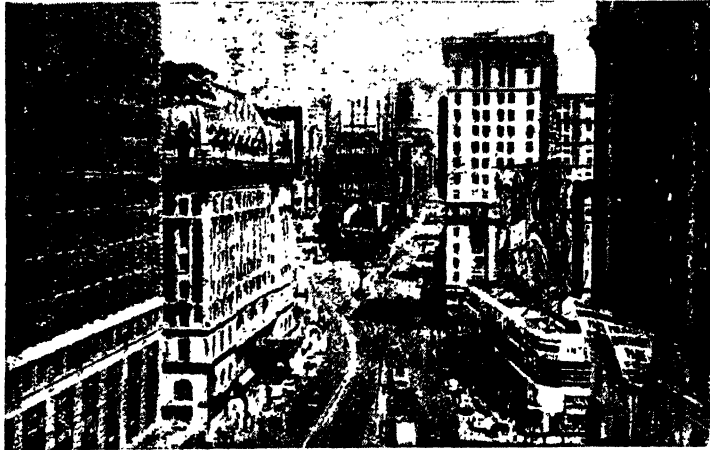
নিউইয়র্ক শহরের রাজপথে

এখানকার International House মস্ত বড় বাড়ী; সেখানে প্রায় ২০০ জন বিদেশী ছাত্রছাত্রী রয়েছে; তার মধ্যে ভারতীয়ও দেখলাম। আধুনিক সহর পেরিয়ে আমরা প্রাচীন নিউইয়র্কের দিকে এলাম। সরু গলির দু'ধারে ৪০।৫০ তলা বাড়ীগুলি আকাশ ফুঁড়ে বিরাট প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার রং কালো, বাড়ীগুলি ধোঁওয়ায় ময়লায় একেবারে কালো হ'য়ে গেছে, আলো হাওয়া ঢোকবার কোন পথ নেই, তাই দিনরাত অন্ধকার রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। কি বিশ্রী জায়গা, গলির ভিতর বেশীক্ষণ থাকলে মাথা ঘুরে ওঠে। এখান থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা Hudson নদীর নীচে Holland Tunnelএর ভিতর ঢুকলাম। ভিতরে নদীর স্রোতের গম্‌গম্ আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় দেড় মাইলব্যাপী টানেল পারহ'য়ে ওপারে New Jersey Stateএর New Jersey cityতে এসে পড়লাম। New Jersey ছোট সহর, এখানে সবুজ মাঠের মাঝে ছোট ছোট বাড়ীগুলি সাজানো ঠিক ছবির মতই দেখতে। সবুজ ঘাসের মাঝে রংবেরংএর ফুলের বাহার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এপার থেকে ওপারে নিউইয়র্কের skyline বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে মিসেস ডেভিডসান হঠাৎ বলে উঠলেন "দেখুন তো ওপারে কেমন জেলখানা তৈরী হয়েছে।" কথাটা শুনে মনে হ'ল তুলনাটা নেহাৎ মন্দ নয়—গরাদের মত সরু সরু উঁচু বাড়ীগুলিতে মানুষ ঠেসে ভরা হয়েছে, আর সহরের যন্ত্র-সভ্যতার চাপে বন্দী হ'য়ে তারা হ'য়ে উঠেছে একেবারে কৃত্রিম যান্ত্রিক মানুষ।

২২শে মে। সকালে প্রথমেই গেলাম State Dept-এর অফিসে। নিউইয়র্ক থেকে আমরা Washington-এ যাব। তারজন্য যথাযথ ব্যবস্থা State Dept থেকেই করা হ'চ্ছে। এদের সাহায্য পেয়ে আমাদের ঘোরাফেরার খুবই সুবিধা হয়েছে। কাজ সেরে সেখান থেকে বেরিয়ে একটি Cafetaria তে ঢুকলাম। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত এই সব খাবার ঘরগুলি জনসাধারণের অশেষ কল্যাণও সুবিধার কারণ হয়েছে। আমেরিকার খাদ্যাদি অতি উৎকৃষ্ট, যেমন সুস্বাদু তেমনই পুষ্টিকর। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত প্রত্যেকটি জিনিষই বিশেষ সারবস্তুযুক্ত। গভর্ণমেন্টের কড়া আইনের চাপে ভেজালের কারবার এদেশে ঢুকতে পারেনি। খাবার ঘরটি প্রায় পুরো

কাঁচেরই। দরজাগুলি এক একটি কাঁচের তৈরী। ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীলের ঝকঝকানিতে চোখ ঝল্‌সে যায়। যন্ত্রের সাহায্যে খাবার ডিশগুলি অতি অল্প সময়েই প্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়ে আসছে। এই Cafetaria গুলিতে টেবিলে খাবার দেবার জন্য কোন ওয়েট্রেস থাকেনা, নিজেদেরই ট্রেতে খাবার সাজিয়ে টেবিলে এনে বসে খেতে হয়। বন্দোবস্ত এত সুন্দর যে তাতে কোন অসুবিধা নেই। হাজার হাজার লোক এখানে অনবরত খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এক একটি মাংসের ডিশ, টাটকা ষ্ট্রবেরী আইস্‌ক্রীম কিছু ও কফি এক এক কাপ নিয়ে আমরা বসলাম। এখানে স্বাস্থ্যের দিকেও সরকারের যথেষ্ট নজর। এই সব খাবার ঘরগুলিতে কাগজের বাসনের ব্যবহারই বেশী। কাঁচের বাসন ও ছুরিকাঁটাগুলি একবার ব্যবহারের পরই যন্ত্রের ভিতর ফুটিয়ে বিশুদ্ধ ক'রে নেওয়া হয়। দৈনিক প্রতি দোকানে কাগজের খরচা প্রচুর। গেলাস থেকে আরম্ভ করে সিগারেটের ছাইদানি পর্য্যন্ত কাগজের তৈরী। এগুলি একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়া হয়। আজ রাতে Dr. Taylor-এর বাড়ী ডিনারে নিমন্ত্রণ আছে। Dr. Taylor Columbia University-র একজন বিশিষ্ট প্রফেসার ও আমেরিকার খ্যাতনামা স্ত্রীচিকিৎসক। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রী দুজনে থাকেন; নিখুঁত পরিপাটী সংসার। সহরে জীবনের ঘোলাটে আবহাওয়ার মাঝেও যে এই রকম সাদাসিধে ধরণের সুখী পরিবার থাকতে পারে, তা ধারণা ছিলনা। ডাক্তারের সাথে খুব গল্প জমলো, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক অনেক তথ্য আলোচনা হ'ল।—শুনলাম নিউইয়র্কে ৭০ লক্ষ লোকের বাস। আলাপ পরিচয়ের পর তাঁদের ঐ ছোট বাড়ীটিতে অতিথি হ'য়ে থাকার জন্য আমাদের অনেকবার বল্লেন। এঁরা ভারতবর্ষের বিষয় বিশেষ কিছু জানেন বলে মনে হল না। শুনলাম এখানে ভারতের বিষয়ে বিশেষ কোনও বইও নাকি নেই। মাসিক পত্রিকাগুলিতে মাঝে মাঝে ভারতের খবরাখবর কিছু বেরোয়, সেইটুকুই যা পড়েন। মিসেস টেলার একখানি "Life" পত্রিকা এনে আমায় দিলেন, পাতা উল্টে দেখি তাতে লেখা রয়েছে—ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র যে বেদবেদান্ত, সে সকল নাকি ২০০ বৎসর আগে ইংরাজ ভারতে আসবার প্রাক্কালেই রচিত হয়েছে। মনে মনে ভাবলাম এই হাস্যকর প্রপাগাণ্ডাটি খোকা বোঝাবার পক্ষে সুন্দর হয়েছে, কিন্তু এখানে হাসবার লোকের বড়ই অভাব। এঁরা তো মহা গুরুত্বের সঙ্গে ঐ সকল জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন। এদেশে আর একটা প্রশ্নের বিশেষ আন্দোলন চলছে—সেটি হ'ল হিন্দুদের "Caste System"। আমার কপালে কুঙ্কুম টিপ্ দেখে মিসেস্ টেলার জানতে চাইলেন যে ওটা কোনো Caste-এর চিহ্ন কিনা। আমি যখন উত্তরে বললুম, যে ঐ ফোঁটার সাথে Caste এর কোন সম্বন্ধই নেই, বরং তাঁদের ভাষায় ঐটাকে Beauty Spot বলা চলে তখন তিনি বিষম ধাঁধাঁয় পড়লেন। ইতিমধ্যে খাবারের ডাক পড়ল। সাদাসিদা ধরণের একপদ রান্না খেয়ে আমরা অল্প একটু পরেই বিদায় নিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা রামকৃষ্ণ আশ্রমে গেলাম। স্বামিজী তখন মন্দিরে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর মাঝে গীতার ব্যাখ্যা করছিলেন। স্বামিজীর অনুরোধে উপাসনা শেষে দুই একটী ভজন ও কীর্ত্তন গান গাইলাম। তিনি তো খুব খুশী; বিদেশী ভক্তবৃন্দ কিছু না বুঝতে পেরেও আমায় খুব আপ্যায়িত করে, বল্লেন "আজ সন্ধ্যায় ভারতকে তুমি আমেরিকায় এনেছ।" রাত প্রায় ১১টার সময় ট্যাক্‌সি নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম।

২৩শে মে। আজ বেলা ১টার সময় এখানকার Planatorium দেখতে গেলাম। কি ভাবে এই সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রের চলাচল ঘটে এবং কি নিয়মে তারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেই সকল বিষয় দেখাবার জন্যই এই শিক্ষা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। গোলাকার বাড়ী; দুই তলা উঁচু। আমরা নীচের তলায় একটী গোল ঘরে গিয়ে বসলাম। চারিদিকে নীল দেওয়ালের গায়ে নক্ষত্রগুলি আঁকা। উপরে সিলিঙেতে সৌরজগতের গ্রহগুলি ইলেক্‌ট্রি্কে ঘুরছে। একজন এট্রনমার লাউডস্পীকারের ভিতর দিয়ে সমস্ত সৌরজগৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করছেন। ইস্কুল কলেজের বহু ছেলেমেয়ে রয়েছে। অবসর সময়ে তাদের পিতামাতারাও এই সকল বিষয় শুনতে ও দেখতে আসেন। এই কঠিন জটিল তত্ত্বটি অতি সোজা ভাবে চোখের সামনে পরিষ্কার দেখিয়ে দেওয়া হয়, শিশুরা ছোট থেকেই এই সকল বিষয় ভাবতে শেখে। আমরা দোতলায় গিয়ে আরেকটি গোল ঘরে ঢুকলাম। ঘরের চারিদিক কালো কাপড়ে মোড়া। গোল দেওয়ালের ধারে ধারে ছোট ছোট

R. C. A বিল্ডিংএর ছাদ থেকে নিউইয়র্ক শহরের উত্তর দিকের দৃশ্য

খেলনার মত নিউইয়র্কের বাড়ীগুলি সাজানো। সাদা ধবধবে ছাদটি গোলাকার ও খুব উঁচু। ঘরের মাঝে একটি প্রকাণ্ড জার্মান যন্ত্র রয়েছে। যথাসময়ে দরজা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করা হ'ল। সাদা ছাদটি নীল আকাশ হ'য়ে উঠল, সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে নিউইয়র্কের
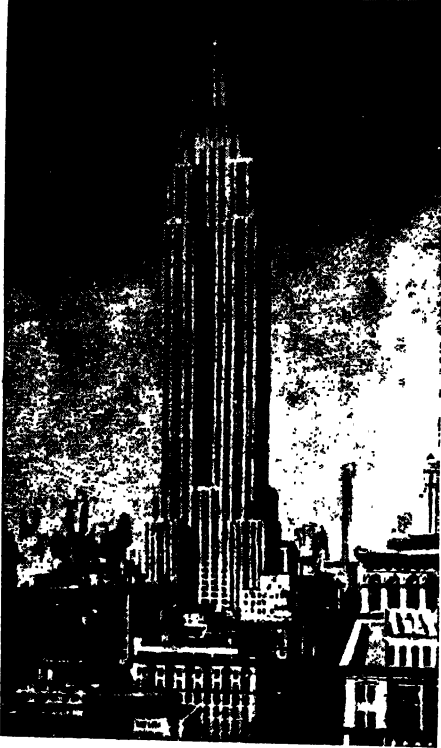
এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং (১০২ তলা) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী

বাড়ীগুলির আড়ালে অস্ত গেলেন, অসংখ্য-গ্রহনক্ষত্র অন্ধকার রাতে আকাশে ফুটে উঠলো।

আকাশে সূর্য্য-গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ কি কারণে কেমন করে হয়, তা অতি প্রাঞ্জল-ভাবে একজন অধ্যাপক সবিস্তারে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। শেষ হ'তে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, দরজার সামনে প্রকাণ্ড একটি উল্কা (Meteor) রয়েছে ;—দেখতে যেন পালিস করা চকচকে একতাল লোহা। ঘরের চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট উল্কা ও (মীটিওর) রয়েছে দেখলাম। শুনলাম এই বছরেই নাকি গ্রহ সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর উপর আরেক খণ্ড উল্কা (মীটিওর) এসে পড়েছে। প্লেনেটেরিয়ম থেকে বেরিয়ে রামকৃষ্ণ আশ্রমে গেলাম, সেখানে রাতে আহার করার কথা।

২৪শে মে। আজ সকালে আবার একবার State Dept. এর officeএ যাওয়া গেল। সেখানে Miss Belt এর কাছে শুনলাম যে এখানকার "Macys" দোকানটিতে পীন থেকে এ্যারোপ্লেন অবধি সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায়। সারা আমেরিকার যাবতীয় তৈরী মাল নিউইয়র্কের এই দোকানটিতে মেলে। কাজ সেরে Macyতে যাওয়া গেল। মস্ত বড় Skyscraper ; তার ভিতর ১৬৮টা বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, প্রত্যেকটিই এক একটি স্বতন্ত্র দোকান-বিশেষ। দৈনিক এখানে প্রায় দেড় লক্ষ লোক জিনিষ কিনে থাকে। দেশ-বিদেশের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে ৭০০ জন guide নিযুক্ত রয়েছে। এদের ভিতর ২৯টি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার Interpreter আছে। এই বাড়ীটি শুধু যে Skyscraper তা নয়, মাটির নীচেও তিন তলা পর্য্যন্ত নেমেছে। দোকানের ভিতরে লোক যাতায়াতের জন্য ৫৫টি Elevator ও ৫৮টি Escalator আছে। সেখান থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরলাম। বিকেলে Alice in wonderland থিয়েটার দেখতে গেলাম। হলিউডের একজন বিশিষ্টা অভিনেত্রী Alice এর অংশে অভিনয় করলেন ; এমন চমৎকার স্বাভাবিক অভিনয় আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই ;—অদ্ভুত অভিনয় ক্ষমতা !

২৫শে মে রবিবার। আজ সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে ঘরেই কাটালাম। রাতে ওকলাহামা থিয়েটার দেখতে গেলাম। এখানকার বড় বড় থিয়েটারগুলিতে হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনিয়ে বিশিষ্ট অংশে নামানো হয়। ওকলাহামার নিম্নশ্রেণীর (Slang) কথা-যুক্ত গান ও কথোপকথন না বুঝলেও, এমন চমৎকার প্রকাশভঙ্গী ও ভাবার্থ ফুটে উঠছিল যে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। অর্কেষ্ট্রার সাথে গান গুলি অতি সুমধুর লাগল। বিভিন্ন রংএর সমাবেশে দৃশ্যগুলি খুব সজীব দেখাচ্ছিল। (ক্রমশঃ)

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিংসফোর্ড-হত্যার তদন্তপ্রসঙ্গে পুলিশ কিন্তু এক বিরাট্ ষড়্‌যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং তাহারই ফলে ১৯০৮ সালের ২রা মে তারিখে মাণিকতলার মুরারিপুকুর বাগানে হইল খানাতল্লাস। খানাতল্লাসীর ফলে বহু বোমা, বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম, কার্তুজ, পিস্তল প্রভৃতি পুলিশের হস্তগত হইল। ইহা ব্যতীত প্রফুল্ল চাকীকে (দীনেশ) মজঃফরপুরে প্রেরিত টাকার একটি মণিঅর্ডার রসিদ (৮ই এপ্রিল তারিখযুক্ত) এবং মজঃফরপুরের যে ধর্ম্মশালায় প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ছিলেন—সেই ধর্ম্মশালা ও কিংসফোর্ডের বাংলোর নক্সাও পুলিশ ঐখান হইতে পাইল।

ঐ বাগানেই যাঁহারা গ্রেপ্তার হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। শ্রীঅরবিন্দকেও সেইদিন রাত্রেই তাঁহাদের গ্রে ষ্ট্রীট ও রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের বাটী হইতে গ্রেপ্তার করা হইল। এইভাবে নানা স্থান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া মোট ৩৬জনের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়—তাহাই আলিপুর বোমার মামলা নামে পরিচিত। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে সকলকে অভিযুক্ত করা হইল। এই মামলার শুনানী চলিয়াছিল এক বৎসর ধরিয়া এবং অভিযুক্তদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সরকার পক্ষে ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন।

ইতিমধ্যে ১৯০৮ সালের ৮ই জুন তারিখে ভারত সরকার সংবাদপত্র-আইন ও বিস্ফোরক আইন আইন-পরিষদে পাশ করাইয়া লইলেন। পরিষদের একদিনের অধিবেশনেই উপরোক্ত আইন দুইটি পাশ হইয়া গেল। বিস্ফোরক আইনে শাস্তির এই বিধান রহিল যে, কাহারও নিকট বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে। সংবাদপত্র-আইনে কোনও সংবাদপত্রে হিংসাত্মক ক্রিয়া-কলাপে উৎসাহদানমূলক রচনা প্রকাশিত হইলে মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত এবং সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি বাতিল করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল; সম্পাদক ও মুদ্রাকরের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তো হইলই।

মেদিনীপুরের বিখ্যাত কর্ম্মী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্তদের অন্যতম। তাঁহার কথা কিছু কিছু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। স্বর্গত রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত অভয়চরণ বসুর সপ্তম সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই স্বদেশী ভাবধারায় মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার জননীর নাম তারাসুন্দরী বসু। ১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই রবিবার তাঁহাদের মেদিনীপুরের বাড়ীতে সত্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। অভয়চরণ ছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

শৈশবকালেই সত্যেন্দ্রনাথের মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট ছাত্র হিসাবে তিনি বিদ্যালয় হইতে বহু পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে নির্ভীক তেজস্বিতা, সত্যপ্রিয়তা ইত্যাদি গুণসকল বিকাশলাভ করিতে থাকে। তাঁহার আন্তরিক অকপট ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত।

১৮৯৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৮৯৯ সালে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সিটি কলেজে বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সহসা তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা অতিশয় খারাপ হইয়া পড়ায় চিকিৎসকদের ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁহার জননী তাঁহাকে লইয়া

কানাইলাল দত্ত

বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিন ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৯০২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে যোগদান করেন। যে গুপ্ত-সমিতিটি তখন সবেমাত্র মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে তিনি দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন।

সেই সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি কুস্তীর আখড়ায় সকলকে নানাবিধ কসরৎ শিক্ষা দেওয়া হইত। সত্যেন্দ্রনাথের চেষ্টা ও যত্নে রাজনৈতিক আন্দোলন মেদিনীপুরে দ্রুত প্রসারলাভ করিতে লাগিল।

কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডে গুপ্ত-সমিতির যে কেন্দ্র স্থাপিত ছিল, কিছুদিন পরে সত্যেন্দ্রনাথ আসিয়া তাহাতে যোগদান

করিলেন। নানা কারণে কিন্তু কলিকাতায় তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না—তাই মেদিনীপুরেই আবার তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। সংসারের আর্থিক অবস্থা এই সময় অস্বচ্ছল হইয়া পড়ায় খড়্গপুরে কেল্‌নার কোম্পানির হোটেলে একটি কেরাণীগিরির চাকুরী লইয়া তিনি খড়্গপুরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু মেদিনীপুরে রাজনৈতিক আন্দোলনও অনেকটা নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

কেল্‌নার কোম্পানির চাকুরী ত্যাগ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ যখন মেদিনীপুরের কালেক্টরিতে কেরাণীগিরির চাকুরী লইয়া পুনরায় মেদিনীপুরে গেলেন, তখন দেশব্যাপী বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আবার নূতন করিয়া মেদিনীপুরে একটি বিপ্লবীকেন্দ্র স্থাপিত করিলেন—তাহার ছদ্ম নাম হইল তাঁতশালা। সেখানে তাঁতে কাপড় বুনার ভাণ করা হইত—কিন্তু আসলে সেটি ছিল বিপ্লবীদের মিলিত হইবার ও পরামর্শ করিবার একটি আড্ডা। ক্ষুদিরামও এই তাঁতশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিদেশী বস্ত্র ও লবণ নষ্ট করিয়া দেওয়া, পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা, কার্য্যে বাধাদানকারীদের সমুচিত শাস্তি-বিধান—ইত্যাদি নানা বিষয়ের পরিকল্পনা এই তাঁতশালাতেই রচিত হইত। সকল পরামর্শ ও কার্য্যেই সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান। পরবর্ত্তীকালে "ছাত্রভাণ্ডার" স্থাপিত হইলে তাঁতশালার অস্তিত্ব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়।

গুপ্ত-সমিতির তত্ত্বাবধানে লাঠি খেলা, অসি খেলা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সদস্যদিগকে রিভলবার চালনাও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথের বন্দুকটি লইয়া সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে আখড়ায় উপস্থিত হইতেন। যুবকদিগের উদ্দীপনা তাহাতে বৃদ্ধি পাইত।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের দ্বারা মজঃফরপুর-হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার পর সত্যেন্দ্রনাথদের বাটীতে খানাতল্লাস হইল এবং কিছু কিছু জিনিষ পুলিশ লইয়া গেল। সত্যেন্দ্রের সহিত ক্ষুদিরামের যোগাযোগের বিষয় পুলিশের অজানা ছিল না; ক্ষুদিরামের নিকট যে পিস্তল পাওয়া গিয়াছিল—পুলিশের ধারণায় তাহা নাকি সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া। খানাতল্লাসীর পর বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখার অপরাধে পুলিশ সত্যেন্দ্রনাথকে ধরিয়া লইয়া গেল। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নেলসনের এজলাসে বিনা অনুমতিতে অস্ত্র-রক্ষা ও উহা লইয়া প্রকাশ্যে ভ্রমণ ইত্যাদি অভিযোগে তাঁহার দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইল। দণ্ডপ্রাপ্তির পর তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলেই রাখা হইয়াছিল। অবশেষে আলিপুর বোমার মামলার সহিতও যখন তাঁহার যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়, তখন সেই মামলাতেও তাঁহার বিচারের জন্য তাঁহাকে লইয়া আসা হয় আলিপুর জেলে।

আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আর একজন ছিলেন কানাইলাল দত্ত। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে ১৮৮৭ সালের জন্মাষ্টমী তিথিতে মাতুলালয় চন্দননগরে কানাইলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গত চুনীলাল দত্ত বোম্বাই-এ Marine-বিভাগের হিসাব-রক্ষক ছিলেন এবং তাঁহার নিকটই কানাইলালের বাল্যজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহার মাতার নাম ব্রজেশ্বরী দেবী। কানাইলালের পৈত্রিক বাড়ী শ্রীরামপুরে।

১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত সময়ের বেশির ভাগই বোম্বাই-এ কাটাইয়া ইহার পর কানাইলাল চন্দননগরে আসেন এবং ডুপ্লে কলেজ হইতে প্রবেশিকা ও এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডুপ্লে কলেজে অধ্যয়ন কালে অধ্যাপক চারু রায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মন বিপ্লবের পথে ধাবিত হয়।

হুগ্‌লী কলেজে ইহার পর তিনি ইতিহাসে অনার্স সহ বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৯০৮ সালে বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পর আলিপুর বোমার মামলার সংশ্রবে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনার্স সহ তাঁহার বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ যখন প্রকাশিত হয়—তখন তিনি জেলে।

কানাইলালের সাহসিকতার সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। কোনও একটি চট কলের মাতাল ফিরিঙ্গীদের উৎপাতে সেখানকার লোকেরা একবার অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কানাইলাল প্রথমে তাহাদের সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের চৈতন্যোদয় না হওয়ায় শেষে একদিন তাহাদের দুই জনকে ধরিয়া উত্তম-মধ্যম প্রহার করেন। তবে তাহাদের খানিকটা শিক্ষালাভ হয়।

১৯০৭ সালে কোন একটি সার্কাস দল চন্দননগরে খেলা দেখাইয়া টাকা লুটিবার ফন্দি করে। কানাইলাল তাঁহার দলবল লইয়া গিয়া প্রথমে ভাল কথায় দলের ম্যানেজারকে সেখান হইতে সার্কাস উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; ম্যানেজার তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না এবং দুইপক্ষে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইল। উদ্ধত ম্যানেজারকে শেষ পর্য্যন্ত প্রহারের দ্বারা শান্ত করিতে হইল।

বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পর বিপ্লবীদলে যোগদান করিবার জন্য কানাইলাল যখন চাঁপাতলায় "যুগান্তর"-কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন—তখন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার শরীর অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি যাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, সেই জন্য বিপ্লবীরা তাঁহাকে পুরী পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন পরে পুরী হইতে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে কলিকাতায় এখানে-ওখানে কয়েকদিন রাখিয়া শেষে ভবানীপুর-কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিপ্লবীদের সেখানে বোমা তৈয়ারী শিখান হইত।

এই ভবানীপুর-কেন্দ্রে থাকিতেন সামান্য কয়েকজন যুবক—তাঁহাদের যা কিছু কাজ, তাহা তাঁহাদিগকে নিজেদেরই করিয়া লইতে হইত। হেমচন্দ্র দাস মধ্যে মধ্যে ঐ বাটীতে গিয়া ইঁহাদিগকে বোমা তৈয়ারীর প্রণালী শিক্ষা দান করিতেন।

শীঘ্রই কিন্তু বাড়ীটির উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়িল এবং বিপ্লবীরা তাঁহাদের নজর এড়াইবার জন্য ১৫নং গোপীমোহন দত্তের লেনে উঠিয়া গেলেন। সেখানেও কিন্তু গোয়েন্দাদের দৃষ্টি পড়িতে বিলম্ব হইল না।

মজঃফরপুর-হত্যাকাণ্ডের পর ২রা মে তারিখে পুলিশ গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ী খানাতল্লাস করিল। নানা জিনিষপত্রের সহিত অপর একজন সঙ্গী সহ কানাইলাল ঐ বাড়ীতেই ধৃত হইলেন। অন্যান্য ধৃত ব্যক্তিদের সহিত আলিপুর জেলে তাঁহাকে রাখা হইল। ঐ আলিপুর জেলেরই বর্ত্তমান নাম হইয়াছে প্রেসিডেন্সি জেল।

মামলা চলিতে থাকা কালে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামে দলের একটি যুবক সহসা রাজসাক্ষী হইয়া দাঁড়াইল। সে ছিল শ্রীরামপুরের জনৈক ধনী জমিদারের একমাত্র পুত্র। প্রথম জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার চরম করিয়া হঠাৎ একদিন তাহার বিপ্লবী হইবার সখ হয় এবং কোনও মতে বিপ্লবী দলে প্রবেশলাভ করে। অনেকে অনুমান করেন যে, প্রথমাবধি সে গুপ্তচররূপেই বিপ্লবী দলে প্রবেশ করিয়াছিল ; সে সম্বন্ধে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রমাণ নাই।

যাহা হউক, জেলে গিয়া গোঁসাই উপলব্ধি করিল যে, বিপ্লবী সাজার ঠেলা সামান্য নয়। তাহার সখের বিপ্লববাদ অল্পদিনের মধ্যেই হাওয়ায় উবিয়া গেল এবং যে কোন উপায়ে জেল হইতে মুক্তি লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার বিলাসী আরামপ্রিয় জীবনে জেলের কষ্ট সহ্য হইল না। ইহার পর তাহার পিতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যখন রাজসাক্ষী হইয়া তাহার পরিত্রাণলাভের একটা উপায় নির্দ্দেশ করিলেন—তখন সে তাহাতেই রাজি হইল।

ইহার পর হইতে নরেনের সহিত মধ্যে মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পুলিশ-কর্ত্তাদের সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল। অপরাপর ধৃত বিপ্লবীদেরও ইহা অজানা রহিল না। তাঁহারাও শুনিলেন ও বুঝিতে পারিলেন, নরেন রাজসাক্ষী হইতে চলিয়াছে। নরেন গোঁসাই-এর বুদ্ধি কিন্তু তীক্ষ্ণ ছিল না। সে মনে করিত, অন্যান্য বিপ্লবীরা তাহার চালাকী বুঝিতে পারে নাই। তাই ভিতরের নানা খবর জানিবার জন্য সে যখন মাঝে মাঝে হঠাৎ কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া কথাচ্ছলে ইহাকে-উহাকে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তখন অন্যান্য বিপ্লবীরা মনে মনে করুণার হাসি হাসিতেন। কাল্পনিক উত্তর দিয়া কৌতুক করিতেও অনেকে ছাড়িতেন না।

নরেনের এই ঘৃণিত আচরণে বিপ্লবীরা তাহার উপর খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। তরুণ বিপ্লবীরা বিশেষ করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। নরেনের সহিত একত্র থাকা কালে সুশীল সেন প্রভৃতি তো জেলের মধ্যেই তাহাকে ইট মারিয়া বা তাহার গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন! দুই-একজনের হাতে নরেন নিগৃহীতও হইল। আদালতে যাতায়াতের সময় সুবিধামত কোনও একস্থানে নরেনকে হত্যা করিবার জন্য জেলের বাহিরে অবস্থিত বিপ্লবীদের প্রতি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তাহাতে অবশ্য কোনও কাজ হয় নাই।

সকলেই কিন্তু বিশেষভাবে ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, নরেনের জীবন যথেষ্ট সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নিরাপত্তার জন্য কর্তৃপক্ষ তাহাকে অন্যান্য কয়েদীদের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া ইউরোপীয় ওয়ার্ডে সরাইয়া দিলেন এবং দুইজন ইউরোপীয় কয়েদীকে তাহার রক্ষী করিয়া দেওয়া হইল। নরেন কোথাও যাইলে তাহাদের কেহ না কেহ তাহার সঙ্গে থাকিত।

আলিপুর জেলে আনীত হওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ পীড়া প্রভৃতির জন্য বরাবর জেলের হাসপাতালেই অবস্থান করিতেছিলেন। নরেনের রাজসাক্ষী হওয়ার সংবাদটা একদিন তাঁহার কানেও গেল ; তিনি চিন্তিত হইলেন। যাঁহারা ধৃত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা ধৃত হন নাই—তাঁহাদের কত বড় সর্ব্বনাশ যে নরেন গোঁসাই করিতে যাইতেছে, তাহা ভাবিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন। ইহার উপায় কি। একমাত্র উপায় হইতেছে নরেন গোঁসাইকে দৃশ্যপট হইতে অপসারিত করা ; নতুবা সকলের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু সরাইয়াই বা দেওয়া যায় কি করিয়া ?

হাসপাতাল হইতে হেমচন্দ্র দাসের সহিত সত্যেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সংযোগ স্থাপন করিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ শুনিলেন যে, বাহির হইতে কতকগুলি পিস্তল আনাইয়া
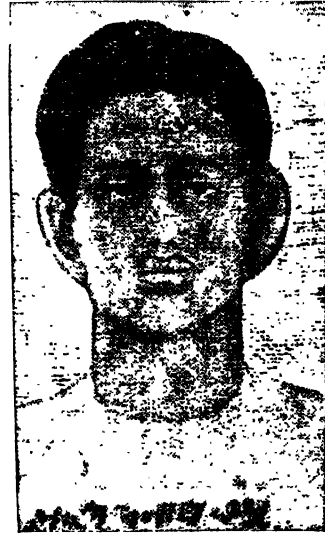
সত্যেন্দ্রনাথ বসু

কয়েদীদের একযোগে জেল হইতে পলায়নের একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে ; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঐরূপ পরিকল্পনা কতখানি কার্য্যকরী হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ হইল। এদিকে বাহিরের বিপ্লবীদের হাতে গোঁসাই-হত্যার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেও যে তাহার মুখ বন্ধ হইবে না, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। নরেনকে হত্যা করিবার জন্য অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি নিজেই একটি পরিকল্পনা রচনা করিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু হেমচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, জেল হইতে কয়েদীদের পলায়নের ব্যবস্থাকল্পে সর্ব্বপ্রথম যে পিস্তলটি বাহির

হইতে জেলের মধ্যে আনীত হইবে, তাহা যেন তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নরেনকে হত্যা করিবার জন্ত যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল—তাহা সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র ছাড়া আর কেহই জানিতে পারিলেন না।

এদিকে নরেন গোঁসাই-এর সহিতও সত্যেন্দ্রনাথ যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। নরেনকে তিনি জানাইলেন যে, জেলের কষ্ট তাঁহার আর সহ্য হইতেছে না, রাজসাক্ষী হইয়া মুক্তি পাইতে তিনিও ইচ্ছুক ; নরেন যেন সেইরূপ ব্যবস্থা করে। সত্যেন্দ্রনাথের এই অভিলাষ অবগত হইয়া নরেনের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল ; কারণ রাজসাক্ষীরূপে সত্যেন্দ্রনাথকে পাইলে তাহারও অনেক সুবিধা। সে যাহা বলিবে, তাহা সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারাও সমর্থিত হইলে তাহার সাক্ষ্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে বিশেষ বাধা থাকিবে না। সে ক্ষেত্রে তাহার মুক্তিলাভ আরও সহজতর হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছা নরেন গোঁসাই পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানাইল এবং তাঁহারাও ইহাতে রাজি হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিবার জন্ত তখন হইতে নরেন প্রায়ই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। দেখা করিতে আসিবার সময় দুইজন ইউরোপীয় প্রহরীর যাহাকে হউক সে সঙ্গে লইয়া আসিত। সত্যেন্দ্রনাথ মনোযোগের সহিত নরেনের সকল কথা শুনিয়া তাহা শিখিবার চেষ্টায় ছলনা করিতেন—কিন্তু বলিবার সময় অনেক কিছুই গোলমাল করিয়া বলিতেন। অনেক চেষ্টাতেও যখন সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়া সকল ব্যাপার গুছাইয়া ঠিক মত বলান গেল না—তখন লিখিত জবানবন্দী দেওয়াই সাব্যস্ত হইল। তদনুযায়ী প্রত্যহ একটু একটু করিয়া জবানবন্দী লেখার কাজ চলিতে রহিল। এই ভাবে বেশ কিছুদিন তিনি নরেনকে নানা অছিলায় ব্যাপৃত রাখিলেন এবং তাঁহার নিকট তাহাকে প্রায়ই আসিতে বাধ্য করিলেন। নরেন পুলিশকে যে সকল সংবাদ দিত, তাহা তাহার নিকট শ্রবণ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ সে খবর হেমচন্দ্রকে জানাইয়া দিতেন। বিপ্লবীরা ইহাতে অনেকটা সাবধান হইবার সুবিধা পাইতেন।

একদিন সত্যেন্দ্রনাথ জানিতে পারিলেন যে, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে যে জবানবন্দী নরেন গোঁসাই প্রদান করিবে, তাহাতে আরও বহু বিপ্লবীর নাম ও কার্য্যকলাপ সে প্রকাশ করিয়া দিবে। তাহার পরিণাম যে কি হইবে—তাহা বুঝিতে সত্যেন্দ্রনাথের বিলম্ব হইল না। আরও অনেকের ধরা পড়ার পথ নরেন প্রশস্ত করিতেছে। মনে মনে সত্যেন্দ্রনাথ তখন কঠোর সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, ঐ তারিখের পূর্ব্বেই নরেনকে সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

পলায়নের পরিকল্পনা মাফিক একটি পিস্তল ইতিমধ্যে জেলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহা রাখিবার ভার পড়িল হেমচন্দ্র দাসের উপর। হাসপাতালে যাওয়া হেমবাবুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল ; কিন্তু তথাপি তিনি নিজে যাইয়া পিস্তলটি সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আর কখনও হাসপাতালে না যাইতে সতর্ক করিয়া দিলেন। পিস্তলটি ছিল খুবই পুরাণো আর বড়—তাহা ব্যবহার করা খুব সহজ ছিল না। তাই আর একটি পিস্তল পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ উহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

আর একটি পিস্তলও জেলের মধ্যে আসিল, কিন্তু হাসপাতালে যাওয়া হেমচন্দ্রের পক্ষে আর সহজ ছিল না। পিস্তলটি ভাল করিয়া কাপড়ে জড়াইয়া তিনি উহা কানাইলালকে প্রদান করিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে উহা দিয়া আসিবার জন্ত। ৩১শে আগষ্ট অপরাহ্নকালে কানাইলাল পেটব্যথার ভাণ করিয়া হাসপাতালে গিয়া সত্যেন্দ্রকে উহা প্রদান করিলেন।

কানাইলাল নরেন-হত্যার উদ্যোগ-আয়োজনের জানিতেন না কিছুই ; কিন্তু পূর্ব্বেকার বড় পিস্তলটি যখন বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথ কানাইলালকে দিলেন উহা হেমচন্দ্রকে দিবার জন্ত—তখন কানাইলাল বুঝিতে পারিলেন হস্তস্থিত বস্তুটি কি। সাংঘাতিক একটা কিছু যে ভিতরে ভিতরে বেশ পাকাইয়া উঠিতেছে, তাহা কানাইলাল উপলব্ধি করিলেন। ব্যাপারটি জানিবার জন্ত তাঁহার খুবই আগ্রহ হইল এবং সকল ব্যাপার তাঁহাকে বলিবার জন্ত সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সকল বিষয় তাঁহাকে বলা হইলে কানাইলাল প্রথমে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তারপর উক্ত কার্য্যে সত্যেন্দ্রনাথকে সহায়তা করিবার জন্ত একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কানাইলালের আগ্রহাতিশয্যে সত্যেন্দ্রনাথকে উহাতে রাজি হইতে হইল। স্থির হইল যে, পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সকালবেলা হাসপাতালের ডিস্পেন্সারির মধ্যে পরামর্শ করিবার ছলে নরেনকে ডাকাইয়া আনিয়া সত্যেন্দ্রনাথ তাহাকে হত্যা করিবেন। কানাইলাল অপেক্ষা করিবেন ডিস্পেন্সারির বারান্দায়। কোনও কারণে সত্যেন্দ্রনাথ বিফল হইলে তবেই কানাইলালও নরেন্দ্রকে আক্রমণ করিবেন।

পরিকল্পনামত ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালের দিকেই সত্যেন্দ্রনাথ নরেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুইজন ইউরোপীয় প্রহরীর মধ্যে হিগিনস্ নামক একজনকে সঙ্গে লইয়া নরেনও আসিল দেখা করিতে। হাসপাতালের দুই তলায় ডিস্পেনসারির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ একখানি বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন। নরেন আসিয়া তাঁহার পাশেই উপবেশন করিল। হিগিনস্ অন্তত্র সরিয়া গেল।

কথাবার্ত্তার মাঝখানে তাঁহার জামার পকেটে হাত রাখিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ একসময় পিস্তলের ট্রিগার টিপিলেন। পিস্তলের গুলি সগর্জ্জনে ছুটিয়া গিয়া নরেনের উরুদেশে বিদ্ধ হইল। চীৎকার করিতে করিতে নরেন উঠিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। হিগিনস্ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সত্যেন্দ্রের পিস্তল কাড়িয়া লইতে গেল, কিন্তু পারিল না ; কারণ দড়ি দিয়া পিস্তলটি সত্যেন্দ্রনাথ নিজ কোমরের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। হিগিনস্ ও সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় পিস্তলের গুলি ছুটিয়া লাগিল হিগিন্সের হাতে। নরেন যেদিকে গিয়াছিল—চীৎকার করিতে করিতে সেও তখন সেইদিকেই ছুটিল।

কি একটু কাজে কানাইলাল ক্ষণেকের জন্ত অন্তত্র গিয়াছিলেন।

পিস্তলের আওয়াজ পাইয়া তিনি বারান্দায় ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন—পাখী পলাইয়াছে। দেখিয়াই তিনি পিস্তল লইয়া সিঁড়ি বাহিয়া তৎক্ষণাৎ নীচে ছুটিলেন—আর তাঁহারই পশ্চাতে পিস্তল লইয়া ধাবিত হইলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

হাসপাতালের গেটের দিকে ছুটিয়া গিয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা দুইজন গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যে কেহ তাঁহাদের সামনে পড়িল—সেই গেল ভয়ে পলাইয়া। কানাইলালের পশ্চাৎ হইতে নরেনের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত সত্যেন্দ্রনাথের একটি গুলিতে একবার কানাইলালেরই গায়ের চামড়া ছড়িয়া গেল।

জেলের ডাক্তার, জেলের অধ্যক্ষ ইত্যাদি অনেকে নরেনকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। পুনরায় গুলি খাইয়া নরেন একস্থানে স্নানাগারের নিকটস্থ এক নর্দমায় মুখ নীচু করিয়া ঘুরিয়া পড়িল। নিঃসন্দেহ হইবার জন্ম কানাইলাল আরও একবার নরেনকে গুলি করিলেন। দুইজনেঃ দ্বারা মোট নিক্ষিপ্ত নয়টি গুলির মধ্যে চারিটি গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল নরেনের শরীরে।

ইহার পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নরেনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে তাহার মৃত্যু হইল। নরেনের মুখ চিরতরে বন্ধ হইল।

গোঁসাই-হত্যার অপরাধে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের স্বতন্ত্র বিচারের ব্যবস্থা হইল—আলিপুরের সেসন্‌স্ জজ মিঃ রো-র নিকট। কানাইলাল বিচারের সময় একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি ও সত্যেন্দ্রনাথই একমাত্র নরেনের হত্যার জন্য দায়ী; কিন্তু বিচারের সময় সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা যখন প্রতীয়মান হইল যে, সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না—তিনি হয় তো মুক্তি পাইলেও পাইতে পারেন, তখন কানাইলাল তাঁহার পূর্ব্ব উক্তি প্রত্যাহার করিয়া নরেন-হত্যার সকল দায়িত্ব এককভাবে নিজের উপর গ্রহণ করিলেন।

দোষী সাব্যস্ত হইয়া বিচারে কানাইলাল মৃত্যুদণ্ড পাইলেন—কিন্তু অধিকাংশ জুরি সত্যেন্দ্রনাথকে নির্দ্দোষ ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বিচারক সত্যেন্দ্রনাথের মামলা হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন।

২১শে অক্টোবর হাইকোর্টে সত্যেন্দ্রনাথের মামলার শুনানী হয় এবং বিচারে তাঁহার প্রতিও মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। কানাইলালের মৃত্যুদণ্ডও হাইকোর্টে অনুমোদিত হইল।

ফাঁসির পূর্ব্বে কানাইলাল দত্তের শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বধ্যমঞ্চে লইয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিজের ঘরে প্রশান্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসির পূর্ব্বদিন জনৈক ইউরোপীয় প্রহরী তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল যে, সেদিনও কানাইলাল হাস্য-পরিহাস করিতেছেন বটে, কিন্তু পরদিন তাঁহার হাসি মিলাইয়া যাইবে। ফাঁসির মঞ্চ হইতে কানাইলাল সহাস্যে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—"আজ আমায় কেমন দেখাচ্ছে?"

জল্লাদকে বলিলেন,—"গলায় লাগ্‌ছে—দড়িটা বড্ড শক্ত।"

ফাঁসির পর কাল কম্বলে ঢাকা মৃতদেহ জেলখানা হইতে মহাসমারোহে কালীঘাট শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করা হয়। সে সমারোহ দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন।

দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণের নামের তালিকা হইতে কানাইলালের নাম কাটিয়া দেওয়া হইল।

সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি হইয়াছিল ২১শে নভেম্বর শনিবার। কানাইলালের শবদাহের সময় সমারোহ দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়াছিলেন বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথের শবদেহ জেলখানার বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। জেলখানার মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথের মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল। কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন গ্রহণও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কানাইলালের ফাঁসির পূর্ব্বদিন—অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর তারিখে আর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। ঐ দিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় সার্পেন্টাইন লেন ও কেরাণীবাগানের মোড়ে পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টর নন্দলাল—যিনি ছিলেন প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করার মূলে—আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। (ক্রমশঃ)

উতকামণ্ড সম্মেলন

শ্রীঅতুল দত্ত

জুন মাসের প্রথমে উতকামণ্ডে এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া উহার সমাধান সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৪৭ সালে জাতি-সঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিকগণ কর্ত্তৃক এই কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন সুপারিশ করিতে পারে, পরামর্শ দিতে পারে; ইহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কাহারও পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। নূতন দিল্লীর 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ পালানস্বামি লোকনাথন এই কমিশনের সেক্রেটারী। ১৯৪৭ সালে জুন মাসে সাংহাইতে এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের (Economic Commission for Asia and the Far East—ECAFE) প্রথম অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ঐ বৎসর নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে ফিলিপাইনের বাগুইওতে। উতকামণ্ডে তৃতীয় অধিবেশন। এই কমিশনের বিবেচনার ক্ষেত্র ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, চীন, হংকং, মালয় ইউনিয়ন ও

সিঙ্গাপুর, ওলন্দাজ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রসারিত। মধ্য-প্রাচ্য ইহার এলাকার বাহিরে। বৃটেন্‌, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রুশিয়া, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস্‌, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড এই কমিশনের সদস্য; ইহারা হয় এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের সার্ব্বভৌম শক্তি, অথবা এই অঞ্চলের সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট।

উতকামণ্ড সম্মেলন উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। উদ্বোধন বক্তৃতায় তিনি শ্রমশিল্পে উন্নত দেশগুলির নিকট এই মর্ম্মে আবেদন জানান যে, তাহারা যেন এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানে সহায়তা করে; উদারতার বশে নহে—নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থেই তাহাদের এই সহায়তা করা উচিত, কারণ আজিকার দিনে বিশ্ব-শান্তির মত বিশ্ব-সমৃদ্ধিও অবিভাজ্য। বিশ্বের এক অংশ আত্মঘাতী কলহে বিধ্বস্ত হইবে, অথচ অন্য অংশে শান্তি বিরাজ করিবে—ইহা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি বিশ্বের এক অংশকে দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত রাখিয়া অন্য অংশে সমৃদ্ধির স্বর্গ রচনাও আজিকার দিনে সম্ভব নহে। পণ্ডিত নেহরু পাশ্চাত্যের জাতিগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, এশিয়ার কোনও জাতি অর্থনৈতিক প্রভুত্ব সহ্য করিবে না। প্রয়োজন হইলে তাহারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান স্থগিত রাখিবে; তবু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া শ্রমশিল্প গঠনে প্রয়াসী হইবে না।

পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তিতে এশিয়ার স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির মর্ম্মকথাই ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ প্রতিনিধি ডাঃ গ্রাডির কর্ণে এই উক্তি মধু বর্ষণ করে নাই। কমিশনের পরবর্ত্তী বৈঠকে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি একটু তিক্ত ভাষাতেই বলিয়াছিলেন যে, এতই যদি ভয়, তাহা হইলে বৈদেশিক সাহায্য চাওয়া কেন? তিনি বলেন—অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ নামক বস্তুটি পুরাকালের "ডোডো" পাখীর মত মরিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী লৌহচক্রের আবর্ত্তনে নিষ্পিষ্ট এই আমরা বুঝি যে, সাম্রাজ্যবাদ একেবারে কাক শালিকের মতই বাঁচিয়া আছে। ডাঃ গ্রাডির এই বক্তৃতার উত্তরে অধ্যাপক জ্ঞান ঘোষ ঠিকই বলিয়াছেন যে, ঔপনিবেশিক শোষণের অঙ্কুশ যাহাদিগকে কখনও বিদ্ধ করে নাই, তাহাদের নিকট হইতে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সংজ্ঞা গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নই। বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদ খোলস বদলাইয়া এখনও যেমন বাঁচিয়া আছে, উতকামণ্ডে অর্থনৈতিক কমিশনের এই অধিবেশনেও তাহার পরিচয় কম পাওয়া যায় নাই।

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনে ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি গ্রহণের প্রসঙ্গটি উতকামণ্ডে সর্ব্বপ্রথম আলোচিত হয়। ওলন্দাজ প্রতিনিধিরা ইহাতে ঘোর আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, ইন্দোনেশিয়া পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভ করে নাই; সুতরাং এই কমিশনে তাহার প্রতিনিধি যোগ দিতে পারে না। বহু তর্কবিতর্কের পর এই প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। বাগুইও অধিবেশনে স্থির হয় যে, অর্থনৈতিক কমিশনের পরবর্ত্তী অধিবেশনে অর্থাৎ উতকামণ্ডে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির হইবে; কিন্তু উতকামণ্ডেও কোনও সিদ্ধান্ত হইতে পারিল না। ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে উতকামণ্ডে যে আলোচনা হয়, তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মনোভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজের সমর্থক ছিল পাকা সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও ফ্রান্স এবং অর্থনৈতিক প্রভুত্বকামী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিণী আশ্রয়ে পুষ্ট চ্যাঙ্গকাইশেকের চীন প্রভুর বিরাগভাজন না হইবার জন্য নিরপেক্ষ থাকে। বিপুল সংগ্রামের ফ্যাসিস্ত শ্যাম ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী, সুতরাং শ্যামের প্রতিনিধি ব্যাপারটা না বুঝিবার ভাণ করিয়া নিরপেক্ষ থাকেন। মার্কিণ ডলারের চাকায় বাঁধা ফিলিপাইনস্‌ একেবারে প্রভুর পক্ষেই ভোট দেয়। এদিকে ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক কমিশনে ইন্দোনেশিয়ার যোগদান সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছিল। সোভিয়েট রুশিয়াও এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিল।

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যেই এই কমিশনের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, দেশের জনসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগ ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন অসম্ভব। অথচ, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশিয়ার গণ-প্রতিনিধির সহযোগিতা ব্যতিরেকেই সেখানকার অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের পরিকল্পনা রচনা করিতে চায়। সুতরাং কাহার কল্যাণ সাধন তাহাদের লক্ষ্য, ইহা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নহে।

উতকামণ্ড সম্মেলনে বন্যা নিবারণ, কারিগরি শিক্ষা, আভ্যন্তরীণ সংযোগ রক্ষা এবং শ্রমশিল্পের উন্নতিবিধান প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রস্তাবটি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাবে শ্রমশিল্পে উন্নত দেশগুলির নিকট সাহায্যের আবেদন জানান হইয়াছে। এই সব প্রস্তাব কতদূর কার্য্যকরী হইবে, তাহা বলা দুষ্কর। ডাঃ গ্রাডি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশে নানারূপ ব্যবস্থার দ্বারা বৈদেশিক সাহায্য লাভের পথ রুদ্ধ করা হইতেছে, আবার বৈদেশিক সাহায্য না পাইবার জন্য অনুযোগও করা হইতেছে। তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম্ম এই—বৈদেশিক সাহায্য (অর্থাৎ মার্কিণ সাহায্য) লাভ করিতে হইলে শ্রমশিল্প জাতীয়করণের অথবা শ্রমশিল্পে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তনের নীতি ত্যাগ করিতে হইবে। এশিয়ার পুঁজিপতিদের সহিত (রাষ্ট্রের সহিত নহে) প্রত্যক্ষভাবে বন্দোবস্ত করিয়া মুনাফাপ্রসূত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে। এই সর্ত্তে অর্থাৎ অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রণের অধিকার বর্জ্জন করিয়া এশিয়ার রাজ্যগুলি যে বৈদেশিক সাহায্যপ্রার্থী হইবে না, এই কথা পণ্ডিত নেহরু প্রথমেই বলিয়াছিলেন।

এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দ্বারা ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন, মূলশিল্পগুলিতে মুনাফাভোগী কর্ত্তৃত্বের অবসান আবশ্যক, জাতীয় প্রয়োজনীয়তার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বৃহৎ শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

এশিয়ার কোনও দেশের জনপ্রিয় গভর্ণমেণ্ট এই দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া বৈদেশিক সাহায্যকারীদের হাতে সকল অধিকার তুলিয়া দিতে পারেন না। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ত্রিবিধ ব্যবস্থা চাই। প্রথমতঃ প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তির পূর্ণ সমাবেশ প্রয়োজন; আভ্যন্তরীণ শক্তির পূর্ণ সমাবেশ যদি না হয়, তাহা হইলে বাহিরের কোনও সাহায্যকারী অর্থনৈতিক উন্নতি আনিতে দিতে পারে না। এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রের। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক সহযোগিতা। এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের উন্নতি বিধানের জন্য এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু এই সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা একই প্রকার হওয়া আবশ্যক। অথচ, ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারে দেখা গিয়াছে যে, যাহারা বর্ত্তমানে চীন, শ্যাম ও ফিলিপাইনসের কর্ণধার, তাহারা সম্পূর্ণরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। ইহা ছাড়া, ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়াকে আত্ম কর্ত্তৃত্বের অধিকার দিতে প্রস্তুত নহে, ফ্রান্স স্বাধীনতাকামী ভিয়েৎনামীদিগকে গলা টিপিয়া মারিতে চায়, বৃটেন্ তাহার ডলারপ্রসূ মনের ত্যাগ স্বীকার করিতে নারাজ। ইহা ছাড়া, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নতির নামে জাপানকে পূর্ব্ব-এশিয়ায় কর্ত্তৃত্বের ভার দিবার একটা গোপন প্রচেষ্টাও উতকামণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের প্রাগযুদ্ধকালীন ধনিক সম্প্রদায়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহী এবং তাহাদিগকে মার্কিণী ধনিকদের গৌণ অংশীদাররূপে ব্যবহার করিয়া তাহাদের সাহায্যে এশিয়ায় পরোক্ষ প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে প্রয়াসী। সুদূর প্রাচ্যের এই বিচিত্র অর্থনৈতিক অবস্থা নিশ্চয়ই পারস্পরিক সহযোগিতার অনুকূল নহে।

সর্ব্বশেষে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ সুষ্ঠু ও সুসামঞ্জস না হইলে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা সম্ভব হইতে পারে না। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আজ দলবিভাগ সুস্পষ্ট; সেখানে সহযোগিতা নাই, আছে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বিস্তারের নগ্ন প্রতিযোগিতা। এই অবস্থায় নিশ্চয়ই আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা লাভ সম্ভব নহে।

উতকামণ্ডে সম্মিলনের দীর্ঘ প্রস্তাবাবলীতে এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এই কথা মনে করিতে পারিতেছি না। তবে, পারস্পরিক মনোভাবের আদানপ্রদানে এশিয়ার স্বাধীনতা-কামী দেশগুলি উপকৃত হইয়াছে; তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাহাদিগকে যথাসাধ্য নিজেদের শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে এবং যথাশক্তি নিজেদের মধ্যেই সহযোগিতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমশিল্পে উন্নত দেশগুলির নিকট হইতে তাহারা কেবল পাইতে পারে অর্থনৈতিক বন্ধনরজ্জু।

হে বীর ভাবুক বন্ধু ভেবেছ কি তুমি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিপ্লবের জয় স্তম্ভে যেথ মুক্ত সূর্য্য জ্বলে,
কোটিকণ্ঠ কোলাহলে মুখর দিগন্তে ওড়ে প্রসন্ন বলাকা।
আলোকের বর্ণে বর্ণে ঊষার হৃদয়াচলে
দুর্গমের দুর্গশিরে জীবন-হিন্দোলে দোলে জাতীয় পতাকা।
মুক্তি-যজ্ঞ হোমানলে শত শত শহীদের আত্মাহুতি পরে
এশিয়ার পূর্ব্বদ্বারে
শক্তি-লব্ধ স্বাধীনতা এনেছে অমৃতবাণী দেশের অন্তরে,
তুমি আজ বন্দী নহ ছায়াচ্ছন্ন কারাগারে।

মরু পথে ছন্দে নব বারিধির ঊর্ম্মিনৃত্য,
অভ্যুদয়ে আন্দোলিত মাঙ্গল্যের মন্ত্রমালা সবুজ অঙ্গনে।
স্তব্ধতার তন্দ্রা ভাঙ্গি আনন্দে জাগরচিত্ত
হৃদিমুক্তা আহরণে জীবনসাগরে'নামে প্রাণের স্পন্দনে।
বিরাট কর্ত্তব্য ভার, বিপুল আশার বাণী সর্ব্ব দেশে দেশে;
আজ ইতিহাসে
সুদীর্ঘ শতাব্দী পরে নূতন অধ্যায় আসে বিপ্লবের শেষে
ভারত সমৃদ্ধ হবে রক্তের ফসল লয়ে আত্মিক উল্লাসে!

ভাগ্যের দুর্য্যোগ রাত্রে হারায়েছে যাত্রী যারা
ভারতের ইতিবৃত্তে নামহীন চিহ্ন শুধু স্বাক্ষরিত করি;
সাম্রাজ্য সমাধি ক্ষেত্রে এসো স্মৃতি-বসুধারা
তাদের উদ্দেশে রাখি,—তারা তো জানেনা বন্ধু?
পোহালো শর্ব্বরী!
হিংসা আর অহিংসার বারম্বার রণোদ্ধত ঘাতপ্রতিঘাতে
পতাকা বহিয়া
স্বদেশের মুক্তিতরে সমাজ-সংসার ত্যজি দৃঢ় বজ্রনাদে
বিজাতীয় আধিপত্য যাবে চলে বীরবৃন্দ গিয়াছে কহিয়া।

আনন্দে আতঙ্ক তবু,—কেন জাগে কেবা জানে!
কোথা যেন ভ্রমে আর দুঃস্বপ্নের সঙ্করণে কাঁদে মায়া-সীতা।
মনের যাতনা তার অশান্তিরে ডেকে আনে
অন্যায় নীচতা শাঠ্য—ধাত্রী দেবতারে মোর করিয়াছে ভীতা!
বিশ্বনীতি বিষায়েছে: হে বীর ভাবুক বন্ধু ভেবেছ কি তুমি
মুক্তির উৎসবে,
হত্যা করি মানবতা, ছিন্ন করি ঐক্য তারা এই জন্মভূমি
চিতায় স'পিতে চায়,—দ্বারে এলো স্বাধীনতা, শান্তি
পাবো কবে!
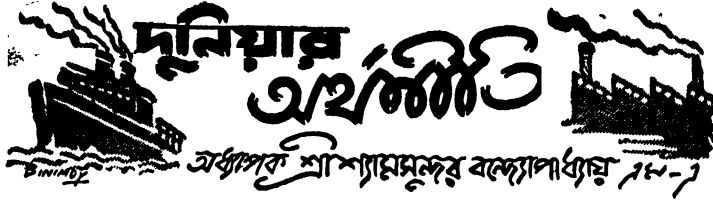
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের গুরুত্ব

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এদেশে আধুনিক প্রথায় ব্যাঙ্ক-ব্যবসা সুরু হইলেও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কোম্পানী আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পরই এই ব্যবসা সম্প্রসারিত হইবার সুযোগ পায়। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহাও কম দিনের কথা নয়। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, এই ৬৬ বৎসরের মধ্যে স্বাভাবিক গতিতে চলিলেও ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কব্যবস্থার যেটুকু উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির সমৃদ্ধি সম্পর্কে আশা করা গিয়াছিল অনেক কিছু। যুদ্ধের ফাঁপা বাজারের সুযোগে এদেশের ব্যাঙ্কসমূহে আমানত অবশ্য অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু ব্যাঙ্কের সত্যকার উন্নতি বলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে যোগাযোগ, জনসাধারণের গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তা, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তি এবং ঝুঁকিদারী মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যে সকল কথা বুঝায়, এ পর্য্যন্ত এদেশে তাহার কিছুই হয় নাই। এইজন্য জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় দেশীয় ব্যাঙ্কে কিছু কিছু টাকা রাখিলেও দেশবাসী এই ধরণের যে কয়টি ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আস্থাবান, তাহাদের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির এই অবস্থার সুযোগ পাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ও স্বচ্ছল বিদেশী, বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি এদেশে পরমানন্দে কাজকারবার বাড়াইয়া চলিয়াছে। ইংরেজ আমলে ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি যে রক্ষাকবচ—সুবিধা লাভ করিত, তাহাও উপেক্ষার বস্তু নয়। ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক-রূপে অতি অল্প যে কয়টি ব্যাঙ্ক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাঙ্কটির সত্যকার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হিসাবে এদেশের সেবা করিবার ইচ্ছা করিলে শুধু ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিই হইত না, অন্যান্য দেশীয় ব্যাঙ্কের সম্মুখে বিরাট আদর্শ উপস্থাপিত হইতে পারিত, কিন্তু ১৭৭টি শাখা ও ২৭০ কোটি টাকা আমানত সমন্বিত এই বিপুলায়তন আধা সরকারী ব্যাঙ্কটি এতকাল ইংরেজ কর্ম্মকর্ত্তাদের হস্তগত থাকিয়া কল্যাণের পরিবর্ত্তে দেশের ক্ষতিরই কারণ হইয়াছে। এই ভাবে নানা দিক হইতে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, ভারতবর্ষে সত্যকার জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে অবিলম্বে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর প্রয়োজনের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

আশার কথা, ভারতের নূতন জাতীয় সরকারও এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। অর্থসদস্য স্যার সন্মুখম চেটি একটি ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া রচনা করিয়া ভারতীয় পার্লামেন্টের গত অধিবেশনে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন. এবারের অধিবেশনে এই বিলটির আইনে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেও একটি ব্যাঙ্ক বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হয়, তখন ইংরেজ রাজত্ব ছিল বলিয়া এই আইনের সাহায্যে ব্রিটিশ স্বার্থের অবসান ঘটাইয়া এদেশে কার্য্যরত ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলিকে সম্পূর্ণ বিদেশী ব্যাঙ্কের পর্য্যায়ভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ইপ্সিত পুনর্গঠনও তখনকার বিলের আওতায় আসে নাই। এ ছাড়া দেশীয় রাজ্যস্থ ব্যাঙ্কগুলিকে তখন বিদেশী ব্যাঙ্ক বলিয়া ধরা হইত। এখন নূতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ব্যাঙ্ক বিলটি রচিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, ছোট বড় সকল নির্দ্দেশে সন্তুষ্ট হইতে না পারিলেও মোটামুটি প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসাকে জাতীয় কল্যাণে নিযুক্ত করিবার এবং ব্যাঙ্ক-সমূহের আমানতের নিরাপত্তা বিধানের একটি আন্তরিক আগ্রহ সকল দেশবাসীকেই সন্তুষ্ট করিবে। আমরা ইহাও আশা করি যে, বিলের আলোচনাকালে পার্লামেন্ট সদস্যগণ ইহার ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে অর্থসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সেগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, জনসাধারণের আমানত ছাড়া ব্যাঙ্কের নিজস্ব মজুত তহবিল ও শেয়ার বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত মূলধনের পরিমাণ যদি যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ ব্যাঙ্কে আমানতের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের হিড়িকে যে সব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাজারের ফাঁপাই টাকার সুযোগ লইয়া ফাঁপিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের মজুত তহবিল বা মূলধনের বিশেষ কোন বালাই ছিল না। যুদ্ধের পর মন্দা বাজারের এইটুকু আঘাত সহিবার ক্ষমতাও যে ইহাদের নাই, একথা সম্প্রতি অনেকগুলি ব্যাঙ্কের দরজায় তালাবন্ধ হইয়া যাওয়াতেই প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা নেয়, এইভাবে আমানত সংগ্রহে সুদ প্রদানের দায়িত্ব আছে, কাজেই আমানতের টাকা ঘরে বসাইয়া না রাখিয়া লাভজনক উপায়ে লগ্নী করিতে হয়। যে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিল বা মূলধন বেশী, তাহাদের পক্ষে একটা বড় অঙ্ক নগদ টাকায় বা সহজে নগদে পরিবর্ত্তনীয় ভাবে হাতে রাখা সম্ভব এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাঙ্কে রাণ হইলেও এই টাকার সাহায্যে বিপদ কাটাইয়া উঠা তাহাদের পক্ষে কঠিন নয়। প্রকৃতপক্ষে আমানত ছাড়া অন্য তহবিল বেশী ছিল না বলিয়াই ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ এই ১০ বৎসরে ভারতে সর্ব্ব-সমেত সাড়ে সাতশতের বেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ফেল পড়িয়াছে। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের সবচেয়ে বড় কথা হইল—ভবিষ্যতে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের মজুত তহবিল ও মূলধনের নিম্নতম পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া। ব্যাঙ্ক বিলের ২নং ধারাটি এই সম্পর্কে রচিত এবং ইহাতে বলা হইয়াছে

যে, যদি কোন ব্যাঙ্ক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন স্থানে কাজ কারবার চালাইতে চাহে, তাহার মজুত তহবিল ও মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার কম হইলে চলিবে না। ভারতের মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাই ব্যাঙ্ক-ব্যবসার সবচেয়ে বড় জায়গা। এই দুই সহরে ব্যবসা চালাইতে হইলে মজুত তহবিল ও মূলধন * মিলাইয়া প্রতি ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা থাকা চাই। এই দুইটি সহর ছাড়া অন্য একটিমাত্র স্থানে ব্যবসা চালাইতে হইলে ব্যাঙ্কের এইরূপ টাকা চাই অন্ততঃ ৫০ হাজার। ব্যাঙ্ক বিলে বলা হইয়াছে যে, যে কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে মজুত তহবিল ও মূলধন হিসাবে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই একটি প্রদেশে যতগুলি শাখায় ইচ্ছা ব্যবসা চালান যাইবে। ব্যাঙ্কের হেড অফিস যে জেলায় অবস্থিত, সেই জেলায় কোন শাখা স্থাপনে ১০ হাজার টাকা এবং সেই জেলা যে প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রদেশের অপর কোন জেলায় কোন স্থানে শাখা স্থাপনের জন্য ২৫ টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়া ব্যাঙ্ক-বিলে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্যাঙ্ক-বিলে বলা হইয়াছে যে বাঙ্গলা অথবা বোম্বাই ছাড়া ভারতের অন্যান্য কোন প্রদেশে কোন ব্যাঙ্ক যদি শাখা স্থাপন করিয়া ব্যবসা চালাইতে চায়, তাহা হইলে এই প্রদেশের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রের জন্য মজুত তহবিল ও মূলধনে মিলাইয়া ব্যাঙ্কের হাতে অন্ততঃ ১ লক্ষ টাকা থাকা চাই। অর্থসচিবের প্রস্তাব অনুসারে ব্যাঙ্ক বিলটি আইনে পরিণত হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে চলতি ব্যাঙ্কসমূহকে এইভাবে নির্দ্দিষ্ট মূলধন দেখাইতে হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাঙ্ক পরিচালনা নীতি সন্তোষজনক মনে হইলে বিশেষ কোন চলতি ব্যাঙ্ককে এই মূলধন দেখাইবার জন্য তিন বৎসরের স্থলে চার বৎসর সময় দেওয়া হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের ব্যবস্থা হইতেছে, এই জাতীয়করণ সম্পূর্ণ হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যেটুকু দোষত্রুটি আছে, তাহা দূর হইবে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থলে সরকারী ব্যাঙ্করূপে কাজ করিত, এখনও যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সেখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। সমগ্রভাবে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা শৃঙ্খলার সহিত চালু রাখিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত এখনও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দায়িত্ব আছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক শুধু আধাসরকারী ব্যাঙ্ক নয়, ইহা এদেশের বৃহত্তম যৌথ ব্যাঙ্ক। দুঃখের বিষয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ইহার অতি সাধারণ কর্ত্তব্য পালনে ভীষণ গাফেলতী করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ কলিকাতার একটি বড় ব্যাঙ্কে যখন রাণ হয়, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে অর্থসাহায্য করিয়া এই সমৃদ্ধ ব্যাঙ্কটিকে বাঁচাইতে পারিত। এবারও ব্যাঙ্কসঙ্কটে কতকগুলি বাঙ্গালী পরিচালিত ভাল ব্যাঙ্ক যখন রাণের ফলে বিপন্ন হইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সাহায্যপ্রার্থী হইল, তখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এমনি তো ইহাদের বাজার-সম্ভ্রমের উপর নির্ভর করিয়া কোন সাহায্য করে নাই, অধিকন্তু ইহাদের সঞ্চিত কোম্পানীর কাগজের জামিনেও শতকরা ৮৫ টাকার বেশী ধার দিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। সরকারী আইনে পরিচালিত এই ব্যাঙ্কের এখনকার সস্তা টাকার বাজারে সাধারণ কোন ব্যাঙ্কের বিপদের সময় একশত টাকার সরকারী ঋণপত্রের জামিনে অন্ততঃ ৯৫ টাকা না দিয়া মাত্র ৮৫ টাকা ধার দিতে রাজী হইবার এই অভিযোগ সত্য হইলে ইহাকে ব্যাঙ্কটির জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী অতি জঘন্য পরিচালনা ব্যবস্থার ফল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের কয়েকটি ধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। বলা বাহুল্য, এইভাবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে ক্ষুব্ধ দেশবাসীর পক্ষে তাহা আনন্দের কথা।

এতদিন ব্যাঙ্ক আইন ছিল না বলিয়া অনেক বেকার ও ফন্দীবাজ লোক কাহাকেও কিছু না জানাইয়া ব্যাঙের ছাতার মত এখানে ওখানে ব্যাঙ্ক খুলিতে সমর্থ হইতেছিল। এই সব ব্যাঙ্কের মজুত তহবিল তো ছিলই না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধনও ছিল অতি নগণ্য। মুদ্রাস্ফীতির সময় এই সব ছোটখাট ব্যাঙ্কেও লোকে টাকা রাখিয়াছে এবং সাধারণের সেই টাকা ব্যাঙ্ক-পরিচালকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছে। এই ধরণের অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে লালবাতি জ্বালাইয়া দেশবাসীর কষ্টার্জ্জিত একরাশ টাকা তো বরবাদ করিয়াছেই, তাছাড়া ইহারা সমগ্রভাবে দেশীয় ব্যাঙ্কের উপর দেশবাসীর আস্থা নষ্ট করিয়া বিদেশী বড় ব্যাঙ্কগুলির সুবিধা করিয়া দিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশেই এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির অধিক উদ্ভব হইয়াছে। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে এইরূপ অবাঞ্ছিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া সকলেই স্বস্তিলাভ করিবেন। ব্যাঙ্ক বিলে বলা হইয়াছে, অতঃপর কোন নূতন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কারবার চালাইবার লাইসেন্স সংগ্রহ করিবার আগে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে না এবং চলতি ব্যাঙ্কগুলিকেও বিলটি আইনে পরিবর্ত্তিত হইবার দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। কোন ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দিবার বা না দিবার অধিকার সম্পূর্ণভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যবস্থা যদি ত্রুটিশূন্য হয়, তাহা হইলে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতা প্রদানের যৌক্তিকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। এইভাবে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতালাভকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ত্রুটিশূন্য পরিচালনা ব্যবস্থাও যেমন আশা করা যায়, তেমনি আশা করা যায়, সাধারণ কোন সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক রাণের ফলে অভাবিত বিপদের সম্মুখীন হইলে এখনকার মত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিষ্ক্রিয় দর্শক সাজিয়া বা ফাঁকা আশ্বাস-বাণী শুনাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করিবে না, অবিলম্বে অর্থসাহায্য করিয়া রাণ বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইবে। মোটের উপর, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স ছাড়া যখন এদেশে কোন ব্যাঙ্ক খোলা যাইবে না এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন থাকিবে, তখন যে কারণেই

---

* মূলধন বলিতে আদায়ী মূলধন (paid up capital) বুঝিতে হইবে।

হউক, কোন ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া যদি দেশের লোকের একটি পয়সা নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষতির নৈতিক দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেই লইতে হইবে। সকলেই জানেন ঠিক এইরূপ মর্য্যাদা ও দায়িত্বসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্যই এদেশবাসী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে এবং ঠিক মনমত হয় নাই বলিয়াই এ সম্পর্কে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসরকারের অর্থসদস্য স্যার জেমস উইলসনের প্রস্তাব এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থসদস্য স্যার বেসিল ব্লাকেটের প্রস্তাব তাহারা গ্রহণ করিতে পারে নাই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় অনেক কিছু আশা করা হইয়াছিল, ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা-ব্যবস্থার জন্য সেই আশা পূর্ণ না হওয়াতে দেশবাসী এখন আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পুনর্গঠনের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড শাখার পরিকল্পনাও হয় নাই, তখন মগরা-তারকেশ্বর অঞ্চলের ৪০০ বর্গমাইলের ২লক্ষ অধিবাসীর সুবিধার্থে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথ নামে একটি ছোট রেললাইন খোলা হয়। দেশের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন এই রেলপথ স্থাপনের উদ্যোক্তা হইলেও ইহার জন্য শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে ৮,৪৮,৬৮০ টাকা মূলধন সংগৃহীত হয় তাহার অধিকাংশই দেশের ৫,০০০ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক জোগাইয়াছেন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথের মগরা হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত প্রধান লাইনটির সহিত পরে দুইটি শাখা (ত্রিবেণী হইতে মগরা জংসন ও দশঘরা হইতে জামালপুর গঞ্জ) সংযোজিত হয়। এখন এই রেলপথটির মোট আয়তন ৪২ মাইল। ইহার ৩৪ মাইল হুগলী জেলায় অবস্থিত এবং এখনও এই রেলপথটি হুগলী জেলার একটি প্রকাণ্ড ও সমৃদ্ধ পল্লী অঞ্চলের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। যে এলাকায় এই রেলপথটি অবস্থিত, তাহার মধ্যে জেলাবোর্ডের একটি মাত্র ভাল রাস্তা আছে এবং তারকেশ্বর হইতে মগরা পর্য্যন্ত রেলের যে প্রধান অংশ রহিয়াছে, বর্দ্ধমান কর্ড লাইন তাহার মাঝামাঝি জায়গায় রত্নাগীতে ইহাকে বিভক্ত করিয়াছে।

সম্প্রতি আমাদের এই রেলপথে ভ্রমণের এবং ইহার কর্ম্মচারী ও যাত্রীসাধারণের সহিত আলাপ আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল। সব জড়াইয়া রেলপথটি বর্ত্তমানে যেভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আমরা হতাশ না হইয়া পারি নাই। রেলের গাড়ীগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, বৃষ্টি হইলে সর্ব্বত্র জল ঝরে, গাড়ীর জানলা দরজা প্রায় ক্ষেত্রেই বন্ধ হয় না। আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল, লাইনের অবস্থাও ভাল নয় এবং সেতুগুলি ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ লাইনে গাড়ী চালান হইলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা থাকে। কর্ত্তৃপক্ষও এসম্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়া বর্ত্তমানে 'গাড়ীর গতি কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন। মনে হইল, গাড়ী এ লাইনে ঘণ্টায় বোধ হয় আট মাইলের মত চলে। প্রয়োজনের তুলনায় ইঞ্জিন, মালগাড়ী বা যাত্রী-গাড়ী সবেরই মারাত্মক অভাব। ট্রেণের সংখ্যা কম হওয়ায় স্থানীয় লোকেদের অসুবিধার শেষ নাই। হুগলী জেলায় যে অঞ্চলে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথ স্থাপিত, সেখানে পাট ও ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, তাছাড়া 'মগরায় বালি' নামে বিখ্যাত এ অঞ্চলের বালির সর্ব্বত্র প্রচুর চাহিদা আছে। দুঃখের বিষয় মালগাড়ীর অভাবে পণ্যসমূহ, বিশেষ করিয়া বালি চালান দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার ফলে ব্যবসায়ীদের যেমন ক্ষতি হইতেছে, দেশবাসীরও তেমনি অসুবিধা হইতেছে। রেলকর্ম্মচারীদের বেতনের যে হার শোনা গেল, বর্ত্তমান চড়া বাজারে সেই হারে বেতন পাইয়া মানুষের পক্ষে সপরিবারে জীবনধারণ অসম্ভব।

মোটের উপর, এখন যেভাবে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথটি চলিতেছে, তাহা না চলারই সামিল ; অথচ হুগলী জেলার অধিবাসীদের প্রয়োজনের হিসাবে ইহার গুরুত্বও অনস্বীকার্য্য। এক্ষেত্রে দেশ স্বাধীন হইবার পর এই গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন ব্যবস্থাটির আমূল সংস্কার দেশবাসী অবশ্যই দাবী করিতে পারে। এইরূপ সংস্কারের জন্য অবিলম্বে কয়েক লক্ষ টাকা একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমানে রেলপথটির অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, প্রকৃতপক্ষে বরাবর সেইরূপ ছিল না। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেলপথটির বেশ আয় হইতেছিল এবং অংশীদারেরা শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ পাইতেছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইন স্থাপিত হওয়ায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথের অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। কর্ড লাইনের বেলমুড়ি ও গুড়্‌প এই দুইটি ষ্টেশন দিয়া বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথের হাজার হাজার যাত্রী ও অজস্র মাল যাওয়া আসা করিতে থাকে। সময়দূরত্বের হিসাবে ছোট রেল অপেক্ষা বড় রেলের ভাড়া স্বভাবতঃই সস্তা। হিসাব দেখিয়া মনে হয়, কর্ড লাইনের জন্য বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথের বৎসরে অন্ততঃ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি হইতেছে, পক্ষান্তরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়েকে বৎসরে ক্ষতিপূরণ দিতেছেন মাত্র ১১ হাজার টাকা। কর্ড লাইনের জন্য মার্টিন কোম্পানীর পরিচালিত হাওড়া শিয়াখালা লাইনটিরও ক্ষতি হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ই আই আর সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনগুলির আয়ের শতকরা ৪৫ ভাগ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিবার ব্যবস্থা করায় এই ক্ষতি অনেকটা পূরণ হইয়াছে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের ব্যাপারেও বেলমুড়ি ও গুড়্‌প ষ্টেশনের আয়ের উপর অনুরূপ হারে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা হইলে এই গুরুত্বপূর্ণ রেলপথটির অবস্থা এত শীঘ্র এইরূপ শোচনীয় হইত না। পরিচালকেরা অনেক কষ্টে দীর্ঘদিন পরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অংশীদারদের আয়করমুক্ত শতকরা ১½ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু কতদিকে কত অবহেলা করিয়া যে এই লভ্যাংশ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা এই রেলপথের সহিত পরিচিত কাহারও অজানা নাই। বেসরকারী পরিচালনাধীন হইলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা জাতীয় সম্পদ, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথের যাত্রী বা কর্ম্মচারী সকলেই স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা অবশ্যই দাবী করিতে

পায়ে এবং সেই দাবী পূরণের প্রথম দায়িত্ব নিঃসন্দেহে কোম্পানীর হইলেও চূড়ান্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

আমরা আশা করি পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সরকার বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথটি সম্পর্কে অবিলম্বে মনোযোগী হইবেন। সবচেয়ে ভাল হয়, অংশীদারদের টাকা ফিরাইয়া দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংলগ্ন এই রেলপথটি রেলওয়ে বোর্ড যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত একত্রীভূত করিয়া লন। ইহাতে জনসাধারণ যেমন সুবিধা পাইবে, কর্ম্মচারীরাও তেমনি সরকারী চাকুরীয়ার মর্য্যাদা লাভ করিয়া নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। আর এইভাবে সরকারী রেলপথের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার অসুবিধা যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে অন্ততঃ ২ লক্ষ টাকা সাহায্য এবং দীর্ঘদিনের পরিশোধের সর্ত্তে আরও ৩ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়া সরকারের রেলপথটিকে ভালভাবে চালু করা উচিত। হুগলী জেলার পল্লী অঞ্চলের প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে এই অর্থসাহায্য ও ঋণদান সরকারের পক্ষে মোটেই বাহুল্য হইবে না। রেলপথটির অবস্থা এত খারাপ যে নূতন করিয়া শেয়ার বিক্রয় দ্বারা টাকা সংগ্রহ এখন অসম্ভব, অথচ অবিলম্বে কিছু টাকা না হইলে চলিতে পারে না। এক্ষেত্রে সরকারের নিজ দায়িত্বে রেলপথটির পরিচালনায় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করিতে অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত। ৩০।৬।৪৮

প্যালেষ্টাইন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

উত্তরে লেবানন পর্বতমালা, দক্ষিণে সিনাই মরুভূমি, পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগরের নীল জলরাশি এবং পূর্বে সিরিয়ার বালুময় ধূসর মরু দ্বারা বেষ্টিত যে ভূখণ্ড, তা হ'ল বাইবেলোক্ত, ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্যালেষ্টাইন রাজ্য। এই সেই দেশ, যেখানে হাজার হাজার বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক যুগে জিহোবার মনোনীত মানুষ ইসরাইলদের বাসভূমি ছিল এবং এখন হ'তে প্রায় দুহাজার বছর আগে ভগবানের প্রিয়পুত্র যীশু এসে জন্ম নিয়েছিলেন। তাই ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের নিকটেই অতি পবিত্র তীর্থভূমি এই প্যালেষ্টাইন। প্যালেষ্টাইন, বিশেষ ক'রে জেরুজালেম যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানদের তীর্থভূমি, মুসলমানদের নিকটেও তেমনি। এই জেরুজালেমেই মুসলমানদের হারাম এল-সরিফ অবস্থিত। কথিত আছে হজরত মহম্মদ নাকি এখানে প্রার্থনা করেছিলেন। তাই মুসলমানরা এখানে একবার নমাজ পড়াকে অন্যত্র হাজার বার নমাজ পড়ার সমান দেখে এবং এই স্থানকে তারা মক্কার পরই মনে করে।

যীশুর জন্মের ১০ হাজার বছর আগে অর্থাৎ ইতিহাস যাকে আদিপ্রস্তর যুগ বলেছে, সেই সময়েও এই প্যালেষ্টাইনে লোকের বাস ছিল। তখন ঐ প্রস্তর যুগে লোকে এখানে পাহাড়ের গুহায় বাস করত। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা গুহা ছেড়ে ঘর বানাল এবং অসভ্য থেকে হ'ল সভ্য। এই দেশের উপরে প্রথম যারা সভ্যতার আলো এনে দিয়েছিল, তারা হ'ল ব্যাবিলন আর মিশর। মিশর এ দেশ জয় ক'রে বহু বৎসর এখানে শাসন চালিয়েছিল। তারপর ইসরাইলরা মিশরের হাত থেকে প্যালেষ্টাইন উদ্ধার করে। সেও হ'ল যীশু-জন্মের ১১৫০ বৎসর পূর্বের কথা।

ইসরাইলরা ৬০০ বছরেরও অধিককাল ধ'রে নিজেদের দেশ শাসন করল। তারপর পারস্য সম্রাট সাইরাস এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্যালেষ্টাইন জয় করে নিলে। দুশ বছর পারস্যের অধীনে থাকার পর দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার আবার জয় করল এই প্যালেষ্টাইন। এই সময়েই প্যালেষ্টাইন সর্বপ্রথম গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে এল। এরপর প্যালেষ্টাইন আবার গেল সিরিয়ার হাতে। সিরিয়ানরা প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদের উপর শাসনের নামে অত্যাচার সুরু করলে, ইহুদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং বহুশত বৎসর পরাধীন থাকার পর নিজেদের দেশকে পুনরায় শত্রু কবল থেকে উদ্ধার করে নিল।

ইহুদীরা স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনলেও, কিছুদিন পরে তাদের মধ্যে গৃহ-বিবাদের সুযোগে রোমানরা যীশু জন্মের ৬৩ বছর আগে আবার প্যালেষ্টাইন জয় করে নিল এবং প্যালেষ্টাইনে রোমান-শাসন জোর ভাবে চালাল। এরই ফলে ইহুদীরা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল এবং সেই থেকে তারা আর কোনও দিনই দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারল না।

রোমানদের পর পারস্য, পারস্যের পর আবার আরবরা প্যালেষ্টাইন জয় করল। আরবরা দেশে কিছুদিন সুশাসন চালিয়েছিল, তারই ফলে প্যালেষ্টাইনের বহুসংখ্যক লোক মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

প্যালেষ্টাইনের মুসলমান রাজারা প্যালেষ্টাইনে অবস্থিত খৃষ্টানদের তীর্থস্থানগুলির বিশেষ যত্ন নিতেন না এবং খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের প্রতিও কোন সহৃদয় ব্যবহার করতেন না। এতে ইউরোপের খৃষ্টান রাজ্যসমূহ ধর্মের অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ করল। এই ধর্মযুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয় ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে। প্যালেষ্টাইন নিয়ে এই ধর্মযুদ্ধ চলে ৬ বার। শেষবার অর্থাৎ ১২২৯ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষের এক সন্ধিপত্রে স্থির হয় যে, জেরুজালেম ও তার পার্শ্ববর্তী শহরগুলো থাকবে খৃষ্টানদের অধিকারে।

এরপর প্যালেষ্টাইন আবার গেল টার্টার ও মিশরীয়দের হাতে।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক মিশরীয়দের সিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করল এবং পরবৎসর মিশরীয়দের হাত থেকে প্যালেষ্টাইন কেড়ে নিল।

এই তুর্কী শাসনে প্যালেষ্টাইন রইল পুরা ৪০০ বছর। চারশ বছর পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করলে, ইংরাজ সেনাপতি লর্ড অ্যালেনবী প্যালেষ্টাইন আক্রমণ ক'রে তুরস্কের হাত থেকে কেড়ে নিল। ইংরাজ প্যালেষ্টাইন জয় ক'রে ঘোষণা করল—এখানের আরবদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদেরও একটা জাতীয় আবাসভূমি স্থির ক'রে দেওয়া হবে।

ইংরাজের এই ঘোষণা ইহুদীদের পক্ষে এক যুগান্তকারী ঘোষণা হ'ল। দুহাজার বছর পরে ইহুদীরা পুনরায় তাদের একটা আশ্রয় পাবার প্রেরণা পেল। অবশ্য এই ঘোষণার কিছুদিন পূর্ব থেকেই ইহুদীরা তাদের এই ঐতিহাসিক দেশে নতুন ক'রে ঘর বাঁধবার চেষ্টা করছিল। দুহাজার বছর আগে রোমান অধিকারের সময় থেকে যে ইহুদীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে ক্রমে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা প্যালেষ্টাইনে পুনরায় ফিরে গিয়ে নিজেদের জাতীয় আবাসভূমি রচনার চেষ্টা করছিল। এই ধরণের চেষ্টা প্রথম সুরু হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। ইণ্টারনেশনাল এসোসিয়েশনে অব দি এলায়েন্স ইসরালিটস বা আন্তর্জাতিক ইহুদী মিত্র সমিতির উদ্যোগে এই কাজ চলে। ইহুদীরা এই সময় জাফার কয়েক মাইল দূরে বা "ইহুদী সংগ্রহ" নাম দিয়ে একটা কৃষি-বিদ্যালয় খোলে। এর দুবছর পরে রাশিয়া থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে জাফার ১০ মাইল উত্তরে সমতলভূমে "আসার যার" নাম দিয়ে এক উপনিবেশ স্থাপন করল এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তারা ৫।৭ বছরের মধ্যে গোটা ছয় গ্রামে উপনিবেশের পত্তন করল। পরে আরও কয়েকটি স্থানে এইরূপ ইহুদী উপনিবেশ গঠিত হ'ল। এইসব ইহুদীরা প্রথম প্রথম আঙুরের চাষ ও মদ বিক্রীকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল, পরে তারা কমলালেবুর চাষ, ও অন্যান্য ফল এবং খাদ্যশস্যের চাষও আরম্ভ করল এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথাও চাষবাসের মধ্যে আমদানী করল। এইসব ইহুদী গ্রামগুলোর চারদিকেই কিন্তু আরবরা ঘিরে রইল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইহুদীরা জাফার উত্তরে তেল-আভিভ শহরের পত্তন করল। তেল-আভিভের শব্দগত অর্থ হল "বসন্ত-পাহাড়"। এ একটি সুন্দর শহর। শহরটি বাগান দিয়ে ঘেরা। ইহুদীরা জেরুজালেম ও তার আশেপাশে এবং হাইফা বন্দরেও নতুন করে বাস সুরু করল। এইভাবে ইহুদীরা তাদের জাতীয় আবাসভূমি গঠনের প্রেরণা নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, পারসিয়া, মরক্কো, এডেন, ভারতবর্ষ, প্রভৃতি স্থান হ'তে অর্থাৎ এককথায় পৃথিবীর সকল দিক হ'তেই দলে দলে প্যালেষ্টাইনে এল। এইসব দলে ভৃত্য, কৃষক, শিল্পী, শিক্ষক, ধর্মযাজক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই রইল। এইভাবে ইহুদীরা ১৯২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক প্যালেষ্টাইনে গিয়ে বাস আরম্ভ করল।

প্যালেষ্টাইনে রোমান রাজত্বের আমল থেকে গত দুহাজার বছর ধ'রে এতদিন ইহুদীরা তাদের জাতীয় আবাসভূমি হতে বিতাড়িত হয়ে বেদুইনের ন্যায় পৃথিবীর নানাস্থানে আশ্রয়ের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তারা ছড়িয়ে পড়ায় তাদের যে মাতৃভাষা ছিল, তা ভুলে, যে দেশে তারা বাস করছিল, সেই দেশের ভাষাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। প্যালেষ্টাইনে ফিরে এইসব ইহুদীরা বাইবেলের প্রাচীন হিব্রু ভাষাকে আবার তাদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করক লাগল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ১৯১৭ সালে লর্ড অ্যালেনবী তুর্কীর নিকটে ৪শ বছরের পরাধীন প্যালেষ্টাইন জয় করেন। ১৯১৯ সালে বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান হলে, পর বৎসর বিজয়ী পক্ষের ঊর্ধ্বতন পরিষদ বৃটেনকে প্যালেষ্টাইনে ম্যাণ্ডেট শাসন বা অভিভাবকত্বের ভার গ্রহণ করবার নির্দেশ দিলেন। ১৯২২ সালে লীগ-অব-নেশানস এই ম্যাণ্ডেট অনুমোদন করলে, পর বৎসর থেকে বৃটিশ প্যালেষ্টাইনে ম্যাণ্ডেট অনুযায়ী শাসন কার্য চালাল।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ নিজের সুবিধার দিকে নজর রেখে কখন ইহুদীদের, কখন বা আরবদের পক্ষ সমর্থন ক'রে, আবার কখন বা কৌশলে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে দেশ শাসন করতে লাগল। ফলে ইংরাজের রাজত্বকালে আরব আর ইহুদীদের মধ্যে বরাবরই একটা বৈরীভাব রয়ে গেল। এমন কি কয়েকবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামারও সৃষ্টি হল এবং উভয় পক্ষেরই বহু লোক হতাহত হ'ল। আরব ও ইহুদীদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটা কমিশন বসল, কিন্তু কিছুই হল না। ১৯৩৭ সালে লর্ড পীলের সভাপতিত্বে এইরূপ এক রয়েল কমিশনের রায়ে বলা হ'ল—অখণ্ড প্যালেষ্টাইনে আরবদের স্বাধীনতা এবং ইহুদীদের জাতীয় আবাস ভূমি একই সঙ্গে স্বীকার করা যায় না। দুটোকেই মেনে নিতে হলে, প্যালেষ্টাইন ভাগ করা দরকার।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু এই প্যালেষ্টাইন ভাগে বাধা দিল। দুবছর পরে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হোয়াইট পেপারে ঘোষণা করল—আগামী ১০ বছরের মধ্যে প্যালেষ্টাইনকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং আরব ও ইহুদীরা মিলিত হয়েই সেই স্বাধীন প্যালেষ্টাইনের শাসন কার্য পরিচালন করবে।

হোয়াইট পেপারে আরবদের মুখ চেয়ে আরও বলা হল—আগামী ৫ বছরে ৭৫ হাজার ইহুদীকে মাত্র প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে, তারপর আর কোন ইহুদীকে এখানে আসতে দেওয়া হবে না।

ইহুদীরা এই প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নিল না। তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং বেআইনী ভাবে পরেও ঠিকই ইহুদী আমদানী চালাতে লাগল।

এই সময়ে পৃথিবী ব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ চলছে। জার্মানী প্রভৃতি স্থান থেকে ইহুদীরা বিতাড়িত হয়ে একপ্রকার আশ্রয়হীন অবস্থায়

পৃথিবীর এখানে সেখানে দিন কাটাতে লাগল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে বিজয়ী পক্ষের আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অবিলম্বে ১ লক্ষ ইহুদীকে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিলেন।

ইতিপূর্বে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি মুসলমান রাজ্য মিলে আরব-লীগের সৃষ্টি করে। আরবরা প্যালেষ্টাইনে এই ইহুদী আমদানীটাকে মোটেই সুনজরে দেখতে পারল না। তারা এতে প্রাণ-পণে বাধা দিতে লাগল।

প্যালেষ্টাইনের এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগে বৃটিশ, প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ৫ বৎসর বিশ্বরাষ্ট্রসমূহের এক অভিভাবক মণ্ডলীর হাতে শাসন ব্যবস্থা দেবার সুপারিশ করে। এই প্রস্তাবে কিন্তু আরব ও ইহুদীরা উভয়েই বিরোধিতা করল। তখন বৃটিশ প্যালেষ্টাইনের সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে দিল।

জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান জেরুজালেমকে নিরপেক্ষ অঞ্চল রেখে বাকি প্যালেষ্টাইনটা আরব ও ইহুদীদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবার সুপারিশ করল এবং পরিষদ পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপর পুলিশ বা সৈন্যের সাহায্য না নিয়ে আরব ও ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা করে দেশ বিভাগের ভার দিল। ইহুদীরা এই প্রস্তাবে রাজী হলেও, আরবরা এ প্রস্তাব মানতে চাইল না।

এইরূপ সমাধানহীন অবস্থাতেই কিছুদিন চলল। তারপর গত মার্চ মাসে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে প্যালেষ্টাইনের প্রশ্ন উঠলে, আমেরিকা হঠাৎ প্যালেষ্টাইন বিভাগে অসম্মতি জানাল। পূর্বে অবশ্য এই আমেরিকাই জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে প্রথম প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব করেছিল। এখন সে তার পূর্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় পরিষদে এই নিয়ে তুমুল আলোচনা হ'ল, কিন্তু প্যালেষ্টাইন সমস্যার আসলে কোনও সমাধান হল না।

এদিকে বৃটিশ তার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৫ই মে মধ্য রাত্রিতে ম্যাণ্ডেট শাসনের অবসান ক'রে প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করতে মনস্থ করল। এই ১৫ই তারিখ যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, একদিকে ইহুদীরা যেমন বৃটিশ শাসন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্যালেষ্টাইনে ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতে লাগল, অপর দিকে তেমনি আরবরা ইহুদীদের রাষ্ট্র-গঠনে সর্বপ্রকারে বাধা দেবার জন্ত উঠে পড়ে দাঁড়াল।

মিশর, সৌদি আরব, ট্রান্সজর্ডান, সিরিয়া প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্র-গুলো প্যালেষ্টাইনের আরবদের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিল এবং প্যালেষ্টাইন সীমান্তে গিয়ে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শাসনের অবসানের জন্ত অপেক্ষা করতে লাগল।

জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান বৃটিশকে ১৫ই মে তারিখের পর আরও অন্তত দশদিন প্যালেষ্টাইনে অবস্থান করবার জন্ত অনুরোধ জানাল। কারণ জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান আশা করেছিল যে, ইতিমধ্যে হয়ত চেষ্টা ক'রে আরব ও ইহুদীদের একটা আপোষে আনা সম্ভব হবে।

বৃটিশ কিন্তু ১৫ তারিখের পর আর একদিনও থাকতে চাইল না। এ সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব জানালেন যে, অতিরিক্ত একদিনও থাকতে গেলে, আবার তাঁদের পার্লামেন্টের অনুমোদন নিতে হবে, এবং পার্লামেন্টে একথা উত্থাপন করতে গেলে, বহু বিতর্কের সৃষ্টি হবে। অতএব আর বেশী গোলযোগে না গিয়ে তারা ১৫ই তারিখেই প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করবে, এই তাদের স্থির সিদ্ধান্ত।

১৫ই মে রাত্রি ১২টার যথাসময়ে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শাসনের অবসান হ'ল। প্যালেষ্টাইনের কমিশনার লর্ড কানিংহাম সদলবলে প্যালেষ্টাইন ত্যাগ ক'রে স্বদেশ যাত্রায় উদ্যোগী হলেন। প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন স্থানের বৃটিশ সেনাদল সাঁজোয়া গাড়ী ও সমরসম্ভার প্রভৃতি নিয়ে স্বদেশে ফিরিবার জন্ত দলে দলে এসে হাইফা বন্দরে জড় হল এবং পরে সেখান থেকে তারা ইংলণ্ডে চলে গেল।

১৫ই মে ছিল শনিবার। শনিবারে ইহুদীদের কর্মবিরতির দিন ব'লে ১৫ই তারিখে ম্যাণ্ডেট শাসন অবসানের আট ঘণ্টা আগে তেল-আভিভ শহরে ইহুদী-জাতীয়-পরিষদের সদস্যরা এক সভায় সমবেত হয়ে ঘোষণা করল—প্যালেষ্টানের ইহুদী অধিবাসী এবং বিশ্বের ইহুদী আন্দোলনের পক্ষ থেকে, আমরা প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শাসন অবসানের দিনে এক মহান অনুষ্ঠানে সমবেত হয়ে ইহুদী জাতির ন্যায়সঙ্গত ও ঐতিহাসিক অধিকার বলে এবং জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনে "ইসরায়েল" রাষ্ট্র নামে এক ইহুদীরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করছি।

ঘোষণায় আরও বলা হল যে, শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত ইহুদী-জাতীয়-পরিষদ ইসরায়েলের অস্থায়ী গবর্ণমেন্টরূপে কাজ চালাবে। এই নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা সচিব হলেন মিঃ ডেভিড বেন গুরিয়ন এবং সভাপতি হলেন ডাঃ ওয়াইজম্যান।

ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হলে আমেরিকা, রাশিয়া, সুইডেন, নিউজিল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লোভিয়া প্রভৃতি একে একে এই নবজাত রাষ্ট্রকে স্বীকার ক'রে নিল।

কিন্তু এদিকে আরব লীগভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ ইহুদীরাষ্ট্রকে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইল না। আরব লীগের ৭টি রাষ্ট্র ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া স্থির করল। বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ১৫ই রাত্রি ১২টা বাজার পরমুহূর্তেই তারা ইহুদীরাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালাল। মিশরীয় সেনাবাহিনী দুইদলে বিভক্ত হয়ে, মিশরের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করল। আর একটি সাঁজোয়া বাহিনীসহ ১০ হাজার মিশরীয় সেনা সীমান্তে সমবেত হয়ে রইল। পরদিন এই মিশরীয় সেনাবাহিনীর একদল এনদাগুস্থিত ইহুদী উপনিবেশ ধ্বংস ক'রে দিল এবং অপর দল গাজা শহর অধিকার ক'রে নিল। এই মিশরীয় সেনারা বীরসেবাগামী সড়কে অবস্থিত একটি ইহুদী গ্রামকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

অপর দিকে ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লা ১৫ই তারিখে রাত্রেই তাঁর সেনাবাহিনীকে ইহুদীরাষ্ট্র আক্রমণের জন্ত পাঠাবার পূর্বমুহূর্তে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে তাঁর রাজ্যের সীমান্তে এলেন। তিনি তাঁর

রাজ্যের শেষ সীমা থেকে প্যালেষ্টাইনকে লক্ষ্য ক'রে কয়েকবার রিভলবারের গুলি ছোঁড়ায় সঙ্কেত ক'রে সৈন্যদের প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী অমনি প্যালেষ্টাইনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এইভাবে আরবরাষ্ট্রসমূহের সিরিয়া ও লেবাননের সেনাবাহিনী উত্তর দিক হতে, ট্রান্সজর্ডান ও ইরাকীবাহিনী পূর্ব দিক থেকে, সৌদি-আরব, ইয়েমেন ও মিশরীয় সেনাদল দক্ষিণ দিক থেকে প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করল।

ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের তোড়জোড় দেখে এবং এই রাষ্ট্রের পিছনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সমর্থন থাকায় প্যালেষ্টাইনবাসী আরবরা এতদিন অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল এবং তারা ভয়ে ইহুদীপ্রধান অঞ্চল জাফা, হাইফা প্রভৃতি শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু আরবলীগের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী প্যালেষ্টাইনে এসে পৌঁছতেই তাদের মনোবল অনেকগুণ বেড়ে গেল। দুর্দ্ধর্ষ বেদুইন ও নানা উপজাতির লোকও পাহাড় থেকে নেমে এসে তাদের পাশে দাঁড়াল।

এদিকে ইহুদীরাও আরবদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করল। ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হলে পর, ইহুদীদের ফৌজ হাগানা রাষ্ট্রীয় বাহিনীতে পরিণত হল। ইহুদীদের গুপ্ত রাজনৈতিক দল ইরগুণ এবং অপরাপর দলও হাগানাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল। নবগঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের আয়তন ৫,৫০০ বর্গমাইল। সমগ্র রাষ্ট্র জুড়েই বিভিন্ন ঘাঁটিতে ৭০ হাজারেরও বেশী ইহুদী নরনারীকে রাখা হল। ইসরায়েলের রাজধানী তেল-আভিভের চতুর্দিকে ৫০ হাজার ইহুদী সৈন্য মোতায়েন করা হল। ইহুদী কর্তৃপক্ষ ৩৫ বৎসর বয়স্ক পর্যন্ত সকল ইহুদী নরনারীকেই সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাল। এছাড়া সারা পৃথিবী ছড়িয়ে যে সব ইহুদী ছিল, তাদের মধ্যেও অনেকে নিজেদের জাতীয় আবাসভূমিকে রক্ষা করবার জন্য প্যালেষ্টাইনে গিয়ে জমা হতে লাগল। আরবরা ইহুদী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করতে পারে, এই আশঙ্কায় ইহুদী কর্তৃপক্ষ সমস্ত ইহুদী অধ্যুষিত শহরে নিষ্প্রদীপের এবং পল্লী-অঞ্চলগুলিতে পরিখা খননের আদেশ দিল।

এই ভাবে একদিকে আরব লীগভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ, অপর দিকে নবজাত ক্ষুদ্র ইসরায়েল রাষ্ট্র উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ইহুদীরা আরব অধ্যুষিত একার বন্দর, লেবানন সীমান্তের ইয়ুবা শহর প্রভৃতি অধিকার করে নিল; আবার আরবরা প্রাচীন জেরুজালেম শহর প্রভৃতি ইহুদী প্রধান অঞ্চলগুলো দখল করল। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বহু লোক হতাহত হতে লাগল।

প্যালেষ্টাইনের সমস্যা এই ভাবে ঘোরতররূপে দেখা দিলে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান প্যালেষ্টাইনের বিষয় আলোচনা করবার জন্য জরুরী বৈঠকের ব্যবস্থা করল। ক'বার বৈঠকও হল, কিন্তু কিছুই সমাধান হল না। প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধ বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করতে পারে এই জানিয়ে আমেরিকা সকল রাষ্ট্রকেই অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ জানাল। কিন্তু কেহই একথায় কর্ণপাত করল না। অধিকন্তু মিশর প্রভৃতি আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলো আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দিল যে, প্যালেষ্টাইনে সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নরমেধ যজ্ঞ বন্ধ করবার জন্যই তারা অভিযান শুরু করেছে এবং এর দ্বারা তারা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অবলম্বিত নীতির মর্যাদা রক্ষা ক'রেই চলছে।

এদিকে নবজাত ক্ষুদ্র ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রবল শত্রু-রাষ্ট্রসমূহের সম্মুখীন হয়ে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রার্থনা করল। অবশেষে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ৩০শে মের বৈঠকে প্যালেষ্টাইনে অন্ততঃ ৪ সপ্তাহের জন্য যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধরত আরব ও ইহুদীদের যুদ্ধ বন্ধ করবার নির্দেশ দিল।

আক্রমণকারী আরব রাষ্ট্রসমূহ কয়েকদিন ধ'রে নানা সর্ত্তের প্রশ্ন তুললেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত হল। আরবরা যুদ্ধ বন্ধ করলে ইহুদীরাও অস্ত্র ত্যাগ করল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাউণ্ট ফোকবার্ণা-দোতকে প্যালেষ্টাইনের জন্য সালিশ নিযুক্ত করল। প্যালেষ্টাইনে এই যুদ্ধ বিরতি অব্যাহত আছে কিনা দেখবার জন্যও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান থেকে সামরিক পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হল। কাউণ্ট বার্ণাদোত উভয়পক্ষের সহিত আলোচনা ক'রে ১১ই জুন ৪ সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতিচুক্তি সম্পাদন করলেন। কাউণ্ট বার্ণাদোত রোড্‌স দ্বীপে তাঁর নিরপেক্ষ হেড কোয়ার্টার স্থাপন ক'রে উভয়ের মধ্যে যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও শান্তি বজায় থাকে তার চেষ্টা করতে লাগলেন। উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ক'রে ২৮শে জুন বিশেষ গোপনে ইহুদী ও আরবদের নিকটে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন। ৪ঠা জুলাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান থেকে কাউণ্ট বার্ণাদোতের এই প্রস্তাব সরকারী ভাবে প্রকাশ করা হলে জানা গেল— প্যালেষ্টাইনে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে আরব ও ইহুদীদের নিয়ে একটা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাব আরবরা স্বীকার করতে কিছুতেই সম্মত হল না। আবার যুদ্ধ বেধে গেল।

জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বড় বড় শক্তিগুলো যদি নিঃস্বার্থ হয়ে প্যালেষ্টাইন সমস্যা আলোচনা করে, তাহলে আরব ও ইহুদীদের বিবাদ সুষ্ঠুভাবে মিটে যেতে পারে। কিন্তু তা না ক'রে তারা যদি প্যালেষ্টাইনের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ জড়াতে যায় তাহলে প্যালেষ্টাইন সমস্যা সুদূর পরাহত হয়ে দাঁড়াবে। প্যালেষ্টাইন নিয়ে এই স্বার্থের প্রশ্নই আজ বড় হয়ে উঠেছে, বিশেষ ক'রে ইংরাজের মধ্যে। তাই সে আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে সায় দিতে পারছে না এবং ইংরাজ একদিন নিজেই প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের বাসভূমি স্থির করে দেবার ঘোষণা করে থাকলেও আজ ইহুদী রাষ্ট্রকে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করছে।

১৪।৭।৪৮

মাধ্যাকর্ষণের বিপর্য্যয়

তাৎপর্য—নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস দ্বারা রিক্সাওয়ালা যে কোন মাংসালো ওজনের সমতার অবলীলাক্রমে সামলাইয়া থাকে। কতটা ক্ষুধার চাপ পড়িলে এইরূপ সম্ভব হইতে পারে, জানা নাই। এ বিষয় কেহ আলোকপাত করিলে মানুষ যন্ত্রের উপকার হইতে পারে।

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
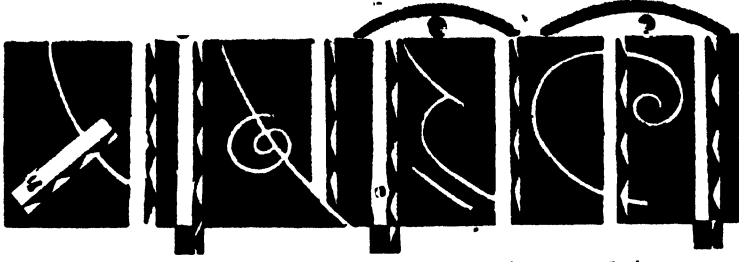
সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষা বোর্ড—

পূর্ব্ব পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক ও শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে লইয়া একটি প্রাদেশিক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক জেলার জন্য নিম্নলিখিতরূপ বোর্ডও গঠিত হইয়াছে—ঢাকা—(১) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী (২) শ্রীভারতচন্দ্র সরকার ও (৩) শ্রীভবেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মৈমনসিংহ—(১) শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সরকার (২) শ্রীমনোরঞ্জন ধর ও (৩) শ্রীবিনোদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বাখরগঞ্জ—(১) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত (২) শ্রীঅবনীনাথ ঘোষ ও (৩) শ্রীউপেন্দ্রনাথ এদবার। ফরিদপুর—(১) শ্রীকৈলাশচন্দ্র সরকার (২) শ্রীবিশ্বেশ্বর বিশ্বাস ও (৩) শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস। রাজসাহী—(১) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (২) শ্রীতানদার ও (৩) শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ। রঙ্গপুর—(১) শ্রীবিজয়চন্দ্র মৈত্র (২) শ্রীতারিণীকান্ত সরকার ও (৩) শ্রীরজনীকান্ত রায় বর্ম্মণ। দিনাজপুর—(১) শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় (২) শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় ও (৩) শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু। পাবনা—(১) শ্রীকুমুদনাথ সরকার (২) শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু সরকার (৩) শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার। বগুড়া—(১) শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত (২) শ্রীসুবোধচন্দ্র লাহিড়ী ও (৩) ডাঃ রমণীমোহন দাস। খুলনা—(১) শ্রীপ্রমথ বিশ্বাস (২) ডাঃ রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় ও (৩) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার। যশোহর—(১) ডাঃ জীবনরতন ধর (২) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায় ও (৩) শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার। কুষ্টিয়া—(১) শ্রীপূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক (২) শ্রীকালীপদ মজুমদার ও (৩) শ্রীমতী প্রভাবতী চক্রবর্ত্তী। চট্টগ্রাম—(১) শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা (২) শ্রীযতীন্দ্রকুমার রক্ষিত ও (৩) শ্রীমণীন্দ্রভূষণ দত্ত। নোয়াখালি—(১) শ্রীচারুভূষণ চৌধুরী (২) শ্রীআশুতোষ নারায়ণ চৌধুরী ও (৩) শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস। ত্রিপুরা—(১) শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাস)২) শ্রীআশুতোষ সিংহ ও (৩) শ্রীবলাই ধর। শ্রীহট্ট—(১) শ্রীজগবন্ধু সরকার (২) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস ও (৩) শ্রীরমেশরঞ্জন সোম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রাদেশিক বোর্ডের ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ জেলা বোর্ডের সভাপতি হইবেন। প্রাদেশিক বোর্ডে ২ জন ও জেলা বোর্ড সমূহে ২ জন করিয়া সদস্য মনোনীত করা হইবে। এই বোর্ডগুলি যদি সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হয়, তবেই এগুলি গঠন করা সার্থক হইবে।

বাংলার নূতন গভর্ণর ডাঃ কাটজু, ভারতের নূতন গভর্ণর-জেনারেল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ও বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
ফটো—শ্রীপান্না সেন

বাসযাত্রী সমস্যা—

কলিকাতায় বাসযাত্রীদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—(১) বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের সভাপতি পদে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মত একজন খ্যাতনামা দেশ-সেবককে বসান হউক (২) কলিকাতার ৫ জন খ্যাতনামা দেশ-সেবককে লইয়া একটি পরামর্শদাতা সভা গঠন করা হউক (৩) যাত্রীদের

সহিত ভদ্র ব্যবহার করিবার জন্ম বাস-ড্রাইভার ও বাস-কণ্ডাক্টারদিগকে উপযুক্ত নির্দ্দেশ দানের ব্যবস্থা করা হউক (৪) বেশী সংখ্যায় বাঙ্গালী ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টার নিয়োগের জন্ম বাসের মালিকদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হউক (৫) বাস চালনায় বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে যে তিক্ত মনোভাব সৃষ্ট হইযাছে, তাহা দূর করিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে প্রীতি সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হউক। ইহার পর বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন বাস সিণ্ডিকেটের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস তিনি বাস-পরিচালন-সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইবেন।

কলিকাতায় আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা মিঃ ডি ভ্যালেরার সম্বর্দ্ধনা
ফটো—শ্রীপান্না সেন

গান্ধী-হত্যার মামলা—

গত ২৭শে মে দিল্লীতে লাল কেল্লায় গান্ধী-হত্যা সম্পর্কে ধৃত আসামীদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে—আসামীদের নাম—(১) নাথুরাম বিনায়ক গডসে (২) নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্‌তে (৩) বিষ্ণু রামকৃষ্ণ কারকারে (৪) দিগম্বর রামচন্দ্র বেজ (৫) মদনলাল (৬) গোপাল বিনায়ক গডসে (৭) শঙ্কর কৃষ্ণায়া (৮) বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও (৯) ডি এস পারচুরে। মামলার রায় জানিবার জন্ম সমগ্র জগতের অধিবাসী উৎসুক হইয়া আছে।

নূতন বিচারপতি—

স্বর্গত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি ৫১ বৎসর বয়সে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বি-এ, এম-এ ও আইন—সকল পরীক্ষাতেই প্রথম

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হইয়াছিলেন। হাইকোর্টে উকীল হইয়া ক্রমে তিনি গভর্ণমেণ্ট প্লীডার হন। তিনি দুইবার কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও দুইবার রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্যরূপে তিনি এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বাঙ্গালার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি।

পশ্চিমবঙ্গে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী—

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন—(১) শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২) শ্রীনিশাপতি মাঝি (৩) শ্রীকানাইলাল দাস (৪) শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক (৫) শ্রীহেমন্তকুমার বসু (৬) শ্রীহরেন্দ্রনাথ দলুই ও (৭) শ্রীধীরেন্দ্র

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ধীরেন্দ্রবাবু পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর কাজ ছাড়াও চিফ হুইপের কাজ করিবেন।
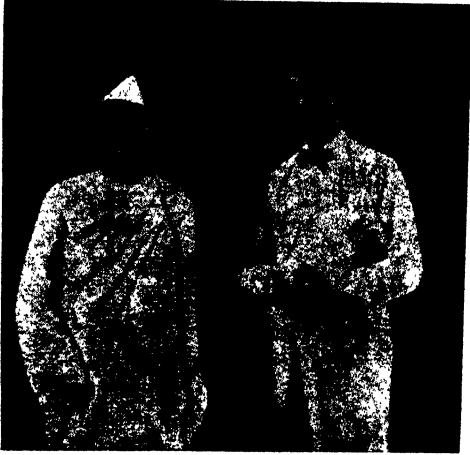
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও মিঃ ডি ভ্যালেরা ফটো—শ্রীপান্না সেন

পুনরায় মন্ত্রিত্ব লাভ—

শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর ও শ্রীযুত মোহিনীমোহন বর্ম্মণ পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন। প্রধান-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের চেষ্টার ফলে তাঁহারা এতদিন বেকার ছিলেন। গত ২৯শে জুন তাঁহাদের আবার ডাঃ বিধানচন্দ্রের মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীযুত নস্কর বন ও মৎস্যচাষ বিভাগ এবং শ্রীযুত বর্ম্মণ আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন নলিনীরঞ্জন সরকার অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প এবং শ্রীযুত যাদবেন্দ্র পাঁজা কৃষি ও পশুচিকিৎসা বিভাগের কাজ করিবেন। নিরপেক্ষ থাকার ফলে শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার মহাশয় কয়দিন পরেই মন্ত্রীর কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন মন্ত্রি সভার মোট সদস্যসংখ্যা হইল ১৩জন।

পুলিসের দুর্নীতি ও নিষ্ক্রিয়তা—

গত ১৮ই আষাঢ় কলিকাতা লালবাজারে পুলিস কর্ম্মচারী সম্মিলনে পশ্চিম বঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় প্রথম বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি তথায় পুলিসের দুর্নীতি ও নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে যে অপবাদ আছে, তাহা হইতে সকলকে মুক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। পুলিস যে জনগণের সেবক মাত্র—স্বাধীনতা লাভের পর তিনি পুলিসকে সকল সময়ে সেকথা স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন। সর্ব্বত্র পুলিসের সহিত জনগণের সহযোগিতা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, কর্ত্তৃপক্ষের সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।

দমদম বিমান-ঘাটিতে ভারত গভর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারী ও পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর মিঃ কাটজু ফটো—শ্রীপান্না সেন

নূতন প্রদেশ গঠন—

অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র নামক ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে ৪টি নূতন প্রদেশ গঠন সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরু নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক কমিশন গঠন করিয়াছেন—(১) এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীএস-কে-দর (২) ভূতপূর্ব্ব আই-সি-এস শ্রীযুক্ত পান্নালাল (৩) গণ-পরিষদের সদস্য শ্রীজগৎনারায়ণ লাল (৪) বিহারের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল শ্রীবি-সি বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষোক্ত ব্যক্তি কমিশনের সেক্রেটারী হইবেন। তাহা ছাড়া মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরার হইতে কয়েকজন সহায়ক

সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা আসামের সীমানির্দ্ধারণ সমস্যা সমাধানের জন্যও কি ঐরূপ কমিশন নিযুক্ত হইতে পারে না?

কলিকাতায় মিঃ ডি ভ্যালেরা ফটো—শ্রীপান্না সেন

বালী বিমান-ঘাটিতে মিঃ ডি ভ্যালেরা ফটো—শ্রীপান্না সেন

পরলোকে সত্যানন্দ বসু—

খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী সত্যানন্দ বসু গত ৪ঠা জুলাই সকালে বালীগঞ্জ নন্দী ষ্ট্রীটে স্বগৃহে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া তিনি ১০ বৎসর ওকালতী করেন ও পরে ১৮৯৫ সালে ওকালতী ছাড়িয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি সারাজীবন কংগ্রেস, শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতায় সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল।

পাকিস্থানে চালান দেওয়ার প্রাক্কালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে রেলওয়ে পুলিস কর্ত্তৃক ১৭ গাঁট কাপড় আটক ফটো—শ্রীপান্না সেন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট—

গত ৩০শে জুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যে বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় আয় অপেক্ষা আগামী বৎসরে ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বেশী হইবে। উহার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ উন্নতির জন্য ১৭ লক্ষ টাকা ও কর্ম্মচারীদের ভাতা ও বেতন বৃদ্ধি বাবদ সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পরিচালন ব্যবস্থা যে বহু ত্রুটিপূর্ণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কলিকাতা কর্পোরেশন সম্বন্ধে যেমন তদন্ত কমিশন বসাইয়া সংস্কার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। সকল পরীক্ষার ফি ৫ টাকা করিয়া বাড়াইয়া আয় ৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যয় হ্রাসের

উপায় সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালীর গৌরবের প্রতিষ্ঠান—তথায় দলীয় রাজনীতি প্রবেশ করিয়া তাহাকে যেন কলুষিত না করে—সকলে তাহাই কামনা করে।

শ্রমিক ফেডারেশন গঠন করিয়াছেন। ফেডারেশন কম্যুনিজমের বিরোধিতা করিবে। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে শ্রমিকদের উন্নতিবিধানই ফেডারেশনের লক্ষ্য হইবে।

আন্তঃ ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রী ও চিফ্ সেক্রেটারীদ্বয়ের কলিকাতার রাইটাস্ বিল্ডিংএ অধিবেশন ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সীমান্ত গান্ধীর কারাদণ্ড—

গত ১৫ই জুন সীমান্ত গান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খানকে কোহাট জেলার বাহাদুরখেল নামক স্থানে সীমান্ত-অপরাধ-দমন আইনে গ্রেপ্তার করিয়া পরদিন রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সীমান্ত গান্ধীর পুত্র খাঁ আবদুল ওয়ালী খাঁ এবং সীমান্ত লালকোর্ত্তা দলের নেতা আবদুল আজিজ খাঁ ও খাঁ ইয়াকুব খাঁকেও গ্রেপ্তার করিয়া কোহাট জেলে রাখা হইয়াছে।

এসিয়া শ্রমিক ফেডারেশন—

গত ৪ঠা জুলাই সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত হরিহরনাথ শাস্ত্রী জানাইয়াছেন যে, ভারত, পাকিস্থান, চীন, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেসিয়া, ফিলিপাইন ও পারস্য হইতে আগত প্রতিনিধিদল একটি এসিয়া

কাশ্মীর যাইবার ছাড়পত্র—

১লা জুলাই ভারতগভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে কেহ যদি কাশ্মীরে যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে ভারত সরকারের দেশরক্ষা দপ্তর হইতে ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। কাশ্মীর ও জম্মু হইতে ভারতে আসিতে হইলে সেখানকার সরকারের ছাড়পত্র প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে।

জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান—

২৪পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ-সভাপতি শ্রীযুত হৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে সম্প্রতি ২৪পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত ২০শে জুন জেলা বোর্ডের অন্যতম সদস্য শ্যামনগর গুড়দহ নিবাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে বারাকপুর

মহকুমা সমিতির কার্য্যকরী সভাপতি শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় প্রফুল্লবাবু ও হৃদয়বাবুকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সভায় বারাকপুর মহকুমার সহর ও গ্রামাঞ্চলের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

(১) দিল্লী-ভূপাল-নাগপুর-হায়দ্রাবাদ-মাদ্রাজ (২) হায়দ্রাবাদ-বাঙ্গালোর ও (৩) হায়দ্রাবাদ-বোম্বাই লাইনে বিমান চালাইত, তাহাদের লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে ও ঐ লাইনের বিমানে তৈল-সরবরাহ বন্ধ করা হইয়াছে। সঙ্গে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু বার্ষিকী—কেওড়াতলায় দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেশবন্ধুর আবক্ষ মর্মর মূর্তির সম্মুখে গভর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারী

ফটো—শ্রীপান্না সেন

ধানবাদে ১৩ই মে ডেরাডুন একস্‌প্রেস দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিগণ

ফটো—শ্রীপান্না সেন

হায়দ্রাবাদ-সমস্যা সঙ্গীন—

গত ২রা জুলাই ভারত গভর্ণমেণ্ট হায়দ্রাবাদে বিমান চলাচল বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন। যে কোম্পানী সঙ্গে ঐ দিনই ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হায়দ্রাবাদে সোনা, গহনা, মূল্যবান প্রস্তর, কারেন্সি নোট, ব্যাঙ্ক নোট প্রভৃতি লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আরও

প্রকাশ, হায়দ্রাবাদের নিজাম সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তুরস্কে চলিয়া যাইতেছেন ও তাঁহার পুত্র নিজাম হইবেন।

সাহিত্যিকের সম্মান লাভ—

বর্ত্তমানে যে কয়জন সাহিত্যিক পাঠক সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। সম্প্রতি 'কথাশিল্পে' প্রকাশিত তাঁহার
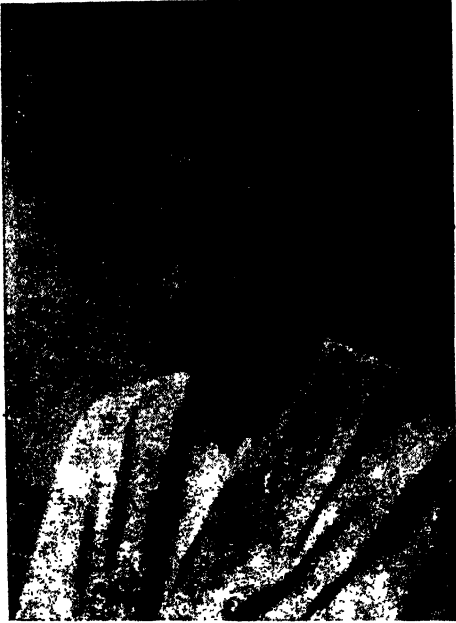
শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

'ইতিহাস' গল্পটি পাঠকগণের ভোটে শ্রেষ্ঠ গল্প বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই অনুযায়ী তিনি ক্যাল-কেমিকো প্রদত্ত ১০০০্ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক এবং জনপ্রিয় সাহিত্যিক। তাঁহার এই সম্মান লাভে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

কাশ্মীরে সেনাপতি নিহত—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ ওসমান কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যদল পরিচালন করিতেছিলেন। গত ৪ঠা জুলাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে আনিয়া সামরিক আড়ম্বরের সহিত শেষকৃত্য করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী—

শ্রীসুধাংশুশেখর বসু যুক্তপ্রদেশের উনাও জেলায় জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৯৪৮ সালে উক্ত প্রদেশের সিভিল (জুডিসিয়াল) সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান

শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর বসু

অধিকার করিয়াছেন। প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন উক্ত পরীক্ষা পরিচালনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এই সাফল্যে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরববোধ করিবেন।

যুক্তপ্রদেশ নির্ব্বাচন—

যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকটি সদস্য-পদ খালি হওয়ায় সে সকল স্থানে সম্প্রতি উপ-নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। সকল কেন্দ্রেই কংগ্রেস-প্রার্থীরা সমাজতান্ত্রিক-দলের প্রার্থীদের পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছে। ঐ সকল কেন্দ্রে ভোট সংগ্রহের জন্য শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সকল সমাজতন্ত্রী দলের নেতা গত কয়েক দিন ঐ অঞ্চলে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কোন কেন্দ্রেই সমাজতন্ত্রী-প্রার্থী জয়লাভ করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের যে সন্ন্যাসী দল সম্প্রতি আফ্রিকায় হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার করিতে গিয়াছেন, সেই

লে ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণও তথায় গিয়াছেন। তিনি সংঘের

রাজকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

প্রচার বিভাগের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা থাকিয়া সেখানে প্রচার কার্য্য চালাইবেন।

পরলোকে তরুবালা—

২৪পরগণা মহেশতলা নিবাসী ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী তরুবালা দেবী গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ পরলোকগমন

তরুবালা দেবী

করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে দেবোত্তর আইন প্রচলনের দ্বারা দেশের দেবস্থানগুলিতে দুর্নীতি নিবারণের জন্য তিনি গত কয় বৎসর ধরিয়া নানাভাবে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে পুস্তিকাদি প্রচার করিয়া জননেতাদিগের ও পশ্চিম বঙ্গের সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

পরলোকে শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী—

ঝরিয়ার জমীদার শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র শিশিরকুমার সম্প্রতি মাত্র ১৪ বৎসর ৯মাস বয়সে পরলোক
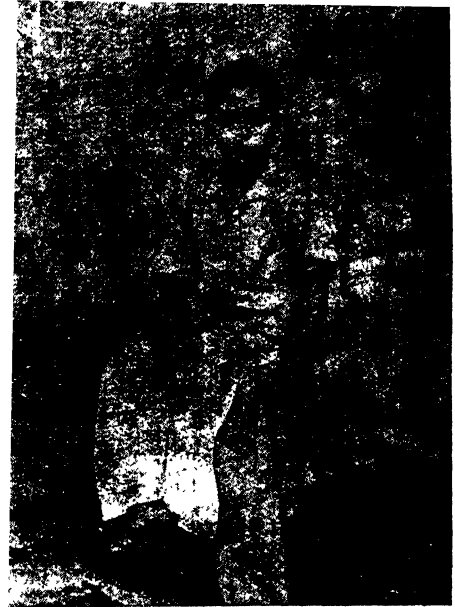
শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী

গমন করিয়াছে। মৃত্যুর ৬ মাস পূর্ব্বে সে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল এবং ধ্যানে বসিয়া ২।৩ ঘণ্টা কাল অজ্ঞান হইয়া থাকিত। সে মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তাহার সমস্ত জিনিষ দান করিয়াছিল। পূর্ব্বজন্মের কথাও সে বলিতে পারিত।

পরলোকে সুকুমার চট্টোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ইন্সপেকটার জেনারেল অব্ রেজিষ্ট্রেসন সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের কর্ম্মসচিব, বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভাপতি, বাঁকুড়া জেলা উন্নয়ন সমিতির সভাপতি প্রভৃতি থাকিয়া জনহিতকর কার্য্য করিতেছিলেন। ১৯০৬ সালে

তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং রায়বাহাদুর ও এম-বি-ই উপাধি পাইয়াছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত একাউন্টেন্ট জেনারেল শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

ডাঃ রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার ডাঃ রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল এম-এসসি, এম-বি, ডি-পি-এইচ, ডি-টি-এম তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। যৌবনে স্বদেশ ও সমাজসেবার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমৃত্যু তাহাই সাধন করিয়া গিয়াছেন। বহু জনহিতকর কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মীনেন্দ্রনাথ বসুর সহযোগে রচিত An Introduction to Anthropology এবং Elements of Pre-history নামক পুস্তকদ্বয় তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির নিদর্শন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর হইয়াছিল।

রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল

বিনা টিকিটে ভ্রমণ—

রেল, ট্রাম প্রভৃতিতে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীর সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। মানুষের মন দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার ইহাই ফল। সম্প্রতি হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকুমার অধিক্রম মজুমদার ৬জন বিনা টিকিট ভ্রমণকারীকে এক অভিনব শাস্তিদান করিয়াছেন। তিনি উলুবেড়িয়া হইতে রেলে প্রথম শ্রেণীর যে কামরায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, ৬জন যাত্রী বিনা টিকিটে সেই কামরায় উঠিয়াছিল। তিনি হাওড়া ষ্টেশনে অপরাধীদিগকে সকলের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া নিজ নিজ কর্ণমর্দ্দন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহার পরও লোকের চৈতন্যোদয় হইবে কিনা কে জানে?

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি—

খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও জননেতা শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৭ই জুন হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রথম জীবন হইতেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেন। প্রথমে কংগ্রেস-নেতারূপে ও পরে হিন্দুসভা নেতারূপে তিনি দেশহিতকর কার্য্য করিয়াছেন।

পরলোকে অশোকনাথ শাস্ত্রী—

বিশিষ্ট পণ্ডিত ও মনীষী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস, বেদান্ততীর্থ গত ১৬ই জুলাই সকালে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বাগবাজারস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ২৪পরগণা হরিনাভী নিবাসী পণ্ডিত অমরনাথ বিদ্যাবিনোদের পুত্র ও অধ্যাপক ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁহার সুকণ্ঠ আবৃত্তি অসাধারণ ছিল। সভানুষ্ঠানে তাঁহার মঙ্গলাচরণ সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের গুরু'ও পুরোহিত ছিলেন এবং সেজন্য-ঐ পরিবারের রাজনীতি আলোচনার সহিতও তাঁহার সংযোগ ছিল। মাত্র ৬মাস পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। তাঁহার একমাত্র বিবাহিতা কন্যা ও ১৮ বৎসর বয়স্ক এক পুত্র বর্ত্তমান। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তিনি লেখক ও বক্তা ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অকালবিয়োগে বাঙ্গালার এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

পরলোকে ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত—

খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত গত ৮ই জুলাই মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে পুরুলিয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯২২ সালে সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন ও সেজন্য বহুবার তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। তিনি বহু বৎসর মন্ত্রী শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহকর্ম্মীরূপে আরামবাগে গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মানভূমের আদিবাসীদের মধ্যে সংগঠন কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন দেশপ্রাণ কর্ম্মীর অভাব হইল।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

আই এফ এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলার ফলাফল এখনও চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়নি। খেলা প্রায় শেষ হতে চলেছে। প্রথম বিভাগের লীগে মহঃস্পোর্টিং ২১টা খেলায় ৩৯ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আছে। সমান ম্যাচ খেলে মোহনবাগান ক্লাব ৩৭ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে এই দুই দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব দুর্ভাগ্যক্রমে মহঃস্পোর্টিং দলের সঙ্গে লীগের দুটি খেলাতেই হেরে যাওয়ায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরে গিয়ে উপস্থিত ২১টা খেলায় ৩৩ পয়েণ্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে। মোহনবাগান ক্লাবকে অবশিষ্ট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে মহঃস্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল এবং কাষ্টমস দলের সঙ্গে। এই সমস্ত খেলায় জয়লাভ করলে পর মহঃস্পোর্টিংয়ের পয়েণ্টের সঙ্গে সমান বা অতিক্রম করবার আশা আছে। প্রথমার্দ্ধের খেলায় মোহনবাগান 'ড্র' করেছিল। ইষ্টবেঙ্গল এবং মহঃস্পোর্টিংয়ের সঙ্গে অপরদিকে মহঃস্পোর্টিং প্রথমার্দ্ধের খেলায় রেঞ্জার্সে'র সঙ্গে খেলা ড্র করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই তিনটি ক্লাবের যে সব খেলা বাকি আছে তার ফলাফলের উপরই মহঃস্পোর্টিং এবং মোহনবাগান ক্লাবের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ভর করছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ১৯৪৪ সালের লীগ খেলায় মোহনবাগান বনাম মহঃস্পোর্টিং দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং শেষ ফল নিষ্পত্তি হয়েছিল উভয় দলের খেলাতেই। সেবার মহঃস্পোর্টিং খেলা ড্র করতে পারলেই লীগ বিজয়ী হ'ত কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ১-০ গোলে পরাজিত হয়ে লীগে রানার্স আপ হয়েছিল।

মহঃস্পোর্টিংয়ের তুলনায় মোহনবাগানের গোল এভারেজ অনেক ভাল। মহঃস্পোর্টিং ২১টা খেলায় ৩৩ গোল দিয়ে ৬টা গোল নিজে খেয়েছে। মোহনবাগান ৪০টা গোল দিয়ে মাত্র ২টো গোল খেয়েছে। প্রথমবিভাগের লীগ তালিকায় কাষ্টমসই সর্ব্ব নিম্ন স্থানে রয়েছে; ক্যালকাটা ২টো কম খেলে ২ পয়েণ্ট উপরে আছে। কোনরূপ অঘটন না ঘটলে ক্যালকাটা এ যাত্রা রক্ষা পাবে।

দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে রাজস্থান ক্লাব, ১৫টা খেলায় ২৬ পয়েণ্ট নিয়ে। রনার্স আপ দলের থেকে রাজস্থান ক্লাব অনেক পয়েণ্ট এগিয়ে থাকবে।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টেষ্টম্যাচ ঃ

ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়াদলের ক্রিকেট টেষ্টম্যাচ এ মুরসুমে আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রথম দুটো খেলাতেই অষ্ট্রেলিয়া বিজয়ী হয়েছে।

প্রথম টেষ্টম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া আট উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস : **১৬৫** (জে লেকার ৬৩ রাণ করেন। জনষ্টন ৬৩ রাণে ৫, মিলার ৩৮ রাণে ৩ উইকেট পান)

দ্বিতীয় ইনিংস : **৪৪১** (ডেনিস কম্পটন ১৮৪, হাটন ৭৪ রাণ, ইভান্স ৫০ রাণ করেন। মিলার ১২৫ রাণে ৪ এবং জনষ্টন ১৪৭ রানে ৪ উইকেট পান।

অষ্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস : **৫০৯** (ব্র্যাডম্যান

১৩৮, হ্যাসেট ১৩৭ রাণ করেন। লেকার ১৩৮ রাণে ৪ উইকেট পান)

দ্বিতীয় ইনিংস **৯৮** (২ উইকেটে। বার্ণেস নট আউট ৬৪ রাণ করেন। বেডসর ৪৬ রাণে ২ উইকেট পান)

দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচ ঃ

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ৪০৯ রাণে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছি।

অষ্ট্রেলিয়া : ১ম ইনিংস : **৩৫০** (আর্থার মরিস ১০৫ ও ট্যালিন ৫৩ রাণ করেন। বেডসার ১০০ রাণে ৪ উইকেট পান)

দ্বিতীয় ইনিংস : **৪৬০** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বার্ণস ১৪১ ; ব্র্যাডম্যান ৮৯ ; মিলার ৭৪ ; মরিস ৬২ রাণ করেন। ইয়ার্ডলে ৩৬ রাণে ২ উইকেট পান)

ইংলণ্ড : ১ম ইনিংস : **২১৫** (কম্পটন ৫৩ এবং ইয়ার্ডলে ৪৪ রাণ করেন। লিণ্ডওয়াল ৭০ রাণে ৫ উইকেট পান)

২য় ইনিংস : **১৮৬** (ওয়াসব্রুক এবং ডলারী উভয়ে ৩৭ রাণ করেন। টসাক ৪০ রাণে ৫, লিণ্ডওয়াল ৬১ রাণে ৩ এবং জনষ্টন ৬২ রাণে ২ উইকেট পান)

ইংলণ্ডে বিশ্বের অলিম্পিক গেমস ঃ

১৯৩৬ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসের পর ১৯৪০ সালে জাপানে হবার কথা ছিল কিন্তু যুদ্ধের জন্য বিশ্বের অলিম্পিক গেমস প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। এবার ইংলণ্ডে বিশ্বের অলিম্পিক গেমস প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে আগামী ২৯শে জুলাই থেকে। বিশ্বের এই অলিম্পিক গেমস প্রতিযোগিতার বিবিধ খেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে নানা জাতির লোক নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান ক'রে শরীর-চর্চ্চায় দেশের কৃতিত্ব প্রদর্শন করার সুযোগ লাভ করে। সুতরাং এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব কোনপ্রকারে উপেক্ষনীয় নয়। পৃথিবীর সকল দেশের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানে দুই কারণে বাধা আছে। প্রথমতঃ খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক কারণ। প্রথম কারণের ব্যতিক্রম অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিন্তু দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরে বিশ্বের অলিম্পিক গেমসেই রাজনৈতিক কারণে জার্মাণী, রাশিয়া এবং জাপানকে যোগদান থেকে বিরত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৬ সালের বিশ্ব অলিম্পিক গেমস প্রতিযোগিতায় জার্মাণী বহু পয়েণ্ট নিয়ে প্রথম হয়েছিল এবং জাপান বিশেষ ক'রে সাঁতারের কয়েকটি বিষয়ে প্রথম হয়ে অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিল। জগতের লোকের কাছে পরিচিত অনগ্রসর জাপান ১৯৩৬ সালের বিশ্ব অলিম্পিক খেলায় বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু জার্মাণ এবং জাপান যেহেতু গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ এবং আমেরিকার শত্রুপক্ষ ছিল সেইহেতু অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় এদের যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঠিক অনুরূপ কারণে রাশিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ ও আমেরিকার মিত্র হয়েও বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই দুই দেশের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখতে না পারার জন্য বাদ পড়েছে। ইংলণ্ডের বিশ্ব অলিম্পিক গেমসে এবার ৬০টি দেশ যোগদান করবে বলে নাম পাঠিয়েছে। মোট ১৭টি স্পোর্টসের ১৩৬টি অনুষ্ঠান আছে।

বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় ঃ

বাঙ্গালী যুবকের জীবনে হাসি আহ্লাদ অনেকদিন আগে উপে গেছে। এমন একদিন ছিল যখন বাঙ্গালী যুবকের দল বৈদেশিক কুশাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করবার চেষ্টার অপরাধে ফাঁসির মঞ্চে হাসি মুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছে ; তাঁদের সে হাসি সারা ভারতবর্ষের জনগণের মনে একদিকে বিস্ময়, সাহস এবং দেশাত্মবোধ জাগরুক করেছে অপরদিকে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তার পর আরম্ভ হয়েছে বাঙ্গালীর উপর নির্ম্মম বৈদেশিক অত্যাচার। সরকারী চাকুরীর বিজ্ঞাপণে প্রকাশ্য ঘোষণা করা হয়েছে 'বাঙ্গালীর আবেদনের প্রয়োজন নাই'; যে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের সরকারী অফিসের উচ্চ পদগুলিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়শীর্ষস্থান নিয়ে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করতো হঠাৎ দেখা গেল বাঙ্গালীরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হচ্ছে, শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা বাঙ্গালা দেশে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী মারফৎ বৃটিশ মূলধন নিয়োজিত ক'রে বাঙ্গলার অর্থনৈতিক জীবনে এক মহা সংকট অবস্থার সৃষ্টি করেছে, বাঙ্গলা ভাষাভাষি অঞ্চলগুলি চারিপাশের প্রদেশগুলির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বাঙ্গালার স্বাধীনতার যুদ্ধ প্রচেষ্টা, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি অঙ্গ

প্রদেশের শাসন এবং প্রভাব দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে পিষে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক কথায় ইংরেজের পরম শত্রু বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব বিলোপের বিবিধ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সেইদিক থেকে বৈদেশিক শাসকবর্গের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধিলাভ করেছে আজ বাঙ্গালীর শোচনীয় অবস্থাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বিগত প্রায় দুই শত বৎসরের বৈদেশিক শাসনে বাঙ্গালী জাতির উপর কত বিভিন্ন ধরণের কূটনৈতিক গবেষণামূলক পরীক্ষা চলেছে যাতে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে কায়েম থাকে। বাঙ্গালী যুবকদের মুখে আজ আর প্রাণ খোলা হাসি নেই। আজ বাঙ্গলার সমাজ জীবন যে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, এখনও যদি আমরা সচেতন না হই, জাতির অস্তিত্ব চিরদিনের জন্যই লোপ পাবে; ইতিহাস এমন বহু জাতির বিপর্য্যয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। খেলার মাঠে অভিযোগ শুনতে পাই আগের মত বাঙ্গালীর ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই। আগের মত জীবন ধারণের মান আমাদের আছে কি? জীবন ধারণের চিন্তায় যদি বাঙ্গালীকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়, খেলার সাধনা কোথা থেকে আসবে? বহুদিন থেকে বাঙ্গালী যুবকদের খেলাধূলা থেকে বিমুখ করেছে এ দেশের খেলাধূলা প্রতিষ্ঠানগুলির অবলম্বিত নীতি। ফুটবল ক্লাবগুলি দলের জয়লাভই বড় করে দেখেছে এবং তা বজায় রাখা হয়েছে বাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে নয়, অবাঙ্গালী খেলোয়াড় সংগ্রহ ক'রে। আইনের ছিদ্র পথে এরা সকলেই সখের খেলোয়াড় কিন্তু আজও কি আমাদের বাঙ্গালা দেশের ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালক মণ্ডলীর বিবেক এইভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করবে? চ্যারিটি ম্যাচ খেলার দু'তিন আগে থেকে ফুটবল খেলোয়াড়দের দুরবস্থা দেখেছি। সখের বাঙ্গালী খেলোয়াড়! পাড়ায় ভক্তের এবং গুণগ্রাহীর অভাব নেই। সকলের টিকিটের প্রয়োজন। আত্মীয় স্বজনেরাও আছেন। অফিসে বড়বাবু এবং বন্ধুবান্ধব। তাঁদের টিকিট সংগ্রহ ক'রে দিতে না পারলে জীবন সংগ্রামে সখের খেলার অপমৃত্যু হবে। চাকুরীতে প্রমোশন চাই, ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে মিনিট কুড়ি আগে অফিস থেকে না বেরুতে পারলে রোদ-বৃষ্টিতে তাঁবুতে পৌছানো এক বিড়ম্বনা। বড়বাবুর শরণাপন্ন হতে হয়, নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে অফিস থেকে বের হওয়ার জন্য হাতের কাজ বন্ধুদের দিয়ে করাতে হবে চ্যারিটি ম্যাচের টিকিটের কড়ার দিয়ে। কণ্ট্রোলের রেশন এবং ট্রাম-বাসে গুঁতো খেয়ে হাঁটা রাস্তায় গলদঘর্ম্ম হয়ে আমাদের দেশের সখের বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা তাঁবুর দিকে ছুটেন। পিছনে একপাল ছেলে শাসাচ্ছে আজ জিততে না পারলে টেংরী খুলে নেবো, জুয়াড়ী দর্শকেরাও তাঁবুর আশে পাশে ঘুরছে কোন ভাড়াটে খেলোয়াড়কে গাঁথা যায় কিনা। গোটা কয়েক চ্যারিটি ম্যাচের টিকিটের জন্যে নামকরা খেলোয়াড়দের অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁবুতে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে দেখেছি, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কি কাকুতি মিনতি! বাঙ্গালীর এই সখের খেলোয়াড় জীবনে আমরা অধিক কি আশা করতে পারি! এ খেলায় না আমরা দেশের ছেলেদের স্বাস্থ্য সঞ্চয় করতে পেরেছি, না পেয়েছি সুস্থ আবহাওয়া। আজ আমাদের একজোট হয়ে ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী তৈরী করে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হ'তে হবে, জাতির জীবনকে এমন নির্ম্মমভাবে উপেক্ষিত হ'তে দোব না।

বিদেশী ফুটবল খেলা আমরা অনেকদিন ধরে অনুকরণ করছি কিন্তু এর আদর্শ আমরা জীবনে কি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি? ইংলণ্ডের ফুটবল খেলার মান অনেক উঁচু এবং সেখানের খেলোয়াড়রাও বাংলা দেশের মত অবহেলিত নয়। পেশাদারী খেলার প্রথা সেখানে আছে বলেই ভাল সখের খেলোয়াড় তৈরী হয়।

ফুটবল প্রসঙ্গ ঃ

আজ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন নানা জটিল সমস্যায় এমনভাবে বিপর্য্যস্ত হয়েছে যে, মানুষের পদে পদে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে। এদিকে খেলার মাঠে একশ্রেণীর দর্শকের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে রেফারীর পক্ষে খেলা পরিচালনা অসম্ভব হয়ে উঠেছে; এমন কি রেফারীর জীবনবিপন্নের সম্ভাবনার কারণও দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের কাছে আজ খেলার মাঠের সমস্যাটা খুব বড় নয় এবং তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা যে সম্ভব নয় তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু খেলাধূলার উদ্দেশ্য যদি এইভাবে ব্যর্থ হ'তে চলে তাহলে ভবিষ্যতে জাতির মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে পড়বে। খেলাধূলার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র শরীর চর্চ্চা নয় কিম্বা দর্শকবৃন্দের চিত্তে নির্দ্দোষ আনন্দ পরিবেশন করা নয়। জাতীয় চরিত্র গঠনে নীতি কথা এবং উপদেশ যত কাজ না দেয় তার থেকে বেশী কাজ পাওয়া যায় খেলাধূলার মধ্যে আমরা যে শিক্ষালাভ করি। সেই কারণে জাতীয় চরিত্র গঠনে খেলাধূলার প্রভূত প্রভাব বিদ্যমান। ইহা বহু জাতীর জীবনে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার কথা। জাতীয় চরিত্র গঠনে ফুটবল খেলায় যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। ফুটবল খেলার আইনশৃঙ্খলা স্বাধীন দেশের সমাজসেবী দ্বারা রচিত এবং খেলায় আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা পদ্ধতির সৃষ্টিও স্বাধীন দেশের বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক থেকে। সমগ্র খেলাটি নিয়মানুবর্ত্তিতার অনুশাসনে এবং স্বাধীন চিত্তের উন্মেষে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ফুটবল খাপছাড়া এলোমেলো খেলা নয়। ফুটবল খেলায় অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী খেলা হলে দর্শকেরা খেলার পরবর্ত্তী অবস্থার সম্ভাবনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে এবং তা পূর্ণ হলে আনন্দ লাভ করে; আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, সমূহ বিপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার পর একদিকে আনন্দ এবং দুশ্চিন্তা দূর, খেলায় পরাজয় এবং সাফল্য এই সমস্ত নিয়ে ফুটবল খেলা। খেলার

উঠা-নামার সঙ্গে দর্শকদের মনও যেন একসূত্রে বাঁধা থাকে। ফুটবল খেলা থেকে বাস্তব জীবনে যে সব নৈতিক শিক্ষালাভ করতে পারি তাহ'ল প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পৃহা, অধিনায়কের নেতৃত্ব স্বীকার, সংঘবদ্ধ আক্রমণে সহযোগিতা, একতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, আইনভঙ্গের জন্ম বিচারকের নির্দ্দেশ স্বীকার করা, বিপদকালে দৃঢ়তা, অটুট সংকল্পে দলের সম্মানরক্ষা, সাফল্যে নম্রতা, পরাজয়ে ধৈর্য্যরক্ষা এবং ফলাফলকে দৃঢ়চিত্তে স্বীকার করা। ফুটবল খেলার উদ্দেশ্যই আজ খেলার মাঠে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে ব্যর্থ হতে চলেছে; সুতরাং নৈতিক শিক্ষা থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চলেছি। খেলার মাঠের এই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতিরোধের জন্ম দায়িত্বশীল ব্যক্তি মাত্রেই আগ্রহান্বিত। আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষ, রেফারী এসোসিয়েশন এবং বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলী জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ক'রে এই উচ্ছৃঙ্খল দমনে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সংবাদপত্রে জোরালো বাছাই বাছাই শব্দ যোজনায় দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতা অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় হিসাবে তীব্রভাবে নিন্দা করা হচ্ছে, ক্যালকাটা মাঠে মাইক মারফৎ খেলা আরম্ভের পূর্ব্বে এবং বিরতিকালে বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধের জন্ম দর্শকদের উদ্দেশ্যে উপদেশ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে; এই সমস্ত সত্ত্বেও পূর্ব্ব অবস্থার যে কোন পরিবর্ত্তন হয়নি তা পরবর্ত্তী-কালের ঘটনাবলীই সাক্ষ্য দিচ্ছে। স্থায়ীভাবে খেলার মাঠে স্বাভাবিক আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করতে হলে দর্শকদের আচরণের তীব্র নিন্দা এবং পুলিশ শাসন কায়েমী করলেই যথেষ্ট হবে না। শান্তিকামী জনসাধারণকে রক্ষার জন্ম পুলিস প্রহরী খুবই দরকার কিন্তু মুষ্টিমেয় উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের প্রতিরোধ করতে হ'লে শান্তিকামী জনসাধারণের সহযোগিতাও একান্ত প্রয়োজন। খেলার মাঠে এ সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। মুষ্টিমেয় দর্শক খেলায় ব্যাঘাত ঘটায়, দর্শকবৃন্দের বৃহত্তম অংশ যোগদান করে না সত্য কিন্তু দর্শক হিসাবে নিশ্চেষ্ট থাকে এবং কর্ত্তৃপক্ষ মহলের হায়রানী, পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে উৎসাহিত এবং আনন্দ উপভোগ করে। কেউ দুষ্কৃতিকারীদের ধরিয়ে দিতে অগ্রসর হয় না; দর্শকবৃন্দের এই নিশ্চেষ্ট-ভাব জাতীর পক্ষে কল্যাণকামী নয়। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ একদিনের ঘটনা বিচার করলে মিলবে না। আজ সরকারী-বেসরকারী অফিসের দুর্নীতি, কর্ম্মচারীদের কাজে অযোগ্যতা, স্বজনপোষণ এবং আপন আপন স্বার্থের হানাহানি সাধারণ মানুষের জীবন ভারাক্রান্ত এবং বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে জন-সাধারণের অর্থের ছিনিমিনি খেলা, পরিচালনায় অব্যবস্থা এবং পুকুর চুরির ফলে মানুষ তার ভিতরের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে; মানুষ একদিনের ব্যাপারে ধৈর্য্যহারা হয়নি। আজ জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করতে হলে তাদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা দূর করতে হবে, অভাব অভিযোগগুলির প্রতিকার করতে হবে এবং তা একমাত্র সম্ভব গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে। অথচ এই অতি প্রয়োজনীয় তথ্যটি আমরা উপেক্ষা করে কেবলমাত্র অপরকে নিন্দা এবং প্রহরী দ্বারা সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে কোমর বেঁধেছি।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—সুশীলকুমার মুখার্জী বনানী ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভাদ্র—১৩৫৫

প্রথম খণ্ড | ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বেঁচে থাকার মালিক

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সুন্দরের অতল রসের মনের মণিমন্দিরেরি তলে
মগ্ন চির আনন্দেরি খনি,
সত্য শিবের জীবন দীপে জ্বলছে সেথায় অনির্ব্বাণের শিখায়
মানব নারীর চিরন্তনের স্বাধীনতার মণি।
শাশ্বত সেই স্বাধীনতার চিরন্তনের রসের মণি-মাঝে
স্বর্গ এবং মর্ত্তেরি প্রেম বাঁধলো এসে ঘর,
তারি মোহন ছন্দপুরে বিশ্বে যারা বেঁচে থাকার মালিক
তাদের লীলা স্নানের লাগি' জাগছে সরোবর।
সত্যিকারের বাঁচার হরষ নিত্যকালের টাট্‌কা সে যে ফুল,
বসন্তেরি হাওয়ায় সে যে পুলক-শিহরণী,
নীল আকাশের উড়ন্ত ওই পাখীর গানের মতন মধু সে যে
শাশ্বত সেই বেঁচে থাকার মোহনমহামণি।
সুন্দরীদের হাসির মত তাহার দেহ হিল্লোলিয়া চলে
শিশুর মুখে মায়ের চুমার মতন তারি প্রাণ,
শিবের ললাটবহ্নিসম দীপ্ত সে যে সর্ব্বজয়ী তেজে
শ্যামের বাঁশীর মতন সে যে তাহার মধু গান।

ঝুলন এবং হোলির মত, রাসের মত তাহার মধুরাতি
গোলক মেরুর উষারসম রঙীণ তারি দিন,
তাদের মত সুন্দর এবং বিরাট যারা তারাই তারে জানে
বিশ্বে তারাই বাজাবে ভাই বেঁচে থাকার বীণ।
ঈশ্বরেরি সুতার সাথে গাঁথলো যারা জীবন-মণিমালা
রাজ্য যাদের মহান ভাগবত,
অমৃতেরি পুত্র প্রজা স্বয়ং রাজা যেথায় ভগবান
শ্রীবাসুদেব চালান যাদের রথ।
তাদের মহানরাজ্যে যেরে অসুরবলের নেইক কভু হানা
বিশ্বে তারা করবে কারে ভয়?
ঈশ্বরেরি সুতায় যাদের মাল্য গাঁথা ছিঁড়বে তারে কেবা,
নিত্য তারাই বিশ্বে বেঁচে কর্ব্বে সবে জয়।
তারাই বেঁচে থাকার মালিক; সত্যকথায় সিদ্ধ হোল যারা—
চিত্ত যাদের ব্রহ্ম তেজে জ্বলে,
ভাইয়ের বুকে বক্ষ বাঁধা, স্বদেশ যাহার স্বর্গ চেয়েও বড়ো
প্রলয় ঝড়ে সাগর বুকে নৌকা বেয়ে চলে।

কল্পনা যার অমোঘ এবং প্রতিজ্ঞা যার ভীষ্মদেবের মত,
যাত্রা যাহার মধুপসম ঊর্দ্ধে উঠে জ্বলি',
ইচ্ছাতে যার কালবোশেখীর বজ্রপাতের বেগের মত গতি
পৌরুষেতে চলতে পারে সর্ব্ব আধিভৌতিকেরে দলি,
স্বদেশ জাতির স্বার্থ লাগি' নিজের সকল স্বার্থ দলি' পদে
সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব যারা কোরলো বলিদান,
জন্মভূমির স্বর্গ বুকে তারাই শুধু বেঁচে থাকার মালিক
গাইবে তারাই চিরন্তনের বেঁচে থাকার গান।
বন্দুক এবং তোপের গোলা জব্দ যাদের ব্রহ্ম তেজের কাছে
বিশ্বেরি সব শক্তি যারা ইচ্ছাবলে করতে পারে জয়,
বিজ্ঞানেরি ধ্বংসলীলা থমকে' দাঁড়ায় যাদের কাছে এসে
এটমবোমার দর্পে যারা কর্ব্বেনাকো ভয়।
সৃষ্টি এবং স্থিতির বিধান-শক্তি যারা জয় করেছে বুকে
গণ্ডুষেতে হাস্ত মুখে সিন্ধু করে পান
অনন্ত এই মহাকাশের মহাপ্রলয় উৎসতলে বসি'
মৃত্যু-সাথে নিত্য করে স্নান ;
তেমন মহাশক্তি যারা অর্জ্জিয়াছে বিরাট তপস্যাতে—
অনন্ত এক বিরাট মহিমায়,
মর্ত্তেরি এই বক্ষতলে বুক ফুলায়ে উচ্চ করি শির
বিশ্বে তারাই থাকবে বেঁচে ভাই।
তারাই বেঁচে থাকার মালিক জীবন যাদের বৃন্দাবনের মতো
উদ্বেগেরি নেইক বালাই ঘাত ও প্রতিঘাতে,
জগন্নাথের চরণতলায় বাঁধলো যারা গৃহস্থালীর দোলা
মৈত্রী বাঁধা মৃত্যু পতির সাথে।
জীবন আছে—মৃত্যু আছে—কিন্তু যেথায় মৃত্যুভীতি নাহি
এমনিতরো মরণজয়ী যারা,
যুদ্ধে ভূমিকম্পে ঝড়ে বজ্রপাতে রুদ্র আঘাত সহি'
বিশ্বে চির থাকবে বেঁচে তারা।
প্রহ্লাদেরি ছন্দে যারা অগ্নি পাহাড় সিন্ধু করি' জয়
প্রসাদ বলি' গরল করে পান,
কালীয় দহে মাভৈঃ দিতে নিত্য ওরে সঙ্গী হল যাদের
কিশোর বেশে রুদ্র ভগবান।
ঈশ্বরেরে সঙ্গি করি' কালের ভীতি লঙ্ঘি' যারা চলে
সৃষ্টি জয়ের বাজিয়ে মহাবীণ,
তারাই বেঁচে থাকার মালিক সত্যিকারের বাঁচার মত বেঁচে
বিশ্বে তারাই থাকবে চিরদিন।

উন্মাদ মুকুন্দমঞ্জুমুরলী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

অসিত বলে: "তখন আমি খুব গান গেয়ে বেড়াই—অবিশ্যি বেশির ভাগই ঠুংরি গজল বা স্বদেশী গান। কিন্তু আমার গানের ঝুলিতে তো হিন্দি ভজনেরও ঠাঁই ছিল—নানা দেশ থেকে ভজন কুড়িয়ে কুড়িয়ে জমিয়ে রাখি—সুরও দিই—ভালো শ্রোতা পেলে গেয়েও থাকি তারস্বরে। একবার এই রকম ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছুলাম দক্ষিণে। সেখানে হঠাৎ খুব ভাব হয়ে গেল একটি ধনী কুমারের সঙ্গে। তাঁর মা মালাবারী, বাপ গুজরাতি। কাজেই সেখানে খুব জমত ভজনের ও গরবার আসর। তাঁর শিবরাত্রির সলতে চন্দু তখন বছর ছয়েকের হবে। শুধু বাপমারই নয়—সবারই আদরের। রঙ শামলা—কিন্তু মুখখানি অপরূপ। বেশি কথার মানুষ নয়—গম্ভীরই বলব—কিন্তু কী ভালোবাসত গান! অত অল্প বয়সে এরকম গানে ডুবে যেতে দেখিনি কাউকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনবে—একটিবারও উঠবে না।

আমার গানের সে হ'য়ে উঠল যাকে বলে 'ফ্যান' তোদের ছবির ভাষায়। যেখানেই যাব আমার কোল ঘেঁষে ব'সে শুনবে আমার ভজন, আমাকেই শোনাবে আমার গ্রামোফোনের গান, আর জিজ্ঞাসা করবে শুধু গানেরই কথা—এককথায় তার সমস্ত সত্তাটা যেন গানের রসে ফুল হ'য়ে ফুটে উঠল। তার বাবার মুখে শুনলাম আগে তার গানে এমন উৎসাহ কেউ কস্মিন্‌কালেও দেখেনি। সে যখন চুপচাপ ব'সে থাকত তাদের শৈলাবাসের কাছে একটি ঝরণার ধারে, তখন মাঝে মাঝে আড়াল থেকে শোনা যেত তার গুণ গুণ ক'রে গান—আমারই গাওয়া গান। কিন্তু কারুর সামনে মুখ খুলবে না ছেলে। আর এক আশ্চর্য এই যে শুধু মীরাবাইয়ের

গানই সে গাইত—আর কারুর গান না। গুজরাতি গরবা শুনলেও উঠে যেত। শুধু ভজন ছিল তার আরাধ্য।

দিন দশেক বাদে চ'লে এলাম। কয়েক মাস কেবল তার ডাগর ভাবেভরা চোখ দুটি মনে পড়ত। তারপর নানা স্রোতে ভেসে ভেসে এখানে ওখানে আছড়ে পড়তে পড়তে সে-নিটোল স্মৃতি ভেঙে চুরে গেল মিলিয়ে।

প্রায় বছর দশেক বাদে—তখন আমি দুমেনে আশ্রমে ঠাঁই পেয়েছি—হঠাৎ বন্ধু লিখলেন চিঠি যে চন্দু ভোরবেলা বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে কাউকে না ব'লে,আমাদের আশ্রমে এসেছে কি? আমি তো অবাক্! লিখলাম—না তো, ব্যাপার কী খুলে জানাও অবিলম্বে। তখন বন্ধু লিখলেন সব ইতিহাস। মস্ত চিঠি। তার ভাবার্থ: চন্দু বাপের ফ্যাক্টরির কাজ বেশ ভালোই চালাত বটে কিন্তু তার মন ছিল যে অন্য কোথাও, সবাই স্পষ্ট দেখতে পেত। মার প্রাণ ভয়ে শিউরে উঠল—ধরলেন স্বামীকে রাতারাতি ছেলের বিয়ে দিতে হবে। ওদেশে এখনো খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয় শুনে থাকবি হয়ত। একটি খুব সুন্দরী মেয়ে—ওদেরি পড়শিনী—মজুদ অনেক যৌতুক নিয়ে। ধনী পিতার একমাত্র পুত্রকে জামাই করতে অসাধ কার? কিন্তু অদ্ভুত ছেলের অদ্ভুত গোঁ—বিয়ে—উঁহুঃ। অনেক সাধ্য-সাধনার পর শেষটায় মা জোর জুলুম সুরু করলেন। উপরোধ অনুরোধ তর্জন-গর্জন কোরে কাকুতি-মিনতি কান্না পর্যন্ত। তার পরেই মেয়েটি—ইলা—পড়ল শক্ত অসুখে। ডাক্তার বলল মন ওর প্রফুল্ল না রাখলে মেয়েকে বাঁচানো যাবে না। ছেলে তখন রাজি হ'ল—বিয়ে করতে। কিন্তু মেয়ে সেরে উঠতে না উঠতে হঠাৎ নিরুদ্দেশ—বিয়ের ঠিক আগের দিন। এর পরে তার কোনো খোঁজই কেউ পায় নি। তার ফটো বহু কাগজে ছাপানো হ'ল—ধনী পিতা বিস্তর অর্থব্যয় করে লোকলস্কর পাঠালেন এখানে ওখানে—বিশেষ ক'রে নানা আশ্রমে খুঁজতে। হ্যাঁ—বল্‌তে ভুলেছি—বন্ধু লিখলেন যে, চন্দু নাকি গ্রামোফোনে আমার গাওয়া মীরাভজন শুনত প্রায়ই একলা ব'সে। রেডিও টকির ধারও ধারত না, শুধু ঐ গ্রামোফোন—তা আবার মীরাভজন। এই তো ব্যাপার। বন্ধু লিখলেন হয়ত কোনোদিন আমার এখানে আসবে ছেলে হঠাৎ—কারণ তাঁর বিশ্বাস যে আমাদের আশ্রমের মুখেই রওনা হয়েছে সে—এক কাপড়ে। উদ্বেগের বিশেষ কারণ এই যে তার হাতে টাকাকড়ি কিছুই ছিল না—আরো শোকের কারণ এই যে, ইলা বিয়ের দিন এই খবর শুনে সেই যে মূর্ছা গেল সে মূর্ছা ভাঙার পর থেকে কথাবার্তা বলে না আর। ডাক্তারে ভয় পেয়েছে—হয়ত পাগল হবার উপক্রমণিকা।"

ছায়া ক্লিষ্টকণ্ঠে বলে: "আহা!" বলেই অসিতের দিকে তাকিয়ে শুধায়: "একেবারে কথা বলত না?"

"এক আধটা। আর শুধু বলত যে চন্দুর গান শুনতে চায়।"

"ও গান গাইতেও শিখেছিল তাহ'লে?"

শুনে শুনে শেখা। তবে গাইত নাকি বেশ প্রাণ দিয়ে। তার উপর গলা মিষ্টি। ইলা এলে ও প্রায়ই তাকে হয় গ্রামোফোনের মীরাভজন শোনাত, না হয় শেখাত। দুটিতে মিলে সময়ে সময়ে নিরালায় জুড়িতে গাইত—বন্ধু লিখেছিলেন। কিম্বা বর শোনাতো বিবেকানন্দের বই প'ড়ে—আর ক'নে শুনত ঠায় ব'সে।

"ঐটুকু ছেলে পড়ত বিবেকানন্দের বই?"

"ষোলো সতেরো বছরের ছেলেকে বলা যায় না 'ঐটুকু'। তাছাড়া ওর মেধা ছিল অসামান্য। তার উপর বন্ধু ছেলেবেলা থেকেই ওকে ইংরাজি শিখিয়েছিলেন। গভর্ণেস রেখে। কাজেই বিবেকানন্দর সহজ ইংরাজি বুঝতে ওর কষ্ট হ'ত না। তবে—বন্ধু লিখেছিলেন—কিছুদিন থেকে ও পড়াশুনায় ঢিল দিয়েছিল—ফ্যাক্টরির কাজেও তেমন মন দিত না। তার উপর কী খেয়াল চেপেছিল—শুধু দুধ আর কলা ছাড়া আর কিছু খাবে না।

"ওমা! কেন অসিদা?"

"ওর মনে নাকি বেশ শান্তি আসত সাত্ত্বিক আহারে। কিন্তু শান্তির মূল্য দিতে হ'ল দেহকে: ছেলে বড্ড রোগা হ'য়ে যেতে লাগল। বাপ-মা ভেবে অস্থির কিন্তু কেউই ওকে দুধ ও কলা ছাড়া কিছু খাওয়াতে পারত না—বন্ধু লিখেছিলেন—এমন কি ইলা যে ইলা, সেও হাল ছেড়ে দিয়েছিল।"

"ওদের দুটিতে তাহলে খুব মাখামাখি হয়েছিল বলতে হবে?"

অসিত হাসে: "মাখামাখি করার পাত্র চন্দু নয়—

তবে ভাব একটু হয়েছিল বৈকি। ইলাকে পেয়েছিল যে প্রায় শিষ্যারূপে কিনা। যাক্ একথা—গল্পটাই বলি।" ব'লে অসিত থেমে একটু ভাবল তারপর বলা সুরু করল :

"বন্ধুর চিঠির উত্তরে জানালাম চন্দু যদি আমাদের আশ্রমে আসে তো তাঁকে খবর দেব। এর বোধহয় দিন পনের পরে হঠাৎ লাহোর থেকে এক চিঠি : চন্দু সেখানে এক নার্সিং-হোমে অসুস্থ হ'য়ে শয্যাশায়ী। আমার কাছেই সে আসছিল হেঁটে—এমন সময়ে লাহোরের কাছ বরাবর এসে জ্বরে প'ড়ে থাকে এক গাছতলায় প্রায় বেহুঁস হ'য়ে।"

ছায়ার চোখ জলে ভ'রে এল : "বেচারি!" তারপর চোখ মুছে বলল : "সেখান থেকে ওকে নার্সিং-হোমে নিয়ে এল কে?"

"এক শেঠজি—মাড়োয়ারি।"

"ও লিখেছিল চিঠিতে?"

"না। বলল—যখন আমি গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে ওকে আনতে গেলাম সেই নার্সিং-হোমে—লাহোরে।"

"কতদিন বাদে দেখলে তাকে?"

"বছর বার। ছবছরের শিশু হ'য়ে উঠেছে আঠারো বছরের যুবক। দেখে চিনতে পারতাম না—যদি না ওর চোখ দুটি চিনিয়ে দিত। তেমন চোখের দৃষ্টি তো পথে-ঘাটে মেলে না।"

"বলো বলো অসিদা, থেমো না।"

"বলবার আর খুব বেশি নেই। কারণ বলেছি, ও ছিল স্বভাবে যাকে পরমহংসদেবের ভাষায় বলা যায় ভেতরবুঁদে—সংস্কৃত পরিভাষায় মৌনী। পুরো মৌনী নয় অবিশ্যি—আধা মৌনী। মানে—ওর মনের কথা জানতে হ'লে ডুবুরি হ'তে শিখতে হ'ত।"

ছায়া বলল একটু হেসে : "যে আর্টে তুমি পাকা—না জানে কে?"

অসিতও হাসল : "আমি সেভাবে দিইনি উপমাটা। মানে : ওকে যে ঠিক্ তুতিয়ে পাতিয়ে কথা বলাতে হ'ত তা নয়—সহজেই ও কথার উত্তর দিত। তবে নিজের মন ও নিজে পুরোপুরি জানত না তো—তাই অনেক কথা আন্দাজ ক'রে নিতে হ'ত আর কি—যাকে ইংরাজিতে বলে reconstruct করা।"

"যেমন ইলাকে ও শিষ্যাই মনে করত, এই না?"

"তুই বড় দুষ্টু। তবে কথাটা ভুল বলিস্ নি এবার। কারণ ইলা যে ওর শিষ্যা হ'য়ে পড়ছিল দীক্ষা না পেয়েও এ সাদা কথাটাও ওর বুঝতে দেরি হয়েছিল—যার জন্যে ভুগতে হয়েছিল ওদের দুজনকেই।"

"যার শেষ অঙ্ক—ইলার অসুখ?"

"অসুখও বটে—বিয়ের কথা পাকা হওয়াও বটে। তবে এখানে খানিকটা আন্দাজ ক'রে নিতে হয়েছে। না ক'রে উপায় ছিল না—কারণ ও বুদ্ধিমান ছেলে হ'লেও আধুনিক ছেলে তো ছিল না—কাজেই মনস্তত্ত্ববিৎ বলা চলে না।"

ছায়া একটু হাসল : সেই জন্যেই বুঝি ধরতে পারে নি কে ওর দীক্ষাগুরু হ'য়ে এসেছিল বার বছর আগে?

"ভুল। গুরু ছিল ওর পহলগাঁয়ে।

"পহলগাঁয়ে? কাশ্মীরের?"

"হ্যাঁ—যেখানে যাবার পথেই ও আসছিল আমার ওখানে।"

"না অসিদা, এখানে ভুল আমার নয়—তোমার। তুমি মনে করো কি পাহালগাঁর গুরু ওকে টানতে পারতেন, যদি না ওর ছবছর বয়সে ও দীক্ষা পেত কোনো বিশেষ লোকের কাছে যে ওর কানের কাছে মন্ত্র না জ'পে গাইত গান—তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোঈ—"

অসিত গম্ভীর হ'য়ে বলে : "কার কানে যে কে কখন কী মন্ত্র দেয় কেউ কী জানে দিদি? শুধু একটি চোখের দেখায়ও মন্ত্র পাওয়া যায় যে রে।" বলেই গুণ গুণ ক'রে ধরে :

"যদবধি যদুনন্দনাননেন্দু
সহচরি লোচনগোচরী বভূব
তদবধি মলয়ানিলেন বা
সহজ বিচার পরাঙ্মুখং মনো মে।"

ছায়া বলে : "কী সু—ন্দর সুর ভাই! কিন্তু এর মানেটা?"

অসিত গুণ গুণ ক'রেই উত্তর দেয় :

"যেদিন হ'তে সে-মুখ চাঁদ দেখেছি নয়নে
শোন্ কী দশা হ'ল আমার সজনি :
প্রণয় তার মলয়ানিল কী বা অনল দাহনে
ভাবিয়া পার না পাই দিন-রজনী।" (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার শিক্ষক

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বারাই জাতির বিচার হয়। যে জাতি শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যত উন্নত বিশ্বের দরবারে সে জাতির স্থান তত উচ্চে। বস্তুত শিক্ষা ও সভ্যতার উপর জাতির সুপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বর্ত্তমান যুগে জাতি গঠনের সমস্যা এক কঠিন সমস্যা। পরস্পর বিরোধী নানা মতবাদের সুকৌশল প্রচারে জনগণ বিভ্রান্ত. এই বিভ্রান্তির কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জাতিকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ও দেশের নেতৃবৃন্দের। আর এই কার্য্যে জাতির প্রধান সহায় শিক্ষক। জাতি গঠনে রাষ্ট্রের ন্যায় শিক্ষকের দায়িত্বও কম নহে। "Teachers are the builders of nation." তরুণ ছাত্র যখন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভের জন্য আসে তখন তাহার মন থাকে সরল ও কোমল—a clean sheet of paper শিক্ষক তাহার কোমল শিশু মনের উপর যে কোনরূপ চিত্র আঁকিয়া দিতে পারেন, যে কোন ভাবে তাহাকে গড়িয়া তুলিতে পারেন। এই শিশুই ভবিষ্যৎ নাগরিক ও রাষ্ট্রনায়ক। সুতরাং জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে প্রধানতঃ শিক্ষকের উপর।

এখন প্রশ্ন—জাতি গঠনের এই মহান দায়িত্ব দরিদ্র শিক্ষকদের উপর চাপাইয়া দিয়া রাষ্ট্র বা জাতীয় নেতৃবৃন্দ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন কি? তাঁহাদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতাব্যতীত দরিদ্র শিক্ষকের পক্ষে এই মহান দায়িত্ব পালন সম্ভব কি?—নিশ্চয়ই নয়। রাষ্ট্রের সহযোগিতা ব্যতীত শিক্ষকদের পক্ষে এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। অনুকূল আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির দায়িত্ব রাষ্ট্রনায়কদের। এই দায়িত্ব তাঁহারা পালন না করিলে শিক্ষকদের নিকট হইতেও সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের আশা করা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালার শিক্ষকদের যে অবস্থায় দিন কাটে, ভাষা তাহাকে রূপ দিতে পারে না। উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, দুমুঠো আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য স্কুলের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সকালে বিকালে যতগুলি সম্ভব "টুইসন" করিয়া আমাদের nation-builderদের কি ভাবে দিন কাটে তাহা সহজেই অনুমেয়। গৃহে শিক্ষক-গৃহিনীগণ অভাব অনটনের সংসার কোনরূপে জোড়াতালি দিয়া চালাইয়া লইবার সারাদিনব্যাপী আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া শয্যা নামধেয় কোন একটি বস্তুর উপর ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিবার পূর্ব্বে বোধহয় ভগবানের পায়ে এই প্রার্থনাই জানান যে, আবার যদি জন্মগ্রহণ করতে হয় তাহা হইলে যেন আর শিক্ষক-গৃহিণী হইতে না হয়। ওদিকে জাতিগঠনকারী শিক্ষক মহাশয় দুবেলা "টুইসন" ও স্কুল করবার মধ্যে কখন কি ভাবে যথা নিয়মে লাইন দিয়া রেশন ও অন্যান্য অপরিহার্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবেন তাহারই চিন্তায় বিভোর। অদৃষ্ট বা বিধাতার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিবার ফুরসৎও বুঝি তাঁহার নাই। নিজের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত অর্থ বা সময়ও তাঁহার মিলে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—পরের ছেলে যাঁহারা মানুষ করেন তাঁহাদের নিজেদের ছেলেরাই লেখাপড়ার অভাবে মানুষ হয় না। এই স্থানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, আমি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি বাঙ্গালার অতি দরিদ্র স্কুলশিক্ষকদের কথা।

বর্ত্তমান কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগে নিঃস্ব স্কুল শিক্ষকদের সামাজিক মর্য্যাদার কথা আর না তুলিলেও চলে। আমাদের সমাজে নিরক্ষর ধনী Black-marketeer এর স্থান অনেক উচ্চে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র স্কুল শিক্ষকের স্থান সর্ব্বনিম্নে। বর্ত্তমান যুগে যাঁহার অর্থ আছে তিনিই বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও মানী, যাহার অর্থ নাই তাহার কিছুই নাই।

আমাদের দেশে শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা যথেষ্টই হয়। শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যতালিকা বিদ্যালয় গৃহের আলো বাতাস, ছাত্রদের স্বাস্থ্য, প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে এবং সে সবের উন্নতি বিধানের প্রতি মনোযোগ প্রদানও যে করা হয় না তাহা নহে। কিন্তু শিক্ষকের দুরবস্থার কথা কোন আলোচনাতেই তেমন গুরুত্ব লাভ করে না। বিশ্ববিদ্যালয় মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সর্ব্বনিম্ন বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া স্কুলে স্কুলে প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—যেখানে স্কুলের আর্থিক সঙ্গতি আছে সেখানেও স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের রিজার্ভ ফণ্ড অধিকতর স্ফীত করিয়া তুলিবার আগ্রহাতিশয্যে প্রস্তাবটি বেমালুম ধামাচাপা দিতে কসুর করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রস্তাবগ্রহণ স্কুলের পক্ষে বাধ্যতামূলক করিবার ব্যবস্থা না করিলে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বা আর্থিক উন্নতি বিধানের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে বাধ্য। এইরূপ কোন প্রস্তাব করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের—প্রত্যেক স্কুলের আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া এবং প্রস্তাবগুলি কতদূর কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব বিচার করিয়া তদনুযায়ী শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বাধ্যতামূলক নির্দ্দেশ প্রদান করিলে কিছুটা সুফল হইতে পারে।

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর সভায় শিক্ষকদের প্রতিনিধিদ্বয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ম্যানেজিং কমিটীর অন্যান্য সদস্যগণ যেন মনে করেন —শিক্ষকদের প্রতিনিধি সদস্যদের সহিত তাঁহাদের কতকটা প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ। তাঁহাদের কোন প্রস্তাব বা প্রতিবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিক্ষুকের কাকুতির ন্যায় উড়াইয়া দেওয়া হয়। কখন কখন তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়াও দেওয়া হয় যে, তাঁহারা ম্যানেজিং কমিটীর সদস্য হইলেও বেতনভোগী কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রধান শিক্ষকের অবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে একই রূপ। অথচ শিক্ষক ও ছাত্রই বিদ্যালয়ের প্রধান অঙ্গ। স্কুল বাঁচাইয়া রাখা ও ছাত্রদের মানুষ করিয়া তোলার

প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকের। আর অভিভাবকদের চেয়েও শিক্ষকগণ ছাত্রদের কম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহে। ছাত্রদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইলে স্কুলের সুনাম বাড়িবে ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। স্কুলের উন্নতি হইলে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিজনিত আর্থিক উন্নতি হইবে। সুতরাং স্কুলের সুপরিচালন ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী স্বার্থ শিক্ষকের। ম্যানেজিং কমিটী তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন। স্কুলের উন্নতির জন্য নূতন নূতন প্রস্তাব ও ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষকদের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য ম্যানেজিং কমিটী গঠন করা হয় না। ম্যানেজিং কমিটী গঠনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। এই সমস্যার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে শিক্ষকদের প্রতি সরকারী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিব। শিক্ষা খাতে সরকার প্রতি বৎসরই টাকা মঞ্জুর করেন। সরকার-পরিচালিত স্কুলও কয়েকটি আছে। সেখানে সাধারণ স্কুল অপেক্ষা শিক্ষকদের অবস্থা একটু ভাল। তাঁহাদের কথা বাদ দিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি সরকারী ব্যবহারকে অবহেলা ও উদাসীনতা ব্যতীত আর কোন আখ্যা দেওয়া চলে না। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য্য প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য যখন ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন বাঙ্গালা সরকার দরিদ্র শিক্ষকদের মাসিক ৫ টাকা রিলিফের ব্যবস্থা করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। অথচ কত ভাবে কত টাকাই যে তাঁহারা অপব্যয় করিয়াছেন তাহার খবর সংবাদপত্রপাঠকদের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। অবশ্য আমলাতান্ত্রিক সরকার বা ভূতপূর্ব্ব লীগ-মন্ত্রিসভার নিকট হইতে জাতিগঠনের ব্যাপারে ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু আশা করা যাইতে পারে না।

মাত্র কয়েকমাস আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এখন আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনা করিতেছেন। সকল জাতীয় সমস্যার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যাও তাঁহাদের মনোযোগ অতিক্রম করিবে না এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সকল দেশেই শিক্ষকদের বেতন অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কোন দেশেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শিক্ষককে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। অভাবের তাড়নায় তাঁহাকে সকালে বিকালে যতগুলি সম্ভব "টুইসন" করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হয় না। যে বেতন তাঁহারা পান তাহাতে তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয়। তাঁহারাও নিশ্চিন্তমনে সর্ব্বান্তঃকরণে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। ক্লাসে পড়াইবার সময় "অন্ন গৃহে তণ্ডুল নাস্তির" অপরিহার্য্য চিন্তায় খেই হারাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত বোধ করিতে হয় না। স্কুলের পরে বাড়ীতে যাইয়া lesson note তৈয়ারির সময়ও তাঁহারা পান, ছাত্রদের শিক্ষাদানের কোন উন্নততর পদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসরও তাঁহাদের থাকে। ফলে তাঁহাদের পক্ষে নিখুঁত শিক্ষাদানও সম্ভব হয়, extra curricular activityতে আত্মনিয়োগের সুযোগ হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত হ'ন না। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষকদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্ন বস্ত্রের চিন্তায় তাহাদের এত বিব্রত থাকিতে হয় যে, extra curricular activity দূরে থাকুক বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ্যাংশ সুচারুরূপে শিক্ষাদানও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার পরও বোঝার উপর শাঁকের আঁটি হিসাবে অনেক স্কুলে শিক্ষকদিগকে মাত্র ৭ পিরিয়ড করিয়া ক্লাস লইতে হয়। রুটীনে হয়ত একটি "পিরিয়ড" off লেখা থাকে। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকের ভাগ্যে এই off লিখিত পিরিয়ডটি কাগজে কলমেই পর্য্যবসিত হয়। সংক্ষেপে ইহাই আমাদের nation buildersদের অবস্থা। এইরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁহাদের পক্ষে জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব কিনা রাষ্ট্রনায়কগণই তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

সম্প্রতি শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি বিধানের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে বাঙ্গালার দরিদ্র শিক্ষকগণ কিছুটা আশার আলোক দেখিতে পাইতেছেন। গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের সর্ব্বনিম্ন বেতন ১২৫৲ টাকা করিবার প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। এজন্য প্রয়োজন হইলে ছাত্র বেতন কিছু বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং যে সকল স্কুলের আর্থিক সঙ্গতি কম সেই সব স্কুলকে সরকার সাহায্য করিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন আছে। অন্যান্য স্বাধীন দেশের শিক্ষকদের সমান সুযোগ সুবিধা পাইলে আমাদের দেশের শিক্ষকগণও কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ থাকিবেন না এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কেবলমাত্র শিক্ষকদের নয় রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিকদের স্বার্থের জন্যও এই সমস্যার প্রতি সরকারের অবিলম্বে মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। জাতিগঠনকারী শিক্ষকদের বর্ত্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকিলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে, স্বাধীনতা লাভ নিরর্থক হইবে।

বনফুল

২০

হোটেলের সামনের দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে সুশোভন খুব সন্তর্পণে ভিতরে গলাটি ঢুকিয়ে চেয়ে দেখলে। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। ঢুকে পড়ল টিপে টিপে। সামনের ঘরে কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠল খানিকটা। উপরে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাঁপানি-রোগীর শ্বাসকষ্টের শব্দ। নেবে এসে দেখলে ওদিকের বারান্দার বেঞ্চিতে গোকুল শুয়ে আছে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। চোখ চেয়ে আছে কিন্তু স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। সুশোভনকে দেখে সে হাসল একটু, তারপর কি মনে হওয়াতে হাত তুলে নমস্কার করলে। হোটেলের কিছু দূরে যে তাড়িখানাটা আছে গোকুল সেখানকার চাকর। ঝুনুকে খোঁজবার সময় সকালে ওর সঙ্গে ভাব হয়েছিল সুশোভনের। সুশোভনের কাছ থেকে মোটা রকম বখশিস পাওয়ার পর ভাবটা বেশ গাঢ়রকমই হয়েছিল।

"গোকুল যে, এখানে কেন"

"ফদু আমায় বসিয়ে রেখে গেল"

'ফদু' শুনেই সুশোভন বুঝলে গোকুল তাড়ি খেয়েছে।

"আমি আবার ফিরে এলাম গোকুল"

"আজ্ঞে। কিন্তু ফদু যে নেই, আপনার খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে। ঠাকুর নেই, গোঁসাইজিও নেই"

"ঠাকুর কোথা গেল"

"হাটে গেছে বোধ হয়"

"খাব না এখন কিছু। দেখ গোকুল, এখানে কয়েকজনের আসবার কথা আছে। শুনছি তারা তোমাদের তাড়ির দোকান খানাতল্লাস করবার মতলবে আসছে। আমাকেও ওই সঙ্গে জড়াবার মতলব তাদের। গোঁসাইজিকেও জড়াতে চায় শুনলাম। ওরা যদি এসে তোমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে—বোলো, আমি কিছু জানি না। বুঝলে"

"আজ্ঞে"

সুশোভন পকেট থেকে ব্যাগ বার করে' আর একটি টাকা গোকুলের হাতে দিলে। গোকুল টাকাটা নিয়ে চোখ মিটি মিটি করে' তাকাতে লাগল।

সুশোভন আবার বললে, "বলবে আমি কিছু জানি না"

"আজ্ঞে"

দূরে একটা মোটরের শব্দ শোনা গেল। আসছে বোধ হয়।

"ওই আসছে বোধ হয়, বুঝলে"

"আজ্ঞে"

"যদি কিছু জিগ্যেস করে' স্রেফ্ বলবে আমি কিছু জানি না"

"আজ্ঞে"

"শুয়ে ঘুমোও তুমি, বুঝলে"

মোটরটা এসে থামল। সুশোভন তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে জানালার কপাটটা একটু ফাঁক করে' দেখলে! বেশ দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ একটি লোক মোটর থেকে নেবেছেন। হরিমটর পান্থনিবাসের দিকে একনজর চেয়ে ড্রাইভারকে কি যেন বললেন। এগিয়ে এলেন তারপর।

"ডাক্তার এল"—সুশোভন ভাবলে—"এত শিগ্গির

ডাক্তার এসে পড়বে তা'তো ভাবি নি। এতে জট আরও না পাকিয়ে যায়"

একটা গম্ভীর বে-পরোয়াভাব মুখে ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বাইরের কপাট খুলল, বন্ধ হল। তারপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বেশ দৃঢ় পদ-ক্ষেপ। তারপর যে ঘরে সে দাঁড়িয়েছিল সেই ঘরের কপাটটা 'ঝড়াম্ করে' খুলে গেল।

"ও"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন। গম্ভীর ধীর স্থির প্রকৃতির লোক ব্যস্ত হলে যেরকম দেখায় ব্রজেশ্বরবাবুকে সেই রকম দেখাচ্ছিল।

"নমস্কার"—এগিয়ে এল সুশোভন।

"এই হোটেল কি আপনার"

"না"

"হোটেলের মালিক কোথায়"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। যে রোগীটিকে দেখতে এসেছেন তিনি আছেন ওপরে। একটু গিয়ে বাঁ ধারে সিঁড়ি। উঠে ডান হাতে একটা ঘর, তার পরের ঘরটাই। উঠলে শব্দই শুনতে পাবেন"

ব্রজেশ্বরবাবুর তাড়া ছিল যদিও—তবু ধীরভাবে দাঁড়িয়ে তিনি সুশোভনের অনাবশ্যক কথাগুলো শুনলেন শেষ পর্য্যন্ত। সকলের সব কথা শেষ পর্য্যন্ত শোনাই তাঁর স্বভাব। সুশোভনের কিন্তু অস্বস্তি লাগছিল।

"আমি তো রোগী দেখতে আসি নি"—মৃদু হেসে বললেন ব্রজেশ্বরবাবু সব শুনে।

"ও"

"আপনি কি এই হোটেলে থাকেন"

"না, থাকি না। তবে—মানে—এসে পড়েছি—"

"এই হোটেলের বিষয়ে দু'চারটে খবর জানতে চাই। কার কাছ থেকে জানা যায় বলুন তো। কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কোন সাড়াশব্দও নেই"

"আর কিছুক্ষণ সবুর কর দাদা"—মনে মনে বলল সুশোভন—"সাড়া এবং শব্দ দুইই প্রচুর পরিমাণে পাবে।"

তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে হেসে বললে—"গোঁসাইজি হলেন এই হোটেলের মালিক। তিনি কার সঙ্গে যেন দেখা করতে বেরিয়েছেন। আজ বিকেলটা ছুটি নিয়েছেন আর কি। কিন্তু দোতলায় যে ভদ্রমহিলাটি থাকেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। তাই এই হোটেলের চাকর ফদকা ছুটেছে গোঁসাইজিকে আর একজন ডাক্তারকে ডেকে আনতে। তাই আমি আপনাকে ডাক্তার ভেবেছিলাম"

ব্রজেশ্বরবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

"গোঁসাইজি আর ফদকা ছাড়া হোটেলে আর কেউ থাকে না?"

"ঠাকুর হাটে গেছে। ওইদিকে বেঞ্চিতে শুয়ে আছে একজন। তবে সে লোকটা—"

"তাকে দিয়েই কাজ চলে যাবে আমার। ধন্যবাদ"

ব্রজেশ্বরবাবু ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"না, শুনুন—আমার মনে হয় চলবে না। মানে, সে লোকটা একটু—"

ব্রজেশ্বরবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাধা পেয়ে তাঁর মুখভাবে ঈষৎ বিরক্তিও ফুটে উঠল।

"এ হোটেলের কিছু কিছু খবর আমিও বলতে পারব। কি জানতে চান বলুন না"

"না, তার দরকার নেই। ধন্যবাদ। আমি যে খবর জানতে চাই তা একটু গোপনীয়। বাইরের লোকের কাছে বলা চলবে না। কোনদিকে লোকটি শুয়ে আছে বললেন?"

অনিচ্ছাসহকারে সুশোভনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হল।

"এইদিক দিয়ে সোজা চলে যান। বেঞ্চিতে শুয়ে আছে। কিন্তু গোকুলের কাছ থেকে কোনও খবর জোগাড় করা কঠিন এখন। নিজেই সেটা বুঝতে পারবেন এখুনি। যান—সোজা ঢুকে পড়ুন—"

ব্রজেশ্বর ভিতরের দিকে চলে গেলেন। সুশোভনের এই উক্তিতে তাঁর মুখভাবে ঈষৎ অপ্রসন্নতা ফুটে উঠল আবার। ভাবটা যেন—আরে বাপু, আমাকে দেখতেই দাও না, তুমি ফপরদালালি করছ কেন।

"গোপনীয় খবর?"

ঈষৎ উৎসুক হয়ে সুশোভন চলে এল বাইরে। লোকটার চাল-চলন মোটেই ভাল লাগছিল না সুশোভনের। হরিমটর পান্থনিবাসে কি গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতে এল লোকটা! উকীল টুকীল নয় তো? না, উকীলের

চেহারা এরকম হতেই পারে না। ডিটেকটিভ? সুশোভন আস্তে আস্তে আবার ভিতরের দিকে গেল। কান পেতে রইল দরজার কাছে, যদি কিছু শোনা যায়।...কিচ্ছু শোনা গেল না। আবার বাইরে চলে এল সে। জানলাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। যে মোটরে ভদ্রলোক এসেছিলেন সেটি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারটি সিগারেট টানছে বসে' বসে'। মোটরের পিছনে ভদ্রলোকের সুটকেস বিছানাপত্র বাঁধা রয়েছে। সুশোভন সেই দিকেই এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

"তুমিই কি গোকুল"

ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর ঈষৎ অনুনাসিক অথচ দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

গোকুল চমকে উঠল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর ছড়িটির উপর দুহাতে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন।

"হোটেলের মালিক শুনছি বাইরে গেছেন। তোমারই উপর সব ভার দিয়ে গেছেন নাকি"

গোকুল ফ্যাল ফ্যাল করে' একবার চাইলে তাঁর মুখের দিকে। স্বভাবতই চোখের দৃষ্টি তার সজল। বিস্ফারিত হওয়াতে জোলো-ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ খুব কুণ্ঠিত হয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল সে।

"তোমারই ওপর সব ভার নাকি"

"জানি না"

"এ অঞ্চলে এটি ছাড়া আর হোটেল আছে কি"

"জানি না"

"কাল রাত্রে এখানে কে কে ছিল বলতে পার"

"জানি না"

"তোমার জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ দেখছি। ক' আনায় এক টাকা তা জান কি?"

"জানি না—আজ্ঞে না, সেটা জানি"

ব্রজেশ্বর পকেটে হাত ঢুকিয়ে মণিব্যাগটি বার করলেন।

"বাইরে ওই যে ভদ্রলোকটি রয়েছেন উনি কে বলতে পার?"

"জানি না"

ব্রজেশ্বর মণিব্যাগটি পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন।

"জানি না, সত্যি"

"উনি কি কাল রাত্রে ছিলেন এখানে?"

"জানি না—হয় তো—ঠিক মনে পড়ছে না"

"ওঁর সঙ্গে কি—"

হঠাৎ থেমে গেলেন ব্রজেশ্বর। কথাটা আটকে গেল যেন মুখে। তারপর প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করে' এগিয়ে এলেন তিনি আর একটু। অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে প্রায় ধমকের সুরে প্রশ্ন করলেন—"ওঁর সঙ্গে কি কোনও মেয়েছেলে ছিল?" ইতস্তত করতে লাগল গোকুল। বোকার মতো একটু হেসে ঘাড়টা আর একবার চুলকে ব্রজেশ্বরবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যদিকে চাইবার চেষ্টা করতে লাগল।

"উত্তর দিচ্ছ না কেন"

"ওনাকেই আপনি জিগ্যেস করুন না"

"মেয়েলোকটি কোথায় এখন"

"তা কি করে' বলব"

"মেয়েটি দেখতে কি রকম ছিল"

"এই মেয়েরা যেমন হয়"

"ভদ্রলোকের মেয়ের মতো?"

"তা বলতে হবে বই কি"

"তার সঙ্গে কি একটা কুকুর ছিল"

"আজ্ঞে—তা—"

হঠাৎ থেমে গেল গোকুল। ব্রজেশ্বরবাবুর যে হাতটি পকেটের ভিতর মণিব্যাগ ধরে' ছিল সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তার।

"তা ঠিক বলতে পারছি না"

ব্রজেশ্বরবাবু পকেট থেকে হাত বার করে' নিলেন। বার করে' নিজের থুতনীতে হাত বুলোতে লাগলেন। গোকুলের দৃষ্টিও তাঁর পকেট থেকে থুতনীর দিকে গেল। গোকুল মুখটা ভাল করে' দেখল এইবার। লম্বা গোছের মুখ। তার মনে হল মুখে রাগের ভাব তো নেই, বরং একটু চিন্তিতই যেন। হাত কিন্তু আর পকেটের দিকে নামল না।

"আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারছি না"

ব্রজেশ্বরবাবু আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। গভীর

চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকমুহূর্ত। তারপর নিজের বিবেকেরই বিরুদ্ধে শক্তিসংগ্রহ করে ফেললেন সহসা যেন সম্ভবত। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে' গোকুলকে একটি টাকা দিয়ে তিনি বললেন, "এই হোটেলের আপিসটা কোথায় তা আমাকে দেখিয়ে দিতে পার"

"ওই যে—"

"তালাবন্ধ রয়েছে দেখছি। চাবি কোথায়"

টাকা পেয়ে গোকুল পুলকিত হয়েছিল। আপিস ঘরের চাবি যে হুকটিতে গোঁসাইজি টাঙিয়ে রাখতেন তা গোকুলের জানা ছিল। সে তাড়াতাড়ি চাবি এনে ঘর খুলে দিয়ে বললে, "এই যে, আপনি বসুন এসে। গোঁসাইজী এসে পড়বেন এখুনি। কেউ যদি এসে পড়ে তাকে বসাবার জন্যেই চাবি রেখে গেছেন তিনি। এখুনি এসে পড়বেন। আপনার কিছু দরকার আছে কি? জলটল—"

"কিছু না। তুমি এস আমার সঙ্গে"

ঠিক এই সময় সুশোভন বাইরে থেকে এসে ভিতরে ঢুকল। ব্রজেশ্বর সুশোভনের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একনজর চেয়ে দেখলেন। তারপর আপিস ঘরে ঢুকে গেলেন।

সুশোভন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হেঁট হয়ে বাঁ পায়ের গোছটা একবার চুলকে নিলে। সে যে কি করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না—এক কথায় যাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে সেই অবস্থা। তার মনে হচ্ছিল গোঁসাইজিও যদি এখন এসে পড়েন সে যেন বাঁচে। মোটরের পিছনে যে স্যুটকেসটি ছিল তাতে বেশ বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—ব্রজেশ্বর দে। ব্রজেশ্বর দে? সান্ত্বনার স্বামী! সর্ব্বনাশ! সে কি করবে ঠিক করতে পারছিল না প্রথমটা। হোটেলের দিকে ব্যায়ত-আননে চেয়ে ছিল খানিকক্ষণ। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না হোটেলের দিকে এগিয়ে যাবে, না সরে পড়বে—কিছুই ঠিক করতে পারছিল না।

"গোপনীয় খবর? ব্রজেশ্বর দে গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতে এসেছে! সারলে দেখছি। গোঁসাইজিও তো এল বলে'। আর আমিও একটা ঝড়ঝড়ে' বাইক হাঁকিয়ে ঠিক এসে পড়লাম এই সময়ে। লে হালুয়া! কি করা যায় এখন—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইত্যাকার চিন্তা করলে সে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ তার মনে হল গতরাত্রে সে-ই যে সান্ত্বনার সঙ্গে এখানে ছিল তা ব্রজেশ্বর বাবু টের পান নি এখনও। তার আসল নামটাও তো কেউ জানে না এখানে। ব্রজেশ্বরবাবু বড় জোর কারও মুখ থেকে (কে সেই রাসকেল?) এইটুকু শুনে থাকতে পারেন যে গতরাত্রে তাঁর স্ত্রী কোনও অজ্ঞাতনামা যুবকের সঙ্গে এই হোটেলে রাত কাটিয়ে গেছেন। সে যে সেই যুবক একথা ব্রজেশ্বরবাবু এখনও জানেন না। জানা সম্ভব নয়। এই কথাটা মনে হওয়াতে তার মনে ভরসা হল খানিকটা। মনে হল ব্রজেশ্বরবাবুর এই অনুসন্ধানে একটু সাহায্য করবার ভান করলে ব্রজেশ্বরবাবুর সন্দেহও হয়তো হবে না তার উপর। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর ভাবভঙ্গী দেখে ঘাবড়ে গেল সে। এক নজরে চেয়েই সুশোভন বুঝতে পেরেছিল ভদ্রলোক ব্যাপারটা জেনেছেন কিছু। কিন্তু কতটা? কি করে' জানলেন?

ব্রজেশ্বর আপিসের ভিতর ঢুকে গেলেন। সুশোভন বাইরে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল। ভয়ঙ্কর রাসভারী লোক মনে হচ্ছে। দুষ্টুমি ধরা পড়ে গেলে দুষ্টু ছেলের শিক্ষকের সামনে যে রকম মনোভাব হয় সুশোভনের অনেকটা সেই রকম হতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন সে ব্রজেশ্বরবাবুর চেয়ে অনেক ছোট, শুধু বয়সে নয়, উচ্চতাতেও! একটু এগিয়ে এসে জানলা দিয়ে আপিসের ভিতর আস্তে উঁকি দিয়ে দেখল সে। ব্রজেশ্বরবাবু 'অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টার'খানা ওল্টাচ্ছেন, নামের পর নাম দেখে যাচ্ছেন। হঠাৎ এক জায়গায় আঙুল দিয়ে থেমে গেলেন তিনি। পরিচিত হস্তাক্ষর চিনতে দেরি হল না। নির্নিমেষে গম্ভীরভাবে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মুখের একটি পেশী বিচলিত হল না কিন্তু। যেন জীবন্ত মানুষের মুখ নয়, মুখোস। বিরাট খাতাটা সশব্দে বন্ধ করে' অন্যদিকে চাইলেন তিনি।

সুশোভন সরে' এল জানলা থেকে। গোকুলই প্রথম

আপিস থেকে বেরুল এবং বেরুবামাত্র সুশোভনের সামনে পড়ে' গেল। এই ব্যাটাই সব ফাঁস করে দিলে না কি! বথশিস টকশিস সব মাঠে মারা গেছে সম্ভবত। গোকুলের একটা গরু-চোর-গোছ ভাব দেখে আরও সন্দেহ হল সুশোভনের।

"কাল রাত্রে আমি যে ওই মেয়ে লোকটির সঙ্গে ছিলাম তা' বল নি তো ভদ্রলোককে"—ফিস ফিস করে' জিগ্যেস করলে সুশোভন।

"না"—অনুরূপ ফিসফিসে উত্তর দিলে গোকুল—"আমি বলি নি কিছু। কিন্তু জিগ্যেস করছিল"

"উত্তরে কিছু বলেছ না কি"

"না বলি নি। কিন্তু কতবার জিগ্যেস করেছে যে"—

ঢোঁক গিলে থেমে গেল গোকুল দ্বারের দিকে চেয়ে। ব্রজেশ্বরবাবুর দীর্ঘদেহ আপিসের দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

সুশোভন সোজা ঢুকে পড়ল সামনের হলটায়।

(ক্রমশঃ)

গান্ধীজীর সমাজ ও অর্থনীতি

কৌটিল্য

বিগত ২৫ বছরের মধ্যে আমরা দুবার বিশ্বযুদ্ধে প্রবল সংঘাত ও প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা দেখতে পেলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার ও চার্চিলের নিজ নিজ উক্তি উল্লেখ করে দেখান যায় উভয়েই কিরূপে একই সঙ্গে অবাধে বলেছেন—"ভগবান আমাদের পক্ষে রয়েছেন।" এই ভগবান কে? ইনি শ্রীকৃষ্ণ নন, শকুনি। এই হিটলারী-চার্চিলী শিক্ষায় আজ জগত শিক্ষিত। এখানে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করলে এই শিক্ষার প্রভাব কিরূপ ব্যাপকভাবে এদেশের সমাজ জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে তা সহজে বুঝা যাবে।

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে যখন নিশ্চিত জানা গেল ভারতের অঙ্গচ্ছেদ অনিবার্য তখন বাংলার হিন্দু-প্রধান অংশ রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন সুরু হলো। এই সময়টায় একদিন নিজ ঘরে বসে আছি এমন সময় তদানিন্তন ভারতের অর্থসচিব (বর্তমানে পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী) সাহেবের এক কর্মচারী এসে বলতে লাগলেন—"ভাই সাহেব, আজ নবাবজাদার ঘরে কয়েকজন হিন্দু বাঙ্গালী এসেছিলেন, তাদের ও বাঙ্গালী মুসলমানগণের ব্যবহার, বেশভূষা সবই যে একই প্রকার দেখলাম, তবে আর বাঙ্গালী হিন্দুগণ বাংলা ভাগ করতে চায় কেন?" এ কথার কোন জবাব নেই—সহস্র কোটিবার বলা হয়েছে ভারত এক, ভারতের কৃষ্টি এক! কিন্তু ভারতে মুসলমান নাকি ভিন্ন একটা 'nation'; এই মিথ্যা যুক্তির উপর ভিত্তি করেই পাকিস্থানের দাবি, আর যখন উপায়ান্তর না দেখে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ স্বীকার করা হলো, তখন যে যুক্তি তাঁরা প্রাণপণে খণ্ডন করেছিলেন সেই যুক্তির বলেই সমগ্র বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাব দাবি করলেন। সুরাবর্দি সাহেবকে ঐ সময়টায়ই দিল্লীতে যখন প্রশ্ন করা হলো, "আপনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাগ চান, বাংলা বিভাগে আপত্তি করছেন কেন?" তিনি জবাব দিলেন, "I want an nndivided Bengal in a divided India." তাঁকে যখন দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হলো, "আপনি এই দিল্লীতে এক বছর পূর্বে (Muslim Legislators' Conferenceএ) ঘোষণা করেছিলেন হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন জাতি, তারা কিছুতেই একত্র বাস করতে পারে না।" জবাব পাওয়া গেল, "That was a mere speech." এরই কিছুদিন আগে চার্চিলকে ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে তাঁর নিজ উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "It is customary to say good things on ceremonial occasions" জগতের বর্তমান শিক্ষা দীক্ষার এই প্রকৃত স্বরূপ। এই শিক্ষার অতি উগ্র প্রতিক্রিয়াই গান্ধীজীর হত্যার কারণ।

গান্ধীজীর অর্থনীতি বুঝতে হলে, কাজে লাগাতে হলে এই শিক্ষার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে। সত্য ও অহিংসার প্রতি নিষ্ঠা যেমন গান্ধীজীর জীবনের প্রতিটি কাজে ফুটে উঠত, তাঁর আচরিত অর্থনীতি ও তাঁর জীবন যাপনের প্রতিটি ধারায় মূর্ত্ত হয়ে উঠত। টাটকা দুধ ও ফল আহার, শুভ্র ফেননিভ বস্ত্রখণ্ড পরিধান, নির্মল পরিমার্জিত কুটিরে বাস, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন চরখায় সুতা কাটা, গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ—এই হলো গান্ধীজীর অর্থনীতির আচরণের দিক, আর ইহার অন্তরের দিকটা হলো কোটি কোটি বুভুক্ষু, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন নরনারীর হেয় দৈন্যমোচনের পথ-নির্দেশ। মানব সমাজের এই দরদী বন্ধু সাধারণ দৃষ্টিতে অর্থনীতিজ্ঞ ছিলেন না বা কোন একটা নতুন অর্থনীতি আবিষ্কারের কল্পনাও তিনি কখন করেন নাই। তবে আজ গান্ধীজীর অর্থনীতি, এ কথাটা এলো কোত্থেকে? আর এ নিয়ে এত আলোচনাই বা কেন? দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসকগণ বিলিতী কাপড়ে বিদেশী ঢংএর খাতে আমাদের লজ্জা ও ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা

করেছেন ; আমাদের দেশের তথাকথিত অর্থনীতিবিশারদগণও বিলিতী ডিগ্রিলাভ করে ভারতে ম্যাঞ্চেষ্টার ও বার্মিংহাম সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছিলেন।

এরই মধ্যে বেধে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধ অবসানে দুর্গত ইয়োরোপের দানবতুল্য কলকব্জা সব বিকল হয়ে পড়ল। খাদ্য ও পরিধানের দ্রব্যের অভাবে অসংখ্য মানুষের চরম দুর্দশা ঘটল। কিন্তু এই যুদ্ধে যারা দানব শক্তির পরীক্ষায় পরাভূত হল এক দিকে তারা পুন: জীবনপণ করে সেই শক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হল, আর বিজয়ী যারা তারাও নিজেদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সেই একই সাধনায় নিযুক্ত থাকল। এই উন্মত্ত সাধনার পরিণতি হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। অমন উন্নত গর্বিত হিটলারের জার্মানীতে আজ অন্নাভাবে শীতবস্ত্রের অভাবে মানুষ কুকুর বিড়ালের মত রাস্তায় পড়ে মরছে। যন্ত্র কেন্দ্রী অর্থনীতি দস্যুর অর্থনীতি। জগৎ-জোড়া লুণ্ঠিত প্রবঞ্চিত নরনারী বালবৃদ্ধের অস্থিমজ্জা দিয়ে আকাশভেদী সৌধ নির্মাণের এই নীতি উন্মত্ত লালসার উদ্রেক করে—বুভুক্ষুর ক্ষুধা, দীনের দারিদ্র্য মোচনের নীতি এ নয়। কিন্তু ইহার আচরণের দিকটায় নির্মম শোষণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সুচতুর চিত্তাকর্ষক প্রচার ব্যবস্থায় যারা দুনিয়ার কোটি কোটি জনসাধারণকে আত্মাহুতির আহ্বান জানাচ্ছে। অগ্নিশিখার সর্বনাশা দাহিকা শক্তি যেমন নিজেকে গোপন রেখে কীটপতঙ্গের নিকট আলোর নিমন্ত্রণ পাঠায়, এই দানবীয় অর্থনীতিও ঠিক তেমনিভাবে নিজ অন্তরের শোষণ ব্যবস্থাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আলেয়া সৃষ্টি করে গোপন রাখে। পুঁজিবাদী যে কোন শিল্পপতিকে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যায় কলেজের অধ্যাপকগণের চেয়ে সাম্যনীতির কথা তাঁরা বেশি জানেন। Confucius থেকে Carl Marx পর্যন্ত সকল প্রকার সাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার সূত্রগুলি তাদের মুখস্থ। মিলের একই মালিক নিজ শ্রমিকদের নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করছেন, সগোত্রদের বৈঠকে গোপনে অধিক লাভের ফন্দি আঁটছেন, আবার শ্রমিক সভায় গদগদ কণ্ঠে শ্রমের মর্যাদা, কর্তব্য নিষ্ঠার মহিমা ও শ্রমিকের কল্যাণের বাণী প্রচার করছেন—এই দৃষ্টান্ত আজ দুনিয়ার সর্বত্র দেখছি। মিথ্যার উপর এই অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা। মানুষের মনে অনাবশ্যক বস্তুর জন্যও তীব্র অভাববোধ সৃষ্টি করাই এই ব্যবস্থার গোড়ার কথা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, আতপ থেকে দেহ রক্ষার জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন সে সব আমরা অপরের অনুরূপ প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থাকে ব্যাহত না করেই সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু ভোগ বিলাসের অবাধ প্রশ্রয় যখন দেওয়া হয় তখন অপরের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেও আমরা অস্বাভাবিক অভাব পূরণে প্রবৃত্ত হই। চতুর ব্যবসায়িগণ তাই মানুষের মনে অভাব বোধ সৃষ্টির কাজে রত থাকে। ফলে একদিকে যেমন ভোগের বন্যা বয়ে যায় অপরদিকে অভাব অভিযোগের হাহাকার আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তোলে। মিলের মালিক প্রয়োজনের অনুপাতে জিনিষ তৈরী করে না। নিজের অর্থাগমের প্রয়োজনে জিনিষ তৈরী করে যাচ্ছে সে। তারপর সেই সব মাল কাটতির জন্য মিথ্যা বিজ্ঞাপনে আরও কত কি প্রচার কার্য চালাতে থাকে। সোজা কথায় এই বাজার দখলের নামই সাম্রাজ্যবাদ। আবেসিনিয়ার 'অসভ্য' হাবসিগণ খালি পায়ে চলে, অল্পসল্প জামা কাপড়ে কাজ চালায়, টিনে পোরা মাংস, বিস্কুট কিছুই খায় না, অথচ ইটালীর মিলগুলিতে কাপড়, জুতা, বিস্কুট সব গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে, কোথাও বিক্রি হচ্ছে না, শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছে, ইটালীর মিল বন্ধ হবার জোগাড়। তাই নিজ অধিকৃত পার্শ্ববর্তী সোমালিল্যাণ্ড হয়ে ঐ সব জিনিষ আবেসিনিয়াকে সরবরাহ করাই ত ছিল ইটালীর একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বুনো হাবসিগণ ইটালীর আশানুরূপ জিনিষপত্র ক্রয় করতে চায় না। তা ছাড়া তাদের বাজারে ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকান ব্যবসায়িগণও এই একই মহৎ উদ্দেশ্যে আনাগোনা করছেন। সুতরাং আবেসিনিয়ার বাজার দখলের একমাত্র উপায় সে দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা। ইটালী-আবেসিনিয়া যুদ্ধের নিছক সত্য এই—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণও এই বিপরীত অর্থনীতি।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের কথা মনে পড়ছে। কোন এক স্থানে তিনি বলেছেন গান্ধীজী প্রয়োজনীয় টাকাকড়ির হিসেব নিকাশ অতি নিখুঁত ভাবে রাখতেন। একটি পয়সাও এদিক ওদিক হবার উপায় ছিল না। ত্যাগী দীনবন্ধু এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিলেন ; একদা গান্ধীজীর সঙ্গে ভ্রমণকালে পাথেয় সব টাকা যাত্রা সুরু করেই অল্প সময় মধ্যে খরচ করে ফেলেন এবং পরে সে জন্য গান্ধীজীর নিকট বড়ই লজ্জা পেতে হয়। এমন আপন-ভোলা সর্বস্বত্যাগী পুরুষের পক্ষে টাকাকড়ির হিসেব রাখার দক্ষতা দেখে দীনবন্ধু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। পূর্বেই বলেছি গান্ধীজী নিজে কখনও নতুন কোন অর্থনীতি আবিষ্কারক বলে নিজেকে মনে করতেন না। তাঁর সত্য সন্ধানের দুটি দিক ছিল—অন্তরের আরাধনা ও বাইরের আচরণ। তাঁর এই সাধনার অন্তরের দিকটা এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নয় ; আচরণেরও সম্পূর্ণ নয়, সামান্য অংশ বিশেষ আমরা আলোচনা করছি।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান সৈনিক গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন—রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ভারতের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছাবার পক্ষে অত্যাবশ্যক উপায় মাত্র। আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর আমরা মর্মে মর্মে এই সত্য উপলব্ধি করছি। সুপ্ত হেয় কুসংস্কার ও দারিদ্র্যগ্রস্ত জাতিকে জাগ্রত উন্নত করতে হলে এক দিকে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের সঙ্গে যুঝতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে গঠনমূলক কাজের সাহায্যে হৃত আত্মচেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই কারণেই যখন তিনি দেখলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে উপযুক্ত পরিমাণ সেনানায়ক ও সৈনিক দলের সমাবেশ হয়েছে, তখন থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালেন। আর সেই থেকেই সুরু হলো পূর্ণোদ্যমে কুসংস্কার, কুশিক্ষা ও জড়তার বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রাম। চরকা বা কুটির শিল্পে অনুরাগসৃষ্টি ও সরল অনাড়ম্বর অহিংস জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাই গান্ধীজীর অর্থনীতির গোড়ার কথা। যে সকল কোটিপতি ব্যবসায়ী আজ অর্থনীতিজ্ঞ সেজে বসেছেন তাদের এই অর্থ-

নীতি নাকি বোধগম্য হয় না, এর কারণ সুস্পষ্ট। আরও বড় ব্যবসায় ফাঁদা হবে, বিদেশ থেকে কলকব্জা আসবে, দরিদ্র জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট সরকারী ধনভাণ্ডার থেকে সংরক্ষণ শুল্ক, মাশুল হ্রাস, এমন কত কি অজুহাতে মোটা টাকা আদায় করা হবে—এই সব বড় বড় পরিকল্পনা বানচাল করে পাছে দেশীয় সরকার কুটির শিল্পের দিকে অগণিত স্বাস্থ্যহীন সম্পদহীন কুটিরের দিকে ফিরে তাকায় এই ভয়ে কতই না কারসাজি দেখছি।

ভারতে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। এই পরিস্থিতি ভারতে নয় সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বর্তমান। এদেশের কৃষকগণ বছরে গড়ে ছ'মাস কৃষির কাজ করে, বাকি ছ'মাস কাজের অভাবে বসেই কাটায়। বছরে ছ'মাস নিষ্কর্মা থাকায় দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া কর্মময় ছ'মাসকেও ক্রমাগত বিকল করে তুলতে থাকে। কৃষকের স্বাস্থ্যহানি ও দুঃখ দৈন্যের ইহা অন্যতম কারণ। কৃষকের এই দৈন্য ঘুচাতে হলে তার হাতে কাজ তুলে ধরতে হবে, আর অনিবার্য কারণে সে কাজ হবে কুটিরশিল্প। ভারতের ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই ভারতের নেতৃত্ব ও আদর্শের দিকে সকলে তাকিয়ে আছে আজ। ভারতের ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই অবস্থা একান্ত স্বাভাবিক। 'সূর্য উদয়ের দেশ' জাপান একদিন ভারতের মৈত্রী ও অহিংসার বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। দু' হাজার বছর পরে ইয়োরোপের যন্ত্র-কেন্দ্রী সমাজপদ্ধতি তথা সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র এশিয়া গ্রাস করতে উদ্যত হল। চতুর কর্মঠ জাপান আত্মরক্ষার মানসে ইয়োরোপের অর্থনীতি আয়ত্ত করে নিল; সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের মোহও জাপানকে পেয়ে বসল। আজ সেই প্রবল শক্তিধর গর্বিত জাপান কোথায়?

কোন দেশের, সমাজের, পরিবারের বা ব্যক্তির অর্থনীতি সমষ্টি বা ব্যষ্টির সমগ্র জীবনের থেকে আলাদা কিছু একটা বস্তু নয়। জীবনে টাকাকড়ির মূল্যজ্ঞান অর্থ উপার্জনের উপায় ও ব্যয়ের ধারাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আজ ইচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ব-অনুসৃত হিংসা ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। গান্ধীজীর আশা ও বিশ্বাস ছিল প্রবঞ্চনার পথ ছেড়ে মানুষ ন্যায়নিষ্ঠার পথে চলতে শিখবে। ভারতের প্রকৃত কল্যাণকর প্রয়োজনের দিক থেকে গান্ধীজীর অর্থনীতির যৌক্তিকতা রয়েছে। গান্ধীজীর কল্পিত সমাজে ব্যষ্টির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, আর মানুষের জীবন এমনভাবে গঠিত হবে যাতে সেই স্বাধীনতা পরস্পর সহযোগিতায় পুষ্ট হবে, বিরুদ্ধাচরণে কখনও ক্ষয় বা বিনষ্ট হবে না।

স্বাধীন ভারতে নবীন বর্ষ

বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

স্বাধীন ভারতে হে নব বর্ষ প্রথম তোমার পদার্পণ;
পাকিস্তানের দরদী প্রাণের অভিনন্দন করো গ্রহণ।
উড়িছে নিশান, বাজিছে বিষাণ আজি পশ্চিম বাংলাময়।
হর্ষ-ধারায় তাদেরে ভাসায় প্রাণ খুলে তারা গাহিছে জয়।
দিল খুসি করে বুঝে নিতে চায় তারাই স্বাধীন, স্বাধীন তারা;
ভাঙিয়া কারার লৌহ প্রাচীর জয় গৌরবে দেয় যে সাড়া।

স্বাধীন ভারত, বিজয় গীতিকা গাহিতে তোমার পারিনে আর;
রাজ-রোষে মোর বাক্‌রোধ আজ, মোর সেতারের ছিঁড়েছে তার।
কেমনে কেটেছে চুয়ান্ন সাল; কেমনে কাটে এ বারোটি মাস।
গেল আগষ্ট হতে প্রতিদিন ওঠে কত শত নাভি-শ্বাস।
বাস্তু হারার কি বেদনা বাজে স্থান ত্যাগের বিড়ম্বনায়
হায়! পশ্চিম বাংলা, তোমার সাধ্য কি আছে বুঝিবে তায়।

মন্ত্রী তোমার করিছে ঘোষণা—পূর্ববঙ্গে অত্যাচার—
হয়নি কখনো ভয়ে খসে তারা; এর চেয়ে নাহি মিথ্যাচার।
হে দরদী, তব দরদ বুঝিনা, মাথা গুঁজিবার চাহি না ঠাঁই;
শুধু করো সখা, সত্য-স্বীকার; এর বেশী কোন কামনা নাই।
হে নব বর্ষ স্বাধীন ভারতে গাহে সবে তব বিজয় গান;
তারি সাথে সাথে মহা উৎসাহে নাচে আনন্দে মোদের প্রাণ।
তবু দুখসর ভুলিতে পারি নি, ভুলি নি যশোর ইষ্টেশন;
বাস্তুহারার বুকের বেদন কাঁদায় আমায় অনুক্ষণ।
যাও তেরশত চুয়ান্ন সাল; ফুলের বাতাস করি তোমায়।
পঞ্চান্নের প্রীতির পরশে পুলকোচ্ছল করো সবায়।
ভাঙা বুকে বলি ব্যথা-ভরা প্রাণে চুয়ান্ন সাল চলিয়া যাও;
সারা বাংলার খুনে লাল তুমি জনমের মত বিদায় নাও।
তারে ভুলে আজি পঞ্চান্নের করি শুভ প্রীতি সম্ভাষণ।
স্বাধীন ভারতে হে নব বর্ষ এই ত প্রথম পদার্পণ।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

২১

আমার যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন পূর্ব্বদিকে রক্তিমাভা ঈষৎ দেখা দিতেছে। ম্লানায়মান্ চন্দ্রমা পশ্চিম দিগন্তে লীন। নৌকার কক্ষমধ্যে প্রজ্ঞা এখনও নিদ্রিত।—বোধ হয়, এই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রবাস গমনে কোনও প্রকার কাতরতা বা চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় নাই। হয়ত, সে এই দুর্ব্বলতা হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে; তাহা না হইলে কি সে এমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারে? এখন বেশ একটু শৈত্য অনুভূত হইতেছে। উত্তরীয় দ্বারা আপনাকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আনন্দ এখনও নৌকার হাইল ধরিয়া বসিয়া আছে। আমি তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম; বলিলাম, "আনন্দ, তুমি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৌকা চালাইতেছ—এখন তুমি যাও একটু বিশ্রাম কর, আমি এখন নৌকা চালাইতেছি।"

সে প্রথমে তাহার স্থান ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইল—আমি বলপূর্ব্বক তাহাকে তুলিয়া দিয়া, নৌকার কক্ষমধ্যে প্রেরণ করিলাম। আমি এখন নৌকা চালনায় ব্যাপৃত রহিলাম।

প্রজ্ঞার এতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সে নৌকার কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া, আমি পূর্ব্বে যেখানে বসিয়াছিলাম, সেইখানে বসিল। হাতে তাহার জীবন-সঙ্গী বাঁশী—সে তাহাতে সঙ্গীত আলাপ করিতে লাগিল। সে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ এবং অনেক সময়ে তাহার সঙ্গীতালাপে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

প্রভাতের আলোক ধীরে ধীরে প্রস্ফুট হইতেছে। পার্ব্বত্য নদীর দুই পার্শ্বের অদূরবর্ত্তী তীরভূমির বৃক্ষসমূহের ঘনপত্রাবলীর মধ্যে আশ্রিত তরল স্বচ্ছ অন্ধকারে বিহগ কাকলী জাগরিত হইতেছে। রূপের ও সুরের মধ্যে দিয়া উষা ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে। নদীর বক্ষে, নৌকার বাহিরে, মুক্ত আকাশের নিম্নে, প্রত্যুষের ধীর সমীরণে, প্রজ্ঞা তাহার হৃদয়খানি বাঁশীর সুরলহরীতে ভাসাইয়া দিয়াছে। তীরতরু সকলও ক্ষুদ্র খর্ব্ব বন ও গুল্মরাজিসমূহ কূজন মুখরিত। গৃহে অবস্থান কালেও প্রাতে ও সন্ধ্যায় সঙ্গীত সংলাপন তাহার নিত্য ক্রিয়া ছিল। আজও সে, এই প্রবাস গমনের সময়, তাহার বাঁশীটিকে সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হয় নাই। উষার এই শীতল স্নিগ্ধতায় সুমধুর সুরগুলি নদীর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বক্ষের উপর মন্থর পবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে।—প্রজ্ঞা, বাঁশীর ফুৎকারে, হৃদয়ের সকল বেদনা ঢালিয়া দিয়াছে।—তাহার নির্ব্বাসনের করুণ গীতি দিবসের রক্তিম সূচনাকে প্লাবিত করিয়া কোন দূর'ন্তরে ভাসিয়া চলিয়াছে। কপিঞ্জর কুলুধ্বনি, তীরের অসংখ্য কূজন-গুঞ্জন, অভিনব জাগরণের শিঞ্জিত শিহরণ ও সহস্র কলরবকে বাঁশীর উচ্ছ্বসিত মূর্চ্ছনায় স্তিমিত করিয়া দিয়াছে। কোনও খরস্রোতা প্রবাহিনীতে পুঞ্জীভূত কুসুমরাশি ঢালিয়া জলপ্রবাহকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া দিলে, যেমন কেবল পুষ্পরাশি তরঙ্গায়িত হইয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে তেমনি প্রজ্ঞার বাঁশীর সুরগুলি, প্রভাতের আকাশে মৃদুমন্থর কম্পনে কোন দূরদূরান্তরে প্রয়াণ করিতেছে। আমি দাঁড় ধরিয়া বসিয়া প্রজ্ঞার প্রাণের তীব্র-মধুর বিলাপ শুনিতেছি—ইহার উদাত্ত মূর্চ্ছনায় আমাকে অভিভূত করিয়াছে—আমাকে আমার বর্ত্তমান্ বাস্তব কর্ত্তব্য হইতে সম্পূর্ণ হরণ করিয়া লইয়াছে। আমি আত্মবিস্মৃত; নৌকার হাইলের উপর হাত রাখিয়া দিগন্তের দিকে চাহিয়া আছি। একটা মুখর, চঞ্চল, দিগন্ত-বিস্তৃত সজীবতা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।—শব্দে, সুরে, সঙ্গীতে, উষার অস্ফুট নবরাগে, বর্ণে, রূপে, সৌন্দর্য্যে, কুসুমিত তটভূমির সৌরভে, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়ে, এক স্বপ্নলোকের রচনা হইয়াছে; সেখানে আছে কেবল রূপের মোহ, সুরের মূর্চ্ছনা ও নবজাগরণের চাঞ্চল্য।

বাঁশী থামিল; কতক্ষণ ধরিয়া তাহার সুরলহরী সকল আকাশ-বাতাসকে পূর্ণ করিয়াছিল তাহা আমার মনে নাই; তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতাও বোধহয় আমার তখন লোপ পাইয়াছিল। এখন পুনরায় বাস্তবের মধ্যে ফিরিলাম—হাইল ধরিয়া—পাল ফিরাইয়া, নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলাম। ক্ষণিকের ভাবাবেশ হইতে মুক্ত হইয়া, কঠিন বাস্তব জগতে, আমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য পালনে পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিলাম।

দিনের আলোক এখন ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রভাতের রক্তিমরাগ এখনও আকাশে ভাসমান্—খণ্ড মেঘগাত্রে বিজড়িত, এখনও তাহা তটভূমির শৈলমালাশ্রিত প্রাংশু বৃক্ষরাজির সর্ব্বোচ্চ শাখা স্পর্শ করে নাই। প্রভাতের কাকলী ও নবজাগরণের কূজন-গুঞ্জন অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। নৌকা এখন অনুকূল বায়ুপ্রভাবে উত্তর পার্শ্বের উচ্চ শৈলময় বনানী-মণ্ডিত তটভূমির মধ্য দিয়া পশ্চিম মুখে চলিয়াছে। মধ্যাহ্নে আমরা পুনরায় উর্ব্বরা কর্ষিত ক্ষেত্র ও নানা ফলবৃক্ষ শোভিত তীরভূমির মধ্য দিয়া নৌকা বাহিয়া চলিলাম।

প্রভাতের শৈলশ্রেণী এখন দূরে অপসৃত হইয়াছে—শিখরগুলি রৌদ্রোজ্জ্বল গগন প্রান্তে ধূম্রবর্ণ পুঞ্জীভূত মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান্ হইতেছে। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে, পথে নৌকা বাঁধিয়া আমরা সকলে স্নানাহার সমাপন করিয়া লইতাম। রাত্রে অতি সতর্কতার সহিত নৌকা চালাইতে হইত। পার্ব্বত্য নদী, নাব্য হইলেও এবং দাঁড়ী মাঝি ও পরিচারকগণ পথের সহিত পরিচিত থাকিলেও, ইহার বক্রগতি ও পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে; সামান্য অসতর্কতায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। রাত্রে নৌকার সকলকেই সশস্ত্র থাকিতে হয়; এই পর্ব্বত বন্ধুর দেশে দস্যুদলের অভাব নাই।

এইরূপ মাসত্রয় অতিবাহিত হইলে শ্রাবণের প্রারম্ভে আমরা প্রায় পঞ্চসহস্র ষ্টাডিয়া * অতিক্রম করিয়া, কফেনস্ বা কপিষা নদীর তীরবর্ত্তী, কফেনস্ বা কপিষা নগরীর পোতাশ্রয়ে বণিকঘট্টায় উপনীত হইলাম। প্রাচ্য হইতে আগত বহু নৌকা এই ঘট্টায় সমবেত হইয়াছিল। সকলগুলিই বহুবিধ পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি আমাদের পূর্ব্বেই ঘট্টায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং কয়েকখানা আমাদিগের পরে আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করিল।

ঘট্টায় আমাদিগের নৌকাসমূহ উপনীত হইলে, কফেনসের শুল্ক বিভাগের নবকর্ম্মী, একজন পরোপমিশদ বা গন্ধারবাসী যবন, আমাদিগের নৌকায় আগমন করিয়া আমাদিগের বাণিজ্য সম্ভারের সূচীপত্র ও সম্ভারবাহী নৌকা কয়খানি পরিদর্শন করিতে চাহিলেন। আমরা তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে সহায়তা করিলাম। তিনি আমাদিগের সহিত সম্ভারবাহী নৌকাগুলিতে গমনপূর্ব্বক বাণিজ্যদ্রব্যসমূহ পরিদর্শন করিয়া আমাদিগের সূচীপত্রের সহিত মিলাইলেন ও আমাদিগের দেয় শুল্কের সমষ্টি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। আমাদিগের সূচীপত্রের নিম্নে, "পরীক্ষিত ও প্রমাদহীন," ও আমাদিগের প্রদেয় শুল্কের সমষ্টি লিখিয়া, কফেনসের শুল্কনবকর্ম্মীরূপে স্বাক্ষর করিলেন। পরিশেষে আমরা নির্দ্ধারিত শুল্ক প্রদান করিলে তিনি ঐ সূচীপত্রের শেষপ্রান্তে, "গৃহীত শুল্ক." লিখিয়া, দিবস, মাস ও বর্ষসহ স্বনাম স্বাক্ষর করিয়া সূচীপত্র আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি একজন তাঁহার যবন সহকর্ম্মীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি আসিলে প্রদত্ত শুল্ক তাঁহাকে রাজস্ব তালিকায় লিখিয়া লইতে আদেশ করিলেন।

এইরূপে আগন্তুক ও বহির্গমনোন্মুখ পণ্যসম্ভারের উপর যে শুল্ক বাণিজ্য পোতাশ্রয়ে গৃহীত হয় তাহা গন্ধারের পরোপমিশদ্ প্রদেশে পাশ্চাত্য যাবনিক রীত্যনুসারে যাবনিক ভাষায় "পেণ্টেকোষ্টে" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শুল্ক গ্রহণের ধারা অনুযায়ী পোতাশ্রয়ে আনীত সমগ্র পণ্যের নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর প্রতি শতকে দুই মুদ্রা ও বিক্রয়ের উপর প্রতি শতকে এক মুদ্রা রাজকোষে প্রদানের নিয়ম আছে এবং পোতাশ্রয়ে নবাগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পোতে প্রবেশ মূল্য একার্দ্ধচতুর্মোরিঅন্ রাজকোষে প্রদান করিতে হয়। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ দুই সহস্র যাবনিক দ্রাক্ম্ * অর্থাৎ পুরুষপুরে প্রচলিত মুদ্রায় সার্দ্ধসহস্র সুবর্ণ দিনার বাণিজ্যশুল্ক ও পোতপ্রবেশ মূল্য স্বরূপ রাজস্ব আমাদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইল।

[ক্রমশঃ]

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে শুল্কপ্রদান নামক একবিংশ বিবৃতি।

* যাবনিক দূরত্ব পরিমাণ।

* যবন দেশে প্রচলিত সুবর্ণ মুদ্রা।

বুনিয়াদী-শিক্ষা

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

গান্ধীজী মূলতঃ বিপ্লবী। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে ও তেমনই তিনি একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই বৈপ্লবিক শিক্ষাপদ্ধতিই আজ বুনিয়াদী-শিক্ষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বৈদেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বাধীন এবং সবল মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্য তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে যতখানি নজর দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি নজর দিয়েছেন জাতি গঠনের দিকে। তাঁর জাতি গঠনাত্মক কর্মপন্থার একটা বড় অঙ্গ ছিল জাতীয় শিক্ষা। এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতিকে তিনি নূতন করে গড়তে চেয়েছিলেন, তাকে একটা সম্পূর্ণ নূতন রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

তাঁর এই শিক্ষাপদ্ধতিকে ভাল করে বুঝতে হলে এর পিছনে তাঁর যে সমাজের কল্পনা ছিল তাকে বুঝতে হয়। আজকার সমাজে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে একটা গভীর বৈষম্য রয়েছে। একদল লোক অপরকে শোষণ করে বড় হচ্ছে এবং আর একদল শোষিত হয়ে দিনের পর দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। দেশের সমস্ত ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে মুষ্টিমেয় সহরে জমা হচ্ছে এবং দেশের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ তার গ্রামগুলি কর্মহীন এবং আনন্দহীন হয়ে ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। গান্ধীজী এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, সহরের ও গ্রামের এই অস্বাভাবিক সম্পর্ক দূর হয়ে গিয়ে একটা স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আজ যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে তা ঘুচে গিয়ে একটা শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠবে। তাঁর কল্পনা ছিল, তাঁর প্রবর্তিত এই শিক্ষাপদ্ধতি

সমাজের মধ্যে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং সমাজকে নূতনভাবে গঠিত করবে। তিনি বলেছেন, "My plan......is thus conceived as the spearhead of a silent social revolution......It will provide a healthy and moral basis of relationship between the city and the village......and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatural division between the 'haves' and 'have-nots.'

সমাজের এক স্তর এবং আর এক স্তরের মধ্যে এই যে বৈষম্য, এর মূলে আছে শ্রম। একদল পরিশ্রম না করে বসে বসে খায় এবং আর একদল উদয়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। এই বৈষম্য দূর করতে হলে সমস্ত সমাজকে শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বসে খেতে কেউই পাবে না। শিক্ষার ভিতর দিয়েই সমাজ গঠিত হয়। আমরা আমাদের ছেলেদের যেমনভাবে শিক্ষা দেব, আমাদের সমাজও তেমনি ভাবেই গড়ে উঠবে। সেইজন্য সমাজকে যদি শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে তার শিক্ষাকেও শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এছাড়া উপায় নাই। গান্ধীজীও তাই করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা তাই হচ্ছে কাজ। সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উৎপাদনাত্মক কোন একটা কাজের ভিতর দিয়ে ছেলেকে শিক্ষা দিতে হবে। কাজ দিয়েই তার শিক্ষা আরম্ভ হবে এবং এই কাজের সাহায্যে প্রথম থেকেই সে সমাজের ধন উৎপাদনের কাজে সহায়তা করতে থাকবে। তিনি বলেছেন, "I would begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training." এই কাজ থেকে যে আয় হবে তার দ্বারা শিক্ষালয়ের ব্যয় নির্বাহিত হবে। শিক্ষালয় স্বাবলম্বী হবে, তাকে বাহিরের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হবে না। তা ছাড়া, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভের ফলে ছেলে এমনভাবে তৈয়ারি হবে যে শিক্ষা সমাপ্তির পর সে স্বাধীনভাবেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। উপার্জনের জন্য তাকে অন্যের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না।

কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজ প্রবর্তিত হয়েছে। কাজ শিশুর প্রকৃতির অনুকূল। সে কিছু করতে চায়, এই তার স্বভাব। বসে বসে লিখতে পড়তে তার ভাল লাগে না। তার চেয়ে কাজের মধ্যে সে অনেক বেশি আনন্দ পায়। আর, এই আনন্দের ভিতর দিয়েই তার দেহমন ও প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশ হতে থাকে। প্রত্যেক ছেলের মনেই একটা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আছে। কাজের ভিতরে তার সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। উদ্দেশ্যহীন কাজ কখনও ভাল হয় না। সাধারণ শিক্ষালয়ে ছেলে যা শেখে, তার পিছনে কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় ছেলে যা শেখে তা কাজের প্রয়োজনে শেখে। তার সমস্ত শিক্ষার পিছনেই একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকে। সেইজন্য এই শিক্ষা ভাল হয়। ছেলে যা শেখে স্বাভাবিকভাবে আনন্দের সঙ্গে শেখে। ফলে তাড়াতাড়ি শিখতে পারে এবং যা শেখে তা সহজে ভোলে না। এই সকল কারণে সর্বত্রই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা দ্রুত প্রসারলাভ করছে।

কিন্তু সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং গান্ধীজীর প্রবর্তিত শিক্ষার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় কাজ যে কোন রকম কাজ হতে পারে। সেই কাজ যদি ছেলের আগ্রহ জাগাতে পারে এবং তাতে যদি ছেলে আনন্দ পায় তাহলেই হল। কিন্তু গান্ধীজী প্রবর্তিত শিক্ষায় এইটুকুতে যথেষ্ট বলে মনে করা হয় না। এখানে কাজ হবে সমাজের কল্যাণকর উৎপাদনাত্মক কাজ। এই কাজের একটা সামাজিক এবং কাজে কাজেই একটা আর্থিক মূল্য থাকবে। এর থেকে আয় হবে এবং তাতে শিক্ষালয় পরিচালনায় সহায়তা হবে।

আমাদের দেশের শতকরা ৮৬জন লোকই অশিক্ষিত। এই বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেবার মত অর্থ এই দরিদ্র দেশে নাই। এদের শিক্ষিত করবার জন্য যদি আমাদের অর্থের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় তাহলে অনন্ত কাল থাকতে হবে। কিন্তু শিক্ষা যদি ব্যয়-সাধ্য না হয়, শিক্ষার খরচ যদি শিক্ষার ভিতর থেকেই উঠে আসে তাহলে শিক্ষার সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। অশিক্ষিতের সংখ্যা যতই হক না কেন, আমাদের তার জন্য ভাবতে হয় না।

এ ছাড়াও আর একদিক থেকে এই শিক্ষার একটা বিরাট সার্থকতা আছে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে উপার্জন করতে করতে ছেলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সে বুঝবে, সে স্বাধীনভাবে নিজে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার তার প্রয়োজন নাই। তার আত্মসম্মান বাড়তে থাকবে। সে অনুভব করবে, শিক্ষার জন্যও সে কারও উপর নির্ভর করে না, সে নিজের শিক্ষা নিজেই অর্জন করে। সে শারীরিক শ্রমকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখবে এবং শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত হবে। তা ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের যে সমাজের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে এবং সেই দায়িত্ব পালন করেই যে তাকে তার অধিকার অর্জন করতে হয়, তাও সে বুঝতে আরম্ভ করবে।

তাহলেও গান্ধীজী এই শিক্ষাকে যে রূপ দিতে চেয়েছিলেন শিক্ষাবিদ্‌রা তাকে ঠিক সেই রূপে গ্রহণ করেন নাই। শিক্ষার কেন্দ্র-স্থানীয় কাজটি একটি উৎপাদনাত্মক শিল্প হবে, এ তাঁরা স্বীকার করেছেন; কিন্তু এর স্বাবলম্বনের দিকটায় তাঁরা তেমন জোর দেন নাই। কেউ কেউ বলেছেন, কাজ যদি ভাল করে করা হয়—ভাল ভাবে শিক্ষা যেখানে দেওয়া হবে সেখানে কাজও ভাল করে করা হবে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে—তাহলে তার থেকে একটা আয় হবে এবং সেই আয় থেকে বিদ্যালয় পরিচালনায় সহায়তা আপনা আপনিই হয়ে যাবে। কেউ বা বলেছেন, ছেলেদের কাজ থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার মত আয়

হতে পারে না এবং হবে বলে আশা করাও উচিত নয়। গান্ধীজী নিজে কিন্তু এই স্বাবলম্বনের উপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে স্বাবলম্বন এই শিক্ষার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। তিনি বলেছেন, "Such education···must be self-supporting, in fact, self-support is the acid test of its reality." গান্ধীজীর প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালী যাঁরা গ্রহণ করবেন তাঁদের এ কথা ভুললে চলবে না যে তাঁর মতে শিক্ষা শিল্প-কেন্দ্রিক হওয়াই যথেষ্ট নয়, শিক্ষা স্বাবলম্বী হওয়াও অবশ্য প্রয়োজন।

শিক্ষাকে স্বাবলম্বী যাঁরা করতে চান তাঁদেরও অনেকের মনে একটা সংশয় আছে, শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করা যায় কি না? শিক্ষার সমস্ত ব্যয় শিক্ষার থেকেই নির্বাহিত হবে, এতখানি অবশ্য প্রত্যাশা করা যায় না। শিক্ষালয়ের জমি, ঘর দুয়ার, সাজসরঞ্জাম, এই সকলের ব্যবস্থা সমাজকে বা রাষ্ট্রকে করে দিতে হবে। শুধু শিক্ষালয় পরিচালনার যে চলতি খরচ, যেমন শিক্ষকের বেতন এবং শিল্পের উপকরণের দাম, সেইটা শিক্ষার থেকে আসা প্রয়োজন। এইটুকু যে আসতে পারে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে। তা ছাড়া, শিক্ষার প্রথম থেকেই যে তা থেকে শিক্ষালয় পরিচালনার মত আয় হবে তাও নয়। প্রথম এক বছর কি দু বছর যথেষ্ট আয় হবে না, কিন্তু তৃতীয় বছর থেকে হবেই; এবং শেষের দিকে কিছু বেশি আয় হবে। তার ফলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষা স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। এর মধ্যে একটা কথা আছে, ছেলেদের শিল্পোৎপন্ন জিনিস ক্রয় করে নেবার দায়িত্ব সমাজ বা রাষ্ট্রকে নিতে হবে।

এই শিক্ষার কাল এবং মান নিয়েও আজ একটা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এইটুকু শিক্ষা নিয়ে সমাজ-জীবনে নাগরিকের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করবার মত ক্ষমতা ছেলের হয় না। সেইজন্য শিক্ষার মান আরও উন্নত করা প্রয়োজন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন যে তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষার মান বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের অনুরূপ হবে, শুধু ইংরেজী থাকবে না, এবং তার পরিবর্তে একটা বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। এইটিই হবে প্রাথমিক শিক্ষা। এই শিক্ষা হবে সার্বজনিক, আবশ্যিক ও অবৈতনিক। তিনি বলেছেন, "Primary education···coveriug all the subjects upto the matriculation standard, except English, plus a vocation···should take the place of what passes today under the name of primary, middle and high school education." এই শিক্ষার কাল হবে ৭ বৎসর। ৭ বৎসর বয়সে ছেলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে এবং ১৪ বৎসর বয়সে তার শিক্ষা সমাপ্ত হবে। ৭ বৎসরে এতখানি শিক্ষা সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। এই শিক্ষার কাল যে ৭ বৎসরেই হতে হবে এমন কোন কথা নাই। ৭ বৎসর সময়টা গান্ধীজীর শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ নয়। তিনি এই পরিমাণ শিক্ষা চান। এর জন্য যদি ৭ বৎসরের বেশি সময় লাগে তো তাতেও ক্ষতি নাই। গান্ধীজী বলেছেন, "Seven years are not an in integral part of my plan. It may be that more time will be required to reach the intellectual level aimed at by me." তাহলেও ৭ বৎসরে এই পরিমাণ শিক্ষা সম্ভব হতে পারে বলেই মনে হয়। বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশন-স্কুলের ছেলেদের অনেকখানি সময়ই ইংরেজীর পিছনে চলে যায়। যদি ইংরেজীর বোঝা না থাকে এবং মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে ম্যাট্রিকুলেশনের অনুরূপ মোটামুটি শিক্ষা ৭ বৎসরে দেওয়া যাবে। এই শিক্ষার যেটুকু পরীক্ষা এখন পর্যন্ত হয়েছে তা থেকে এই কথাই মনে হয়।

প্রকৃত শিক্ষা দিতে হলে ছেলেকে অনেক রকমের অনেক জিনিসই শেখাতে হয়। তার সবগুলিই একটা শিল্পের ভিতর দিয়ে শেখান সম্ভব কি না, এ সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সত্য সত্যই একটা মাত্র শিল্পকে অবলম্বন করে স্বাভাবিক ভাবে সব জিনিষ শেখান যায় না। কিন্তু শিল্প যে একটাই শেখাতে হবে, এমন কিছু হয়। বরং প্রধানভাবে একটা শিল্প শেখান হলেও আনুষঙ্গিকভাবে আরও অন্যান্য শিল্প শেখাবার ব্যবস্থাই এই শিক্ষায় আছে। ছেলেকে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করা এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। অন্ন, বস্ত্র এবং গৃহ মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। স্বাবলম্বী হওয়ার অর্থ এই প্রাথমিক প্রয়োজন নির্বাহ করবার শক্তি অর্জন করা। সেইজন্য কৃষি ও পশুপালন, সুতাকাটা ও কাপড় বোনা এবং কাঠের ও লোহার কাজ, এই সবগুলিরই কিছু কিছু ছেলেকে শেখান আবশ্যক। তা ছাড়া শিক্ষাকে যদি জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হয় তাহলে ছেলের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশকেও বাদ দেওয়া যায় না। এই সমস্তকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা চলবে এবং কোন প্রয়োজনীয় জিনিসই শিক্ষার থেকে বাদ যাবে না।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৩৮ সালে কয়েকটি প্রদেশে সরকারীভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। কিছুদিন পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং ইংরেজ গবর্মেণ্টের সঙ্গে মতদ্বৈধতার জন্য কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি প্রদেশেই বুনিয়াদী শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। মাত্র দুটি প্রদেশে পরীক্ষামূলক ভাবে একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষা চলতে লাগল। যুদ্ধের পর কংগ্রেস গবর্মেণ্ট পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে আবার সর্বত্রই বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। বাঙলা দেশে এতদিন পর্যন্ত সরকারীভাবে এ সম্বন্ধে কোন কিছু করা সম্ভব হয় নাই। কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর হল কিছু কিছু কাজ করতে আরম্ভ করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙলা দেশের কংগ্রেস-গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানেও বুনিয়াদী শিক্ষাকে সরকারী শিক্ষানীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কাজ এখনও বেশি দূর এগোয় নাই।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেস জাতীয় শিক্ষানীতি স্বরূপে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করেন। সেই জন্য, ইচ্ছায় হ'ক, আর অনিচ্ছায় হ'ক, প্রত্যেক প্রদেশেই গবর্মেণ্টকে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিকে স্বীকার

করে নিতে হয়েছে। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হয়, সকলে এটাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নাই। বাঙলা দেশেও আজ এই অবস্থাই হয়েছে।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর আমরা বেশি করে তাঁর কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি এবং তাঁর আদর্শকে সমাজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম নূতন করে সংকল্প করছি। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর সামাজিক আদর্শের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ বললেও বিশেষ ভুল করা হবে না। আমরা যদি গান্ধীজীর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহার এই শিক্ষাকেও আমাদের সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে।

পিছু ডাকে

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বনের পর বন, জঙ্গলের পর জঙ্গল, আদিমকালের আরণ্যক্ কালো। মানুষ গিয়ে হানা দিয়েছে সেখানে। ঠক্‌ঠক্ কুড়ুলের পর কুড়ুলের আঘাতে ছিন্নভিন্ন ক্রুদ্ধ বনদেবতা সুন্দরবনের এই অঞ্চলে শেষবারের মত রুখে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আছে দুরন্ত পশুবাহিনী, বাঘ কুমীর মশার ব্রিগেড। মানুষের লুব্ধতা কিন্তু নাছোড়বান্দা। কৃষিধ্বজ হলায়ুধ হয়ে সে এগিয়ে চলেছে অরণ্যকে জয় করবে বলে, প্লায়ের নীচের মাটির সঙ্গে মিতালি তার জন্ম থেকে, বনস্পতির বন্ধন থেকে সে উদ্ধার করবে শ্যামলা মাটিকে, বীর্য্যবতী হবে বসুন্ধরা, শস্যমালিনীর সোনার ঝাঁপি ভরে যাবে কনকাঞ্জলিতে।

বনান্ত দিক্-রেখার দিকে চেয়ে হারু সেই কথাই ভাবছিল, আরো দুএক বিঘে জঙ্গল যদি ইজারা নিতে পারে—বিঘে প্রতি বারো মন্ আর সুঁদরী কাঠগুলোর কিছুটা পেলে···

বছরের পর বছর সে যুদ্ধ করে চলেছে ঝড় জল জঙ্গল আর বাঘ ম্যালেরিয়ার সঙ্গে—সবাহন্ সপারিষদ অরণ্যদেবতার সঙ্গে।

হঠাৎ নজরে পড়ে হারুর—তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে কি রকম আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাদু।

—কি হয়েছে রে, অত হাঁকু পাকু কিসের?

—কে যেন···

কথা বেরোয় না গলা দিয়ে—উৎকণ্ঠায় ভয়ে। একটা হাঁক্ দিলে হারু—জোয়ান্ মরদ গলার নির্ভীক্ হাঁক্।

সামনে নিমগাছের ডাল থেকে একটা পাখী ডানার ঝটাপট শব্দ করে উঠলো, একদল শিয়াল হুক্কাহুয়া করে চীৎকার করলে, ঝিল্লী ঝাঁঝরের সঙ্গে কিসের একটা অস্পষ্ট শিরশিরণী শব্দ উঠলো, শার্দ্দুল সহচর ফেউএর ডাক্ সেই সঙ্গে···

এই ত সেদিন পাশের আবাদের ভুঁইয়াদের তিনটি ছেলেকে অরণ্যদেবতা গ্রাস করলেন নির্ব্বিচারে, একটি গেলো সাপের কামড়ে, একটি কুমীরের পেটে, আর একটি বাঘের থাবায়। বুনো জ্বর আর আমাশার ত কথাই নেই, লেগে আছে ঘরে ঘরে।

—তুই যেন দিনে দিনে ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছিস—বলে হারু।

—মরণ্ আর কি—মুখ ঝামটা দেয় কাদু।

সিঁদুরে মেঘ দেখা বাঁধা গরুর মত কিন্তু হান্‌টান্ করে সে।

এইত সেদিনের কথা—বড় নদী পেরিয়ে কাঁথির শ্রীপুর থেকে জোয়ান্ হারু যেদিন কাদুকে নিয়ে ছোট্ট ডিঙি বেয়ে পাড়ি দিয়েছিল গঙ্গাসাগরের এই পেছন কোণে মাতলা নদীর দক্ষিণে। অতিকষ্টে কাকদ্বীপে পৌছে বড় নৌকো ধরেছিল। ভরতি বর্ষার শেষে সে কী জোর তুফান্—শন্ শন্ ঝড়ো হাওয়ায় মাতাল নৌকো বান্‌চাল হতেই বসেছিল। বড় নদীতে পড়ে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল কাদু—ঈশান্ কোণে মেঘের কি জমজমাটী জমায়েৎ, এপার ওপার নিশানা না পাওয়া নদীর বুকে কী বিরাট্ হানা, যেন একশো পশুরাজ তাদের কালো

কেশর ফুলিয়ে ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিংড়ে নিতে চায় মানুষের সামান্য সহায় সম্বলটুকুকে।

কানু কেঁদে উঠেছিল ভয়ে, অন্য মেয়েরাও।

হারু ধমক দিয়ে বলেছিল—এই সাহস নিয়ে তুই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিস্—

মাঝদরিয়ায় মাঝিরা বদর বদর করে পীরের সিন্নি মেনেছিল।

অনেক দুঃখেই হারু অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছিল, শুধু পেটের জ্বালায় নয়, জ্বালামুখী ফুটেছিল তার মনেও।

কানু তার ছেলেবেলাকার খেলার সাথী। বালিয়াড়ীর পিছনে ছোট্ট খাড়ির চিক্‌চিকে বালির ধারে তারা দুজনে খেলা করত বরবউ হয়ে। গম্ভীর হয়ে কানু গিন্নীপণা করত, বালির বাঁধ দিয়ে উচ্চচূড় ঘর বাঁধতো—ঝিনুকের বর্ডার দিয়ে পায়েস রাঁধতো কাদা গুলে।

সমবয়স্কা অন্য ছেলেমেয়েদের আমল দিতে চাইত না কানু, হারুকে নিয়েই মত্ত। সমবয়সী সই দুর্গা বলত—তুই বড় দুষ্টু কানু, একাই খেলবি ওর সঙ্গে।

গম্ভীর হয়ে কানু বলত—হ্যাঁ, ও যে আমার বর। দুর্গা হাসতো—ওমা, তাই এতো, ভাগ দিতে ভয় হয়।

নবছর বয়সে মা-মরা কানুর যখন বিয়ে হলো ভিঁন্ গাঁয়ের বুড়ো সুরথের সঙ্গে তখন বারো বছরের ছেলে হারুর কি আনন্দ।

—এই কানু, তোর খুব মজা লাগছে, না?

কানু ছোট্ট ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিয়েছিল—ধ্যেৎ!

কবছর পরে কানু শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে আবার মামার বাড়ীতে এসে খেলায় মন দিলে, আর রুগ্না মামীর ছেলে-মেয়েগুলোকে খাওয়াতে নাওয়াতে লাগল। তার মন কিন্তু তখন আস্তে আস্তে মোড় নিচ্ছে, দেহটাও ভারী। রেখার কোমলে কঠিনে সবে ধরা দিচ্ছে দেহের খোঁজ-খাঁজগুলো, মনের ভেতরেও তার যেন সাড়া, পেশীতে কার যেন আগমনীর আভাস। হারুকে দেখে কেমন লজ্জা করে, অথচ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতেও ভাল লাগে, পুতুল নিয়ে আর খেলতে ভালো লাগে না।

হারুও তখন ষোলো সতেরো বছরের। অঙ্গে অবয়বে আগন্তুক যৌবনের স্পষ্ট দৃপ্ত চেহারা, শিরায় শিরায় নতুন এক উষ্ণতা।

নদীর ধারে গিয়ে সে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকতো পাল তোলা বড় বড় নৌকো, জাহাজের মাস্তুলগুলোর দিকে—কোথায় চলেছে তারা, কোন অজানা দেশে? মনে মনে কল্পনা করতো একটা ছোট্ট ডিঙ্গি নিয়ে সে পাড়ি দেবে একবার সাগর পারে। মাঝে মাঝে শুনতে পেতো তাদের আশ-পাশের মাঝিমাল্লা জেলে হাটুরেদের কথা—ওপারে আছে নাকি এক আজব সোনার দেশ, উবর উর্ব্বর—শুধু যাওয়া আর মুঠো মুঠো সোনার বরণ ধান লুঠে নিয়ে আসা—ছড়িয়ে দিলেই ফলন্। আর এখানে, বছরে তিনমাস তারা খেতে পায়, আরো তিনমাস কোন রকমে টানাটানি, বাকী ছমাস ভগবানই জানেন, তবু সবাই কিছু না কিছু মাছ ধরে, জাল বোনে, শাক লাউ কুমড়োটা ফলায়।

আরো দুতিন বছর যায়, কানু ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পড়ে, হারুর উনিশ পেরিয়ে বিশ্। নতুন করে গাঙে যেন জোয়ার আসে, দক্ষিণে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় সব কিছু ধুলো বালি ময়লা।

পই পই করে মামা নিবারণ কানুকে শাসিয়েছে—দেখ্ ঐ বামণুলে হারুর সঙ্গে বেশী মেশামিশি করিসনি। তুই বিধবা মানুষ—পাঁচজন পাঁচকথা বলবে, দরকার কী! কিছু জবাব দিতোনা কানু—শুধু থেকে থেকে বুকটা একটু কেঁপে উঠতো কি এক অজানা আশায় আকাঙ্ক্ষায়।

সামনে কিন্তু নিবারণ হারুকে কিছু বলতে সাহস করতো না, তার ছফুট লম্বা কালো পাথরে কোঁদার মত সুপুষ্ট পেশীবহুল চেহারা নিবারণের মনে সম্ভব ভয়েরই উদ্রেক করতো, তাছাড়া তার কাছে চাষ-আবাদে সাহায্যও পেতো সে ঢের। তবু নিবারণ পেছনে দিতো কুৎসিত গালাগালি, আর মামীকে গঞ্জনা।

রুগ্না মামী তবু মাঝে মাঝে মুখ ঝামটা দিত—আ মরণ, শতেক খোয়ার না হলে আর তোমার ঘরে মুখে কেউ অন্ন তোলে, পোড়াকপাল, এর চেয়ে বেরিয়ে যাওয়াও ভাল।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে নিবারণ জবাব দিতো—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যাও গোষ্ঠীশুধু, পিণ্ডি গেলার আর দরকার কি—

মামী চেঁচাতো—তোমার দুপয়সার সাশ্রয় হয় যে, কি পয়সাই চিনেছো—

চুপ করে আনমনা হ'য়ে বসে থাকতো কানু—কী পোড়াকপাল তার।

জমিদার ইন্দ্রনারায়ণবাবু আবাদে চাষের জন্য জোয়ান্ লোক খুঁজছিলেন। বাঘের সঙ্গে কুমীরের সঙ্গে ঝড়ের সঙ্গে খাড়া লড়াই করে মাথা তুলে যারা চলতে পারবে এমন ইস্পাতওয়ালা মানুষ। তাঁর বেগার অবশ্য কিছু দিতে হবে, কিন্তু তিনি লিখে দেবেন দশ বিঘে করে জঙ্গল। ত্রিশ বছরের লীজ্, দশ বছর খাজনা দিতে হবে না, পরে বিশ বছর আধ্বেক্ ধান, আধ্বেক্ খাজনা।

বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো হারু শুনেই ঠিক্ করে ফেল্লে যাবে। নিবারণও খুব উৎসাহ দিলে—যাবি বই কি, জোয়ান্ বয়েস্ এই ত খাটবার দিন্—

কাদু কেঁদেই মাটি করলে—ওমা, সে কী, এই সেদিন জ্বর থেকে উঠেছো, কোথায় বিদেশে বিভূঁয়ে যাবে, কে দেখবে, কে রেঁধে দেবে?

হারু শুধু তার হাতটা টেনে নেয়। কাদুর অঙ্গ যেন অবশ হয়ে যায়। চুপ করে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে দুজনে সাঁঝের আলোয়। নির্জ্জন আকাশে তখনো তারার দল ভিড় করেনি, শুধু দুটি একটির অস্পষ্ট আভাস নীহারিকার নবনীল রাজত্বে।

—যাই কাদু।

কেঁদে ফেলে সে, কান্নাভেজা সুরে বলে—

—যাই বলতে নেই, বলো আসি, তিন সত্যি করো, আসবে ফিরে—

—সত্যি, সত্যি সত্যি।

পিছন ফিরে চাইতে চাইতে চলে যায় হারু—চারকোশ দূরে জমিদার বাড়ীতে তাদের জমায়েৎ হবার কথা। ভোজও হবে জোর। বাবুর হুকুমে বড় বড় খাসি কাটা হচ্চে। অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের কল্পনায় সবাই রঙীণ্। বড় তামাক ছোট তামাক গালগল্প আর তাড়ির ভাঁড়ের মাঝে সোনার স্বপ্নে সবাই মশগুল। হারু দেখে শুধু মরদরাই নয়, কয়েকজন জানা অজানা মেয়েও চলেছে কামিন্ খাটবে বলে।

হারু চুপ করে একপাশে বসে বিঁড়ি ফুঁকছিল, মনটা খারাপ—হঠাৎ তাদের পাশের গাঁয়ের শ্রীমন্তর ফিস্‌ফিসানি শুনে চমকে উঠলো—নিবারণ নাকি বেশ মোটা টাকা নিয়ে গোমস্তাবাবুর বাড়ী ঝিয়ের কাজের জন্যে কাদুকে ছেড়ে দেবে—সবই ঠিক—শুধু হারু চলে যাওয়ার অপিক্ষে —কি জানি গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে—কী না কী করে বসে! মেয়েটা এখনও জানে না।

হারুর মাথায় যেন আগুনের জ্বালা ধরে—বটে রে, বেটা বেঁটে। মনের পর্দায় ভেসে উঠলো গোমস্তার চেহারাটা—গোলগাল নাদুস-নুদুস, কুতকুতে চোখ, চক্‌চকে টাক, মুখে লেগে আছে এক রকমের দেঁতো হাসি, গায়ে গোপিকারমণের শত নামাবলীলাঞ্ছিত উত্তরী। হারুর ইচ্ছে হয় গোমস্তার টাকের নীচে স্বল্প চুলের গুচ্ছে বাঁধা পূজোর প্রসাদী ফুলটি টিকিশুদ্ধ উপড়ে দেয়।

তখনি উঠলো সে, শ্রীমন্ত শুধোয—কোথায় চললি হারু?

—এই একটু ঘুরে আসি—

তার দৃপ্ত মত্ত পৌরুষ জেগে উঠেছে মনে, কামনার লহর নিয়ে—কাদুকে তার চাই!

খালের মুখে একটা ডিঙি বাঁধা ছিল—খুলে পাড়ি দিলে সে, সারারাত বেয়ে ভোর সাড়ে তিনটায় পৌছল গাঁয়ে। তিনদিন পরে সে বড় নৌকো ধরলো কাকদ্বীপে। সঙ্গীরা খুব বেশী আশ্চর্য্য হলো না কাদুকে দেখে। তার অনুপস্থিতির সঙ্গে কাদুর যে একটা বিশেষ যোগ আছে সে কথা বলাবলি করছিল সকলেই। ওরকম হামেশাই হয়। কত মেয়ে ঘর ছেড়ে পাড়ি দেয়, আবার ফেরে, কত ছেলে তাদের ফেলে পালায়। সমাজের বাইরে জঙ্গলের ধারে কিছু বিসদৃশ কটু লাগে না তাদের চোখে, বরং আবাদে গিয়ে লাঠালাটি, দখলিসত্ব, বাঘ ভালুকের মাঝে দুএকটা কোমল কালো চাহনি নিয়ে যদি একটু চোখোচোখি ও কথা কাটাকাটি না হলো, তাহলে এই বুনো দেশে কি নিয়ে তারা থাকবে।

শ্রীমন্ত হেসে বললে—তা হলে সুভদ্রাহরণ হলো—

—হ্যাঁ, দিয়েছি বুড়োর থোঁথা মুখ ভোঁতা করে।

—যাই বল, তুই পয়মন্ত বটে, এবারে আবাদে একটা মেয়ের মত মেয়ে যাচ্ছে বৈরিগীকে ডাকিয়ে কণ্ঠীবদলটা করে নিস্।

প্রথম থেকেই হাঁফিয়ে উঠেছিল কাদু: এ কী দেশ রে বাবা, চতুর্দ্দিকে যতদূর চোখ যায় শুধু জঙ্গল আর খাল, বন আর বড় বড় গাছ, রাতে ঝিঁঝিঁ আর জোনাকীপোকা, জানোয়ারের ডাক, সাপের সরসর শব্দ। লোক নেই, জন্

নেই নির্ব্বান্ধব কুঁড়েটাকে দেখলেই তার কান্না পেতো—বনটা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। দিনের বেলাটা কোন রকমে কেটে যেত—হারুর সঙ্গে সেও খাটতো। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই বুকের ভেতরটায় যেন কাঁপুনী ধরতো—কালো বন থেকে কে যেন দুটো হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগুচ্চে মনে হ'ত। এক একদিন সে বলতো—ভালো লাগছে না বাপু, চলো যাই অন্য কোথাও—

হারু হাসতো, তার টুকটুকে গালটা টিপে দিয়ে বলতো—লজ্জা করে না দেশে ফিরতে, ঘর ছেড়ে এসেছিস্ মনে নেই—রাঙা হয়ে উত্তর দিতো কাদু—সে তো তোমারই জন্যে।

হারুকে কিন্তু বনের নেশা পেয়ে বসেছিল। ভয়ঙ্করী সর্ব্বনাশী এই নেশা, একবার রক্তে ঢুকলে ছাড়ানো দায়। মানুষের বন্য যুবশক্তির সঙ্গে প্রাচীন বুনো জঙ্গলের যুদ্ধ—আদিম আরণ্যক্ সূচ্যগ্র মেদিনী ছেড়ে দেবে না বিনা সংঘর্ষে, গোঁয়ার মানুষও নাছোড়বান্দা।

গভীর রাত্তিরে এক একদিন কাদু আঁতকে উঠতো ঘুম ভেঙে—কে যেন ডাকছে, বুনো অজগর যেন ফোঁস ফোঁস করছে নিষ্ফল আক্রোশে—শুনতে পেতো হায়না, হরিণের ডাকের মাঝে যেন এক ক্রুদ্ধ দেবতার অভিশাপ।

পাশের আবাদের সোনাদিদির সঙ্গে কাদু গঙ্গাজল পাতিয়েছিল। সোনাদিদিও বৈরাগীর মেয়ে, কার সঙ্গে প্রণয়ের রসকলি পাতিয়ে এসেছিল এই তেপান্তরের জঙ্গলে কেউ জানে না। নাকের উপর টিকোলো তিলক্, গলায় কণ্ঠী, পানের রসে ঠোঁট রাঙানো--মুখে হাসি লেগেই আছে, কথারও খই ফুটছে মুখে। সবার দায়ে অদায়ে তাকে দেখা যাবেই।

প্রায়ই আসতো সে—সই, ওলো সই!

—কি ভাই গঙ্গাজল।

—কি হচ্চে, ইহকালের কেষ্টঠাকুরের ধ্যান্ না পর-কালের শ্যামরায়ের?

নিঃশব্দে চেয়ে থাকে কাদু।

—কি ভাবছিস্ লা গঙ্গাজল?

—ভয় করে ভাই।

—সে কী, পেটে একটা এসেছে, এসময় ভয় পাওয়া ত ভালো নয়।

লজ্জায় ভয়ে চুপ করে থাকে কাদু।

—সত্যি বলছি আমারও গোড়ার দিকে কি রকম গা ছম্ ছম্ করতো—বড় বড় গাছগুলো যেন মাথা নেড়ে কী বলতো। কত ঠাকুরদেবতা উপদেবতা থাকেন ত বৃক্ষ বনস্পতিকে ভর করে, তাঁদের আশ্রয়ের আসনগুলোকে কেটে খান্ খান্ করা—কি রকম লাগে যেন ভাই—

—পোড়া পেটের জ্বালায় করতে হয় দিদি—

—তাতো জানি বোন, কিন্তু মনে হয় যেন তাঁদের গায়ে হাত দিচ্চি—অপরাধ হচ্চে।

—সত্যি দিদি—শিউরে ওঠে কাদু।

—কি জানি, সেই পাপেই বুঝি পেটে একটাও এলো না, কত মানত—কত দোর ধরেছি ঠাকুরের।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঘুরে ঘুরে মরে দুই সমবয়স্কা সখীর মাঝে ব্যর্থ বেদনায় চঞ্চল হয়ে।

—বাবার স্থানে পূজো দিয়েছিস্—বদরপুরের পীরের দরগাতেও পূজো পাঠিয়ে দেব তোর জন্য।

ভয় যায় না তবু কাদুর—হারু আশ্বাস দেয়, সোনাদিদি বোঝায়, আবাদের পাঁচজনে কত কথা বলে। সন্ধ্যেয় কিন্তু কুঁড়ের দাওয়া থেকে নামতে তার সাহস হয় না। বনের দিকে পিদিম্ দেখিয়ে সেইখানেই সে আঁচল গলায় দিয়ে প্রণাম করে:

—অপরাধ ক্ষমা করো বাবা, আমরা বড় গরীব, তোমার আশ্রয়ে পায়ের তলায় পড়ে আছি দেবতা।

শন্ শন্ হাওযায় ফিরে আসে সে নমস্কার—না, না ক্ষমা নেই, তোরা আমার গায়ে হাত দিয়েছিস্—এত স্পর্দ্ধা মানুষের!

খরবেগে বায়ু বয় প্রেতের অট্টহাস্যের মত—থর থর করে কাঁপতে থাকে কাদু।

দুটি ছেলেকে পর পর বন-দেবতার কালো কোলে তুলে দিতে হ'ল কাদুকে।

সোনাদিদি কাদুকে আশ্বাস দিয়ে বলে—ভাবিসনি, এবার নৌকো এলে মহিষাদলের মহিষমর্দ্দিনীর মাদুলী আনিয়ে দেব, ওঁর কাছে সবাই জব্দ, চামুণ্ডা কিনা, স্বয়ং শিবকেই পায়ের তলায় ফেলে রেখেছেন্।

নমস্কার করে ভক্তিভরে সোনাদিদি।

মাদুলীর জোরেই হোক্, আর সময়ের গুণেই হোক্,

আস্তে আস্তে সয়ে যায় কাদুর, ভয় কিন্তু একেবারে যায় না। লাট্ মনসাদ্বীপের চক্‌বন্দী আবাদের আশে পাশে বাস্তু গড়ে ওঠে নদীর ধারে ধারে—ভরে ওঠে না কিন্তু ছোট শিশুর কাকলীতে—টলতে টলতে যে এগুবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে—হাঁ করে চেয়ে থাকবে কাদু আর সোনাদিদি! একজনের ভয় কখন হারায়, আর একজনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা—দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবে।

তন্ময় হয়ে ভাবে সোনাদিদি—বালগোপাল কি মা বলে আসবে না কোলে—

অরণ্যদেবতা যতই হটতে থাকেন, বনের রেখা যতই সোনার শীষের শ্যামাঞ্চলে ঢাকা পড়ে, ততই উদ্বেগ বাড়ে কাদুর। ভয় আর যায় না—হারুর জন্য ভয় করতে সুরু করে—কি জানি কি হয়, হারু ত শুধু তার ভালবাসার সামগ্রী নয়, তার ভাবীছেলের বাপও, যে ছেলে সে হারিয়েছে, যে ছেলে আবার আসবে—

বুকটা টন্‌টন্ করে ওঠে তার, চোখে আসে জল। হারু হেসে বলে—আঁচলে আগলে আর কতদিন রাখবি, ছেড়ে দে বাবার নামে, কপালে যা আছে হবে—

কাদু চোখ মুছে বলে—না, না, আমার মাথা খাও—

যতক্ষণ না সে ফিরবে, হান্‌টান্ করবে কাদু। মাদুলী তাবিজ শুধু কাদুর নয়, হারুরও গলা হাত কোমোর ভর্ত্তি হয়ে ওঠে ক্রমে।

কাদুর মনে হয় সবাই যেন ওৎপেতে বসে আছে কখন তার কি সর্ব্বনাশ ঘটাবে! কেড়ে নেবে তার সব কিছু! পিছু ডাকছে অমঙ্গলের বাঁশী, যেন নিশির ডাক্—বনদেবতা যেন সবাইকে চর লাগিয়েছে—বুকে হাত রেখে ভয়ে সে বলে ওঠে—বাবা, বাবা, রক্ষা কর—

রাতে সে জোরে আঁকড়ে ধরে হারুকে—পালিয়ে যাবে না তো তুমি, শুনছ না কে ডাকছে—

—দূর পাগলী—বলে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোয় হারু। মাঠের ধারে একদিন একটা কেউটে তাড়া করেছিল হারুকে, বাড়ী এসে হেসে সে গল্প করেছিল কাদুর কাছে—

শুনে বুক টিপ্ টিপ্ করে উঠেছিল কাদুর, মা মনসার পূজার জন্য একসরা ধান তখনি মানত করেছিল সে। অনুযোগ করেছিল—কেন সে ওদিকে গিছলো।

হো হো করে হাসে জোয়ান হারু—সারাআবাদ ধরে তার নামডাক—সাবাস্ ভাই, মরদ বটে, কত বাঘ কুমীর ময়ালের সঙ্গে সে লড়াই করেছে একা টাঙ্গি আর কুড়ুল নিয়ে। এই ত সেদিন সুঁদুরী কাঠ চুরি করতে এসেছিল বোম্বেটের দল—একা রুখেছিল হারু দশটাকে—সড়কি আর ল্যাজা দিয়ে।

কাদু রেগে বলে—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি—

হারু উত্তর দিয়েছিল—তুই থাম—

দিন যায়, বছরের পর বছর, সোনাদিদি পর্য্যন্ত ভাবিত হয়ে ওঠে—দেবতার কোপ লাগলো নাকি, আর একদফা মাদুলী তাবিজ স্বস্ত্যয়ন চললো—

কবছর পরে আবার যখন সন্তান-সম্ভাবনা হলো, কাদু বেঁকে দাঁড়ালো—আর সে থাকবেনা এই দেশে। দেবতা নিঃশ্বাসে শুষে নেবে তার পেটের ছেলে। চেঁচিয়ে কেঁদে অস্থির হয়ে ওঠে—এই বুনোদেশ কী ছাড়বে না, গুষ্ঠীশুদ্ধুকে না মেরে—

তার এই নবজাগ্রত উপলব্ধি হারুকে ভাবিয়ে তোলে, সন্ত্রস্ত করে। যে কাদুকে সে ছেলেবেলার পুতুল খেলা থেকে জানে এ যেন সে কাদু নয়, সন্তান-সম্ভাবনায় সে হয়ে উঠেছে এক হিংস্র বাঘিনী, নির্ম্মমভাবে রক্ষা করবে তার নাড়ীছেঁড়া আদরের ধনকে—কারুর রেহাই নেই। এমন কি ছেলের বাপকেও নয়।

কাদুর এক বুলি—এবারের চাষ শেষ হলে চলো তুমি।

—সে কী! খাবো কি—

—যা হয় জুটবে একমুঠো, না করোনা আর, পেটের-টাকে বাঁচতে দাও—

এখানে থাকলে মরবে, আর ওখানে গেলেই বাঁচবে—কে বল্লে তোকে—

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পায়ে পড়ি তোমার, একটা কথা রাখো—

—দেখি—

—দেখি নয়, বাবার গায়ে হাত দিয়ে কয় করেছো তাঁর দেহ, শাপমণ্যি লাগছে না, বাবার রাজত্ব না ছাড়লে রক্ষা পাবে না পেটেরটা।

আগেকার দিনের সেই অদ্ভুত ভয় যা ঘুমিয়ে পড়েছিল তার মনে, আবার শতগুণে জেগে ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে।

অরণ্য দেবতার ক্রুদ্ধ মুখ রাতের অন্ধকারের সঙ্গে এগিয়ে আসে। মনে মনে সে বলে—রক্ষে করো বাবা!

যতই দিন যায় কাদু কি রকম যেন হয়ে যায়। খায়না দায়না, হাঁ করে বসে থাকে উদাস হয়ে। যে ঘরসংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটির উপর তার টান ছিল সেই সংসারই আর সে দেখে না—তার শুধু এক কথা—এদেশ থেকে চলো, বাঁচতে দাও এটাকে—

হারু পর্য্যন্ত রেগে ওঠে, এড়িয়ে চলে ওকে। সোনাদিদি এসে বলে—গঙ্গাজল, এ কী করছিস্ বোন্!

—না দিদি, এদেশ থেকে বিদেয় না হলে পেটেরটা বাঁচবে না—

—বালাই ষাট্—মিথ্যে ভেবেই তুই গেলি।

শ্রীমন্ত পর্য্যন্ত এসে বলে হারুকে—কি আর করবে ভাই, অন্ততঃ কিছুদিন না হয় শ্রীপুরে ঘুরে এসো—

গোঁয়ার হারু চুপ করে থাকে—

শেষ পর্য্যন্ত কাদু বেঁকে তার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ে—তুমি না যাও, আমায় ছেড়ে দাও, আমি ত তোমার গাঁটছড়া বাঁধা বউ নই। পেটের ছেলেটাকে তা বলে মরতে দিতে পারি না, তোমার না টান্ থাকতে পারে।

হারুর বুকটা কেঁপে ওঠে—কাদু বলে কি, মন্ত্র পড়ে পুরুত ডেকে তাদের বিয়ে হয়নি বটে; কিন্তু এই আকাশ, এই বাতাস, শ্রীপুরের সেই বালীয়াড়ী, চঞ্চল নদীর জল, সবাই সাক্ষী, সবাই জানে···হা ভগবান—

দারুণ অভিমানে ভরে ওঠে তার মন। সময় বুঝে অরণ্যদেবতা তার সম্মোহন বাণ ছাড়েন, স্থলে জলে বনানীতে মাদকতা তাকে মাতাল করে তোলে। চেয়ে চেয়ে দেখে সে—কত ধ্যান কত ধৈর্য্য দিয়ে সৃষ্টি ঐ হলুদবরণ সোনার শীষগুলো, ঐ শিশু বনস্পতিরা, তারাও ত তারই সৃষ্টি—তারা ডাকছে, হাতছানি দিচ্চে, বলছে—তোমায় আমরা কত দিয়েছি, কত পেয়েছো আমাদের কাছে, তুমি ত আমাদের, আমাদের ফেলে যেয়ো না—

তবু পাঁচজনের কথায় আর কাদুর কান্নায় যাবার দিন স্থির হয়ে যায়, নবান্নের পর পূর্ণিমার কোটালে তারা এ স্থান ছাড়বে। এখান থেকে কাকদ্বীপ, কাকদ্বীপ থেকে শ্রীপুর—যে পথে তারা এসেছিল কবছর আগে, সেই পথ দিয়েই তারা ফিরবে স্রোতের উজান বেয়ে।

শ্রীমন্ত আসে, নানা উপদেশ দেয়—হারু ভাই তোকে ছেড়ে থাকবো কেমনে—

সোনাদিদি বলে—গঙ্গাজল, দেশে গিয়ে ভুলে যাবি ত এই হতভাগী দিদিকে?

কাদু উত্তর দেয়—কি যে বলো দিদি—তার পর হাত চেপে বলে—তুমিও চল না ভাই গঙ্গাজল, তুমি কাছে থাকলে ভয় করে না—

—না ভাই, কোথাও যাবার জো নেই আমার, আমার বৈরিগী মরেছে এই জঙ্গলে, এই মাটিতেই আছেন আমার রাধারমণ, কেটে যাবে হেসে কেঁদে বাকী কটা দিন, তবে তোর কোলের ছেলে মানুষ করবার বড় সাধ ছিল, তা আর হলো না, কত আশাই ত মানুষের এমনি করে মরে। ঝরঝর করে কাঁদে সোনাদিদি—

হারু মাঝে মাঝে বিমনা হয়—যাবে না, তাকে যেন পিছু থেকে কে ডাকছে। ছেড়ে যেতে তার বুকের পাঁজরা ভেঙে যাচ্ছে—এতো শুধু মাটিতে ভরা ক'বিঘে জমি নয়—এ যে মা, অন্নপূর্ণা, বুকের রক্ত দিয়ে কলজে দিয়ে তৈরী, এও তার সৃষ্টি, কাদুর পেটে যেটা এসেছে সেটার চেয়ে কিসে কম? কাদু যায় যাক্···

বুকটা চড় চড় করে ওঠে কিসের একটা জ্বালায়; কিন্তু কাদুর মুখের দিকে চাইলেই চুপ হয়ে যায় হারু। কাদুর শুকনো মন-মরা চেহারাটা পর্য্যন্ত বদলে গেছে—দূরে থেকে দেখায় যেন সাক্ষাৎ গণেশ জননী।

আবাদে তাদের শেষ রাত্রি নেমে এলো—ঘন কালো রাত্রি, আকুতিতে-ভরা, বেদনায় মুহ্যমান। অরণ্যদেবতা সুযোগ বুঝে শেষ পাশুপতাস্ত্র ছাড়লেন। অনুভূতিময় হয়ে বিঁধলো গিয়ে একজোড়া মানুষের বুকে। ছট্‌ফট্ করে উঠে পড়লো নিদ্রাহীন হারু, দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে আঁতকে উঠলো কাদু।

তিমির নিবিড় রাতে নিরালা অন্ধকারের নীচে আলোহারা হারু চুপি চুপি এসে দাঁড়ালো হেঁট মুখে ছোট্ট একটা পুঁটলী নিয়ে। চতুর্দ্দিক থেকে তাকে ডাকছে—আরণ্যক্ ছায়া দল—আমাদের ছেড়ে যেয়ো না, গাছের মাথা থেকে ডাকছে, জঙ্গলের ধার থেকে ডাকছে, নদীর কিনারা থেকে ডাকছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো সে গোয়ালের দিকে।

তার অতি প্রিয় গরু দুটোর গায়ে হাত বুলিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালো—তাকে ইসারা করছে ছোট্ট মরাইটা—কেন আমাকে লক্ষ্মীছাড়া করলে ? আজই সকালে যাবার উপলক্ষে সব বিক্রী করে দিয়েছে সে দালালকে। লম্বা সুপুরীগাছ দুটোর দিকে সে তাকিয়ে রইল। কাদু খুব পান দোক্তার ভক্ত, যেদিন তারা এসেছিল সেদিনের স্মারক হিসেবে নিজেদের নাম দিয়ে জোড়া সুপুরী গাছ পুঁতেছিল সখ করে তারা। জড়িয়ে ধরে হারু গাছ দুটোকে। কাদুর কবোষ্ণ স্পর্শ যেন সে পায়, যেন কার এলোচুলের দুএকটা স্তবক মুখে এসে পড়ে। কাদু নাকি! চমকে ওঠে সে, চেখে মুখে গায়ের উপর পড়েছে কাদুর প্রিয় পান গাছটা, সুপুরি গাছের সঙ্গে লতিয়ে।

কুঁড়ের দিকে ফিরে চাইলে না সে—কি জানি কাদু যদি জেগে উঠে পড়ে! কাদু যদি ডাকে! সুখী হোক্ কাদু, বেঁচে থাক্ তার পেটের ছেলে, তার কাজ ফুরিয়েছে, সে এখন গৌণ। বেদনার শতদংশনের মাঝেও কোথায় যেন মুক্তির একটু হাওয়া বর্ষণক্লান্ত রিক্ত রাতকে দাক্ষিণ্যে মধুর করে তুলেছে।

আস্তে আস্তে কুড়ুলটা হাতে নিয়ে টলতে টলতে মিলিয়ে গেল সে অরণ্যের কোলে, কাদু ছাড়াও আরো যারা তাকে ভালবাসে তারা ডাকছে, নিশির ডাক্ সে শুনেছে।

হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে তাকে কালো পর্দায় ঢেকে দিলেন অরণ্যদেবতা। কেঁদে উঠলো যেন দূরে কেউ।

আধো আঁধারী সকাল বেলায় নদীর ধারে ডিঙির উপর মাল তুলছিল শ্রীমন্ত, চতুর্দ্দশীর চাঁদ সবে ভোরের কোলে ঢলে পড়েছে, এমন সময় কাদু এসে কেঁদে আছাড় খেয়ে পড়লো বাণবিদ্ধা হরিণীর মত ছটফট করতে করতে।

—হারু, হারু—চেঁচায় শ্রীমন্ত।

সোনাদিদি দৌড়ে এসে মাথায় আঁচলা আঁচলা জল দেয়, পরণের শাড়ীটা রক্তাক্ত।

দূরে কার যেন এক টুকরো হিংস্র হাসি ঝড়ো হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে—হা, হা।

বড় গাঙের জল ছল ছল করে সায় দেয়।

চৈতন্য-যুগের প্রভাব

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম-এ, পিএচ্-ডি

ভারতে যে সকল জাতির বাস তন্মধ্যে বাঙালী জাতির এমন কতকগুলি চরিত্রগত ও আচারগত বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা একান্তরূপে তাহার নিজস্ব। এই জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ধর্মে-কর্মে, সাহিত্যে-শিল্পে, আচারে-আধ্যাত্মিকতায় সে নিজের অনুকূল কতকগুলি বিশিষ্ট মতবাদ ও একটী বিশেষ জীবন-দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল ভাবধারার পুংখানুপুংখ অন্বেষণ করিলে তাহাদের মধ্যে ভারতীয়ত্বের পরিচয় মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু তাহা অতিক্রম করিয়া যাহা সে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতেই তাহার বাঙালিত্ব। এমনটী যে হইয়াছে তাহার কারণ হয় তো বাঙালী-দেহ বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণে গঠিত। আর্যের চিন্তাশীলতার সহিত অনার্যের শিল্প-চাতুর্য ও অধ্যবসায় এক অপূর্ব রসায়নে মিলিত হইয়া বাঙালী জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্র বৈষ্ণব দ্বৈতবাদের সহিত হাত মিলাইয়াছে। বাঙালী একই সঙ্গে বৈদান্তী, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক কবি, শিল্পী ও জ্ঞানী।

জাতির এই বৈশিষ্ট্য যে যুগে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, সেইটীই উহার স্বর্ণ যুগ। যেমন ইংলণ্ডে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিটিশ জাতির কাব্য-নাটক, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বীর্য-গরিমায় শ্রেষ্ঠত্বের শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিল, যেমন ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে হিন্দুত্বের চরম উন্নতি দেখা দিয়াছিল, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালে বঙ্গদেশ নানা বিষয়ে ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

চৈতন্যের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দেওয়াতে দেশে শান্তি ছিল না। সামাজিক অবনতির ফলে জাতি-গত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। সহজিয়া পন্থীদের আচার-ব্যবহার, পঞ্চ-মকার সাধকদের বীভৎস ধর্মানুষ্ঠান প্রণালী এবং শাসন-প্রণালীর উৎপীড়নের ফলে অনেক হিন্দুর মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা দেখা দিয়াছিল।

এই দারুণ বিপদ হইতে দেশের পরিত্রাণের জন্য এই সময়ে একজন মহাপুরুষের আবশ্যক হইল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্য জন্ম-গ্রহণ করিয়া দেশের সংস্কার সাধন করিলেন। তাঁহার পিতার নাম

জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচী দেবী। পিতা-মাতা সন্তানের সুশিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চৈতন্য অল্প দিনের মধ্যেই সর্বশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। নবদ্বীপ সে সময়ে ন্যায়-শাস্ত্র আলোচনার কেন্দ্র ছিল। সে সময় নবদ্বীপে নানা দেশ হইতে বহু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শুভাগমন হইত। এইরূপ অনেক দিগ্বিজয়ীর গর্ব খর্ব করিয়া, শ্রীচৈতন্য গয়ায় ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে ও সংকীর্তনে মাতিয়া যান। নবদ্বীপে তাঁহার ভক্ত-সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ ও হরিদাস। পরে ২৪ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্য কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারত পর্যটনে বাহির হইলেন।

প্রথমে তিনি নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরের পথে পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে ক্রমে দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ভ্রমণ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন যাইবার পথে রূপ-সনাতনকে সংসার ত্যাগের উপদেশ দেন। এই যাত্রায় তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহার ভক্তি-ধর্ম প্রচার করেন। জীবনের শেষ ১৮ বৎসর কাল ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল অবস্থায় নিরত নাম-কীর্তন করিয়া তিনি নীলাচলেই অতিবাহিত করেন। সেইখানেই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব হয়।

নবদ্বীপে, পুরীতে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে যে সব প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরবর্তী যুগে শিষ্যানুশিষ্যের দ্বারা চৈতন্য-যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এই ভক্ত সম্প্রদায়ের অনেকে শুধু ভক্তই ছিলেন এমন নহে, তাহাদের মধ্যে কেহ বিশিষ্ট দার্শনিক তর্কের দ্বারা, কেহ বা কাব্য-রচনাদ্বারা বৈষ্ণব-ধর্মকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেরই মূল প্রেরণা চৈতন্যদেব হইতে প্রাপ্ত। ধর্মের দিক দিয়া বলিতে গেলে, যে আধ্যাত্মিক সাম্য চৈতন্যদেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা দেশের মধ্যে ভক্ত-সম্প্রদায় দ্বারা এরূপভাবে প্রচারিত হইল—যাহাতে সামাজিক বিশৃংখলা দূর হইল, উচ্চ-নীচতার পার্থক্য লোপ পাইল এবং ধর্মান্তর গ্রহণের সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। দার্শনিক উচ্চচিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতনত্বের সৃষ্টি না হইলেও, রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী প্রমুখ মনীষিগণ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করিয়া যে মতবাদ গড়িয়া তুলিলেন, তাহা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক বিপ্লব উপস্থিত হইল বাংলা সাহিত্যে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার প্রায় সকল কবিই বৈষ্ণব ছিলেন। জয়দেবের সময় হইতে যে গীতি কাব্যের ধারা বহিয়া আসিতেছিল, চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এমন কি, মৈথিল ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে একটা নূতন কবি-ভাষা (ব্রজ বুলি) গড়িয়া উঠিল। পরবর্তী প্রায় দুইশত বৎসর কাল এই ব্রজ বুলিতেই রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক কাব্য রচিত হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবাচার্যগণ এক নূতন ধরণের কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া কবিতায় তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সকল জীবনী-কাব্যের ভাষা তেমন কবিত্ব-মণ্ডিত না হইলেও, ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ও দার্শনিক চিন্তাপুষ্ট হওয়ায়, ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। উদাহরণ চৈতন্যচরিতামৃত।

সঙ্গীত জগতেও বৈষ্ণবগণ নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। কীর্তন-গানের দ্বারা যে শ্রীচৈতন্য সমগ্র দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই শ্রেণীর গানের আবেগময় সুর-সংযোগ এবং বহু কণ্ঠের সম্মিলিত ঐকতান। এই জন্যই শত শত বৎসর ধরিয়া কীর্তন-গান বাংলাদেশের জনমনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

একটা অসাধারণ ভাব-বিহ্বলতা ও চিন্তার ঐশ্বর্য—ইহাই চৈতন্য-যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কেবল চৈতন্য-যুগের কেন, সকল যুগের জাতিপুঞ্জের মধ্যে বাঙালী যে বিশিষ্টতার আসন লাভ করিয়াছে, তাহার কারণও ইহাই। তবে, চৈতন্যদেবের প্রভাবে পড়িয়া বাঙালীর ভাবুকতা একটু বেশী মাত্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

একথাও সত্য যে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত অতি দীনতার আদর্শ ও ভিক্ষার দ্বারা জীবিকার্জনের অভ্যাসের ফলে একটা কর্ম-বিমুখতা ও ক্লৈব্য এক শ্রেণীর বাঙালীকে আশ্রয় করিয়াছিল। ভাব লইয়া মাতামাতিও অনেক সময় সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তথাপি শ্রীচৈতন্য একটা জাতির জীবনে যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা জাতিটাই যে শুধু রক্ষা পাইয়াছিল তাহা নহে, বাঙালীর আত্মপ্রকাশের সমস্ত পথ তাহার সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছিল। আজ পাঁচ শতাব্দী পরে আমাদের জীবনে খাঁটী চৈতন্য যুগীয় ভাবধারার হয় তো কিছু অবশিষ্ট নাই—বিদেশীয় প্রভাবে আমাদের অন্তর-বাহিরের আমূল পরিবর্তন হইয়াছে—সেদিনকার আকাশ বাতাস যে ভাবের স্পর্শে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাঙালী আজও তাহা পিপাসার্তের মত পান করে বৈষ্ণব কাব্যে, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভিতর দিয়া। পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থায় সে যুগের আদর্শকে মানিয়া লইতে না পারিলেও, ধর্মে, দর্শনে, কাব্যে, গানে, সে যুগ যাহা আমাদিগকে দান করিয়াছে, আমরা তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব।

গান ও স্বরলিপি

মনে যে-আশা ল'য়ে এসেছি হল না হল না হে—
ওই মুখ-পানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আঁখিজল,
বেদনা রহিল মনে মনে।
তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে,
আমি কেন কেঁদে ফিরি।
কেন আনি কম্পিত হৃদয়খানি,
কেন যাও দূরে না দেখে॥

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি ॥ ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

[পর্সা -নর্সা ধা পা   হ্মপা -গা]
II সন্সা -া রা গা | গাঃ -মঃ -রা -া | -া -া ন্সা -রা | -গা -া রসাঃ -ন্ঃ I ধ্ন্া -ধ্া -রা -া |
ম° ° নে যে আ ° ° • • • শা • • ° লয়ে • এ° • ° •

॥
-া
| -া ন্া সরা -সন্া | -সা -া -া -া | -া -া -া সা I সা -গরা গা -া | -া -মগা -রা গা |
• সে ছি • ° • • • • ° ° ° হ লো • • না ° • • • • হ

| গা -পা পা -হ্মা | পাঃ -হ্মাঃ -ধপা -হ্মপা I -গাঃ -মঃ -রা গা | গা -পা পা পা | হ্মপা -ধা পা -া
লো • না • হে • ° • • • • ° ও ই • মু খ পা• • নে •

| স্মাঃ -পঃ গা -া I রা গা রগা -মা | মগা রগা রসা ন্‌সরা |
চে ॰ য়ে • ফি রি নু • লু॰ কা তে আঁ॰॰

| সন্‌া ধ্‌ন্‌া -ধ্‌ন্‌সাঃ -ন্‌ঃ | -ধ্‌ন্‌া -ধ্‌ম্ম্‌া ধ্‌া প্‌া I -া -া সা সা | ন্‌সা -রা -া -া |
খি জ॰ ॰॰॰ ॰ ॰॰ ॰॰ • ল • ॰ বে দ না॰ ॰ ॰ ॰

| রগা -সা রা রগা | -া -া গরা -গা I গম্মা -া -া -া | -া -া ম্মগা -ম্মা |
র॰ • হি ল • ॰ ম • নে ॰ • ॰ ॰ • ম ॰

[ ]
| ম্মপা -া -া -া | -া -া পম্মা -পা II
নে • • • • • "ম" ॰

II { গা -া পা -া | পনা ধা -া -া | ধর্সা -া র্সা -না | র্রা -র্সা -া না I নধা -া না -া |
তু • মি • কে ন • • হে ॰ সে • চা • • ও হে • সে •

| নর্রা -র্সা -া না | ধনাঃ -ধঃ- ম্মধা -পম্মা | -ম্মগা -া -া -া } I গা -া গনা -া | ধা পা -া -ম্মা |
যা • • ও হে • ॰॰ •• • • • ॰ আ • মি ॰ কে ন • •

| ম্মগা -া মা -গা | রগা -মা গা -া I রগা -া রা -া | সা -া ন্‌া -া | ধ্‌সা -া ন্‌া -া |
কেঁ • দে • ফি • রি • কে • ন ॰ আ ॰ নি • ক • ম্পি •

| নধ্‌া -া ধ্‌রা -া I সা -া ন্‌া -ধ্‌া | ধ্‌ন্‌া -া -ধ্‌া -া | ম্মধ্‌া -প্‌া -া -া | -া -া -া -া I
ত • হৃ • দ • য় ॰ খা • • • নি • • • • • • • •

I গা -া পা -া | পর্সা -া -া না | নর্রা -া র্সা -া | -া -া -া -না I ধপা -া -া -ম্মা |
কে • ন • যা • • ও দূ • রে • ॰ • • • না • • •

| গমা -া গা -া | -া -া -া -মা | -রা -া -া -া II II
দে • খে • • • • ॰ • ॰ • •

রবীন্দ্র-সংগীত স্বরলিপি

রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার জন্ত ঔৎসুক্য দেশে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বর্তমান অবস্থায় তদনুপাতিক সত্বরতার সহিত স্বর-লিপি-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলিয়া, বিশ্বভারতী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-সংগীত-স্বরলিপি প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক নিযুক্ত স্বরলিপি-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এই স্বরলিপিগুলি প্রকাশিত হইবে। ভারতবর্ষ পত্রিকায়ও ভবিষ্যতে এইরূপ স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক, ভারতবর্ষ

বেসিক এডুকেশন কনফারেন্স, বিক্রম

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় বি-এল, বি-টি

পাটনা জেলার অন্তর্গত বিক্রম নামক পল্লীতে নিখিল ভারত বেসিক এডুকেশন কনফারেন্সের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন গত এপ্রিল মাসে হয়েছিল। বিহারের শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সেই কনফারেন্সে যোগদানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কনফারেন্সে যোগদান করে বেসিক এডুকেশন সম্বন্ধে আমার মনে যে উচ্চ ধারণা ছিল তা বদ্ধমূল হল।

কনফারেন্সে বিভিন্ন প্রদেশের এবং দেশীয় রাজ্যের শিক্ষাবিদরা এসেছিলেন। তাঁদের কেউ শিক্ষামন্ত্রী, কেউ ভাইসচ্যান্সেলার, কেউ অপর কোনো সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার পর্য্যায়ভুক্ত। সেই হিসেবে কনফারেন্সকে সরকারী শিক্ষাবিদদের কনফারেন্স বলা যেতে পারে। বিহারের বেসিক এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীরামশরণ উপাধ্যায় কনফারেন্সে যোগদানকারী যে সব ব্যক্তির নাম বলে গেলেন তাঁদের অধিকাংশই ভারত বা প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাবিভাগের সহিত কোনো না কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট। যাঁরা তা নন, তাঁরা উপস্থিত থাকলেও তাঁদের নাম করা হল না। এ থেকে আমি এই বলতে চাচ্ছি যে, কনফারেন্সে শিক্ষা সম্বন্ধে যে নীতি ঘোষিত বা নির্ধারিত হল তাই সরকারী নীতি হওয়া উচিত। কারণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক যদি কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত বা গৃহীত হয় তাহলে তা সরকারের বিবেচনাধীনে চলে যায়। কিন্তু সরকার কর্তৃক যা আলোচিত হয় এবং গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় তা আর কারো বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। বর্ত্তমানে কংগ্রেস দেশশাসন করছেন এবং কংগ্রেস নিজেকে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মনে করেন। প্রয়োজন হলে সাধারণের মতামতের অপেক্ষা না রেখেই সরকারী নীতি নির্ধারিত হয়। জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে শিক্ষা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় জিনিষ। অতএব সরকারের শিক্ষানীতি সর্বপ্রথম নির্ধারিত এবং কার্যকরী করা উচিত।

কনফারেন্সে যোগদান করে আমি যা বুঝলাম তাতে আমার মনে হল বেসিক এডুকেশন এক্সপেরিমেন্টেল ষ্টেজ অতিক্রম করেছে। এখন একে ব্যাপকভাবে কার্যে প্রয়োগের দিন সমাগত এবং এর সংগে সামঞ্জস্য রেখে কলেজ শিক্ষার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণের দিন সমাগত।

হিন্দীতে বেসিক এডুকেশনের অনুবাদ আধার শিক্ষা করা হয়েছে। অনুবাদটি চমৎকার হয়েছে। কারণ আধার শিক্ষা কথাটির মধ্যে আধার শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা সংক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কোনো এক বিশেষ শিল্পের আধারে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়কে স্থাপন করে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির শিক্ষা দেওয়াই হল আধার শিক্ষার বিশেষত্ব। সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এক বিশেষ শিল্পকে ভিত্তি করে অংক, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আধার শিক্ষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। কি করে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে এক বিশেষ শিল্পের সংগে তথা পরস্পরের সংগে সংযোজিত করা যেতে পারে, তা শিক্ষকদের বুঝবার ব্যাপার। বিশেষ শিল্প ছাড়া আর কি কি বিষয় শিক্ষা দিলে ছাত্রদের ভালো নাগরিক করা যেতে পারবে, তা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের বুঝবার কথা। কি কি শিল্পকে আধার করা যাবে তা মুখ্যত সরকারের বিবেচনার বিষয়। একটা বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করে অপর সব শিক্ষণীয় বিষয় শিখানো যেতে পারে কিনা তা শিশু মনস্তাত্ত্বিকদের জানবার কথা।

অপরাপর সমস্ত ব্যাপারের ন্যায় শিক্ষা ব্যাপারেরও দুটী দিক আছে —শিক্ষাবিষয়ক মতবাদ, আর তার প্রয়োগ। প্রয়োগ যদি সার্থক হয় তবে মতবাদও ঠিক। একটা বিশেষ শিল্পকে ভিত্তি করে অপর সব শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, এটা হল আধার শিক্ষার মতবাদগুলির একটি। আধার শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই মতবাদকে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং প্রয়োগ করে দেখা গেছে এই মতবাদ নির্ভুল। তার প্রমাণ পাওয়া গেল বিক্রমে আধার শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের তৈরী বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনীতে এবং ছাত্রদের প্রাপ্ত প্রমাণ পত্রে। ছেলেরা নিজে হাতে তুলো ধুনেছে, সুতো কেটেছে, কাপড় বুনেছে; কাঠ ও লোহা থেকে নানা দ্রব্য তৈরী করেছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের যে প্রমাণ পত্র দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানতে পারা গেল তারা সব শিক্ষণীয় বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং যে শিল্প শিক্ষা করেছে তাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে জীবিকা অর্জ্জন করতে তারা সক্ষম হবে। তাদের প্রমাণ পত্র থেকে এটা বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, এক বিশেষ শিল্পকে ভিত্তি করে সেই বিশেষ শিল্পের সংগে এবং অপরাপর শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে পরস্পরের সংগে সম্বন্ধ স্থাপন করে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে; তা মনস্তত্ত্বসম্মত এবং শিক্ষার্থীর সৃজনীশক্তির পরিপুষ্টির সহায়ক।

ছেলেমেয়েদের আমরা যা শিখাই, তা যদি তারা আনন্দের সংগে শিক্ষা করে এবং সংগে সংগে এক বিশেষ শিল্পে পারদর্শী হয়ে ওঠে তাতে জনসাধারণের বলবার কিছুই থাকতে পারে না। বিক্রমে যে আধার শিক্ষার সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয়ে গেল তা থেকে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আধার শিক্ষার মূল মতবাদের কার্যকারিতা প্রমাণিত হল।

যে সব শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই আধার শিক্ষার প্রয়োগ সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন এবং যাঁরা শ্রোতা ছিলেন তাঁদের কাছে চমৎকার ভাষায় আধার শিক্ষার উপযোগিতা বিবৃত করতে লাগলেন। আমি পূর্বেই বলেছি আধার শিক্ষার যে সম্মেলন হয়ে গেল তাকে সরকারী সম্মেলনই বলা যেতে পারে। জনসাধারণ সরকারের কাছে

শিক্ষার পরিবর্তনের যে দাবী করে, সেই দাবীই সরকারের মুখপাত্রদের নিকট শুনে বিস্মিত হলাম। জনসাধারণই যেমন আধার শিক্ষার বিরোধী এবং সরকার তার স্বপক্ষে। কিন্তু ব্যাপরটা ঠিক উল্টো। জনসাধারণই বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ওপর বিরূপ। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে চায়, যার সাহায্যে তারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু শিক্ষার নীতি নির্ধারণের তথা নূতন শিক্ষাধারা প্রবর্তনের ভার সরকারের ওপর। কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক সরকারসমূহই বরং জনসাধারণের আকাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে গাফিলতি করছেন।

বর্তমান শিক্ষাবিরোধী কি তা আমরা সবাই হাতে হাতে অনুভব করছি। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পরিমিত, উকিল খুব বেশি দরকার হয় না, কেরাণীর চাহিদাও অপরিমিত নয়। বর্তমান সংখ্যাতত্ত্বের কল্যাণে কোন্ বৃত্তির জন্য কি পরিমাণ লোকের দরকার তা জানা অসম্ভব নয়। বর্তমানে যে হারে ম্যাট্রিক, আই এ, বি-এ, এম-এ, ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র বার হচ্ছে সরকার তাদের উপযুক্ত কাজ কিছুতেই দিতে পারবেন না। অথচ বেকার সমস্যার সমাধান করা স্বাধীন ভারতের সরকারের অবশ্য কর্তব্য। বর্তমান শিক্ষার গতি এমনি রুদ্ধ না করে দিলে দেশে অকর্মণ্য শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে যাবে। সেটা বিষবৃক্ষ বলে প্রমাণিত হয়েছে; দেশের উন্নতির পথের প্রতিবন্ধক। ওটাকে সমূলে উৎপাটিত করে তার স্থানে আধার শিক্ষাকে বসানো এখনি দরকার।

তা করতে গেলে প্রশ্ন আসবে: টাকা কোথায়? উপযুক্ত শিক্ষক কৈ? কলেজী শিক্ষা সম্বন্ধে যখন এখনো কোনো নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয় নাই, তখন যতদিন না তা করা হচ্ছে ততদিন বর্তমান ধারাকে বন্ধ করে দেওয়ায় অবিবেচনার কাজ হবে না কি?

একে একে এই সব প্রশ্নের আলোচনা করা যাক। প্রথমেই আসে টাকার প্রশ্ন। কারণ অধিকাংশ পরিকল্পনা অর্থাভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা জানি টাকা আকাশ থেকে পড়ে না। কু-শিক্ষা ও অ-শিক্ষার জন্য সরকার এতাবৎকাল যে অপব্যয় করছিলেন সেই অর্থটা আধার শিক্ষার জন্য ব্যয় করুন। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারী এবং বে-সরকারী বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। সেই সব অর্থ আধার শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হোক। সমস্ত প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিকে আধার শিক্ষা বিদ্যালয়ে পরিণত করা হোক। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য রাখবার আর কোনো দরকারই নাই। সমস্ত বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করা সম্ভব বর্তমানে না হলে সকল গুলিকে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পরিণত করা হোক। তা হলে বর্তমানে শিক্ষার জন্য বে-সরকারী যে অর্থ ব্যয়িত হয় আধার শিক্ষার জন্যও তাই ব্যয়িত হবে এবং সরকারী সাহায্য পাওয়ায় বিদ্যালয়ের আর্থিক স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ততা আসবে। বর্তমান বিদ্যালয়-সমূহকে আধার-শিক্ষা বিদ্যালয়ে পরিবর্তন করতে গেলে তার জন্য সরকারকে খুব বেশি অর্থব্যয় করতে হবে না। তবে আধার শিক্ষাকে যখন অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক বা কেবল বাধ্যতামূলক করা হবে, তখন বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়াতে হবে এবং তার জন্য অধিক অর্থব্যয়ও করতে হবে। কিন্তু তা এখন সম্ভব হচ্ছে না বলে যে কুশিক্ষা এবং অশিক্ষাকেই চালু রাখতে হবে, তা হতে পারে না। যে অর্থ বর্তমানে ব্যয়িত হচ্ছে তা আধার শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হোক, কারণ আধার শিক্ষাই স্বাধীন অথচ দরিদ্র ভারতের একমাত্র উপযোগী শিক্ষা। এই শিক্ষার যারা বিরোধী, তারা আরামপ্রিয় পরশ্রমোপজীবীর শ্রেণীভুক্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সংগে সংগে কেরাণীগিরির যুগও শেষ হয়ে গেল। স্বাধীন ভারতে চাকরি নিয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে প্রতিযোগিতার শেষ হওয়া উচিত। প্রত্যেক নাগরিককে উপযুক্ত কর্মে নিয়োগের দায়িত্ব সরকারের। স্বাধীন ভারতে বেকার সমস্যা বলে কিছু থাকা চলতে পারে না। দেশে বহু ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম-এ, ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি বেকার আছে। তাদের যখন সরকার কাজ দিতে পার্ছেন না, তখন এর পরে যারা ও সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের ত দিতে পারবেনই না। অতএব সমস্ত পুরাতন ধরণের ইংরাজি বিদ্যালয়, আই-এ, বি-এ, এম-এ, ও ল কলেজসমূহ এই মুহূর্তে বন্ধ করে তার স্থানে আধার শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। আধার শিক্ষার জন্য তাহলে আরো বেশি অর্থ পাওয়া যাবে। এ সম্বন্ধে শেষের দিকে আরো আলোচনা করা যাবে।

এখন শিক্ষক সমস্যায় আসা যাক। আধার শিক্ষার এক বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে, এক বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করে অপর সব শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে। এই শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষকের দুইটি জ্ঞান দরকার,—শিল্পজ্ঞান ও সেই শিল্পকে কেন্দ্র করে অপর সব শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাদান জ্ঞান। দ্বিতীয় জ্ঞানটি অর্জন করা খুব জটিল ব্যাপার নয়। অভিজ্ঞ শিক্ষকমাত্রই সামান্য ট্রেনিং পেলে এ জ্ঞানটি অর্জন করতে পারবেন। জটিল হচ্ছে কোনো এক বিশেষ শিল্পে পারদর্শী হওয়া। এটা অভ্যাস ও সাধনা সাপেক্ষ এবং এর জন্য দীর্ঘকাল আবশ্যক। যদি একই শিক্ষককে শিল্প ও বিষয় জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হয়, তাহলে বর্তমানে যাঁরা শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁরা আধার শিক্ষার ট্রেনিং না নিলে শিক্ষকতার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা অনুপযুক্ত হলে তাঁদের স্থান পূরণ করবার মত যথেষ্টসংখ্যক আধার শিক্ষায় ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে না। অতএব আধার শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত করা সম্ভব নয়, এরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু আমি তা মনে করিনা।

কোনো বিষয়েই গোঁড়ামি ভালো নয়। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের অজুহাতে যে শিক্ষার কোনো সার্থকতাই নাই তাকে প্রচলিত রাখতে হবে, এ কথার কোনো অর্থই হয় না। শিক্ষকদের যদি বর্তমানে কাজ চালাবার জন্য দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তাহলে আধার শিক্ষাকে ব্যাপক ভাবে বর্তমানেই প্রচলন করা চলে। যাঁরা কোনো বিশেষ

শিল্পে পারদর্শী তাঁরা মাত্র শিল্পকর্ম শিখাবেন, অপর সব শিক্ষক সেই শিল্পের সংগে সম্পর্ক রেখে অপর সব বিষয় শিখাবেন। অল্পকথায়, শিল্পী শিক্ষক শিল্পশিক্ষা দিবেন, বিষয়জ্ঞানী শিক্ষক বিষয়-জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। শিল্পী শিক্ষক এবং বিষয়জ্ঞানী শিক্ষকগণ পরস্পরের সংগে পরামর্শ করে নিজনিজ পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করলে আধার শিক্ষার মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত একজন করেও শিল্পী শিক্ষক নেওয়া দরকার। কোন স্থানের বিদ্যালয়ে কি শিল্প প্রচলন করা যেতে পারে তা স্থানীয় ব্যক্তিগণের সংগে আলোচনা করে বা দেশের চাহিদা অনুযায়ী স্থির করা যেতে পারবে। শিল্পী শিক্ষক ছাড়া অপর যে সব শিক্ষক আছেন তাঁদের জন্য প্রতি জেলায় ও মহকুমায় ভোকেশন ট্রেনিং ক্লাশ খুললেই বর্তমানে কাজ চালাবার মত শিক্ষক তৈরী করতে পারা যাবে।

নাই মামার চেয়ে কাণামামা ভাল। এটা হল সাময়িক বৈকল্পিক ব্যবস্থা। যে সব বিদ্যালয় পরিপূর্ণভাবে আধার শিক্ষার নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম তাদের সে বিষয়ে পরিপূর্ণ সাহায্য করতে হবে। ইতিমধ্যে সরকার বিশেষ পরিকল্পনা তৈরী করে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করতে পারবেন। তাছাড়া যে শিল্পীশিক্ষকগণ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হবেন তাঁরাও বিষয়জ্ঞানী শিক্ষকদের শিল্পজ্ঞান লাভে সহায়তা করতে পারবেন।

তাছাড়া আরেকটা কথা ভাববার আছে। আধার শিক্ষা পল্লীর উপযোগী করে পরিকল্পিত। যদিও ভারতের অধিবাসীদের শতকরা আশীজনই পল্লীর অধিবাসী তাহলেও সহরবাসী কুড়িজনও উপেক্ষার নয়। সহরে কুড়িজনের জন্য যদি বিভিন্ন শিক্ষা প্রচলিত থাকে এবং শিক্ষা অবসানে যদি মাত্র তারাই দায়িত্বপূর্ণ সরকারী ও বে-সরকারী-পদসমূহে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায় তাহলে পল্লীবাসীদের সংগে তাদের বিভেদ রেখা কোনোদিনই দূর হবেনা। তাদের শিক্ষার মধ্যেও দৈহিক শ্রমকে আবশ্যিক করতে হবে—তাহলেই তারাও শ্রমের মর্যাদা বুঝবে। যে সব কুটীর শিল্পকে আধার শিক্ষার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেগুলা ছাড়াও সব কল ও কারখানা-সমন্বিত সহরের জন্য স্থানীয় প্রয়োজনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে কল-কব্জাকেও আধার শিক্ষার তালিকাভুক্ত করা সংগত। যদিও মহাত্মা গান্ধী বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত সরকার যখন তা অপরিহার্য বলে মনে করেন, তখন বৃহৎ শিল্পকে ও আধার-শিক্ষার বিষয়ীভূত না করার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। বিভিন্ন শিল্প অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শিল্পকে আধার শিক্ষার বিষয়ীভূত করলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাব হবেনা এবং ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিল্পীর প্রাচুর্যের জন্যে কল-কারখানারও বিশেষ উন্নতি হবে। এরজন্য সরকারকে খরচের জন্য ভাবতে হবেনা। কারণ শিল্পপতিরা এ বিষয়ে বহু পরিমাণে অর্থ সাহায্য করবেন।

বর্তমানে প্রচলিত কলেজী শিক্ষার ওপর কারো আস্থা নাই। এই শিক্ষার যাঁরা সমর্থক তাঁরা ভেবেছেন তাঁদের ছেলেপিলেরাও তাঁদের মত কলম পিশে আয়াস করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন কলেজী শিক্ষাকে আধার শিক্ষার সহযোগী এবং অনুপূরক হিসেবে পরিবর্তন করতেই হবে। আধার শিক্ষা ও উত্তর-আধারশিক্ষার সাত বছরের শিক্ষা যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবুও এমন অনেক শিল্প থাকতে পারে যার জন্য অতিরিক্ত শিক্ষা ও দক্ষতা দরকার। 'অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এ্যাডুকেশন' যা করতে চান পরিবর্তিত কলেজের দ্বারা তাই করা সম্ভব। বাস্তব জীবনের সংগে সম্পর্কশূন্য নিছক জ্ঞান চর্চার কোনো সার্থকতা নাই। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত প্রভৃতি কলেজপাঠ্য বিষয়সমূহকে আধার শিক্ষার অনুকরণে কোনো এক বিশেষ শিল্প বা শিল্পসমূহকে ভিত্তি করে শিখাতে হবে। ইংরাজির মাধ্যমে শিক্ষাদানপ্রথা প্রচলিত থাকায় আইন, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার জন্য যে অসুবিধা ভোগ করতে হত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে আর সে অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। অতএব উত্তর-আধার-শিক্ষা লাভ করে যে কেউ ইচ্ছা করলে আইন, ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারবে, এরকম ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমাদের দেশে উকিলের খুব বেশি দরকার নাই ; কিন্তু ডাক্তারের দরকার অনেক। দরিদ্র পল্লীবাসীদের অশিক্ষিত হাতুড়ে ডাক্তারের ওপর নির্ভর করে কাল কাটাতে হয়। যদি প্রতি কলেজে ডাক্তারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং তার মান যদি কিছু খাটোও হয় তাহলেও দেশ হাতুড়ে ডাক্তারদের হাত থেকে রেহাই পাবে।

কিন্তু উপরে যা বলা হল তা অগৌণে করা সম্ভব কিনা তাই বিবেচ্য। যখন বর্তমান কলেজী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কোনো উপকারই হবে না, তখন তা এইক্ষণেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

বর্তমানে যদি কলেজী শিক্ষার স্থান গ্রহণ করবার মতো অপর কোনো শিক্ষা প্রচলিত করতে না পারা যায় তাহলেও দেশের প্রয়োজন বুঝে তার সংস্কার করতেই হবে। আই-এ, বি-এ, পড়বার জন্য বার বৎসর সময় দরকার হয় ; এম, এ,র জন্য আরো দু বৎসর এবং ল'র জন্য দুই বা তিন বৎসর। শিক্ষকতার জন্য এক বৎসর। এই অতিরিক্ত সময়কে অনায়াসে এখনই কমানো যেতে পারে। আই-এ, বি-এর পাঠ্য বিষয় বা পাঠ্যবিষয়ের পরিমাণ কমিয়ে তিন বৎসরের মধ্যে আই-এ, বি-এ, পড়ানো চলবে এবং আজ ও শিক্ষকতাসম্বন্ধীয় ট্রেনিং আই, এ, বি, এ,র পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত অনায়াসে করা চলে। এসবের জন্য কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না। তারপর যতশীঘ্র সম্ভব উত্তর-আধার-শিক্ষার অনুকরণে কলেজী শিক্ষা পরিবর্তন আনতে হবে।

ভারতবর্ষ তার বহুদিনের আকাংখিত স্বাধীনতা পেয়েছে। ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণ যাতে সেই স্বাধীনতার সুখ পরিপূর্ণ ভাবে আস্বাদ করতে পারে. যাতে স্বাধীন ভারতের কোনো নাগরিককেই বেকার হয়ে থেকে দেশের ও পরিবারের বোঝাস্বরূপ হয়ে থাকতে না হয়. স্বাধীন ভারতের সরকারের সর্বপ্রথম সেই দিকেই মন দেওয়া উচিত এবং তা দিতে গেলে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অগৌণে প্রস্তাবিত পরিবর্তন আনতেই হবে। বর্তমান শিক্ষাধারার গতি অক্ষুণ্ণ রাখলে স্বাধীনতার পথে বেকার সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য এবং তার ফলে নানা অশান্তির উদ্ভব হবার সম্ভাবনা।

আয়ুর্বেদের কথা

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন

আপনারা সকলেই জানেন চিকিৎসা জগতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাই মৌলিক চিকিৎসা। বিশ্বের বিবিধ চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ুর্বেদের সমৃদ্ধ-ভাণ্ডার হইতেই সংগৃহীত হইলেও বিশ্বের দরবারে আয়ুর্বেদের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ—জগতের বিজ্ঞান সভায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সদস্যের সমাদর তো দূরের কথা—স্থানই নাই। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

দেশের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যেমন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানআয়ুর্বেদেরও অনুশীলনের অভাবে যেইরূপ উন্নতি সম্ভব হয় নাই। হিন্দু রাজত্বে আয়ুর্বেদ উন্নতির উচ্চতম সোপানে অবস্থিত ছিল। রাজ সাহায্য যখনই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ পাইয়াছেন, তখনই তাঁহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। এই সেদিনও চক্রপানি দত্ত ও শিবদাস সেন রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া আয়ুর্বেদের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বাদসাহের আমলেও দেখা যায় রাজাশ্রয় পাইয়া হেকিমির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু রাজাশ্রয় হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবনতি ঘটে। হেকিমি মৌলিক চিকিৎসাশাস্ত্র নহে, সেই জন্ম চর্চ্চার অভাবে এই চিকিৎসাশাস্ত্রের অবনতি ঘটিয়াছে।

অন্ত দেশীয় চিকিৎসার সহিত আয়ুর্বেদের তুলনাই হয় না।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান যদিও আজ নব নব আবিষ্কারের দ্বারা সভ্যজগতের মন আকৃষ্ট করিতেছে তথাপি আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণই আছে। চিকিৎসা বিষয়ে এমন কোনও প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার সূত্র আয়ুর্বেদে নাই। আয়ুর্বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মত শুধু রোগের চিকিৎসা নহে। আয়ুর্বেদের প্রধান উদ্দেশ্য রোগ আরোগ্যের মত পৃথিবীর জীবগণকে আদৌ যাহাতে রোগের আক্রমণে পতিত হইতে না হয় তাহারই উপায় বিধান করা। আয়ুই হিত এবং আয়ুই অহিত, আয়ুই সুখ এবং আয়ুই দুঃখ, অতএব হিতাহিতই আয়ুর মান, আয়ু যে গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে তাহারই নাম আয়ুর্বেদ। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু কহে। রোগ শব্দে সংক্ষেপতঃ অর্থ শরীর ও মনের বিকৃতি। এক কথায় শরীর ও মন এই দুইটীকে লইয়াই রোগের সৃষ্টি; কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় বিষয় ইহাদের মিথ্যা যোগ, অযোগ ও অতি যোগ—এই তিনটি ব্যাপার শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার ব্যাধিরই হেতু। অযোগ শব্দের অর্থ হীন যোগ, কালের হীন যোগ যথা শীতকালে সম্যক শীত না হওয়া; কালের অতি যোগ যথা শীতকালে অত্যন্ত শীত হওয়া, কালের মিথ্যাযোগ যথা শীতকালে একেবারে শীত না হওয়া। বায়ু পিত্ত ও কফের বিকৃতি বৈষম্য শারীরিক ব্যাধি উৎপন্নের কারণ। মনের দোষ সত্ত্ব রজঃ ও তম। শারীরিক দোষ—দৈব ও যুক্তির আশ্রয় দ্বারা শান্ত হয়, আর মনের দোষ—জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি দ্বারা শান্ত হয়। দৈব শব্দের অর্থ স্বস্ত্যয়নাদি। যুক্তি শব্দের অর্থ ঔষধ প্রয়োগ। আয়ুর্বেদের সূত্র এইরূপ ভাবে গ্রথিত। বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটী বিষয়ের মীমাংসা সাধন আয়ুর্বেদের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ও শারীরিক যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয় তাহার নাম বায়ু। পিত্ত শব্দে জীবশরীরের উষ্মাকে বুঝাইয়া থাকে। সাধারণতঃ শরীরের জলীয়াংশের নাম শ্লেষ্মা। বায়ু পিত্ত ও কফ সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে ও সর্ব্বশরীরে কুপিত ও অকুপিত হইয়া শুভাশুভ করিয়া থাকে। এই অশুভ ফল হইতেই রোগের সৃষ্টি হইয়া অশীতি প্রকার বাতজ ব্যাধি, চল্লিশ প্রকার পিত্তজ ব্যাধি ও বিংশতি প্রকার কফজ রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বায়ু পিত্ত ও কফের সাম্য ও বৈষম্য বিচার করিয়া দ্রব্য-সমূহের গুণ ও তাহাদের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই মনুষ্য দীর্ঘায়ু লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার বৈশিষ্ট্যই এইখানে। রোগ যাহাতে আক্রমণ না করিতে পারে—যাহাতে নীরোগ ও সুস্থদেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারা যায়—তাহার তো উপায় বিধান করিবেই—তদ্ভিন্ন রোগ হইলে রসপ্রভাব, দ্রব্যপ্রভাব, দোষ-প্রভাব ও রোগ-প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিবে ইহাই আয়ুর্বেদের উপদেশ। চিকিৎসা—চিকিৎসা, চিকিৎসা মন্ত্রশক্তি নহে। রোগ হইলে প্রথমেই উগ্রবীর্য্য ঔষধ দিয়া রোগের সাময়িক উপশম করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে নূতন রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই আয়ুর্বেদ বলেন,—যে প্রয়োগ একটী ব্যাধিকে শান্ত করে পরন্ত অন্য একটী ব্যাধিকে উৎপন্ন করে সে প্রয়োগ শুদ্ধ বা প্রশংসনীয় নহে, পরন্ত যাহা অন্য কোন রোগ বৃদ্ধি করে না তাহাই শুদ্ধপ্রয়োগ। আয়ুর্বেদ কত সাবধানতার সহিত ব্যাধি শান্তির কথা বলিয়াছেন যে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মানুষের প্রয়োজন আয়ু। মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত আয়ুর্বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য আয়ুর্বেদ তিনটী এষণার বিচার করিয়াছেন—প্রাণৈষণা অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবৃত্তি ও ধনৈষণা অর্থাৎ ধনোপার্জ্জন এবং পরলোকৈষণা ইহাতে পরলোক ধর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে। সেইজন্ম আয়ুর্বেদ কেবল চিকিৎসা গ্রন্থ নহে। শ্রুতি ঠিকই বলিয়াছেন, ইহকালের ও পরকালের যাহা কিছু কল্যাণ তাহা এই আয়ুর্বেদের মধ্যেই নিহিত আছে। তাই চরকসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণের কথা।

এক্ষণে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে দু' একটী প্রসঙ্গের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আপনারা হয় তো জানেন, ভারত সরকার ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সময় গঠিত হইয়াছিল—সেইজন্য এই কমিটিতে পাকিস্থানী ৩ জন সদস্য

ছিলেন, ইহারা ভারত বিভাগ হওয়ার পর কিরূপে থাকেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহা ভিন্ন এই কমিটিতে একজনও প্রাচীনপন্থী আয়ুর্বেদসেবীর স্থান হয় নাই। এই কমিটির দ্বারা আয়ুর্বেদের কার্য্য কতটা হইবে, তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়। কারণ কমিটির সদস্যগণের মনোভাব হইতেছে একটীমাত্র চিকিৎসার প্রচলন করা এবং সে চিকিৎসা এ্যালোপ্যাথিক। আয়ুর্ব্বেদ বা অন্য যে সব চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত আছে সেই সব চিকিৎসার যে সব ভাল ঔষধ তাহা এ্যালোপ্যাথিকের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া। প্রত্যেক স্বাধীন দেশই নিজ নিজ চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতির জন্য যথেষ্টপরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশ স্বাধীনতালাভ করার পরও যদি আয়ুর্ব্বেদের বিলোপ সাধন করার আয়োজন করা হয় তাহা হইলে তাহাপেক্ষা লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে? যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত অনুরাগী, দেশের সত্যিকারের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য ভারতসরকারের এই অপচেষ্টা হইতে আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা করা। এই সম্বন্ধে আমি মহাত্মা গান্ধীর কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, তিনি বলিয়াছিলেন "আয়ুর্ব্বেদের গৌরবের যে সামান্য অংশ আজিও অবশিষ্ট আছে, তাহা যেন এ্যালোপ্যাথি বা অন্য কোন চিকিৎসা পদ্ধতির সংমিশ্রণে নষ্ট হইয়া না যায়।" পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন চিরদিনই সকল শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদের যে পরিবর্দ্ধনাদির প্রয়োজন আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভারত সরকার যদি আয়ুর্ব্বেদের সহায় হন তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রবি উদিত হইতে কয়দিন লাগে? আয়ুর্ব্বেদের বহু বিষয় অনুশীলনের অভাবে আজ লুপ্তপ্রায়। আয়ুর্ব্বেদের শস্ত্র-চিকিৎসা ও প্রসূতি চিকিৎসা এক সময়ে বিশেষ সমুন্নত ছিল। আপনারা জানেন যে, যুদ্ধযাত্রায় শিবির সন্নিবেশকালে রাজার শিবিরের পরেই বৈদ্য যন্ত্রশস্ত্রাদি উপকরণ লইয়া প্রস্তুত থাকিতেন। আজ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক-দিগের শস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানের যে অভাব হইয়াছে—রাজ সাহায্য পাইলে তাহা আবার পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে বসরকারের তরফ হইতে প্রকৃত সহানুভূতি ও সাহায্য চাই।

বঙ্গীয় সরকার প্রত্যেক তিন মাইল অন্তর যে স্বাস্থ্য ইউনিটের সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতালের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের স্থান নাই। বঙ্গীয় সরকার যে বাজেট পাশ করিলেন তাহাতেও আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালগুলির জন্য এক কপর্দ্দক সাহায্য করা প্রয়োজন মনে করিলেন না। ইহাপেক্ষাও আশ্চর্য্যের কথা—বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক (ইংরাজ আমলে) আয়ুর্ব্বেদ ষ্টেট ফ্যাকাল্টী গঠিত হইলেও আয়ুর্ব্বেদীয় রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণের সার্টিফিকেট ছুটী ইত্যাদি ব্যাপারে গণ্য হইবে না বলিয়া স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় সার্কুলার জারি করিয়াছেন। বিদেশী সরকার পর্য্যন্ত এইরূপ সার্কুলার জারী করিতে সাহসী হন নাই, অথচ অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে স্বাধীন সরকার স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব লুপ্ত করিবার জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী যেন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহার প্রতিকারকল্পে আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে সচেষ্ট না হই তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব শুধু যে নষ্ট হইবে তাহা নহে, ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য লুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই সকলের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, সকলে আয়ুর্ব্বেদ সেবীদিগের সহায় হউন—সাধারণের ন্যায্য দাবী কোন সরকারই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন আয়ুর্ব্বেদ ধ্বংসের জন্য অপচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাহারও তীব্র প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসান আয়ুর্ব্বেদের কলেজ সমূহকে অচিরে বন্ধ করিয়া দিয়া আয়ুর্ব্বেদের পঠন-পাঠন যাহাতে চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায় তাহার জন্য ভারত সরকারকে পরামর্শ দিয়া কতকগুলি মেমোরেণ্ডাম দিয়াছেন এবং তাঁহাদের মুখপত্রে (Journal of the Indian medical Association) প্রতিমাসেই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। Indian medical Association এর এই অপচেষ্টার সমুচিত শিক্ষা কি সকলে দিতে পারেন না? নানা দিক দিয়া আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রতীক্ষা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

কালো-অঙ্গের স্মরণ সুরভি-কাজল নয়নে মাখি
বিরহ-পয়োধি-পর-পারে তব মিলন আশায় থাকি।
বাঁশরী লইয়া হাতে, দেখা দিল কোন্ রাতে
আশায় বসিয়া যামিনী জাগিয়া রাঙা হয় মোর আঁখি।
এমনি করিয়া পথ নিরখিয়া কত রাতি হয় ভোর।
সুখ-সুধা মোর আঁধারে বসিয়া চুরি করে কোন্ চোর?
পূর্ব অরুণাভাসে, ভাবি বুঝি প্রিয় আসে।
সে আশার ঊষা কোথা যায় ভেসে চির-নিরাশায় থাকি।
ভাবি বুঝি কোন্ খেলায় মাতিয়া এলে না দিনের বেলা,
পাব গোধূলিতে ফিরিবে যখন সাঙ্গ করিয়া খেলা।
মিলায় তপন রেখা, মিলে না ত তব দেখা!
কত যে গোধূলি বিদায় লভিল পথের ধূলিকা মাখি
তব দরশন-কাতর আমারে রাতের তিমিরে রাখি।
এস চন্দ্রমা, লভিতে উদয় জীবন-অন্ধকারে
পদ-পথ ধূলি ধোয়াইয়া দিব আমার নয়নাসারে
তমসা করিয়া লয়, এস এস সুধাময়!
কবি-কণ্ঠের নীরব-কাননে আবার গাহক পাখী
নব-জলধর-স্নিগ্ধ-মুরতি নয়নের আগে রাখি।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

Washington ষ্টেশনে একজন লালটুপী পরা লোক—যাদের Red-cap-helper বলা হয়, গাড়ী থেকে আমাদের মাল নামিয়ে দু'চাকার একটি ঠেলা গাড়ীতে তুলে নিয়ে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা বাইরে বেরিয়ে দেখি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের কাছে লোকটি দাঁড়িয়ে আমাদের জন্ম অপেক্ষা করছে। Mayflower Hotelএ ২০ তলায় একটি ঘর পাওয়া গেল। State Dept. এর সাহায্যে এখানেও ঘর আগে থেকে রিজার্ভ করা ছিল।

২৭শে মে। ভোরে ঘুম ভেঙ্গেই দেখি নুতন জায়গায় রয়েছি। নুতন সহর দেখার উৎসাহে ও আনন্দে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। সামনেই Capital প্রাসাদ—বিরাট গম্বুজওলা চূড়ো—রাজধানীর বুকে মাথা তুলে দাড়িয়ে রয়েছে। দু'ধারের দু'টী বড় হ'লে সিনেটের অধিবেশন ও হাউস অফ্ রিপ্রেজেণ্টেটিভের অধিবেশন বসে থাকে। কংগ্রেসের সভা সমিতির আসর এই প্রাসাদ কক্ষেই হয়। আমরা Cab এ করে সহর ঘুরতে বেরিয়েছি। পথে U. S. Supreme Court দেখলাম। বাড়ীগুলি আগাগোড়া সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে গেঁথে তৈরী করা, ধবধবে সাদা রঙের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়ে এত চক্চক্ করছে যে, ভালো করে তাকান যায় না। এখানকার State Dept, অফিস থেকে আমাদের সকল খবর পূর্ব্বেই পেয়েছিলেন।

আজ দুপুরে সেখানেই আমাদের ল্যঞ্চের নিমন্ত্রণ। সেখানে যথা-সময়ে উপস্থিত হলাম। স্থানীয় কয়েকজন ডাক্তারও সেখানে

ওয়াশিংটনের রাজপথে

লিঙ্কন স্মৃতি সৌধ (ওয়াশিংটন)

নিউইয়র্কের নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। আমরা মোট ১২ জন টেবিলে বসেছি। সুপ্ খাওয়া হ'লে একটি মাছের ডিশ এল—সবুজ মোটা কাঁচা
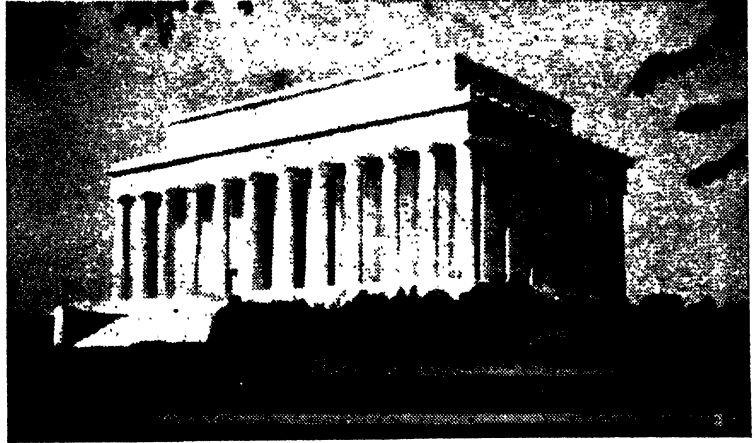
লঙ্কার ভিতরে মাছের পুর দিয়ে ভেজে রকমারি সিদ্ধ সবজি দিয়ে ডিশটি সাজানো। ডিশটি যেমন সুস্বাদু তেমনই উপাদেয়—ঝালের নামও নেই, অথচ কাঁচা লঙ্কার সৌগন্ধে ভরা। শেষে এক গ্লাস বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা চা খেয়ে উঠলাম। এদেশে গরম চায়ের চেয়ে এই রকম ঠাণ্ডা চা'ই লোকে বেশী পছন্দ করে। আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগলো না। খাবার পর ডাক্তারদের সাথে উনি হাসপাতালে গেলেন। আমি, খুকু ও ষ্টেট্‌ডিপার্টমেণ্টের মহিলা অফিসারটি কিছুক্ষণ গল্প কোরে একটু বেড়িয়ে হোটেলে ফিরলাম। Washington সহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজানো ও গোছানো। রাস্তার দুধারে খুব চওড়া ফুটপাথ। বাড়ীগুলি সবুজ মাঠে ঘেরা। Newyork এর মত এখানে ঘেঁসাঘেঁসি Skyscraper এর সারি নেই। এখানে লোকও কম, মাত্র ১০ লক্ষ লোকের বাস। পরদিন ২৮শে মে। এখানকার বিখ্যাত Cancer Institute দেখতে উনি সকালেই বেরিয়ে গেলেন। বেলায় ঘুম থেকে উঠে আমি ও খুকু একটু হাঁটতে বেরিয়েছি। প্রথমে রাস্তার মোড়ে White Hall নামে একটা Cafeতে গিয়ে টাটকা ফলের রস ও দুধ এক গেলাস খেলাম। তার পর বেলা ১টা অবধি ঘুরে বেড়িয়ে হোটেলে ফিরলাম। উনি ২টোর সময় ফিরে এসে সেদিনকার একটি মজার ঘটনার কথা বল্লেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে একটি আমেরিকান ডাক্তারের সাথে উনি কথা বলছেন, এমন সময় একটি মহিলা ছুটে এসে ওঁদের সামনে দাঁড়াল। ওঁর মাথায় গান্ধীটুপী দেখে জিজ্ঞেস করলো "এটে কি গান্ধীটুপী?" উনি বল্লেন 'হ্যাঁ', উত্তর শুনেই ভদ্রমহিলা একটুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়াল—তার পর "ধন্যবাদ" বলেই যেমন দৌড়ে এসেছিল তেমনি ছুটে চলে গেল।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারশালা (ওয়াশিংটন)

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বাসগৃহ

পরদিন ২৯শে মে। Baltimore Medical Conferenceএ যোগ দেবার জন্য উনি ২০ মাইল দূরে John Hopkins Hospitalএ গেলেন। আমরা সেদিন প্রায় দুপুর ১টা অবধি ঘুমিয়েছি। ঘুম থেকে উঠে দেখি—ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় তো চলেই গেছে, ল্যাঞ্চের সময়ও বুঝি যায়! কাজেই তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে খেতে গেলাম। বিকেলে সবাই মিলে সহর ঘুরতে বেরোলাম। Washington এর রাস্তার কায়দা বেশ একটু নতুন ধরণের; Capitalকে কেন্দ্র ক'রে রাস্তা গুলি গাড়ীর চাকার Spoke এর মত বেরিয়েছে। রাস্তা গুলিকে Avenue বলা হয়; আমেরিকার ৪৮টি State এর নামে এই এ্যাভিনিউ-গুলির নাম দেওয়া হয়েছে। 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি' প্রভৃতি নামাঙ্কিত ষ্ট্রীটগুলি এ্যাভিনিউগুলির মাঝে মাঝে পরস্পরকে যুক্ত করে বরাবর চলে গেছে। আমরা পথে President এর বাসগৃহ 'White House দেখলাম।

বাড়ীটি দেখতে খুবই সাদাসিধে প্যাটার্ণের,—আড়ম্বরও জাঁকজমক বিহীন। Washington Monument ঘুরে আমরা অন্য দিকে "Shakespear Library," "Lincoln Memorial" ও "Jefferson Memorial" এর বাড়ীগুলি দেখে রাত প্রায় ৯টার সময় হোটেলে এলাম; আকাশে তখনও সূর্য্যের আলো রয়েছে।

৩০শে মে। আজ আবার একটি টুরিষ্ট Cab নিয়ে সকালেই বেরিয়েছি। এই Cab গুলির মাথায় ছডের উপর রাত্রে Sky view লেখা আলো জলে, ভারি সুন্দর দেখতে লাগে। আমরা President এর বাড়ী White House এ এসে নামলাম। বাড়ীর ভেতর ৮টি ঘরে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। আমরা সবগুলি ঘুরে দেখলাম। প্রথম প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি সব প্রেসিডেন্টেরই বড় বড় অয়েল কলারের ফোটো রয়েছে, দেয়ালের ধারে কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তিও সাজানো রয়েছে। প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত হ'য়ে যাঁরা মারা গেছেন একটা ঘরে তাঁদের স্মৃতি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। Americaর প্রেসিডেন্ট জনসাধারণ থেকেই নির্ব্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হ'লে তিনি তাঁর Cabinet গঠন করেন। দায়িত্বপূর্ণ কোন বিশেষ কাজ ক'রতে হ'লে President স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে পারেন না, কংগ্রেসের সাথে একমত হয়েই কাজ করতে হয়। গোলমাল উপস্থিত হ'লে Supreme Court এর সাহায্য নিতে হয়। আমেরিকার এই কংগ্রেস একটি অভিনব সংগঠন। প্রত্যেক ষ্টেটের ২ জন প্রতিনিধি নিয়ে Senate তৈরী এবং প্রতি ৩ লক্ষ লোক পিছু একজন করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হ'য়ে House of Representative গঠিত হয়। ৪৮টি ষ্টেটের প্রত্যেকটিতেই স্বায়ত্ব শাসন রয়েছে। সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই প্রত্যেক ষ্টেট নিজের দেশের শাসনকার্য্য ও সংরক্ষণের ভার বহন করে থাকে। Post, Transport, Trade প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের ভার Federal Government এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। White House থেকে গেলাম Washington Monument দেখতে। খুকুর হুকুম মনুমেণ্টের উপর উঠতেই হবে। মনুমেণ্টটি ৫৫০ ফিট উঁচু, Elevator এ করে উঠতে হয়। মনুমেণ্টের শেষ প্রান্তটি ক্রমশঃ পেনসিলের মত সরু হ'য়ে গেছে, তাই খুকু এটার নাম দিয়েছে পেনসিল মনুমেণ্ট। আমরা সবাই ঐ পেনসিলের চূড়ায় তো উঠলাম। সেখান থেকে Washington সহর সত্যিই ছবির মত দেখায়—কি সুন্দর নক্সা করে এই সহর তৈরী হ'য়েছে। ধনীর ভাণ্ডার উজাড় ক'রে ঐশ্বর্য্যময়ী আমেরিকার রাজধানী এই Washington সহর গঠিত। আমরা মনুমেণ্ট থেকে নেমে Cab এ করে সোজা এক বন্ধুর বাড়ী লাঞ্চের নিমন্ত্রণে গেলাম। ঘুরে ঘুরে ক্ষিদে পেয়েছিল খুব; তার উপর আবার দেশী রান্না ভাত, ডাল,
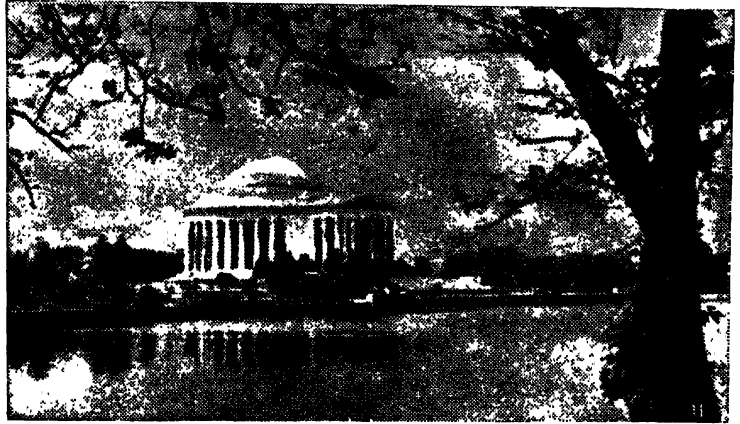
ওয়াশিংটনে পার্স পরিবার সহ আমরা

ওয়াশিংটনে জেফার্সন স্মৃতি সৌধ

তরকারী এলো দেখে কি যে আনন্দ হ'লো তা আর বলার নয়। এখানকার চাল, ডাল অতি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু। সমস্ত রকম দেশী মশলার গুঁড়ো ছোট ছোট টিনের কৌটায় পাওয়া যায়। Tropics-এর সব রকম ফসলই এ দেশে ফলে। মরসুমের জলবায়ুতে পুষ্ট Floridaর মাটীতে সোণা ফলে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন ক'রে প্রখরতা। আবার বৃষ্টির পরিমাণও যথেষ্ট। বিভিন্ন প্রকার চাষের পক্ষে এমন উৎকৃষ্ট জলবায়ু সারা পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। আমেরিকার মধ্য প্রদেশে গম এত অধিক পরিমাণে জন্মায় যে ঘর-খরচা বাদেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত গম ইউরোপের নানাস্থানে রপ্তানি হয়। আমেরিকার দক্ষিণ ভাগে অতি উৎকৃষ্ট তুলার চাষ হয়। পৃথিবীর তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ তুলাই এইখানে জন্মায়। পশুপালনের জন্ত রকির সুবিশাল তৃণভূমি বিশেষ উপযোগী হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে California ফলফুলে সমৃদ্ধ।
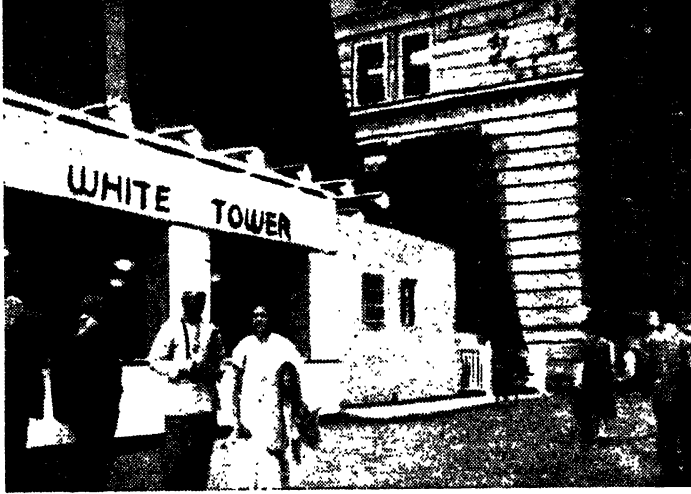
ওয়াশিংটনে একটি 'কাফে তারিয়ার সামনে
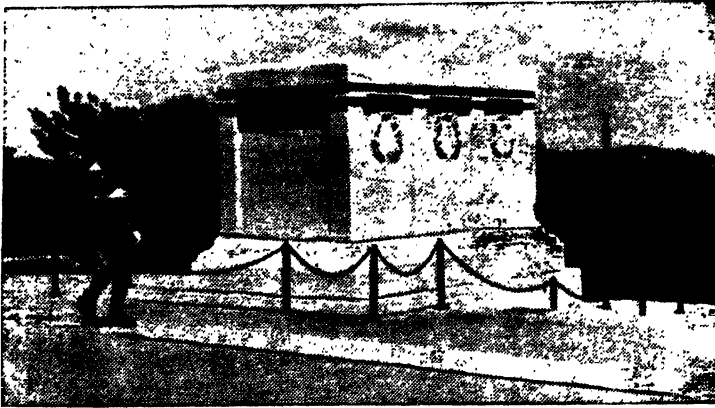
ওয়াশিংটনে নাম-না-জানা বীর শহীদদের স্মৃতি বেদী

৩১শে মে শনিবার। উনি সকালে John Hopkins Hospitalএ গেলেন। আমি আর খুকু আমার সেই বন্ধুকে তুলে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম। বিকেলে স্থানীয় প্রফেসার Dr. Parksএর বাড়ী আমাদের নিমন্ত্রণ। প্রায় ৬টায় ডাঃ পার্কস্ হোটেলে এসে আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গেলেন। বাড়ীটি সহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। সহরের বাইরে নীরব ও নিস্তব্ধ আবহাওয়ার মাঝে গৃহস্থেরা সুখে বসবাস করছে। এই পল্লীগুলি দেখতে খুব ভালো: বসবাসের পক্ষে আদর্শ স্থানই বটে। আমরা পৌঁছুতেই Dr. Parks-এর ৮ বছরের একটি ছেলে ছুটে এলো আমাদের কাছে, তার পর খুকুর হাত ধরে নিয়ে গেল তার খেলাঘরটি দেখাতে। বাড়ীর বাগানে আমরা বেড়াতে লাগলাম। Mrs. Parks বড় সুন্দর ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। খাবার পর কিছুক্ষণ গল্প করে বিদায় নিলাম। Dr. Parks আমাদের গাড়ীতে করে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

এরা চাষের যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। শাখা প্রশাখা বিস্তৃত Mississippi নদী আমেরিকার মধ্যভাগে প্রবাহিত হ'য়ে সুবিশাল সমতল ভূমিকে উর্ব্বরা করেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শস্য-ভাণ্ডার এই দেশে। আমেরিকার অতি উৎকৃষ্ট জলবায়ু চাষের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এদেশে শীতের যেমন প্রকোপ, গ্রীষ্মেরও তেমনই

১লা জুন। আজ আমরা George Washingtonএর আবাস-ভূমি Mount Vernonএ যাব। বেলা দুটোর সময় আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের তুলে নিয়ে Potmac নদীর ঘাটে উপস্থিত হ'লাম। সেখান থেকে Ferryতে করে Mount Vernonএ পৌঁছুতে দেড় ঘণ্টা লাগলো। George Washingtonএর বাড়ী ঘাটের কাছেই বেশ উঁচু জমির উপর অবস্থিত। এই বাড়ীতে তিনি জীবনের শেষ

দিনগুলি কাটিয়েছেন। আমরা ঘরগুলি ঘুরে দেখে মাঠের মাঝে এসে বোসলাম। প্রত্যেকটি ঘরে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের ব্যবহৃত জিনিষগুলি অতি সযত্নে সাজানো। বাড়ীটির একটি ছোট ইতিহাস আছে। ওয়াশিংটনের মৃত্যুর পর ছোট্ট এই সম্পত্তিটি ধূলিধূসরিত হবার উপক্রম হয়, দেশবাসীর দৃষ্টি তখন এদিকে ছিল না। কালে সবই নিলামে উঠলো, কিন্তু ক্রেতা নাই। তখন কয়েকটি মহিলা নাম-মাত্র মূল্যে এই বিষয়টুকু কিনে নেয় এবং বহু কষ্টে চাঁদা সংগ্রহ করে বাড়ীটি রক্ষা করে। মহিলাদের আপ্রাণ চেষ্টায় মহামান্য ওয়াশিংটনের এই স্মৃতিটুকু কোনো রকমে রক্ষা হ'ল। তার পর সরকার মহলের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হ'ল। জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করে সেই থেকে সরকারই এই স্মৃতি রক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবার জন্য আজ সেখানে দলে দলে পৃথিবীর লোকেরা আসছে। ক্ষুদ্র এই গৃহপ্রাঙ্গণটি আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় গৌরব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।
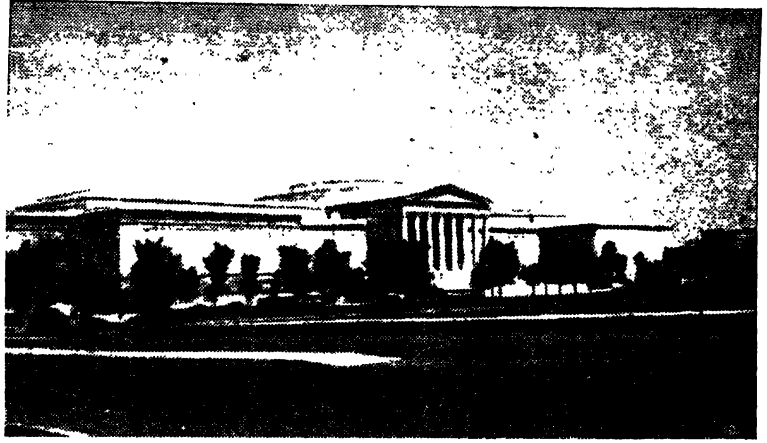
ওয়াশিংটনের জাতীয় যাদুঘর

[ক্রমশঃ]

দুর্নিরীক্ষ্য

শ্রীবেচু প্রামানিক

ব'সে ব'সে ভাবছিলাম—।

লিপি এসে ডাকলো—সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে দাদু, ভেতরে চলুন।

প্রথমটা শুনতে পাইনি, লিপি পুনরুক্তি করতে চমক ভাঙলো!

সেই বিকেল থেকে চুপচাপ উপরের এই বারান্দায় ব'সে আছি, চোখের সুমুখ দিয়ে ধীরে-ধীরে কখন সূর্য নেমে গেছে অস্তে, টেরও পাইনি, অন্তরের কলরবে ব্যস্ত ছিলাম এতক্ষণ, দৃষ্টিতে ছিল বহু দূর অতীতের এক ব্যথা-ভরা রঙিণ আবেশ! লিপির ডাকে তাই চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি দিনের প্রখর আলো ক্রমশঃ নিস্তেজ হ'য়ে এসে বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে ধরিত্রীর সুশ্যামল পৃষ্ঠ হ'তে—গোধূলির আকাশে নেমেছে ম্লান আলোর রক্ত-শতদল, স্নিগ্ধ সুন্দর বিকেলের আকাশটি ধীরে-ধীরে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে কালো আঁধারের অতল-তলে।

লিপির একটা হাত ধরে আমি উঠে দাঁড়ালাম—।

দিগন্তে জমেছে মেঘ। ছোট ছোট দুঃস্বপ্নের মতো মেঘগুলি আকাশের হৃদয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার দ্রুত নেমে আসছে। বাড়ির ছোট্ট বাগানটির শিউলি-ডালে বেদনার ছায়া পড়েছে, বাতাসে টুপটাপ ঝরছে তার ফুল—কুন্দ কলির আঁখি আজ বন্ধ, যুঁই-চামেলিও শেষ করেছে ফুল ফোটানোর পালা, মাধবীলতা দুলছে বাতাসে। রাস্তা পারের বুড়ো বট গাছটার কচি-কচি পত্র-মর্মরে রাত্রির স্বাগত সম্ভাষণ··· বাদুড়ের পাখায় চঞ্চলতা, নোনা গাছে শালিখের কিচির-মিচির···

এমনি এক গাঢ় অন্ধকার সেদিনও নামছিল—হাজারী-বাগের পথে-প্রান্তরে। দিগন্তকে চেনা যাচ্ছিল না, কেবল একটা ধূসর বিবর্ণতা। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল নাম-না-জানা হাজার পাখী—দিনান্ত ভ্রমণ সাংগ ক'রে কি সুখ-বার্তা তারা বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে নীড়াশ্রয়ী তাদের শিশুগুলির জন্যে, অনুধাবনের চেষ্টা করিনি বারেকের তরে। উর্দ্ধাকাশে ডানা উড্ডীন করেছিল শ্বেত-পক্ষ কতকগুলি হংস-বলাকা, তাদের শুভ্র পাখায় শেষ-বেলাকার রৌদ্ররাশি পৌঁছে দিয়ে দিগন্তে অপেক্ষা করছিল গোধূলির রক্ত-রঙিণ সূর্যাভা: আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ছাই-ঘ্যাঁশ-মাটি-ভরা ঢিবিটার উপর, চোখ গিয়ে পড়েছিল বহু দূরে পরেশনাথের মন্দির চূড়ার পানে, স্তিমিত স্বর্ণ-ঔজ্জ্বল্যের মতো ছটা বিকীরণ করছিল সেই চূড়াখানি··· আকাশে সজাগ ক্বচিত-দেখার এক লোভনীয় মধুর রূপ···

কিন্তু—কিন্তু সে তো কই এলো না!

মুগ্ধ বিহ্বল ভাবটা কেটে গেল চকিতে। সূর্য গেল অস্তাচলে, নামলো আঁধার-দল। আমি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

সে বাস্তবিক এলো না।

নেমে এলাম ঢিবির উপর থেকে। বাড়ি ফিরছি। সারা অন্তর তখন ভ'রে গেছে ক্ষুব্ধ অভিমানে!

নীচে বাই-সাইকেলের ঘণ্টা বেজে উঠলো—ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

লিপি আমার কেশ-বিরল শুভ্র মস্তকে ধীরে ধীরে হাত বুলোচ্ছিল—তার হাতখানা সহসা কেঁপে গেল। ঘরের আলোকে সুস্পষ্ট দেখলাম, সে কেমন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, তার চোখে-মুখে কেমন একটা চকিত-ব্যগ্র ভাব। আড়-চোখে এইটুকু আবিষ্কার ক'রে আমি মৃদু হাসলাম, বললাম—ওটা কার সাইকেলের ঘণ্টা রে? বাদলের নাকি?

লিপি নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালো, হাঁ।

ব্যাপার কি ঠিক বুঝলাম না। বাদলকে ঘরের ছেলে ব'লেই মনে করি—দু'বেলা তার যাতায়াত আছে আমাদের বাড়িতে, তবু সে বাইরে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাচ্ছে কেন? কিছু বিস্মিত ও কিছু কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালাম লিপির মুখের পানে। লিপি আহত কণ্ঠে জানালো:

—আজ রাত আটটার সময় মজুর-বস্তিতে আমাদের একটা মিটিং আছে, বাদলদা সেইজন্যে ডাকতে এসেছে আমাকে। এদিকে মা'র কড়া হুকুম কলেজের সময়টুকু ব্যতীত আমি যেন আর কখনো ঘরের বাইরে না বেরুই। বাদলদাকে এ-কথা জানিয়ে ছিলুম কলেজে, তবু যে কেন ডাকতে এসেছে জানি না!

···আমি জানতাম!

সস্নেহে তার একটা হাত আমার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম—তোমার মায়ের হুকুম নাকচ করবার ক্ষমতা আমার আছে। তুমি নির্ভয়ে যেতে পারো।

—ফিরে এলে বড্ড বকুনি দেবে!—লিপি করুণ কণ্ঠে বললে।

—সেটাও আমি সামলে নিতে পারবো। তুমি যাও···

লিপি অকস্মাৎ নত হ'য়ে আমার পদধূলি নিলো।

আমি হাসলাম।

ওদের বাড়ি কিছুতেই যাব না—বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রতিজ্ঞা স্থির ক'রে ফেললাম। কেন যাব? সন্ধ্যার ছায়া-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওর জন্যে অধীর অপেক্ষা করেছি কতক্ষণ, ঢিবির উপর থেকে বার বার তাকিয়েছি ওদের বাড়ির পানে—আকাশে উঠলো চাঁদ, ফুটলো তারার দল, ঝির ঝির ক'রে বইলো বাতাস; ও কি একবারও আসতে পারতো না? কি এত কাজ পড়েছিল তার আজকে? অন্তরে পূর্ণ হ'ল অভিমান।···পরদিন গেলাম না তাদের বাড়ি, তার পরদিনও না।

চতুর্থ দিন সকালে উঠে নিবিষ্টমনে চা পান করছি, মা এসে বললেন—শ্রুতির ভাই ডাকছে তোকে···

ভ্রূ কুঞ্চিত করলাম, কেন?

—তা কি ক'রে জানবো? আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি···মা চলে গেলেন কার্যান্তরে।

ধীরে-সুস্থে চা পান শেষ করলাম। শ্রুতির দূত এসে দাঁড়িয়েছে, শ্রুতি আমার এতদিনের বৈকালিক-ভ্রমণে অনুপস্থিতির কারণ নিশ্চয়ই জানতে চায়···চোখেতে অভিমান ঘনাচ্ছে নূতন ক'রে, অন্তরে অনুভূতি জাগছে।

একটা সুমধুর স্বাচ্ছন্দ্যে শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে।…ছোট একফালি উঠোন, গৃহ-প্রাংগণ। তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে টাঙানো একটা লোহার মোটা তার ঝুলছে, তাতে মা'র আর আমার কাপড়…তারপরই সদর দোরের দু'পাশে সারি সারি দোপাটি ফুলের চারা…মিষ্টি রোদ তাদের গায়ে, অদ্ভুত দোল্ খাচ্ছে ফুলগুলি বাতাসের সঙ্গে। সব মধুর, সত্যি মধুর! অকারণে আমি দেরী করলাম খানিকক্ষণ, তারপর পায়ে চটিটা গলিয়ে বেরিয়ে এলাম উঠোনে, তারে-টাঙানো কাপড়গুলির ওপাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল শ্রুতির ছোট ভাই অজয়কুমার, ধীরপদে এগিয়ে গিয়ে তার পিটে হাত রাখলাম…

—তারকদা?—ডাকলো অজয় সজল স্বরে…

চমকে উঠলাম, কিরে? কি হয়েছে?

—দিদির বড় অসুখ। আপনাকে সে একবার দেখতে চায়।

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম…উঠোনের মাঝখানে রৌদ্রটা তীব্র হ'য়ে উঠেছে, দোপাটি ফুলগুলো দুলছে না… বাতাসটাও হঠাৎ থেমে গেল যেন।…নির্বাক নিস্পন্দবৎ আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম, কিছু বলতে গিয়ে চোখ তুলে দেখি অজয় চলে গেছে কখন্…মর্মরিত হচ্ছে বৃক্ষশাখা, কাক ডাকছে অমংগলস্বরে।

খানিক পরে বেরিয়ে পড়লাম শ্রুতিদের বাড়ির উদ্দেশ্যে পায়ে পায়ে বেদনা কথা কইছে, হাঁটলাম একটু জোর পায়েই। বেশী দূরে নয়—শ্রুতিদের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে…কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌছে গেলাম। সমস্ত বাড়িটা কেমন থম্ থম্ করছে, একটা শোকের ছায়া যেন।…শ্রুতির ঘরখানি ছোট। সিঁড়ি ভেঙে তর্ তর্ ক'রে উঠে গেলাম তার ঘরে…ঘরের এককোণে অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রুতির বাবা ও মা, অপর কোণে ব্যথাতুর দৃষ্টি মেলে অজয়…ঘরটি একেবারে নিস্তব্ধ।

ডাক্তার নাড়ি দেখছিলেন। শ্রুতি চক্ষু মুদে শুয়ে আছে বিছানায় নিস্পন্দের মতো, দেখলেই মনে হয় সে যেন এক কঠিন অসুখে ভুগছে বহুদিন থেকে। মুখের কোমল লালিত্যটুকু গেছে বিনষ্ট হ'য়ে, তার বদলে উজ্জ্বল-ভাবে ফুটে উঠেছে চোখের কোলে রাত্রি-জাগরণের গাঢ় মলিন ছাপ…টোল্-খাওয়া সুন্দর দুটি গালে রক্তহীনতা… গলার হারে সে-দ্যুতি নেই, শাড়িটাও যেন নিষ্প্রভ। বুকটা শুধু নিঃশ্বাসের ভারে মৃদু উঠা-নামা করছে, ছড়িয়ে গেছে মাথার চুল খাট থেকে মেঝে অবধি…রুক্ষ সেই চুলে দোলা দিচ্ছে দক্ষিণা-বায়ু, পড়ে আছে তার বাহু দুটো বাসি-মালার মতো…হঠাৎ যেন ফুরিয়ে গেছে শ্রুতি…

ডাক্তার নাড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবুর আর উত্তর দেওয়া হ'ল না—শ্রুতি চোখ মেলে চাইলো, নিঃশব্দ হাসি ফুটলো তার ঠোঁটের দুইপ্রান্তে, বললো,

—এসেছো? জানতুম তুমি আসবে!

ঈষৎ বিচলিত হলাম—কেমন আছো?

—ভালোই তো! দেখতে পাচ্ছ না?—শ্রুতি থামলো হঠাৎ, ইসারায় ডাকলো কাছে, ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো —অসুখটা এত বাড়তো না··কেবল বাবার একটা কথা শুনেই যেন বেড়ে গেল! দিন চার-পাঁচ আগে অসুখটা হয়েছে, এই ক'দিন বেহুঁসের মধ্যে দিয়ে গেছে, কাল থেকে একটু ভালো। তোমার সংগে এই ক'দিন দেখা করতে পারিনি, কী কষ্টই যে গেছে!··অসুখ হওয়ার দিন চুপচাপ শুয়ে আছি বিছানায়, মাথাটা বড় কামড়াচ্ছে, অজয় ওডিকোলন আনতে গেছে বাজারে… শুনলুম পাশের ঘরে বাবা মাকে উত্তেজিত কঠিনকণ্ঠে বলছেন: কোনো কথাই শুনবো না তোমার, কলকাতায় ওই রায় বাহাদুরের ছেলের সংগেই শ্রুতির বিয়ে আমি দোবই।…খানিক পরে মা এঘরে এলেন, মুখটা থম্ থম্ করছে, মা-ই শুধু জানতেন তোমার আমার কথা। তাঁর কোলে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদলুম।…রাত ভোর হ'য়ে গেল। সকালবেলা বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে দেখি প্রবল জ্বর এসেচে, মাথা কামড়াচ্ছে অসম্ভব, কষ্ট হচ্ছে খুব।…তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি শুধু এইজন্যে, এর একটা বিহিত তোমাকে করতে হবে, নইলে বাঁচবো না…

কিছুই বলতে পারলাম না। কাঁপছে আমার শরীর। শ্রুতির বাবার চোখে তীব্র রোষ দৃষ্টি…

বড় বৌমা এক কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করলেন:

—খেয়ে নিন্, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে—

নীরবে কাপটা তুলে নিলাম। বৌমা বললেন, লিপি কই? তাকে যে দেখছি নে!

—লিপি?

চমক ভাঙছে আমার: মজুর-বস্তিতে ওদের একটা মিটিং আছে···বাদলের সংগে সে সেখানে গেছে···

—অত ক'রে বারণ করা সত্ত্বেও সে আজ বেরিয়েছে? আচ্ছা, আসুক আজ বাড়িতে?

—কি করবে বাড়ি এলে?—আমি হাসিমুখে প্রশ্ন শুধাই।

বৌমা থমকে গেলেন, রাগান্বিত ভাবটা যথাসম্ভব দমন ক'রে নিয়ে তিনি বললেন—দিন-দিন ওর এই ধিংগিপনা বেড়েই চলেছে, এটা ভালো নয়। লোকে বলবে কি?

—লোকে যাই বলুক, আমি তেমনি হাসিমুখে বললাম—তুমি কিন্তু ওকে কিছু বলতে পারবে না। কারণ লিপির কোনো দোষ নেই, আমিই ওকে জোর ক'রে পাঠিয়েছি···

—যা ইচ্ছে করুন আপনি—বৌমা মুখ ভার ক'রে চলে গেলেন।

শ্রুতিরা আজ চলে যাচ্ছে। চলে যাওয়া ওদের পক্ষে কিছু আকস্মিক। কারণ, ছ'মাসের জন্যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল ওরা, অগ্রিম টাকাও দিয়েছিল, সেই ছ'মাস কাল পূর্ণ হবার আগেই ওরা চলে যাচ্ছে। চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে কিনা, কে জানে! কিন্তু হৃদয়-পাথারে বেদনার ঢেউ উঠা-নামা করছে। সেদিন শ্রুতিকে যেভাবে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার হ'তে দেখেছি সেই স্পষ্টতাই হৃদয়ে হাহাকার তুলছে।···আর খুঁজে পাব না একটা অখণ্ড পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে বিকেলের আলোয় আমার পাশাপাশি ঘুরে বেড়াতে, পাব না কারো একটি নিবিড় অনুভূতিময় উপস্থিতি আমার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়—মাঠে মাঠে সোণা ছড়াবে বিকেলের ক্রম নিস্তেজ সূর্য, ফুল ফুটবে পথিপার্শ্বের নাম-না-জানা হাজার গাছে—জাগবে পাখির কল-কাকলি, হয়ত আকাশ পথে উড়ে যেতে যেতে কোনো একদিন সেই শ্বেতপক্ষ হংসবলাকা আমার মস্তকোপরি ফেলে যাবে ক্ষণিকের পক্ষছায়া—গোধূলির রক্ত-আলোয় রূপ বিকীরণ করবে দূর পরেশনাথের মন্দির চূড়া—থাকবে সবই, সমস্ত আলো আর হাসি, শুধু থাকবে না সে-ই।

একটি বেলার মধ্যে ওদের যাওয়া স্থির হয়েছিল—দূরদেশে কোনো আত্মীয়-বিয়োগ সংবাদের মতো, একটি বেলার মধ্যেই ওরা প্রস্তুত হ'য়ে নিলো। শ্রুতি চুপি চুপি পাঠিয়ে দিলো ওর ছোট ভাই অজয়কে আমার কাছে; ষ্টেশনে গিয়ে আমি যেন ওর সংগে দেখা করি···

খুবই অপ্রত্যাশিত ওদের যাওয়া, আমার কাছে অন্ততঃ। তবু নিয়তিকে স্বীকার ক'রে নিলাম। অজয়ের সংগে তখুনি আমি ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম।

অনেক মাল-পত্তর সংগে এনেছিলেন ওর বাবা—চারটে কুলিকে নিয়ে হিমসিম্ খাচ্ছেন; ওর মা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে জিনিশ-গণনায় সাহায্য করছেন। অজয় গিয়ে দাঁড়ালো ওঁদেরই কাছে। আমি দেখতে পেয়েছিলাম লেডিজ-কম্পার্টমেণ্টের জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে শ্রুতি আমাকে ইসারায় ডাকছে। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্রুতি যেন বিসর্জন মুহূর্তের একটি বিষাদ প্রতিমা! চুলেতে লেগেছে পূবালী হাওয়া, উড়ছে চুলগুলি মুখের চৌদিকে, হাতের চুড়িতে সকালের রোদ। কাঁচপোকার টিপ্ কপালে—নূতন শাড়ি অংগে, প্রসাধনে সমুজ্জ্বল শ্রুতির সবাংগ···তাকিয়ে থাকতে সাধ হচ্ছে, আমি তাকিয়ে আছি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে, শ্রুতির চোখে অশ্রু। এতক্ষণ সে প্রাণপণে রোধ ক'রেছিল এই অশ্রু আবেগ, বারেক চোখাচোখি হ'তেই তা ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়লো। বললাম—কাঁদে না শ্রুতি, ছিঃ!

আমার কণ্ঠও অশ্রু-ভারাক্রান্ত। ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ওর কান্না আরো বাড়িয়ে তুললাম। শ্রুতি কাঁদতেই লাগলো।

এই-সময় ওর মা এসে পড়লেন।—কে? তারক? এসেছো বাবা? এই যাবার বেলায় তোমাকেই যেন আমি খুঁজছিলাম···

তাঁর পদধূলি নিলাম।

—বেঁচে থাক বাবা। যদি কখনো কলকাতায় যাও, আমাদের সংগে দেখা করতে ভুলো না···তাঁর শেষ আশীর্বাদ। ভবিষ্যতে শ্রুতির সংগে দেখা হয়েছে, কিন্তু

তাঁর সংগে আর কখনো দেখা হয়নি, তিনি তখন ইহলোকে ছিলেন না।

কথা যা বলবার, কণ্ঠ ভ'রে জমা হয়েছিল; সেদিন তা প্রকাশ পায় নি। ট্রেণ ছাড়ার ঘণ্টা পড়ে গেল—শ্রুতির বাবা মাল-পত্তর তুলে নিয়েছিলেন নিজ কামরায়, অজয়কে তার তত্ত্বাবধানে রেখে একটু তাড়া দিয়ে গেলেন। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শ্রুতির চোখে অশ্রু শুকিয়ে গেছে, শুধু একটা করুণ বিষণ্ণতা তার সারা মুখখানায় থম্ থম্ করছে। আমি শেষ বারের মতো তার পানে চোখ তুলে তাকালাম···শ্রুতি তেমনি অশ্রুহীন চোখে ব'সে আছে।

পায়ের শব্দে মুখ তুললাম।

লিপি ফিরে এসেছে। সংগে বাদল, আর তার বোন ধারা।

বিস্মিত হ'য়ে বললাম—কি হ'ল? মিটিং-এ গেলে না?

—গিয়েছিলুম। উত্তর দিলে লিপি: পুলিশ ভেঙে দিলে।

—মানুষের সত্যিকারের অবস্থাটা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আজ আমাদের হাতে নেই, কবে স্বাধীন হবে ভারত, কবে ঘুচবে এই লাঞ্ছনা, কষ্টভোগ!—বাদল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপলো।

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

প্রথম-প্রথম ওর প্রচুর চিঠি পেয়েছি—ওরা যে কত সুন্দর ক'রে চিঠি লিখতে পারে তারই প্রমাণ এসে পৌছুতো নিত্য, আমি উত্তর দিতে কার্পণ্য করিনি। কিন্তু ক্রমে তার চিঠির সংখ্যা কমে এলো···আমি অনুযোগ করিনি, শুধু পথ চেয়ে থাকতাম কখন্ পিওন এসে কড়া নাড়বে দ্বারে···

আমার গল্প লেখার অভ্যাস ছিল, সে অভ্যাসটি আরো বেড়ে গেল। রাতদিন গল্প লিখতাম। শ্রুতি ভালোবাসতো 'পান্থপাদপ' মাসিক পত্রিকাটি···তাইতে প্রকাশ করতে লাগলাম মাসের পর মাস, শ্রুতিকে যে কথা বলতে পারিনি বিদায় বেলায়, জীবনের কোনো স্বর্ণ-মুহূর্তে, সেই সব কথা পত্রিকা-মারফৎ পৌছে দিতে লাগলাম তার হৃদয়ে···

একদিন কড়া বেজে উঠলো দ্বারে, দৌড়ে গিয়ে দ্বার খুলে হাত পাতলাম পিওনের সামনে···পিওন আমার হাতে দিলো দুটো চিঠি, একটি প্রজাপতির ধূসর পাখা-সমৃদ্ধ রঙিন কার্ড, আর একখানি শ্রুতির বাবার হাতে লেখা দুই ছত্র পোষ্টকার্ড···পোষ্টকার্ডখানিতে লেখা ছিল: "রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অশোকরঞ্জন মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান আলোকরঞ্জন মিত্রের সহিত আমার কন্যা কুমারী শ্রুতিবালা বসুর শুভ পরিণয় আগামী ৯ই ফাল্গুন ···এই বিবাহ উৎসবে আমি তোমাকে ও তোমার মা'কে যোগদান করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি!"

মনে আছে, সেদিন সারাটি রাত জেগে আমি জীবনের শেষ গল্পটি লিখেছিলাম। অত ভালো গল্প আমি আর কখনো লিখিনি। গল্পটি 'পান্থপাদপে' প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক প্রশংসা-পত্র পেয়েছিলাম। মনে আছে শুধু শ্রুতির লেখাটুকু: "কি গল্প লিখেছো তারকদা, কেঁদে-কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছি···"

—জ্যেঠামশাই? বাদল ডাকলো।

—উঁ!

—পান্থপাদপে আপনার এই গল্পটা আমরা তিনজনে পড়লাম—অতি সুন্দর লিখেছেন! বাদল একটা পুরোনো পান্থপাদপ আমার সামনে মেলে ধরলো।

—কি গল্প?

—বাদল-ধারা। এইটাই নাকি আপনার শেষ গল্প জ্যেঠামশাই—ধারা জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ মা। আমি উত্তর দিলাম, কিন্তু এত পুরোনো পান্থপাদপ তোমরা পেলে কোথায়?

বাদল বললো—মিটিং-এ যাবার আগে ধারা মা'র কাছ থেকে একটা ভালো কাপড় চাইছিল—আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেই ঘরে, মা তোরংগের যত রাজ্যের কাপড় বার ক'রে একটা নতুন শাড়ি তুলে দিলেন ধারার হাতে। ধারা চলে গেল। মা পুনরায় কাপড়গুলো তোরংগের মধ্যে তুলছিলেন—হঠাৎ তাঁর দামী শালখানার মধ্যে থেকে ঝুপ ক'রে পড়ে গেল এই 'পান্থপাদপ'খানা' দৌড়ে গিয়ে তুলে নিলাম। মা কিছুতেই দেবেন না, বললেন, একটা পুরোনো জিনিস আছে, থাক্‌না···শুনলুম না তাঁর কোনো বারণ, জোর ক'রে নিয়ে চলে এলুম···

বাদল হাসতে লাগলো। ধারা হাসছে। হাসছে লিপি! আমিও হাসছিলাম। হঠাৎ হাসিটা থেমে গেল। আমি হারিয়ে ফেলেছি পান্থপাদপখানি—শ্রুতিঠিক রেখে দিয়েছে।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(৪)

অনেক আলো নিভে গেছে, অনেক তারা তখন আকাশে জ্বল্‌ছিল'। আমি আমার বারান্দায় বসে আছি, পদ নিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে অবিরাম জলস্রোত—স্রোতস্বিনীতীরে দাঁড়িয়ে আছে তিন্‌তিড়ি বৃক্ষ। বৃক্ষ-পত্ররাজি আমার মাথার উপর রচনা ক'রে দিয়েছে আবরণ।

তারপর দুলেরা অন্তর্হিত হ'লেন। আমি কিন্তু অনুভব করলেম তাঁর সান্নিধ্য সেই নীল কৃষ্ণ রাত্রির অন্ধকারে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ। রাত্রির শীতলতা আমার জ্বলমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সুশীতল ক'রে দিচ্ছিল। লেবারনাম এবং আমারান্ত পুষ্প আমার বারান্দায় ফুটেছিল, আমি আলোর নিচে বসে শুভ্র পুষ্পে একটী মালা গাঁথলাম। দুলেরার পরিচ্ছদ ছিল শুভ্র, তার মাঝে ছিলো স্বর্ণখচিত কোমর বন্ধ। একমাত্র চন্দ্রের চিন্তায় যেমন সমুদ্রের জোয়ার ভাটা খেলে যায়, তেমনি আমার একমাত্র চিন্তা আমার রাখিবন্ধ ভাই দুলেরার কথা। সে চিন্তা আমার জীবনের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস।

আজকের মতন আকাশ আমার এত কাছে এসেছে কি কখনো? আজকের আকাশ আমার কাছে অতি স্বচ্ছ পদ্মরাগমণিখচিত চন্দ্রাতপ। আজকের ধরণী আমার উৎসব কক্ষ, তারকারাজি আমার উৎসবের উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে জ্বলছে, নদী কলকলতান আমার বীণার সঙ্গীত, আমি সমস্ত বিশ্বকে আমন্ত্রণ করেছি আমার আনন্দোৎসবে যোগ দিতে। আজ যে আমার স্বয়ংবর।

আমি আমার পিতা সম্রাট শাহ্‌জাহানের নিকটে সুবর্ণখচিত সিংহাসনের পার্শে বসেছিলাম। আমি দেখলাম—দেওয়ান-ই-আমে সমস্ত সামন্ত নরপতি এবং সম্ভ্রান্ত পরিষদ সমবেত, সর্ব্বশেষে এল আমার দুলেরা—ধীর নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে, প্রথম দিনের মত উন্নত গ্রীব, চন্দ্রের মত সমুজ্জ্বল; পার্শে তারকার মত সামন্তগণ নিষ্প্রভ, আমি প্রস্থানের সময় আমার ফুলের মালা দুলেরার শরীর স্পর্শ ক'রে গেল।

বাতাসের আন্দোলনে পত্র মর্ম্মরের মত দুলেরার নাম দিল্লীর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। আমি কিন্তু দেখলাম প্রিয়তমের দু'টী নয়ন—সমুদ্রের মত গভীর, সূর্য্যের মত ভাস্বর। আমি আজ তার মধ্যে সন্ধান পেলাম আমার দয়িতের—যাকে আমি চিরকাল সন্ধান করে বেড়িয়েছি। আমি পেয়েছি আমার গুরু—যিনি আমাকে সব কিছু শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁকে আমি চিরকাল অনুসরণ করতে পারি। স্বামীবিহীনা নারী আর সূর্য্যহীন দিবস সমান।

আমি আমার অলিন্দে বসে স্বপ্ন দেখছি—বিবাহের উৎসব রাত্রিতে আলোর মালার মত খদ্যোৎমালা আমার পার্শে নৃত্য ক'রছে। চিন্তা শক্তির দ্বারা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার রহস্য শেখ ইবন-উল-আরাবী জানতেন। আমি দুলেরার কাছে পত্র লিখতে ইচ্ছা করলাম, সে পত্রে জানিয়ে দিতাম যে দারা যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তবে সম্রাট আকবরের বিধানকে (১) পরিবর্ত্তিত ক'রে দারা তার ভগ্নীকে স্বেচ্ছায় বর বরণ ক'রে নেবার অধিকার দেবে। আমি জানিয়ে দিতাম জানকী শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের সময় লিখেছিলেন—যদি আমার স্বামী রাজ-প্রাসাদে অথবা স্বর্গে দেবতার রথে বিচরণ করেন, যদি শূন্যলোকে ভ্রমণ করেন তবু স্বামীর চরণচ্ছায়াই স্ত্রীর একমাত্র আশ্রয়। সুদূর ভ্রমণের সময় মর্ত্তলোকে ধূলির ঝড় স্ত্রীর নিশ্বাস যদি রোধ করে, তবে সে ধূলিকণা হবে সুমধুর চন্দন-গন্ধ-বাহী কুম্‌কুম্।

আমি আমার কাহিনী আরও লিখতাম, কিন্তু দেখছি রাত্রির কোলে রক্তিম আভা। ঐ দেখ, সমুদ্রের কোলে অরুণ আভাস, অসময়ে আমার অঞ্চলের মালা শুকিয়ে গেছে। আজ আমার জীবনে নূতন অরুণ উদয় হল। সে আমরণ আমার দিনগুলি আলোকিত ক'রে রাখবে। আমার অন্তর নবরূপে রূপা রত হ'য়ে উঠেছে। আমার হৃদয় ত' আমার বার্ত্তা শুনে না—অন্য একজনের বার্ত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত। আমার সমস্ত অস্তিত্ব দুলিয়ার মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, প্রিয়তমের মধ্য দিয়ে আমি বিশ্বচরাচরের মধ্যে লীন হয়ে আছি, আমার আত্মা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, কাল ও অনন্তের মাঝে সমস্ত সীমা-বিলীন হয়ে গেছে—গোপন রহস্যের অর্গল আজ আমার কাছে মুক্ত...

প্রভাতের আকাশ আমার চিন্তার স্রোতকে বিরাটের দিকে নিয়ে চলেছে। স্বচ্ছ নির্ম্মল বায়ু, সমুদ্রে সূর্য্যের পার্শে স্বর্গের নীল পরীরা পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। তারা যেন সমস্ত ব্যোম পরিমাপ করে দেখবে। 'মিমাহান্‌' পাখী মর্ম্মর প্রাচীরের উপরে বসে আছে, প্রভাতের সঙ্গীত তার কণ্ঠে। নবপ্রস্ফুটিত গোলাপ তার সুগন্ধ ছড়িয়ে সূর্য্য দেবতার অর্ঘ্য সাজিয়েছে।

তারপর আমি শুনলাম, ফিরোজশাহের পরিখার অপর তীরে উষ্ট্রের খুরধ্বনি। বণিকদল চলেছে দিনের কাজ রাত্রির আগমনের পূর্ব্বেই শেষ করে নেবে। একটী পারস্য-সঙ্গীত প্রভাতকে আকুল করে দিয়েছে—আবু সাইদের প্রেমের গান মূর্ত্ত হয়ে উঠল আমার চোখে :—

সমাধির অভ্যন্তরে মৃত্তিকার অন্তরালে
ভঙ্গুর এ দেহ মোর মিশে যদি থাকে,

---

(১) সম্রাট আকবরের বিধান ছিল চাঘতাই বংশের রাজকুমারীর বিবাহ হবে না, উদ্দেশ্য পারিবারিক মনোমালিন্য এবং সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিসর সংকীর্ণ করা, অবশ্য সে উদ্দেশ্য শেষ পর্য্যন্ত সফল হয়'নি।

অস্থি মোর রহে যদি ধরার ধূলিতে মিশি—
জাগিয়া উঠিব আমি তোমারই ডাকে।

অন্ধকার নেমে আসছে, আমি আঙ্গুরীবাগ থেকে আলোকোদ্ভাসিত 'জেসমিন' প্রাসাদে চলে যাচ্ছি, এখানে নীরবে একাকী বসে লিখতে পারব, এখানে কোন মানুষের পদধ্বনি আমার চিন্তাকে ব্যাহত করবে না। এখানে কোন মনুষ্য কণ্ঠ আমাকে আমার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না—আমার অতীতকে জাগ্রত ক'রবে না—আমার বাস্তব জীবনের সংবাদ বহন করে আনবে না। সম্রাট শাহ্‌জাহান আমাকে আহ্বান করেছেন। আওরঙ্গজেব অনুগ্রহ করে পিতার কারাবাসের যন্ত্রণা লাঘবের জন্ত কয়েকটী হস্তী ও ব্যাঘ্র পাঠিয়ে দিতে স্বীকার করেছেন। হতভাগ্য শাহ্‌জাহান! আজ রজনীতে আমি আসব না সম্রাটের কাছে; আজ সম্রাটের পুরনারী ও কিঙ্করীর সঙ্গ-বিলাসের দিন। আমার অতীতের দুঃখ আমার হৃদয়কে দগ্ধ করে দিচ্ছে, আমি আমার দুঃখের কাহিনী আজ আমাকেই বলে যাব—আমি যে আজ আমার অচেনা বন্ধু, শেষ পর্য্যন্ত আমি লিখে যাব, যদিও জানি আমি যে, এর শেষ কখনো হবে না···

আমি সে দিন প্রাসাদের ছাদে বসে বলেছিলাম যে, আমি পরদিন প্রিয়তমের কাছে পত্র লিখব। আমার নাজীর (কিংকর) আমার নিকট তার পত্রের উত্তর নিয়ে এসেছিল—আমি শিবিকারোহণে দিল্লীর অদূরে ভগ্নদুর্গের অনুরূপ একটী পুরাতন মস্‌জিদের দিকে অগ্রসর হলাম, আমি জানতাম—সেখানে ছিল পরম শান্তি, আশাকম্পিত হৃদয় নিয়ে আমি মস্‌জিদের ভগ্ন সোপান অতিক্রম করলাম। বনফুলের তীব্র গন্ধ-মদিরা আমাকে বিভ্রান্ত করে দিল। একটা সবুজ পাখী প্রাচীরের উপরে বসেছিল; সে আমাকে কর্কশ স্বরে অভিনন্দন জানালে, প্রবেশ-পথের পার্শ্বে হরিণ চর্ম্মের উপর সমাসীন একজন সন্ন্যাসী, পার্শ্বে দণ্ড, কমণ্ডলু। তিনি ধ্যান-নিমগ্ন। তাঁর শুভ্র উষ্ণীষ-শোভিত মস্তক তাঁকে প্রাচীন ঋষির রূপ দিয়েছিল। তিনি হিন্দু শাস্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন "সে নির্ব্বোধ যে এই নশ্বরদেহের আবরণে অমরত্ব বাঞ্ছা করে,—এই দেহ ত ক্ষণ ভঙ্গুর শিকামোর (১) বৃক্ষের শাখার মত—সমুদ্রের ফেনরাশির মতন ক্ষণ ভঙ্গুর, সে সন্ন্যাসী ছিলেন দৃষ্টিহীন, তাঁর ভিক্ষা পাত্রে কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে দিলাম—ভাবলাম যদি তিনি দিব্যচক্ষে আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পান। যোগী বল্লেন "মা, তোমার স্বর্ণ খণ্ড তুমি নিয়ে যাও।" আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করে বল্লেন "তোমার আত্মা যে তোমার সন্তুষ্টির চেয়েও বড়। তুমি কেন আবার সন্তুষ্টির কামনা কর?"

আমার ভাষা আমার অধরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। যোগী পুরুষ চলে গেলেন—আমার স্বর্ণমুদ্রাগুলি তাঁর পদতলে ফেলে দিলাম। সন্তুষ্টি! আমার অন্তর সেই বস্তুটার জন্ত কত আকাঙ্ক্ষিত।···

(১) শিকামোর বৃক্ষ চির সবুজ, প্রতিদিনই তার পুরাতন শাখা শুষ্ক হয়ে যায় আবার নবীন শাখা জন্মায়।

আমি কূপের পাশে বসে দুলেরার লিপিখানি পড়ে নিলাম, প্রত্যেক শব্দের মধ্যে ফুটে উঠছিল তাঁর মহানুভবতা—অথচ তাঁর ভিতরে ছিল শিশুর সারল্য। তোমায় অভিনন্দিত করি, হে আমার রাজা! তুমি তোমার ভগ্নীর উদ্দেশ্তে আনন্দ প্রকাশ করেছ, তোমার মহত্বে তুমি মহীয়ান—তুমি আমার প্রাণে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে দিয়েছ—সমস্ত পৃথিবী যেন এক প্রার্থনার সুরে ভরে গেছে। তুমি আমাকে "দেবী" বলে সম্বোধন করেছ—লিখেছ, আমি যদি সংযুক্তা—হ'তাম, তুমি পৃথ্বীরাজ হয়ে কনৌজের দিকে অভিযান করতে। আমার সমস্ত পৃথিবী গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে। তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ—সংযুক্তার সেই কথাগুলি—আমরা নারী,—সরোবরের মতন, —তোমরা পুরুষ রাজহংসের মত, সাঁতার দিয়ে চলেছ। নারীর হৃদয় সরোবর থেকে দূরে সরে গেলে পুরুষের আর কি অবশিষ্ট থাকে?

আপনার পত্র আমাকে অভিভূত করেছে। আমার শির আমি অবনত করলাম। আমার মস্তকে এক আশীর্ব্বাদের মুকুট শোভা পেয়েছে। সে শোভায় গৌরবান্বিত হয়ে আমি মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে চলে এলাম।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে হল আমার বিজয় অভিযান। আমি আমার শিবিকায় বসেছিলাম—দুই পাশে ছিল বাদামী রঙের কালয়—দুইটী উটের দুপাশে ঝুলে পড়েছে—কি সুন্দর মন্থর গতি ছিল সে উষ্ট্রদ্বয়ের! পাখীরা আমারই জন্ত গান গেয়েছিল, হরিণ শিশুগুলি সুন্দর গ্রীবা ভঙ্গি করে আমাকে অভিনন্দন জানাল। অন্তরীক্ষে, ভূমিতে সবই যেন আমার আনন্দে উল্লসিত। পথের পাশে চলেছে ক্যাক্‌টাশ্রর শ্রেণী, বৃক্ষশীর্ষে শোভা পাচ্ছিল রক্ত কোরক।—সম্মুখে বেলাবিহীন সমুদ্রের মত পড়েছিল বিরাট ভূখণ্ড। সবুজ বসন্তে বনের উপরে আকাশ অবনত হয়ে স্বর্ণাভ মাকড়শার জাল বুনেছিল।

ঐ দূরে নীল বনচ্ছায়ে আমি যদি একটী হাজার মিনার প্রাসাদ রচনা করে দিয়ে পারতাম—সেই সঙ্গে মিলিয়ে দিতাম একটী পামিরা খর্জ্জুর বৃক্ষের বন পথ—সীমাহীন অনন্তের দিকে।

যখন আমরা চাঁদনীচকের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, তখন দরবারের সময় উপস্থিত। পথপার্শ্বে বিটপী বীথির মধ্য দিয়ে চলেছে উৎসবের পোষাকপরিহিত একদল লোক এবং সঙ্গে সুসজ্জিত বলীবর্দ্দ ও করীযূথ। বাতাসে ভেসে যাচ্ছে কস্তুরী জাফরাণ গন্ধ, অগুরু চন্দনের সুবাস; পথপার্শ্বে বিপনীতে শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল অলঙ্কার-রাজি, পণ্ডগ্রীবা বিলম্বিত ক্ষুদ্র ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি; পথচারিণী নারীর মণিবন্ধ ও বাহুর কাংস্য অলঙ্কারের নিক্কণ কর্ণে প্রবেশ করছে, বিচিত্র বর্ণের ঘুড়ি শূন্তে উড়ে চলেছে, অবগুণ্ঠিতা নারীর দল পাশাপাশি অলিন্দে দাঁড়িয়েছে—তাদের নয়নের কৃষ্ণমণি অঙ্গের হীরক ও নীলকান্ত-মণির উজ্জ্বলতা ছাড়িয়ে গেছে।

এমন আনন্দের দিন কি কখনো আমার জীবনে এসেছে; দরিদ্রতম পথিকও আজ আনন্দমুখর। দরিদ্রের চেয়ে আমাদের কি বেশী সামগ্রী আছে? সূর্য্যের আলো নারীর মস্তকে ঐ জলপূর্ণ তাম্রকলস সম্রাটের

মুকুটের পোখরাজ মণির চেয়েও সমুজ্জ্বল। নারীদের শুভ্র দন্তরাজি আমার কণ্ঠের মুক্তাহারের মত শুভ্র।

শাহ্‌জানাবাদ নগর অপরূপ। এইখানে আমি নির্ম্মাণ করব একটী বৃহৎ সুন্দর পান্থনিবাস—তার সমতুল কোন পান্থশালা হিন্দুস্থানে থাকবে না। পথিক এখানে এসে দেহ মনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে—আমার নাম হিন্দুস্থানে চিরন্তন হয়ে থাকবে। আমি দরিদ্রদের বিলিয়ে দেব আমার যত ধনসম্পদ!

চিন্তাস্রোত চলেছে আমার মনে মনে—আমি রাজপ্রাসাদের প্রান্তে এসে উষ্ট্র থামিয়ে দিলাম। সূর্য্য যখন আলো বিতরণ করে—অসংখ্য অণু তখন মনুষ্য চোখে ধরা দেয়। এখানে চাঁদনীচকের মত বিসর্পিল বিপণীতে এসেছে অসংখ্য লোক—সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এখানে সমবেত হয়েছে, এখানেই বিভিন্ন পথ এসে মিশে গেছে। ঐ দেখ মানুষ এসেছে আল্জিরিয়া, সিরিয়া, ইংলণ্ড, হোলাণ্ড, তুরস্ক, খোরাসান, জাবুলিস্থান, চীন, কাবুল, তুর্কীস্থান আরও অনেক দেশের লোক। ফলের দোকান—ডালিম, কুল, তরমুজ, আঙ্গুরে ভরে গেছে। আজকের দিনে সুখ-স্বাদের জন্য মানুষ কোন্ মূল্য না দিতে পারে? ফুলের দোকান দেখে মনে হয় বাগান গড়ে উঠেছে—সহস্র পাত্র থেকে যেন ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ ভোজনালয়ে তৈরী হয়েছে সুগন্ধি মশল্লার ভোজ্য।—ঐখানে চীৎকার করে বিক্রেতা তার জিনিষের পরিচয় দিচ্ছে। সমস্ত স্থানেই কলরোল, বিভিন্ন শব্দ যেন একটীমাত্র কবিতার বিভিন্ন চরণ। ঐ দেখ বসে আছে ভাগ্যগণক—তাদের সম্মুখে রয়েছে বিভিন্ন ভাগ্যচক্র, জন্মকুণ্ডলী। ঐ দেখ তারা রাশিচক্র আঁকছে—শঙ্কাকুল নারীকে ভাগ্যফল বলে দিচ্ছে—তারা তাদের কপালের লিখন পাঠ শেষ করে জনতার মধ্যে মিশে যাচ্ছে। ওগো, তরুণ নক্ষত্রের ভাষ্যবিদ্! বল ত, আমার ভাগ্যে কি লেখা আছে? আমার জন্য আনন্দক্ষণ কি আসবে না? ঐ আকাশের আঁখি কি আমার জন্য কেবল দুঃখেরই ইঙ্গিত করেছে?

ঐ দেখ চলেছে আমির, মনসবদার, রাজা দরবারের দিকে। তাদের সঙ্গে চলেছে অসংখ্য অনুচর। কি অপরূপ তাদের সৈন্যদল! অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা যেন যুদ্ধের শব্দহীন সঙ্গীত। দেওয়ান-ই-আমের দিকে আরও কত লোক চলেছে, শিবিকার রেশমী আবরণের অন্তরালে উজ্জ্বলবেশী নর্ত্তকীরা দৃষ্টিপথে পড়ছে। ঐ চলেছে কৃষ্ণরেখাঙ্কিত হস্তীযূথ—গলায় ঝুলছে রূপোর ঘণ্টা, কাণের পাশে দুলছে তিব্বতের চামর, তাদের পার্শ্বে রয়েছে ছোট ছোট হস্তীশিশু—যেন তারা রাজঅনুচর। আমি যেন আমার চোখের উপরে দেখছি সেই দৃশ্য।

তারপর আসছে চিতাবাঘ—তার পশ্চাতে চলেছে বাঙ্গালার বাঘ। তারা যে বনরাজ্যের রাজদূত, তারপর চলেছে শিকারী বাজপাখী—ওরা শূন্যরাজ্যের রাজদূত, সকলের শেষে রয়েছে উজবেগ দেশের কুকুর—কেমন সুন্দর রক্তপট্টবাস দিয়ে আস্তরণ তৈরী হ'য়েছে ঐ কুকুরগুলির। বড় বড় পশুগুলির পাশে দুলছে ক্ষুদ্র পতাকা।—শিঙার শব্দ শুনছি, কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর ঐ হরিণের দল।

এমনি ভেসে চলেছে কত সুন্দর ছবি—আমার চোখের উপর, কিন্তু একটীমাত্র চিন্তা আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে—আমার প্রিয়তম যুদ্ধান্তে অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে আসবেন—আমাকে এখানে তিনি দেখবেন—আমাকে অভিনন্দন জানাবেন……

সত্যি তিনি এসেছিলেন, তাঁর যুদ্ধের অশ্ব তখনও ভূমি স্পর্শ করেনি। কিন্তু অশ্বারোহী মর্ম্মর পুতুলের মতন বসে আছেন—ভীষণ-দর্শন অথচ কোমল। চারণের সঙ্গীতের উন্মাদনায় তিনি কি তাঁর অশ্বকে পরিচালিত করে আসতে পারেন না? আমি আর কি তাঁর হস্ত কখনো স্পর্শ করতেও পাব না। আমার বহুমূল্য মুক্তাহার কণ্ঠ থেকে খুলে ফেল্লাম—তারপর গজমতির পাতায় কয়েকটী অক্ষর খোদিত করে প্রিয়তমের কাছে পাঠিয়ে দিলাম, প্রিয়তম আমাকে অভিবাদন জানিয়েছেন—আরও বিনম্রতায় অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ ভঙ্গীতে বুকের উপর হস্ত স্থাপিত করে মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করলেন, তার-পর মুহূর্ত্তে অশ্বকে কষাঘাত করে বর্শা বাহিনীর পশ্চাতে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

কিছুদিন আমার কাটল স্বপ্নের মধ্য দিয়ে—আমি অতীতকে ফিরে পেলাম—কিন্তু এবার নূতন আবেষ্টনীর ভিতর দিয়ে—নূতন আলোর মাঝে। আমি দেখেছি আমার উদ্যান-বাটিকার পাশ দিয়ে যমুনার জলধারা আর বয়ে চলে না, ঐ দূর নীল গগনের সীমা রেখান্তে তৈরী হয়েছে আমার নূতন উদ্যান। আমার সম্মানে তৈরী করেছিলেন সম্রাট শাহ্‌জাহান দিল্লীর মর্ম্মর মসজিদ্। আজ সূর্য্যের আলোরেখার সঙ্গে মিশে গেছে আমার সেই মসজিদের ভগ্ন প্রাঙ্গণ।

নীরবতা! শোন, এবার তোমায় বলব আমার এক স্মরণীয় কাহিনী, নর্ত্তকী গোয়ালিয়ার গুলরুখ-যে আমার নয়নের আনন্দের জন্য এক নূতন নৃত্য আবিষ্কার করেছে। তার সূক্ষ্ম ওড়নায় অঞ্চলকে সে গুজরাটের আতর দিয়ে সুগন্ধি করে নিয়েছিল। ওড়নার ঝালরের মধ্যে সে বাদাম ফুলের চুম্‌কী বসিয়েছিল—আমার দেওয়া সমস্ত অলঙ্কার পরেছিল। গুলরুখ আমার অত্যন্ত প্রিয়। মানুষ কি মৃত্যুর আভাসে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে! নৃত্যের অবসরে হরিণীর মত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—গুলরুখ অতি মৃদুকণ্ঠে পুরাতন সঙ্গীতের চরণ গেয়েছিল, সে সঙ্গীতের রেশ আজও আমার কানে শোকগীতির মতন ধ্বনিত হচ্ছে:—

"ফুটেছিল আমার প্রাঙ্গণে রজনীগন্ধা
ঝরেছিল সুবাসের নব অলকনন্দা,
প্রিয়, ভূস্বর্গের প্রাসাদে চলে গেলে তুমি,
আকাশের মেঘ এসেছিল তব চরণ চুমি
লিপি পাঠায়েছি তোমারে, আসেনি উত্তর,
তবু আশা মোর প্রাণে জেগেছিল নিরন্তর
আমার উদ্যানে ফুটেছে আজি কত শত ফুল
এখনো শয্যা মোর তোমারই গন্ধে রয়েছে আকুল।"

নৃত্যশেষে গুলরুখ কক্ষ ত্যাগ করে গেল। আমি সুদীর্ঘ অলিন্দ

অতিক্রম করে তার পশ্চাতে অনুসরণ করলাম—তাকে আমার ধন্যবাদ জানাতে। প্রাচীর পার্শ্বে ছিল লাল নীল আলোর প্রদীপ—প্রদীপের বুকে জ্বলছিল অগ্নিশিখা। বাতাস আন্দোলিত হয়ে তার সূক্ষ্ম ওড়নার অঞ্চল একটী আলোর শিখা স্পর্শ করল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার গুলরুখ—আমার মুখের রক্তিমার মত গুলরুখ—অগ্নিপরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল, ভীত আর্ত্ত হয়ে গুলরুখ ছুটে পালাল—যেমন করে পালায় বনের হরিণী—দাবানলের ক্ষণে। আমিও ছুটে চল্লাম, আমরা এসে পড়লাম মহলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। আমার বসন অঞ্চল ছুঁড়ে দিলাম তার অগ্নিশিখার উপরে—আমার সূক্ষ্ম মসৃণ বসন মুহূর্ত্তের মধ্যে অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠল,—আমরা দুজনে আগুনের মধ্যে দাঁড়ালাম।

তখন দরবার-ই-খাসের অধিবেশন চলছিল, চীৎকার করে ডাকলে হয়ত কেউ আসবে আমাদের সাহায্যে। কে আসবে? আমার প্রিয়তম দরবারে ছিলেন—আমার বিপর্য্যস্ত বসনাবৃত শরীর তাঁর দৃষ্টিপথে আসবে কি? তিনি কি আমাকে স্পর্শ করবেন, না—তাঁর চক্ষুর সম্মুখে অন্য কোন মানুষের হস্ত আমাকে স্পর্শ করবে—আর তিনি হবেন শুধু সেই দৃশ্যের নীরব সাক্ষী? আমার লজ্জায় আমি রক্তিম হয়ে গেলাম—সে রক্তিমা অগ্নিশিখার চেয়েও উষ্ণ, আমি কিন্তু তবু নীরবই রয়ে গেলাম।

সেদিন আমার শরীর দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি অনেক দিন শয্যাশায়িনী ছিলাম, আমার প্রিয়তম ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। প্রিয়তম আমাকে আমার রাখীর প্রতিদানে একটী 'কাঁচুলী'(১) পাঠিয়েছিলেন। সেই সোনালী কাঁচুলীর প্রচ্ছদ ছিল—ঘন লাল রেশম—পদ্মরাগ মণি খচিত হীরা প্রবালজড়িত মুক্তা। সুতরাং সে দানের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি তাঁকে পত্র লিখেছিলাম—আমার রাখীবন্ধ ভাই যদি তাঁর ভগ্নীর প্রতি অনুগ্রহ করে গজদন্তের উপর খচিত ছবি তাঁর ভগ্নীকে উপহার দেন তবে তাঁর ভগ্নী খুব আনন্দিত হবে। সম্রাট শাহজাহানও জানলেন যে, তাঁর কন্যা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামন্তবন্ধুর নিকট পত্র প্রেরণ করেছে। তিনিও লিখলেন একটী প্রয়োজনীয় পত্র—সে পত্র পাঠিয়েছিলেন ছদ্মবেশী দূতের হাত দিয়ে ঔরঙ্গজেবের শিবিরে।

দিন গেল—অনেক দিন, তারপর এল পত্রের উত্তর। আমি পত্র খুলে দেখলাম—শিথিল হস্তলিপি, আমি পত্র পড়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম—হিমালয় স্থান পরিবর্ত্তন করেছে! পশ্চিম গগনে সূর্য্য উঠেছে! কোন প্রেত কি আমার প্রিয়তমকে আশ্রয় করেছে? পত্রখানি ক্ষুদ্র কিন্তু খুব বীরত্বব্যঞ্জক—হিমশীতল তার সুর। আমার অন্তরের মধ্যে আমার জীবনের গতি স্তব্ধ করে দিল! সমস্ত দিবারাত্রি তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদনে তিনি কি এতই ব্যস্ত যে তাঁর মনের মতন করে তাঁর অন্তরের কথাগুলি সাজাবার সময়ও নেই! শেষ ছত্রে লেখা ছিল:—"মুসলিম রাজকুমারীর চিত্র সংগ্রহের মধ্যে চৌহান রাজপুতের ছবি শোভা পেতে পারে না।"

আমার সমস্ত আনন্দ এক মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হয়ে গেল। 'খোরাসানের অশ্রু' কাব্যে কবি আনোয়ার লিখেছিলেন:—

"শুরু হল মোর চিঠি অন্তরের বেদনা লইয়া।
—শেষ হল চিঠি মোর অন্তরেরে আঘাত করিয়া।"

এক্ষণে আমার মনে হচ্ছে যেন আমার একটী খনি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। কারো কাছে কিছু নিন্দা শুনেছে কি? কেন সে কথা বিশ্বাস করেছে? প্রিয়তম, যদি সহস্র সাধু এসে আমায় বলত—তোমার বিরুদ্ধে, আমি বিশ্বাস করতাম না কিছুই—যতক্ষণ না তোমার মুখে শুনতাম সে কথা। তুমি আওরঙ্গজেব আর ভগ্নী রোশেনারার মুখে কিছু শুনেছ কি? তারা যে দারার শত্রু—আমার শত্রু। আমরা কি সেই আমাদের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয় হারিয়েছি—সে আশ্রয় ত চৌহান বংশ—বুঁদির রাজা—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর-বংশধর—যার নামে কোন কলঙ্ক নাই—যার দৃষ্টিতে সমস্ত আপদ দূরে পালিয়ে যায়।

এমনি করে আমি শত শত প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কোন উত্তরই পেলাম না। আমি আমার হাত মুষড়ে দিলাম। আমার মনে পড়ে কৃষ্ণমেঘের ডম্বরুধ্বনি—সে ধ্বনিতে ছিল সহস্র দামামার রুদ্ধ সুর। আকাশে কি কোন শ্মশানযাত্রার কলরোল উঠেছে? কোন স্বর্গ-শিশুর মৃত্যু হয়েছে কি? ঐ দেখ মুষলধারে বারিপাত হচ্ছে। তারপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—বিদ্যুৎশিখা কৃষ্ণ মেঘখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল, আমি বিরাট ছেদচিহ্ন দেখতে পেলাম, আমার দুঃখের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে একটা শব্দ আসছে—সে শব্দ অতলস্পর্শী......

নৃত্য চলেছে সেই অতলস্পর্শী তল ভেদকরে, আমার জন্য রাত্রির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শত প্রদীপ জ্বলে উঠল—আমার প্রকোষ্ঠে স্বর্ণ-খচিত যবনিকা প্রসারিত হয়েছে, বাঁশী, বীণা, করতালের রোল সমস্ত রজনীব্যাপী চলেছে। সমস্ত জিনিষই কি ভগবানের দান নয়—এই অসহনীয় দুঃখও তাঁরই দান? এই ত' প্রমাণ করছে যে আমি ভগবানকে বাদ দিয়েও বাঁচতে পারি। বাদ্যকরদের আদেশ দিলাম—আরো ঝড়ের গতিতে বাদ্য চালাও। ব্যাঘ্রের মত দ্রুত পদক্ষেপে আমি ছন্দহীন গতিতে চলেছি। আমার চিন্তার মধ্যে ছিল এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাব, করতালের ধ্বনি শান্ত হয়ে গেল—ঝঙ্কার তখনও ভেসে আসছিল, আমি নিশাচরের মতন আমার গালিচার উপর দিয়ে চলে এলাম, আমি ফিরোজশাহপয়োধারার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি—আর কিছু নয়।

আমি চলেছি—চলেছি, হঠাৎ আমি শিলাতলে নিজেকে বিছিয়ে দিলাম—আমি নিঃস্পন্দ; কে যেন এসে আমাকে তুলে নিল, আমার বুকের মধ্যে আমার হৃদয় কাচ খণ্ডের মত চূর্ণ হয়ে গেল।

(১) বেগম নুরজাহান প্রথম ভারতবর্ষে নারীদের জন্য "কাঁচুলী" (বডিসের মত) জামা প্রবর্ত্তন করেন, তিনি 'বাদলকিনারী' ওড়না, খাবার টেবিলের "দস্তরখান" চাদর ব্যবহার আরম্ভ করেন, আতরের পুন প্রবর্ত্তন করেন।

তোমায় আমি লিখেছিলেম অনেক পত্র
ফিরে ত আসেনি আজও একটী ছত্র,
আজ নিশীথে ফুটেছে রজনীগন্ধা আমার বনে
ছড়িয়ে গেছে গন্ধ তাহার আমার মনে মনে

একদিন দরবারে খুব বড় কোলাহল উঠল। ছুলেয়ার জন্ত ভাবব! বিপুলস্কন্দ ক্ষীণকটি ছুলেয়ার জন্ত ভাবব! সে যে এক নর্ত্তকীর সন্তান, তার জন্ত কি আসে যায়? তার "বসন্ত-সঙ্গীত" আর "বর্ষার-সুর" তার হরিণ নয়ন আমাকে একদা বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছিল, শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা কন্তা জাহানারা যা ইচ্ছা সবই কর্ত্তে পারে। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে কার এমন ক্ষমতা আছে যে, সম্রাটকুমারী জাহানারার বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করে? সুতরাং দিল্লীর শ্রেষ্ঠ গায়ককে আমার কৃপাদান করে কৃতার্থ করলাম—তাকে দরবারের ভূষণে ভূষিত করলেম। মুঘল রাজকুমারী আজ হিন্দুস্থানের দীনতম সন্তানকে সেই জিনিষ দিল যা' ভারতের শ্রেষ্ঠতম বরেণ্য সন্তান প্রত্যাখান করেছে।

আজ সেদিন, যে দিন ছুলেরা তার অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনী নিয়ে পতাকা উড়িয়ে আমার প্রাসাদে এসেছিল, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল: সম্রাট জাহাঙ্গীরের অন্ততম প্রধান সেনাপতি মহবৎখানের সঙ্গে।—মহবৎখান রাণা প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র, সে দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী। মহবৎখান দরবারের দিকে আসছিল। আমীর—মহবতের অনুচরের সঙ্গে পথে গায়কের অনুচরের আরম্ভ হল কলহ—মহবৎখান যুবরাজ দারার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবার এই নূতন ব্যাপারে আমার উপর রুষ্ট হলেন। শিশোদীয় বংশাবতংস মহবৎখান দরবারে প্রবেশ করলেন—তাঁর কোন পতাকা ছিল না। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন পতাকা কোথায়? মহবৎ উত্তর দিলেন—প্রয়োজন নাই, কারণ গায়ক দরবারে পতাকা নিয়ে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। সুতরাং আমার পতাকার প্রয়োজন নেই। সম্রাট আদেশ দিলেন, গায়কের পতাকারও প্রয়োজন নাই। আমি বুঝলাম রাজদরবারে আমাদের শত্রু অনেক, আওরঙ্গজেবের মিত্র বহু। যুবরাজ দারা ছিলেন স্বভাবতঃ গর্ব্বিত মনা, তার ব্যাঙ্গক্তিগুলি অনেক সময়ই মহৎ লোকের সম্মান রেখে চলতে জানত না, আর সম্রাট শাহ্‌জাহান অন্তঃপুরে ছিলেন বিশেষ ভাবে অন্তরঙ্গর বিলাসী।

বস্তীর মেয়ে

জসীমউদ্‌দীন

বস্তীর বোন, তোমারে আজিকে ছেড়ে চ'লে যেতে হবে
যত দূরে যাব তোমাদের কথা চিরদিন মনে রবে।
মনে রবে সেই ভাবসা গন্ধ অন্ধগলির মাঝে,
আমার সে ছোট বোনটির দিন কাটিছে মলিন সাজে।
পেট ভরা সে যে পায়না আহার, পরণে ছিন্নবাস,
দারুণ দৈন্ত অভাবের মাঝে কাটে তার বারোমাস।
আরো মনে রবে, সুযোগ পাইলে তার সে ফুলের প্রাণ,
ফুটিয়া উঠিত নানা রঙ লয়ে আলো করি ধরাখান।
পড়িবার তরে কত আগ্রহ, একটু আদর দিয়ে,
কেউ যদি তারে ভর্ত্তি করিত কোন ইস্কুলে নিয়ে,
কত বই সে যে পড়িয়া ফেলিত, জানিত সে কত কিছু,
পথ দিয়া যেতে জ্ঞানের আলোক ছড়াইত পিছু পিছু।
নিজে সে পড়িয়া পরেরে পড়াত, তাহার আদর পেয়ে,
লেখাপড়া জেনে হাসিত খেলিত ধরণীর ছেলেমেয়ে।

হায়রে দুরাশা, কেউ তারে কোন দেবে না সুযোগ করি
অজ্ঞানতার অন্ধকারায় রবে সে জীবন ভরি।
তারপর কোন মূর্খ স্বামীর ঘরের ঘরণী হয়ে
দিন গুণি তার কাটিবে অসহ দৈন্তের বোঝা বয়ে।

এ-পরিণামের হয় না বদল? এই অন্তায় হ'তে
বস্তীর বোন তোমারে বাঁচাতে পারিব না কোন মতে?
ফুলের মতন হাসি খুসী মুখে চাঁদ ঝিকি মিকি করে
নিজেরে গলায়ে আদর করিয়া দিতে সাধ দেহ ভরে।
তুমি ত কারুর কর নাই দোষ, তবে কেন হায় হায়,
এই ভয়াবহ পরিণাম তোর নামিছে জীবনটায়।

এ যে অন্তায় এ যে অবিচার, কে রুখে দাঁড়াবে আজ,
কার হুঙ্কারে আকাশ হইতে নামিয়া আসিবে বাজ।
কে পোড়াবে এই অসাম্য-ভরা মিথ্যা সমাজ বাঁধ,
তার তরে আজ লিখিয়া গেলাম আমার আর্ত্তনাদ।
আকাশে বাতাসে ফিরিবে এ ধ্বনি, দেশ হ'তে আর দেশে,
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিয়া আঘাত হানিবে এসে।
অশনী পাখীর পাখায় চড়িয়া আছাড়ি মেঘের গায়,
টুটিয়া পড়িবে অগ্নি-জ্বালায় অসাম্য ধরাটায়।
কেউটে সাপের ফণায় বসিয়া হানিবে বিষের শ্বাস,
দগ্ধ করিবে যারা দশ হাতে কাড়িছে পরের গ্রাস।

আলো বাতাসের দেশ হ'তে কাড়ি, নোংরা বস্তী মাঝে
যারা ইহাদের করেছে ভিখারী অভাবের হীন সাজে
তাহাদের তরে জ্বালায়ে গেলাম শ্মশানে চিতার কাঠ,
গোরস্থানেতে খুঁড়িয়া গেলাম কবরের মহা-পাঠ।
কাল হ'তে কালে যুগ হ'তে যুগে, ভীষণ ভীষণতর
যতদিন যাবে তত জ্বালা-ভরা হবে এ কণ্ঠস্বর।
অনাহারী মার বুভুক্ষা-জ্বালা দেবে এরে ইন্ধন
দিনে দিনে এরে বিষায়ে তুলিবে পিড়িতের ক্রন্দন।
দুর্ভিক্ষের স্তন পিয়ে পিয়ে লেলিহা জিহ্বা মেলি,
আকাশ বাতাস ধরণী ঘুরিয়া করিবে রক্ত কেলী।

শিলালিপি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দশ

সময় উড়ে চলেছে, পাখা মেলে দেওয়া সোনালি রঙের সময়। না—সোনালি নয়, আগ্নেয় রঙের সময়। বাংলা দেশের প্রতি প্রান্তে প্রান্তে অগ্নি-গিরির আত্মবিদারণের সূচনা। ডাকাতি, মেল-ডাকাতি, ষড়যন্ত্র আর অস্ত্র আবিষ্কার, শ্বেতাঙ্গ অফিসারের বুলেট-বেঁধা বুকের রক্তে রাঙা হয়ে যাচ্ছে মেদিনীপুরের খেলার মাঠের সবুজ ঘাস, রক্তে কলঙ্কিত হয়ে গেছে অহমিকার দুর্গ রাইটার্স বিল্‌ডিঙের ঝকঝকে মেঝে পর্যন্ত। হাওয়ায় ভেসে গেছে দুবছর সময়।

অন্তরীণের বন্দী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় চোখ তুলে তাকায় সামনের দিকে। পদ্মার ঘোলা জল কালো হয়ে এল, দূরের মস্ত উঁচু মঠটার চূড়ো যেন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে। গাং-শালিকেরা প্রবল কলরবে ঘরে ফিরে আসছে।

অল্প অল্প বাতাস। সে বাতাসে যেন মনের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলোও উড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। কোলের ওপরে খোলা বইটার অক্ষরগুলো একটু একটু করে অস্পষ্ট হয়ে এল।···

···টক্‌ টক্‌ টক্‌—

দরজায় তিনটে টোকা দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। একেই বাড়িটা আমবাগানের নির্জনতার মধ্যে, বেশ রাত হয়েছে তার ওপরে। এত অন্ধকার যে নিজেকেই ভালো করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

—টক্‌ টক্‌ টক্‌—

আবার টোকা দিলে রঞ্জু। সামনের কালো দরজাটা কোনো শব্দ না করে যেন বাতাসে খুলে গেল।

—কে?

—আমি রঞ্জন।

—ওঃ, ভেতরে আসুন।

নারী কণ্ঠ। কিন্তু যে বলছে—অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না। নিঃশব্দে আবার পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, একটা টর্চের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠে উঠোনের ওদিকটাতে একটা ঘর পর্যন্ত পথের মতো প্রসারিত হয়ে গেল। অদৃশ্য মেয়েটি আবার বললে, ওই ঘরে চলে যান।

যন্ত্র-চালিতের মতো রঞ্জু ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা ভেজানো, ফাঁক দিয়ে মিটমিটে লণ্ঠনের আলো আসছে। দরজায় আবার গোটা কতক টোকা দিতেই বেণুদার চাপা গম্ভীর গলা কানে এল: কাম্‌ ইন।

ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা। ঘরে যারা আছে, লণ্ঠনের আবছা আলোয় ভালো করে তাদের দেখা যায় না, কিন্তু তার ভেতরেও নির্ভুল আর নিঃসন্দেহভাবে চিনে নেওয়া যায় বেণুদাকে।

বেণুদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন: কে?

—আমি রঞ্জন।

—বেশ, বোসো।

স্তব্ধ, কঠিন গলা। স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের আভাস তাঁর স্বরে কোথাও নেই। অল্প অল্প আলোক সমস্ত ঘরটায় একটা রহস্যঘনতার আমেজ। এখানে, এই মুহূর্তে যারা বসে আছে, তারা পথে ঘাটে দেখা চেনা মানুষ নয়। পাতালের পথে, ছেলেবেলার আপনার সেই মাটির তলাকার বোমার কারখানার এরা মানুষ—ক্ষুদিরামের কামানের উত্তরাধিকারী। এরা নিহিলিষ্ট্‌—এরা মিচেল কলিন্‌সের সহধর্মী, সিন্‌ফিনের কর্মী, সান্‌-ইয়াৎ-সেনের ইয়ং-চায়না আর বক্‌সার বিপ্লবীদের এরা প্রতিভূ। মুস্তফা কামাল এদের অনুপ্রেরণা।

রঞ্জু অন্ধকারের মধ্যে এক কোণায় বসে পড়ল। বেণুদা চাপা গলায় সুরু করলেন: টাকা আমাদের চাই। আমাদের যার যা ছিল সাধ্যমতো সবাই তা দিয়েছি। অথচ পরশু কলকাতায় জাহাজ আসবে, মালও আসবে। অন্তত আরো হাজার দেড়েক টাকা জোগাড় না করলেই নয়। পরিমল?

ঘরের এক কোণ থেকে পরিমলের ছায়ামূর্তি জবাব দিলে, আমি যেমন করে হোক শ দুই জোগাড় করব।

—থ্যাঙ্ক ইউ। বেণুদা হাসলেন: পার্টি তো তোমাকে বরাবরই দোহন করে আসছে, তোমার ওপরে আর বেশি চাপ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আর কেউ—

ঘরের সকলে মাথা নীচু করে রইল।

বেণুদা বললেন, সকলের অবস্থাই আমি জানি। সোনার বোতাম থেকে ঘটিবাটি পর্যন্ত বিক্রী করেও টাকা দিয়েছে অনেকে। কিন্তু এ অবস্থায় কী যে করা যাবে—

—আমি সামান্য কিছু দিতে চাই—

ঘরের সকলের দৃষ্টি ফিরে গেল একসঙ্গে—রঞ্জুরও। এ সেই অদৃশ্য মেয়েটির গলা। লণ্ঠনের আবছায়া আলোয় চোখ এতক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এবার সে তাকে দেখতে পেলো।

লম্বা ফর্সা চেহারার রোগা মেয়ে। কালো পাড়ের একখানা শাদা শাড়ী তার পরণে। এগিয়ে এল নিঃশব্দ একটা ছায়ার মতো। কেমন যেন মনে হল অন্ধকারের মধ্য থেকে যেমন হঠাৎ সে বেরিয়ে এসেছে, তেমনি আকস্মিকভাবেই আবার কোথাও মিলিয়ে যেতে পারে।

—সুতপা?—স্নিগ্ধ বিস্মিত গলায় বেণুদা বললেন, কী দেবে তুমি?

হাত থেকে ছোট একটা আংটি খুলে সুতপা বেণুদার পায়ের কাছে এগিয়ে দিলে: এইটে।

—এই আংটি?—বেণুদার স্বরে ব্যথা ফুটে বেরুল: এইটে তুমি দিতে চাও?

ছায়ামূর্তি সুতপা ঘাড় নাড়ল—কথা বললে না।

—কিন্তু—বেণুদা বিব্রত স্বরে বললেন, এ তো নিতে পারব না।

মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল সুতপা: কেন?

তেমনি বিব্রতভাবে বেণুদা বললেন, এ তোমার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন। আমি জানি এর সত্যিকারের দাম কত। এ বরং নাই নিলাম সুতপা।

সুতপার চাপা গলা অন্ধকারে যেন ঝলকে উঠল।

—তাহলে কি মনে করব পার্টিকে এটুকু দেবার অধিকারও আমার নেই? মনে করব, আমি পার্টির করুণার পাত্র?

ঘরের প্রত্যেকটি মানুষ নিঃশব্দ হয়ে বসে রইল, এমন কি বেণুদাও। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার সেই ধারালো গলা শোনা গেল: হয় তো দাম এর বেশি নয়, আর সেই জন্যেই—

এবার বেণুদা জবাব দিলেন। শান্ত, বিষণ্ণ আর গভীর তাঁর কণ্ঠ। বললেন, না, এর এত বেশি দাম যে এর ঋণ পার্টি কোনোদিন শোধ করতে পারবে না। জানি, জীবনে নিজের বলতে এইটুকুই তোমার ছিল। তবু আমি এ নিলাম সুতপা। আমরা আজ এর দাম দিতে পারব না, কিন্তু দেশ হয়তো দেবে একদিন।

রঞ্জুর অনুমান ভুল হয়নি। চক্ষের পলক না ফেলতেই দেখল ছায়ামূর্তি তেমনি নিঃশব্দ অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। যেন একটা কালো খাপের ভেতর থেকে ক্ষণিকের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেই আবার আত্মগোপন করেছে একখানা তীক্ষ্ণধার তলোয়ার। কিন্তু তলোয়ার যে কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

তিনটি বিস্ময় দেখা দিয়েছে রঞ্জুর জীবনে। মিতা, করুণা, আর সুতপা। একজন রূপকথা, একজন অশ্রু-ভরা মায়ের চোখ আর একজন আগুনের একটা অপ্রত্যাশিত ঝলক। কাউকেই ধরা যায় না, অথচ তিনজনকে কেন্দ্র করেই কল্পনা খেয়াল খুশিতে তার জাল বুনে চলে, হারিয়ে যায় অসীম আর অর্থহীন কৌতূহলের গভীরে।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত কিছু একটা অপেক্ষা করছিল হালদারের জন্যও।

সেই হালদার। ফণীর মাকে বাড়ী থেকে তাড়ানোর ব্যাপারে সেই অত্যুৎসাহী লোকটি। সহরে সোনা-চাঁদির ব্যবসা, বেশ কিছু টাকাকড়ি জমিয়েছে বলে গুণ্ডার দল ভাড়া করে আনে কথায় কথায়। আর 'তরুণ-সমিতি'র ওপরে হাড়ে হাড়ে চটে আছে, শাসিয়ে দিয়েছে বাগে পেলে এদের সে দেখে নেবে।

কিন্তু তার আগে তার নিজেরই যে দিন এগিয়ে আসছিল সে কথা জানত না হালদার।

শীতের রাত নেমেছে শহরে। উত্তর বাংলার শীত—হাড় জমানো ঠাণ্ডা। গুঁড়ো বরফের ঝাপটার মতো

উত্তুরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে শোঁ শোঁ করে যেন ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে কোনো প্রেত-ঈগলের মৃত্যু-হিমাক্ত ডানা—রোমকূপগুলো তার স্পর্শে কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে, শরীরের যে যায়গাগুলো খালি তারা যেন অসাড় হয়ে খসে পড়তে চায়, ঠোঁট মুখ ফেটে রক্ত পড়তে থাকে।

একটি লোক নেই রাস্তায়। শুধু খোয়া-ওঠা পথের খস্ খস্ খট্ খট্ আওয়াজ তুলে ঘোড়ার গাড়ি একটা চলে গেল ওদিকের চৌমাথা দিয়ে। কোথায় কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে উঠেছে একটা শীতার্ত কুকুর। যেন চারদিকে অদেহী কতগুলো ছায়ামূর্তি চলা ফেরা করছে, চারদিকে তাদের তুষারস্পর্শ সঞ্চার করে'। মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো যথানিয়মে নিবে যাচ্ছে একটার পর একটা।

আর নেমেছে কুয়াশা। সন্ধ্যার কয়লার ধোঁয়া আর রাত্রির হিম একসঙ্গে মিশে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে চারপাশে। ঝাপ্সা ধোঁয়াটে আবরণ যেন চোখের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে আনে। ফরশাটায় শেষ টান দিয়ে মস্ত একটা আরামের হাই তুলল হালদার, একবার অন্যমনস্কভাবে তাকালো পথের দিকে।

এত রাত্রে আর খদ্দের আসবে না।

—ওরে জগা, ক্যাশটা দে দেখি।

ক্যাস বাক্স এগিয়ে দিলে জগা। প্রলুব্ধভাবে নোটগুলো গুণতে গুণতে হালদার একবার তাকালেন নিজের আয়রণ সেফগুলোর দিকে। বললেন, দরজাটাও বন্ধ করে দে—

দরজা আর বন্ধ করতে হল না। সে দিকে দু পা এগিয়েই জগা সঙ্গে সঙ্গে তিন পা পেছিয়ে এল। তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে আতঙ্কে।

হালদার ধমক দিলেন: কিরে, ভূত দেখলি নাকি?

জগাকে কিছু বলতে হল না, নিজেও দেখলেন হালদার। হাত দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল তাঁর, টাকা পয়সাগুলো ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়ল মেজেতে।

দরজা দিয়ে খদ্দের ঢুকেছে জনচারেক। মুখে তাদের কালো কাপড়ের মুখোসটানা। দুজনের হাতে দুখানা বড় বড় বারো ইঞ্চি ছোরা; বাকী দুজন দুটি ছোট ছোট কালো নল সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, নল দুটি দেখতে ছোট হলেও ওদের চেনে বই কি হালদার।

জগা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে কাউণ্টারের তলায় ঢুকেছে, ভয় পেয়ে কুকুর যেমন করে পালিয়ে আসে সেই রকম। হালদারের মুখের চেহারা অবর্ণনীয়, তার দাঁতে-দাঁতে আওয়াজ উঠছে খট্‌খট্ শব্দে। মুহূর্তের মধ্যে যেন ঘরটায় তুষার-মেরুর শীতলতা সঞ্চিত হয়েছে।

—একটি কথা বললেই গুলি করব।—চাপা তীক্ষ্নস্বরে একজন বললে, দেখি ক্যাশ বাক্স—

নিরুত্তরে ক্যাশবাক্স এগিয়ে দিলে হালদার।

—সিন্দুকের চাবি।

একটা বুকফাটা কান্না বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছিল হালদারের, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন লাফিয়ে একটা কালো নল এগিয়ে গেল তার কপালের দিকে। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল হালদার।

মাত্র মিনিট তিনেক সময়। দুহাতে মুখ ঢেকে রইল হালদার, এই শীতের দিনেও কপাল বেয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরে পড়ছে তার। কাউণ্টারের তলায় কুকুরের ছানার মতো অব্যক্ত একটা কুঁই কুঁই শব্দ করছে জগা—অজ্ঞান হয়ে গেছে খুব সম্ভব।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় একজন আর একবার মুখ ফেরালো হালদারের দিকে। বললে, দরজার বাইরেই পাহারা দিচ্ছি আমরা। কোনো সাড়াশব্দ করেছ কিংবা বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছ—কি সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দেব।

হালদার জবাব দিলে না। জগার মত সেও জ্ঞান হারিয়েছে বোধ হয়।

দরজার শিকলটা টেনে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চারজন। কোনোখানে কারো সাড়াশব্দ নেই, শুধু শীতার্ত কুকুরটার একটা কান্না উঠছে অবিশ্রাম। আর পথের ওপর কন্‌কনে শীতে শাদা কুয়াশা নিরবচ্ছিন্ন কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেছে, ঝাপটা মারছে মৃত-ঈগলের প্রেত ডানা, খোয়া ওঠা পথের ওপর টপ টপ করে ঝরে যাচ্ছে বরফগলা শিশির-বিন্দু।

* * * *

আজ রাত্রে আর ঘুম আসবেনা।

লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে রঞ্জু ছটফট করতে লাগল। লণ্ঠনটা একেবারে কমিয়ে রাখা হয়েছে, অন্ধকার ঘরে ওইটুকুই শুধু একটুখানি আলোকবৃত্ত। কিন্তু রঞ্জুর চোখের

সামনে যেন অজস্র আলোর কণা—ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। তারপর ধুলোর মতো আরো সূক্ষ্ম হয়ে রেণু রেণু হয়ে পাক খাচ্ছে জ্যোতির ঘূর্ণির মতো। পা দুটো এখনো বড় বেশি ঠাণ্ডা—পেরিয়ে এসেছে মেরু-মৃত্তিকার তুহিনতা, পায়ের পাতা শরীরের একটু ওপর দিকে ছোঁয়ালেই যেন ঠাণ্ডায় শিউরে উঠছে চামড়া।

ঘুম আসবে না। মাথার মধ্যে যেন বিপর্যয় কাণ্ড চলেছে—ছিঁড়ে পড়তে চাইছে রগগুলো। একটা কালো শীতল সাপের মতো চেতনায় শিউরে উঠছে। আজ তার প্রথম হাতে খড়ি। রক্ত-ঝরা দুর্গম পথে এই প্রথম অভিসার সুরু হল!

ডাকাতি!

সে ডাকাতি করেছে। হালদারের দোকানে হানা দিয়ে টাকায় গয়নায় হাজার তিনেক টাকার মতো সংগ্রহ করা হয়েছে আজ। এ ছাড়া উপায় ছিল না। জরুরি তাগিদ, জরুরি প্রয়োজন। কলকাতায় জাহাজ এসে পৌঁচেছে, আর অপেক্ষা করলে কতগুলো ভালো ভালো জিনিস যেত হাতছাড়া হয়ে।

ডাকাতি করেছে সে। ভালো মানুষ রঞ্জু, লাজুক রঞ্জু। ছেলেবেলায় হাড়গিলা পাখির ডাক শুনে যে ভয় পেয়েছিল—সেই মানুষ। তাকে হাতছানি দিয়েছিল ডাহুক-ডাকা কালীসন্ধ্যায় অশরীরী অবিনাশবাবু, নির্জন কাঞ্চননদীর ধারে একা একা আসতে তার আতঙ্কের সীমা ছিল না। এমনকি এই সেদিন, মাত্র দুবছর আগেও সে নির্ভয়ে গোমেজ সাহেবের কুঠি-বাড়ির কবরখানায় আসতে সাহস পায়নি, সে আজ ডাকাতি করল!

কী জীবন ছিল! চোখভরা ছিল মালঞ্চমালা-পাশাবতীর স্বপ্ন; খিড়কির বাগানের ঠাণ্ডা ছায়ায় ছাইগাদার পাশে বসে একা একা ভাবতে ভালো লাগত, ভালো লাগত বুক ভরে বাতাবী-ফুলের গন্ধভরা বাতাস টেনে নিতে; রেললাইনে চলন্ত গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কল্পনা-বিহ্বল মন কোথা থেকে কোথায় যে ভেসে যেত তার, ভূগোলের পাতায় পড়া কোন্ তুষার-মেরুর আশ্চর্য বিস্তারে, কোন্ আফ্রিকার নীল অরণ্যে, পাহাড়ের বুকের মধ্যে গর্জনমুখর কোন্ দূর ফেনিল কলর্যাডো নদীর ধারে ধারে। তারপর সংঘমিত্রা। না—মিতা। যেন স্বপ্ন দিয়ে গড়া সেই ফোয়ারা আর হেনার কুঞ্জে সাজানো সেই বাগানটা—সেখানে একটা চিতি-হরিণ, আর হরিণের মতো যার চোখের দৃষ্টি—

অথচ কী হল। আজ সেদিনের নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, আজ সেদিনের মনটাকে করুণা করতে ইচ্ছে যায়। বিপ্লবী নির্ভীক রঞ্জু। রবীন্দ্রনাথের সেই পংক্তিগুলো মনে পড়ে :

"চাবোনা সম্মুখে মোরা, মানিবনা বন্ধন-ক্রন্দন
হেরিবনা দিক,
গণিবনা দিনক্ষণ, করিবনা বিতর্ক-বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল-উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—"

হাঁ, তাই। মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততাই আজ কণ্ঠ ভরে পান করে নিতে হবে। মদ সে খায়নি, কিন্তু এর চাইতেও তীব্র কি তার নেশা, তার জ্বালা কি এর চাইতেও উদগ্র? সেদিনের সেই কিশোর স্বপ্ন-বিভোর রঞ্জু চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাক, মরণের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী রঞ্জন রচনা করে যাক তার আত্ম-কাহিনী: "মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন ইতিহাস—"

কিন্তু ডাকাতি?

বাইরে কিসের শব্দ? কেউ হাঁটছে না?

চকিত হয়ে সে বিছানায় উঠে বসল—বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস আরম্ভ হয়ে গেছে। ওই পায়ের শব্দটা যেন হৃৎপিণ্ড থেকে উঠে আসছে, উঠে আসছে তার শ্বাসনলী চেপে ধরতে, তার নিশ্বাস রুদ্ধ করতে। রক্ত-মাখানো কয়েক টুকরো রুটি আর কয়েকটা কালো টাকার লোভে চারদিকে জাল ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে টিকটিকির সর্দার সেই ধনেশ্বরটা। আর ছাই রঙের কোটপরা ইয়াদ আলী, বর্ণচোরা আরো অজস্র—দেশের হৃৎপিণ্ডে যেখানে এতটুকুও প্রাণ ধুক ধুক করছে, উড়ন্ত শকুনের মতো চক্র দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারি ওপরে ছোঁ দিয়ে পড়বার জন্যে। তাদেরই কেউ বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো?

—টপ টপ—

না। টিনের চালের ওপর থেকে বরফ-গলা জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচের মরা ঘাসের ওপর। কিন্তু তবু ওদের বিশ্বাস নেই। শহরে এর মধ্যেই পাঁচ সাতটা বন্দুক চুরি হয়ে গেছে, দুটো ডাকাতিও হয়েছে গ্রামের দিকে। এখন যেন হন্সে কুকুরের মতো ঘুরছে ধনেশ্বর। কোনোটার কিছু কিনারা করতে পারেনি, তাই অনবরত সার্চ চলেছে; শহরে, দুবার সার্চ করেছে বেণুদার বাড়িতেই। আর আছে সংশোধিত ফৌজদারী আইন, শহরের অনুশীলন দলটাকে প্রায় বেড়েন দিয়ে জেলে নিয়ে ঢুকিয়েছে। শুধু ওদের এখানেই এখনো নাক গলায়নি, সবশুদ্ধ এক সঙ্গে নিয়ে জাল টানবার মতলব আছে কিনা কে জানে। অন্তত বেণুদার যে আর খুব বেশি বাকী নেই একথা নিজেই তো তিনি বলছিলেন সেদিন।

ধেৎ—কী বাজে ভাবনা এসব! ভয় পাচ্ছে নাকি রঞ্জু? ভয় পাচ্ছে জেলে যেতে? আজকে যে ডাকাতি করেছে, ধরা পড়লে তার শাস্তিটা কল্পনা করে কি আতঙ্কে বুকের মধ্যে রক্ত জমাট হয়ে আসছে তার? না—কোনো ভয় নেই, কোনো আশঙ্কাই নেই তার। জেলকে ভয় করবে না, একবিন্দু দুর্বল হয়ে পড়বে না পুলিশের হাজার অত্যাচারের আতঙ্ককর সম্ভাবনায়। দূর কালাপাণির ওপারে বিভীষিকাভরা আন্দামান যা কোনো প্রাগৈতিহাসিক ড্রাগন দ্বীপের মতো অমানুষিক বিভীষিকায় ভরা, আজ তাই নতুন পাশাবতী আর মালঞ্চমালার পুরীর মতো তাকে মায়াময় আহ্বান পাঠাচ্ছে। যেদিন ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে সে হাসিমুখে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে বিপ্লবী কানাইলালের মতো, অন্যান্য শহীদদের মতো তারও স্থান হবে কোনো জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিলোকে, সেদিনের চেয়ে কোন বড় গৌরব আছে আর?

কোনো বন্ধন আছে কি? কোনো মোহ? বিপ্লবীর পিছুটান থাকতে নেই। কতবার সে তো নিজের খেয়ালে আবৃত্তি করেছে—"ঝড়ের গর্জন মাঝে, বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে।" কবিতার খাতায় ছন্দে ছন্দে রূপ দিয়েছে তার সেই অনুপ্রেরণাকে: বন্ধন নয়, ক্রন্দন নয়, মুক্তির স্পন্দন—

তবুও—

তবুও কে? মিতা?

হঠাৎ রঞ্জু চঞ্চল হয়ে উঠল। এই দু বছরে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে এসেছে মিতার সংস্রবে, মেশবার সুযোগও পেয়েছে। জেনেছে পরিমলের বোনও পিছিয়ে নেই, সেও ওদের দলেরই একজন। অমন ফুলের মতো যে মেয়ে সেও সূর্যমুখী—তারও তপস্যা আগ্নেয় তপস্যা। তবু—

মিতা বড় হয়েছে, উঠেছে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে। ছেলেমানুষ রঞ্জু আজকে হয়েছে তরুণ, সেদিনকার ছোট মেয়েটি আজকের তরুণী। হরিণের মতো চোখে এখন থেকে কেমন একটা আলো যেন ঝলমল করে ওঠে তার। মিতার চলায় যেন নতুন একটা ছন্দ এসেছে আজকাল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগে, একটা অর্থহীন গানের মিষ্টি সুরের মতো রিণ রিণ করে ওঠে।

আস্তে আস্তে একটা মৃদুমধুর আবেশ যেন মনকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। ভাবতে ইচ্ছে করে জালালাবাদ পাহাড়ে কিংবা ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে বুড়ীবালাম নদীর একটা পরিবেশ—সমস্ত শরীর জ্বলছে যেন মশালের মতো, টগবগিয়ে ফুটছে রক্ত। কারণ, ওদিকে টিলা আর জঙ্গলের আড়ালে এগিয়ে আসছে পুলিশ বাহিনী।

—টু আর্মস্ কম্রেড্স্—

কম্রেড্স্! মাত্র দুজন। ও আর মিতা। পাশাপাশি দুজনে দাঁড়িয়েছে। একবার শুধু পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা, তারপরেই ওদের রিভলবার গর্জন করে উঠল। প্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ লড়াই। হঠাৎ একটা গুলি এসে বুকে লাগল—হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে গেল—মৃত্যুর তপ্ত পরোয়ানা। পরম শান্তিতে চোখ বুজবার আগে শেষবারের মতো দেখল নীল আকাশ আর মিতার নীল চোখ একাকার হয়ে যাচ্ছে—

ধ্যাৎ—কোনো মানে হয় না। কী যে হয়েছে, কিছুতেই ওই মেয়েটাকে মন থেকে মুছে দিতে পারে না, একটা নেশা যেন ঝিনঝিন ঝিমঝিম করে রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। না—কোনো সঙ্গী নেই বিপ্লবীর। একলা পথেরই সে যাত্রী: "এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা—"

কিন্তু ডাকাতি।

হালদারের মুখটা মনে পড়ছে। কী অদ্ভুত বিবর্ণ আর বিকৃত। যদি ধরা পড়ে? কাল সকালে যদি পুলিশ আসে?

রঞ্জু উঠে বসল। ভয় পাচ্ছে—দুর্বল হয়ে পড়েছে নিঃসন্দেহ। না—এ চলবে না। সেদিন বিধুবাবুর বাড়ি থেকে যখন টোটা চুরি করেছিল সেদিন কি এর চাইতে বেশি বুক কেঁপেছিল তার? ধরা পড়ুক—দ্বীপান্তর হোক, ফাঁসি হোক। আর নয়। অমর-মরণ রক্ত-চরণে ডাক দিয়েছে, ভয়ের জঞ্জালে আগুন ধরিয়ে দাও আজকে।

ঘুম আসবে না নিশ্চয়ই। লিখলে কেমন হয়? মনের এই অস্থিরতা খানিকটা কেটে যাবে হয়তো। প্রথম ডাকাতির অভিজ্ঞতা যেন স্নায়ুগুলোকে তার এখনো বিপর্যস্ত আর বিশৃঙ্খল করে রেখেছে।

কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসল:

পুঞ্জিত হল ঘন দুর্যোগ
তিমিরে হারালো চন্দ্র,
মহারুদ্রের কাল-মন্দিরা
বেজে ওঠে মেঘমন্দ্র।
মত্ত-সিন্ধু করি ঝংকৃত,
কার ধনু আজ হল ঝংকৃত
থরো থরো করি কাঁপে দিগ্বধূ
রজনী বিগত-তন্দ্র—

বেশ লাগছে লিখতে। নিজের লেখার ঝঙ্কার নিজের কানেই অনুরণিত হচ্ছে। মিতা তার কবিতা পড়ে বলেছে, বিপ্লবী বাংলার বিপ্লবী কবি সে। নজরুলের মতো সেও লিখবে অগ্নিবীণা, প্রলয়-শিখা জ্বালিয়ে দেবে, ভাঙার গানে শতখান করে দেবে কারাগারের লৌহ কপাটকে। কবি—

কিন্তু—কবি!

—এ পথ তোমার নয় ভাই, এ রক্তের পথ তোমার নয়—

করুণাদির কথা। মায়ের চোখের মতো দুটি নিবিড় চোখে তাঁর জল নেমে এসেছিল সেদিন। মুখখানা যেন ভালো করে চেনা যাচ্ছিল না, তার ওপর ছড়িয়েছিল একটা কুয়াশার পর্দা। সেই সন্ধ্যায় কেন কে জানে করুণাদি অদ্ভুতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, হারিয়ে ফেলেছিলেন নিজের স্বাভাবিকতা, যে কথাগুলো বলেছিলেন তাদের বেশির ভাগেরই কোনো অর্থ বুঝতে পারেনি। যেন করুণাদিরই অর্থ বোঝা যায় না। আজ মনে হয় স্বপ্ন দেখেছিল সে।

স্বপ্ন ছাড়া আর কী। তারপরে তো করুণাদি ও সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি। শুধু ও সম্পর্কে নয়, কেমন যেন হয়ে গেছেন আজকাল—বেশি কথাই বলেন না। সেই স্নেহ আছে, আদর করে খাবার আর চা খাওয়ানো সব আছে, চোখের সেই স্নিগ্ধতাও আছে ঠিক আগের মতোই। তাঁর কাছে গেলে তেমনি করেই মাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে যায় ছোড়দিকে। অথচ—অথচ, কিছু একটা হয়েছে। আর একদিনও মনে হয়েছিল একা একা বসে তিনি কাঁদছেন—রঞ্জুকে দেখেই চোখ বুজে ফেললেন।

—কী ভাই, দেশের স্বাধীনতা এনে ফেলেছো?

খুব হালকা আর সহজভাবে যেন কথাটাকে বলতে চাইলেন করুণাদি, কিন্তু সে সহজ সুর তাঁর কথায় বাজল না। নিজেরই কেমন অপ্রস্তুত লাগে আজকাল। করুণাদির সামনে বড্ড অপরাধী বলে বোধ হতে থাকে, চোখের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস হয় না।

—তুমি কবি, তুমি শিল্পী। এ সর্বনাশা খেয়াল তুমি ছেড়ে দাও—

কেন এই কথা? আর এ কথার সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের ব্যর্থতার সম্পর্কই বা কী? কোথায় একটা নিবিড় বেদনা আছে করুণাদির, একটা রহস্যময় গভীরতা ঘিরে আছে তাঁকে। সেটাকে জানা যায় না বলেই যেন তাকে কেন্দ্র করে একটা ব্যবধান মাথা তুলছে আজকাল।

পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন।

—তুই বলেছিলি ভারী দুঃখের জীবন করুণাদির। কিসের দুঃখ রে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল পরিমল। বললে, অল্প অল্প শুনেছি, ঠিক জানি না। তবে যেটুকু জানি সেটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

—তবে থাক।

কিন্তু কেমন যেন লাগে। নিজের লেখা কবিতাগুলোর পেছন থেকে যেন উঁকি দেয় কারো ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি। সত্যিই কি ভুল পথ! কবির জন্যে অস্ত্র নয়, কল্পনা-বিলাসীর জন্যে নয় শিবিরের প্রস্তুতি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসমাপ্ত কবিতাটা বন্ধ করে ফেলল রঞ্জু। বাইরে থেকে এল মোরগের ডাক। জানলার ফাঁকে ফাঁকে ঘরে এসে লুটিয়ে পড়ল ভোরের আলো। (ক্রমশঃ)

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করিবার জন্ম কলিকাতার ওভারটুন হলে ৭ই নভেম্বর আর একবার চেষ্টা করা হইল—কিন্তু পূর্ব্ববৎ সে চেষ্টাও সফল হইল না। পুলিসের গোয়েন্দা বলিয়া অনুমিত এক ব্যক্তি এই মাসেই নিহত হইল ঢাকায় এবং নদীয়া জেলার রায়টাতে একটি ডাকাতিও হইল।

আলিপুর বোমার মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় গুপ্ত সমিতির সহিত শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ প্রমাণিত হইল না—সুতরাং তিনি মুক্তি পাইলেন। এই মামলার বিচারক বীচক্রফট্ সাহেব ইংলণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। উভয়েই একসঙ্গে আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

অভিযুক্ত আর সকলেরই শাস্তি হইল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। হুকুম শুনিয়া অকুতোভয় উল্লাসকর সহাস্যে বীচক্রফট্‌কে বলিয়া উঠিলেন,—"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।"

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দশজন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল—অবশিষ্ট আর সকলের হইল পাঁচ হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড। হাইকোর্টে আপীল করার ফলে বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ডাদেশ রদ্ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয় এবং অন্যান্য আরও কয়েকজনের দণ্ডাদেশ কিছু কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

আলিপুর বোমার মামলায় সরকার পক্ষের অন্যতম উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। কলিকাতার সুবার্ব্বন পুলিশ আদালত হইতে বাহিরে আসার সময় ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী গুলির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। হত্যাকারীর পরে ফাঁসি হইয়াছিল। এই সালেরই জুন মাসে কতেজঙ্গপুরে জনৈক গোয়েন্দার ভ্রাতাও নিহত হইল।

বিপ্লবী-সংগঠন উত্তমরূপে পরিচালিত করার জন্ম অর্থের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। অর্থ-সংগ্রহের জন্ম ডাকাতি করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে প্রমথ মিত্রের সভাপতিত্বে এক গুপ্ত সভায় ডাকাতির প্রশ্নটি আলোচিত হয় এবং শ্রীঅরবিন্দের সমর্থনে স্বদেশী ডাকাতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গভর্ণমেণ্টের টাকা লুঠ করিতে হইলে যে প্রস্তুতি ও শক্তির প্রয়োজন—বিপ্লবীদের তাহা ছিল না ; সুতরাং দেশের লোকের মধ্যেই যাহারা দেশদ্রোহী, গুপ্তচর, মদ্যপ, অত্যাচারী, অসৎপ্রকৃতি, অতিরিক্ত সুদখোর বা অপব্যয়কারী—তাহাদের উপরই ডাকাতি করা হইবে বলিয়া স্থির হইল। আরও ঠিক হইল যে, লুণ্ঠিত টাকার একটি হিসাব রক্ষা করা হইবে এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর লুণ্ঠিত টাকা পুরাপুরি পরিশোধ করা হইবে।

পুলিনবিহারী দাসের দ্বারা পরিচালিত ঢাকার অনুশীলন-সমিতির নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির সময় তৎকালে এই অনুশীলন-সমিতি জনসাধারণকে রক্ষা করার বিষয়ে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছিল এই সমিতির বহু শাখা-প্রশাখা।

স্বদেশী ডাকাতিতেও অনুশীলন-সমিতি দক্ষতার পরিচয় দিল। প্রথম ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইল নারায়ণগঞ্জে। প্রায় হাজারখানেক টাকা লুণ্ঠিত হইলেও বিপ্লবীরা কিন্তু সমুদয় অর্থ লাভ করিতে পারিল না। অন্ধকারে পলায়নের সময় টাকার থলিটি ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় সকল টাকা ছড়াইয়া পড়িল। ফলে পুনরায় সকল অর্থ কুড়াইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহার পর শেখরনগর নামে একখানি গ্রামেও ডাকাতির চেষ্টা হয়। তখন বর্ষাকাল। নৌকাযোগে এক গৃহস্থের বাটীতে হানা দিয়া বহুকষ্টে একটি সিন্দুক নৌকায় আনিয়া তুলিলে নৌকাটি সিন্দুকের ভারে ডুবিয়া গিয়া বিভ্রাটের সৃষ্টি করিল। সে যাত্রাও সামান্য কিছু টাকা লইয়াই বিপ্লবীদের ফিরিয়া আসিতে হয়। আরও দুই একটি ছোট-খাট ডাকাতি এখানে-ওখানে সংঘটিত হইল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুইটি ডাকাতি হইল বড়ঢ়া এবং নড়িয়ায়। ঢাকা জেলার বড়ঢ়া গ্রামে ডাকাতি হয় ১৯০৮ সালের ২রা জুন। অনুশীলন-সমিতির প্রায় ছত্রিশ জন যুবক এই ডাকাতিতে যোগদান করিয়াছিল। মধ্য রাত্রিতে দুইটি নৌকায় চড়িয়া বড়ঢ়া গ্রামে সকলে উপস্থিত হইলে গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বিপ্লবীরা গুলি ছুঁড়িলে তাহারা ভয়ে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। নির্দ্দিষ্ট গৃহের সিন্দুক হইতে টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া নৌকায় তুলিবার সময় দলের নেতা শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক ব্যক্তির দ্বারা সহসা আক্রান্ত হইলেন। আত্মরক্ষার্থ তিনি গুলি নিক্ষেপ করায় আক্রমণকারী লোকটি নিহত হইল। গ্রামের লোকেরা নৌকা দুইটির অনুসরণে বিরত হইল না। প্রাতঃকালেও তাহারা নৌকা দুইখানিকে আক্রমণ করিল এবং নৌকার উপর হইতে বিপ্লবীরা গুলি চালাইলে তাহাতেও কয়েকজন হতাহত হইল। কিছু পরে বন্দুক ও লোকজন সহ নৌকা লইয়া সাভার থানার দারোগা আসিলেন যুবকগণকে ধরিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া। দারোগার গুলিতে দলের একজন প্রাণও হারাইল। অবশেষে দারোগার দলেরও যখন একজন হত ও একজন আহত হইল, তখন অনুসরণ ত্যাগ করিতে দারোগাটি বাধ্য হইলেন।

ইহার পর একটি ষ্টীমলঞ্চ লইয়া পুলিশ পুনরায় নৌকা দুইখানির অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। বিপ্লবীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূর

হইতেই তাহা দেখিতে পাইল। পুলিশের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তাহারা নৌকা দুইখানি পার্শ্ববর্তী একটি খালের মধ্যে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিল। লঞ্চখানি উপস্থিত হইয়া অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বিপ্লবীদের পাত্তা পাইল না। পুলিশের দল প্রস্থান করিলে নৌকা দুইখানি পুনরায় অগ্রসর হইল। দাঁড় টানিয়া সকলেই খুবই ক্লান্ত হইয়াছিল—কাজেই গুণ টানিয়া নৌকা লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। যাহারা গুণ টানিতেছিল তাহাদিগকে সহসা কোন এক স্থানের একদল গ্রামবাসী আক্রমণ করিয়া বসে এবং একজন যুবককে ধরিয়া লইয়া যায়। নৌকার যুবকগণ অতিকষ্টে গিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে। এইভাবে পথে সকলে আরও দুইবার গ্রামবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং বহুকষ্টে শেষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ পায়। যাহা হউক, এই ডাকাতির দ্বারা বিপ্লবীরা প্রায় হাজার ছাব্বিশেক টাকা সংগ্রহ করে।

ঐ সালেরই ৩০শে অক্টোবর তারিখে ডাকাতি হইল নড়িয়ায়। নড়িয়া ফরিদপুর জেলার একখানি গ্রাম। বিপ্লবীরা আশা করিয়াছিল যে, নড়িয়া বাজারে ডাকাতির দ্বারা অন্ততঃ লাখখানেক টাকা পাওয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হইল না। ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বেই টাকা লইয়া সরিয়া পড়ায় আশানুরূপ অর্থ পাওয়া যায় নাই।

ইহার পরই ১৯০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একদিনেই ১৪নং সংশোধিত ফৌজদারী আইন পাশ হইল। এই আইনে হত্যা ও ষড়্যন্ত্রের অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের সরাসরি বিচারের সুবিধা করিয়া লওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি অপরাধের জন্য জুরী বা এসেসর ব্যতীতই হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতি লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চে আসামীদের বিচারের ব্যবস্থা হইল। এই আইনের দ্বারাই বড়লাট সন্দেহবশে যে কোন সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করারও অধিকার পাইলেন।

১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যেই বড় বড় নেতারা হইলেন ধৃত ও কারারুদ্ধ। এই সকল ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পুলিনবিহারী দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি। ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকার অনুশীলন-সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ্‌-সমিতি ও সাধনা-সমিতি, বরিশালের স্বদেশবান্ধব-সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী-সমিতি এবং কলিকাতার অনুশীলন-সমিতি ও আরও অন্যান্য সমিতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইল।

১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে আহ্‌মেদাবাদে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর গাড়ীর নিকট বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই বৎসরেই যশোহরের নাঙ্গলা ষড়্যন্ত্র মামলায় ছয় জনের সাত বৎসর দ্বীপান্তর, তিন জনের পাঁচ বৎসর এবং দুই জনের তিন বৎসর কারাদণ্ড হইল। নদীয়া জেলার হলুদবাড়ী ডাকাতি মামলায় হইল পাঁচ জনের আট বৎসর, একজনের সাত বৎসর এবং একজনের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ।

আলিপুর বোমার মামলায় সরকারের তরফে সাক্ষী সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক কাজ করিয়াছিলেন মৌলভী শামসুল আলম—পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি ছিলেন বিপ্লবীদের সম্বন্ধে গুরুতর তদন্ত কার্য্যে লিপ্ত। বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামক একটি আঠার বৎসরের যুবকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বারপথে ১৯১০ সালের ২৪শে (২৯?) জানুয়ারি তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। বিচারে বীরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়।

ধরা পড়িয়া বীরেন্দ্রনাথ পুলিশের নিকট যে স্বীকারোক্তি করে, তাহাতে সে বলে যে শামসুল আলমকে হত্যা করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) কর্তৃক সে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার ফলে যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চাশজনকে বিভিন্ন স্থান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসে হাওড়া ষড়্যন্ত্র মামলা রুজু করা হইল। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা, ডাকাতি, হত্যার সহযোগিতা ইত্যাদি নানা অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত হইল। হাইকোর্টের সেসনে প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্সের বিচারে ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে হাওড়া ষড়্যন্ত্র মামলা ফাঁসিয়া যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই মুক্তিলাভ করেন।

ঢাকা অনুশীলন-সমিতির পুলিনবিহারী দাসের ধৃত হওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রেপ্তার করার পর তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হইয়াছিল। অবশেষে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইলে তিনি ঢাকায় ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহাকে পুনরায় অস্ত্র আইনে ধৃত করা হইল। শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র-আইন মোকদ্দমা হইতে তিনি রেহাই পাইলেন বটে, কিন্তু আর একটি বৃহত্তর মামলায় জড়িত হইয়া পড়িলেন। এই মামলা ঢাকা ষড়্যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে এই মামলা আনীত হইয়াছিল। পুলিনবিহারী দাস ও অন্যান্য ৪৩ জনের বিরুদ্ধে এই মামলায় যে প্রধান অভিযোগ আনীত হইয়াছিল—তাহা ছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের। পি. মিত্র এই মামলার দায়িত্বভার গ্রহণে আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, সুতরাং মামলা পরিচালিত করিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ঢাকা ষড়্যন্ত্র মামলায় ১৫ জনের সাত হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। পুলিনবিহারী দাসের হইয়াছিল সাত বৎসর কারাদণ্ড। তাঁহাকে পাঠান হইল আন্দামানে।

১৯১০ সালে খুলনা ষড়্যন্ত্র মামলা এবং ১৯১৩ সালে বরিশাল ষড়্যন্ত্র মামলা হইয়াছিল। শেষোক্ত মামলায় ঢাকা সমিতির ২৬ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে অন্তরীণ করিয়া রাখার সিদ্ধান্ত গভর্ণমেণ্টের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী গ্রেপ্তারের পরোয়ানাও বাহির হইয়াছে। এই অবস্থায় ভগিনী নিবেদিতারই পরামর্শক্রমে শ্রীঅরবিন্দ গোপনে পলাইয়া চন্দননগরে গেলেন এবং বিপ্লবী মতিলাল রায়ের বাটীতে কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পর একখানি

ফরাসী জাহাজে চাপিয়া পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইলেন। তদবধি তিনি পণ্ডিচেরীতেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন আছেন।

কতকগুলি হত্যাকাণ্ড ১৯১১ সালেও অনুষ্ঠিত হইল। ফেব্রুয়ারী মাসে একজন হেড কনষ্টেবল শ্রীশ চক্রবর্ত্তী, এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহে বোমার মামলার সাক্ষী মনোমোহন দে, জুন মাসে টিনেভেলীর কালেক্টর অ্যাস সাহেব এবং ময়মনসিংহে পুলিশ ইন্‌সপেক্টর রাজকুমার রায় বিপ্লবীদের হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

এই বৎসরেরই প্রথম দিকে ঢাকা জেলার সোনারং-এ ডাক পিওনের উপর আক্রমণ করার অভিযোগে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষক ও ছাত্রকে এক মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। পাঠশিক্ষা ব্যতীতও এই বিদ্যালয়টিতে লাঠিখেলা, নানাবিধ ব্যায়াম ইত্যাদিরও চর্চ্চা করা হইত এবং ছুতার ও কামারের কাজও ছাত্রদিগকে শিখান হইত। পূর্ব্ব হইতেই এই বিদ্যালয়টিকে পুলিশ সুনজরে দেখিত না। যাহা হউক, যে মামলাটি রুজু হইয়াছিল, তাহাতে সাতজন দণ্ডিত হইলেন। এই মামলায় সরকার পক্ষের তিন জন সাক্ষী ১১ই জুলাই তারিখে উক্ত গ্রামেই নিহত হইল।

মনোমোহন ঘোষ নামক পুলিশের একজন ইন্‌সপেক্টরকে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বরিশালে হত্যা করা হয়। ১৯১১ সাল হইতেই গুপ্ত বিপ্লব-আন্দোলন পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যেই অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশের মত পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশেও বিপ্লবী মনোভাব বিস্তারলাভ করিতেছিল। ১৯০৭ সালের কিছু পূর্ব্ব বা পর হইতেই ঐ দুইটি প্রদেশেও আন্দোলনের প্রসার ঘটিতেছিল। স্বামী দয়ানন্দের আর্য্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন পাঞ্জাবের তরুণ সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্ত্তীকালে পাঞ্জাবের লায়ালপুর, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি ইত্যাদি স্থানসমূহে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রচারকার্য্য ও তাহাদিগকে অপমান করা প্রভৃতি চলিতে থাকে। রাজদ্রোহকর বিষয় প্রকাশের অপরাধে "ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর এবং "পাঞ্জাবী" পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হইলেন। ভূমি-সংক্রান্ত আইন ও জমির খাজনাবৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারে শিখগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন এবং পুলিশ ও সৈন্যবিভাগ হইতে শিখদিগের চাকুরী ত্যাগের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। চারিদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতেই লাগিল। রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য হিন্দু-নেতা লালা লাজপৎ রায়কে ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত করা হয় ১৯০৭ সালের ৯ই মে। শিখ-নেতা সর্দ্দার অজিত সিংহও ঐ একই আইনে কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত হইলেন। দেশান্তরিত হওয়ার মাস ছয়েক পরে সর্দ্দার অজিত সিংহ পলাইয়া প্রথমে পারস্যে যান, তথা হইতে পরে তিনি ইউরোপ গমন করেন। বোমা তৈয়ারীর প্রণালী সম্বন্ধীয় পুস্তক ইত্যাদি রাখার অপরাধে ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত করা হইল ভাই পরমানন্দকে। শান্তিভঙ্গ না করিয়া সদ্ভাবে জীবন-যাপনের সর্ত্তে মুচলেকাবদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলায় জড়িত হইয়া পরবর্ত্তীকালে ভাই পরমানন্দ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ভারতের বড়লাট তাঁহার মৃত্যুদণ্ড মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেন। আরও পরে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

যুক্তপ্রদেশে ১৯০৭ সালে শান্তিনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির দ্বারা "স্বরাজ্য" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদ্রোহে উৎসাহদানমূলক প্রবন্ধাদি এই পত্রিকাটিতে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। ইহার ফলে শান্তিনারায়ণ দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পর আরও নূতন নূতন সম্পাদক আসিয়া ঐ একই ভাবে কারাদণ্ড বরণ করিতে লাগিলেন, তথাপি "স্বরাজ্য"-পত্রিকায় বিদ্রোহ-প্রচার বন্ধ হইল না। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "কর্ম্মযোগীন্"-সংবাদ-পত্রটিও রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের ত্রুটি করিত না। ১৯১০ সালে নূতন মুদ্রাযন্ত্র আইনের কবলে পড়িয়া দুইখানি সংবাদপত্রের প্রচারই বন্ধ হইয়া যায়।

বঙ্গদেশ হইতে বহু বিপ্লবী কাশী গিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহাদের দ্বারা ১৯০৮ সালে "অনুশীলন-সমিতি ও তরুণ-সঙ্ঘ" স্থাপিত হয়। কাশী বাঙ্গালী-টোলার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সমিতির প্রধান নেতা।

ক্ষুব্ধ ভারতীয় জনমতকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিবার জন্য এদিকে ১৯০৯ সালের ২৫শে মে তারিখে নূতন ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ-আইন বিলাতের পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল। কতকগুলি বিষয়ে এই আইনটি পূর্ব্ববর্ত্তী আইনগুলি অপেক্ষা সামান্য প্রগতিশীল হইলেও জনসাধারণের দাবী মিটাইবার পক্ষে ইহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। তাহার উপর আবার ইহাতে পৃথক্ নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদের জাতীয় সংহতিতে ভাঙ্গন ধরাইবার চেষ্টা করা হইল।

বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যেন উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। উক্ত বিভাগ রদ্ করিয়া জনমতের দাবী স্বীকার করিয়া লইতেও তাঁহাদের বাধিতেছিল—অথচ উহা উপলক্ষ্য করিয়া যে প্রকাশ্য ও গুপ্ত আন্দোলন পরিচালিত হইতেছিল, তাহা দমন করিবার মত পর্য্যাপ্ত ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। এই অবস্থায় রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতবর্ষে আগমন করিলেন এবং দিল্লীতে একটি দরবার হইল। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর এই দরবারের অনুষ্ঠান হয় এবং তাহাতে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের একটি রাজকীয় ঘোষণায় কৌশলে বঙ্গ-বিভাগ বাতিল করিবার ব্যবস্থা হয়। উহাতে ঘোষিত হইল যে, কয়েকটি প্রদেশের সীমা নূতন করিয়া পুনরায় নির্ণয় করা হইবে। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্তও ঐ সময় ঘোষণা করা হইল।

যাহা হউক, এইভাবে দিল্লীর দরবারে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যাপারে লর্ড মর্লির পূর্ব্বঘোষিত *settled fact* যখন *unsettled* হইয়া গেল, তখন ১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ্ তদনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হইলেন। বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক্ করিয়া একটি আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি করা হইল; পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ একত্রিত হইয়া গঠিত হইল একটি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ; আসামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার শাসনভার একজন চীফ কমিশনারের উপর অর্পণ করা হইল। ভারতের রাজধানীও ঘোষণামত স্থানান্তরিত হইয়া গেল দিল্লীতে।

নূতন রাজধানীতে প্রবেশের দিন স্থির হইল ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। ঐদিন মহাসমারোহে শোভা-যাত্রা করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় অবস্থায় বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ্ চলিলেন নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করিতে, কিন্তু অকস্মাৎ যেন কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হইল স্বয়ং বড়লাটের উপর। লর্ড হার্ডিঞ্জ্ সেই বোমার আঘাতে সামান্য আহত হইয়া বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একজন আর্দ্দালী নিহত হইল।

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসেই ঢাকায় পুলিশের হেড্ কনষ্টেবল রতিলাল রায়কেও বিপ্লবীদের হস্তে প্রাণ দিতে হয়। ১৯১৩ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীহট্টে মিঃ গর্ডনকে হত্যার চেষ্টা করা হইল। এই বৎসরেই মে মাসে লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে যে বোমা বিস্ফোরিত হয়, তাহাতে একজন আর্দ্দালীর জীবনাবসান ঘটে।

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ এবং লাহোরে বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপার লইয়া পরবর্ত্তীকালে দিল্লী ও লাহোর ষড়্যন্ত্র মামলা নামে দুইটি মামলার সৃষ্টি হইয়াছিল। দীননাথ নামে একজন আসামী রাজসাক্ষী হইয়া দাঁড়ায়। আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ এবং বসন্ত দাসের ফাঁসির আদেশ হইল। কয়েকজনের হইল কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড।

আর এক ব্যক্তি, যাঁহার ফাঁসির আদেশ দেওয়া হইল বটে, কিন্তু পুলিশ যাঁহার কোনও সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না—তিনি হইলেন চির-বিদ্রোহী রাসবিহারী বসু। সরকারী মতে এই রাসবিহারীই ছিলেন পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের অধিনায়ক। বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপের পর হইতেই দেরাদুন Forest Research Institute-এর হেড্ ক্লার্ক রাসবিহারী বসু নিরুদ্দিষ্ট হইলেন।

এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত করার পর রাসবিহারী এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন কাশীতে। শচীন্দ্র সান্যালের বিপ্লবী-সমিতির সহিত সেখানে তাঁহার যোগাযোগ স্থাপিত হইল। উক্ত সমিতির সদস্যগণকে রাসবিহারী বোমা ও রিভলবার ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপারের সংস্রবে একদিন তাঁহাকে নিজেকেই আহত হইতে হইল। যাহা হউক, বিষ্ণু গণেশ পিংলে নামে পুণার একজন মারাঠি যুবক এবং সত্যেন্দ্র সেন নামে একটি বাঙ্গালী যুবক এই সময় ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে একদিন

বিষ্ণু গণেশ পিংলে

আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। পিংলে পরে কাশীতে চলিয়া গেলেন এবং সত্যেন্দ্র রহিয়া গেলেন কলিকাতাতেই। পিংলের সহিত শচীন্দ্র সান্যাল ও রাসবিহারীর পরিচয় হইল। পিংলের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, গদর-দলের বহু শিখ বিপ্লব বাধাইবার জন্য আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়াছে এবং শীঘ্রই আরও আসিবে। রাসবিহারী তাহাদের বোমা তৈয়ারীর প্রণালী শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবার আশ্বাস দিলেন। (ক্রমশঃ)

দেহারতি

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

দেহ করিয়াছি প্রেম মন্দির দেবতা পূজার লাগি,
পরাণে জ্বেলেছি পঞ্চপ্রদীপ, জীবন ভরিয়া জাগি!
প্রীতি-ফুল রাখি' জীবন আলায়,
অশ্রু-মুকুতা গাঁথিয়া মালায়,
ব্যথা-বেদনায় চন্দন করি তোমার দরশ মাগি,

কামনা বাসনা ধূপ হ'য়ে জ্বলে অভিমান গেছে ভাসি'!
পূজার অর্ঘ্য করে নেবে প্রিয় দু'হাতে বাড়ায়ে আসি'!
পূজারী কাঁদায়ে তুমি কাঁদ জানি,
জান তুমি মোর অন্তর খানি,
দেহ মন সব জ্বলে হোমানলে তোমারি পূজার লাগি!

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাজনগর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা গেল বটে কিন্তু, রাজনগরের কোনও চিহ্ন নেই। ধূ ধূ করছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে জঙ্গলও চ'খে পড়ে। রাজনগর ঘাটেই একদা বিখ্যাত 'নওচৌকী' ছিল। অর্থাৎ তিন মাইল প্রশস্ত বাঁধের উপর পর পর সমান্তরালে ন'টি সুদৃশ্য সিংহাসন তুল্য চবুতারা ও ঘাট নির্ম্মিত হয়েছিল। সেই নওচৌকীর অধিকাংশই আজ ভেঙে পড়ে গেছে। মাত্র তিন চারটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে।

দেখে মনে হ'ল, একসময় সম্ভবতঃ রাজনগর প্রাসাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এই ন'চৌকী। উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল এই ঘাট। ঘাটের সংলগ্ন বিশাল রাজোদ্যান ছিল। প্রাসাদ ভেঙে পড়েছে, কিন্তু উচ্চ প্রাচীর ও তোরণ দ্বার এখনও আছে। আমরা টংগা থেকে নেমে সেই তোরণ দ্বার দিয়েই রাজনগর ঘাটের ন'চৌকী দেখতে এসেছিলুম।

প্রত্যেক চৌকী বা মর্ম্মর-সিংহাসন অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত শ্বেত পাথরে তৈরী। আবু পর্ব্বতের দিলবারা মন্দিরে যেরকম কারুকার্য্য করা মর্ম্মর খিলান দেখে এসেছি প্রত্যেক চৌকীতে প্রবেশের মুখে ঠিক সেই রকম কারুকার্য্য করা মর্ম্মর তোরণ আছে। সেই তোরণের ভিতর দিয়ে প্রশস্ত চবুতারা পার হয়ে এক একটি চৌকীতে যাওয়া যায়। চৌকীগুলি একেবারে জলের উপর তৈরী। অর্থাৎ তার তিনদিকেই রাজসমুদ্রের চঞ্চল তরঙ্গ এসে ক্ষণে ক্ষণে আছ্‌ড়ে পড়ছে। প্রত্যেক চৌকীটি বেশ প্রশস্ত। দিলবারার নাটমন্দিরের মতো চারিদিকে দ্বাদশ স্তম্ভের উপর মর্ম্মর ছত্রযুক্ত এক একটি চৌকী। প্রত্যেক দিকে তিনটি করে স্তম্ভের উপর তিনটি তিনটি খিলান আছে। প্রত্যেকটি স্তম্ভের মূল হ'তে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত। তোরণশীর্ষে ও ছত্রতলে অগণিত দেবদেবী তাদের বাহন সমেত, কত অপ্সর কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর নর্ত্তক নর্ত্তকীর রমণীয় মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। মনে হয় এ যেন পাথর কেটে পাষাণ কুঁদে তৈরী নয়—মর্ম্মর পাথরের মতো দেখতে শাদা নরম মাটির ডেলা নিয়ে মূর্ত্তি-শিল্পীরা আপন ইচ্ছামতো অতি অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দ প্রয়াসে এইগুলি গড়ে গেছে! ভাস্কর্য্যশিল্পের এমন সূক্ষ্ম সুচারু নিদর্শন—তক্ষণকারুর এমন রম্য কলা—এক দিলবারার প্রসিদ্ধ জৈন মন্দির ভিন্ন আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। সারাদিন ধরে এক একটি চৌকীর কারুকার্য্য দেখেও আশ মিটবে না এমনিই অপরূপ সেই মর্ম্মর শিল্প। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার—তাদের সূক্ষ্ম চারুকলাবোধ ও

উদয় সরোবরে

শিল্পরসানুভূতি যে কত উচ্চস্তরে গিয়ে পৌঁচেছিল এগুলি দেখতে দেখতে কেবলই সেই অতীত গৌরব স্মরণ ক'রে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল।

সমস্ত মন আনন্দে ভরে নিয়ে রাণা রাজসিংহের ভগ্নপ্রাসাদ সসম্ভ্রমে ঘুরে দেখে আমরা ফিরে এলুম টংগায়। আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবু আসতে হ'ল। শ্রীমতী রাজসাগরে পা ডুবিয়ে আর ভাবসাগরে মন ডুবিয়ে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। তাঁর বান্ধবীর বোধকরি গতজন্মের স্মৃতি সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। তিনি তার গরদের সাড়ী পরেই—'সাগর জলে সিনান করে' নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না।

ফেরবার পথে পড়লো পাহাড়ের চূড়ায় নির্ম্মিত জৈনমন্দির। কিন্তু মন আমাদের এমন ভরে উঠেছিল যে কেউ আর পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে জৈনমন্দির দেখতে গেল না, কারণ শোনা গেল ওটি খুব প্রাচীন নয়। শিবমন্দিরের সামনে এসে বুড়ো যখন শয়তানীকে দাঁড় করালে, লোভ হ'ল দেখে আসবার। কৈলাস চূড়ার মতো একটি শৈলশৃঙ্গে এই প্রাচীন শিবমন্দির, কিন্তু বেলা তখন বেড়ে উঠেছে। সঙ্গে ছাতা নেই। বুড়ো বললে পাহাড়ে চড়তে আর নামতে অন্ততঃ দেড়ঘণ্টা সময় লাগবে। অগত্যা দূর থেকে "শিবায় নমঃ" বলে আমরা মোহন্তর বাগীচা আর চিড়িয়াখানা দেখতে গেলুম। দুইই ছেলেখেলা বলে মনে হ'ল। সেখান থেকে একটু বাজার ঘুরে কিছু সওদা করে আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরে এলুম। বেলা তখন প্রায় দুটো হবে। মোহন্তর বাড়ী থেকে প্রসাদ এসে চাপা দেওয়া রয়েছে। স্নানাহার সেরে নিয়ে একটু বিশ্রাম করে শেষবারের মতো মন্দিরে গেলুম। দ্বারকানাথজীর মন্দিরের মধ্যে আশেপাশে আরও দু তিনটি মন্দির আছে, দ্বারকানাথ একা নেই। মথুরানাথ, সীতারাম, গোবিন্দজী অনেকেই সুযোগ বুঝে পুজোপাবার লোভে ভীড় করেছেন সেখানে। সবারই বেশ বোল বোলাও দেখা গেল।

জগনিবাসের ভিতর—পিছনদিকের বাগান

বুড়োকে বলে দিয়েছিলুম তার শয়তানী তুফানীকে নিয়ে এবং সেই সঙ্গে আর একখানি ভাল টংগা নিয়ে এসে আমাদের যেন ঠিক সময়ে কাঁকরৌলী ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিয়ে দেয়। কারণ, আমরা ট্রেণে উদয়পুরে ফিরবো স্থির করেছিলুম।

বুড়ো ঠিক সময়ে গাড়ী এনে হাজির। ম্যানেজার লোকজন দিয়ে আমাদের জিনিসপত্র সব গাড়ীতে তুলিয়ে দিলেন। তাঁর ভিজিটার্স বুকে আমাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর আদায় করলেন, আর আদায় করলেন আমাদের সঙ্গের খালি সুগন্ধি কেশ তৈলের শিশি, চাটনীর বোতল, বিস্কুটের টিন ও সিগারেটের কৌটো। এসব আধার ও পাত্র নাকি এখানে দুষ্প্রাপ্য! আমরা খুসী হয়েই তাঁকে সব দিয়ে এলুম। মোহন্ত মহারাজের জিনিসপত্রগুলি ফেরত দেবার ভারও তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা 'জয় দ্বারকানাথজী' বলে বেরিয়ে পড়লুম

উদয়পুর প্রাসাদ ও দুর্গ
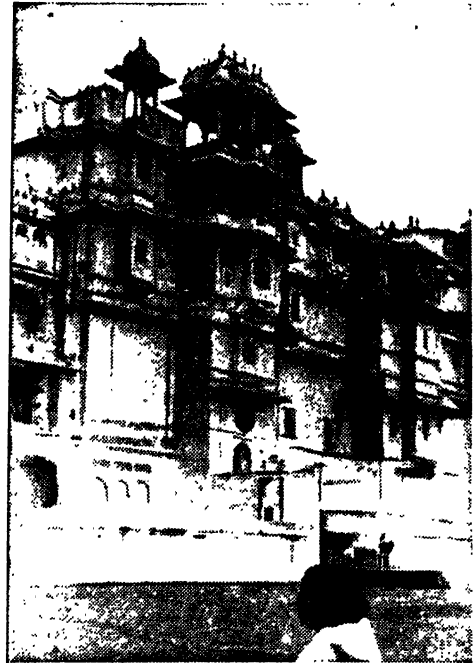
কাঁকরৌলী ষ্টেশনের প্লাটফর্মে এসে দেখি—গাড়ী আসবার দেরী আছে। অগত্যা ওয়েটিংরূমে আশ্রয় নেওয়া গেল।

(কাঁকরোলি—উদয়পুর—চিতোর গড়)

কাঁকরোলি থেকে উদয়পুরগামী যে গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম আমরা সেখানি বেশ ফাঁকা ছিল। প্রশস্ত এক সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টের দুটি বেঞ্চে মাত্র দুটি লোক আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিলেন। ভাবলুম, আমরা বোধহয় ভুল ক'রে কোনও রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়েছি। কিন্তু গাড়ীর সর্ব্বাঙ্গ খুঁজেও কোথাও তার সে পরিচয়-পত্র আঁটা আছে দেখলুম না। মনে হ'ল, তবে বোধ করি এঁরা

'শোয়া টিকিট' (!) কিনে আসছেন? শোয়া টিকিটের গল্পটা মনে পড়ে গেল। একটি আধাবয়সী প্রৌঢ়া মহিলা একবার গয়া কাশী হ'য়ে প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে মথুরা বৃন্দাবন অভিমুখে যাচ্ছিলেন। একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের একটি গোটা বেঞ্চি জুড়ে তিনি তাঁর বিছানা ও সংসার পেতে নিয়ে চলেছিলেন। গাড়ীতে খুব ভীড় হয়েছিল। এক ভদ্রলোক অনেকগুলি মেয়েছেলে নিয়ে মাঝের একটা ষ্টেশন থেকে সেই গাড়ীতেই উঠলেন। জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। তীর্থ যাত্রিণী সেই প্রৌঢ়া মহিলাটির ভ্রূক্ষেপও নেই। তিনি একলা গোটা বেঞ্চিটা জুড়ে আছেন। কাজেই তাঁকে বলতে হ'ল—আপনি দয়া করে আপনার সংসার গুটিয়ে নিয়ে এক পাশে সরে বসুন। এঁদের বসতে জায়গা দিন।

ভদ্র মহিলা একেবারে রেগে ফোঁস্ ক'রে উঠলেন। কী? যত

শৈলাবাগের অভ্যন্তরে

বড় মুখ নয়—তত বড় কথা! আমাকে সরে বসতে বলা? স্পর্দ্ধা তো কম নয়! জানো আমি কে? আমার ছেলে রেলের বড়বাবু! আমাকে সরিয়ে দেবার তোমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই! আমার ছেলে আমাকে 'শোয়া টিকিট' ক'রে দিয়েছে।

বুঝলুম, তাঁর ছেলে রেলের বড় চাকরে, হয়ত' মায়ের জন্ম একটা 'বার্থ-রিজার্ভ' করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু, সে অধিকার তো ইনি রাত ন'টার আগে খাটাতে পারেন না। কাজেই তাঁর জিনিসপত্র ডেয়ো-ঢাকনা একপাশে সরিয়ে দিয়ে একরকম জোর করেই ওঁদের বসতে হয়েছিল। এখানে আমি ঘড়ি খুলে দেখলুম তখনও সাতটা বাজেনি। আমরা ৯টার আগেই উদয়পুরে নেমে যাবো। সুতরাং, আমাদের বসবার জন্ম জায়গা ছেড়ে দিতে এঁরা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

কিন্তু, মুস্কিল হ'লো—ওদের গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে তুলবে কে? এত আওয়াজেও যখন ঘুম ভাঙেনি, তখন ধাক্কা দেওয়া ছাড়া তো' উপায় নেই! অথচ কম্বল মুড়ি দেওয়া জীব দুটিকে আমরা ছুঁতে পারছিনি, কারণ, যদি স্ত্রীলোক থাকেন ওর মধ্যে! আবার শ্রীমতীরাও ভরসা পাচ্ছেন না—যদি কম্বলের ভিতর থেকে ইয়া গালপাট্টা চাপদাড়ি গর্জ্জনসিংরা কেউ বেরিয়ে পড়েন! শেষে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে নাবালিকা নবনীতাকে লেলিয়ে দেওয়া হ'ল। সে একটা মজার কাজ পেয়ে মহা উৎসাহে লেগে গেল।

প্রথম কম্বলের স্তূপটিকে আক্রমণ করতেই শ্রীরামচন্দ্রের পদ-স্পর্শে পাষাণ খণ্ড যেমন শাপমুক্তা গৌতম-পত্নী অহল্যা সুন্দরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল, তেমনি কালো কম্বলের সাবরণ ভেদ ক'রে এক সুন্দরী অপ্সরীর আবির্ভাব ঘটলো!

দুর্গাভ্যন্তরের ভগ্নাবশেষ

পরিচয়ে জানা গেল তিনি বিকানিয়ার ষ্টেটের রাজনটী। চলেছেন উদয়পুর দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে। তিনি যেমনি রূপসী তেমনি সুকণ্ঠী, তাঁকে বিনয় ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের আদর্শ প্রতিমূর্ত্তিও বলা চলে। যথা সম্ভব সরে বসে তিনি মেয়েদের বসবার জন্ম জায়গা করে দিলেন। তাঁর সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করার যে অপরাধ হয়েছিল তার জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বললেন—গাড়ীতে কথা বলার মতো কোনও সঙ্গী না থাকায় অগত্যা...ইত্যাদি। ইসারায় তাঁকে অপর বেঞ্চের কম্বলের মোড়কটি দেখিয়ে দিতেই, তিনি মধুরহাস্তে তাঁর সদ্য-ঘুমভাঙা-মুখখানি উজ্জ্বল করে তুলে, নিদ্রালস নয়নে এক মদির কটাক্ষ হেনে নিম্নস্বরে বললেন—বেচারা বেনিয়া শেঠ! বাজারকি ভাও বেগর আওর কুছ নেহি জানতে!

হো হো শব্দে আমরা সমবেত কণ্ঠে অট্টহাস্য করে উঠলুম, কম্বলের মোড়কটি কিন্তু তখনও অসাড় নিস্পন্দ! বাবাজী এবার বীর

বিক্রমে সেটিকে আক্রমণ করলেন। কারণ, আমি কিছুতেই ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে তুলতে রাজী হই নি। ও সম্বন্ধে আমার বেশ একটু দুর্ব্বলতা আছে। এবার কম্বল থেকে বেরুলেন এক পাক্কা মাড়োয়ারী ব্যবসাদার। তবে ভদ্রলোকের মেজাজটা ভালো। সহসা তাঁর উপর আমাদের এই হায়দ্রাবাদী রাজকার অত্যাচার সত্বেও তিনি একটুও চটলেন না। নীরবে শান্ত ভাবে উঠে বসলেন। তাঁর দুই চখে ভ্রূকুটি-পূর্ণ বিরক্তির কোনও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়নি। বয়স হয়েছে ভদ্র লোকের। আমরা দু'জন তাঁর বেঞ্চি খানাকে 'পুরুষ দিগের জন্ত' করে নিয়ে বসে পড়লুম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে দেখে রাজনটী রজনীর প্রসাধনে মনোনিবেশ করলেন। চুলখুলে চুল আঁচড়ে সযতনে আবার কবরী রচনা করলেন।

জীর্ণ জৈনমন্দির
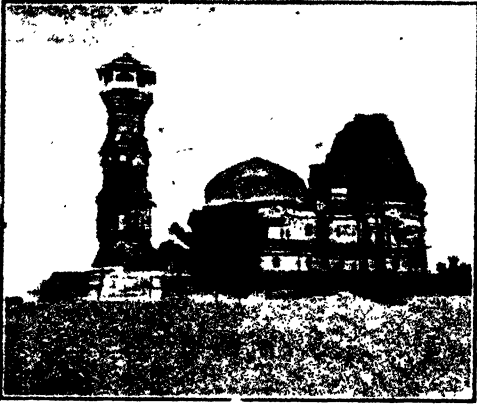
তারপর, স্যুটকেস খুলে শাড়ী ব্লাউস তোয়ালে সাবান টুথব্রাশ মাজন প্রভৃতি নিয়ে গজেন্দ্র গমনে বাথরুমের মধ্যে অদৃশ্য হলেন। বহুক্ষণ পরে যখন বেরিয়ে এলেন তখন আর তাঁকে চেনা যায় না! দক্ষ হাতের নিপুণ প্রসাধনের গুণে রূপসী সুন্দরী একেবারে অপরূপ হয়ে এসেছেন। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হয়েছেন এবার। উজ্জ্বল গৌরবর্ণা দীর্ঘ-তনু তন্বী তরুণী, রাজা মহারাজাদের প্রমোদ-প্রাসাদে আনন্দ-সভায়-নৃত্য গীতের নর্ম্ম বাসরে-এঁকে যে এতটুকুও বেমানান বোধ হবে না এটা বেশ বোঝা গেল।

মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হলেন। হিন্দু মেয়ের হাজার হাজার বছরের প্রকৃতিগত সংস্কার বাধা হয়ে উঠলো। পণ্যানারীর সঙ্গে তাঁরা কেউ বাক্যালাপ করতে রাজী হলেন না। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে 'হাঁ' বা 'না' এইরকম দু'চারটি 'মনোসিলেবল্' মাত্র উচ্চারণ করেছিলেন তাঁরা। বাস্! তারপর চুপ! একেবারে যাকে বলে ঠোঁটে চাবী। কাজেই তাঁর আলাপের সমস্ত ধাক্কাই শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই সামলাতে হ'ল। তাঁর আত্মজীবনী যা শোনালেন তার সারমর্ম্ম হ'চ্ছে তিনি পঞ্চনদের হিন্দু কন্যা। লাহোরেই তাঁর বাস। সেইখানেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর থেকে যৌবন সমাগম পর্য্যন্ত আনন্দে কেটেছিল। তিনি লাহোরে কোন ইংরাজ মিশনারী স্কুলে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পর্য্যন্ত পড়েছিলেন। কাশ্মীরের মহারাণী তাঁর সহপাঠিনী। তাঁদের সে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। প্রায়ই কাশ্মীরে এঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান তিনি। রাণীর প্যালেসেই থাকেন। রাণী নাকি তাঁর বিবাহে সুখী হ'তে পারেন নি। রাজনটীর কাজ তাঁর বংশগত পেশা নয়। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিদুষী মেয়ে। সখ ক'রে নিয়েছেন এই কাজ। বিকানীয়ার ষ্টেটের বেতনভুক্ত নর্ত্তকী তিনি। স্বাধীনভাবে কোনও আসরে তাঁর নৃত্যকলা প্রদর্শনের অধিকার নেই। বিকানীয়ারে তিনি খুব সম্মানের উপর আছেন। তিনি তাঁর বর্ত্তমান জীবনে খুব সুখী। কোনও দায়িত্বভার নেই কাঁধের উপর। নির্ব্বিঘ্নাটে তাঁর আরাধ্যা কলালক্ষ্মীর সেবা করবার সুযোগ পান!
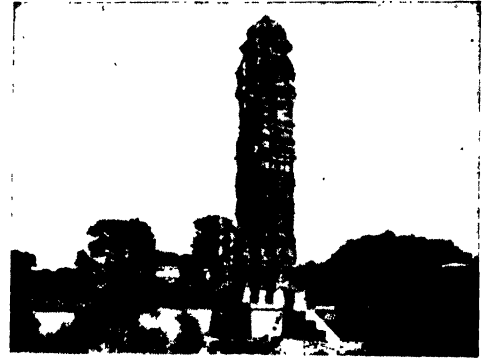
রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ

তাঁর কাছে সেদিনের ইংরাজী সংবাদপত্র 'হিন্দুস্থান টাইমস্' রয়েছে দেখে পড়বার জন্ত চেয়ে নিলাম। তিনি ততক্ষণ তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে প্রসাধনে 'রিটাচ্' দিতে ব্যস্ত হলেন।

উদয়পুরে নামবার সময় হয়ে এল। গাড়ী আজ একঘণ্টা লেট রাণ করছে। ৯টায় পৌছবার কথা, দশটা বেজে গেল। মাড়োয়ারী শেঠজী উদয়পুরের দু'এক ষ্টেশন আগেই নেমে গেলেন। তাঁর পিছু পিছু দুই বেঞ্চের তলা থেকে অনেকগুলি চটের বস্তাবন্দী হরেক চীজ নামলো। তিনি চলে যাবার পর রাজনর্ত্তকী হেসে বললে—'কাষ্টাম ডিউটি' আর 'অক্ট্রয়' ফাঁকি দেবার জন্ত বেনিয়াকা বাচ্চা আগেই ভাগলো। বুঝলুম রাজা থেকে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলকে ফাঁকি দেওয়াটাই এঁদের ব্যবসার রীতি। বিকানীয়ার মরুভূমিতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিতা এই পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলটিকে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি উদয়পুরে গিয়ে কোথায় উঠবেন? তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—'বিকানীয়ার ক্যাম্পে' থাকবো। মহারাজার এডিকং আমাকে ষ্টেশনে নিতে আসবেন। আমি তিন চারদিন মাত্র এখানে আছি। তারপর AIRএ বিকানীয়ায় ফিরে যাবো। সম্ভবতঃ মহারাজার প্লেনেই ফিরবো। আপনারা যদি বিকানীয়ারে বেড়াতে

যান, আমার কাছে আসবেন, নিমন্ত্রণ রইল। আমি তাঁকে এই অনুগ্রহের জন্ত ধন্তবাদ জানালুম।

উদয়পুর ষ্টেশনে খাঁকি স্যুটপরা ছুটি যুবক রাজনটীকে নিতে এসেছেন দেখলুম। তিনি বেশ সুষ্ঠু ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে আমাদের গুডবাই করে চলে গেলেন। আমরাও অবশ্য তাঁর পিছু পিছুই নামলুম। কিন্তু ষ্টেশনে যাত্রীর জনতার ভীড়ে তাঁকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

পরদিন সকালে—বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা হবে, ফতে-মেমোরিয়্যালের বারান্দা থেকে আমার স্ত্রী নিম্নস্বরে ডেকে বললেন "শীগ্‌গির একটা মজা দেখবে এসো।" ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর নির্দেশ মতো চেয়ে দেখি—সেই গত রজনীর বাসবদত্তা ফতেমেমোরিয়্যালের নীচেকার একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে সেই ছুটি য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে শোভিত যুবকের সঙ্গে কোথায় নিক্রান্ত হচ্ছেন!

কাশ্মীরের মহারাণীর যিনি সহপাঠিনী সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পড়া—লাহোরের সম্ভ্রান্ত ঘরের যিনি মেয়ে—তাঁর এই অধঃপতন দেখে দুঃখিত হলেও আমি বিস্মিত হইনি একটুও। কারণ নারী যে ছলনাময়ী এ প্রাচীন ঋষিবাক্য তো স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অবশ্য এ হেন অভ্রান্ত সত্যও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর থেকে একেবারে মন্ত্রগুপ্তির মতোই চেপে থাকতে হয়েছে! মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবার আর সাহসে কুলায়নি। সুতরাং আজও সেটা এখানে স্বগোতোক্তিই হয়ে রইলো। বিবাহ অনেক বলিষ্ঠ মানুষকেও ভীরু করে তোলে! বিশেষ আবার যাঁদের পত্নীভাগ্য ঈর্ষাযোগ্য; নয় কি?

মীরাবাঈয়ের গিরিধারী মন্দির (মন্দির পাদপীঠে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি-শিল্প ও কারুকার্য্য অনুপম সুন্দর)

এর পর আমাদের উদয়পুরের ইতিহাস বড় করুণ। একের পর এক আমরা অসুখে পড়ে শয্যা নিয়েছি এবং উদয়পুর ষ্টেট হস্‌পিট্যালের খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত পি কে মাথুর সাহেব এসে আমাদের চিকিৎসা করে একে একে সারিয়ে তুলেছেন। দীর্ঘ দশদিন কেটে গেল আমাদের এই পালা করে ভুগতে। ডাক্তার মাথুরকে না পেলে আর কতদিন ভুগতে হ'ত কে জানে? অদ্ভুত সুদক্ষ চিকিৎসক এই ডাক্তার মাথুর। ধীর স্থির শান্ত এবং বুদ্ধি ও প্রতিভায় প্রদীপ্ত এই যুবক জীবক। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিদেশে প্রবাসে এমন ভদ্র ও পরোপকারী চিকিৎসক বন্ধু পাওয়া একটা দুর্লভ ভাগ্য বলে মনে করি। তাঁর সুচিকিৎসায় আমরা সকলে সুস্থ হয়ে ওঠবার পর একদিন তিনি আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর কিশোরী কন্যা আমাদের অনেকগুলি গান শোনালেন। ডাক্তারের সাদর আতিথ্যে আমরা সেদিন পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলুম।

এরই মধ্যে আমরা উদয়পুরের বাকী যা কিছু প্রধান দ্রষ্টব্য তা সত্বর দেখে নিলুম। উদয় সরোবর, সজ্জন গড়, জগমোহন প্রাসাদ, উদয়পুর দুর্গ, শৈলাবাগ, মীরা বাঈয়ের গিরিধারী মন্দির প্রভৃতি দেখা শেষ করে আমরা ব্যস্ত হয়ে 'চিতোর গড়' দেখবার জন্ত উদয়পুর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। কৈলাশপুরী, কুম্ভগড়, চারভুজ, রিখাব দেওজী এবং জয়সমুদ্র প্রভৃতি দেখে যাবার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলিয়ে উঠলোনা। 'মোটর' পেলে হয়ত যাওয়া যেতো। কিন্তু অসুখে ভুগে দুর্ব্বল শরীরে বাসে ও টংগায় ঘুরতে আর কারুর ইচ্ছে হ'ল না। "দিল্লী চলো"র মতো 'চিতোর চলো' বলে ছুটলুম। সকালের ট্রেণে উদয়পুর থেকে সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে আমরা চিতোরগড়ে গিয়ে পৌঁছলুম প্রায় বেলা ১২টায়। ওয়েটিংরূমে না ঢুকে একেবারে সোজা রেলওয়ে রিটায়ারিং রূমে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া গেল। কারণ, সারাদিন সারারাত এখানে কাটাবার ইচ্ছে। রিটায়ারিং রূম বলতে মাত্র দুখানি ঘর। একখানি বড়ো—'ডবল-বেড' আর একখানি ছোট—সিংগ্‌ল-বেড। ছোট ঘরখানি বাবাজী দখল করলেন। বড় ঘরখানিতে আমরা অধিষ্ঠিত হলুম। পার্শ্বে ছিল রিফ্রেশমেণ্টরূম। বাবুর্চ্চিকে ডেকে আমাদের 'লাঞ্চ' অর্ডার দিলুম। বেচারা সবিনয়ে জানালে—'চাউল' নেই হুজুর!'

জানতে চাইলুম কি দিতে পারবে খেতে? বললে—রুটি, স্যালাড, ডিম, ফাউল কারি, মটন কোর্ম্মা, দোপেঁয়াজী, চাটনি, পুডিং বা দই। আমরা সবাই তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। বললুম—যা পারো মিঞা সাহেব চট্‌ পট বানিয়ে দাও। আমাদের চার জনের মতো। কারণ, নবনীতা ছিল ফাউ! কড়িংয়ের মতো চেহারা, পয়সা কড়িংয়ের মত

খাওয়া। আমাদের কজনের পাত্ থেকে নিয়ে চাকতে চাকতে ওর পেট ভরে যায়। ভোলানাথকে দেওয়া হল, বাজার থেকে পুরি তরকারি বা ডালভাত খেয়ে আসবার জন্য। এখানে ভাত মাথা খুঁড়লেও পাবে না জানি। সারা রাজপুতানা অন্নহীন। তবে গেঁহু, ছতুয়া, বাজরার অভাব নেই। পুরি তরকারি আর খাট্টা (চাটনি) দধি দুগ্ধও যথেষ্ট মেলে।

স্নানপর্ব্ব সেরে আহার করতে প্রায় ৩টে বাজলো। চিতোরগড়ের রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বাবুর্চির রান্না অতি উপাদেয়। বুড়ো মানুষ কিনা, পাকা হাত। খেয়ে তৃপ্তি হল খুব। যা যা ও দিতে পারবে বলেছিল, সবগুলিই রেঁধে দিয়েছিল। এত চমৎকার ডিমের কারি ইতিপূর্ব্বে আমরা আর কোথাও খাই নি। দু' রকম মাংসই খুব সুস্বাদু হয়েছিল।

খাওয়ার পর আর বিশ্রাম করবার অবকাশ পাওয়া গেল না। চিতোর

চিতোর দুর্গ প্রাকার

দুর্গে যাবার জন্য দুখানি টংগা ষ্টেশনে নেমেই ভাড়া করে রেখেছিলুম। ৩টেয় বেরুবার কথা। তারা ঠিক এসে হাজির। সামান্য কিছু জলযোগ আর ফ্লাস্কে চা ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। পাছে আবার অচলগড়ের দুরবস্থা ঘটে, চিতোরগড়ে গিয়ে সেই ভয়ে কিছু গরম কাপড়ও সঙ্গে নেওয়া হল।

চমৎকার গদি আঁটা প্রশস্ত টংগা। তেজী ঘোড়া। আধ ঘণ্টার মধ্যে মাঝ পথের পার্ব্বত্য নদী 'গম্ভীরা'র (কালিদাসের মেঘদূতের 'গম্ভীরা' কিনা জানি না) সেতু পার হয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল চিতোর দুর্গপ্রাকারের প্রবেশ দ্বারে। এখানে ওরা ঘোড়া বদল করলে। বললে—গাড়ী নিয়ে এ ঘোড়া পাহাড়ে উঠতে পারবে না। পাহাড়ে ওঠার অভ্যস্ত ঘোড়া জুতে নেবো। পাঁচ মিনিট একটু নেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করুন।...নেমে এলুম আমরা।

চিতোর গড়ের চার পাশে খাল কাটা। প্রবেশ পথে কাঠের সেতু। প্রয়োজনমতো তুলে নেওয়া চলে। মাথা তুলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলুম—সামনেই পাহাড়ের উপর সুদৃঢ় প্রাকার পরিবেষ্টিত প্রশস্ত প্রাচীন চিতোর দুর্গ। তিন মাইল দূর থেকে একে দেখাচ্ছিল যেন মুকুট পরিহিত এক শৈলরাজ। কাছে এসে বোঝা গেল এ সেই দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ—যার প্রত্যেক পাথরে লেখা রয়েছে রাজপুত বীরত্বের গৌরবময় ইতিহাস। সেই গহিলট বাপ্পা, হামীর, কুম্ভ, প্রতাপ, রাজসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত বীরেন্দ্রবৃন্দের অমর কীর্ত্তিমণ্ডিত চিতোর! মেবারের অপরাজেয় রাণাদের সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজধানী—বীর প্রসবিনী চিতোর—সেই পদ্মিনী, করুণাবতী, রাণী কৃষ্ণকুমারীর সতীত্বের তেজে উজ্জ্বল ও ত্যাগের অনলে বিশুদ্ধ চিতোর! সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো!

"গাড়ী তৈয়ার হুজুর!"

স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমরা গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। দুই চোখে যেন রাজস্থানের শৌর্য্য-বীর্য্যের উজ্জ্বল রাঙা অঞ্জন লেগেছে! অপরিমিত শ্রদ্ধায় সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ।

চিতোর তোরণের বিরাট ফটক পার হয়ে আমরা নগরে প্রবেশ করলুম। সে ফটকের লোহার শূল বসানো বিশাল দরজা যারা একদিন হেলায় খুলতো বন্ধ করতো, তারা আজ আর নেই! নগরদ্বার খোলাই পড়ে আছে। ছোট্ট পার্ব্বত্য গ্রাম চিতোর। নগরের রূপ তার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গাড়ী আমাদের ক্রমে ঢালু রাস্তা বেয়ে একটু একটু করে উপরের দিকে উঠছিল। চখে পড়ছিল শুধু মাটির কুটীর—আর খোলার চালের ঘর। তাও সংখ্যায় বেশী নয়। দারিদ্র্যের মলিন রূপ চারিদিকে প্রকট।

চিতোরের পরিধি মাইল দুইয়ের বেশী হবে বলে মনে হল না। অধিবাসীরা সংখ্যায় অল্প। সকলেই খুব গরীব বলে মনে হল। আজও বোধ করি সেই হাতে গড়া বাজরার রুটি আর বুটের ডাল খেয়েই দিন কাটায়।

ক্রমে আমরা মূল দুর্গের প্রথম দ্বারে এসে পৌছলুম। এখানে নেস্‌লস্‌এর গোয়ালিনী মার্কা একটি রাজপুত মহিলা মেয়েদের গাড়ীতে উঠে পড়লো। গাড়োয়ানরা পরিচয় করিয়ে দিলে—চিতোরগড়ের ইনিই নাকি সব চেয়ে ভালো 'গাইড' অর্থাৎ 'পথ-প্রদর্শিকা।' বয়স বছর ৩০।৩৫ হবে। অটুট স্বাস্থ্য। দেখতে নেহাৎ কুরূপা নয়। খুব

হাসে। আধা বাংলা আধা হিন্দিতে কথা বলতে পারে। নবনীতার সঙ্গে তার খুব ভাব হ'য়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' পড়েছে নবনীতা। অসংখ্য প্রশ্নবাণে সে মহিলা-গাইডটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। তারই মুখে শুনলুম এই রকম পর পর সাতটি তোরণ পার হয়ে তবে আমরা দুর্গের অভ্যন্তরে উপস্থিত হবো। প্রায় প্রত্যেক তোরণেরই এক একটি বীরের নামে নামকরণ হয়েছে; কারণ, সেই বীর তার অসাধারণ বীরত্বের ইতিহাস রেখে গেছে শত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্গের এই দ্বার রক্ষা করবার জন্ত। এর পর আমরা একটি ফটকের সামনে আসতেই রাজপুতানী বললে—এর নাম 'বাদল দারোয়াজা।' বীর বাদল চিতোরের এই দ্বার রক্ষা করবার জন্ত অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করবার পর যবনের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। আরও ৭টি প্রধান তোরণের পরিচয় আমরা পেলাম—রামপোল, সূর্যপোল আর লাখোটাবাড়ী পোল। এ ছাড়া হনুমান পোল, পদ্মপোল প্রভৃতিও রয়েছে। ফটককে রাজপুতেরা 'পোল' বলে। যোধপুরের দুর্গেও দেখেছিলুম এই রকম এক এক জনের নামে এক একটি 'পোল'!

(ক্রমশঃ)

আলাউদ্দিন

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রূপের পূজারী আমি তব দ্বারে রূপমুগ্ধ বীর
সৈনিক শিবির
পাতিয়াছি গিরি দুর্গ তলে,
উর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকি আক্রোশ নিষ্ফলে
পাষাণ প্রাকার পানে।
তব রক্ষী সেনা দল যত অস্ত্র হানে
যত ভীম পরাক্রমে হর হর ব্যোম ব্যোম রবে
গম্ভীর ভৈরবে
ধেয়ে আসে—তত আমি অনুভব করি
কত যে তোমারে চাই, হে বিশ্বের নিঃসীম সুন্দরি।
যত আমি তোমারে না পাই
বার বার পিছু হটে যাই,
হে রূপ কমল,
তোমারে ঘিরিয়া নাচে বাসনা তরঙ্গ টলমল।
এ ভারত জিনি'
কত রাজ্য লভিয়াছি, কত না বন্দিনী
আমার কামনানলে দিয়েছি আহুতি,
রূপের বিভূতি—
মূল্য তার মোর কাছে নাই,
হেলায় বিজিত রত্ন ভুলিয়া হারাই,
কণ্ঠে চাহি নব রত্নমালা।
সেই আমি জয়ী রাজা বীর শত্রু 'আলা'
তিল তিল করি'
দিনে দিনে মহাধৈর্য্য ধরি'
যুঝেছি হেথায়।
হায়!
তুমি জানিবে না, রাণী, চিরজয়ী 'আলা'
নিতান্ত নিরালা
'গাম্ভেরী' নদীর নীরে খোজে তব ছবি
অস্তাচলে রবি
যবে ঢলে পড়ে রোষে রাঙাইয়া চিতোরের শির
আমার এ তৃষিত শিবির
হ'তে দুটি শ্যেন চক্ষু চেয়ে রহে দুর্গ চূড়া পানে
তিলোত্তম তোমার সন্ধানে।
আরো এক দিনান্তের ক্ষয়
মাঝে মানি তব কাছে মোর পরাজয়।
সবে বলে আমি দিগ্বিজয়ী।
তব কাছে, হে সুন্দরি, মোর জয় কই?
দেহের দেউলে তব মোর প্রেম বাণী
তুলিবে আজান ধ্বনি
কোন্ সুপ্রভাতে?
কোন্ শান্ত রণক্লান্ত রাতে
লভিব তোমারে,
সমর হুঙ্কার রব স্থান দিবে স্মরের ঝঙ্কারে?
তার পূর্বে প্রতি দিন প্রতি ব্যর্থ রাতি
আমারে অরাতি
জেনে তুমি করে যাও ঘৃণা,
আমার এ বাসনা সুদীনা

দীনতর হয়ে ফোটে তোমার আকাশে,
কমল লতার আশে পাশে
মোর কামনার ঢেউ কালসর্প সমা,
ওগো নিরুপমা,
কালশ্বাস ফেলে বলে মনে করো নিতি
তাই তব অহেতুক ভীতি ;
তারি মাঝে মম পরাজয়
চরম লজ্জার গ্লানি, মোর বীর্য্য পৌরুষের ক্ষয়।
তুমি ত রূপসী নহ শুধু ;
প্রাপ্তির অতীত তীরে অপরিচয়ের যত মধু
তাই দিয়ে—রচেছি তোমারে,
কল্পনার হারে
সাজায়েছি বরতনু তব ;
অভিনব
রূপ মূর্ত্তি খানি,
ওগো রাণী,
বহু প্রতিবিম্ব মাঝে বহু প্রতীক্ষায়
হেরি' দূর স্ফটিকের গায়
অধিক সুন্দর হ'ল অজানা গৌরবে
অনাঘ্রাত পদ্মের সৌরভে।
'বাসনা দুর্বার হ'লো ; অপ্রাপনীয়া
সেই দিন হ'তে হ'লে আরো বরণীয়া ;
তাই তব তরে
সব পাপ সব মিথ্যা সত্য বলে মানিনু অন্তরে,
বুঝিলাম এ জগৎ
মাঝে সফলতা শুধু রচে শ্রেষ্ঠ পথ।
সেই দিন হ'তে মোর রণনীতি নাই
তাই
ছলে ও কৌশলে
বহু ভুজ বলে
জিনিনু তোমার দুর্গ। তব সরোবরে
থরে থরে
যত পুষ্প দাম ছিল সব গেল মুদে
ফুটাইয়া অযুত বুদ্বুদে ;
অনলের লেলিহান শিখা
পরাল ললাটে তব চির জয় টীকা।
পাষাণ প্রাকার মাঝে তোমার প্রকৃতি
লভেছিল পাষাণের রীতি,
তাই তব রূপ অতুলন
শুধুই শোভিয়াছিল সুদূর ভুবন
ধেয়ে এনু যবে কাছে রহিলে সুদূরে
মম আগমনী গাথা রূপ পেল বিদায়ের সুরে।
যে মানুষ আমার অন্তরে
দুঃসাহসে দুর্নিবার পিপাসার ভরে
জীবনের হারজিত চরম খেলায়,
সর্ব্বস্ব পণের মূল্যে হাসিল হেলায়
উল্কা সম ছুটে এল বাধা লঙ্ঘি' ধূমকেতু বেগে
প্রাণের আবেগে
সে মানুষে তুমি গেলে জেনে
অমানুষ ব'লে ঘৃণা কৃপাদৃষ্টি হেনে।
নিজে দীপ শিখা—
জ্বালাইলে তার হিয়ে অনল দাহিকা।
অবহেলে
নিজে মুক্তি পেলে
ভরিয়া আমার মন দুঃখের চরম ব্যর্থতায়
বিজয়ের পরম ব্যথায়।
চারিধারে মেবারের গিরি
বন্দী সম হেরে মোরে সতর্ক প্রহরী,
অস্ত সূর্য্য রোষরক্ত আঁখি
আকাশেতে চিতানল আঁকি'
উপহাস ক'রে যায়। আমি শুধু ভাবি
স্মৃতি সরোবরে নাবি'
বেদনা তরঙ্গ মাঝে, হে পদ্মিনী, তুমি তথা নাই।
বৃথাই
রূপ মুগ্ধ অন্ধ বীর করেছিনু ভুল,
হৃদয় দেউল
বাহুবলে হয় না আপন,
পরম স্বপন
শুধু জাগরণ গণে যায় না ত গড়া,
রূপের অতীত বোঝাপড়া
প্রাণ দিয়ে গড়ে নিতে হবে
প্রেমের বৈভবে।
তাই শুধু ভুজ বল দিয়ে
বীর ভোগ্যা ধরণীতে জয়রথ নিয়ে
শূন্য হাতে ফিরে গেনু। চিতোরের রণে
জীবনে হারিয়া তুমি জিনিলে মরণে।
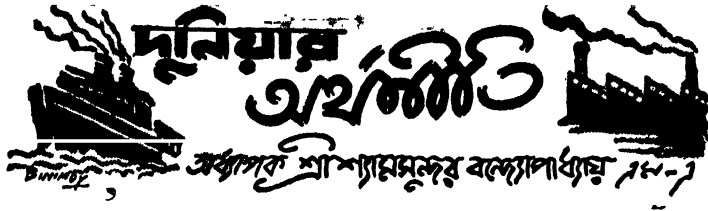
ষ্টার্লিং চুক্তি

অবশেষে ব্রিটেনের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের ষ্টার্লিং চুক্তি গত ৯ই জুলাই লণ্ডনে সম্পন্ন হইয়াছে। এই চুক্তি অবশ্য সমস্ত পাওনা সম্পর্কে হয় নাই, তবে যুদ্ধ চলিতে থাকার সময় হইতেই মিঃ চার্চিল পরিচালিত টোরী দল ও ব্রিটেনের রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি নানাভাবে ভারতের পাওনার পরিমাণ কমাইবার যে অপচেষ্টা চালাইতেছিলেন, এই চুক্তির ফলে সেই অপপ্রয়াস অন্ততঃ সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়াছে। ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পর্কে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা এবং ভারত সরকারের অর্থসদস্য শ্রীযুত আর-কে-সন্মুখম চেট্টি গত ১৫ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, আলোচনা চলিবার কালে ব্রিটিশ অর্থসচিব স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতের পাওনা হ্রাস করিবার কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই।

এদিক হইতে চুক্তিটি আশাপ্রদ হইলেও মোটের উপর যেভাবে চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা কিন্তু আমাদের আশ্বস্ত করিতে পারে নাই। সকলেই জানেন—নোট ও ঋণপত্র সমেত ভারত সরকারের তিন হাজার কোটি টাকার বেশী আর্থিক দায়িত্বের একমাত্র ভরসা এই ষ্টার্লিং পাওনার কয়েক কোটি টাকা। এই পাওনার সাহায্যে ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নত করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই এদেশবাসীর আর্থিক স্বাচ্ছল্য বৃদ্ধির সহিত দেশের সাধারণ অর্থব্যবস্থার উন্নতি হইবে এবং সরকারের আয় বাড়িবে। ব্যয় অপেক্ষা আয় যতক্ষণ না বেশী হইতেছে, ততক্ষণ ভারত সরকারের পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণপরিশোধের কোনই আশা নাই। ষ্টার্লিং পাওনার গুরুত্ব এইরূপ অসাধারণ বলিয়াই ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই পাওনার এক কপর্দ্দকও ছাড়িয়া দিতে রাজী হন নাই। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ব্রিটেন আমেরিকার নিকট হইতে কর্জ্জ গ্রহণের সময় যে ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তি হয়, তাহার একটি সর্ত্ত ছিল যে ব্রিটেন একবৎসরের মধ্যে বাহিরের দেনা কমাইয়া বা রফা করিয়া বাকী অংশ পরিশোধের একটা পাকা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। এই চুক্তির জন্য অনেকেই ভারতের পাওনার ভবিষ্যত সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময় প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেখাইয়া তৎকালীন অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলি খান ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ঘোষণা করেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তিতে যাহাই থাকুক, ভারতের সহিত পরামর্শ করিয়া এই চুক্তি যখন সম্পন্ন হয় নাই, তখন ইহা মানিয়া লইতে ভারতবর্ষ বাধ্য নয়। জাতীয় আর্থিক ভবিষ্যতের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ ষ্টার্লিং পাওনা আদায়ের ব্যবস্থায় ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ তেমন সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলা যায় না। অবশ্য অর্থসদস্য স্বয়ং এবং তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গরা জোর গলায় এই চুক্তির নানা গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচক হিসাবে তাঁহাদের এই কীর্ত্তনে অংশ গ্রহণ আমাদের পক্ষে সত্যই কঠিন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্যার উইলফ্রিড ইডির নেতৃত্বে এক ব্রিটিশ প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারতে আসিয়া ষ্টার্লিং সম্পর্কে প্রথম চুক্তি করিয়া যান। ইহার পর এই বৎসরের শেষ দিকে ব্রিটিশ সরকারের সহিত ভারত সরকারের ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে এক চুক্তি হয়। আলোচ্য চুক্তি ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে তৃতীয় চুক্তি।

আগের দুইটি চুক্তিতে ব্রিটেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ৮ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং পরিশোধ দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল। ভোগ্যপণ্য আনিয়া বিদেশী মুদ্রা নষ্ট করা সমীচীন মনে করেন নাই বলিয়া এবং ষ্টার্লিংয়ের বিনিময়ে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী সম্ভব হয় নাই বলিয়া—ভারত সরকার এই ৮ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে এপর্য্যন্ত ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের বেশী খরচ করেন নাই। তৃতীয় চুক্তির সময় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাওনার পরিমাণ স্থির হয় ৮০ কোটি ষ্টার্লিং। চুক্তিতে ইহার মধ্যে আগামী তিন বৎসরের (১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত) হিসাবে ব্রিটেন মোট ৮ কোটি ষ্টার্লিং পরিশোধ করিতে রাজী হইয়াছে। তাহা হইলে আগের ৮ কোটি ষ্টার্লিং সমেত ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ভারতের হাতে ব্যবহারযোগ্য ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ হইল ১৬ কোটি ষ্টার্লিং। বাকী ৭২ কোটি ষ্টার্লিং ব্রিটিশ সরকার কবে যে পরিশোধ করিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বলা বাহুল্য, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার বিপুল প্রয়োজনের জন্য সমস্ত পাওনা ষ্টার্লিং আদায় হইয়া গেলেও এদেশের পক্ষে যথেষ্ট হইত না, এখন মাত্র ১৬ কোটি ষ্টার্লিংয়ে জাতীয় অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন বেশী দূর অগ্রসর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এ ছাড়া এ সম্পর্কে একটা অসুবিধা আছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের রাজনৈতিক অবস্থা কি হইবে কেহ বলিতে পারে না। টোরী দল গদী পুনর্দখল করিলে হয়তো বাকী পাওনার একাংশ বাতিল করিবার জন্য তাঁহারা ভারত সরকারের কাছে দাবী জানাইবেন। ব্রিটেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার পর ষ্টার্লিংয়ের মুদ্রা হিসাবে আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা অনেকটা কমিয়াছে। এখন অবস্থা বৈগুণ্যে ষ্টার্লিংয়ের মূল্য আবার হ্রাস পাওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়। এইভাবে ষ্টার্লিংয়ের বিনিময়-মূল্য কমিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পাওনার একাংশ হ্রাস পাইবে, অথচ এইভাবে ক্ষতি স্বীকারের জন্য ভারতবর্ষের নিজস্ব কোন অপরাধ থাকিবে না। এইসব বিভ্রাটের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই শ্রীযুত মনু সুবেদার, স্যার চুণিলাল মেটা, অধ্যাপক এম সি ভাকিল প্রমুখ বহু খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ভারতের বাকী পাওনার

ভবিষ্যত সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এবারের চুক্তিপত্রে ভারতসরকারের প্রতিনিধিবর্গের উচিত ছিল এমন সর্ত্ত লিখাইয়া লওয়া যাহাতে ষ্টার্লিংয়ের বিনিময় মূল্য কমিলেও ভারতের বর্ত্তমান পাওনা ভবিষ্যতে কমিতে না পারে এবং এবার যেমন ব্রিটিশ অর্থসচিব স্তর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ হ্রাস করিবার কোনরূপ অপচেষ্টা করেন নাই, ভবিষ্যতেও কোন ব্রিটিশ অর্থসচিবের পক্ষে স্তার ষ্ট্যাফোর্ডের আচরণের অন্যথা করা সম্ভব না হয়। মোট পাওনার আরও অধিক অংশ অবিলম্বে আদায়ের অক্ষমতা ছাড়াও চুক্তির এই ধরণের ত্রুটি সমূহ ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের বিফলতা প্রমাণ করিয়াছে। চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে, অতঃপর ব্রিটেনের কাছে ভারতের যে অনাদায়ী ৭২ কোটি টাকা পাওনা থাকিবে, তজ্জন্য ভারতসরকার ·৭৮ টাকা হিসাবে সুদ পাইবেন। ষ্টার্লিং পাওনার অঙ্ক ফাঁপিয়া উঠিবার বিপরীত দিকে ভারতে ভারতসরকারের ঋণপত্রের পরিমাণ যে বাড়িয়া গিয়াছে একথা সকলেই জানেন এবং এইসব ঋণপত্রের জন্য ভারতসরকার গড়ে শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কাজেই এই ঋণপত্রসমূহের জামিনস্বরূপ আটক ষ্টার্লিংয়ের উপর শতকরা মাত্র ·৭৮ ভাগ সুদ নির্দ্ধারণ ভারতের পক্ষে অবশ্যই লাভের কথা নয়।

পাকিস্তানের সহিত তুলনামূলক বিচারেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ঠকিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নূতন চুক্তি অনুসারে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যদিও পরিশোধিতব্য টাকা হইতে কিছুই পাইবে না, প্যাকিস্তান তখন এই হিসাবের পাওনা হইতে স্বাভাবিক প্রয়োজনে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতির জন্য ৫০ লক্ষ পাউণ্ড একুনে এই এককোটি পাউণ্ড ফিরিয়া পাইবে। ভারতসরকারের অধীনস্থ ব্রিটিশ প্রজাদের পেন্সন লইয়া ভবিষ্যতে গোলমাল না হয় তজ্জন্য একটি পেন্সন তহবিল গঠন করিয়া এখনই এই তহবিলের টাকা ষ্টার্লিং পাওনা হইতে ব্রিটিশ সরকার পৃথক করিয়া লইয়াছেন। এই তহবিলে ভারতের ভাগে ধরা হইয়াছে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং বা ২২৪ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় খাতে ১৯৭ কোটি ও প্রাদেশিক খাতে ২৭ কোটি টাকা), পক্ষান্তরে পাকিস্তানের হিসাবে এই খাতে ধরা হইয়াছে মাত্র ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের সামান্ত বেশী ! একথা সকলেই জানে যে, ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতীক হিসাবেই ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এই দরিদ্র দেশের সরকারী তহবিল হইতে রাশি রাশী টাকা লুটিয়াছেন, এইসব কর্ম্মচারীকে পেন্সন প্রদানের দায়িত্ব হইতে অতঃপর ভারত ও পাকিস্তান সরকারের রেহাই পাওয়াই উচিত। তাহা না হইয়া ভারত ও পাকিস্তান যদি পেন্সন তহবিলের দায়িত্ব ভাগ করিয়া লয়, সেই ভাগাভাগিতে উভয় রাষ্ট্রের হিসাবে একটা সামঞ্জস্য আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি। ভারতের এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিকারী পাকিস্তান এক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের স্থলে মাত্র ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের দায়িত্ব লইয়াছে, ইহা নিশ্চয় কোন সুসমঞ্জস নীতি অনুসারে হয় নাই।

ষ্টার্লিং চুক্তির আর একটি ব্যাপারে ভারতের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কথাটা ভারতস্থ ব্রিটিশ সমরসরঞ্জাম ক্রয় সম্পর্কে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতে যে সমরসরঞ্জাম ফেলিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন ভারতসরকার ষ্টার্লিং পাওনার একাংশের বিনিময়ে কিনিয়া লইলেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে এই সমরসরঞ্জামের দর স্থির হইয়াছে ১০ কোটি পাউণ্ড বা ১৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। সরঞ্জাম সমূহের 'বুক ভ্যালু' বা ক্রয়মূল্য ৫০০ কোটি টাকা, কাজেই আপাতদৃষ্টিতে ১০০ কোটি টাকার বিনিময়ে ৫০০ কোটি টাকার জিনিষ ক্রয় করা ক্ষতির ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমরসরঞ্জাম ক্রয়ের হিসাবে ভারতসরকারের দারুণ লোকসান হইল বলিয়া আমরা মনে করি। ছয় বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছে, এই দীর্ঘ ছয় বৎসরে যথেষ্ট অযত্নে জিনিষগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া এগুলি পুরাতন, জীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, সে হিসাবে ক্রয়মূল্য যাহাই হউক, বিক্রয় মূল্য ইহাদের অতি সামান্ত হওয়া উচিত। তাছাড়া যুদ্ধের জিনিষ যাহারা সরবরাহ করে, তাহারা ফন্দী ফিকির খাটাইয়া কত গুণ দামে কোন শ্রেণীর জিনিষ গছাইয়া দেন, সেকথা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সবদিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয়, আলোচ্য সমরসরঞ্জামগুলির জন্য ১৩৩' কোটি টাকা দর নির্দ্ধারণে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাবই প্রমাণিত হইয়াছে।

অবশ্য উপরিউক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্বেও একথা স্বীকার করিতে আমাদের কোনই কুণ্ঠা নাই যে, চুক্তির কতকগুলি বিষয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ লক্ষণীয় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-ভারত চুক্তি অনুসারে এ পর্য্যন্ত ভারতের যুদ্ধ ব্যয়ের হিসাবে কিঞ্চিদধিক সতেরোশো কোটি টাকা ব্রিটিশসরকারের ভাগে পড়িয়াছিল, এই টাকাই ষ্টার্লিং পাওনার ভিত্তি। ব্রিটেনের বহু সংবাদপত্র এবং মিঃ চার্চ্চিল প্রমুখ অনেকে এতদিন যুদ্ধান্তে ভারতের স্বাধীনতালাভ, ব্রিটিশ সাহায্য ব্যতিরেকে জাপানের হাতে ভারতের চরম লাঞ্ছনার সম্ভাবনা, ব্রিটেনের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক দুর্গতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির দরুণ দেয় টাকার একাংশ কমাইবার দাবী জানাইয়া আসিয়াছেন; এবারের চুক্তির সময় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে এইরূপ পাওনা কমাইবার কোন কথা উঠাইবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এইসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে আগের হিসাব ছাড়া ভারতের সমরব্যয়ে ব্রিটেনের দেয় অংশে আরও ৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বা ৭৩ কোটি টাকা বাড়ানো হইয়াছে। ষ্টার্লিং পাওনা আদায়ের ব্যাপারটা ব্রিটেনের বর্ত্তমান অবস্থায় অনেকটা ভারতের হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, সুতরাং এক্ষেত্রে এইভাবে ব্রিটেনের হিসাবে দেয় টাকার অঙ্ক কমাইবার পরিবর্ত্তে ৭৩ কোটি টাকা বাড়াইতে সক্ষম হওয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষে নিঃসন্দেহে সাফল্যের বিষয়। এছাড়া মুদ্রাব্যবস্থায় এলাকা স্থিরীকরণের ব্যাপারেও ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের কৃতিত্ব

উল্লেখযোগ্য। আগামী তিন বৎসরে আদায়ী ১৬ কোটি ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে ভারতসরকার আগামী এক বৎসরে মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং ডলারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন; ভারতে মার্কিণ যন্ত্রপাতি, খাদ্যাদি ও ভোগ্যপণ্যের প্রচণ্ড চাহিদার হিসাবে এই পরিমাণ সত্যই নগণ্য, তবে আলোচ্য চুক্তির পর ইয়োরোপের চারিটি সমৃদ্ধ দেশকে অবাধ ষ্টার্লিং বিনিময় এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই দেশ চারিটি হইতেছে ফ্রান্স, সুইডেন, সুইটজ্যারল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া। এই চারিটি দেশ অবাধে ষ্টার্লিং গ্রহণে রাজী হওয়ায় চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত ষ্টার্লিং ব্যবহারে ভারতবর্ষ অবশ্যই অধিকতর উপকৃত হইবে।

যাহা হউক, তিন বৎসরের জন্য হইলেও উপস্থিত ষ্টার্লিং পাওনা সমস্যার যে একটা সমাধান হইয়াছে, ইহাও আশ্বাসের কথা। ভারতবর্ষ পাওনাদার দেশ হইলেও পাওনাদারের অধিকার বা ক্ষমতা তাহার হাতে নাই। বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যেরূপ ঘোরালো, তাহাতে ব্রিটেনের ন্যায় শক্তিশালী দেশের সহিত বিবাদ করিয়া পাওনা আদায় করাও অত্যন্ত কঠিন। ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থাও বর্ত্তমানে খুবই শোচনীয়। সুতরাং এ হিসাবে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ যে পাওনার পরিমাণ না কমাইয়া একাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন, তাহাও মন্দের ভালো। ষ্টার্লিং চুক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে কোন এক বিখ্যাত ভারতীয় সংবাদপত্র মন্তব্য করিয়াছেন "Shri Shammukham Chetty and his colleagues have made the best of a bad bargain," পরিস্থিতির জটিলতার বিবেচনায় এই অভিমত আমরাও সমর্থন করি।

খাদ্যশস্য আমদানী

খাদ্যশস্যের হিসাবে অবিভক্ত ভারত ঘাটতি দেশ ছিল এবং স্বাভাবিক সময়েও এদেশে বৎসরে গড়ে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য কম পড়িত। ভারত বিভাগের পর খাদ্যশস্যের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা এখন সঙ্গীণ হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর হইতে ভারতে খাদ্যশস্যের অবিরাম ঘাটতি চলিতেছে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অনেকে অবস্থার উন্নতি আশা করিয়াছিল, কিন্তু সে আশা এ পর্য্যন্ত পূর্ণ হয় নাই। শুধু ভারতবর্ষ নয়, অতি অল্পসংখ্যক দেশ ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বর্ত্তমানে মারাত্মক খাদ্যাভাব দেখা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে অবস্থা এমন যে, পৃথিবীর সমস্ত উদ্বৃত্ত দেশ হইতে বাড়তি খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ঘাটতি দেশসমূহকে সরবরাহ করিলেও সবদেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এখন পৃথিবীতে বাৎসরিক খাদ্যের অভাব ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অভাব ৪৫ লক্ষ টন।

খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষের অসুবিধার শেষ নাই। এদেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেই বনিয়াদ পুনর্গঠন করিতে হইলে কলকারখানা বাড়ানো একান্ত আবশ্যক এবং সেজন্য দরকার প্রচুর পরিমাণ যন্ত্রপাতি। যন্ত্রপাতি ভারতে উৎপন্ন হয় না, এগুলি আনিতে হইবে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে। এজন্য বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আবশ্যক। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি এখন আর আগের মত ভারতের তত বেশী অনুকূলে নেই, কাজেই বহির্বাণিজ্যে ভারতের যেটুকু বৈদেশিক মুদ্রা উদ্বৃত্ত হইতেছে, তাহা যদি বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতেই চলিয়া যায়, তাহা হইলে যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যসাধন অসম্ভব। তা ছাড়া খাদ্য এবং যন্ত্র ব্যতীত আরও নানা প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্যও ভারতবর্ষ বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

ভারতবাসীকে খাদ্য যোগাইতে ভারত সরকার এখন বৎসরে গড়ে ১০০ কোটি টাকার খাদ্য বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেছেন এবং এজন্য তাঁহাদের লোকসান দিতে হইতেছে বৎসরে ২০ কোটি টাকার মত। এইভাবে দীর্ঘকাল লোকসান টানিয়া যাওয়া ভারতের মত দেশের পক্ষে যে অসম্ভব তাহা না বলিলেও চলিবে। এখন আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার সহিত কীট পতঙ্গাদির জন্য ভারতের প্রতি বৎসর যে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়, তাহা যথাসম্ভব বন্ধ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার। বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা এখন কিছুদিনের জন্য ভারতের স্থায়ী সমস্যা, কাজেই বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী না কমাইতে পারিলে ভারতের আর্থিক অবস্থার কিছুতেই পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

সম্প্রতি ভারত সরকারের খাদ্যসদস্য শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম গত কয়েক বৎসর বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্য আমদানীর একটা হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাব পরিদৃষ্টেই ভারতের অন্নাভাব অবস্থা উপলব্ধি করা যাইবে। শ্রীযুত দৌলতরামের হিসাবে জানা যায় ভারতে বিদেশ হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টন, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯ লক্ষ ১০ হাজার টন, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১ লক্ষ টন ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে। বাহির হইতে আমদানী বাবদ ভারত সরকার ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ কোটি টাকা এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০০ কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণ খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী হইতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন এবং এজন্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ১।৮।৪৮

লোমহর্ষণকর ঘটনা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সার অংশ—অত্যগ্র রুচীসম্পন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে, বর্ব্বরতার উলঙ্গ নৃত্য ! শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী

রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম, রহড়া

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

অবহেলিত, পদদলিত ও আর্ত্ত ভারতে ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর সামনে স্বামী বিবেকানন্দ এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ভগবানের বাণী যখন মানুষের ভিতর দিয়া আসে তখনই হয় ইহা সত্য আর সহজ। তাই মানুষ তাহার স্বাভাবিক প্রেরণায় এই সরল সত্য বেশ ভাল বুঝিতে পারে। জীব শিব, জীবের মধ্যেই অজর অমর আত্মার প্রতিষ্ঠা। সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি তাই এই মানুষের মধ্যে, প্রধানতঃ উৎপীড়িত জনসাধারণের ভিতর শিব'কে খুঁজিতে বলিয়াছেন।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ;
জীবে দয়া করে যেইজন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর,"

এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রামকৃষ্ণ মিশন "মূক যারা দুঃখে সুখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে" তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

গত ২০শে জুলাই মহানগরীর মাত্র ১২ মাইল দূরে খড়দহ রেল ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে রহড়া গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল বাহাদুরের আগমন উপলক্ষে আমরা এইরকম এক মনোরম দৃশ্য দেখিলাম। কারখানা-বহুল, মহানগরীর উত্তেজনাময় জীবনের পার্শ্বেই রাজনৈতিক দলাদলি ও চটকদার শস্তা বুলি ব্যতিরেকে সত্যিকার মানুষ তৈয়ারীর প্রাণবন্ত এই কারখানা দেখিবার সৌভাগ্য সকলকে জানাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

এক নাটকীয় শোকাবহ দুর্ঘটনার মধ্যে 'মানুষ' বানাইবার এই অপূর্ব্ব যজ্ঞশালার বোধন আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তরের সময় বিদেশী সরকার কলিকাতার রাজপথে মৃত ও জীবন্ত নরকঙ্কালের এক প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, ঠিক এই সময় মহানগরীর অপর পার্শ্বে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র ধীমান্ পুত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র ও কন্যা প্রীতির অকালমৃত্যু ঘটে। ইহার অল্পকাল মধ্যেই সতীশবাবু ও পুত্র কন্যার অনুগমন করেন। সতীশবাবুর উইল অনুযায়ী তাঁহার সাধ্বী পত্নী রহড়া গ্রামের চারিখানা বাগান বাড়ী ও তিন লক্ষাধিক মুদ্রা 'বালকাশ্রম' প্রতিষ্ঠার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে প্রদান করেন। উক্ত চারিখানা বাগান-বাড়ীতে প্রায় ১২ বিঘা জমি ও কয়েকখানা পাকা বাড়ী ছিল। এই সময় অক্রিন সরকার ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মা-বাবা-হারানো কয়েকশত ছেলেমেয়ে লইয়া একটী "রিফিউজ" পরিচালিত হইতেছিল। বসুমতীর বদান্যতায় উক্ত "রিফিউজ"এর ২৫টী শিশু লইয়া ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ রামচন্দ্র প্রীতি স্মৃতি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে এখানে ১৯৮টী কিশোর বালক ও শিশু আশ্রমে থাকিয়া 'মানুষ' হইতেছে, স্বদেশী রাষ্ট্র ইহার মধ্যে ১৪৬টী শিশুর জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী সাহায্য দেন, বাকী জনসাধারণের নিকটে সংগৃহীত হয়।

অধ্যক্ষ পুণ্যানন্দজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে আশ্রম দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে। অনেক ঘর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকের জমি ক্রয় করায় এক্ষণে আশ্রমের বিস্তৃতি ২০ একর দাঁড়াইয়াছে। ছোট হইলেও আশ্রমের নিজ পরিচালিত ডেয়ারী ও কৃষিক্ষেত্র আছে, ইহাতে আশ্রম-বাসীদের দুগ্ধ ও শাকসব্জীর অনেক সাহায্য হইতেছে, পুকুর ও ঝিলে মাছ ছাড়া হইয়াছে। বি-এ, বি টি পাশ একজন শিক্ষাব্রতীর তত্ত্বাবধানে আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে, বর্ত্তমানে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি তিনটী ছাত্র প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়টীকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করার ব্যবস্থা হইতেছে।

লোকলোচনের সামনে, সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীতে, রাজপথে, যাহারা মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল, দৈবের প্রেরণায় দুই একটী বাঁচিয়া উঠিলে যাহারা চোর, ডাকাত কিম্বা গুণ্ডামী করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত তাহারা সুস্থ বাহাল তবিয়তে শিক্ষিত হইতেছে, খেলাধূলা শিখিয়াছে, ব্রতচারীর তালে তালে নৃত্য করে, প্রতিমাসে হস্ত লিখিত প্রাচীর পত্র বাহির করে, ছাপানো নিজস্ব পত্রিকা চালায় ; পড়াশোনার সাথে সাথে ভবিষ্য জীবন সংগ্রামে উন্নত মস্তকে সমাজে দাঁড়াইবার জন্য হাতের কাজ শিখে, খেলনা তৈয়ারী করে, চরকায় সুতা কাটে, তাঁতে গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি বোনে। আবৃত্তি গানের জলসা প্রতিযোগিতা হয়, নিজেরা মিলিয়া থিয়েটার যাত্রা করে। চার বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণে আসিলে আজ শরীর রোমাঞ্চিত হয়। চার বৎসর পূর্ব্বে ইহারাই তিলে তিলে মৃত্যুপথে আগাইয়া যাইতেছিল।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের পরেই প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া পাঠ্যারম্ভের পূর্ব্বে নিয়মিত প্রার্থনা ও পূজারতি প্রত্যেক ছাত্রের কর্ত্তব্য। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদের তত্ত্বাবধানে কিশোর ও শিশুরাই পূজার কাজ নির্ব্বাহ করে। এই সম্পর্কে পত্র ও পুষ্প আহরণ হইতে বিল্বপত্র চয়ন প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ছাত্রদের স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছামূলক নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হয়। যথাসময়ে আহারের পরে বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ের ছুটীর পরে বৈকালে খেলাধূলা, ব্রতচারী, ঘোড়ায় চড়া, সাইকেলে আরোহণ, লাফ-ঝাঁপ, সন্তরণ, ফুটবল প্রভৃতি নানাবিধ খেলা-ধূলার ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যার পরে পুনরায় পূজা, ভজন ও প্রার্থনা। সমস্ত দিবস কার্য্য তালিকায় ভরা, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সেবা প্রভৃতি দ্বারা চরিত্র গঠনের মনোরম অবকাশ আছে। প্রত্যেক আশ্রমবাসীকেই 'রুটীন' অনুযায়ী হাঁসপাতালে, হাতের কাজে, গান বাজনার ক্লাসে যাইতে

হয়। আশ্রমের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার জন্ত সাময়িক আলোচনা, সঙ্গত সভা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে।

রান্না-বাড়ীর ব্যবস্থা অনেকটা এক ছোট-খাট ঘরাট্টি. রাঁধুনীর সহিত সহযোগিতা করার জন্ত আশ্রমবাসী কর্ম্মচারী ব্যতীত ছাত্রদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছা নির্ব্বাচিত সহায়ক আছে। সর্ব্বত্রই মূলতঃ একই দৃষ্টি, দরদী আঁখির নীচে গণতন্ত্রমূলক ছাত্ররাজ্য। ছোট-খাট অপরাধের জন্ত তাহাদের নিজেদের বিচারালয় আছে, বিচারক ছাত্রদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হয়, প্রতিনিধিরা কোন ব্যবস্থায় অপারগ কিম্বা অসহায় বিবেচনা করিলে স্বামীজীরা সাহায্য করেন। প্রগতিমূলক, জাতিভেদ-হীন একান্নবর্ত্তী পরিবার গঠন দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মহাভারত প্রতিষ্ঠার কল্পনা স্মরণে আসে। পিতামাতার স্নেহকোলবিচ্যুত, ঘর-বাড়ী-হারা—সর্ব্বহারা সন্তানদের লইয়া হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে সর্ব্বোদয় সমাজের নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠা এক অদ্ভুত ব্যাপার !

প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু আশ্রমের বালকগণ ও পরিচালকগণকে সম্বোধন করিয়া ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, আশ্রমের অধিবাসী বালকগণ দুর্ভাগ্যক্রমে পিতামাতাহীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা এই আশ্রমে যথাসম্ভব সেবা ও যত্ন পাইয়া থাকে। সুন্দরভাবে পরিচালিত এইরূপ আশ্রমে অনাথ বালকেরা স্বগৃহে পিতামাতার স্নেহ পায় না বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের শুধু সকল প্রকার স্নেহ ও যত্নই পায় না পরন্তু জনগণ ও রাষ্ট্রের নিকট হইতে আদর যত্ন লাভ করিয়া থাকে। এই দেশের রাষ্ট্র এক্ষণে আর বিদেশী রাষ্ট্র নহে। ইহা জনগণের রাষ্ট্র, আশ্রমের বালকদের এই ভাবিয়া মন খারাপ করিবার প্রয়োজন নাই যে, যেহেতু তাহাদের পিতামাতা নাই, সেই হেতু তাহারা কোন সেবা যত্ন পাইবে না বা তাহারা মানুষ হইতে পারিবে না। আশ্রমের বালকেরা সাধ্যমত উত্তম চিকিৎসার সুযোগ পায়, নিয়মিত ও পরিমিত খাদ্য পায়। সাধারণ শিক্ষার সহিত নানাবিধ কাজ শিখিবার সুযোগ পায় এবং যখনই মন খারাপ হয় তাহারা স্নেহ যত্ন করিবার লোক পায়, অনেক স্থলে নিজের পিতামাতা যে প্রেম ও দরদে তাহাদের ভবিষ্যৎগঠন করিবার জন্ত উন্মুখ তাহার চেয়ে ভাল লোক পায়। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে তাহারা আর অনাথ নহে এবং এই ধরণের আশ্রমের নাম "অনাথ আশ্রম" দেওয়া উচিত নহে। গান্ধিজী 'অনাথ আশ্রম' নাম মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। গান্ধিজী চাহিতেন যে এই সকল আশ্রমের নাম 'বালাশ্রম' কিম্বা 'আশ্রম' রাখা হউক। তিনি বলিতেন পুরাকালে ঋষিদের আশ্রমে বহু সন্তান 'মানুষ' হইত, বিখ্যাত পিতামাতার সন্তান ও ঋষিদের আশ্রমে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিত, এই সকল সন্তান সন্ততিদের অনেকে আদর্শ জনক জননী হইয়াছে, কাজেই আশ্রমবাসীদের জীবনে গ্লানি আসা উচিৎ নহে, তাঁহার মতে আদর্শের দিক হইতে রহড়া আশ্রমের,রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম নামকরণ সঙ্গত হইয়াছে। ডাঃ কাটজুর মতে প্রত্যেক জেলায় ও প্রত্যেক মহকুমায় এই ধরণের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক এবং রাষ্ট্র ও জনগণের যৌথ দায়িত্বে এইগুলি পরিচালিত হওয়া উচিত। বক্তৃতার শেষে ডাঃ কাটজু লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া বলেন যে আজ রামকৃষ্ণ মিশনের লোকসেবার আদর্শ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে এবং অগণ্য জনগণের মধ্যে সেবা ধর্ম্ম ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা আনিয়াছে। স্বাধীন ভারতে জনগণের আত্মিক ও বৈষয়িক নবসংগঠনে ত্যাগধর্ম্মের প্রেরণার সমধিক প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

প্রদেশ পাল ডাঃ কাটজুর সম্বর্দ্ধনার প্রারম্ভে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পূণ্যানন্দ সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে আশ্রমের ইতিহাস বর্ণনা করেন। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতায় তরুণ চিত্তের মনঃ-সংগঠনের সময় স্নেহকোমল হস্ত-প্রলেপের গুরুত্বে জোর দিয়া বলেন—আশ্রম শারীরিক কৌশল প্রয়োগের স্থলে মনঃসমীক্ষণ ও প্রেমের উপরে বেশী জোর দেন, তরুণ চিত্তে যখন এই প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ মনকে দোলায়মান করে তখন কেবলমাত্র আক্ষরিক ও পুঁথিগত শিক্ষা না দিয়া কর্ম্মবহুল পাঠ্য তালিকা, দরদী ও ব্যবহারকৌশলী মনঃসংযোগ কিশোর ছাত্রদিগকে তারুণ্য বৃদ্ধির সহিত আত্মরক্ষায় সাহায্য করিতে পারে। আশ্রম এই আদর্শে শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালন করিয়া থাকে। উন্মত্ততা ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে আজ দেশ পূর্ণ। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে ত্যাগের ঐক্যবন্ধনে যাঁহারা প্রাণপাত করিয়া দেশের স্বাধীনতা আনয়নে সাহায্য করিয়াছেন, স্বাধীনতা সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে তাঁহাদের অনেককেই ত্যাগের বন্ধন বিস্মৃত হইয়া, পথবিচ্যুত হইয়া, রুটীর টুকুরা লইয়া মাতামাতি করিতে দেখিয়া এই কথাই মনে আসে যে সত্যিকার শিক্ষা, শৃঙ্খলাবোধ ও নীতিধর্ম্ম—সকল বিষয়েই আমরা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। সুদীর্ঘ বিদেশী শাসনে আমাদের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা ও দুর্গতি ঘটিয়াছে। জাতিকে এই পরাজয় হইতে বাঁচাইতে হইলে, মুহ্যমান জাতিকে ত্যাগ ধর্ম্মে পুনরায় দীক্ষিত করাইতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সমাজগত, জাতিগত স্বার্থ বড়—হৃদয়ে অনুভব করাইতে হইলে চাই নিয়মানুবর্ত্তিতা, সৈনিকের একাগ্রতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা—আশ্রমিক শিক্ষায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলিত আদর্শে, অনুপ্রেরণায়, ইহা সম্ভব হইতে পারে। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার দায়িত্ব হইবে কেবলমাত্র পিতা-মাতার নহে, রাষ্ট্রের, দেশের জনগণের কেবলমাত্র তাহার নিজস্ব স্বার্থের জন্ত নহে,রাষ্ট্রের এই যৌথ দায়িত্ব আপামর সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র ও অনাথ সকলকেই "বালকাশ্রমের" মধ্য দিয়া চরিত্র ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিতে হইবে। রাশিয়ায় সকল শিশুকেই [illegible] বৎসর হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত আশ্রমে বাস করিতে হয়, আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে সকলকেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিবার জন্ত গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। এইরূপ শিক্ষার মধ্য দিয়া ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ক্ষমতা ঐক্য ও পৃথক পৃথক গৃহের আবেষ্টনী দূরীভূত হইয়া ঐক্যত্রিক দেশপ্রেম প্রজ্জলিত হয়। সুকুমার শিশুচিত্তই এই নবীন আদর্শ ও কল্পনা গ্রহণ করিতে সমর্থ।

এই পরিকল্পনা সম্ভব ও কার্য্যকরী হইলে বাপুজীর কল্পিত সর্ব্বোদয় সমাজের উদ্ভব সম্ভব হইতে পারে। রামকৃষ্ণ বালকাশ্রমে এই পরিকল্পনার একটী ক্ষুদ্র বটবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে দেখিয়া আসিলাম।

সঙ্কলন

ভারত হইতে যাহাতে অধিকতর পরিমাণে মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকার যে নূতন উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন তাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারত সরকারের যে সমস্ত বাণিজ্য প্রতিনিধি রহিয়াছেন তাঁহাদের কাজের সুবিধার জন্য উঁহাদের সকলের উপরে একজন ইনস্পেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত করা হইবে। এশিয়ার দেশসমূহের জন্যও এইরূপ একজন ইনস্পেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত করিবার ভারত সরকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে। উহা ছাড়া প্রত্যেক ট্রেড কমিশনারের অফিসে ভারতের রপ্তানীযোগ্য মালপত্রের নমুনা প্রদর্শনের জন্য একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে। এই সব ব্যবস্থার ফলে ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইলে ভারতের প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রার সচ্ছলতা হইবে এবং উহার দ্বারা ভারত বিদেশ হইতে কলকব্জা ও খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে সমর্থ হইবে। অবশ্য বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ উহার সঞ্চিত ষ্টার্লিং হইতে বৎসরে যে ১০৬ কোটি টাকা করিয়া পাইতেছে তাহা দ্বারা ভারতের বিদেশী মুদ্রার অভাব অনেকটা দূর হইবে। কিন্তু রপ্তানীর মারফত নূতন বিদেশী মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ না হইলে ষ্টার্লিং তহবিলে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইতে বেশী সময় লাগিবে না। তারপর শেষ পর্য্যন্ত যে এই ষ্টার্লিংয়েরও সাকুল্য অংশ পাওয়া যাইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

—স্বরাজ

* * *

আটা, ময়দা, কাপড়, মাছ হইতে সুরু করিয়া জীবনধারণের সর্ব্বপ্রকার সামগ্রীর যখন দাম বাড়িতেছে, তখন চিনির দামও আবার নূতন করিয়া না বাড়িলে চলিবে কেন? চিনির নিয়ন্ত্রণ উঠিবার পর হইতে সাড়ে দশ আনা সেরের চিনি কৌলিন্যের গুণে চৌদ্দ আনা হইতে এক টাকায় বিক্রয় হইতেছিল। এদিকে ব্যবসায়ীদের হাতে চিনি এতই মজুত রহিয়াছে যে, বর্ষাকালে চিনি রসিয়া যাইবার ভয়ে বাজারে বেশী সরবরাহ করিলে চিনির দাম আরো কমিয়া যাইত। কিন্তু চিনির দাম হ্রাস পাওয়া সুগার সিণ্ডিকেটের কর্ত্তাদের ভাল লাগিবার কথা নয় এবং তাঁহাদের ভাল না লাগিলে ভারত সরকারের কর্ত্তারাই বা কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিবেন? সুতরাং চিনি বিদেশে চালান দিয়া সুগার সিণ্ডিকেটের কর্ত্তাদের অতিরিক্ত লাভের পথ প্রস্তুত করিতে ভারত সরকার বিন্দুমাত্র দেরী করেন নাই। ডাক বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে, ভারতীয় ইউনিয়নের বাহিরে বিনা বাধায় চিনি রপ্তানী করিবার অনুমতি ভারত সরকার দিয়াছেন। এক দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া অন্যত্র চিনি রপ্তানীর লাইসেন্স পর্য্যন্ত লাগিবে না। চমৎকার। ইহার ফলে ভারতে চিনির দাম যদি বৃদ্ধি পায় তো পাক, লোকের দুর্গতি বাড়ে তো বাড়ুক; কিন্তু তাই বলিয়া ব্যবসায়ীদের লাভের বখরা কমিতে দেওয়া তো চলে না।

—দৈনিক বসুমতী

* * *

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরগণ সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দিয়া অপরিমিত বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন—গত বাজেট বক্তৃতায় অর্থসচিব মহাশয় এইরূপ একটা কথা বলিয়াছিলেন। তারপর ফাঁকি দেওয়া ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য একটি আয়কর তদন্ত কমিশন বসিয়াছে এবং ভারতের বৃহত্তম ধনকুবেরদের নামের তালিকা কমিশন প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাতে বিড়লা পরিবারের অনেকের নাম আছে। কমিশনের কাজ অনেকদিন যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বিড়লা পরিবারের ধনকুবেরদের নিকট হইতে কত টাকা আদায় হইয়াছে দেশবাসী তাহা জানিতে উৎসুক। ইতিমধ্যে একটা গুজব রটিয়াছে এই বলিয়া যে, এই পরিবারের লোকদের বিত্ত সম্বন্ধে তদন্ত বন্ধ রাখিবার জন্য নাকি কেন্দ্রীয় সরকার হইতে নির্দ্দেশ আসিয়াছে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আয়কর তদন্ত কমিশন ইহা সত্য কি না তাহা জানাইবেন কি?

—ভারত

* * *

কয়েকদিন আগে কলিকাতার পুলিশকর্ত্তৃপক্ষ এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় উপদ্রবাত্মক অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল যে কথাটা ঠিক নহে, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে আবার উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য সংবাদে প্রকাশ যে, হাওড়ায় এক রেশনের দোকানের কর্ম্মচারীকে ছোরা দেখাইয়া কাবু করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। আর একটী সংবাদে প্রকাশ যে, জগন্নাথ ঘাটে ছোরা দেখাইয়া এক ব্যক্তির নিকট হইতে আটশত টাকা ছিনাইয়া লইয়া দস্যুরা চম্পট দিয়াছে। মুনাফা-শিকারী চোরা-কারবারী ফড়িয়াদের দিনে ডাকাতি অপরাধের তালিকায় পড়ে না, কিন্তু তাহাদের কার্য্যও এই সমস্ত দৌরাত্ম্য অপেক্ষা কম উপদ্রবমূলক নহে। সকলেই দিনে ডাকাত। পশ্চিম বাঙ্গলা এখন দিনে-ডাকাতের কবলে। ইংরাজ সরকার ঠক ও পিণ্ডারীদের উপদ্রব বন্ধ করিয়া সুশাসনের বড়াই করিয়াছিলেন। আমাদের নিজস্ব-রাজ যদি বর্ত্তমান দিনে ডাকাতি বন্ধ করিতে পারেন তবে জনসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। আজ জনসাধারণের একমাত্র বুলি—দিনে ডাকাতি বন্ধ কর।

—ভারত

* * *

খনিজ তৈল সম্পর্কে ভারতের পরনির্ভরতা দূর করার জন্য বিভিন্ন দিক হইতে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কয়লা হইতে পেট্রোল তৈয়ারীর সম্ভাব্যতা অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার একটি মার্কিণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বার্ষিক সর্ব্বোচ্চ দশ লক্ষ টন হইতে সর্ব্বনিম্ন এক লক্ষ টন কয়লা-চোয়ান পেট্রোল তৈয়ারীর উপযোগী

কারখানা স্থাপনের সুযোগ-সুবিধা অনুসন্ধান ও কারখানার স্থান বাছাই করিবেন। তৎসম্পর্কে কয়েকজন মার্কিণ বিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যে ভারতে আসিয়াছেন। এই সম্পর্কে জার্মাণ এবং ফরাসী বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শও গ্রহণ করা হইতেছে। মধ্যপ্রাচ্য হইতে অপরিশোধিত খনিজ তৈল আনিয়া এখানে শোধন করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বড় বড় শোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাবও উত্থাপিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে পরনির্ভরতা দূর হইবে না সত্য; কিন্তু অপরিশোধিত তৈলের দর অনেক কম বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রার খরচ কমিবে এবং স্থানীয় কারখানায় বহু লোকের কাজ জুটিবে। অন্যদিকে চিনির কারখানা হইতে মাৎগুড়, আখের ছিবড়া প্রভৃতি লইয়া ও বিভিন্ন প্রকার কাঠ হইতে কৃত্রিম পেট্রোল ও কৃত্রিম সুরাসার তৈয়ারীর জন্য চলতি কারখানাগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ও নূতন কারখানা খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। এই শ্রেণীর "তৈল" ঠিক পেট্রোলের সমগুণসম্পন্ন নহে। তবে পেট্রোলের সহিত মিশাইলে উহা দ্বারা অনেকটা পেট্রোলের সমান কাজই পাওয়া যায়। যুক্তপ্রদেশে স্থানীয় প্রয়োজনের সহিত তুলনায় এই প্রকার পেট্রোল উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী। উহা কাজে লাগাইবার জন্য উক্ত প্রদেশে কৃত্রিম ও খাঁটি পেট্রোল মিশাইয়া ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতেও পুরা উৎপাদন নিঃশেষ হইবে না। বাকী মালটা যাহাতে পড়িয়া না থাকে—তদুদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ আইন প্রবর্ত্তনের জন্য যুক্তপ্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনা অনুসারে পুরাপুরি কাজ আরম্ভ হইলে জ্বালানী তৈল সম্পর্কে ভারতের পরনির্ভরতা দূর হইবে; বৈদেশিক মুদ্রার খরচও কমিবে।

—যুগান্তর

* * *

পাকিস্তান গঠনের পর যে সমস্ত মুসলমানকে ভারতীয়-যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর থাকিয়া যাইতে হইয়াছিল, তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অতঃপর তাঁহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত প্রজা হিসাবেই এদেশে বাস করিবেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের অনেকেরই আনুগত্য-স্বীকার মৌখিক উক্তিমাত্র। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিতে গুপ্ত সভা-সমিতির অধিবেশন হইতেছে এবং মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে হায়দ্রাবাদী ফৌজে যোগ দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে। বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পাকিস্তান পাইবার পরও এক শ্রেণীর মুসলমান তুষ্ট হইতে পারেন নাই। প্রথমে কাশ্মীর অধিকার করিয়া ও পরে হায়দ্রাবাদে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ সারা ভারতবর্ষ গ্রাস করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। কংগ্রেসের মুসলিম-তোষণ নীতি যে এই সমস্যার কখনও সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিবে, এই দুরাশা কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মন হইতে যত শীঘ্র দূরীভূত হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

—দৈনিক বসুমতী

* * *

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির প্রতি এক নির্দ্দেশনামা প্রচার করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদের স্ব স্ব প্রদেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ডাঃ প্রসাদের নির্দ্দেশনামায় বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসকর্ম্মীদের কোন গঠনমূলক প্রস্তাব থাকিলে তাঁহারা তাহা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট করিতে পারেন এবং নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি এই সকল প্রস্তাব যথাবিধি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। সর্ব্বত্র কংগ্রেসকর্ম্মীরা কর্ত্তা সাজিয়া শাসন বিভাগের, এমন কি কখনও কখনও বিচার বিভাগের দৈনন্দিন কার্য্যে যে পরিমাণ হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ এমন কি কোন কোন প্রাদেশিক মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকেও প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের জেলায় জেলায় এই অপকার্য্য যে ভাবে চলিতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি এবং আমরা একথাও বলিয়াছি যে, ইহার ফলে কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনও যদি কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে দমন করিবার সাহস সংগ্রহ না করেন, তাহা হইলে শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ কুশাসনের যন্ত্রে পরিণত হইতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না। কংগ্রেস সভাপতির নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হইবার আশা করা সম্ভব কি?

—পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

* * *

কয়েকদিন পূর্ব্বে বিভাগীয় কমিশনার লক্ষ্ণৌ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত পরিদর্শনে আসিয়া জনৈক কেরাণীকে নগ্নপদে দেখিতে পান। তাঁহার নগ্নপদের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে কেরাণী ভদ্রলোক তাঁহার দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি মাগ্‌গী ভাতাসহ মাসিক বাহাত্তর টাকা মাহিনা পাইয়া থাকেন এবং ঐ টাকায় তাঁহাকে নয় জনের ভরণপোষণ করিতে হয়। অর্থাৎ ভদ্রলোক তাঁহার পরিবার ভরণপোষণের জন্য জন প্রতি মাসে গড়ে মাত্র আট টাকা ব্যয় করিতে পারেন। অবশ্য ইহাই বর্ত্তমান ভারতে চরম দৃষ্টান্ত নয়, মাসিক বাহাত্তর টাকার অনেক কম মাহিনায় দশ বারজনের সংসার চালাইতে হয় এমন লোক বহু আছে, তাহার উপরে আছে বেকার জীবন। সুতরাং এই সমস্ত লোক যেভাবে সংসার চালাইতেছে তাহাকে রীতিমত ঐন্দ্রজালিক উপায় বলা চলে। বাস্তবিক বর্ত্তমানে একমাত্র ইন্দ্রজাল ছাড়া বাহাত্তর টাকা তো দূরের কথা দুই তিন শত টাকারও কাহারও সংসার চালান সম্ভব নয়। তাই কেহ নগ্নপদে থাকিয়া, অর্দ্ধপেটে রহিয়া জীবনের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাইতেছে।

—যুগান্তর

* * *

পুণার একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতি সম্প্রতি 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতকেই জাতীয় সঙ্গীতরূপে গণ্য করিবার সুপারিশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আসাম, পশ্চিম-বাঙলা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের জনমতও সুস্পষ্টরূপে 'বন্দেমাতরমের' পক্ষে ব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্সঙ্গে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির সমর্থন যুক্ত হওয়ায় অবস্থা অধিকতর অনুকূল হইল। এতগুলি অঞ্চলের জনমত

যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণের পক্ষে, সেইখানে আশা করি, গণপরিষদও বঙ্কিমচন্দ্রের এই অমর সঙ্গীতকেই তাহার যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

* * *

ভারত খণ্ডিত হওয়ার ফলে তুলা, পাট প্রভৃতি কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্য ভারত ইউনিয়নে ঘাটতি ও পাকিস্থানে উদ্বৃত্ত দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে চেষ্টা করিলে তুলা ও পাটের চাষের প্রসার ঘটাইয়া এই ঘাটতির কতক অংশ পূরণ করা চলে, কিন্তু সেজন্য বাঙলা সরকারের কৃষি-বিভাগের তেমন কোনও চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। অথচ রাজসাহী জেলার নওগাঁ অঞ্চলে সরকারী তত্ত্বাবধানে সমবায় প্রথায় গাঁজার চাষ হইয়া সরকারের যে লাভ হইত তাহা পাকিস্থানের অংশে পড়িয়া যাওয়াতে এই খাতে সরকারী লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাই পশ্চিমবঙ্গে গাঁজা চাষের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চলিতেছে। তুলার অভাবে বস্ত্র না পাইলাম, চাউলের অভাবে উদরপূর্ত্তি পূর্ণমাত্রায় নাই বা হইল, পাটের অভাবে চট থলি প্রভৃতি নাই বা মিলিল, গঞ্জিকা সেবন করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী রঙীণ স্বপ্নে বিভোর থাকিতে পারিবে। গঞ্জিকা-বিলাসী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জয় হোক। —ভারত

* * *

বড় আন্দুলিয়া নদীয়ার চাপড়া থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রামে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য চালাইবার জন্য জনাব রেজাউল করিম ও শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে লোকসেবা শিবির নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সম্প্রতি কাহারা শিবিরের একাংশ পোড়াইয়া দিয়াছে। গ্রামবাসীরা জীবন বিপন্ন করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত না করিলে শিবিরটি একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাইত, সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধি-পরায়ণ একদল লোকের দ্বারা যে এই দুষ্কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে শিবির-পরিচালকদের সেই বিষয়ে মোটেই সন্দেহ নাই। কংগ্রেসকে সগৌরবে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করিতেই হইবে। গ্রামোন্নয়ন ও কংগ্রেসের অন্যান্য গঠনমূলক কার্য্যে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যে সাম্প্রদায়িকতা-বাদীরা যাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করা কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব। আমরা এই ঘটনাটির প্রতি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লোকসেবা শিবিরের পুনর্গঠনে স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য এবং সহযোগিতাও একান্ত কাম্য। —যুগান্তর

* * *

রেশম ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন কাশ্মীরের প্রধানতম শিল্প। কাশ্মীরের নবগঠিত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে সেই রেশম শিল্পের সমুচিত উন্নতি বিধানে যত্নপর হইয়াছেন। এতদিন যেভাবে রেশম বস্ত্র উৎপাদন ও তাহা বিক্রয়ের কাজ পরিচালিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণ তন্তুবায়রা উহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইত না। মধ্যব্যবসায়ীরা কারখানায় তন্তুবায় নিয়োগ করিয়া তাহাদের মারফতে রেশম বস্ত্র উৎপাদন করাইত। আর তাহা হইতে মোটা মুনাফা আয়ত্ত করিত। কারখানার তন্তুবায়দিগকে দৈনিক মজুরী দিয়া কাজ করানো হইত। উহাতে গড়ে প্রতি তন্তুবায়ের মাসে ৩০৲ টাকার বেশী পড়িত না। এই অবস্থা রেশম শিল্পের সম্প্রসারণের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়া কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট ঐ শিল্পকে সরকারের হাতে লওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, যে সব তন্তু-বায়ের তাঁত আছে তাঁহারা তাহাদিগকে বিনা মূল্যে কাঁচা রেশম সরবরাহ করিবেন। রেশম বস্ত্র উৎপাদিত হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট তাহা নিজেরা বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এই ব্যবস্থায় মধ্যব্যবসায়ীদের মুনাফা-বৃত্তির কোন সুযোগ থাকিবে না। উৎপন্ন রেশম বস্ত্রের মূল্য অনুযায়ী তন্তুবায়দিগকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভবপর হইবে। কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ এই যে, উহাতে গড়ে প্রতি সাধারণ তন্তুবায়ও মাসে দেড় শত টাকার মত রোজগার করিতে পারিবে। ফলে রেশম বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে রাজ্যে একটা বিশেষ উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইবে। কাশ্মীরে রেশম শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে ও তন্তুবায় শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের এই উদ্যোগ আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। —আর্থিক জগৎ

* * *

বাঙলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানকল্পে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে একটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির প্রস্তাব কার্য্যকরী হইতেছে না উপযুক্ত অর্থাভাবের দরুণ। বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সমিতির সভাপতি। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করিলে সমিতির সদস্যগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করেন। বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বাঙলার বাহিরে বাঙালীরা যাহাতে মাতৃভাষা অধ্যয়ন করিতে পারে—সে বিষয়ে ব্যবস্থা করা উচিত। ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই বাঙলা ভাষার জন্য স্বতন্ত্র আসন থাকা প্রয়োজন। বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি এইদিক হইতে যে কাজ করিতেছেন তাহা প্রশংসনীয়। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হইলে বাঙলার বাহিরে বাঙলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও প্রচার বৃদ্ধি পাইবে। দেশে ধনীলোকের সংখ্যা এখনও এত হ্রাস পায় নাই যে মাতৃভাষা প্রচারে অর্থাভাব ঘটিবে—তবুও এমন একটি মহৎ উদ্যম কার্যকরী হইতেছে না নিছক অর্থাভাবের দরুণ—ইহা প্রকৃতই কলঙ্কের কথা। রবীন্দ্রনাথের পুণ্য নামে যে পুণ্য কাজের সঙ্কল্প, তাহা প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবন কলঙ্কিত হইবে।

—সচিত্র খেয়ালী

* * *

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা—

স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিষ কিরূপ ভীষণ ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আজ তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল মুসলমান হিন্দুস্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারা কিছুতেই তাহাদের পাকিস্থানী মনোভাব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহার ফলে কাশ্মীর যুদ্ধ ও হায়দ্রাবাদ সমস্যা লইয়া তাহাদের মধ্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখা যায় এবং হায়দ্রাবাদ সমস্যা ভীষণতর আকার ধারণ করিলে ভারতীয় মুসলমানগণ যে নিজামকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, তাহা এখন হইতে বুঝা যাইতেছে। পাকিস্থানী নেতারা ভারতবাসী মুসলমানদিগকে তাহাদের গুপ্তচররূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পাকিস্থানবাসী মুসলমানদিগকে যোগ্যতা বিবেচনা না করিয়াই এক এক কর্মের ভার দিয়া পাকিস্থান হইতে হিন্দুস্থানে দলে দলে পাঠাইয়া তাহাদের কার্য্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যে ভারতের নানা স্থানে বহু মুসলমান গুপ্তচর ধরা পড়িয়াছে এবং কি উদ্দেশ্যে তাহারা এ দেশে আসিয়াছে তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। সম্প্রতি গত ২৪শে জুলাই মাদ্রাজে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এ কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শুধু সাম্প্রদায়িকতা নহে, প্রাদেশিকতাও দেশের উন্নতির পথে বিশেষভাবে বাধা দিতেছে। পশ্চিম বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে প্রাদেশিকতার বিষময় প্রচার কার্য্যের ফলে কোন প্রকার সমবেত চেষ্টায় উন্নতিমূলক কার্য্য করা সম্ভব হইতেছে না। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, তিনি সকল প্রকার শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিষ দূর করিবার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। পণ্ডিতজী তাঁহার কথা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন গঠনমূলক কার্য্যই দেশের জনগণের উন্নতি বিধানে সমর্থ হইবে না।

রামকৃষ্ণ বালকাশ্রমে (রহড়া) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু ফটো—ইলেকট্রিক আর্ট ষ্টুডিও

পশ্চিম বাঙ্গালার খাদ্যাবস্থা—

গত ২৩শে জুলাই দিল্লী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পশ্চিম বাঙ্গালার সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম বাঙ্গালায় খাদ্যাবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক আছে। তিনি আরও বলেন—কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডার হইতে পশ্চিম বঙ্গের জন্য আগামী ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খাদ্য বরাদ্দ না করিলে রেশন ব্যবস্থা বলবৎ রাখা

সম্ভবপর হইবে না। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পশ্চিম বঙ্গের ঘাটতি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু সচিব মহাশয়ের এই কথাতেই লোকের পেট ভরিবে না। গত কয় সপ্তাহ ধরিয়া রেশনের দোকানে যে 'বি' চাউল সাড়ে ১৭ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে, তাহা মানুষের গ্রহণের অযোগ্য। ফলে এই বর্ষাকালে প্রতি গৃহে উদরাময় রোগ দেখা দিয়াছে। সচিব মহাশয় ইহার সম্বন্ধে কি কিছু করিতে পারেন না? বর্ত্তমান অবস্থায় চাউলের দাম সাড়ে ১৭ টাকা মণও কম নহে। সাধারণের বিশ্বাস—সরকারী ব্যবস্থা হইতে গলদ দূর করা হইলে চাউলের মূল্য অবশ্যই কমান যাইতে পারে।

রহড়ার রামকৃষ্ণ বালকাশ্রমে প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার মিত্র (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট). মধ্যে স্বামীজী

ফটো—ইলেকট্রিক আর্ট ষ্টুডিও

পূর্ব্ব পাকিস্থানে আটক হিন্দু—

পূর্ব্ব পাকিস্থানে বহু হিন্দু সম্ভ্রান্ত লোককে গভর্ণমেণ্ট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ রাজসাহী—নাটোরের বিশিষ্ট অধিবাসী শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ তালুকদারের নাম করা যায়। বাড়ীতে হাত-বোমা রাখার জন্য এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি, তাঁহার এক অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ও এক নাবালক পুত্র ধৃত হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন মামলা হয় নাই—তাঁহারা রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে আটক আছেন। দ্বিজেনবাবু প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীযুত জে-এন-তালুকদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের কি এ বিষয়ে কিছু করিবার নাই?

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মী স্বামী আত্মবোধানন্দ (উদ্বোধন)

বিনা টিকিটে ভ্রমণ—

ই-আই-রেলের কর্ত্তৃপক্ষ গত মে মাসে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে মোট ১লক্ষ ৭৬ হাজার ৩শত ৬৫ টাকা আদায় করিয়াছেন। দেশে সকল শ্রেণীর যান-বাহনে যাত্রীর ভিড় অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে—তাহার ফলে একদল লোক বিনা টিকিটে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে। লোকের মন দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছে এবং লোকের অভাবও দারুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সকল কারণ একত্রে মিলিয়া যানবাহনগুলি বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে রেল কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কাজ করা উচিত। শুনা যায়, দেশ বিভাগের ফলে কর্ম্মচারীর সংখ্যা সর্ব্বত্র অধিক

হইয়াছে। অতিরিক্ত কর্ম্মচারীদিগকে এই দুর্নীতি দমন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে দুর্ব্বৃত্তদের দমন করা হইবে, রেলে যাত্রীর ভিড় কমিবে ও রেল কর্ত্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পাইবে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (সহ সভাপতি, রামকৃষ্ণমিশন)

নূতন খনি-অঞ্চল প্রদেশ গঠন—

পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গালায় যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা নষ্ট করিবার জন্য ভারতীয় কয়লা খনি মালিক সমিতি বাঙ্গালা ও বিহারের খনি অঞ্চল লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। স্বতন্ত্র শিল্প প্রদেশ এইভাবে গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে—(১) ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চল (২) সিংহভূম ও আসানসোলের দুইটি প্রধান ইস্পাতের কারখানা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল (৩) দামোদর পরিকল্পনা ও সিন্দ্রীর সালফেট পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানা, মিহিজামের এঞ্জিন নির্ম্মাণ কারখানা, উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তাপ-উৎপাদক কেন্দ্র, কয়লা হইতে পেট্রল উৎপাদন কারখানা, আসানসোলের নিকট প্রস্তাবিত ২টি ইস্পাতের কারখানা—নূতন প্রদেশে যাইবে। (৪) ঘাটশিলার তামা কারখানা ও আসানসোলের এলুমিনিয়ম কারখানা (৫) খড়গপুর ও জামালপুরের রেল কারখানা (৬) ঐ অঞ্চলের বিমান ঘাঁটিসমূহ সব নূতন প্রদেশে যাইবে। ঐ ভাবে একটি শিল্প প্রদেশ গঠিত হইলে সেখানে প্রাদেশিকতা থাকিবে না—তাহা সর্ব্ব ভারতের শিল্পীদের প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। খনি-মালিক সমিতির এই নূতন প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে না—যে কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।
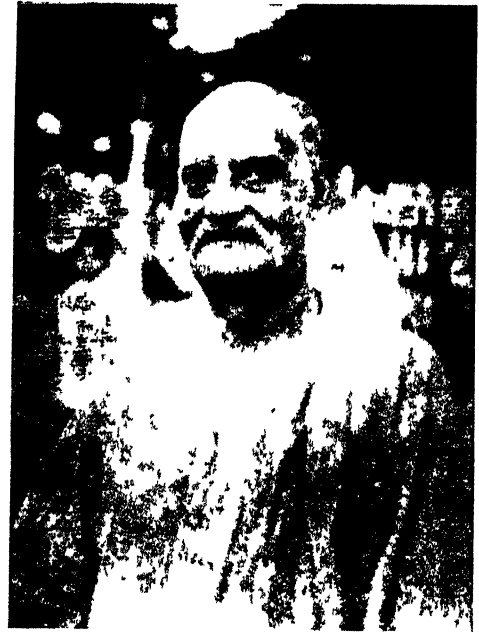
স্বামী শঙ্করানন্দ (সহ-সভাপতি, রামকৃষ্ণমিশন)

বিজ্ঞান ও তাহার ব্যবহার—

জগতে বিজ্ঞানের আলোচনা দিন দিন বাড়িতেছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান গঠনমূলক কাজে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত না হইয়া ধ্বংসমূলক কার্য্যেই অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে এবং তাহার ২৫ বৎসর পরে ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় যুদ্ধে আমরা জগতে বিজ্ঞানের অপব্যবহার ও তাহার কুফল লক্ষ্য করিয়াছি। অবশ্য বিজ্ঞান যে বর্ত্তমান যুগে নানা ক্ষেত্রে বহু সুবিধাবিধান করিতেছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভারতের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। তাঁহার আত্মজীবনী পাঠে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কিরূপ, তাহা জানিতে পারা যায়। সম্প্রতি গত ২৫শে জুলাই তিনি মাদ্রাজ প্রদেশে কারাইকুদী নামক স্থানে যাইয়া তথায় একটি ইলেকট্রো-কেমিকেল গবেষণা ইনিষ্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি স্বাধীন ভারতের নানা স্থানে কয়েকটি গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এটি তাহাদের অন্যতম। এখানে যেরূপ কাজ হইবে, ভারতে ইতিপূর্ব্বে সেরূপ কাজ হয় নাই। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, আচার্য্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এই কার্য্য সম্পাদনের ভার পাইয়াছেন। পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—ভারতবর্ষ হইতে দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তিনি বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় দেশগুলির উন্নতি না হইয়া বরং সর্ব্বত্র ধ্বংসই দেখা গিয়াছে। জার্ম্মাণী ও রুশিয়া তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। ভারতবর্ষ যাহাতে সেই পথে না চলিয়া জন-কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়, পণ্ডিত নেহরুর মত দেশহিত-ব্রতী ব্যক্তিদের প্রথম হইতে সে বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত। সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে কয়েকটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইল, সেগুলিতে কাজ আরম্ভ হইলে ভারতের অন্ন-বস্ত্র সমস্যা ও বেকার সমস্যা যদি দূরীভূত হয়, তবেই স্বাধীন ভারতের অধিবাসীরা স্বাধীনতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

পশ্চিম বাঙ্গালায় কংগ্রেস-কর্ম্মকর্ত্তা—

গত ৬ই আগষ্ট সকাল ৯টায় কলিকাতা কুমারসিং হলে নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রথম সভায় নূতন কর্ম্মকর্ত্তার দল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মোট—৩৬৩ জন সদস্যের মধ্যে ৩৩৪ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের (মন্ত্রী) প্রস্তাবে ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সমর্থনে ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীসুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকিরণশঙ্কর রায় (মন্ত্রী) সভাপতি পদের জন্য শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুরেশবাবু ১৭৫ ভোট ও সুরেন্দ্রবাবু ১৫৬ ভোট পান। শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (মন্ত্রী) ও ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। তাহার পর ৯২ জন সদস্য লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন—সভাপতি—ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক—শ্রীঅতুল্য ঘোষ। সহ-সভাপতি—শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় (মন্ত্রী), শশধর কর, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী। সহ-সম্পাদক—ডাক্তার নৃপেন্দ্র বসু, দেবেন্দ্র সেন, দুর্গা চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র মাল। কোষাধ্যক্ষ—বিজয় সিং নাহার। আমরা নূতন কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।
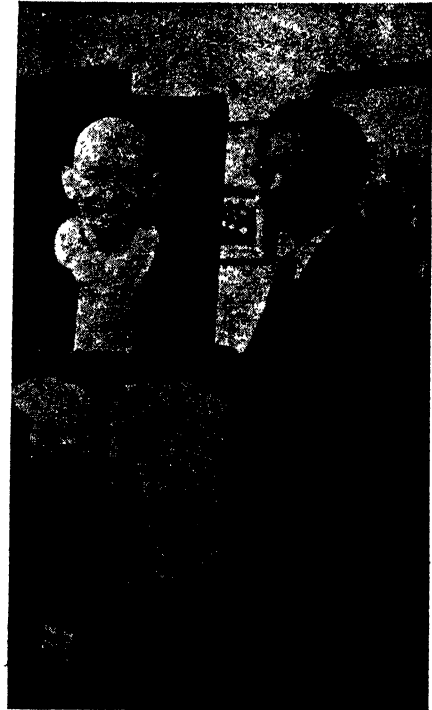
লণ্ডনে মহাত্মা গান্ধীর মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্মাণরত
শিল্পী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর

হিন্দু আইন সংস্কারের প্রস্তাব—

কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দু আইন সংশোধনের কতকগুলি প্রস্তাব করা হইলে সে প্রস্তাব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত গ্রহণ ও আলোচনার পর সে বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশের জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছিল। সার বি-এন রাও,

শ্রীযুক্ত ঘরপুরে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী ও ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র কমিটির সদস্য হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত ৩ জন সদস্য ৩৮ পৃষ্ঠার এক রিপোর্ট দিয়াছেন—কিন্তু ডাঃ মিত্র ১০২ পৃষ্ঠার এক স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ডাক্তার মিত্রের রিপোর্ট বিশেষ মূল্যবান। প্রত্যেক প্রশ্ন সম্পর্কে কে কে বা কোন কোন প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের সপক্ষে এবং কে কে বা কোন কোন প্রতিষ্ঠান উহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন, তিনি তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। দিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র বলিয়াছেন—যাহারা সংস্কারের পক্ষে মত দিয়াছেন—তাঁহারা সাধারণত ব্রাহ্মসমাজ বা আর্য্যসমাজভুক্ত নরনারী। কাজেই কমিটীর সদস্যগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহ গ্রহণের অযোগ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত কমিটীর ৩জন সদস্য একযোগে মত প্রকাশ করিয়াছেন—ভারতকে সমগ্র জগতের সহিত এক তালে চলিতে হইলে আইনের চক্ষে সকলকে সমান অধিকার দান করিতে হইবে এবং

ব্রিটেনের রিচমণ্ড পার্কে অলিম্পিক খেলার ক্যাম্পে ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দল

মূল রিপোর্টে এরূপ তালিকা স্থান পায় নাই। আইন সংশোধনের পক্ষে মত দিয়াছেন ২২৪ ও বিরুদ্ধে ৩৭৫ জন। পুত্র বর্ত্তমানে কন্যার দায়াধিকারের পক্ষে ৮৪ ও বিপক্ষে ২২৪ জন, বিধবার বিব্যূঢ় সম্বের পক্ষে ৪৯ ও বিপক্ষে ১০৪ জন, একাধিকবার বিবাহ অসিদ্ধ করিবার পক্ষে ৭৫ ও বিরুদ্ধে ৯৯ জন, বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষে ১১২ ও বিরুদ্ধে ১৯৭ জন—ইহাতে বুঝা যায় যে প্রস্তাবিত সংস্কারমূলক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধেই অধিকাংশ লোক মত জাতিভেদ ও লিঙ্গভেদমূলক অধিকার ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইবে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে একমাত্র 'স্বরাজ' ব্যতীত কলিকাতার কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র এই প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। 'স্বরাজ' আইনের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেও সে সমর্থনে কোন যুক্তি দেন নাই। কমিটীর নিকট গৃহীত সাক্ষ্যের সংখ্যা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়—দেশবাসী এই পরিবর্ত্তনের সমর্থন করেন না। সামাজিক বন্ধন নষ্ট হইতে দিয়া দেশ ত অগ্রগতির

পথে যায় নাই, ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরও বিদেশী শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত বিকৃত মনোভাব আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকায় একদল লোক এই পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সমাজের হিতকামী এবং দেশের সংহতি ও সম্পদ রক্ষায় যত্নশীল কোন ব্যক্তিই এই পরিবর্ত্তন সমর্থন করিতে পারেন না।

তাঁহার স্থানে ইণ্ডিয়ান-চেম্বার-অফ-কমার্স-নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারও পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুত সুকুমার দত্ত পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে হুগলী কেন্দ্র হইতে শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন পরিষদ সদস্য হইয়াছেন। নলিনীবাবু ও প্রফুল্লবাবু বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। হরেন্দ্রবাবুকে ভোট যুদ্ধে

বোম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ কর্ত্তৃক ভারত সেবাশ্রম সংঘ হইতে প্রেরিত:পূর্ব আফ্রিকাগামী ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের সন্ন্যাসীগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা ৩জন ছাড়া আর একজন মন্ত্রী শ্রীকিরণশঙ্কর রায় এখনও পরিষদের সদস্য হন নাই।

রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—

রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী যখন পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন, তখন তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন না। সম্প্রতি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ রায় ভারত গভর্ণমেণ্টে চাকরী লইয়া দিল্লী যাওয়ায় তাঁহার স্থানে বাঁকুড়া-পশ্চিম-সাধারণ-গ্রাম্য-নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে হরেন্দ্রবাবু পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত প্রভুদয়াল হিমৎসিংকা গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করায়

বাটোয়ারা সংশোধনের দাবী—

র‍্যাডক্লিফ বাটোয়ারা প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরে নদীয়া জেলার হিন্দু অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে এক আন্দোলন আরম্ভ হয় যে, র‍্যাডক্লিফ বাটোয়ারার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগের ফলে ভারতরাষ্ট্র লইয়া জেলা ৫শত বর্গ মাইল জমি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। উহাদের দাবী এই

যে, মাথাভাঙ্গা নদীর পশ্চিমস্থ যে অঞ্চলকে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা পশ্চিম বঙ্গে থাকা উচিত ছিল। সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া এই দাবী যে যুক্তিযুক্ত তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ অংশ অবিলম্বে যাহাতে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেজন্য পশ্চিম বাংলা গভর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ৫শত বর্গ মাইল স্থান—কোন ব্যক্তি বিশেষের ভুলের জন্য—এইভাবে চলিয়া যাওয়া কেহই সহ্য করিবে না।

সিকিমে গণ-জাগরণ—

ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত সিকিম নামক দেশীয় রাজ্যে স্বৈরাচারী শাসনের ফলে জনগণের দুর্দ্দশা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। সেজন্য স্থানীয় জনগণ ষ্টেট-কংগ্রেসের মারফত দাবী করিয়াছেন—(১) লোকায়ত্ত দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা (২) জনগণের প্রতিনিধি লইয়া অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠন ও (৩) ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যাহাতে তথায় এই দাবী সত্বর কার্য্যে পরিণত করা যায়, সেজন্য তথায় গণ-আন্দোলন হইতেছে এবং মহারাজা ও তাহার লোকজন আন্দোলন দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম দশজন—

১৯৪৮ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ১০জন প্রথম ১০টি স্থান অধিকার করিয়াছেন—১। শ্রীউদয়শঙ্কর গাঙ্গুলী—ভবানীপুর মিত্র ইনিষ্টিটিউশন ২। শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত—ভবানীপুর মিত্র ইনিষ্টিটিউশন ৩। শ্রীসুনীলকুমার সিংহ—বীরভূম জেলা স্কুল ৪। শ্রীঅনাদিশঙ্কর গুপ্ত—আসানসোল উষাগ্রাম বয়েজ হাই স্কুল ৫। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুহ—সরস্বতী ইনিষ্টিটিউশন ৬। শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত—ভবানীপুর মিত্র ইনিষ্টিটিউশন ৭। শ্রীরথীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সাউথ সুবার্ব্বান স্কুল-মেন ৮। শ্রীসুনীলচন্দ্র নন্দী—বীরভূম জেলা স্কুল ৯। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য—২৪পরগণা জয়নগর ইনিষ্টিটিউশন ১০। শ্রীনীতীশচন্দ্র মিত্র—সাউথ সুবার্ব্বান স্কুল—ব্রাঞ্চ। পরবর্ত্তী জীবনে এই সকল ছাত্র কিরূপ সাফল্য লাভ করে, সে বিষয়ে দেশে আলোচনা ও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

হায়দ্রাবাদের অবস্থা—

গত ২৪শে জুলাই হায়দ্রাবাদে নিজামের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত জে-ভি-যোশী পদত্যাগ করিয়া এক বিবৃতিতে হায়দ্রাবাদের প্রকৃত অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"জনসাধারণের অর্থের দ্বারা সাধারণের ধনপ্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে পুলিস ও সৈন্যবাহিনী রাখা হইয়াছে, তাহারা শান্তিপ্রিয় হিন্দু নাগরিকদের স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করা দূরে থাকুক, তাহাদের নিকট সাহায্য চাহিয়াও পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে হিন্দুদের নিকট যে সকল আগ্নেয়াস্ত্র রহিয়াছে, কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া অথবা না জানাইয়া সেগুলি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে।" তাঁহার বিবৃতিতে তিনি যে অত্যাচারের তালিকা প্রদান করিয়াছেন, নিজামের পক্ষে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ অবস্থা অধিক দিন চলিতে দিলে হায়দ্রাবাদের সংখ্যাগুরু অধিবাসী হিন্দুরা তথায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কাজেই পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার গভর্ণমেণ্টের সত্বর এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা ও কর্ত্তব্যে অগ্রসর হওয়া উচিত বলিয়া সকলে মনে করিতেছেন।

পাকিস্থানে মাল চুরি—

আসাম প্রদেশে দারুণ চাউল-সঙ্কট দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে কলিকাতা হইতে ৮০ হাজার মণ ব্রহ্মদেশীয় চাউল আসামে প্রেরণ করা হইতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে পাকিস্তান এলাকায় উক্ত চাউল রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে। একখানি ষ্টীমার করিয়া নদীপথে চাউল পাঠান হইয়াছিল—ষ্টীমার গন্তব্যস্থলে পৌছিলে দেখা যায়—চাউলপূর্ণ থলেগুলির ওজন কমিয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের মধ্য দিয়া ছাড়া আসামে কোন জিনিষ পাঠানো যায় না। রেলযাত্রীদিগকেও পাকিস্তানের মধ্য দিয়া আসাম যাইতে হয়। রেলের কামরা হইতে জিনিষপত্র অদৃশ্য হয়—মালগাড়ীর মাল কমিয়া যায়। পূর্ব্ব পাকিস্তানে একদল নিয়মিতভাবে এই চোরাই ব্যবসা করিতেছে। তাহাদের দমনেরও কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। ভারত গভর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

প্রতাপচন্দ্র হোমিও কলেজে গভর্ণর—

বাঙ্গালার গভর্ণর ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু সম্প্রতি কলিকাতায় প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই তিনি তথায় আসিয়াছেন। দরিদ্র দেশে তিনি সকলকে সুলভ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচারে যত্নবান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশে হোমিওপ্যাথী রাজসম্মান-প্রাপ্ত হইয়াছে—তিনি পশ্চিম বাঙ্গালায়ও তাহা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

যামিনীভূষণ যক্ষ্মা হাসপাতাল—

কলিকাতায় যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালের অধীনে যে যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে—উহা দমদম পাতি-পুকুর ২৯ কে-কে-দেব রোডে অবস্থিত—তথায় ৫০টি যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা হইয়া থাকে। সম্প্রতি অর্থাভাবে হাসপাতালগুলির কার্য্য উপযুক্তভাবে চলা অসম্ভব হইয়াছে। গৃহগুলি জীর্ণ, সেগুলি সংস্কারের জন্য অবিলম্বে ১৫ হাজার টাকা প্রয়োজন। হাসপাতালের বার্ষিক ব্যয় দেড় লক্ষ টাকা। কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে মাত্র বার্ষিক ৪৮ হাজার টাকা পাওয়া যায়। ১৭০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের সাধারণহাসপাতালেও ১২৫ জন রোগীর স্থান আছে। স্বাধীন দেশে যাহাতে জাতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থাভাবে বন্ধ না হয়, সেজন্য মহাপ্রাণ দেশবাসীদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আসামের ইতিহাস প্রকাশ—

জলপাইগুড়ী আনন্দচন্দ্র কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত রেবতীমোহন লাহিড়ী নয়া দিল্লীতে অবস্থিত ভারত সরকারের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূল দলিল অবলম্বনে ইংরেজ কর্ত্তৃক আসাম-বিজয় (১৮২৪—১৮৫৪) নামক একটি ইতিহাস-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই যুগের আসামের কোন প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয় নাই। সম্প্রতি বরদলৈ মন্ত্রিসভা অধ্যাপক লাহিড়ী মহাশয়ের পুস্তকখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধামাতা—

এই ধর্ম্মপ্রাণ মহিলা বাংলার নানাস্থানে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন ও সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া

শ্রদ্ধামাতা

সৎকথা প্রচার করিতেছেন। তিনি আপন মধুর ব্যবহারে সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। জনগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধামাতা আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন।

ভারতে সমাজতন্ত্রী রাজ্য প্রতিষ্ঠা—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৯ই আগষ্ট কলিকাতায় আগষ্ট-বিপ্লবী শহীদ-স্মৃতি সভায় বক্তৃতা-কালে বলিয়াছেন—ভারতে সমাজতন্ত্রী রাজ্য প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসীদের কাম্য। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে সাধারণ শ্রমিকগণ ভারতীয় শ্রমিকগণ অপেক্ষা অনেক বেশী সুখী। এদেশের শ্রমিকগণকে তাহাদের আদর্শে অধিক কাজ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আগামী নির্ব্বাচনে যাহাতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অধিক প্রতিনিধি জয়যুক্ত হন, এখন হইতে দেশের জনগণকে

সেইরূপ শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। আজ দেশের শ্রমিকগণের কার্য্যের ধ্বংসমূলক সমালোচনা না করিয়া সকলেরই গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত—তবেই দেশ উন্নতিলাভে সমর্থ হইবে।

ডাক্তার শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

বীরভূমের জননায়ক ডাক্তার শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি পরিণত বয়সে তাঁহার সিউড়ীর বাসগৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল জেলা

৺শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৬ পর্য্যন্ত বীরভূম হইতে নির্ব্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। সুচিকিৎসক ও পরদুঃখকাতর হিসাবে তিনি জেলার সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গে মন্ত্রিসভা সমর্থন—

হুগলীর খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ বিনা বাধায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবার পরই এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—বঙ্গীয় কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তার পরিবর্ত্তনে লোক মনে করিতেছে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া যাইবে। সাধারণের সে ধারণা ভ্রান্ত। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভা কংগ্রেসের সকল দলের সমর্থনলাভ করিয়াছে ও করিবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা শক্তিশালী ও স্থায়ী। সকলেরই বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কার্য্য সমর্থন করিয়া দেশের উন্নতিমূলক কার্য্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের অর্থনীতিক ও সামাজিক কর্ম্মসূচি কার্য্যে পরিণত করার জন্য পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসের নূতন কর্ম্মকর্ত্তারা এখন বিশেষভাবে অবহিত হইয়া কাজ করিবেন।

পরলোকে সতীশচন্দ্র বসু—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় গত ২১শে জুলাই ৬১ বৎসর বয়সে কলিকাতা ১০৩-এ সৈয়দ আমীর আলি এভেনিউস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ৯ বৎসর পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করেন ও পরে কলিকাতায় আসেন। তিনি বহু বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস-কার্য্য ও দেশসেবায় তিনি চিরদিন আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুও রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরিচিত।

পরলোকে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার—

বিখ্যাত শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ২২শে জুলাই মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে তাঁহার ১নং পার্ক সাইড় রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সাধারণ শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তিনি শিল্পীর জীবন গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ২ বৎসর ও জুবিলী আর্ট একাডেমীতে ২ বৎসর শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২১ সালে তাঁহার একখানি ছবি বোম্বাই প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করিলে তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। পাতিয়ালার মহারাজা তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন ও তাঁহাকে রাজশিল্পীর সম্মান দান করিয়াছিলেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় ভারতীয় দলের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এই প্রথম অপরাজিত অবস্থায় লীগ বিজয়ী হয়েছে। লীগের খেলায় প্রথম অপরাজেয় রেকর্ড করে ১৯০০ সালে রয়েল আইরিশ রাইফেলস। ১৯০১ সালে তারা পুনরায় অপরাজিত অবস্থায় লীগ বিজয়ী হয় এমন কি কোন খেলা ড্র না করে এবং একটাও গোল না খেয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করে। এ রেকর্ডের সমান এ পর্য্যন্ত কোন দলই করতে পারে নি। কোন খেলায় না হেরে বা ড্র না করে লীগ বিজয়ী হয়েছে ১৯০৮ সালে গর্ডনস এবং ১৯১২ সালে ব্লাকওয়াচ। লীগে অপরাজেয় হয়েছে ১৯০৩ সালে ৯৩ হাইল্যাণ্ডার্স ১টি খেলা ড্র করে, ১৯০৫ সালে কিংসওন ৪টি খেলা ড্র করে, ১৯১৬ সালে ক্যালকাটা ৮টি খেলা ড্র করে, ১৯২২ সালে ক্যালকাটা ১টি খেলা ড্র করে, ১৯২৭ সালে ১ম নর্থ ষ্টাফোর্ড ৪টি খেলা ড্র ক'রে। এ বছর নিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৮বার লীগ বিজয়ী হ'ল। বেশীবার লীগ পাওয়ার রেকর্ড ছিল ক্যালকাটা ক্লাবের। এ দলও ৮বার লীগ পেয়েছে। তবে ক্যালকাটা প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় যোগদান করেছে ১৮৯৮ সালে আর মহমেডান স্পোর্টিং মাত্র ১৯৩৪ সালে। অর্থাৎ সুদীর্ঘ ৫১ বছরের খেলায় ক্যালকাটা ৮বার লীগ বিজয়ী হয়েছে আর অন্যদিকে মহমেডান স্পোর্টিং মাত্র ১৫ বছরে ক্যালকাটার রেকর্ডের সমান করেছে। ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলন হেতু খেলা বন্ধ ছিল সুতরাং এ বছরটা বাদ দিতে হবে।

১৯৪২ সালের লীগ খেলায় মোহনবাগান দল এক পয়েন্টের ব্যবধানে রাণার্স আপ হয়ে লীগে অপরাজেয় ছিল। লীগ চ্যাম্পিয়ান না হলেও লীগের খেলায় ভারতীয়দলের মধ্যে অপরাজেয় রেকর্ড মোহনবাগান দলই প্রথম স্থাপন করে। প্রসঙ্গত বলা যায় লীগের খেলায় অপরাজিত অবস্থায় কোন দলই এ পর্য্যন্ত রাণার্স আপ হ'তে পারে নি।

বিগত দিনের মহমেডান দলের খেলার ষ্টাণ্ডার্ডের তুলনায় এ বছরের মহমেডান দল কোন দিক থেকেই দাঁড়াতে পারে না। এ বছরের মহমেডান দল অপরাজেয় রেকর্ড করতে সক্ষম হয়েছে ক'লকাতার নিম্নগামী খেলার ষ্টাণ্ডার্ড এবং শক্তিশালী মিলিটারী ফুটবল দলের অভাব হেতু। খেলায় যেমন দক্ষতা দলকে বিজয়ের পথে নিয়ে যায় তেমনি ভাগ্যও যথেষ্ট সাহায্য করে। খেলাধূলায় এ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এবার লীগে মহমেডান-ইষ্টবেঙ্গলের দুটী খেলাতেই ইষ্টবেঙ্গল সর্ব্বক্ষণ ভাল খেলেও ভাগ্যদোষে শেষে পরাজিত হয়েছিল। কেবলমাত্র মহমেডান দলই যে ভাগ্যগুণে বিজয়ী হয়েছিল এ বলি না, অনেক খেলাতে অনেক দলই এইভাবে বিজয়ী হয়েছিল এবং ফলে বলা যায় খেলায় দক্ষতা যেমন থাকা দরকার সেই সঙ্গে ভাগ্যও দরকার এবং খেলায় ভাগ্যও একটি অঙ্গ বিশেষ বলা চলে। মোহনবাগান মহমেডান দলের লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়রা দলের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছেন মারাত্মক ভুল খেলার পরিচয় দিয়ে। খেলোয়াড়রা ছাড়া খেলোয়াড় মনোনয়ন কর্ত্তৃপক্ষের ত্রুটিও ছিল। কারণ এতবড় খেলায় লীগের নিয়মিত খেলোয়াড়দের বসিয়ে অন্য খেলোয়াড়দের খেলবার সুযোগ দিয়েছিলেন। লীগে যাঁরা নিয়মিত খেলছিলেন তাঁরা যে খুব উচ্চাঙ্গের তা নয়,

তবে এক্ষণে তাঁদের দলের হয়ে খেলার স্থান প্রথম এবং সঙ্গত।

লীগের ২১টা খেলায় মোহনবাগান মাত্র ২টি গোল খেয়ে মহমেডান দলের সঙ্গে ফিরতি খেলাতে অর্থাৎ একটা খেলাতেই ২টি গোল খেয়ে বসে। গোল এভারেজে মোহনবাগান অন্য দলের থেকে তবুও প্রথম স্থানে আছে।

পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলায় মোহনবাগান যেভাবে খেলে জয়ী হয়েছে তার একাংশ যদি অন্যান্য দলের সঙ্গে খেলতো তা হ'লে অনেক খেলা ড্র না ক'রে কেবল জয়ী হ'ত না লীগবিজয়ী হতে পারতো।

প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় কাষ্টমস এবার সর্ব্বনিম্ন স্থান পেয়েছে। আগামীবার থেকে তাদের দ্বিতীয় বিভাগে খেলার কথা। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে উঠেছে রাজস্থান ক্লাব।

কলকাতায় চীনা ফুটবলদল ঃ

অলিম্পিক যোগদানকারী চীনা ফুটবল দল কলকাতায় ৪টি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় যোগদান করেছিল। প্রথমদিনের খেলায় এই দলটি ৩-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে; দ্বিতীয় খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হয়। মোহনবাগান দলের সঙ্গে খেলা ড্র যায়। আই এফএ একাদশ ১-০ গোলে চীনা অলিম্পিক ফুটবলদলকে পরাজিত করে। ১৯৩৬ সালের চীনা ফুটবল দলের খেলা যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা এই দলের খেলা দেখে হতাশ হয়েছেন। খেলা ছাড়া এই দলটির জনৈক খেলোয়াড় রেফারীকে শারীরিক লাঞ্ছনা ক'রে যে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন তা আমরা অলিম্পিক যোগদানকারী কোন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আশা করতে পারিনি। একমাত্র প্রথম দিনের খেলাতেই চীনাদল ভাল খেলেছিল; বাকি খেলাগুলি এখানের সাধারণ লীগের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের থেকে বেশী উন্নত মনে হ'ল না। চারদিনের খেলাতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। বহু টাকা টিকিট বিক্রী বাবদ সংগৃহীত হয় এবং তার মোটা অংশ চীনাদলকে দিতে হয়। আর আমাদের দেশের যে সব দল এই খেলায় যোগদান ক'রে এই প্রচুর অর্থ সংগ্রহে সহযোগিতা করেছিল তাদের ক্লাবের উন্নতি বিধানার্থে একটা কাণা কড়িও মিলেনি। দেশের লোক নির্দ্দোষ আনন্দ লাভের জন্য মাত্র কয়েক দিনে লক্ষাধিক টাকা যে ব্যয় করলো তার ন্যায্য অংশ এই প্রদর্শনী খেলায় যোগদানকারী দলের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিলে তাদের ব্যয় সার্থক হ'ত। আমাদের দেশের ক্লাবগুলি অর্থাভাবে ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বৃদ্ধির কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছেনা; প্রদর্শনী, চ্যারিটি এবং লীগ-শীল্ডের খেলা থেকে যদি তাদের অর্থ উপার্জ্জনের পক্ষে কোন বাধা না থাকে তাহলে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্বভাবতই উন্নত হবে সেই অর্থ যথাযথ ব্যয় করলে।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্টম্যাচ ঃ

খুবই উত্তেজনাপূর্ণ খেলার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে এ বছরের ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে জয়ী হয়েছে। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিযার টেষ্ট ম্যাচের ইতিহাসে এই খেলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে স্থান লাভ করেছে। টেষ্টম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে এত অধিক রাণ এ পর্য্যন্ত কোন দলই তুলতে পারেনি। ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে অষ্ট্রেলিয়া দল খেলার চতুর্থ ইনিংসে ৩ উইকেটে ৪০৪ রাণ তুলে রেকর্ড স্থাপন করেছে। ক্রিকেট জগতে একপ্রকার যা অসম্ভব বলে ধরা হত অষ্ট্রেলিয়া তাই সম্ভব করে জগতের ক্রীড়ামোদীদের চমৎকৃত করেছে।

টেষ্ট ম্যাচের শেষ দিনে ইংলণ্ডের ক্যাপটেন ইয়ার্ডলে তাঁর দলের অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা যথারীতি সুরু করলেন কিন্তু ২টো ওভার খেলার পর ৮ উইকেটে ৩৬৫ রানের মাথায় ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। খেলা শেষ হ'তে হাতে মাত্র ৩৫৫ মিনিট সময়। অষ্ট্রেলিয়াকে খেলায় জয়লাভ করতে হলে ৪০৪ রান তুলতে হবে। ক্রিকেট খেলায় ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার কারণ এরূপ কোনদিন খেলায় সম্ভব হয়নি। অষ্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। প্রথম উইকেট পড়লো দলের ৫৭ রানে, হ্যাসেট ১৭ রানে আউট হলেস। মরিসের সঙ্গে স্বয়ং ব্র্যাডম্যান জুটী হয়ে খেলার ভোলই পাল্টে দিলেন। মরিস ১৮২ রান করে আউট হলেন; এরপর মিলার ১২ রানে। ব্রাডম্যান একটা বাউণ্ডারী করে দলের ৪০০ রান পূর্ণ করলেন; তাঁর সঙ্গী হার্ভে তারপরই অপর একটি বাউণ্ডারী করলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪০৪ উঠে যায়। ব্র্যাডম্যান ১৭৩ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ইংলণ্ডের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র গেছে।

ইংলণ্ড ঃ ১ম ইনিংস—৩৬৩ (ডেনিস কম্পটন ১৪৫। লিণ্ডওয়াল ৯৯ রাণে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস—১৭৪ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওয়াসব্রুক ৮৫)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ১ম ইনিংস—২২১ (মরিস ৫১। বেডসার ৮১ রাণে ৪ এবং পোলার্ড ৫৩ রাণে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস—৯২ (১ উইকেট। মরিস নট আউট ৫৪)

খেলা-ধূলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

চতুর্দ্দশ অলিম্পিক ঃ—

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত চতুর্দ্দশ অলিম্পিক প্রায় সমাপ্তির পথে। আড়াই হাজার বছরেরও আগে ৭৭৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক নামক স্থানে যে ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রথা প্রথম আরম্ভ হয়ে প্রায় বারশত বৎসর পর্য্যন্ত চলেছিল, তারই জের টেনে আধুনিক কালের চতুর্দ্দশ অলিম্পিক বিশ্বের সেরা সহর লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বের প্রাচীন গ্রীসের এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রথাকে দেড় হাজার বছর পরে পুনরায় এই আধুনিক কালে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পুনঃ প্রবর্ত্তন করার জন্য ফ্রান্সের ব্যারণ পীয়ের দ্য কুবাঁর্তার (Baron Pierre De Coubertin) কাছে বিশ্বের ক্রীড়ামোদীগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে তিনবার অলিম্পিক অনুষ্ঠান মহাযুদ্ধের জন্য বন্ধ হয়েছে। ১৯১৬ সালের বিশ্ব-অলিম্পিক যা বার্লিনে হবার কথা ছিল তা বন্ধ হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য এবং ১৯৪০ সালের, যা টোকিওতে হবার কথা ছিল, ও ১৯৪৪ সালের বিশ্ব-অলিম্পিক বন্ধ হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য। ১৯৩৬ সালের বার্লিনে অনুষ্ঠিত একাদশ অলিম্পিকের পরে ১৯৪৮ সালে পুনরায় এই চতুর্দ্দশ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মধ্যে কেটে গেছে দীর্ঘ বার বৎসর। এর মধ্যে কত ওলট পালট হয়ে গেছে পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবে। আজ ইউরোপ ক্ষতবিক্ষত, জার্মাণ সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, জাপান মুমূর্ষু! জার্মাণ এ্যাথ্লেট ও জাপানী সাঁতারুদের অভাব এই চতুর্দ্দশ অলিম্পিকে বিশেষ করে অনুভূত হয়েছে। ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে জার্মাণী প্রথম স্থান অধিকার করেছিল ৫৮৪ পয়েণ্ট পেয়ে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য হয়েছিল দ্বিতীয় ৩৮৯ পয়েণ্ট পেয়ে। সন্তরণ প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়ে জাপান প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। দ্বিতীয় হয়েছিল আমেরিকার যুক্তরাজ্য। জার্মাণী ও জাপানের প্রতিযোগীগণ লণ্ডন অলিম্পিকে যোগদান করতে পারলে ট্র্যাক্ ও সন্তরণ বিষয়ে আমেরিকার প্রাধান্য অনেকটা খর্ব্ব হত বলে মনে হয়। অবশ্য আমেরিকার নিগ্রো স্প্রিণ্টাররা যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়বাজ

গ্রীক্ স্প্রিণ্টার
(ষ্টার্ট নেবার আদর্শ ভঙ্গী)

তার প্রমাণ দিয়েছেন বার্লিন অলিম্পিক-বীর জেস্ ওয়েন্‌স্ ও বর্ত্তমান লণ্ডন অলিম্পিকে হ্যারিসন্ ডিলার্ড। আমেরিকার স্প্রিণ্টাররা দ্রুত দৌড়ে যদিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতায় তাঁরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেন না। এর কারণ দেখাতে গিয়ে বর্ত্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী ব্যক্তি হ্যারিসন ডিলার্ড বলেছেন যে আমেরিকানরা সব কিছুর মধ্যেই দ্রুততা চায়। সেজন্য দৌড়ের মধ্যেও তারা দ্রুত দৌড়কেই পছন্দ করে। তার উপর বিখ্যাত নিগ্রো স্প্রিণ্টার জেস্ ওয়েন্‌স্, রাল্‌ফ্ মেটকাফ ও এডি টোলানের দৃষ্টান্ত আমেরিকান নিগ্রো স্প্রিণ্টারদের অনুপ্রাণীত করেছে। তাই দেখা যাচ্ছে দ্রুত দৌড়ে আমেরিকার নিগ্রো স্প্রিণ্টাররা আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছে।

অলিম্পিকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিযোগীতা হচ্ছে ম্যারাথন দৌড়। এই দৌড়ে ২৬ মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করতে হয়। কথিত আছে, প্রাচীনকালে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৯০ সালে পারস্যের উপর গ্রীসের জয়লাভের সংবাদ ম্যারাথন নামক স্থান থেকে ফিডিপ্পিডিস নামে একজন গ্রীক্ যোদ্ধা বহন করে এথেন্স অবধি দৌড়ে এসেছিল। এথেন্সে পৌছে কিন্তু খালি জয়লাভের সংবাদটি ছাড়া আর কিছুই সে বলতে পারে নি। যুদ্ধের পর এই দীর্ঘপথ দৌড়ে আসার কঠোর পরিশ্রমে প্রথম ম্যারাথন দৌড় বীরের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার থেকেই অলিম্পিকে এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগীতার প্রচলন হয়। ১৮৯৬ সালের এথেন্সে অনুষ্ঠিত আধুনিক যুগের প্রথম অলিম্পিক ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগীতায় স্পিরিডন্ নামে একজন গ্রীক্ রাখাল বালক জিতেছিল। ম্যারাথন থেকে এথেন্সে ষ্টেডিয়াম পর্য্যন্ত এই ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করতে তার সময় লেগেছিল ২ ঘণ্টা ৫৫, মিনিট। বর্ত্তমানে এই চতুর্দ্দশ অলিম্পিকের ম্যারাথন্ দৌড় প্রতিযোগীতা জিতেছে আর্জ্জেনটিনার ডেল্‌ফোর কাব্‌রোরা ২ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ৫১.৬ সেকেণ্ডে। দ্বিতীয় হয়েছে গ্রেট ব্রিটেনের টম্ রিচার্ডস। বিগত বার্লিন অলিম্পিকেও গ্রেট ব্রিটেন ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগীতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। প্রথম হয়েছিল কোরিয়ার কিটেইসান।

মহিলাদের প্রতিযোগীতাগুলিতে হল্যাণ্ডের মহিলা এ্যাথ্‌লেটরা বিগত একাদশ অলিম্পিক থেকেই বেশ সাফল্য লাভ করে আসছেন। গত অলিম্পিকে যদিও জার্ম্মাণ ও আমেরিকান মহিলা এ্যাথ্‌লেটরা ফিল্ড ও ট্রাক প্রতিযোগীতায় প্রথম হয়েছিল, কিন্তু হল্যাণ্ডের মহিলা সাঁতারুরা সন্তরণ প্রতিযোগীতার প্রায় সবগুলি বিষয়ে প্রথম হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। বর্ত্তমান লণ্ডন অলিম্পিকেও মহিলাদের প্রতিযোগীতায় হল্যাণ্ড তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ, ট্রাক প্রতিযোগীতায় তার পৃথিবী শ্রেষ্ঠা মহিলা এ্যাথ্‌লেট মিসেস্ ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কারস্-কোয়েনের সাহায্যে দিয়েছে। তিনটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক প্রাপ্তা, তিরিশ বৎসর বয়স্কা ডাচ্ জননী মিসেস্ ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কারস্-কোয়েন মহিলাদের প্রতিযোগীতায় তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়ে চতুর্দ্দশ বিশ্ব-অলিম্পিকে যে নূতন ইতিহাস রচনা করলেন, তা পৃথিবীর মহিলা এ্যাথ্‌লেট ও ক্রীড়ানুরাগীদের চিরকাল অনুপ্রাণীত করবে। ৮০ মিটার হার্ডল্ রেসে ব্ল্যাঙ্কাসরস্-কোয়েন ব্রিটেনের মিস্ মরিস গার্ডনারকে খুব অল্পের জন্য পরাজিত করতে সমর্থ হন। দুইজনেই ১১.২ সেকেণ্ডে দৌড় সমাপ্ত করে পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন অলিম্পিক ও পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ব্ল্যাঙ্কাসরস্-কোয়েন ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৮০ মিটার হার্ডল্ এই তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়েছেন।

মহিলাদের ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সন্তরণে প্রথম পাঁচ-জনই পূরাণ রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করে অপূর্ব্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম হয়েছেন যুক্তরাজ্যের আন্ কার্টিস।

আধুনিক পেণ্টাথলন প্রতিযোগীতায় ৩৪ বৎসর বয়স্ক সুইডিস আর্টিলারী অফিসার ক্যাপ্টেন উইলি গ্রুট্ ১৬ পয়েণ্ট পেয়ে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "অল্ রাউণ্ড স্পোর্টস্-ম্যান"এর সম্মান লাভ করেছেন। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তিনি সুইমিং, রাইডিং ও ফেন্সিং এই তিনটিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

ভারতবর্ষ থেকে যে সব প্রতিযোগী বিশ্ব-অলিম্পিকে যোগদান করেছেন, একমাত্র হকিদল ছাড়া তাঁদের উপর বিশেষ ভরসা আমাদের ছিল না। তবে কয়েকটি বিষয়ে

বিশেষ সাফল্যলাভের আশা করা গিয়েছিল। এর মধ্যে হপ্-স্টেপ্ এ্যাণ্ড জাম্পই প্রধান।

হপ্-স্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প এ মাইশোরের হেনরী রেবেলোর প্রথম স্থান অধিকার করে সর্ব্বপ্রথম ভারতের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক পাবার সম্ভাবনা খুবই ছিল কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী ভারতের উপর বিরূপ হলেন। রেবেলো প্রথম লাফের পরেই উরুতের পেশী টেনে ধরায় আর লাফাতে সক্ষম হন না এবং অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। রেবেলোর এই দুর্ভাগ্যে ভারতের যে কত বড় ক্ষতি হ'ল তা ক্রীড়ামোদী মাত্রেই বুঝতে পারছেন। এ রকম দুর্ভাগ্য ভারতের আরও ঘটেছে। ম্যারাথন্ দৌড় প্রতিযোগীতায় ভারতের ছোটা সিং দশ মাইল দৌড়াবার পরেই তাঁর ডান পায়ের এ্যাঙ্কেল মচ্ কে ফেলেন। এর পর আরও পাচ মাইল তিনি দৌড়ান কিন্তু তারপর তাঁকে এ্যাম্বুলেন্সে উঠতে হয়।

কুস্তি ও মুষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগীতায় ভারত তবু কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার পর পরাজয় বরণ করেছে কিন্তু সবচেয়ে হতাশ করেছে ওয়াটার পোলো খেলায় স্পেনের কাছে ১১-১ গোলে ও হল্যাণ্ডের কাছে ১২-১ গোলে শোচনীয় ভাবে হেরে। ফুটবল প্রতিযোগীতায় ভারতবর্ষ যদিও প্রথম রাউণ্ডেই ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছে তবুও তারা আমাদের একেবারে হতাশ করেনি। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার পর ভারতীয় দল দুর্ভাগ্য বশতঃ পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে তারা দু' দু'টা পেনালটি সটের সুযোগ নষ্ট করেছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে তারা জয়ী হতে পারত বলে মনে হয়। ভারতীয় দলের লেফ্‌ট ফুল ব্যাক্ মোহনবাগান ক্লাবের শৈলেন মান্নার খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। দু'টি পেনালটি সটের একটিও অন্ততঃ মান্নাকে মারতে দেওয়া অধিনায়ক টি, আওএর উচিত ছিল। মান্নার সটের তীব্রতা একই ক্লাবের খেলোয়াড় হিসাবে আওএর ভালই জানা আছে।

মনে পড়ছে, এই ফুটবলদল পাঠানোর ব্যাপারে কি বিরুদ্ধ সমালোচনাই না এ দেশে হয়েছিল! আমাদের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া অন্য সমস্ত সমালোচকই এই দল পাঠানোর বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল ভারতীয় ফুটবল দল দেশের মুখে চুণ-কালি মাখিয়ে আসবে। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে সত্যই ভারতীয়দল দেশের মুখে চুণ-কালি মাখায় নি। বরং ভারতবর্ষ ফুটবল খেলায় যে একেবারে পিছিয়ে নেই সে কথা বিশ্বের ফুটবল মহলে জানিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া দলের খেলোয়াড়রাও অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পেয়েছেন, যা ভারতের ফুটবল ভবিষ্যত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আশা করি আগামী বিশ্ব-অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দল বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করবেন।

১০০ মিটার ওয়াকিং প্রতিযোগীতায় ভারতের সুবোধ সিংহকে কিছুটা হাঁটবার পর ত্রুটিপূর্ণ ওয়াকিংএর জন্য প্রতিযোগিতা থেকে অপসারিত করা হয়। সুবোধ সিংএর ওয়াকিংএর যে দোষ আছে তা' কি বাংলার বা ভারতের কোনও এ্যাথ্‌লেটিক্‌স্ বিচারক বা অপর কেহ লক্ষ্য করেন নি? সিংহকে অলিম্পিকে পাঠাবার আগে তাঁর এই ত্রুটি শোধরাবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আমার মনে আছে ইডেন গার্ডেনে ট্রায়ালের সময়, যাতে সুবোধ সিংহ প্রথম হয়েছিলেন, কয়েকজন ক্রীড়ামোদী সিংহের এই ত্রুটী লক্ষ্য করেছিলেন এবং একথা বলাও হয়েছিল কিন্তু তার কোন ব্যবস্থাই হয়নি।

ভারতের একমাত্র আশাস্থল ভারতের অপরাজেয় হকিদল গ্রেট ব্রিটেনকে ফাইন্যাল খেলায় ৪-০ গোলে পরাজিত করে তাঁদের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রেখে উপর্য্যুপরি চতুর্থবার বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ২০ বৎসর ধরে ভারতীয় হকিদল বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করে আসছেন। এর মধ্যে ভারতকে পরাজিত করবার ক্ষমতা কোন দেশেরই হয়নি। বিশ্বের ক্রীড়াজগতে ভারতগৌরব এই ভারতীয় হকিদলই ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি যাঁরা উপর্য্যুপরি ভারতের সম্মান রক্ষা এবং বর্দ্ধিত করে আসছেন। বিদেশী কোন খেলাকে এরকম চরম সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্ত করা যে কত কঠিন তা আমাদের ফুটবল, ক্রিকেট, এ্যাথ্‌লেটিক্স, বক্সিং প্রভৃতি বিষয়গুলির স্ট্যাণ্ডার্ড থেকেই বুঝা যায়। ভারতীয় হকিদলের এই সাফল্যে আজ সমগ্র ভারতীয় ক্রীড়াজগৎ গর্ব্ব অনুভব করছে।

আমরা আমাদের এই বিশ্বজয়ী প্রতিনিধিদের এখান থেকেই সাদর অভিনন্দন ও সানন্দ সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

মনে করা গিয়েছিল যে মহাযুদ্ধের ধ্বংসকারী প্রভাবের জন্য এই চতুর্দ্দশ অলিম্পিকে ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির প্রতিযোগীগণ বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না বলে অলিম্পিকের রেকর্ড ভাল হবে না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল এ্যাথলেটিক্স ও সন্তরণে মোট ২১টি বিষয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে দু'টিতে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য মোট ৩০৩ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে সুইডেন ৯৩ পয়েণ্ট পেয়ে। এই ফলাফল থেকেই বোঝা যায় যে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা এবং ধ্বংসকারী প্রভাব ওদেশের এ্যাথ্‌লেট ও সাঁতারুদের ক্রীড়ানুশীলনের অদম্য স্পৃহাকে প্রশমিত করতে পারে নি। আশা করি ওদেশের এ্যাথ্‌লেটদের এই সার্থক প্রচেষ্টা আমাদের দেশের এ্যাথ্‌লেটদেরও অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং আগামী ১৯৫২ সালের বিশ্ব-অলিম্পিকে আমাদের এ্যাথ্‌লেটরা নানা বিষয়ে সাফল্যলাভ করে ভারতের গৌরব বর্দ্ধিত করবেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "ভস্মাবশেষ"—৪৲
শ্রীসুধীরকুমার সেন প্রণীত "মরণজয়ী বীর"—১৷৹
বন্দে আলী মিয়া প্রণীত "রামধনুকের দেশে" (২য় ভাগ) ৷৶৹, "অরণ্যের বিভীষিকা"—১৲
শ্রীরবীন্দ্র নাগ প্রণীত স্বরলিপি-গ্রন্থ "মানুষের জয়গান"—২৲
অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী ও নীলাদ্রিশিখর বসু অনুদিত "দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো"—২৸৹
বিনয় চৌধুরী প্রণীত "সিনেমায় অভিনয় তথা অভিনয় বিজ্ঞান"—২৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "সুলু সাগরের ভুতুড়ে দেশ"—১৷৹

হিজ মাষ্টারস ভয়েসের নব-প্রকাশিত রেকর্ড

১৫ই আগষ্টের পবিত্র দিনটিকে আনন্দোৎসবে যাপন করবার জন্য হিজ মাষ্টারস ভয়েসের উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। প্রথমত এঁরা বাঙলার জনকয়েক বিশিষ্ট শিল্পী দ্বারা ভারতের গণ-জাগরণ মন্ত্র "বন্দেমাতরম্" (N. 27893) রেকর্ডে পরিবেশন করেছেন, আর তারই অন্য পিঠে যন্ত্রসঙ্গীতের পরিবেশনে সকলকে নিখুঁতভাবে গানটি গাইবার সুযোগ দান করেছেন। বিশ্বকবির "আমাদের যাত্রা হলো সুরু" ও "শুভ কর্মপথে" (N. 27882) গান দুখানি সত্য চৌধুরী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিবেশনে মনোরম হয়েছে। সুকৃতি সেনের "বন্দেমাতরম্! চক্র শোভিত ওড়ে নিশান" ও "পনরই আগষ্ট" (N. 27879) ১৫ই আগষ্টের উৎসবকে প্রাণের স্পন্দন দিয়েছে। এ ছাড়া মন্টু আচার্যের "মহাভারতের মুক্তিতীর্থ" (N. 27880) ও সত্য চৌধুরীর "বল্ নাহি ভয়, নাহি ভয়" (N, 27881) গান দুটিও উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—মণি গাঙ্গুলী　　হর-পার্ব্বতী　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
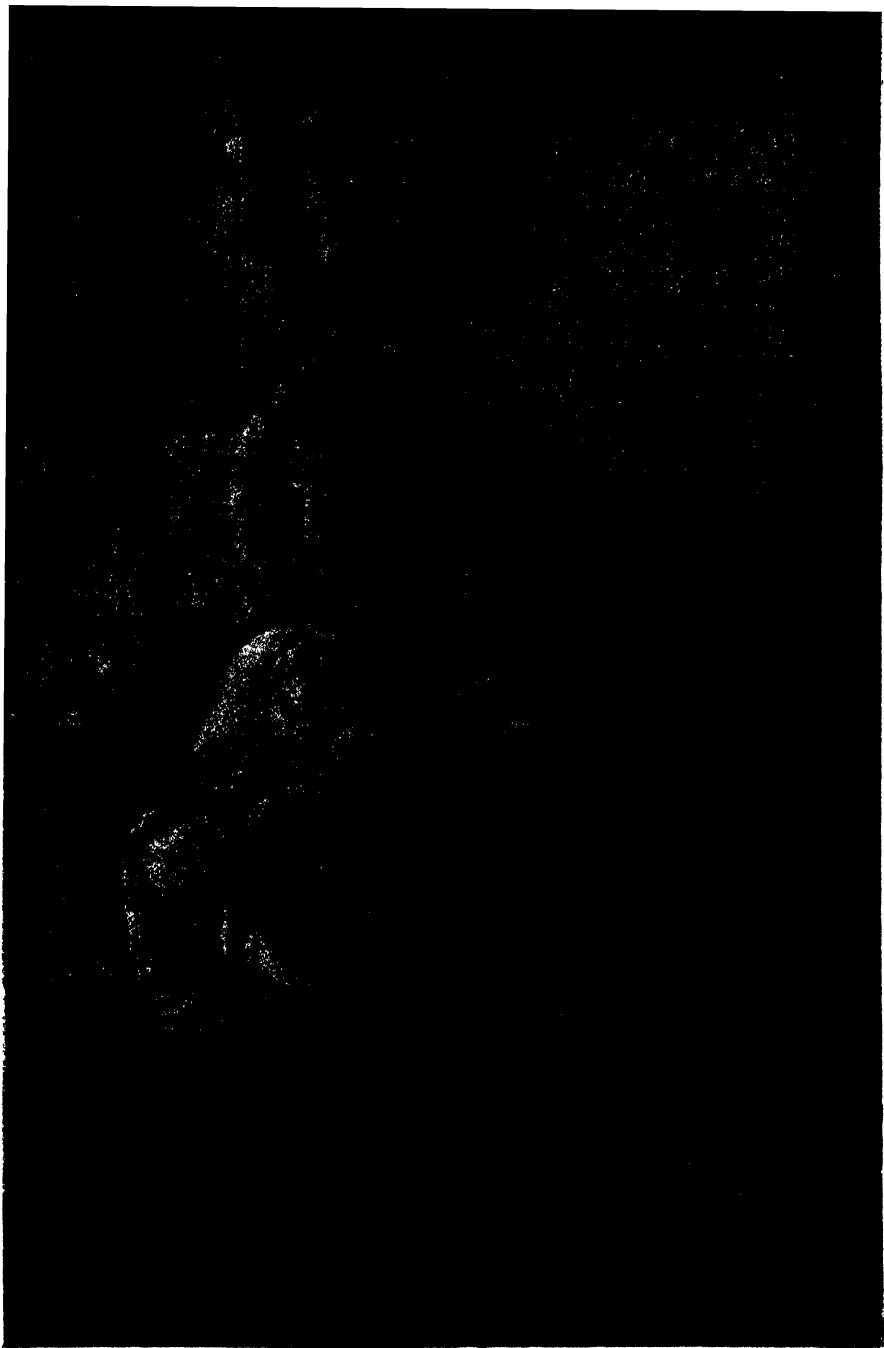
আশ্বিন—১৩৫৫

প্রথম খণ্ড | ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

"ইনাও"এর পৌরাণিক কাহিনী

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ

নাটকীয় এবং কাব্যের দুই দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখতে গেলে "ইনাও"এর কাহিনী শ্যামদেশীয় সাহিত্যে এক অতি উচ্চস্থান অধিকার ক'রে আছে। এই কাহিনী ভাবে, নৃত্যে ও গীতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রেছে। মূলতঃ "ইনাও"য়ের উপকথা আভাদ্বীপের "পঞ্জি" (Panji) সাহিত্য(১) থেকে গৃহীত হ'য়েছে। "পঞ্জি"র গল্পে কুরিপানের রাজপুত্র "শ্রীপঞ্জি" অথবা "রাদিন ইনু"র জীবনকথা বর্ণিত হ'য়েছে। এই রাজকুমার শ্যামদেশের পৌরাণিক গাথায় ইনাও অথবা "রাদেন মন্ত্রী" নামে খ্যাত।

কথিত আছে যে, কুরিপানের সাথে "দহ"র রাজকুমারী অপূর্ব্ব রূপবতী "চন্দ্রকিরণে"র (শ্যাম সাহিত্যের "বুস্‌বা") বিয়ের কথা ঠিক হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যের দরুণ বিয়ের ব্যাপার স্থগিত হ'য়ে যায়, কারণ ইনাও আরেকজন রাজকুমারীকে ভালবেসে ফেলেন। বুস্‌বার পিতা এতে অপমানিত বোধ ক'রে ঠিক ক'রলেন যে প্রথমে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রতে চাইবে তার সঙ্গেই তিনি তার বিয়ে দেবেন। দুঃখের বিষয় প্রথমে অগ্রসর হ'ল কুৎসিত চোরক। রাজা ত আর তাঁর কথা ফিরিয়ে নিতে পারেন না, তাই তিনি তারই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন ঠিক ক'রলেন। এ'দিকে ইনাও একদিন বুসবা অথবা "চন্দ্র-কিরণ"কে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেন এবং অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে অবশেষে তাকে বিয়ে ক'রতে সক্ষম হন। এই হ'চ্ছে পঞ্জি কাহিনীর মূল বস্তু।

শ্যামদেশের উপকথামূলক সাহিত্যে বর্ণিত হ'য়েছে যে বুস্‌বাকে বিয়ে ক'রবার জন্য অনেক বিদেশী রাজপুত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে দহরাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু ইনাও অবশেষে সকলকেই যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই জয়ের জন্য দহের নৃপতি তার প্রাসাদের মন্দিরে দেবতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এই উপলক্ষে সেখানে অভূতপূর্ব্ব আনন্দোল্লাস হয়।

এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে পঞ্জির (Panji) গল্পবস্তু কি ক'রে শ্যামদেশে প্রবেশ ক'রল। H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab এবং H. H. Prince Dhani Nivat এর মতে আভার এই উপকথা প্রথমে মালয় উপদ্বীপে আদৃত হয় এবং সেখান থেকে তা শ্যামদেশে প্রচারিত হয়। অষ্টাদশ (১৮) শতাব্দীতে বর্ম্মীদের হাতে

১। যাই ভাষায় "নিথান পঞ্জি"—(নিদান পঞ্জি)।

শ্যামের পূর্ব্বতন রাজধানী আয়ুথিয়া (Ayuthia) ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে রাজকুমারী কান্থোন (KANTHON) এবং মোংকুত (MONGUT) নাকি একজন মালয়বাসী পরিচারিকার কাছে এই কাহিনী শুনতে পান। তারা তখন পল্লি উপকথা থাই (THAI) ভাষায় অনুবাদ করেন এবং এইভাবে তা প্রথমে থাইদেশে পরিচিত হয়। তদবধি এই গল্প শ্যামদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হ'য়ে আসছে। এর অনেক অনুবাদ থাই ভাষায় হ'য়েছে। এখানে কেবল H. R. H. Prince Naris (NARIS) এর সুত্র অনুবাদটি তুলে দিলাম।(১) মাননীয় রাজপুত্র কেবল কয়েকটি সৌন্দর্য্যমূলক অংশেরই অনুবাদ ক'রেছেন এবং সেই জন্য সেখানে পুরো গল্পের স্থান নেই। এই অনুবাদটি কেবল নৃত্যের প্রয়োজনে করা হয়েছিল।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্পচয়ন এবং ছুরির ঝল্‌কানি

সেদিন ইনাও তার প্রিয় বন্ধু সাম্বামারাত এবং আরও কয়েকজন পরিচিতদের নিয়ে পাহাড়ের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখে তারা আনন্দে বিভোর। প্রকৃতি যেন আজ নববধূর মত অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হ'য়েছে। নানা রকম পাখী গান গাইছে দূর থেকে। তাদের মধুর স্বর এই পার্থিব পরিবেশকে যেন আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে।

ইনাওরা যখন প্রকৃতির এই মাধুরী উপভোগ ক'রতে ব্যস্ত, তখন তারা হঠাৎ শুনতে পেল দূর থেকে ভেসে আসা নারীকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত। গান শুনে ইনাও চ'মকে উঠল। এই গান গাইছিল আসলে বুস্‌বার দাসীরা ফুল তুলতে তুলতে পাহাড়ের ওপর থেকে।

যখন স্বর ক্রমে নিকটতর হ'তে লাগল, তখন ইনাও তার সঙ্গীদের সব লুকোতে ব'লে নিজেকেও আড়াল ক'রতে গেল। সবে সে পেছন ফিরেছে, সে দেখতে পেল বুস্‌বার এক দাসী গুন্ গুন্ ক'রে গান গাইতে গাইতে আসছে, নাম তার উবোল। বেচারীর দেহের গঠন আর সকলের মত স্বাভাবিক নয় ব'লে পেছনে প'ড়ে গেছে। ইনাও দেখতে পেল যে, উবোল খুব ভয় পেয়ে গেছে—কারণ হঠাৎ সে বুঝতে পারল যে সে দলছাড়া হ'য়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সান্ত্বনা দেবার জন্য ইনাও তার সামনে উপস্থিত হ'ল এবং তাকে জিজ্ঞাসা ক'রল যে, সে আর তার সঙ্গীরা কেন পাহাড়ের ধারে বেড়াতে এসেছে। ভীতা উবোল তখন রাজপুত্রকে নিজের সমস্ত কথা খুলে ব'লল। সে বোঝাল যে সে রাজকুমারী বুস্‌বার দাসী। মালা গাঁথবার জন্য রাজকুমারীর একরকম ফুলের দরকার. তাই তাদের পাঠান হ'য়েছে পাহাড়ের উপত্যকায়। উবোল অবশেষে ইনাওকে খুব অনুরোধ ক'রতে লাগল, তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। ইনাও তাতে রাজি হ'ল, কিন্তু তার কাজের পরিবর্ত্তে একটি প্রতিদান চাইল। বেচারী উবোল তখন সবটাতেই রাজি।

ইনাও খুঁজে খুঁজে একটি ওই রকম ফুল যোগাড় ক'রল। সে সেটাকে কেটে নিয়ে তার পাঁপড়ির উপর নখ দিয়ে বুস্‌বার নব বাগদত্তা কুৎসিত চোরকের সম্বন্ধে কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য লিখে সেটা উবোলকে দিল রাজকুমারীকে দেবার জন্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরের প্রাঙ্গণ

বুস্‌বা এবং তার সঙ্গিনীরা মন্দিরে এসেছে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাবার জন্য। দেবতার উদ্দেশ্যে তারা সুন্দর নাচ ও গান ক'রতে লাগল। নাচ শেষ হ'লে বুস্‌বা ব'সে মালা গাঁথতে লাগল এবং তার সঙ্গিনীরা চ'লে গেল নানা রকম ফুল সংগ্রহ ক'রবার জন্য। এমন সময় উবোল এসে তাকে ফুলটি দিয়ে চলে গেল। ফুল পেয়ে ত রাজকুমারী খুব খুসী। কিন্তু যখন সে দেখতে পেল চোরকের সম্বন্ধে মন্তব্য লেখা আছে, তখন সে লাঞ্ছিতা বোধ করে ফুলটি টুকরো টুক্‌রো করে ফেলে দিল। রাজকুমারীর কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহচরী সন্দেহবশে ছিন্ন পুষ্প জোড়া লাগিয়ে ইনাওয়ের লেখা প'ড়ে সংক্ষেপে ঘটনাটি জানতে পারল। ইতিমধ্যে ইনাও মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠে বুস্‌বার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তার চোখের ওপর নিজের ছুরির প্রতিফলিত আলোকচ্ছটা নিক্ষেপ করল। ঝল্‌কানো আলো চোখে লাগামাত্র ভয়ে বুস্‌বা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল এবং তাই দেখে তার সহচরীরা ব্যস্ত হ'য়ে তাকে শুশ্রূষা করতে লাগল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দিরের প্রাঙ্গণ

ইনাও আর সাম্বামারাত দেখছে তাদের সহচরদের নাগ নৃত্য। এই নাচের বিষয়বস্তু, একটি অজগর তার নিজের লেজ গিলে ফেলছে।* এমন সময় তারা শুনতে পেল যে, দহ রাজ্যের এক রাণী এবং রাজকুমারী বুস্‌বা মন্দিরে আসছে। খবর শুনে ইনাও তার সব বন্ধুদের চ'লে যেতে ব'লল। কেবল সে আর তার দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু সাম্বামারাত এবং প্রশান্ত মন্দিরের মধ্যে লুকিয়ে রইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরের অভ্যন্তর

ইনাও যখন দেখতে পেল যে, দহরাজ্যের রাণী এবং রাজকুমারী আসছে তখন সে সাম্বামারাত এবং প্রশান্তর সঙ্গে একটি মূর্ত্তির পেছনে লুকিয়ে প'ড়ল। রাণী বুস্‌বাকে ব'ললেন তিনটি দীপের সাহায্যে

১। Thai নাম যে সব দিয়েছি, সেগুলি উচ্চারণ করা খুবই শক্ত। সেটা ক্রমাগত অভ্যাস না থাকলে হয় না। তবে যতটা পেরেছি উচ্চারণগুলো ঠিক রাখবারই চেষ্টা ক'রেছি।

* থাই ভাষায় এই নৃত্যমূলক খেলার নাম "ঙু ক্লীন্ হাং" (ngu klin hang)। ঙু—সাপ; ক্লীন্—গিলে ফেলা; হাং—লেজ।

দেবতার কাছ থেকে জেনে নিতে যে, কে তার স্বামী হবে, চোরক না ইনাও। তার কথামত বুস্‌বা যখন প্রার্থনা ক'রল তখন ইনাও অলৌকিকতা সৃষ্টি ক'রে ব'লল যে, তার স্বামী আসলে হবে কুরিপানের বীর রাজপুত্র ইনাও, অপদার্থ চোরক কখনই হবে না।

দেবতা কথা ব'ললেন ভেবে রাণী এবং বুস্‌বা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। তারা তাঁর কাছ থেকে আরও খবর জানতে চাইল, কিন্তু দেবতা (আসলে ইনাও) কোন উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে ইনাও আশে-পাশের বাচ্চুরগুলোকে তাড়িয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিল এবং গভীর অন্ধকারে বুস্‌বার কাছে তার প্রেম নিবেদন ক'রল। ভীতা রাজকুমারী চেঁচিয়ে উঠল এবং তাতে ইনাওয়ের চালাকী রাণীর কাছে ধরা প'ড়ে গেল।

তৃতীয় অঙ্ক

অপর একটি বৃহৎ মন্দিরের অভ্যন্তর

দহর রাজা সপরিবারে তার বন্ধুদের সাথে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছেন। তরুণ রাজপুত্রদের বড় অসুবিধা হ'য়েছে, কারণ প্রত্যেকেরই নাচতে হবে দেবতার উদ্দেশ্যে—প্রাসাদের সুন্দরী নারীদের সামনে। বুস্‌বার দুই প্রণয়িনী সান্ত্বামারাত এবং ইনাও কিছুতেই এতে অন্যের উপস্থিতি সহ্য ক'রতে পারছে না। এমতাবস্থায় ইনাওয়ের দূর সম্পর্কের ভাই সুরানাকোং নিজে সুন্দর নাচতে আরম্ভ ক'রে অপ্রীতিকর আবহাওয়া সহজ ক'রে দিল। তার নাচ দেখে আর সবাই নাচতে আরম্ভ ক'রে দিল। নৃত্যে ও গীতে পরিবেশটি বড়ই মধুর হ'য়ে উঠল।

জনতা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, ছোট ছোট শহরে বা বড় শহরের বিভিন্ন পাড়ায় এমন দু'একটি তরুণী থাকে যারা সেখানকার যুবকগণের টারগেট বা আলোচনার বিষয়। এ প্রাধান্য কেন তারা পায়, তাহা বলা কঠিন। কেবল দেহ-সৌষ্ঠবই নয়, চালচলন প্রভৃতি নানা চারিত্রিক উপাদান তাহাদের বৈশিষ্ট্যের কারণ।

কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গাতীরের শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত আমাদের ছোট শহরটির ডাঃ সেনের কন্যা রেণুও ঠিক এই শ্রেণীর। শহরের যুবকগণ এই পরিবারটি ও রেণু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যেন বেশ একটা আনন্দ পায়। অবশ্য রেণু কলেজের ছাত্রী, সুন্দরীও বটে, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চশিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যার অভাব নাই, তথাপি গঙ্গার ঘাটে বসিয়া, ক্লাবে লাইব্রেরীতে প্রকাশ্যে, ভাবে, দুর্বোধ্য ভাষায় তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলে। মনবিজ্ঞানী হয়ত বলিবেন—অজ্ঞান মনের আকাঙ্ক্ষা নিন্দা ও স্তুতির ভিতর দিয়া তৃপ্তিলাভ করে।

সে যাহাই হোক, অকস্মাৎ একখানা পত্রিকায় ডাঃ সেনের মেয়ে রেণুর নাম করিয়া এবং স্থানাদির নাম করিয়া একটা গল্প প্রকাশিত হইল—তাহাতে লেখক নিজের জবানি দিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে একথা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই যে লেখকের সঙ্গে উক্ত পরিবারের পরিচয় আছে এবং রেণুর সহিত তাহার যে পরিচয় হইয়াছিল তাহা প্রণয়েই পরিণত হইয়াছে এখন সে প্রণয় পরিণয়ের অপেক্ষা করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে তড়িৎবেগে শহরময় সংবাদটা প্রকাশিত হইল এবং পত্রিকার অবশিষ্ট কয়েকখানা মুহূর্ত্তে বিক্রয় হইয়া গেল—উৎসাহায় যুবকগণ কলিকাতা লোক পাঠাইয়া প্রচুর কাগজ আনাইয়া ফেলিলেন। কাগজ পাঠান্তে শহরে নানা আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল।

লাইব্রেরীর সাম্‌নে ঘাটে বসিয়া যুবকগণ আলোচনা করিতেছেন। একজন বলিলেন—এ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, মেয়েরা সাধারণতঃই একটু প্রতিভাবান লোককে ভালবাসে। এ ক্ষেত্রে একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে ওর যে নৈকট্য হবে এ আর আশ্চর্য্য কি ?

—তা ছাড়াও সাহিত্যিকরা সাধারণতঃ নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন হন না, এটা ইতিহাসে আছে।

—কিন্তু যদি ব্যাপারটা সত্যিই কিছু হ'ত তবে তা নিয়ে এমনিভাবে লোক জানাজানি নিশ্চয়ই ক'রতেন না—

এটুকু বুদ্ধি সাহিত্যিকদের আছে অনুমান করলে অন্যায় করা হবে না।

—আবার এমনও হ'তে পারে যে কথাটা বাপ-মার কাণে এভাবে উঠিয়ে কার্য্যটা শেষ ক'রতে চান।

—যতদূর মনে হয় সাহিত্যিকরা একটু মরিয়া ধরণের লোক, কাজেই সত্য হলেও তারা এ ক'রতে পারেন।

—কিন্তু এতে একটা মন-কষাকষি হয়ে ব্যাপারটা ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনাই ত বেশী।

—ব্যাপারটা কি ?

—বিবাহটা।

—বিবাহ না হ'য়ে এটা একটা নিছক নভেলী ব্যাপারও ত হতে পারে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর না নিলে কিছু বোঝা যায় না। এ লোকটাকে চেনে এমন কি কেউ নেই এদিকে ?

—আমাদের নরেশ ত ব'ল্‌ছিল সে নাকি চেনে—তার এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় আছে।

—কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি, রেণুর বিয়ে কোন এক ডাক্তারের সঙ্গে ঠিক হ'য়ে গেছে, খুব বড়লোকের ছেলে।

—থামো—বিয়ে আর প্রেম এক বস্তু নয়। প্রেম দু'দশটা হ'লেও বিয়ে হ'তে পারে না। মন সম্বন্ধে কোন আইনই খাটে না।

—কিন্তু এত লোক থাক্‌তে রেণু একটা অখাদ্য নেহাত গরীব লেখককে—যার মোটর নেই বালিগঞ্জে বাড়ী নেই তাকে বিয়ে ক'রবে এ যেন অসহ্য।

—কিন্তু অবস্থাবানও হ'তে পারে ত!

—অবস্থাবান হ'লে লেখক হয় না—ওসব বাজে কথা।

রেণুর বিবাহ হইয়া গেলে তাহাদের অন্তর-জগৎ একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে, কল্পনা বিলাসে মনটাকে আর রঙীণ করা যাইবে না, এমনি একটা ব্যর্থতার ভঙ্গিতে একজন কহিল—বিয়ে হ'য়ে যাবে—রেণু গৃহবধূ হ'য়ে যাবে অন্তত্র এ যেন নেহাতই বে-মানান।

অন্যে ব্যঙ্গ করিল—তবে উর্ব্বশী হ'য়ে চিরকাল ঘরে থাক্‌বে, তোমাদের সান্ধ্য আসরের খোরাক হ'য়ে ?

বিমর্ষভাবে আরেকজন বলিলেন—কিন্তু এই কাহিনীটা যেন একটা অস্বস্তি সৃষ্টি ক'রেছে মনে—কেন জানি না অকারণ দুঃখবোধ ক'রছি।

বিজ্ঞের মত একজন কহিলেন—অমন হয়।

কথাটা যুবক-মহল হইতে যুবতী-মহলে প্রচারিত হইল, —তথা হইতে গৃহিণী ও বৃদ্ধা-মহলে। পাড়ার চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে সেদিন দুপুরে পাড়ার কয়েকজন মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানেও আলোচনাটা উঠিল—

—রেণুর বিয়ে ত ঐ লেখকের সঙ্গে ঠিক হ'য়ে গেছে। কিন্তু বড় বোনের যে বিয়ে হয় নি তার কি হবে!

—আজকালকার মেয়ে, তারা খুঁটে খেতে শিখবে না ? বড় বোনের বিয়ে যদি নাই হয়, তাই বলে কি সেও কুমারী থাক্‌বে চিরটা কাল।

—আমি ত শুনলাম—ওরা নাকি এক কলেজেই পড়ে, জানাশোনা হ'য়েছে। তা দোষ কি! বয়সের মেয়ে, বয়সের ছেলে, আমাদের মত ত নয় যে বার বছরে গৌরীদান হ'য়েছে।

—বয়সের মেয়ে সে কি গা ? বিয়ের বয়স আর কি আছে ? রেণু ত' আমার মেয়ের চেয়েও বড়। আমার অমলার ছেলেই ত পাঁচ বছরের হ'ল, কুড়ি বাইশ কি বিয়ের বয়স গো—

—না অত হয়নি—আমার অনুর চেয়ে তিন বছরের বড়, তা হ'লে ত আঠার হয়।

—ও তোমার অনুর বয়স পনর তা হ'লে ? তা অমন বলাই ভাল, যে দিনকাল পড়েছে তাতে ত আর মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না।

—অনু যে বেড়ে পড়েছে তাই, নইলে—

—কিন্তু সে মুখপোড়া কাগজে উঠিয়ে, এমন একটা লোক জানাজানি করলে কেন ?

—আজকাল ত ওই ফ্যাসনই হ'য়েছে। এই যে আমার মামাত দেওয়ের বন্ধু বে করলে, কাগজে ছবি ছাপা হ'য়ে গেল।

—সে ত বিয়ের পর, এ ত আগেই। যদি বিয়ে নাই হয়, তখন ও মেয়ের কি আর বে হবে ? সকলেই ভাববে—যখন এত ঢলাঢলি তখন ও মেয়ের আর কাজ নেই—

—মেয়ের যদি গুণ থাকে তবে আবার জোটাবে, তা'তে কি হ'ল। আজকালকার মেয়ে, কলেজে পড়ে, তারা ত যা তা ধ'রে দিলেই গছবে না।

—এসব কিন্তু হিংসের কথা। কলেজে পড়লেই কি আর তেমন হয়। এই আমার পিস্‌শাশুড়ীর মামাত ভাইয়ের ভায়রা ভাইয়ের মেশোত শালীর মেয়ে এম-এ পড়ে—কেমন স্বভাব তার। রেঁধে খাইয়ে তবে কলেজে যায়। ডাক্তারের পয়সা আছে, পড়াচ্ছে—

—তাই বলে মেয়েকে মেমসায়েব করার কি দরকার! বিয়ে না হয়ত দেখবে ঠেলাটা।

—মেয়ে না হয় নাই বিয়ে ক'রবে, কত মেয়ে চাকুরী করে খাচ্ছে—

—আমার দেওর ত কলকাতায় চাকুরী করে, সে ব'ললে ও লেখকটা নাকি মাতাল আর বাউণ্ডুলে। তার হাতে মেয়ে দেবে কেন?

—বাপের ইচ্ছেয় ত হবে না গা? আজকালকার মেয়ে—

—আমি ত শুনলাম—সে নাকি ফি শনি র'ববারে ওদের ওখানে আসে, জামাই আদরে খেয়ে দেয়ে সোমবার যায়—

—সে আমি শুনেছি—সে ডাক্তারের কি রকম ভাই।

আমায় নন্দীদের লক্ষ্মী ব'ললে—সে ত আবার একটু ওদের ঘেঁষা।

আলোচনা ক্রমেই বেগবান হইয়া উঠিতে লাগিল। শহরময় ঐ একমাত্র আলোচনা। ক্ষুদ্র শহরের লোকগুলি যেন কোন কিছু না পাইয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল—এতদিনে একটা মুখরোচক আলোচনা পাইয়া বাঁচিয়া গেল এবং যে যেটুকু পারে সেইটুকু সংবাদই প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল—

ডাক্তার বাড়ীতে যাহারা যাওয়া-আসা করে তাহাদিগকে জেরা করা হইল। যাহারা কলিকাতা সাহিত্যিক মহলের সংবাদ জানে তাহাদিগের নিকটে একটা হদিস পাইবার আশায় নানা প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু সমস্যাটা সমস্যাই রহিয়া গেল—সংবাদ যাহা পাওয়া যায় তাহা পরস্পর-বিরোধী কাজেই কোনটা সঠিক তাহা বোঝা যায় না।

সেদিন রেল ব্রিজের উপরে বসিয়া আলোচনা চলিতেছিল। জনৈক ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিলেন—এতদিনে হদিস পাওয়া গেল। একেবারে নিশ্চিত খবর।

সকলে সাগ্রহে আগাইয়া বসিল। ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিল—কি ব্যাপারটা বল ত?

একটা সিগারেট ধরাইয়া তিনি বলিলেন—আমাদের পটলার ভগ্নীপতির সঙ্গে ওই সাহিত্যিকপ্রবরের পরিচয় আছে। নাকি বন্ধুই বলা চলে।

—তারপর?

—সংবাদে প্রকাশ—লোকটির বয়স বছর সাতাশ। এম-এ—ভবানীপুর বাড়ী আছে। বড়লোকই বলা চলে। ক'লকাতায় রেণুদের মামাবাড়ীতে ওদের পরিচয়। তারপর নানা সাহিত্য সমিতিতে গতায়াত প্রভৃতি অবস্থা অবলম্বনে পরিচয় এখন পরিণয়ে পরিণত হ'তে চলেছে। ভদ্রলোকের চেহারাটা নাকি চমৎকার—ফর্সা কোঁকড়াচুল নধর দেহ ইত্যাদি—

—কিন্তু আমি জানি—ঠিক সংবাদ—রেণুর মামা নাকি এ গল্পটি পড়ে ভয়ানক রেগে গেছেন এবং তিনি যে ওকে চেনেন না তাও সত্যি।

—এ হ'তেই পারে না। আমি যা শুনেছি তা ধ্রুব সত্য।

আর একজন ভদ্রলোক আসিলেন। তিনি কহিলেন—যা হোক্, সমাধান হ'ল।

—কি সমাধান হ'ল? কি সংবাদ!

—বলে বা কি হ'বে। শুনলে তোমরা মুসড়ে পড়বে।

—কেন? বলই না।

—উক্ত ভদ্রলোক বৃদ্ধ ব্যক্তি—চুল রীতিমত সাদা, দাঁত নেই। নাতিপুতি মোট জন দশেক হবে। তিনি নাকি রেণুর দাদুর বন্ধু, রেণুকে জব্দ করবার জন্যে অমনি একটা রসিকতা করেছেন—একথা রেণুও জানে, ডাক্তারও জানে, তাই তারা কথা কয় না। নইলে ত ডিফার্মেশন্ সুট হ'ত হে—এটা বুঝছো না।

—এ সংবাদ একেবারেই ভুয়ো। আমি অন্ততঃ এ সংবাদটা জানি যে ডাক্তার এবং তার শ্যালক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উকিলদের পরামর্শ নিচ্ছেন মামলা করা যায় কিনা। ডাক্তার যে ওই লোককে চেনেন না একথা নিশ্চিত।

ডাক্তার-গিন্নী হায় কি হ'ল বলে যথেষ্ট খেদ ক'রছেন—কারণ তার ধারণা এর পরে আর মেয়ের বিয়ে হবে না।

তৃতীয় ব্যক্তি আসিলেন। তিনি সংবাদাদি শুনিয়া কহিলেন—তোমরা যা ব'ল্লে সব ভুল। ভেবে ভেবে ওসব কথা আবিষ্কার করে এনেছ জমাটী আড্ডার জন্যে। প্রেমও নয় কিছুই নয়। একেবারে সত্য সংবাদ—ওদের গানের মাষ্টারকে চেন ত? সেই ভীমের মত চেহারা লোকটি, তিনি ঐ কাগজের আফিসে গিয়েছিলেন খোঁজ নিতে—ডাক্তার প্রেরিত কি নিজের গরজে জানি না, তবে গিয়েছিলেন। লেখকের ঠিকানা যা দেখা গেল তাতে কোন রোমান্স হওয়া সম্ভব নয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোনও গ্রামে নাকি তিনি থাকেন—তিন চার বছর বাদে হয়ত কদাচিত এতদঞ্চলে আসেন। অর্থাৎ এটা একটা accident বা coincidenc ব'ল্তে পার।

—ধ্যেৎ, তা হলে জায়গার নাম, ডাক্তারের নাম, ওদের সকলের নাম হুবহু মিলে গেছে, একি হতে পারে। একটা আধটা হয়ত মিলতে পারে কিন্তু সব মিলে গেছে যে—

—ওইটাই ত accident—তা না হলে তোমরা এত মাথা ঘামাতে কি?

—নাঃ কথাটা মনে ধ'রছে না।

—নামগুলি যে সব চলতি, রেণু বেণু নাম বোধহয় শতকরা সত্তর জন মেয়ের।

—ওটা একটা কথাই না।

—এটা একেবারেই সত্যি। আদতে আমরা ওদের একটু কুচ্ছো করে মনে মনে খুশী হই—সেটা হয়ত রেণুকে ভালবাসি বলে, বা নাগালের বাইরে বলে বা বড়লোক বলে—

—এ একটা কথা হ'ল! অমনি মেয়ে এখানে ডজন চারেক আছে, ওদের নিয়ে আমরা মাথা নষ্ট করবো কেন?

—ক'রছ ত? আর তোমাদের যত কাব্য তা ত' ওকে নিয়েই।

—তোমার মত ত নয় দাদা, যে তাকে দেখবার জন্যে সারা সকাল বাড়ীর সামনে দিয়ে সাইকেল চালাই। আলাপ করে না, বা করতে পারো না বলে নানা নিন্দে কর—

—যাক্‌ ভাই, তোমরা সব যুধিষ্টির। আমার কথায় বিশ্বাস আজ না হয় দু'দিন বাদে করবে, সত্য ত গোপন থাকে না।

সংবাদ বহু প্রচারিত হইল, কিন্তু প্রকৃত কোন সমাধানই পাওয়া গেল না। কথাগুলি স্ত্রীমহলেও প্রকাশিত হইল, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু হইল না। দ্বিপ্রহরে কথা প্রসঙ্গে একজন বলিলেন—যতই যা বল, বিয়ে ঠিক, তা না হ'লে কাগজে ছাপার হরফে লেখালেখি কেন? আমিও রেণুর মার কাছে শুনলাম এই আষাঢ়েই বিয়ে—

—রেণুর মা এর কিছুই জানে না। আমি শুনলুম, সে মুখপোড়া বুড়ো, নাতি-পুতি হ'য়েছে, তার সঙ্গে বিয়ে কিসের আবার? রঙ্গ ক'রেছে—

—মেয়ের বদনাম না হয় সেইজন্যে ডাক্তার ওই সব কথা রটনা করছে। একদিন নাকি সে এক বুড়োকে ধরে এনে দেখাবেও কিন্তু ব্যাপার তা নয়। মেয়ে ফষ্টি-নষ্টি ক'রছে, সে কথা ঢাকবার জন্যে নানা ভাঁওতা দেওয়া হ'চ্ছে।

—কেন আমার ঠাকুরপো ক'লকাতা গিয়ে নিজে খোঁজ করে এসেছে। সে বল্লে ব্যাপার ঠিকই—ওদের বাড়ীতে রীতিমত আসা যাওয়া আছে। তবে ডাক্তার কথা ভাঙছে না—ডাক্তারের বৌ ত চিরদিনের ন্যাকা। জিজ্ঞাসা করলে কেবল বলে, আমি ত কিছুর মধ্যে কিছু না ভাই; সংসার নিয়েই গেলাম—এই সব কাঁদুনী।

—আমাদের উনি ত ব'ললেন, ও সব বাজে কথা। যদিও তিনি চেনেন না তবুও তিনি বলেন, যে ও লোকের লেখা তিনি আজ ২০ বছর পড়ছেন। যদি তাই হয় তবে তার বয়স পঞ্চাশ হবেই—

—না গো, এ সে বুড়ো নয়, নতুন একজন ঐ নামের। জানো না শরৎচন্দ্রও দু'জন আছে, এও তেমনি।

শহরে আলোচনা চলিতে চলিতে কথাটা এবং গল্পটা ডাক্তার ও ডাক্তারের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ডাক্তার গিন্নী কাঁদিয়া কহিলেন—কি হ'ল গো? আইবুড়ো মেয়ে, তার নামে কলঙ্ক দিলে, একেই মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে দায়, তার পরে এমনি হ'লে কি হবে—

ডাক্তার ক্ষীণজীবী লোক, তিনিও একটু ঘাবড়াইয়া

গেলেন। পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে বলিলেন—আমিও ত কিছু জানি না। সত্যিই ত সবই মিলে গেছে—লোকেরই বা দোষ কি, তারা ত টিট্‌কিরি দেবেই, শত্রু মিত্র সকলেরই আছে। যাহোক তোমার ভাইকে লিখ্‌ছি—রেণুরা ত তারই ওখানে থেকে পড়ে, তিনি নিশ্চয়ই সব জানেন।

চিঠি দেওয়া হইল, যথা সময়ে উত্তরও আসিল। ডাক্তার শ্যালক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জানাইয়াছেন—যেমনই হোক, রেণুর মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে একটা মামলা করিতেই হইবে, যদি না রেণু কোনরূপ আপত্তি করে। এমনও হইতে পারে ব্যাপারটা হয়ত সত্য, রেণু হয়ত তাহার সহিত পরিচিত—এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি তাহা বিবেচ্য। আমি রেণুকে সমস্ত গোপন করিয়া, সামনের রবিবারে তাহাকে লইয়া যাইব এবং যাহা হয় করা যাইবে। তবে একথা জানিও, আমার এখানে বাহিরের কেহ কোনদিন আসিতে পায় না এবং আমি নিজে সঙ্গে লইয়া তবে সিনেমা বা অন্যত্র যাই, এ ক্ষেত্রে কাহারও সঙ্গে পরিচয় হওয়া সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না। যাহাই হোক, মেয়ে বড় হইয়াছে এখন ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াই সব করা ভাল। ইত্যাদি—

রবিবার আসিল—

রেণু আসিয়া স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ীতে সকলের সহিত মেলামেশা করিল। সকলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার চাল-চলন কথাবার্ত্তা প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কোন রকম বৈষম্যই দেখা গেল না। সে যে গল্পটি পড়িয়াছে কিনা তাহাও বোঝা গেল না।

দ্বিপ্রহরে মাতা ইচ্ছা করিয়াই কাগজখানা রেণুর টেবিলে রাখিলেন; সে তাহা একবার খুলিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। মাতা পরিশেষে গল্পটিকে পড়িতে বলিলেন। রেণু সংক্ষেপে জানাইল—সে তাহা পড়িয়াছে। এবং সারা দুপুর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া কাটাইল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার, তদীয় শ্যালক ও ডাক্তার পত্নী রেণুকে ড্রইংরুমে ডাকাইয়া বসাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, ঐ কাগজের গল্পটি পড়েছিস্—

রেণু কহিল—হ্যাঁ।

—কিন্তু ওই জন্যে শহরে যে কতজন কি আলোচনা করছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। শহরে কাণ পাতার যো নেই—

রেণু সাগ্রহে কহিল—কি ব'লেছে?

রেণুর মা সংক্ষেপে তাহাদের আলোচ্য বিষয় জানাইলেন। রেণু তাহা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাতা বলিলেন—আবার হাস্‌ছে দ্যাখোনা। আইবুড়ো মেয়ে, মানুষে এত কলঙ্ক দিলে, বিয়ে হবে না, তা কি ভেবেছিস্? শহর ক্ষেপে গেছে—কি ব'ল্‌ছে, না ব'ল্‌ছে—

রেণু কহিল—খুব মজার ত!

ডাক্তার বিরক্ত হইয়াছিলেন—মজার ত বটেই। কিন্তু সে তোমাকে চিন্‌লে কি করে? আর এ সব লেখেই বা কেন?

রেণু কহিল—বা, এত তোমরাও জানো, তোমরাই ত তাকে লিখ্‌তে ব'ললে?

—সে কি? আমরা তাকে চিনিও না।

—বেশ, সব ভুলে গেছ? সেই যে ব্যানার্জ্জি কাকার সঙ্গে এক ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিলেন মনে আছে?

—তার বন্ধু?

—হ্যাঁ।

—সে, ওই চুলপাকা ভদ্রলোক—পাকাচুল কাঁচা কর্‌বার অষুধ চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। তিনিই ত, তিনি ব'ললেন—মানুষ মানুষের নিন্দা বা স্তুতি করে আপনার গরজে আপনি সুখী হবে বলে। নিজ্ঞান মনের আকাঙ্ক্ষা আমরা অমনি করে মেটাই। তুমি বল্‌লে—শিক্ষিত লোকে তা নয়। তিনি বল্‌লেন—সকলেই—শিক্ষিত ভদ্রলোকেও অসম্ভব আজগুবি কথা প্রচার করে, মিথ্যা নিন্দা করে এবং জানা মিথ্যাও বিশ্বাস করে—এটা তার মনের অজ্ঞাত ক্রিয়া।

ডাক্তার একটু হতাশভাবে তাকাইলেন। রেণু কহিল, তারপর আমরা প্রতিবাদ করলাম, তিনি বল্‌লেন—দ্যাখো তোমার নামে একটা গল্প লিখে দিচ্ছি—দেখো সাধারণে, শিক্ষিত লোকে কত আজগুবি গল্প প্রচার করে, এমন কি তোমার বাপ মাও কি ভুল করে। তোমরা ব'ল্‌লে—কখ্‌খনও না।

ডাক্তার রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—ও—হ্যাঁ—তিনিই এটা লিখেছেন? আমি ত ভুলেই গিয়েছিলাম। সকলেই যা তা ব'লছে—তাই ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলাম এ আবার অন্য কে যেন হবে?

রেণু কহিল—তার কথা যে এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে তা ত আমিও ভাবতে পারিনি। তোমরাও জেনে শুনে ভুল করলে?

রেণু একটু যেন অভিমানেই চুপ করিয়া গেল!

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পিএচ-ডি

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় হাজার বছর পরে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হইতে থাকে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য বাংলা ও বিহারেই সীমাবদ্ধ ছিল। যখন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই প্রাচীন ধর্ম্মমত বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবিতেছিল—তখনও প্রায় চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত বাংলার বৌদ্ধ পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে ইহার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতের বাহিরে, বিশেষতঃ মধ্য, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাব। এই সমুদয় দেশবাসী বৌদ্ধগণ বাংলার পালরাজগণকেই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন এবং উত্তরে তিব্বত হইতে দক্ষিণে যবদ্বীপের রাজগণ বাংলা ও বিহারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করিতে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন।

এই হিসাবে একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে এবং অপরদিকে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্ত্তনে বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলার অবদান কেবল শেষ আশ্রয়দাতার বা পালকের সম্মানে সীমাবদ্ধ নহে। এই শেষ চারিশত বৎসরে বৌদ্ধধর্ম্মের যে গুরুতর বিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালীর হাত যে খুব বেশী পরিমাণেই ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাংলায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোহা এবং তিব্বতীয় গ্রন্থে লিখিত বাঙ্গালী বৌদ্ধগুরু ও বাংলার বৌদ্ধ বিহারের বিবরণ পড়িলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সত্যই বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। বাঙ্গালী তাহার অতীত গৌরব সবই ভুলিয়াছে। কিন্তু তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের কৃপায় বাংলার অতীত ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় বাঙ্গালীর নিজস্ব দান কি এবং কতটুকু তাহা আজ সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাতে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাহা চিরদিনই বাঙ্গালীর একটি শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালীজাতি এই দান সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন নহে। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ যুগে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সংঘের কীর্ত্তি এবং বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের নূতন রূপ সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজেও কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ, এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত সহজবোধ্য গ্রন্থের অভাব। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম, নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া এই অভাব অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বিশেষ আলোচ্য বিষয়, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব, বিশেষত বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি পরিচয় এবং বাঙ্গালী বৌদ্ধ গুরুগণ ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির বিবরণ। বাংলার বৌদ্ধ বিহারগুলির বিবরণ এবং যে সমুদয় বাঙ্গালী তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছেন তাহাদের জীবনীও এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও আসে নাই।

কিন্তু শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত তাহাব জন্য যে সমুদয মালমসলা সংগ্রহ করিযাছেন তাহা বিশেষভাবে প্রশংসাব যোগ্য। তাঁহাব গ্রন্থ পড়িলে আমাদেব অতৃপ্তি এবং আবও সঠিক বিবরণ জানিবাব আকাঙ্ক্ষা বাড়িযাই চলে—কিন্তু তথাপি বাঙ্গালী বৌদ্ধগণেব কীর্ত্তি ও কৃতিত্বেব কাহিনী পড়িযা মন বিস্মযে ও শ্রদ্ধায ভবিযা ওঠে।

আজ বাঙ্গালীব ভাগ্যাকাশে বর্ষাব ঘনঘটা উপস্থিত। আজ তাহাব বড়ই দুর্দ্দিন। অতীতেব কীর্ত্তিগাথা হয ত তাহাব মনে নূতন প্রেবণা ও আত্মপ্রত্যয জাগাইতে পাবে। তাই এই নবপ্রকাশিত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইযাছি এবং গ্রন্থকাবকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়াছি। এই দুর্ম্মূল্যেব বাজাবে বহু অর্থ ব্যয় কবিযা তিনি এই গ্রন্থখানি ছাপাইযাছেন। ইহাতে আর্থিক ক্ষতি ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা নাই। কেবলমাত্র বাঙ্গালীব অতীত কীর্ত্তি প্রচারে দৃঢ়নিষ্ঠাই তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। এই গ্রন্থ সমালোচনা কবা আমাব উদ্দেশ্য নহে। স্নেহাস্পদ গ্রন্থকাবেব সাধু উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত কবিবাব জন্যই এই কযটি কথা বলিলাম।

উন্মাদ মুকুন্দমঞ্জুমুরলী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছায়া চোখ বড় বড় ক'রে বলল : "কী আশ্চর্য অসিদা। আমারো কতবার ঠিক এমনি মনে হয়েছে—যখন কোনো কোনো গান শুনি তোমারি মুখে—মানে যখন এ আনন্দ না ব্যথা ঠাহর পাওয়া যায় না।"

অসিত মৃদু হেসে বলল : "অন্য ভাষায়—অমাবস্যার চাঁদের উল্টো পিঠেই আলোর সমুদ্র—উপমাটি একদিন চন্দুই দিয়েছিল আমাকে ইলার বর্ণনা করতে করতে—অর্থাৎ ওর বাইরেটা চঞ্চল হ'লেও ও অন্তরে খুব শান্ত ও সজাগ।" ব'লে একটু থেমে : "আর তাই তো আমি বলছিলাম এইমাত্র যে, কে যে কার কানে তখন কোন্ মন্ত্র জপায় কেউ কি জানে? আমরা বিজ্ঞ হবার ভঙ্গি করি বটে কিন্তু কতটুকু জানি বল্ বাঁশি কাকে ডাকে কখন কোন্ পথ দিয়ে? এই কথাই তুলসীদাস বলেছিলেন : 'ক্যা জানে কৌন ভেকসে নারায়ণ মিল্ যায়।' কিন্তু কথায় [illegible] কথা বেড়ে যাচ্ছে—গল্পটাই বলি।"

"চন্দুর মুখখানা কেবলি মনে পড়ে ইলার মুখের পাশে। একটি [illegible] তার কাছে একটি ছোট স্ন্যাপ—ওরা দুটিতে ব'সে আছে ওদেরই [illegible] একটা ঝরণার ধারে—ওর এক অটোম্যাটিক ক্যামেরায় [illegible] ছবিটা। ওরা মাঝে মাঝেই যেত দুটিতে পিকনিক করতে।"

"আচ্ছা অসিদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ওদের দেশে কি বিয়ের আগে বর ক'নে এতটা স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করতে পায়?"

"ওদের [illegible] পর্দা তো নেই। তাছাড়া ইলাদের পরিবারের সঙ্গে ওদের পরিবারের কি একটা জ্ঞাতি সম্বন্ধ ছিল। এ ধরণের সম্বন্ধ থাকলে আমাদের মধ্যে বিয়ে হয় না কিন্তু ওদের হয়—যেমন ধর তামিল [illegible] মধ্যে মামা ভাগনির বিয়ে।"

"কী সর্বনাশ! বলো কি অসিদা!"

"সর্বনাশ তো এখানে সংস্কারের হিক্কা। বিলেতে মাসতুত পিসতুত মামাতো খুড়তুত ভাই বোনে বিয়ে হয় না?"

"তা ব'লে মামা ভাগ্নি?'

"আমাদের মনে লাগে মানি—কিন্তু এ সব ব্যাপারে দীক্ষাগুরু চলতি প্রথার চাপ বা সংস্কার ছাড়া আর কে?—ভাগবতে আরো সাংঘাতিক কথা আছে—কিন্তু যাক সে কথা।" ব'লে অসিত অরুচিকর প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বলল : "তাছাড়া বলেছি, ইলার বাপ মা ছিল চন্দুদের পড়শী। ছেলেবেলা থেকেই ওদের দেখাশুনো হ'ত। কাজেই বিয়ের কথা ওদের অনেকবারই মনে হয়েছিল—সে কথা আমায় চন্দুই বলেছিল পরে। তবে এ ছাড়াও ওদের ঘনিষ্ঠতা হবার কারণ ছিল। মেয়েরা অনেক সময়ে সেই সব ছেলের দিকেই বেশি ঢলে যারা একটু স্বভাব উদাসী, মানে অগোছালো—অসহায়। চন্দু একলা ঘুরে বেড়াত, গান গাইত, ধ্যান করত, বিবেকানন্দর বই পড়ত, তার উপর দেখতে কমনীয়—ইলার মন সে না টানবে তো টানবে কে? ইলা একদিন নাকি ওকে বলেছিল যে ওকে দেখলে তার মনে হ'ত রমণ মহর্ষির কথা। এর পরে টান না হয়ে পারে?"

"রমণ মহর্ষি কে অসিদা?"

"অরুণাচল শিবমন্দিরের কাছে থাকেন। আশৈশব উদাসী ব্রহ্মচারী। এক কাপড়ে সংসার ছাড়েন ষোলো বছর বয়সে। পঞ্চাশ বছর ধ'রে আছেন তিরুভান্নামালাই ব'লে একটি গ্রামে—দক্ষিণ দেশে। ঠিক ওরি মতন এক কথায় তিনিও প্রিয় পরিজন সব ছেড়ে সোজা অরুণাচল শিবমন্দিরে এসে বলেন : 'শিব! এসেছি আমি তোমার

চরণে—আমাকে নাও।' সেই থেকে—আজ পঞ্চাশ বৎসর—তিনি ঐখানেই ঐ ছোট্ট গ্রামটিতেই চুপটি ক'রে ব'সে।"

"এক কাপড়ে চ'লে এসে পঞ্চাশ বছর একই গ্রামে রয়েছেন? বেরোন নি একবারও কোথাও?"

অসিত হাসে: "তাই না তোকে বলছিলাম রে—কার মন কী ধাতুতে গড়া তার হদিশ পাওয়া যায় না শুধু বাইরেটা দেখে, দেওয়া যায় না লেবেল—অমুক উদাসী, অমুক সংসারী। কারণ মনে রাখিস, ঘোর সংসারীর ঘরেই রত্ন মহর্ষিরও জন্ম।"

"তুমি কী বলতে চাচ্ছ অসিদা? স্বভাব ব'লে কি কিছুই নেই তাহ'লে?"

"থাকবে না কেন? কেবল মুস্কিল এই যে কোনটা কার আসল স্বভাব জানা ভার। ধর্ না ঐ চন্দুরি কথা। ইলার প্রতি তার টান ছিল সত্য—একথা নির্ভয়ে বলা চলে। ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে—ওর রূপ দেখে, গান শুনে ওর নেওটো—বিয়ের কথাবার্তা হ'তে না হ'তে ওর খেলার সাথীও বটে শিষ্যাও বটে—টান না হবে কেন? অথচ তবু ও তো এক কথায় ছাড়ল তাকেও।"

"কী কথায়?"

"বলছি। এবার আমাকে বলতে দে—টুকিস নে। নৈলে গল্পটা শেষ হবে না। এখনি যেতে হবে নদীতে ভাসান দেখতে—"

অসিত বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে বলল: "ঐ দেখ্ সূয্যিমামার প্রায় শুতে যাবার সময় হ'ল। কাশীর গঙ্গায় বিজয়া দশমীর ভাসানটা—দেখেছিস কখনো?"

"ও না দেখলেও চলবে—বলো গল্পটা।"

"অমন কথা বলে না। তাছাড়া গল্পের মালমশলা তো একটা নাবালক কিশোর ছেলে বৈ তো নয়—কীই বা দেখেছে দিন দুনিয়ার—আর কীই বা থাকতে পারে তার জীবনে যাকে নিয়ে গল্পের মতন গল্প ফাঁদা যাবে? অথচ তবু—ভাবি আমি সময়ে সময়ে এখনো—ওর ছোট্ট মনের নাটমঞ্চে যে ড্রামাটা ঘটে গেল তার কতটুকু বর্ণনা করতে পারে একজন বাইরের শ্রোতা মাত্র ওর আত্মকাহিনী শুনে?"

"বলো বলো অসিদা—থেমো না—এবার কিন্তু তুমিই আনমনা হ'য়ে পড়ছ মনে রেখো।"

অসিত হাসল—নামমাত্র: "আনমনা নয় রে। তবে ওর মুখখানি আমার মনের পটে একটা ছাপ এঁকে গেছে—সেইটে ঠিক প'ড়ে তুলতে চাইছিলাম দূরের দৃষ্টি দিয়ে—যদি পারি।"

ব'লে একটু চুপ ক'রে রইল অসিত। ছায়া শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। অসিত গল্পের হারিয়ে-যাওয়া খেই ধরে ফের সুরু করে: "বেশ মনে পড়ে ওর কমনীয় পাৎলা ঠোঁটদুটির আশপাশে হাসির সেই থেকে থেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া···সেই একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকা···যেন কিছুও ও শুনতে চায় আমার কাছে—অথচ আলগোছে—প্রশ্ন না ক'রে। কারণ, বলেছি, প্রশ্ন করবার পাত্র ও ছিল না। ডুবুরি হ'য়ে তবে ছেঁকে তুলতে হ'ত ওর মনের কথা। অথচ···অথচ সত্যিই অনর্গল কথা বলত ওর ডাগর প্রায়-সদাসজল চোখ দুটি। কী সুন্দর যে সে চোখ রে!···আমি এক একবার ভাবি হয়ত ইলা ওকে এ ও তা সাত পাঁচের জন্যে ভালোবাসে নি—বেসেছিল সব আগে ওর এই আশ্চর্য চোখ দুটিরই জন্যে।"

অসিত ফের থেমে যায়। দেয়াল ঘড়ি করে টিক্ টিক্ টিক্।

* * * *

* *

অসিত সুরু করে ফের: "একদিনের কথা মনে পড়ে···এত স্পষ্ট! তখন ও আমাদের আশ্রমে। আমার ছাদে ব'সে ও চুপ ক'রে চেয়ে—সামনের হিমালয়ের দিকে। হঠাৎ পড়ল ওর দীর্ঘনিশ্বাস। আমি তাকাতে ও কুণ্ঠিত হ'ল, কিন্তু একটুখানির জন্যে, তার পরেই হাসল—অকারণ হাসি।

'হাসলে যে?' বললাম আমি।

'এম্নি।' এম্নিই ছিল ওর জবাবের ভঙ্গি।

"খানিকক্ষণ চুপ—দুজনেই।" আমি হঠাৎ বললাম: 'একটা কথা বলবে চন্দু?'

"ও শুধু চোখের চাহনিতেই জানিয়ে দিল—গোপন করবার মতন কথা ওর কিছুই নেই।"

'ইলাকে তুমি ভালোবাসতে, না শুধু ওর একটু ছোঁয়াচ চাইতে?'

'ভালোবাসা?' বলল ও নিরুত্তাপ সুরে। 'মানে বিয়ে করতে চায় যে ভালোবাসা?'

'হুঁ।'

'সে ভালোবাসা আমি হয়ত জানি না—যদিও পড়েছি বইয়ে। তবে—'

'বলো।'

'ওর সরল উচ্ছ্বাস, গান ভালো লাগত। আরো ভালো লাগত—

'কী?'

'ওর দৃষ্টি। বড় সুন্দর চোখ।'

'ব্যস। আর কিছু বলে নি, বলবার হয়ত ছিলও না বিশেষ কিছু। একটু অপেক্ষা ক'রে বললাম: 'তোমার বাবা মার জন্যে মন কেমন করে না?'

'না।'

'ফের চুপ। এ কেমন ছেলে! এমন কোমল যার দৃষ্টি—এমন মিড়ে ভরা যার কণ্ঠস্বর সে স্নেহ মমতার ধার ধারে না ভাবতে একটু বাজে বৈকি। এমন কি মনে একটু হয়ত রাগও হয়। আহা, যে বাপ-মা এত যত্ন ক'রে ওকে মানুষ করল—'

"ঠিক বলেছ অসিদা—কিন্তু না—আমি টুক্‌ব না। বলো—কী বলছিলে?"

"বলছিলাম এমন কিছু নয়। শুধু এই যে, দেখেও মন মানত না দেখার এজাহার। ভাবতাম ও হয়ত বলছে না খুলে সবটুকু।"

ছায়া একটু অপেক্ষা ক'রে বলল: "তোমাদের ওখানে ছিল কতদিন?"

"পাঁচ সাত দিনের বেশি না।"

"কী করত?"

"কিছু না।"

"কিছু না?"

"একেবারে কিছু না। বই দু-একখানা ছিল ওর কাছে। কিন্তু ঠায় একভাবে ব'সে থাকত—তা আবার চোখ চেয়ে—কেবল মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে। একদিন মনে আছে ওকে বললাম একটু জিরোও এখানে। খানিক বাদে এসে দেখি যে-খাটটিতে ব'সে জপ করছে। শিয়রে পাহাড়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে ঠিক ওর মাথায় কিন্তু ও নির্বিকার—ঘামবে গল্ গল্ ক'রে অথচ একটু স'রে পর্যন্ত বসবে না।"

"বলো কি অসিদা? গরম লাগত না ওর?"

"না শীত, না গ্রীষ্ম। ওর লম্বা আলখেল্লাটি প'রে শুত বিছানায়—কেবল স্নানের সময় খুলত সেটি—কিন্তু ঐ একবার।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? একটু একটু ক'রে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানলাম ব্যাপারটা। ঐ সূর্য পাটে নামল—সেরে নিই বাকিটুকু।"

অসিত সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বলে: "বলেছি ওর বাবা ধনী। যাকে বলে সেল্ফ্-মেড-ম্যান। ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি থেকে সুরু ক'রে নিজের চেষ্টায় নানা জিনিষ-পত্রের ফ্যাক্টরি গ'ড়ে তোলেন। বিস্তর শ্রমিক খাটে তাঁর তাঁবে। চন্দুও লোক খাটাতে শিখেছিল। শিখল কেমন ক'রে ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগত। কিন্তু বন্ধু আমাকে বলেছিলেন চন্দু ফ্যাক্টরির সব কাজের অন্ধিসন্ধি জানত। শ্রমিকদের কেউ যে ওকে ফাঁকি দেবে তার জো ছিল না। অথচ আশ্চর্য এই যে ও কাউকে একটা ধমক পর্যন্ত দিত না। কোনো শ্রমিক কাজ ফাঁকি দিলে ও নিজে হাতে সেটা করত। তাতে তারা ভয় পেয়ে হাঁ হাঁ ক'রে আসত ছুটে।"

ছায়া হাসে:

"মন্দ উপায় বার করে নি শাস্তি দেবার।"

"ঠিক তাই। ছেলেটির বুদ্ধি যে তীক্ষ্ণ ছিল সবাইকারই মনে হ'ত—যদিও ওর চোখ দুটি দেখলে কেউ বলবে না ও ছেলে কর্মী। তাই তো বলছিলাম—কাকে যে কী উপাদানে বিধাতা গড়েছেন সেটা এক তিনিই জানেন। প্রতি মানুষই দেখতে একটা—কিন্তু আসলে অনেকগুলো মানুষের ঠিক মিলে তবে একটা ব্যক্তির দানা বাঁধে—ঠিক যেমন অনেকগুলি অণুপরমাণু মিলে তবে এক একটি জিনিষ গ'ড়ে ওঠে—টেবিল চেয়ার খাট পাথর মানুষের দেহ—কী নয়? অথচ তবু এ-ও সমান সত্যি যে সব জড়িয়ে প্রতিজীবেরই একটা না একটা বিশেষ চেহারা গ'ড়ে ওঠে বার একটা মূল প্রবণতা থাকে। চন্দুর মধ্যে এই প্রবণতাটি ছিল—কিসের? বলা শক্ত—তবে আধুনিক কোনো মতিগতির নয় এটুকু বোধ হয় নির্ভয়েই বলা যায়।"

"কী ঠিক বলতে যাচ্ছ তুমি অসিদা?"

অসিত হাসে:

"ঐ তো বিপদে ফেললি দিদি! কোনো কিছুর বিষয়েই একটা ঠিক ঠিকানা দেওয়া তো সহজ নয়। তবু আমাদের একটা না একটা ধারণা তৈরি ক'রে নিলে বলতেই হয় প্রতি আলাপীর সম্বন্ধে, কেন না নৈলে চলাই যায় না—এক পাও।"

"ওর সম্বন্ধে তোমার সেই মূল ধারণাটি কী?"

"আমার মনে হয়েছিল—ওর পূর্বজন্মের নানা কর্মের সংস্কার ওকে এ জন্মে ছেলেবেলা থেকেই করেছিল ইংরাজিতে যাকে বলে day dreamer—অথচ ওর বাপের কাছ থেকে ও পেয়েছিল কর্মনৈপুণ্য। এই দুয়ে বাধত—কিন্তু তাও হয়ত ওর সইত। সইল না শেষটায় যখন এল ইলার বাপ—শেষ অবধি।"

"আর ওর বাবা? ছেলেকে বাধা দিতেন না কাজ করতে?"

"না। তিনি ছিলেন খুবই উদার স্নেহশীল। ছেলেকে জোর ক'রে কিছুই করাতে চাইতেন না।" একটু থেমে: "কিন্তু মা-র তো মা-র প্রাণ—কাজেই তিনি দিতে চাইতেন ছেলের বিয়ে। তাছাড়া ইলাকে ওর লাগতও ভালো। অথচ কী ভাবে যে ভালো লাগত ও কতখানি ও যেন জেনেও জানত না।"

"ঠিক বুঝলাম না।"

"আমিই ঠিক বুঝি নি তাই তা তোকে বোঝাব কি? মানুষকে ঠিক বোঝা যে কত শক্ত নিজেকে দিয়েই জানি তো। মানে যে-আমি-কে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঘর করি, নানা সময়ে সেই আমিটাই—সেই মানুষটাই আচমকা বিভ্রাট বাধিয়ে বসে—বরাবর যা চেয়েছে হঠাৎ হয়ত তাকেই দিল তছনছ করে—বা কোনো দিন যা চায় নি হঠাৎ দেখল তাই চাই—নৈলে চলে না আর একদণ্ডও।"

"কিন্তু ইলা সম্বন্ধে কী জানত কিছু বলেছিল কি?"

"হ্যাঁ, তবে টুকরো টুকরো ভাবে। কাজেই সবটুকু আমার মনে নেই, তবে মোট কথাটা এই যে ইলার সঙ্গ ওকে একধরণের তৃপ্তি দিত অথচ সে তৃপ্তির উল্টোপিঠে যে ওর মনের উপর একটা চাপ মতন পড়ছে—অর্থাৎ তার প্রতিদানে ওকে দিয়ে ইলা কিছু করিয়ে নিত বলিয়ে নিত এটা সে বুঝেও বুঝত না। ভাবত এম্নি ভাবেই চলবে ওদের সাহচর্যের বেপরোয়া পুতুল খেলা। শেষটায় ব্যাপারটা ঘনিয়ে উঠল বোধহয় একটা বিশেষ কারণে।"

"ও কী অসিদা? ঠিক এই সময়েই থামে! তুমি ভারি দুষ্টু।"

"থামি নি দিদি, ভাবছি কী ক'রে বোঝাই—গল্প হ'লে যা তা বানিয়ে বলা যেত কিন্তু এ চোখে দেখা জিনিস কিনা তাই ভুল হবার সম্ভাবনাও বেশি"—ব'লে অসিত একটু হাসে—"বাস্তব বাস্তব ক'রে যাঁরা বেশি চিৎকার করেন তাঁরা প্রায়ই ভুলে যান মানুষের এই অকাট্য অভিজ্ঞতাটি যে দেখার বিভ্রায় কল্পনায় চোখের দর্শন ঢের কম কাঁপয়ে পড়ে। যাক বলি—যা পারি।"

অসিত একটু থেমে সুরু করল: "যারা এ পথের পথিক হয়

তাদের বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় সংসারের প্রায় সব কিছুই। তাই না সন্ন্যাসীরা "পূর্বাশ্রমের' নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে নারাজ—অতীতকে তাঁরা ঝেড়ে ফেলতে চান স্মৃতি থেকেও। কিন্তু চন্দু তো তখন এতশত জানত না—বই প'ড়ে কি শুনে তো আর জানা যায় না পথের পাথেয় বা বাধার খবর। তার জন্যে চাই পথে দাঁড়ানো। ও জানত শুধু ধ্যান আর জপ—রামকৃষ্ণদেবেরই মূর্তি ও নাম—তাঁর আশ্রয় চেয়ে। এ প্রেরণা ওর আপনা থেকেই আসে প্রথমটায় কিন্তু কয়েকদিন ধ্যান জপ করতে না করতে—ও বলেছিল আমাকে—ওর মনে নামত গভীর শান্তি—দেখত নানারকম জ্যোতি, শুনত ওঁকারের শব্দ—কিন্তু মূর্তি টূর্তি বড় একটা দেখত না। ও ভরপুর খুসি ছিল এই গভীর শান্তিতে স্নান করিয়ে নিজেকে। সে শান্তি এত প্রত্যক্ষ যে ওর মুখচোখে তার যেন আভা বেরুত ফুটে। বলেছি, ইলা ওর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল অনেকগুলো কারণেই কিন্তু ওর মধ্যে একটা কারণ—মনে হয়—ওর মুখচোখে এই শান্তির দীপ্তি।" ব'লে অসিত একটু থামল তারপর ফের সুরু করল: "কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-শান্তি যে ওকে এমন একটা লক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলেছে যেখানে নারীর সুষমা বা সাহচর্যের কোনো স্থান নেই এটুকু ইলা বুঝত—ঠিক যে ভেবেচিন্তে, বলব না—তবে যেখানে তৃষ্ণা প্রবল সেখানে জল কোথায় নেই বুঝতে বেগ পেতে হয় না। ইলা তাই ওকে থেকে থেকে বলত ওর কাছে আর একটু ধরা দিতে—অত বেশি ধ্যান নাই করল।

"এতেই চন্দুর মনে প্রথম খটকা লাগে। ধার্মিক মেয়ে ধ্যান করতে মানা করে কেন? শুধু মানা নয়—বেশি ধ্যান করলে যেন ভয়িয়েই ওঠে। পুরুষেরা তাদের জীবনকে নানাভাবে খণ্ডিত করতে পারে। চন্দুরও ধ্যানের জীবন ছিল এক, ইলার সাহচর্যের জীবন আর। বেশ তো—এ দুই নাই বা মিলল—ভাবত চন্দু। কিন্তু ইলা শুনত না—চাইত মেলাতে—খুব যে ভেবেচিন্তে 'হার্মনি' চাইত তা নয়—চাইত নিজের মেয়েলি সহজবোধেই ইনষ্টিংটে। ফলে একটু একটু করে ও চন্দুকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। সে ছিল বেশ পাকা মেয়ে—চন্দু তাকে যতটা সরলা মনে করত ততটা সরলা নয়। কাজেই চন্দু বুঝতে পারে নি প্রথম দিকে যে ওর ধ্যানের সময়টা ও কমিয়ে দিতে চাইছে ইচ্ছে ক'রেই—নানা অছিলায়। ইলা কখনো নিয়ে যেত ওকে ওদের মোটরে ক'রে বনভোজনে। কখনো সিনেমা দেখাতে, কখনো বা কাছের নদীতে স্নান করতে একসঙ্গে। ফলে চন্দুর মনটা একটু একটু ক'রে হ'য়ে উঠল বহির্মুখী। তখন ও আবিষ্কার করল যে ধ্যানে ওর যে একটা ঘোর মতন অবস্থা সহজেই হ'ত সেটা একটু একটু ক'রে ফিঁকে হ'য়ে আসছে। সারাদিন যদি গল্পালাপ করা যায় তাহ'লে বাকি সময়টা মনের মধ্যে ধ্যানের আগ্রহ বজায় রাখা যায় না এই একটা মস্ত অভিজ্ঞতা তো তখনো ওর হয় নি। কাজেই ও ঠিক বোঝে নি পরমহংসদেবের উপমার তাৎপর্য যে মন ধোপাঘরের কাপড়, লালে ছোপাও লাল, নীলে নীল। অজান্তেই ওর মনটা ছুপিয়ে উঠতে লাগল বহির্মুখিতায়। ফলে, প্রথম হ'ল আবেশের অভাব—তার পরে শান্তির অন্তর্হানি।

"এ শান্তির স্বাদ একবারও যে পেয়েছে সে জানে এর নাগাল পেয়ে হারালে সে কী কষ্ট। যে পায়নি কখনো এ-শান্তি তাকে ব'লে বোঝানো যায় না কী দুঃসহ যন্ত্রণা এসে ঠিক ঐ শান্তিরই জায়গা জুড়ে বসে। চন্দু এ অবস্থায় প্রথম প্রথম রুখে উঠেই আরো বেশি ধ্যান লাগাত—বেশি রাত জেগে। কিন্তু তাতে হ'ল উল্টো উৎপত্তি—দিনের বেলায় দেহে মনে অবসাদ ধরত ছেয়ে—যাকে কাটাতে ওকে শরণাপন্ন হ'তে হ'ত বহির্মুখিতার দুয়ারে—হাত পাততে হ'ত বৈচিত্র্যের কাছে—বাইরের জীবনের বৈচিত্র্য। এ-বৈচিত্র্যের খোরাক সব চেয়ে সহজে যোগাতে পারত যে—সে ইলা। কাজেই ইলার সঙ্গে ওর মেলামেশা ক্রমশ ঘনিয়ে উঠবে এ আর বিচিত্র কী? আরো এইজন্যে যে দুপক্ষের অভিভাবকই ওদের ঠেলে দিত এই দিকেই: চন্দুর বাপ মা ছেলের মন ফেরাতে চেয়ে—ইলার বাপ মা অমন জামাইয়ের মতন জামাই চেয়ে। ইলা তো উঠতই পুলকিত হ'য়ে—নিজের প্রভাবের শক্তি প্রত্যক্ষ ক'রে। তাছাড়া বাড়ছে যে-মেয়ে সে প্রভাব বাড়বে কী ক'রে তার ফিকির খুঁজবে না?—ইলাও খুব মন দিয়ে গান শেখা সুরু করল—বিশেষ ক'রে ভজন গান—তুকারাম, নর্সি মেতা, মীরা, কবীর, তুলসীদাস—এদের ভজনের চল ওখানে বেশি ব'লে শেখাও হ'ত সহজ। চন্দু মুগ্ধ হ'ত সহজেই এ সব গান শুনে।...এমনি ক'রে দিন যেতে যেতে একদিন চন্দু আবিষ্কার করল যে ও যখন ধ্যান করতে বসে তখনো যেন অপেক্ষা করে কখন ইলা এসে ডাক দেবে—'হয়েছে, এবার নতুন গান শোনার পালা—ধ্যান রেখে চলো বাইরে।'

"অমনি ও বাধ্য ছেলের মতন যেত ওর পিছনে পিছনে?"

"প্রথম প্রথম একটু আপত্তি হয়ত আসত। কিন্তু ওকে যে ইলা বোঝাত—গান কি ধ্যানের চেয়ে কম? হয়ত ওর মন এ কথায় পুরোপুরি সায় দিত না—কিন্তু প্রথম যৌবনে যখন কোনো কিছু খুব ভালো লাগে তখন সেটা এত ভালো মনে হয় যে খটকাকে প্রশ্রয় দেওয়াটাই মনে হয় অন্যায়। চন্দুর মন গানের দিকে আরো ঝুঁকতে লাগল সে সময়ে ওর ধ্যান আর তেমন জমত না বলে। মানুষ সব সইতে পারে হাসিমুখে কেবল সেই নীরসতার বোঝাকে ছাড়া, যার তার হাল্কা করার পথ খোলা।"

"তার পর?"

"এমনি ক'রে কিছুদিন কাটাবার পর চেপে ধরল ওকে এক দুঃসহ অশান্তি। ইলার সাহচর্যে বা গান শুনে তখনো আনন্দ যে পেত না বলব না—কিন্তু তার পরেই ওর মনে আসত গভীর অবসাদ ছেয়ে। শেষটায় দোটানায় প'ড়ে অতিষ্ঠ হ'য়ে ও হঠাৎ একদিন উধাও হ'ল ওর এক মাসির বাড়ি। সেখানে গিয়ে খুব বেশি ক'রে ধ্যান লাগানোর ফলে ওর মনে ফিরে এল হারানো শান্তি। তখন ও স্থির করল দুনৌকায় পা আর না—আমি সংক্ষেপেই বলছি এখন—লিখে দিল ইলাকে ঝোঁকের মাথায় ওর সঙ্গে আর মিশবে না।"

ছায়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল: "তার পর?"

"দিন দুই পরে চন্দুর মা এসে হাজির বোনের বাড়ি। কী

লিখেছিস তুই অমন লক্ষ্মী প্রতিমাকে? সে কেবল কাঁদে আর কাঁদে—খাওয়া দাওয়া ছেড়ে···ইত্যাদি।"

"ওর মন চঞ্চল হ'ল কিন্তু নরম না। বলল: 'মা কেন বিরক্ত করো আমাকে? আমি ওকে তো প্রথমেই বলেছিলাম—মিশতে চাও মেশো কিন্তু বিয়ের কথা মনেও ঠাঁই দিও না। আমি তো বিয়ে করব না—করতে পারি না যে মা। অথচ ও মিশতে চায় আমার সঙ্গে এইদিকেই আমাকে টানতে।"

"মার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তার পর যা হয়—মার প্রাণের হাহুতাশ—অনুযোগ অভিযোগ কান্নাকাটি। শেষে বললেন: 'মেয়ে বাঁচবে না যদি তুই ওকে বিয়ে না করিস।' চন্দু হেসে উড়িয়ে দিল—অত সেন্টিমেন্টাল ও নয়, মেয়েরাও নয় এত অপলকা। কিন্তু এর তিন চার দিন পরেই তার এল ইলার বাপের কাছ থেকে যে মেয়ের দারুণ অসুখ। কেবল প্রলাপ বকছে—চন্দুকে দেখতে চেয়ে।"

"অগত্যা চন্দুকে ফিরতে হ'ল। মনে ওর একটু অনুশোচনাও এল বৈ কি—মা তো তাহ'লে ভুল বলেন নি। ইলা যদি না বাঁচে—তাহ'লে? এতদূর এগিয়ে এখন ইলাকে 'যাও' বলা—এই সব কুণ্ঠা।"

"তার পর?"

"ইলার বাবা একটু অত্যধিক ভয় পেয়েছিলেন। ইলার রোগশয্যায় এসে দাঁড়াতেই ইলা একটু একটু ক'রে সেরে উঠতে লাগল। ডাক্তারও বলল—ইলাকে খুব প্রফুল্ল রাখতে হবে নৈলে সারতে দেরি হবে, হয়ত না বাঁচতেও পারে। চন্দু নিজের কর্মের পাকেই ধরা পড়ল, পালিয়ে বাঁচবার পর্যন্ত-পথ রইল না আর—মেয়ে যদি না বাঁচে ভগবান্ রাগ করবেন না—এই ভয়ের কাঁটা সর্বদা রইল বিঁধে ওর মনে। তার পরে একটু একটু ক'রে বাধ্য হ'য়ে ও বিবাহে রাজি হ'ল।

"বাড়িতে সোরগোল প'ড়ে গেল। ধনী পিতার বংশপ্রদীপ ঘটা করেই বিয়ের আয়োজন হ'তে থাকে। ধুমধাম!

"কিন্তু ওর মনের শান্তি এবার প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেল।"

অসিত একটু থেমে মৃদু হাসল, তারপর বলল: "কিন্তু কর্মের ফল এদিকেও যেমন ফলে তেমনি তো ও'দিকেও ফলবে। ইলার চাপ এল যে-কর্মে, অন্তদিকের চাপ এল ঠিক তার বিপরীত কর্মে। বিয়ের ঠিক আগের দিন শেষ রাতে ও স্বপ্নে দেখল ইলার সঙ্গে ওর বিয়ে হ'য়ে গেছে—ইলা এসেছে ওর শয্যায়—চারদিকে ফুল। হঠাৎ দেখল—প্রতি ফুলের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের চোখ—করুণ ভর্ৎসনায় ভরা। অমনি বুকের মধ্যে জেগে উঠল হাহাকার—কী করলাম কী করলাম! শান্ত ছেলে চিৎকার ক'রে জেগে উঠল। মা ছুটে এলেন পাশের ঘর থেকে। ও লজ্জিত হয়ে বলল—কিছু না এমনি ভয় পেয়েছিল।

"মা শুতে গেলেন ফের। ও-ও বেরিয়ে পড়ল পা টিপে টিপে। ওদের বাড়িটা ছিল একটা পাহাড়ের চূড়ায়—বলেছি বোধ হয়। পাশে একটা ঝরণা যার জল ওদের ফ্যাক্টরির বিদ্যুৎ সরবরাহ করত। সেখানে একটি শাদা পাথরের বেদীও তৈরি করিয়েছিল—ধ্যান করবার। সেদিন শেষ রাতে এসে এখানেই ও বসল। মনে ওর তখনও অসহ্য যন্ত্রণা—তারপরদিনই বিয়ে। ধ্যানের সময় কাতর প্রার্থনা এল: 'ঠাকুর তোমার শরণ নিচ্ছি—বাঁচাও।'

"হঠাৎ দেখে ঠাকুর স্বয়ং!"

"ঠাকুর?"

শ্রীরামকৃষ্ণ। ধ্যানে ও তাঁর মূর্তি এই প্রথম দেখল। তাঁর মুখ প্রসন্ন কিন্তু কঠিন। বললেন ডান হাত বাড়িয়ে: "এক্ষণি গৃহত্যাগ করতে হবে তোমাকে—এক কাপড়ে। ভয় নেই, আমি আছি।"

"তারপর?"

"ও বেরিয়ে পড়ল। মনে অগাধ আনন্দ—চোখে জল—মনে ভরসা ভরপুর। কিন্তু এ ভাবের তো আছে জোয়ার ভাঁটা। তা ছাড়া শ্রেয়ের পথে বিঘ্নও অঢেল। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই ইলাদের বাড়ি। পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। ইলার গাড়িবারান্দার কাছ দিয়ে যেতেই শুনতে পেল তার গলা। আজকাল ও রীতিমত গান সাধা সুরু করেছিল ভোর রাতে উঠেই। ও চকিতে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে শোনে:

শ্যাম সখি মথুরা গয়োরী।
প্রাণ পরিমল লে গয়োরী।
খোজ ভী কৈসে করূঁ পদচিহ্ন সারে খো গয়োরী।

"হঠাৎ বুকের মধ্যে ওর কেমন ক'রে ওঠে। ও সুরু করল ফের পথচলা। কিছু দূর গিয়ে আর একটিবার মাত্র ফিরে দাঁড়াল—তখনো ইলার কণ্ঠের রেশ শোনা যাচ্ছে:—

দৈতকী পূজা সিখা অদ্বৈত সহসা হো গয়োরী

"আর দাঁড়াল না। চোখ মুছে দ্রুতপদে সামনের পরিচিত সবুজ মাঠ, যেখানে ইলার সঙ্গে কত খেলা করেছে, এল পেরিয়ে। আর শোনা যায় না ইলার মধুর কণ্ঠ!···আর দেখচে তখনো ওর দুটি হাসিভরা চোখ।

"তখন আকাশে তারার দেয়ালি নিভে এসেছে সবে-জাগা সোনার আলোর আভাসে। ও উঠে দাঁড়িয়ে শুকতারাকে প্রণাম করল। তার-পর চলল উত্তর দিকে।"

"কোথায় যাবে স্থির না ক'রে?"

"ওর মনে এল পাহালগাঁ যাবে।"

"কিন্তু এত জায়গা থাকতে পাহালগাঁ কেন?"

"গুরুর খোঁজে।"

"রামকৃষ্ণদেব কি ওকে গুরুর খোঁজে পাহালগাঁ যেতে বলেছিলেন?"

"না। বলেছিলেন শুধু গৃহত্যাগ করতে, তিনি পাশে আছেন এই ভরসা দিয়ে।"

"তাহ'লে ও পাহালগাঁ রওনা হ'ল কী ভেবে?"

"এ সব তোকে আমি কী ক'রে বোঝাব বল্ দেখি? আমি কতটুকু বা জানি এ সবের? ভরসা ক'রে কেবল এইটুকু বলতে পারি—তা-ও গুরুদেবের কাছে শুনেছি ব'লেই—যে সাধক যদি খুব আন্তরিক ভাবে ভগবানকে চায় তাহ'লে ভগবান হৃদয় থেকে এই ভাবেই তাকে

চালিয়ে নেন—যার নাম—কিন্তু নামে কাজ কি—ইনটুাশন ব'লেই ধ'রে নে না, যদি আদেশ ব'লে মেনে নিতে বাধে।"

"তারপর?"

"ও ঠিক করল দু-মেলে আমার কাছে দু-চারদিন থেকে যাবে উঠতি পথে পাহালগাঁ। সুরু করল পথ চলা—হাতে মাত্র গুটি দশেক টাকা। তারপর—সে অনেক কাহিনী—পথে একজন ওকে টিকিট ক'রে দিল লাহোর অবধি। লাহোরে নেমে ও হাঁটতে সুরু করল। কিন্তু হঠাৎ অনভ্যস্ত ঠাণ্ডায় ও অনাহারে অসুখ করল—পড়ল জ্বরে। জ্বর গায়ে কিছুদূর চলেই প'ড়ে গেল মাথা ঘুরে এক গাছতলায়। সেখান থেকে এক শেঠজি ওকে নিয়ে এলেন তুলে—তাঁর মোটরে। তিনি যাচ্ছিলেন কাশ্মীরেই। ও তাঁকে সব বলাতে তিনি আশ্চর্য হ'য়ে বললেন পাহালগাঁতেই তাঁর গুরু থাকেন, সেখানে ওর থাকার বন্দোবস্ত তিনিই ক'রে দিতে পারেন সহজেই। ও তো চাঁদ হাতে পেল। বলল—দিন তাই ক'রে। শেঠজি ওকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে যেতেন কিন্তু ওর তখন এত জ্বর যে ওকে নিয়ে যেতে সাহস পেলেন না, লাহোরের এক নার্সিং হোমে রেখে পাহালগাঁয়ে ওঁর গুরুর নাম ধাম দিয়ে চ'লে গেলেন নার্সিং হোমের জন্যে সব খরচ দিয়ে।

"কী আশ্চর্য! পাহালগাঁয়েই ওর গুরু মিলল!

"আর এমন একজন হঠাৎ পাওয়া পথিকবন্ধুর নির্দেশে।"

"কেমন ক'রে ঘটে এ ধরণের যোগাযোগ অসিদা?"

"আজব পথের সবই আজব রে ভাই।"

"রোসো অসিদা, একটা প্রশ্ন কেবল: ও এখন কোথায়?"

অসিত আশ্চর্য হ'ল: "কেন? গুরুর কাছে।"

"কেমন আছে সেখানে? চিঠি পাও?"

"একটি মাত্র পেয়েছিলাম ওর পাহালগাঁ পৌঁছনোর পরেই। তাতে ও লিখেছিল ওর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা—যদিও সামান্যই।"

"সেখানে কী করে?"

"ধ্যান ধারণা গ্রন্থপাঠ গুরুসেবা, যা করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা।"

"খায়?"

"দুপুরে গুটি তিন-চার পরোটা ও একটু ডাল।"

"ব্যস? এক পেয়ালা চাও না?"

"চা কোথায় পাবে ওখানে?"

"রাতে কিচ্ছুটি খায় না?"

অসিত হাসে: "ওরা একাহারী যে। খুব খিদে পেলে—লিখেছিল—আঁজলা ভ'রে খায় নদীর জল—অঢেল।"

ছায়ার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। একটু পরে বলে: "ওর কষ্ট হয় না? মানে না খেয়ে?

অসিত একটু হাসে: "ওরে, এ পথে যারা পা বাড়ায়—তারা তো আর আদর কাড়ায় না।"

"তবু—"

"কী?"

"কষ্ট তো কষ্টই। তার উপর বড় মানুষের ছেলে—ভোগী।"

"দিদি!" অসিত বলে মৃদু হেসে: "ত্যাগ করে সবচেয়ে সহজে—হাসিমুখে—কারা জানিস?—যারা ভোগ করেছে সবচেয়ে বেশি। এ ভগবানের খাস তালুকের আর এক ব্যাপার। তোকে ঐ গানটা শেখাই নি—আজব তমাশা তেরা শ্যামল?"

ছায়া একটু চুপ ক'রে থাকে মাটির দিকে চেয়ে। তারপর চোখ তুলে বলে: "যাবার সময় কী ব'লে গেল তোমাকে?"

"বেশি কিছু না। শুধু আমি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 'মনে কোনো আক্ষেপ নেই তো চন্দুলাল?' তখন ও শুধু হেসে বলেছিল: 'স্বামীজি, আপনি আজ ভোরে যে ভজনটি গাইছিলেন মনে আছে?'

'তুলসীদাসের—?'

'না—তার পরেরটি—যার অন্তরায় আছে—বাঁশির ডাক যখন কানে পৌঁছয় তখন আক্ষেপ থাকা না থাকাটা হ'য়ে ওঠে—অবান্তর—অর্থহীন।'

ছায়া দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়াল: "যাবে না—বাগান দেখতে?"

অসিত উঠল: "হ্যাঁ—সময়ও হ'ল—সুবিমাখা ডুবু ডুবু…চল্।"

সমাপ্ত

ব্যর্থ অভিযান

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ক্লান্ত মোর বিহঙ্গের পাখা—
বিবর্ণ বিশুষ্ক ওষ্ঠ, আছে বক্ষ তলে ঢাকা
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত শত অভিশাপ
বিগত দিনের কত জ্বালাময় বেদনার তাপ
হিমরিক্ত মরুবেশে যাত্রাপথে বিচিত্র কাহিনী
গিয়ে যারা দিয়েছিল বিজয়ের বরমাল্যখানি—
সব মনে আছে,

তাই ওর বিধাতার কাছে
নেই কোন আকুল প্রার্থনা।
নেই কোন অভিমান, নেই প্রবঞ্চনা।
পক্ষে তার উড়িবার শক্তি নাহি আর
বক্ষতলে বন্দী প্রাণ করে হাহাকার।
শকতি হারাল তবু অভিযান
নিষ্ফল আক্রোশে তাই কাঁদিছে পরাণ।

কোথা তীর

শ্রীঅমলকুমার রায়চৌধুরী

(ক)

কুলির ছেলে সুখন। দিনের বেলায় বাপের সঙ্গেই মাল টানে, আর সাঁঝের বাতি জ্বল্‌লে পরে পড়্‌তে যায় নাইট্‌-স্কুলে। নাইটস্কুল শিখিয়েছে ওকে ক-খ, শিখিয়েছে গুণ-ভাগ। ও আজকাল ছোট ছোট বই পড়ে বেশ বুঝতে পারে, প্লাটফরমের ইংরেজীতে লেখা নোটিশবোর্ডের ইংরেজী শব্দগুলো পর্য্যন্ত বানান করে পড়্‌তে শুরু করে দিয়েছে। ওর বাপ্‌কে সবাই ঠাট্টা করে—"তোর হ'ল কি, শেষটায় যে সুখন উপোস করে মরবে, দুপাতা ইঙ্গিরি শিখ্‌লে চাক্‌রীও মিল্‌বে না—অথচ মাথা যাবে বিগ্‌ড়ে, তখন কি আর আড়াই মণি বাক্স কাঁধে ফেলে চল্‌তে পার্‌বে?"

সুখনের বাবা হাসে, বলে না কিছুই।

সেদিন গোটা বারর সময় একটা ট্রেন এসে ইন্‌ করেছে। পাকিস্থান থেকে এসেছে ট্রেন। দলে দলে লোক পালিয়ে এসেছে, তাদের সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে, সব মালপত্তর নিয়ে। দৌড়ে যায় কুলিরা—এই সময়টায়ই অনেক পয়সা পাওয়া যাবে। সুখনের বাবা এক বাবুর মাল গিয়ে ধরে—বৃদ্ধ ভদ্রলোক, স্ত্রী আর ছোট কয়েকটী বাচ্চা—নাতি-নাত্‌নী হবে আর কি। মাল কিন্তু তার গোটা দশেক—ওজনে মণ কুড়ি হবে। "দশঠো কুলি লাগেগা, বাবুজী; বিশ্‌ রূপেয়া দিজিয়ে, হাম্‌ আপ্‌কা মাল গাড়ীপর পৌছ্‌ দেগা।" আঁত্‌কে ওঠেন ভদ্রলোক—"বল কি হে, চলে এসেছি নিজের গাঁ ছেড়ে; কি খাব এখানে ঠিক্‌ নেই, আর কুড়ি টাকা চাও তুমি। তোমার রেটমাফিক দিলে ত' দশজন কুলিকে দুটাকা দিতে হয়, আমি না হয় আর এক টাকা বেশীই দেব, তুমি তিন টাকায় আমার মালটা উঠিয়ে দাও ভাই।" রুখে ওঠে সুখনের বাবা—কি বলে এ বাবু, রেট্‌—হ্যা তিন আনা করেই বটে রেট্‌, কিন্তু শুধু তিন আনায় আজকাল কোনও কুলি মালে হাত দেয় নাকি! "নেহি বাবু—নেহি হোগা" বলে দলবল নিয়ে ও চলে যাবার উদ্যোগ করে।

সুখনের মনটা কিন্তু কেমন আর্দ্র হয়ে ওঠে। ও পড়েছে দাঙ্গার করুণ কাহিনী, ও জানে এই দাঙ্গার ভিতরে মানুষ মানুষের হাতে কত নির্য্যাতন, নিপীড়ন, কত নিষ্ঠুরতা সহ্য করেছে। মনে হল ওর কে জানে এই বৃদ্ধও হয়ত কোনও রকমে পালিয়ে এসেছেন, এর পাশেই হয়ত জ্বলেছে অসংখ্য প্রতিবেশীর চিতার আগুন, হয়ত এরই পিতা-পিতামহের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এরই চোখের সাম্‌নে। প্রাণের মায়ায় যে পালিয়ে এসেছে এম্‌নি অবস্থায়, তাঁকে কি এখানেও নিজের স্বার্থের জন্য এমন্‌ভাবে পীড়ন কর্‌তে হবে?

"বাবা"—সুখন তার বাপ্‌কে ডেকে বুঝিয়ে বল্‌তে যায়। কিন্তু আর একটা কুলি ক্ষেপে ওঠে। খেঁকিয়ে বলে ওঠে—"তাতে তোর কি সুখন? ও না হয় এখন বিপদে পড়েছে। না হয় আজ ওর বাড়ীঘর পুড়ে গিয়েছে; কিন্তু নিজের কথা ভাব্‌, নিজের যে তোর কোনদিনই বাড়ীঘর নেই। আর ঐ চেয়ে দেখ ঐ জেনানার দিকে, আজও যে সোনা, যে গয়না ওর আছে, ওর হাজার ভাগের এক ভাগও কি দেখেছিস কোনওদিন তোর মা-বোনের? সত্যি কথাই এগুলি, কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা সংশয় থেকে যায় সুখনের। বিত্তবান যে বিত্ত হারাল, সুখী যে এক নূতন বিপদে পড়্‌ল, তাদের জন্যই তো সহানুভূতি করতে শিখিয়েছে তার শিক্ষা, তার বই; কিন্তু এই বহুকালস্থায়ী কুলি-ভদ্রলোক বৈষম্যের ভিতর যে কিছু অন্যায় বা অসন্তোষের কারণ আছে, তা তো সে আজও জানে নি। ব্যবসায়ে কার বিরাটরকম ক্ষতি হ'ল তাই নিয়ে ওঠে পৃথিবীতে আলোড়ন—বংশানুক্রমিক ভিখারীর কথা কে ভাবে? অন্য একজন কুলি বলে—তুই কি বোকা রে সুখন। ও কষ্টে পড়েছে তাতে আমাদের কি? দেখ্‌বি ঠিক্‌ই ওর টাকাকুড়ি দিতে হবে, লোক পাবে কোথায়? সত্যিই তাই, একটু পরেই

ভদ্রলোক ওদের ডাকেন, পনের টাকায় ওদের রফা হয়। কিন্তু সুখনের মনে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন একটা তিক্ততা টেনে আনে। মানুষ কি শুধুই তার দেনা-পাওনা আদায়ের চেষ্টায় থাক্‌বে, আর কোনও বিচার বিবেচনাই কি তার কাজকে প্রভাবান্বিত কর্‌বে না? এই কি মানুষের জীবন! কিন্তু সে আজ পর্য্যন্ত যা শিখেছে, যা পড়েছে তাতে তো এ শিক্ষা দেয় নি। সে ত' বরং শিখেছে যে স্বার্থবুদ্ধিপরিহার করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

(খ)

বছর দুই কেটে গেছে। এর ভিতরে সুখনের মনে আরও এসেছে দ্বন্দ্ব, জেগেছে সংশয়। সে নূতন চোখ দিয়ে দেখেছে তাদের দুরবস্থা, দেখেছে কুলিলাইনে মদের নেশায় রাত্রির উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রশ্ন জেগেছে তার, কেন এমন অবস্থার ভিতর সে পৃথিবীতে জন্ম নিল। সবাই ত' এমন নয়। তারই স্কুলের বন্ধুদের ভিতর যারা একটু ভদ্র, তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখেছে সে—অর্থের প্রাচুর্য্য তাদের না থাক্‌লেও, মানুষের চরিত্রের হীন দিক্‌টা এমন প্রকটভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে না তাদের জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে, প্রতিটি রাত্রির অন্ধকারে।

অথচ দুষ্‌বে ও কাকে? ওরই নিকটতম আত্মীয়; সেই শিশুকাল থেকে দেখা বান্ধব, ও জানে যারা ওর জন্য হয়ত "জান" পর্য্যন্ত "কবুল" করতে পারে, তারাই ত' আবার নেশা করে অমনি কুৎসিৎ, বীভৎস হয়ে ওঠে। এদের যে আত্মীয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা না দিয়েও তার উপায় নেই, অথচ তার সমস্ত শিক্ষা, তার সমস্ত ধ্যান-ধারণা এদের আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়। সে যে অন্ততঃ তার বইয়ের পাতার ভিতর দিয়ে পরিচিত হয়েছে এক নবজীবনের সঙ্গে, কি করে সে তা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাবে, ফিরে যাবে আবার সেই ক্লেদাক্ত, কুৎসিৎ কুলিলাইনে। তার হৃদয় আজ দুখানা হয়ে ভেঙে গেছে—একদিকে তার সমস্ত প্রেম, ভালবাসা—আর অন্যদিকে তার এক নবজীবনের উপলব্ধি।

কেন এমন হয়? সামান্য শিক্ষাই ত' সে পেয়েছে, কিন্তু এতেই জেগেছে তার মনে এক নবচেতনা, সে ত ভাবতেও পারে না ঐ রকম মাত্‌লামির কথা। আচ্ছা যদি সবাই—যদি ঐ কুলিলাইনের সবাই অন্ততঃ তার মত একটু সামান্য শিক্ষাও পেত, তাহলে হয়ত চারিত্রিক দিক দিয়ে এত নীচে তারা নামতে পারত না। অভাব তাদের হয়ত শিক্ষা পেলেও থাকৃত, কিন্তু তাদের জীবন যে আজ এত কালো হয়ে উঠেছে, তা বোধগয় এমন হত না। কেন তারা সে শিক্ষাটুকুও পেল না? একি শুধু সেই পরমকারুণিক—যার কথা সে পড়ে এসেছে তারই এক করুণার নিদর্শন—না এ আর কিছু?

ধরণীতে নেমেছে সন্ধ্যা। আঁধার হয়ে গেছে সবদিক। এই কচি বয়সেই সুখনের মনে হয় যেন তার জীবনেও নেমে এসেছে সন্ধ্যা। অন্ধকারে ঢেকে গেছে তার ভবিষ্যৎ। মাঝদরিয়ায় এসেছে সে, কিন্তু তার ধ্রুবতারা আজ 'ঘনমেঘে অবলুপ্ত।'

(গ)

কলেরার মহামারী লেগেছে কুলি লাইনে। রোজই মাছির মত মরে যাচ্ছে দশ বিশ জন করে। না হচ্ছে এদের কোনও চিকিৎসা, আর না আছে কোনও প্রতিষেধক ব্যবস্থা। ভয়ও যেন এদের নেই। রোগী নিরোগী সবাই দিব্যি মেলামেশা কচ্ছে। এমন ভাবেই হাজার খানেক হয়ত মরে যাবে, আর বাকীরা শুধু অদৃষ্টের জোরেই টিকে থাক্‌বে। সুখন জানে যে খাওয়া দাওয়ার ভিতর দিয়েই ছড়িয়ে পড়ে এ রোগ, জানে যে রোগীর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করাটা ভাল নয়, বিশেষ করে তার মলমূত্র পরিহার করতে হবে বিষের মতো। সুখন বলেছে সবাইকে এসব কথা, বলেছে যে তোমাদের বাঁচতে হলে সবাই মিলে অসাবধানে যেও না রোগীর কাছে, খেয়ো না নোংরা পচা জল। কিন্তু তাতে ফল হয় নি কিছুই, ফিরে পেয়েছে যে শুধু পরিহাস আর তিরস্কার। সন্দেহ করেছে অনেকে সে ইংরেজী পড়ে সে হয়ে গেছে সহানুভূতিহীন, সে আজ অসুস্থ আত্মীয় বন্ধুকে নিষ্ঠুর ভাবে ফেলে যেতে চায়। বিস্ময়ের কিছু নেই এতে। এই স্বাভাবিক; অন্ধকারে যাদের চোখের দৃষ্টি হয়ে আসে স্তিমিত, সূর্য্যের রশ্মিকে তারা জানায় না স্বাগত সম্ভাষণ, তারা বরং নিবিয়ে দেয় আলো; ঢোকে গিয়ে তাদের অজ্ঞানতার ছায়ায় ঘেরা অন্ধকারে। সেখানেই তাদের

শাস্তি, সেখানেই তো পায় তারা তাদের চির-অভ্যস্ত জীবনধারা।

ব্যথা পেয়েছে সুখন ওদের কথায়, কিন্তু তবুও দমে যায় নি। ফিরে গিয়েছে ভদ্র শিক্ষিত জনমণ্ডলীর কাছে। প্রার্থনা করেছে অর্থ সাহায্য, চিকিৎসার সুযোগ, আর অনুরোধ করেছে প্রচুরতর পবিত্র জলের বন্দোবস্তের জন্য। কিন্তু সেখানেও এসেছে ব্যর্থতা। এরা তিরস্কার করে নি, কিন্তু করেছে রূঢ় পরিহাস। প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে যে অজ্ঞ, মূর্খ, দরিদ্রের দলের ঐ রকম মৃত্যুই হল জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি, আর এই উচ্চ গোষ্ঠী পরম উদাসীনভাবেই দেখে যাবে তাদের দুরবস্থা। তাদের একমাত্র প্রচেষ্টা হবে যাতে এ কালরোগ তাদের ভিতরও না আসে। এমন ব্যবহার ছিল সুখনের অভাবনীয়। সে ভাবতে পারে নি যে শিক্ষা আর অজ্ঞতার ভিতর শুধু এই মাত্র পার্থক্য যে, শিক্ষা আন্‌বে স্বার্থপরতা আর অজ্ঞতার ভিতর বাসা বাঁধবে কুসংস্কার। অজ্ঞতা আত্মঘাতী—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই সুখনের, তা ত' সে চোখের পরেই দেখ্‌ছে; কিন্তু শিক্ষা কি এত সংকীর্ণভাবে শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে চলার পথই দেখাবে? সে কি দেবে না কোনও উদারতা, কোনও নিঃস্বার্থ পরোপকারের প্রেরণা, আন্‌বে না কোনও বহুর জন্য একের আত্মবলিদানের উন্মাদনা? কোথায় তবে হবে সুখনের স্থান? বইয়ে পড়া শিক্ষার ভিতর দিয়ে যা ও নিজের জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে, তা হল সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে সবাইয়ের সঙ্গে সুখেদুঃখে মিশে যাওয়া। আর আজ ঐ সজীব শিক্ষার প্রতীকরা তাকে রূঢ় ভাবে জানিয়ে দিল যে, নিজের বিপদই একমাত্র বিপদ, অন্যের বিপদ শুধু পরিহাসের এবং উপভোগের বিষয়। ওর কানের ভিতর বাজ্‌তে লাগ্‌ল সেই বহুদিন আগেকার কথা—"তুই ভারী বোকা ত রে সুখন, ও বিপদে পড়েছে তাতে তোর কি; ঠিক্ দেখ্‌বি টাকাকুড়ি ওকে দিতেই হবে—লোক পাবে কোথায়?" আর আজ যে কথা মধুর ভদ্র ভাষায় ওঁরা বল্‌লেন তার মানে দাঁড়ায় এই—"তুই একেবারেই আনাড়ী সুখন। তোরা মরছিস্, তাতে আমাদের কি? আমাদের সাবধানতার উচু দেয়াল ডিঙিয়ে ও রোগ কখনই আমাদের ঘাড়ে চাপ্‌তে পারবে না। আর তোরা মরছিস্, তা মর্ না, কয়েকশ' মরে গেলেও মাল টান্‌বার মত যথেষ্ট লোক থাকবে।"—

আজ জগতের সাম্‌নে সুখনের একমাত্র পরিচয়।—উঁচু, নীচু সবাই মিলে আখ্যা দিয়েছে ওকে বোকা। বোকাই হবে বোধ হয়, না হলে এই বয়সের ভিতর কেনই বা ও এত ব্যথা, এত বেদনা পাবে!

(ঘ)

মনে চলে আশানিরাশার দ্বন্দ্ব, আসে বেদনা, আসে হতাশা, কিন্তু পৃথিবী তার কক্ষ পথে আপন মনেই চলে যায়। ভোর কেটে আসে দুপুর, দুপুর ফুরিয়ে আসে সন্ধ্যা। বর্ষা কেটে আসে শরৎ, কিন্তু তারও যাবার পালা আসে, আবার ঘুরে আসে বর্ষা। আমাদের সুখনের বয়সও বেড়ে চলে, বেড়ে চলে তার সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা, আর ভরে ওঠে তার বুক সংশয়ে, বেদনায়।

এরই মাঝে একটী মেয়ে এসে পড়ে সুখনের জীবন পথে। মুলুক থেকে নূতন আসা বেহারীর মেয়ে রুক্‌মী। আশ্চর্য্য মেয়ে এই রুক্‌মী। এই কদিনের ভিতর উৎসাহ আর চাঞ্চল্য দিয়ে যেন সমস্ত পল্লীটার জীবন সে দিয়েছে বদলে। রুক্‌মীর জীবনগাঙে বান ডেকেছে, নিজে ত সে উদ্বেল হয়ে উঠেছেই, এমন কি তার আবেষ্টনীতেও এনেছে প্লাবন।

সেদিন ষ্টেশনে একটা বাক্স মাথায় আর বগলে একটা বিছানা নিয়ে চল্‌ছে সুখন। দৌড়ে কোথা থেকে রুক্‌মী এসে উপস্থিত—"তুই যে একেবারে দুটো মাল নিয়েই কাবু হয়ে পড়েছিস—দে আমাকে বিছানাটা"—বলে বিছানাটা নিয়ে নেয় রুক্‌মী, আর বেশ সহজভাবেই চল্‌তে থাকে সুখনের সঙ্গে।

সুখনের মনে হল যে, ওর হাতের বোঝা আজ যেমন হাল্কা করে দিল রুক্‌মী, তেমনি যদি কেউ সাহায্য করতো ওর মনের বোঝা হাল্কা কর্‌তে, কেউ যদি ওর মনের দ্বন্দ্বে ওর পাশে এসে দাঁড়াত, তাহলে হয়ত ওর জীবন আজ এত দুঃসহ হয়ে উঠ্‌ত না।

* * * *

সেদিন বিকেলে একটা ইংরেজী বই পড়্‌ছিল সুখন। বাইরে তখন ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়্‌ছে। এরই মাঝে

হঠাৎ কোথা থেকে যেন রুক্মী এসে উপস্থিত। বাইরে থেকে চীৎকার—"ভিজে যাচ্ছি রে সুখন, দোর খোল্ তাড়াতাড়ি; না হলে হয়ত বা বাজ পড়েই মারা পড়ব।" দোর খুলে দেয় সুখন—"কি রে, এখানে আবার এই বৃষ্টির ভিতর কি করে এলি?"

"আরে ছো, এই নাকি আবার বৃষ্টি, এই ত বেরিয়েছি একটা ট্রেণের হুইস্‌ল্ শুনে; তুই ত' দেখ্‌লি না; সে কত রকম সাহেব, মেম, বাবু, মেয়ে এল, আর তাদের দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কখন যেন এল এই হতভাগা বৃষ্টিটা; কি আর করি—কাছে তোদের বাড়ীটা—আর ঠিক্ জানি তুই নিশ্চয়ই বাড়ীতে বসে কুঁড়ের মত একটা কি ঐ সব আখর আঁকা বই নিয়ে বসে আছিস। তাই ত' এখানে চলে এলাম আর তোকে ডাক্‌লাম—হ্যাঁ শোন্ আজ যা মজা হয়েছিল—যা জব্দ করেছি ছুখিয়াকে…" কথা না শেষ করেই রুক্মী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

"আচ্ছা রুক্মী, তোর কি এখানে ওখানে দৌড়ে বেড়ান, একে জব্দ করা, ওকে ঘায়েল-করা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না; জান্‌তে ইচ্ছে করে না ঐ সব সাহেব মেমেদের কথা, আমাদের দেশের কথা, সূর্য্যচন্দ্র-তারার কথা?"

"দূর সুখন, তুই ভারী বোকা, আমার ইচ্ছে করবে না কেন ঐ সাহেবদের কথা জান্‌তে; আমার খুব ইচ্ছে করে, আর জান্‌তেই কি শুধু, আমার ইচ্ছে করে, ঐ মেমদের মত সুন্দর সুন্দর জামা পর্‌তে, ঐ বাঙ্গালী মেয়েদের মত সুন্দর শাড়ী পর্‌তে? আচ্ছা, দেনা সুখন তুই আমাকে একটা শাড়ী কিনে, একটা রঙীণ শাড়ী।"

সুখন চুপ্ করে থাকে। হঠাৎ এর ভিতরেই একটা হ্যাচ্‌কা টানে ওর বইটা হাত থেকে টেনে নিয়ে আর একটা তুব্‌ড়ী ছুটিয়ে দেয় রুক্মী—"কি দেখ্‌ছিস্ রে এ বইটায়? ছবি আছে বুঝি, কৈ, না ত', একটা ছবিও ত দেখছি না, তবে এটা নিয়ে এরকম বসে থাকিস্ কেন রে? এতে কি সুখ পাস্? তার চেয়ে চল্ না একটু বৃষ্টির ভিতর ঐ মাঠে ঘুরে আসি।"

আস্তে আস্তে সুখন বলে—"তুই জানিস্ না, কি চমৎকার এই বইটা।"

ইচ্ছে করে বইয়ের গল্পটা রুক্মীকে বল্‌তে। কিন্তু রুক্মী এর মর্ম্ম বুঝতে পারবে কিনা কে জানে। অথচ একজনের উপলব্ধি, আনন্দ, অথবা আবিষ্কার আর একজনের সঙ্গে ভাগ না করে নিলে কখনই পূর্ণতা পায় না। তাই সুখন নিজে উপযাচক হয়েই গল্পটা বল্‌তে থাকে।

গল্পের নায়ক এক তরুণ। এক প্রলয়ংকরী যুদ্ধের বীভৎস রূপ দেখে ফিরে এসেছে সে। দেখেছে ধ্বংসের উন্মত্ত তাণ্ডবলীলা, অনুভব করেছে যে কত ক্ষণস্থায়ী এ মানবজীবন। মনে জাগ্‌ছে তার এখনও সেই বিভীষিকার কালো ছায়া, চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে অসংখ্য মানুষের মুখ—যারা একদিন এই ধরণীর বুকে হেসে খেলে গেছে কিন্তু আজ তারা গেছে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে।

সংসারে এসেছে তার বিতৃষ্ণা, বীতশ্রদ্ধ হয়েছে সে যশ, মান, খ্যাতি, অর্থের পরে। বেরিয়েছে সে সত্যিকারের জ্ঞানের অন্বেষণে, দেশের পর দেশ ঘুরেছে, শুধু এক লক্ষ্য, এক চিন্তা—সে জানবে কেন এই জীবন-মৃত্যুর খেলা, এই আশানিরাশার দোলা, এই দুঃখসুখের মায়াজাল। সুখনের মনে পড়ে সেই বহুযুগ আগের বুদ্ধের কথা—'প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ।' সব ছেড়ে চলে গেলেন তিনি দূরে, বহুদূরে—আবিষ্কার কর্‌লেন তিনি মানবজীবনের দুঃখ বেদনার উৎস—কঠোর তপস্যায় অর্জ্জন কর্‌লেন পরমজ্ঞান।

সুখেনের চোখে নামে এক অপূর্ব্ব ছায়া, গলা কেঁপে আসে আবেগে। কি মহান্, কি সুন্দর এই জীবন। নিজেদের অতীতকে পেয়েছে পরিপূর্ণভাবে আপনার করে।

উচ্ছ্বসিতভাবে বল্‌তে থাকে সুখন—"তুই জানিস্ না রুক্মী, আমার মনের উপর দিয়েও কত ঝড় কত তুফান বয়ে গেছে, দেখিনি আমি যুদ্ধের উন্মুক্ত ধ্বংসলীলা সত্যি, কিন্তু আমি দেখেছি কত অসহায় আমার এই অজ্ঞ, মূক আত্মীয়বান্ধবরা; এরা রোগে জানে না কি করে বাঁচ্‌তে হয়, এরা জানে না নিজেকে মানুষের সম্মান দিতে, এরা জানে না যে মানুষ জন্মায়নি পশুর মতো তার জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে। আর বিশ্বের কাছে ত এরা কেবল পণ্য-সামগ্রী।

আর একদিকে আমি দেখেছি আর একদল মানুষ, শিক্ষিত সুন্দর এরা, সুস্থ, সৌম্য এদের চেহারা, কিন্তু ভিতর এদেরও খাক্ হয়ে গেছে, এরা মনের ভিতর

রেখেছে শুধু গরল—সংসারে এরা ছড়িয়ে যাচ্ছে তারই বিষবাষ্প।

যুদ্ধের ধ্বংসটা বড় বীভৎস, সেটা বড় প্রকট হয়ে দেখা দেয় সবার চোখে, কিন্তু এই যে আস্তে আস্তে যুগ যুগ ধরে ধ্বংস হয়ে গেছে—নারে ধ্বংস হয়ে যায় নি, ধ্বংস হয়ে গেলে ত ছিল ভাল—এই যে পশু হয়ে গেছে কোটী কোটী মানুষ, আর তাদের উপরতলার লোকেরা হয়ে গেছে কালো সাপ—এ খবর কেউ রাখে না।

রুক্‌মী, আমার কল্পনা ছিল, আমি দেখেছিলাম আমার মানসচক্ষে এক ভবিষ্যতের যুগ। যাতে এই পঙ্কিলতা যাবে চলে, আস্‌বে সুস্থ, মহান মানুষের দল, তাদের থাক্‌বে না অজ্ঞতা, শিক্ষায় এনে দেবে না শুধু স্বার্থবুদ্ধি। কিন্তু আমি কর্‌তে পারলাম না রে কিছুই। পদে পদে পেয়েছি আমি আঘাত, কেউ করেছে পরিহাস, কেউবা করেছে সন্দেহ, আর সবাই মিলে জেনে নিয়েছে যে, আমি মূর্খ। মনে আমার ছিল না সে শক্তি যে এ সমস্ত আঘাত সহ্য করেও আমি দাঁড়াব, আমি দাঁড়াব যুগের এই পৃথিবীর সঙ্গে। তাই ব্যর্থ হয়ে গেছি আমি—আজ ক্লান্তি নেমে এসেছে আমার সমস্ত অঙ্গে। একদিন বিশ্বাস ছিল আমার মানুষের পরে—মনে পড়ে সেই ছোটবেলার কথা। দেখেছিলাম কতদূর অবনত হতে পারে মানুষ নেশার ঘোরে। সেদিন ভেবেছিলাম সে এক শিক্ষার মঙ্গলস্পর্শেই বুঝি সব কিছু ধুয়ে মুছে সুন্দর হয়ে ওঠে—কিন্তু আজ জেনেছি যে তা নয়, আজ আমার ভেঙে গেছে মানুষের অন্তরের শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস। আজ আর আমি আলো দেখ্‌ছি না কোথাও।

রুক্‌মী, আস্‌বি তুই আমার সঙ্গে, আমার চলার পথে। তোর চোখের তারায় জ্বল্‌বে আমার জীবনের আলো, তোর চঞ্চলতা দেবে আমার বাহুতে শক্তি, তোর হাসি এনে দেবে পথচলার ছন্দ।

তাহলে আয় রুক্‌মী, আর একবার চেষ্টা করি, হয়ত আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে আসবে নবীন জীবন—আস্‌বে নূতন পৃথিবী, আর যদি ব্যর্থতাই আসে আমাদের জীবনে, আসে দুঃখ, আসে বিফলতা, তাতেই বা কি খেদ—

"রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই ত' পাব
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি, ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—তুমি আছ, আমি আছি।"

"আস্‌বি কি তুই রুক্‌মী?"

অবাক হয়ে যায় রুক্‌মী ওর এই উচ্ছ্বাসে। কি হল সুখনের! তবে কি রুক্‌মী এসে যা শুনেছে তাই সত্যি—সুখন পাগল! তাই হবে বোধ হয়। রুক্‌মীর পাগলামিটা বেশ উপভোগ্য মনে হয়—হেসে বলে—"সুখন, তুই পাগল; কি সব বলিস্, তার মানেই বুঝি না আমি, কুলির ছেলে হয়ে তোর এত বড় বড় কথায় দরকার কি রে? বই পড়্‌তে পড়্‌তে তোর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। ও হো, রাত হয়ে গেছে আর বৃষ্টিটাও থেমেছে, আমি এবার যাই।" হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে যায় রুক্‌মী, আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুখন।

সত্যিই সুখন পাগল।

(৬)

শ্রাবণ মাসের আঁধার রাত। বাইরের দিকে চেয়ে থাকে সুখন। 'গগনে গগনে ডাকে দেয়া।' ক্ষণেকের জন্য ঐ দূর বনানী আর তার গাছপালা প্রকাশ হয়ে পড়ে বিদ্যুতের আলোতে। এমনি বিদ্যুতের মতই এসেছিল ওর জীবনে রুক্‌মী। ক্ষণেকের জন্য আলো করে দিয়েছিল ওর জীবন। কিন্তু সে চলে গেছে তাকে কৌতুক করে, তার পাগলামিতে উপহাস করে। রুক্‌মীর স্মৃতি এখনও আসে ওর মনে—কিন্তু সে শুধু এনে দেয় বেদনা—'The rose's scent is bitterness to him that loved the rose.'

কি করবে ও? বাইরে থেকে ভেসে আস্‌ছে বৃষ্টির শব্দ আর তারই সঙ্গে মিশে আস্‌ছে একটা বীভৎস কোলাহল। ও জানে কি হয় এই সময়টায় সমস্ত কুলি লাইনে—এই এনেছিল ওর জীবনের প্রথম বিপ্লব আর আজ এই পরমক্ষণেও ভেসে আসছে তারই সাড়া।

ওর সম্মুখে আছে মানুষের মহান ঐতিহ্য। যুগে যুগে মানুষ কত বাধা, কত বিঘ্ন পেয়েছে, কিন্তু তবু সে দাঁড়ায়নি স্থির হয়ে, করে নি পশ্চাদপসরণ। সফলতা হয়ত আসে নি তার সব সময়, কিন্তু তবুও সংগ্রাম সে করে গেছে সততঃই। এই সংগ্রামই ত জীবন, আর এর ভিতরেই ত মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি। রুক্‌মী আজ তাকে ফেলে চলে গেছে, তার নিকটতম আত্মীয়দের সঙ্গে এসেছে তার বিচ্ছেদ—কিন্তু তার মহান আদর্শ পড়ে আছে—মানুষের ভিতর আন্‌তে হবে মনুষ্যত্ব। আজ তার একলা চলার দিন এসেছে। কে জানে তার 'সোনার তরী' কোনদিন তীরে ভিড়্‌বে কিনা, কিন্তু পাল তার আজ তুলে দিতে হবেই।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

২২

শুল্ক প্রদান পর্য্যায়ের অবসানে আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছি এবং আমাদিগের পণ্যসম্ভার কপিষার সম্ভল ঘট্টার বণিকবীথিতে সম্পূর্ণরূপে বিক্রয়ের জন্য কি ব্যবস্থা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা ও আমি আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে, অপরাহ্নে একজন বৌদ্ধশ্রমণ আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তাঁহাকে আমি আমাদের নৌকায় আনয়ন করিয়া আমাদের বিশ্রাম কক্ষে বসাইলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কি প্রয়োজনে কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। শ্রমণ তদুত্তরে বলিলেন, "আমি সুবর্ণ বিহারের আর্য্যমহাস্থবিরের আদেশে আসিতেছি। আপনারা কি পুরুষপুর হইতে আসিতেছেন ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

—আপনাদের কি থেওডোটস ও সক্লোমিডস সার্থবাহের যৌথ-সম্ভার ?

—হাঁ, তাহাই বটে।

—তবে ঠিকই হইয়াছে। সুবর্ণ বিহারের মহাস্থবির অর্হৎপাদ আর্য্য সংঘরক্ষিত বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যে কয়দিন আপনাদের পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা না হয় ততদিন আপনাদিগকে এই ঘট্টার নৌকাতেই অতি সতর্কতার সহিত ও সশস্ত্র হইয়া অবস্থান করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়। কারণ, এই পোতাশ্রয় জনবহুল বণিকবীথি এবং রাজকর্ম্মচারীসঙ্কুল ও প্রহরীগণদ্বারা সুরক্ষিত হইলেও চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তির অসুবিধা বা অভাব আছে বলিয়া মনে হয়না।

—আমরা আর্য্য মহাস্থবিরের উপদেশমত এইখানেই—এই নৌকাতেই সতর্ক ও সশস্ত্র হইয়া থাকিব।

—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য হইতে অনেক সার্থবাহগণ এখনও ককেনসে * আসিয়া উপনীত হন নাই। তাঁহারা অতি সত্বরই আসিয়া পড়িবেন, এবং বোধ হয়, সপ্তাহ মধ্যেই বণিক ও সার্থবাহ সমাবর্ত্তনে যোগদান করিবেন।

—আর্য্য মহাস্থবিরকে নিবেদন করিবেন যে আমরা এই সমাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

—আপাততঃ তবে আমার কার্য্য শেষ হইল—আমাকে সংঘারামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আর্য্য-মহাস্থবিরকে আপনাদের সংবাদ দিতে হইবে। আপনাদিগের আর কিছু কি বলিয়া পাঠাইবার আছে ?

—আপততঃ তাঁহাকে আমাদিগের অভিবাদন জানাইবেন—আমাদের আর কোনও নিবেদন নাই।

—আচ্ছা, তবে এখন আসি :—নমস্কার !

—নমস্কার !

শ্রমণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অন্ত সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আরও অনেকগুলি সম্ভারপূর্ণ নৌকা কপিষার পোতাশ্রয়ে আগমন করিল, ও বহু বণিক এবং সার্থবাহগণ অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ ও চমরী পৃষ্ঠে তাঁহাদের পণ্যবাহিত করিয়া এবং আপনারাও তদ্রূপ বাহনে কপিষার বণিকবীথিতে সমবেত হইলেন।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে আমাদিগের পরিচিত শ্রমণ মঞ্জুকান্তি সুবর্ণবিহার হইতে আরাত্রিক মাঙ্গল্য লইয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। আমরা তাহা সসম্মানে গ্রহণ করিলাম। শ্রমণ আমাদিগের মধ্যে মাঙ্গল্য বিতরণান্তে বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে প্রথম যামের প্রথম পাদে নবসমাগত সার্থবাহ ও বণিকগণের মধ্য হইতে চারিজন আমাদিগের নৌকায় আগমন পূর্ব্বক আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত পরিচয়ে জানিলাম যে একজন আসিতেছেন গৌড়দেশের সমতটপ্রদেশ হইতে, অপর তিনজন যথাক্রমে তক্ষশিলা, সৌরাষ্ট্র ও মধ্যদেশ হইতে। ইঁহাদিগের মধ্যে দেখিলাম যে সামতটিক বণিক বিশেষরূপে সম্মানিত এবং বুঝিলাম যে ইনি বহু মূল্যবান্ পণ্য লইয়া প্রাচ্যে বিক্রয়ের জন্য যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু যদি সুবিধা হয় ত তিনি কপিষার ও বাহ্লিকের বণিক-বীথিতে তাঁহার পণ্যসম্ভার বিক্রয়পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিবেন।

ইঁহারা কোনও প্রকারে শুনিয়াছিলেন যে আমরা দুইজন যবন সার্থবাহ বহু মূল্যবান্ পণ্যসম্ভার লইয়া প্রাচ্য হইতে আসিয়াছি এবং আপাততঃ ককেনস্ পোতাশ্রয়ে অবস্থান করিতেছি। ইঁহারা আরও শুনিয়াছেন যে যদি সম্ভব ও সুযোগ হয় তাহা হইলে আমরা আমাদিগের পণ্যসম্ভার স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্রে সমবেত বণিকমণ্ডলীর মধ্যে বিক্রয় করিয়া সত্বর স্থানান্তরে গমন করিব। ইহা সত্য কিনা তাহা ইঁহারা জানিতে চাহিলেন। আমরা বলিলাম যে তাঁহারা যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য। ইঁহাদের বাণিজ্য অভিযান সুদূর প্রতীচ্যে পণ্টস্ নগর অবধি গমন করিবে আপাততঃ এইরূপ স্থির হইয়াছে। যদি আমাদিগের আনীত সম্ভার হইতে আরও কিছু মূল্যবান্ পণ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন সেই উদ্দেশ্যে ইঁহারা অন্ত রাত্রেই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন,—যেন আমরা অপর কাহাকেও ইতিমধ্যে

---

* ককেনস্ কপিষার যাবনিক নাম।

আমাদের পণ্য বিক্রয় করিয়া না ফেলি তদ্রূপ অনুরোধও ইঁহারা করিলেন এবং আমাদের পণ্য পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। অনেক রাত্রি হওয়াতে এবং দিবসের পরিশ্রম হেতু ক্লান্তি ও অবসাদের পর তাহা আর সম্ভব হইল না; আমরা বণিকগণকে কল্য প্রাতে আসিয়া এ সম্বন্ধে আমাদিগের সহিত আলাপ করিতে বলিলাম।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে সার্থবাহ সমাগম
নামক দ্বাবিংশ বিবৃতি।

২৩

পরদিবস প্রাতে সংবাদপ্রাপ্ত হইলাম যে বহু সার্থবাহ ও বণিকগণ প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন এবং এখনও আরও আসিতেছেন। প্রজ্ঞা ও আমি গতরাত্রে সার্থবাহগণ যে আমাদের পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে সুবর্ণবিহারের আর্য্য মহাস্থবির অর্হৎপাদ সংঘরক্ষিত শ্রমণ মঞ্জুকান্তির সহিত আমাদিগের নৌকায় আগমন করিলেন। আমরা তাঁহাকে সসম্মানে সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া প্রথমে আমাদের নৌকায় অবস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে আমরা কোনও প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতেছি না, বরং নৌকায় অবস্থানে আমাদের অনেক সুবিধাই আছে, যেমন, নবাগত সার্থবাহগণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ,—ইহাতে আমাদের পণ্যদ্রব্য সত্বর বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে।

মহাস্থবির বলিলেন, "এখনও সকল সার্থবাহ ও বণিকগণের সমাগম হয় নাই। প্রতীচ্যদেশ হইতে বণিকগণের আসিতে হয়ত কিয়দ্দিবস বিলম্ব হইতে পারে। তাঁহারা না আসিলে আপনারা আপনাদিগের পণ্য বিক্রয় করিবেন না। বণিকগণের সমাবর্ত্তন হইলে এবং তাঁহাদিগের গণ নির্ম্মান কার্য্য সমাধা হইলে, বণিকগণতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী পণ্য বিক্রয়ে লাভবান হইতে পারিবেন।"

আমি বলিলাম, "আমরা বণিক-সমাবর্ত্তনের পর গণবিধি অনুসারে পণ্য বিক্রয় করিব—এইরূপ স্থির করিয়াছি।—গতরাত্রে জনকয়েক সার্থবাহ ও বণিক আসিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—তাঁহারা বোধহয় অদ্যও আসিবেন—সুলভে পণ্য ক্রয় তাঁহাদের উদ্দেশ্য—তাঁহাদিগকে অদ্যপ্রাতে আসিয়া আমাদিগের সহিত পণ্য বিক্রয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বলিয়াছি। হয়ত তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নেই আসিবেন—আসিলে কোনও ছলে তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিব। আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি।"

—বেশ—তবে সেইরূপই করিবেন—আমি এখন চলিলাম।

আমরা তাঁহাকে যবনপ্রথা অনুসারে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলাম।

মহাস্থবির একজন গন্ধারবাসী যবন। প্রব্রজ্যা* গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি সাধারণে থেওক্রিটস্ হেলনিডস্ নামে পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি ভিক্ষু সংঘরক্ষিত নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও পারদর্শিতার জন্য যথাক্রমে স্থবির, মহাস্থবির ও অর্হৎপাদ আখ্যালাভ করিয়া স্থবির ও ভিক্ষুসংঘের অনুমোদনে সুবর্ণ-বিহারের সংঘারামের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত আছেন। পুরুষপুরের কাপাতিক বিহারের সংঘারামের মহাস্থবির আমাদের কপিশায় আগমন-বার্ত্তা ইঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া, যাহাতে আমাদের কোনওরূপ অসুবিধা না হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাকে মনোযোগী ও যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। সুবর্ণবিহারের মহাস্থবির অর্হৎপাদ সংঘরক্ষিত এক সময়ে পুরুষপুরের কাপাতিক বিহারের আর্যমহাস্থবির অর্হৎপাদ ধর্ম্ম-রক্ষিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পাদমূলে বসিয়া অভিধর্ম্মে পারদর্শী হইয়াছিলেন। প্রাক্তন আচার্য্যের পত্রে আমাদের পরিচয় পাইয়া আর্য মহাস্থবির অর্হৎপাদ সংঘরক্ষিত আমাদিগের এখানকার কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন।

গতরাত্রে যে চারিজন বণিক আমাদিগের পণ্য ক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অদ্য আর আসিলেন না। তাঁহারা হয়ত আমাদের কথায় ও ব্যবহারে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাদের প্রয়োজন মত সুলভে আমাদিগের পণ্য বিক্রয় করিয়া ক্ষতি স্বীকার করা আমরা আবশ্যক মনে করি না।

অষ্টাহের মধ্যে বহু বণিক ও সার্থবাহগণের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। কপিশায় বাণিজ্য-পোতাশ্রয়ে আমাদের আসিয়া পঁহুছিবার পক্ষান্তে বণিক ও সার্থবাহ সমাবর্ত্তন দিবস নির্দ্ধারিত হইল এবং এই সমাবর্ত্তনে বণিক ও সার্থবাহদিগের গণ গঠন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া তাহাদিগের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ও পণ্য বিনিময় আরম্ভ হইল। একজন গণনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন। ইনি আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সমতটের সার্থবাহ; এই গণ কর্তৃক বিভিন্ন দিকের অভিযানের এক-একজন নায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন। বাহ্লিক ও শকস্থানে অভিযানের নায়ক হইলেন একজন সিন্ধুদেশ হইতে আগত সার্থবাহ ও প্রতীচ্যদেশগামী অভিযানের নায়ক হইলেন একজন সৌবীরী বণিক। যতদিন কপিশায় এই বণিক ও সার্থবাহগণ অবস্থান করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পণ্য বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়াদি গণনির্দ্ধারিত বিধি-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। সকল বিবাদবিসম্বাদ গণনায়কের ও গণসমিতি দ্বারা চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হইবে। *গণান্তর্গত বণিক ও সার্থবাহগণের মধ্যে কেবল বাহ্লিক-গন্ধারে দিনার ও প্রতীচ্য যাবনিক ওবোলে এবং দ্রাক্‌ম্ প্রচলিত থাকিবে। কেবল সামান্য বিনিময় ও স্থানীয় বীথিতে ক্রয়-বিক্রয়ের* জন্য প্রচলিত রজত ও তাম্রমুদ্রা, কার্ষাপনাদি ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

এইরূপে গণগঠন সম্পাদিত হইল। এখন আমাদের পণ্য বিক্রয় সমস্যা সমাধান করিতে হইবে। আমরা—প্রজ্ঞা ও আমি—গণনায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাদিগের পণ্যসূচী ও বিক্রয়ের জন্য আমাদিগের নির্দ্ধারিত মূল্য ও রাজকোষে প্রদত্ত শুল্কাদি লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং সমিতিকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। পণ্যসমূহ ক্রেতাদিগের মধ্যে বিক্রয় ও বিতরণের ভার গণসমিতির উপর অর্পিত হইল। আমরা সমিতির ব্যবস্থার প্রতীক্ষায় রহিলাম। নির্ব্বিঘ্নে আমরা ভারমুক্ত ও নিশ্চিন্ত হইলাম এবং সত্বর আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাহ্লিক যাত্রা করিবার আশা হইল।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিত
গণ গঠন নামক
ত্রয়োবিংশ
বিবৃতি। (ক্রমশঃ)

* (পালি পব্‌বজ্‌জা) বৌদ্ধদিগের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ।

ভীমপলশ্রী

বনফুল

২১

সান্ত্বনা দোতালায় ছিল শব্দ শুনে দ্রুতপদে নাবতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। সামনের হলটায় দিগ্বিজয় সিংহ রায়, সুরেশ্বরী দেবী, কতকগুলো ভিজে কাপড়, বর্ষাতি প্রভৃতি মিলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হচ্ছিল একটা।

"সান্ত্বনা কই, কোথায় সে"—বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন সুরেশ্বরী দেবী।

"ওগো, তুমি ওই কাদামাখা জুতোটা বাইরে ছেড়ে এস না। গরম জল করতে বলেছি, তোমরা স্নান করে' ফেল সব"

সকলের দিকে চেয়ে বললেন তিনি আদেশের ভঙ্গীতে। ট্যাঁশ হিন্দিতে উত্তর দিলেন ছকুবাবু—"মরে গেলেও আমি তো আস্নান করছি না বাবা"

"যাঁরা ভিজেছেন তাঁদের বলছি। আপনাকে নয়"

"আমি একটুও ভিজিনি"—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন দিগ্বিজয়—"ভিজেছ বরং তুমি। তোমারই আগে স্নান করা উচিত"

"গোবর্দ্ধনবাবু, আপনিও তো খুব ভিজেছেন। আপনি করবেন না?"

গোবর্দ্ধনবাবুর দিকে চেয়ে সুরেশ্বরী প্রশ্ন করলেন।

"বেশ তো, করব"—হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন গোবর্দ্ধন।

"ওমা, এই যে সান্ত্বনা, ওপরে ছিলি বুঝি—"

সান্ত্বনা প্রণাম করতেই সুরেশ্বরী দেবী জড়িয়ে ধরলেন তাকে এবং সকলের সুমুখেই চুম্বন করলেন।

দিগ্বিজয়কে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "ছকুবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে তোমরা এসেছ তখন কি যে আনন্দ হল। আমার ভয় হচ্ছিল, আমি বুঝি ভুল তারিখ জানিয়েছিলাম তোমাদের—"

"আমি কিন্তু তখনই বলেছিলাম তা জানাও নি" —ঘাড় ফিরিয়ে সুরেশ্বরী বললেন—"তোমার ভুল কখনও হয় না। তারপর, সান্ত্বনা, তুই আছিস কেমন"

"ভুল করেছি কি না, তার অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। সুশোভনদের তো পাত্তাই নেই কারও। সান্ত্বনা তুমি এঁদের চেনো কি—ইনি হলেন ছকুবাবু, আর ইনি হলেন গোবর্দ্ধনবাবু। দুজনেই সম্পর্কে আমার"— সম্পর্কটা হঠাৎ গুলিয়ে ফেললেন দিগ্বিজয়বাবু—"মানে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়"

সুরেশ্বরী বললেন, "আচ্ছা, ব্রজেশ্বর এসেই চলে গেল কেন। ছকুদা বলছিলেন—এসে নাবেন নিঃপর্য্যন্ত। আর তোর কুকুর নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল। ভাগ্যে ভদ্রলোক পেয়ে দিয়ে গেলেন। লোকটি খুব ভাল বলতে হবে। ব্রজেশ্বর আবার আসবে তো"

"আসবে বই কি, শিগ্‌গিরই আসবে"—সান্ত্বনা জবাব দিলে চট করে'—"খুব জরুরি একটা দরকারের জন্য চলে যেতে হল। কোথাকার একটা জরুরি ফাইল না কি তাঁর কাছে থেকে গিয়েছিল। সেইটে দিয়েই ফিরে আসবেন"

"দরকারি ফাইলটা না দিয়েই চলে এসেছিল! কি যে সব ভুলো মন তোমাদের হয়েছে আজকাল"—সুরেশ্বরী দেবী তারপর দিগ্বিজয়ের দিকে ফিরে বললেন—"তুমি যদি চান না-ও কর, কাপড়-চোপড়গুলো ছাড় অন্তত"

"ছাড়ছি। স্নান করলেও মন্দ হয় না। কিন্তু তুমি

নিজে করছ কি। ভিজে সপ সপ করছে যে তোমার কাপড়—"

"কি যে বাজে কথা বল! আমি একটুও ভিজি নি। এ যা দেখছ ওপর-ওপর। তবে এগুলো ছাড়ব, আমি। স্নানও করতে পারি—"

ছকুবাবু পাইপ ধরিয়েছিলেন, দিগ্বিজয়ও মোটা সিগার বার করলেন একটা। গোবর্দ্ধনের দিকে চেয়ে বললেন—"নেবেন না কি"

"ও কি, তোমরা স্নান করে' ফেল আগে। সিগার বার করছ যে মোটা মোটা"

"থাক তবে। স্নান সেরেই খাব"

কুণ্ঠিত গোবর্দ্ধন প্রসারিত হস্ত গুটিয়ে নিলেন।

"টেলিগ্রাম"

দ্বার প্রান্তে পিওন এসে দাঁড়াল।

দিগ্বিজয় তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিগ্রামটা নিলেন এবং পড়েই সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলে' উঠলেন—"এ কি, ব্রজেশ্বর কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করছে"

"খুব চট করে' পৌছে গেছেন তো"—সান্ত্বনা বললে। টেলিগ্রামটা আর একবার পড়ে' দিগ্বিজয় বললেন, "টেলিগ্রাম করেছে আজ সকাল। লিখছে আজ সাড়ে চারটের ট্রেণে আসছে"

"তা কি করে' সম্ভব—" নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে সান্ত্বনা। "তাহলে কাল বোধ হয় করেছিলেন আজ এসে পৌছল"

"কিন্তু টেলিগ্রামেই তো তারিখ রয়েছে। এই যে নাইন্‌টিন্‌থ। আমি আবার বোধ হয় গোলমাল করে' ফেলছি। দেখ তো, এটা নাইনটিন্‌থই তো মনে হচ্ছে—না এইটিন্‌থ, দেখ তো। কিম্বা কালই বোধ হয় নাইন্‌টিন্‌থ ছিল তাহলে—তা হবে—"

"নেহি"—মাথা নেড়ে ছকু বললেন—"আজই নাইনটিন্‌থ"

"হ্যাঁ আজই নাইনটিন্‌থ", দিগ্বিজয় বললেন আবার, "আমাদের নন্দর জন্মদিন নাইনটিন্‌থ, তাকে চিঠি লিখলাম যে আজ সকালে—"

"কাল হয় তো তার জন্মদিন ছিল", সুরেশ্বরী বললেন। "না গো না, নাইনটিন্‌থই তার জন্মদিন"

"তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু কাল হয় তো নাইন্‌টিন্‌থ ছিল। কিন্তু না, তুমি তো ভুল করবার লোক নও"

"না, না, থাম, আমারই ভুল হচ্ছে বোধহয়। গোলমাল করে' ফেলছি, কালই বোধহয় নাইন্‌টিন্‌থ ছিল—থাম, ক্যালেণ্ডার একখানা দেখলেই তো চুকে যায়—"

"চল মাসীমা, তুমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলবে চল আগে। টেলিগ্রামের কি আজকাল কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে। হয়তো কেরাণীই লেখবার সময় ভুল তারিখ বসিয়ে দিয়েছে, কিম্বা চাকরে হয়তো দেরি করে' দিয়েছে। উনি এলেই বোঝা যাবে সেটা। তুমি এখন ওঘরে চল"

সুরেশ্বরীকে প্রায় টানতে টানতে সান্ত্বনা পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল।

"তোরা কোলকাতায় চাকর পেয়েছিস না কি। কোলকাতায় শুনেছি আজকাল চাকর পাওয়াই যায় না। মানুষের চিনিস ?"

"ব্যাপারটার কিন্তু একটা 'ফায়সালা' হওয়া দরকার। শুনুন সান্ত্বনা দেবী", ছকুবাবু এগিয়ে এলেন, "আপনার স্বামী আজ সাড়ে চারটের সময় পৌছুচ্ছি বলে' চাকরকে দিয়ে কি করে' টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন তাতো আমার মগজে ঘুসছে না। মোটর না বেগড়ালে তো আপনাদের কালই এখানে পৌছবার কথা। তা-ও ট্রেণে নয়, মোটরে—"

"সত্যি ব্যাপারটা এখন ঘোরালো গোলক ধাঁধার মতো হয়ে গেছে যে মাথায় কিছু ঢুকছে না আমার"—একটু শুষ্ক হাসি হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা।

"আমারও ঢুকছে না"—দিগ্বিজয় বললেন।

"গোপাল ভাঁড়ের একটা গল্প আছে"—হেসে সুরু করলেন দিগ্বিজয়, করেই ভ্রূকুঞ্চিত করে' থেমে গেলেন আবার—"দাঁড়াও গোপাল ভাঁড়ের না বীরবলের, আবার গুলিয়ে ফেললাম—"

অপ্রস্তুত মুখে থেমে গেলেন তিনি। সুরেশ্বরীও এ নিয়ে বাদানুবাদ করবার সুযোগ পেলেন না। টেলিগ্রামটার দিকে তর্জ্জনী আস্ফালন করে' ছকুবাবু যা বলতে লাগলেন, তাতেই মনোনিবেশ করতে হল তাঁকে।

"আপনি এবং আপনার স্বামী এখানে আসবার জন্যে

কাল একটা হাওয়া গাড়িতে রওয়ানা হয়েছিলেন কোলকাতা থেকে। হাওয়াগাড়ির কলকব্জা বিগড়ে যাওয়াতে আপনারা কাল রাতে ধরমশালা না কোথায় রাত কাটিয়েছিলেন। এ তার আপনার নোকরদের মালুম হ'তে পারে না। তারা এ বিষয়ে তার ভেজতেও পারে না। আপনার স্বামী আজ সমস্ত সকাল আপনার সঙ্গে মহজুদ ছিলেন, এতদুর তক্ এসেওছিলেন, তিনিও ও তার ভেজতে পারেন না। তাছাড়া তিনি লিখছেন ট্রেণে করে' আজ সাড়ে চার বাজে পহুঁছ যাউঙ্গে। বড় তাজ্জব লাগছে আমার"

"মরুক সে, চান করে' ফেল সব একে একে। প্রথমে কে ঢুকছে বাথরুমে"

"মাফ কি জিয়ে মালকাইন"—ছকুবাবু সুরেশ্বরীর দিকে অভিবাদনের ভঙ্গীতে ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে সরে গেলেন।

সুরেশ্বরী দিগ্বিজয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যাচ্ছ তো বাথরুমে এবার"

প্রকাণ্ড সিগারটার দিকে এক-নজর চেয়ে দিগ্বিজয় উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেল আমার। তুমি কিন্তু ভিজে কাপড়ে কেন যে দাঁড়িয়ে আছ এখনও, তা বুঝতে পারছি না"

"তুমি চল মাসীমা ওঘরে"—সান্ত্বনা আর একবার সুরেশ্বরীকে পাশের ঘরে নেবার চেষ্টা করলে।

"চল যাচ্ছি। ব্রজেশ্বর তাহলে সাড়ে চারটের ট্রেণে আসছে না তো? কি ঠিক হল, সেইরকম ব্যবস্থা তো করতে হবে আবার—"

ছকুবাবু বিস্ফারিত চক্ষে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ছিলেন। এই কথায় এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় তিনি বললেন, "সাড়ে চারটার ট্রেণে আসা কি করে' সম্ভব তাঁর পক্ষে! ঘণ্টা দুই আগে তিনি তো এখান থেকেই মোটরে রওনা হয়েছেন কোলকাতার দিকে"

"কি জানি বুঝতে পারছি না ঠিক। সে যা হয় হবে, চল মাসীমা তুমি ওঘরে, কাপড়টা ছাড়বে চল"

সান্ত্বনা সুরেশ্বরী দেবীকে পাশের ঘরে নিয়ে চলে গেল।

অপস্রিয়মান দুটি নারীমূর্ত্তির দিকে ছকুবাবু বড় বড় চোখ করে' চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর কাঁকড়ার মতো পাশ দিয়ে সরে' সরে' ঘরের কোণের টেবিলের কাছে গিয়ে আর এক ডোজ 'হিংগাহ' প্রান করে' ফেললেন।

"চীজ বটে মেয়েমানুষ। উফ! বেশ একটি 'ওঝরা' পাকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই। দিমাগই নেহি হ্যায় কিসি কো"

রায়বাহাদুর দিগ্বিজয় সিগারটি একটি অ্যাশট্রের উপর সন্তর্পণে নাবিয়ে রেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। ছকুবাবুর শেষ কথাগুলি শুনতে পেলেন তিনি। সুদীর্ঘকাল দাম্পত্যজীবন ভোগ করার ফলে সে স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা ঠিক বর্ণনা করা শক্ত। অনেকটা অন্ধ বিশ্বাস গোছের। ছকুবাবুর শেষ কথাগুলি শুনতে পেলেন তিনি। পেয়ে বললেন, "ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছেন কেন। সুরোর হাতে ছেড়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে—"

উন্মুক্ত বাতায়ন পথে তাঁর এই উপদেশ সান্ত্বনারও কানে ঢুকল। শুধু কানে নয়, মরমেও। অকূল পাথারে পড়ে' সে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, হঠাৎ যেন ভেলা দেখতে পেলে একটা। ঠিক! মাসীমারই শরণাপন্ন হওয়া যাক। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তো 'উনি' এসে পড়বেন। ইতিমধ্যে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে' ফেলতেই হবে। ওই বেরাল-গুঁফো ছকুবাবুটি মোটেই সুবিধের লোক নয়। সমস্ত ঘটনা উনি যদি জানতে পারেন তাহলে ত্রিভুবনে আর কারও জানতে বাকী থাকবে না। 'ওঁর' সঙ্গে ষ্টেশনেই দেখা করে' আগে থাকতে সব ঘটনাটা খুলে বলা দরকার, তা না হলে উনিই সব ফাঁস করে' দেবেন এখানে এসেই। মাসীমাকেই সব খুলে বলতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই।

সুরেশ্বরী দেবী বাথরুমে ঢুকে গায়ের চাদরটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা খুলতে লাগলেন। একটা স্মৃতিও ভেসে উঠছিল তাঁর মানসপটে। তাঁর সখী সান্ত্বনার মা তাঁর চুল বেঁধে দিতে কি ভালোই না বাসত।

"মাসীমা, আসলে কি হয়েছে জানেন"

"কি"

"উনিই ওই টেলিগ্রাফ করেছেন"

"ব্রজেশ্বর ? কিন্তু সে তো বলছিস একটু আগে মোটরে করে'—"

"মোটরে উনি ছিলেন না"

"কে ছিল তবে"

"সুশোভনবাবু"

"অ্যাঁ! বলিস কি"

তাঁর পিঠের উপর সাদা রেশমের মতো একরাশ চুল আলুলায়িত হয়ে পড়েছিল। ঈষৎ বেঁকে চিরুণী চালাচ্ছিলেন তিনি তাতে। সান্ত্বনার কথা শুনে চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল, সোজা হ'য়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি সান্ত্বনার দিকে।

"সব খুলে বলছি শোন না। কি যে বিপদে পড়ছি। আমাকে বাঁচাও তুমি মাসীমা"

সুরেশ্বরীর হাতের চিরুণী দ্রুততর বেগে চলতে লাগল। সান্ত্বনা বলতে লাগল সব। সুরেশ্বরী দেবী কেবল মাঝে মাঝে অস্ফুটকণ্ঠে কাতরোক্তি করে' উঠছিলেন, মনে হচ্ছিল বুঝি চুলের জটে চিরুণী আটকে গিয়ে লাগছে তাঁর। অবিরাম চিরুণী চালনায় হয় তো সত্যিই লাগছিল।

সান্ত্বনা কিছু গোপন করলে না। যা যা ঘটেছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে গেল সব। সুরেশ্বরী দেবীও ঘাড় বেঁকিয়ে চিরুণী চালাতে চালাতে সব শুনলেন।

"এই হয়েছে। এখন কি করি বল মাসীমা। আমাকে উদ্ধার কর তুমি এখন কোনও রকমে—আমি মনে করলুম আগে পৌঁছে যাব—তাই"—সান্ত্বনার গলার স্বর কেঁপে গেল।

"তোর বয়স কি কোনদিন বাড়বে না পোড়ারমুখী, বুদ্ধি কি কোনদিন হবে না। এই সেদিনই এত কাণ্ড হয়ে গেল, আবার তুই এই করলি—"

ক্ষিপ্রহস্তে চিরুণীটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন সুরেশ্বরী। মাথার সমস্ত চুল বিস্রস্ত, চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত। সে এক অদ্ভুত মূর্তি হল তাঁর।

"কি হবে এখন"—ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি।

"কিচ্ছু হবে না, যদি ব্যাপারটা গোপন রাখা যায়। ওই ছকুবাবুর কাছ থেকে গোপন রাখলেই হবে"

ব্রজেশ্বর যদি শোনে কি মনে করবে সে"

"সব শুনলে কি আর মনে করবে। মেসোমশায়ের মতো লোক উনিও, মহাদেব তুল্য—"

"তা যদি হয় তাহলে ভাবনা নেই। কিন্তু আমি তোর আক্কেলের কথা ভাবছি কেবল। কি বলে' তুই সুশোভনবাবুর সঙ্গে একা এলি! তার বউ যদি শোনে কি ভাববে। ছি, ছি, এতটুকু হুঁস নেই তোদের। একঘরে শুতে গেলিই বা কি করে'। মনে পাপ ছিল না মানলাম না হয়, কিন্তু দৃষ্টিকটু তো। ছি ছি ছি। আর ওই সুশোভনই বা কি রকম ছেলে। তারও তো ভাবা উচিত ছিল। আজকালকার ছেলেমেয়ে কি যে হচ্ছ মা তোমরা। সেদিন এত কেলেঙ্কারি হল, আবার তুই এই করলি—"

"আমি তোমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে পড়ব বলেই তো ওঁর সঙ্গে ট্যাক্সিতে এলাম। আমি ইচ্ছে করে' তো আর কিছু করি নি, হয়ে গেল কি করব।"

অভিমানে সান্ত্বনার গলার স্বর কেঁপে উঠল একটু। সুরেশ্বরী একনজর তার দিকে তাকালেন। মা-হারা মেয়েটা! একেবারে ছেলেমানুষ এখনও।

"তুমি ভিজে সেমিজ কাপড় ছেড়ে ফেল আগে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার"

"আমার অত সহজে ঠাণ্ডা লাগে না। গরম বোধ হচ্ছে। তুই এখন কি করতে চাস বল"

"আমি গাড়ি করে' ষ্টেশনে যাই। আর কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হওয়া দরকার। তারপর উনি আবার হঠাৎ এত শিগগির কি করে' ফিরে এলেন তার কারণ একটা বার করা যাবে দু'জনে মিলে"

"মিছে কথা বলবি ?"

"বলব না ?"

"না। মোটামুটি সত্যি কথাটাই বলতে হবে সকলকে। কিন্তু এমনভাবে বলতে হবে যাতে—ওই যে কি একটা কথা আছে—সাপও না ভাঙে—না না ঠিক উলটো বুঝি"

"সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে ? কিন্তু কি করে' করবে সেটা"

"তা জানিনা মা। তারই বা দরকার কি। এখানে সবই তো ঘরের লোক"

"ছকুবাবু ?"

"ওঁকে বলে' দিলে উনি কাউকে কিছু বলবেন না। উনি সম্পর্কে আমার দাদা—"

সান্ত্বনা মাথা নাড়লে।

"না, ওঁকে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আচ্ছা, ওঁকে বিকেলে কোনও রকমে সরিয়ে ফেলতে পারা যায় না বাড়ি থেকে ঘণ্টা খানেকের জন্য ?"

"তুমি কোথায় কি কাণ্ড করে' এসেছ তার জন্যে আমি ওঁকে কোথায় তাড়াই বল এখন"

"তাড়াতে বলছি না তো। সরিয়ে দিতে বলছি। তুমি কাপড় সেমিজ ছেড়ে ফেল না আগে"

আলনা থেকে একটা শুকনো সেমিজ এবং শাড়ি নিয়ে জোর করে' সুরেশ্বরীর হাতে গুঁজে দিলে সে।

"এই বাড়িতেই যদি ওঁকে কোনও ঘরে অন্যমনস্ক করে' রাখতে পার তাহলেও হবে"

"চেষ্টা করব"

কাপড় এবং সেমিজ নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন সুরেশ্বরী। সেখান থেকেই কথা বলতে লাগলেন।

"ছি ছি এতটুকু বুদ্ধি কি নেই। এই সেদিন এত কেলেঙ্কারি, আবার এই! আমারই শুনে কেমন করছে! আর কারও ব্যাপার হলে বিশ্বাসই করতাম না যে এর মধ্যে কোনও কুমতলব নেই। একথা বাইরের লোক যদি শোনে তোকে কি ছেড়ে কথা কইবে এবার। চিনি তো সবাইকে। সেবার কিছুই ছিল না তাতেই অত—"

"আমার নিজের জন্যে হলে আমি কোনও তোয়াক্কাই করতাম না", এ ঘর থেকে জবাব দিলে সান্ত্বনা, "আমার খালি ভয় হচ্ছে ওঁর সুনামে যদি কোনও আঁচড় লাগে। আমার জন্যে যদি ওঁর বদনাম হয় তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব"

"হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে। চুপ কর"

"তখন থেকে কেবল বকে' যাচ্ছ আমায়"

সুরেশ্বরী কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ উপছে পড়তে লাগল। সেমিজ কাপড় ছেড়ে পাশের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন একেবারে আলাদা লোক।

"আচ্ছা, যা হয়েছে হয়েছে। এখন কি করা যায়—"

"তুমি যা বলবে তাই করব"

"কিন্তু কি বলব তাই যে ভেবে পাচ্ছি না। ব্রজেশ্বর আর সুশোভনের স্ত্রী যদি জিনিসটাকে ভালভাবে নেয় তাহলে ব্যাপারটা সোজা হয়ে যায়। তারপর ওই লোকটাকে সামলাতে হবে—বজরং না কি নাম—সে বোধহয় মোটর সাইকেল ছুটিয়ে ছিপছররামারিতে গিয়ে বক্তৃতা করছে এতক্ষণ"

তাঁর এ অনুমান মোটেই মিথ্যা নয়।

"যাক গে। এখন ওঁকে ব্যাপারটা বলা দরকার। আমিই বলি। উনি কি বলেন শোনা যাক। তারপর দু'জনে মিলে উপায় বার করতে হবে একটা। করতেই হবে"

হঠাৎ যেন একটা প্রেরণা পেলেন সুরেশ্বরী দেবী। বিপদের সময় এই ধরণের প্রেরণা পান তিনি মাঝে মাঝে। সেবার যেমন হল। এক হাঁড়ি পোলাওয়ের তলা ধরে' গেল। সবাই যখন মহা চিন্তিত কি হবে—মান্য অতিথিরা খেতে বসেছেন—তখন সুরেশ্বরীই উপায় বার করলেন। বললেন—থাক, নেড়ো না, একটা হাঁড়িতে ঘি গরম মশলা চড়িয়ে দাও—আর পোলাওটা উপর উপর থেকে ঢেলে দাও তাতে। তাই করা হল। টের পর্য্যন্ত পেলে না কেউ।

সুরেশ্বরী 'ওঁকে' বলতে গেলেন। ব্যাপারটা খুব সহজে হল না কিন্তু। দিগ্বিজয় ব্যাপারটা বুঝতে প্রথমত অনেক দেরি করলেন। বারম্বার সব গুলিয়ে যেতে লাগল তাঁর। তারপর অনেক কষ্টে যদি বুঝলেন, বিশ্বাস করতে চান না। সুরেশ্বরী যখন তাঁকে অবশেষে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্য, তখন সমস্ত দোষটা সুশোভনের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে' অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করলেন তিনি। কিন্তু সুরেশ্বরী যেই বললেন যে তাঁর মতে সান্ত্বনার দোষও কিছু কম নয় অমনি তিনি সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, সান্ত্বনারই তো সব দোষ!"—তখন সুরেশ্বরীকে বাধ্য হয়ে আবার সুশোভনের দোষ-কীর্তন করে' সান্ত্বনার অপরাধ লঘু করবার প্রয়াস পেতে হল। আধ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল, যাকে খবরের কাগজের ভাষায় 'সঙ্কটজনক পরিস্থিতি' বলা যেতে পারে। সুরেশ্বরী প্রথম যা বলেছিলেন দিগ্বিজয় বদ্ধ-পরিকর হয়ে তাই সমর্থন করতে লাগলেন এবং সুরেশ্বরী নানাভাবে প্রমাণ করতে লাগলেন যে দিগ্বিজয় প্রথমে যা

বলেছিলেন তাই ঠিক, ভুল সুরেশ্বরীরই হয়েছিল। কেউ এক-ইঞ্চি হঠতে রাজি নন।

এ সমস্যা অমীমাংসিত রেখে সুরেশ্বরী তখন দ্বিতীয় প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করলেন। ছকুবাবুর কৌতূহল কি করে' ভিন্নমুখী করা যায়। দিগ্বিজয় বললেন ছকুবাবুর কৌতূহল ভিন্নমুখী করতে হলে ওঁকে ভিন্ন স্থানে চালান করে' দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ বাড়িতে রেখে ওঁকে সামলানো অসম্ভব। এর থেকে নূতন একটা প্রেরণার উদ্ভব হল। প্রেরণাটা আসলে দিগ্বিজয়ের মনেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু দিগ্বিজয় কৌশলে কৃতিত্বটা সুরেশ্বরীর উপরই আরোপ করলেন। সুরেশ্বরীও মেনে নিলেন সেটা। কারণ এর সঙ্গে সামান্য একটু মিথ্যা জড়িত ছিল। স্বামীর নাম তার সঙ্গে জড়াতে ইচ্ছে হল না তাঁর এবং বুদ্ধি করে' সে কথাটা চেপে গেলেন তিনি। প্রকাশ করলে মুশকিল হ'ত। দিগ্বিজয় যদি ঘুণাক্ষরে টের পেতেন যে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে সুরেশ্বরী নিজের ঘাড়ে এই মিথ্যা-দুষ্ট প্রেরণার দায়িত্ব নিচ্ছেন তাহলে তৎক্ষণাৎ বেঁকে দাঁড়াতেন এবং উক্ত প্রেরণার কৃতিত্ব নিজেই দাবী করে' বসতেন। আর একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হত।

রীতিমত একটা নাটকে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়ে দিগ্বিজয় মনে মনে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন (যৌবনে তিনি সত্যিই ভাল অভিনেতা ছিলেন একজন) এবং এমন একটা অপ্রস্তুত-ভাব মুখে ফুটিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন যার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করার ক্ষমতা ছকুবাবুর অন্তত ছিল না।

ছকুবাবু জানলার পাশে বসে' আপনমনে গজগজ করছিলেন। গোবর্দ্ধন স্নানান্তে কাপড়-চোপড় পরে' কিঞ্চিৎ জলযোগের অপেক্ষায় বসে ছিলেন।

"ও মশায়, ভারী একটা মুশকিলে পড়ে গেছি"

"মুশকিল? কিস্‌কিসিম্‌ কি?"—ভ্রূযুগল উত্তোলন করে' প্রশ্ন করলেন ছকুবাবু।

"কি হল"—ক্ষুধার্ত্ত গোবর্দ্ধনবাবু বললেন। তাঁর ভয় হল জলযোগ ব্যাপারেই গোল-যোগ হল বুঝি বা।

"আমারই দোষ। ছি ছি, কি যে করা যায় এখন"

"আরে বাতাইয়ে না জনাব ক্যা হুয়া"

"আপনার হুইস্কি আনা হয় নি"

"অ্যাঁ—"

বাংলায় চীৎকার করে' উঠলেন ছকুবাবু। তারপর দম নিয়ে বললেন, "বলেন কি!"

"একদম ভুলে গেছি। আমার নিজের তো অভ্যাস নেই। অবশ্য বীরু সার কাছে লোক পাঠালে এখনও পেয়ে যাব"

"তবে আর দেরি করছেন কেন। ভেজিয়ে, জলদ ভেজ দিজিয়ে"

"কাকে পাঠাই। মুশকিল সেইখানেই। আমি নিজেই যেতাম কিন্তু আমার গোটা দুই জরুরি চিঠি লিখতে হবে এক্ষুণি। সাড়ে পাঁচটার ডাক বেরিয়ে যায়। চিঠি লিখে যেতে গেলে বীরু সা দোকান বন্ধ করে' চলে যাবে"

"বীরু সার দোকান কতদুর"

"তা মাইল ছয়েক। বগেন্দ্রপুর। গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে, মানে বগিটা। মোটরে তেল আনতে গেছে। যোগেন সাধারণত করে এসব—কিন্তু সে বেরিয়ে গেছে পীরনগরের হাটে। কোচোয়ানটা বিয়ে করতে গেছে আজও ফিরল না। পরেশ ছাড়া বাড়িতে দ্বিতীয় চাকরও নেই। তা ছাড়া পরেশ বগি হাঁকাতে পারে না"

"আরে আমি তো পারি"—বলে উঠলেন ছকুবাবু। "না, না, আপনার শরীর খারাপ—আপনার যাওয়াটা কি ঠিক হবে"

"শরীর খারাপ! পোথমনবাবুর সঙ্গে যখন থাকতাম তখন ১০৪ জ্বর নিয়ে বুনো রাস্তা দিয়ে দশ মাইল বগি হাঁকিয়ে গেছি"

"তবু আপনার একলা যাওয়াটা ঠিক হবে না। তবে গোবর্দ্ধনবাবু যদি সঙ্গে যান। বগেন্দ্রপুরের রাস্তা চেনেনও উনি—"

"বেশ তো জলযোগ করে নি। যাব সঙ্গে—"

"তাহলে সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। ছকুবাবু নিজে গেলে বীরু বাজে জিনিস দিতে পারবে না"

এই কথায় ছকুবাবুর চোখে মুখে অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত এমন একটা হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল, যার অর্থ বীরু তো ছেলেমানুষ বীরুর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ যদি

সমবেতভাবে চেষ্টা করেন তাহলেও ছকুবাবুকে বাজে জিনিস গছাতে পারবেন না।

মুখে তিনি বললেন—"আজকাল বাজারেই ভাল জিনিস নেই। সমস্ত আফ্রিকান মাল—"

"আপনার যেতে কষ্ট হবে না তো, দেখুন। আমারই উচিত ছিল আনিয়ে রাখা—ছি ছি—"

"আরে না, না,—কুছ ভি নেহি—ইয়ে তো মামুলি বাত হ্যায়—"

"আপনার বাতটা বেড়েছে শুনলাম"

"বাত? না। লিভারটা গড়বড়িয়ে ছিল, কিন্তু এখন আর কিছু নেই। আর দেরি করবেন না। গোবর্দ্ধনবাবু তৈরি হন—"

"জলখাবারটা আসুক। জলযোগটা সেরেই বেরুই"

"আরে জলযোগ পরে করবেন মশাই। জলের অভাব কোনও দিন হবে না। নিন তৈরি হয়ে নিন। চটপট—"

জলখাবার এসে পড়ল।

দিগ্বিজয় বগির ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(শিকাগো)

২রা জুন। আজ বিকেল ৬টার ট্রেণে শিকাগো রওনা হলাম। Pullman এর একটি কামরা পূর্ব্বে রিজার্ভ করা ছিল। ট্রেণটির ভিতরে এয়ার কণ্ডিশন্ করা; আরামের বদলে আমাদের তো শীতই করতে লাগল, শেষে ওভারকোট চাপিয়ে বসতে হ'ল। ড্রইংরুমে সোফায় বসে দিব্যি আরামে চলেছি। খুকু লেমনেড্ খেতে চাইলে খাবার ঘর থেকে এক গেলাস ঠাণ্ডা coca cola দিয়ে গেল, আর তার সঙ্গে এল

শিকাগোর রাজপথে

বড় একবাটী বরফ। coca cola পানীয়টির ব্যবহার এ দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত। এ দেশের আরও একটি প্রথা লক্ষ্য করেছি যে টেবিলে খাবার দেবার আগে সর্বদাই এক গেলাস বরফ জল এনে সামনে দেয়, তার পর হুকুমমত সব খাবার আনে। বরফের বাটী ফিরিয়ে দিয়ে দামের সঙ্গে বকশিষও দিতে হ'লো। আমেরিকার এই বকশিষের বহর সত্যিই আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এক এক সময় এমনও হয়েছে যে দিনের শেষে এই বকশিষের বহর ১০ ডলারও ছাড়িয়ে গেছে।

শিকাগো শহরের দৃশ্য (পাশাপাশি ঠাসাঠাসি স্কাইস্ক্র্যাপার) (

সারা রাত ট্রেণে কাটিয়ে পরদিন সকাল ৯টায় আমরা শিকাগোতে নামলাম। Hotel palmer House এ ২২ তলায় ১খানি ঘরে ওঠা

গেল। হোটেলটি একটি Skyscraper, ভিতরে ২০০০ ঘর রয়েছে; ৩০টা লিফট যাত্রী নিয়ে অনবরত ওঠা-নামা করছে। হোটেলের চারিদিকে চারটে বড় বড় বিখ্যাত রাস্তা; প্রত্যেক রাস্তার উপরেই একটা করে সদর দরজা রয়েছে। আমরা ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে Coffee shopএ লাঞ্চ খেতে গেলাম। এই হোটেলের ভেতর নেই হেন জিনিস নেই; হোটেলটি একটি সহর বিশেষ। এখানে ডাক টিকিট থেকে আরম্ভ করে এ্যারোপ্লেনের টিকিটও কিনতে পারা যায়; ছোটখাটো নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় curioও মেলে। এখানে বিভিন্ন রকমের রেষ্টুরেণ্ট রয়েছে, তার মধ্যে Coffee shopএর খাবার বেশ ভাল, অথচ দামে সস্তা। General Electric
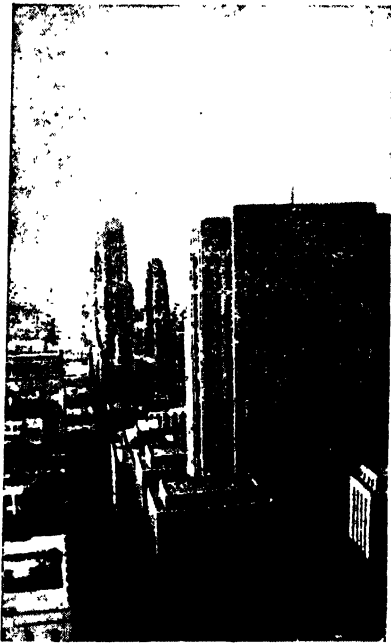
শিকাগো ফিল্ড বিল্ডিং

কোম্পানীর head quarter এই শিকাগোতে। মিলিয়াম ভোল্ট একুসরে মেসিন এখান থেকেই কেনার কথা। সুতরাং মেসিন সম্বন্ধে কথা বলতে উনি G. E. C.তে গেলেন, আমরাও সঙ্গে ছিলাম। মৈমনসিংএর মহারাজকুমার শ্রীমান স্নেহাংশু আচার্য্য মহাশয় এই যন্ত্রটির মূল্য ৩ লক্ষ টাকা দান করেছেন। ক্যানসার রোগের চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য যন্ত্রটি বিশেষ প্রয়োজন। আর্ত্তের সেবায় ও মানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁর এই মহৎ দান চিরদিনই তাঁকে অমর করে রাখবে। এখানকার কাজ সারা হ'লে State Deptএ যাওয়া গেল। এই State Deptএর সাহায্য না পেলে আমাদের বেড়ানর অর্দ্ধেক আনন্দ যে মাটি হয়ে যেত সে বিষয় নিঃসন্দেহ। অত অল্প সময়ের মধ্যে দূর দেশে হোটেলের বন্দোবস্ত, ট্রেণের বন্দোবস্ত, স্থানীয় ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, হাসপাতাল দেখা যায় আমাকে ও খুকুকে নিয়ে সহর ঘুরে দেখানো অবধি সব কিছু এঁরাই করেছেন। এখানকার কাজ চুকিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। পথে পথে খানিকটা ঘুরে রোটারির লাঞ্চ মিটিংএ গেলাম। বিদেশী রোটারিয়ানরা খুবই আনন্দের সহিত আলাপ আপ্যায়িত করলেন। সেদিনের বক্তব্য বিষয় ছিল—একজন আমেরিকান পাদ্রীর সাড়ে তিন বৎসর সিঙ্গাপুরে জাপানীর কবলে কারাবাসের করুণ কাহিনী। সিঙ্গাপুর পতনের পর জাপানীরা শত্রুপক্ষ সকলকে বন্দী করল; বক্তা নিজেও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। সমস্ত দেশের লোক ইউরোপ ও এসিয়াবাসী একসঙ্গে ক্যাম্পে দিন কাটাতে লাগলো। শত্রু হস্তে নির্য্যাতিত ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে

শিকাগো মিশিগান হ্রদের তীরে

কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল তিনি বল্লেন—"আমাদের জীবনে তখন ভীষণ অনিশ্চয়তার ছাপ ঘন মেঘের মত ছেয়ে ফেলেছে, বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই, আবার কোনদিন হ'বে কিনা সে বিষয় কোন নিশ্চয়তাও নেই, এ হেন অবস্থায় মনের বাঁধ ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে আসছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছে এই বুঝি আমার শেষ প্রদীপ নিভে যায়। কিন্তু এ হেন চরম দুর্দ্দিনেও পরস্পর পরস্পরের মনের পাশে দাঁড়িয়েছি, জাতি-ধর্ম্ম সেখানে ছিল না, একমাত্র ছিল মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনা ও সহানুভূতি। 'বাঁচতে হবে' এই সঙ্কল্প করে পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছি। সকলের ভেতর ছিল শুধু মনের সংযোগ। বাইরের দিক থেকে

কোথাও কিছু সহায় সম্বল এমন কি সহানুভূতিটুকু পর্য্যন্তও নেই ; এ সত্ত্বেও এই সর্ব্বহারার দলে যার যতটুকু সামর্থ্য ছিল তাই দিয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ নিয়েই সেখানে এক অপূর্ব্ব স্বর্গ সৃষ্টি করলো। সেদিন ছিল বড় দিন—Christmas day। ছোট ছোট প্রার্থনা এবং সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে এমন আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল যে জীবনে আমি কখনও এমন নিবিড় ভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ অনুভব করিনি। এই অনুভূতিই আমাদের শেষ সম্বল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাম্পের অদূরেই মহাসাগরের তীর। সেদিন পুর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে ; বসে বসে অন্যমনস্ক হ'য়ে তাকিয়ে তাই দেখছি। নৈরাশ্যে ভারাক্রান্ত মন অধীর হ'য়ে উঠছে। মনে হ'ল এই কঠিন বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে ছুটে চলে যাই। এমন সময় দূরে বহুদূরে সাগরের এক কোনে একটি জাহাজের মাস্তুল চোখে পড়ল—ভাবলাম ঐ বুঝি আমারই দেশের বার্ত্তা বহন করে আনছে। আশায় মন নেচে উঠলো, সুদিনের ছবি চোখের সামনে ভাসছে। বিশ্বাস হ'ল না, সত্যিই এ আমেরিকার জাহাজ কিনা। তারপর এলো মুক্তির দিন। কোনদিনই ভাবিনি দেশে ফিরে এসে এমনি করে এইখানে দাঁড়িয়ে জীবনের এই কটা দিনের কাহিনী বোল্‌বো।" হলশুদ্ধ লোক মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনছিলো, হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে, সভা শেষ হ'লো। আমরা বেরিয়ে এলাম। বর্ণনা ভঙ্গির সৌন্দর্য্যে আমরা অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলাম। কাণের কাছে কথাগুলি বারবার ধ্বনিত হ'তে লাগলো।

৪ঠা জুন। হোটেলের কাছেই Grand Park। বিকেলে আমরা হেঁটে সেখানে বেড়াতে গেলাম। Parkটি খুব বড়, বহুলোক বেড়াচ্ছে দেখলাম। আমরা পরিষ্কার ঘাসের ওপর গিয়ে বসলে কয়েকজন উৎসুক হ'য়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলেন। বুঝলাম তাঁরা যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন, তাই এত আগ্রহ। ভারতবর্ষের কোথায় কোন দেশে কোন কোন লোকের সঙ্গে তাঁদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল এবং সেই সব লোকের সঙ্গে কতটা বন্ধুত্ব জমেছিল সেই সব গল্প সুরু করলেন। তারপর কথা প্রসঙ্গে তাঁদের খবরাখবর আমাদের জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা কেউবা কাশ্মীরের লোক, কেউবা দক্ষিণ ভারতের, আর কেউবা আসামের। ধৈর্য্য ধরে শুনে বাবার পর নিরুপায় হ'য়ে বলতে হ'লো যে তাঁদের আমরা চিনি না এবং চেনা সম্ভবও নয়। আমাদের মিশিগান (Michigan) লেক দেখতে ইচ্ছে হ'লো। ট্যাকসি ডাকতে রাস্তার মোড়ে গিয়ে সবাই দাঁড়ালাম। এখানে ট্যাকসি ডাকার কায়দা বড় মজার। হাতের বুড়ো আঙ্গুল উঁচু করে তুলে কাণের পাশে নাড়তে হয়, ট্যাক্‌সি চালক তা দেখলেই সামনে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ খুকু বলে উঠলো "বাবা কলা দেখাও কলা দেখাও, নইলে ট্যাক্সি চলে যাবে।" উনি অনভ্যাসবশতঃ 'ট্যাক্‌সি' ট্যাক্‌সি বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। যখন দেখলেন তা শুনেও ট্যাক্‌সি চলে যাচ্ছে তখন হাতে দু'চার বার তালি ঠুকলেন, কিন্তু তাতেও কাজ হ'লো না, ট্যাকসি চলে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল তুলে রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। যা হোক শেষে ট্যাক্‌সি মিল্‌লো। আমি আর খুকু হাঁসতে হাঁসতে মজা দেখছিলাম। Lake Michigan-এর ধারে এসে পাড়ে বালির ওপরে আমরা দাঁড়ালাম ; কণকণে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, তখন তাপ প্রায় ৪০° ডিগ্রীতে নেমেছে। এত হাওয়া যে ওভারকোট পরেও শীতে কেঁপে মরছি। স্থানটি খুব নির্জ্জন, হ্রদের শোভা অতি অপূর্ব্ব। সাগরের মত অতল জলরাশি থৈ থৈ করছে। ওপার দেখা যায় না। পাড়ের কাছে বালির ওপর ছোট ছোট ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে ; নোনা জলের হাওয়ায় আঁসটে গন্ধভরা। শিকাগোতে শীতকালে নাকি তাপ শূন্য থেকে ২০° ডিগ্রীতে নেমে যায়। বেশ খানিকটা হ্রদের জল জমে বরফ হ'য়ে যায়। সেই প্রচণ্ড শীতে জমা বরফের ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া এসে যখন সিকাগোর ওপর ছড়িয়ে পড়ে তখন সহর শুদ্ধ জমে যাবার জোগাড় হয়। সেই জন্যে এখানকার বাড়ীগুলিতে জানালা দরজা যথা সম্ভব কম ; ডবল করে দেওয়া, তার ওপর আবার heatingএর বেশ ভালো রকম বন্দোবস্ত করা। হ্রদের ধারে ধারে একটি সোজা রাস্তা সিকাগোর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বরাবর চলে গেছে, রাস্তাটির নাম Michigan Boulevard। আমরা জলের ধারে

শিকগো শিল্প বিজ্ঞানের যাদুঘর।

ঠাণ্ডা হাওয়ার বেশীক্ষণ থাকতে না পেরে হোটেলে ফিরে গেলাম।

৫ই জুন। শিকাগোতে ৫ দিন থেকে আমাদের San Franciscoতে যাবার কথা। সহর ঘুরে বেড়িয়ে দিনটা কাটলো বেশ। রাতে সিনেমায় যাওয়া গেল। রাত ১১টায় ফিরছি, সহরের রাস্তা তখন সরগরম, গাড়ীর ভীড়ে আর লোকের চাপে পথ বন্ধ। শুনলাম এখানকার কয়েকটা সিনেমা ও থিয়েটার সারারাতই নাকি চলে। ক্লাব ঘরে নাচ গান ও আমোদের অবধি নেই। হোটেলের ২২ তলার ওপরে শুয়েও সহরের গোলমালে ও বিষম আওয়াজে আমার ঘুম আসছে না। রাত তখন প্রায় ছুটো। আমি জেগে আছি, জানলা দিয়ে দেখি নীচে রাস্তার দু-ধারের শো কেসে জোর আলো জ্বলছে, আর পথিকের দল ভীড় করে করে দাঁড়িয়ে দেখছে; পুরোদমেই গাড়ী চলাচল করছে। এখানে মাঝ রাস্তার ওপর দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন চলে, ট্রেনের লাইন প্রায় দোতালার সমান উঁচু, লোহার থামের ওপর পাতা। তার ওপর দিয়ে যখন ট্রেন যায় তখন এত ভীষণ শব্দ হয় যে প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। রাতেও গাড়ী চলার বিরাম নেই। পৃথিবী ব্যাপী সকল রকম ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হ'লো এই শিকাগো। ব্যবসায়ীদের বড় বড় কারখানা, দোকান ও প্রধান কার্য্যালয় এইখানে দেখতে পাওয়া যায়। Skyscraper বাড়ীগুলিতে অফিসের নানা রকম কাজ হ'চ্ছে।

৬ই জুন। Illinois Universityর মেডিকেল কলেজে ক্যানসারের বিষয় বক্তৃতা দিতে উনি সকালেই বেরিয়ে গেলেন। শিকাগোতে আরো দু'টি প্রসিদ্ধ University রয়েছে—North Western University এবং Chicago University।

আমরা বিকেলে হ্রদের ধারে বেড়াতে গেলাম। হ্রদের কাছে Tribune বাড়ীটির উঁচু চূড়ার ওপর বিমানের পথনির্দ্দেশক একটি বড় সার্চ্চ লাইট পথ আলো করে ঘুরছে দেখলাম। ফেরার পথে মিসিগান এভিনিউ দিয়ে সোজা চলেছি, পথে দেখলাম Wrigly Buildingএর সাদা বাড়ী ফ্লাড লাইটে আলো হ'য়ে আছে। নানারকম আলোর বিজ্ঞাপনের মাঝে দিনের আবহাওয়া লেখা একটি নতুন কায়দার বিজ্ঞাপন দেখলাম। আমাদের এই Palmer House হোটেলের একদিকে রয়েছে একটি বিখ্যাত বড় রাস্তা নাম State Street। একটু এগিয়ে

মিশিগান হ্রদের তীর থেকে শিকাগো শহরের দৃশ্য

যেখানে State Street ও Madison Street মিলিত হয়েছে সেইখান থেকেই সহরকে দিক হিসাবে ভাগ করা হয়েছে, অর্থাৎ এই মোড় থেকেই রাস্তাগুলোকে পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ হিসাবে বলা হয়।

(ক্রমশঃ)

বন্ধুরে মোর স্বপন দেখিনু আজ

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

বন্ধুরে মোর স্বপন দেখিনু আজ,
ঘুমঘোরে যবে ছিনু অচেতন রাতের স্বপন মাঝ
বন্ধু আসিয়া বসেছিল পাশে,
শারদ নিশায় শেফালী-সুবাসে,
সংগেতে তার আলো-ঝলমল রূপ-রঙীণ সাজ,
বন্ধুরে আজ স্বপন দেখিনু রাতের স্বপন মাঝ।
বন্ধু আমার কহিল না কথা হাতে দিল বীণাখানি,
বাজিল তাহাতে শত বিরহের শতেক গোপন বাণী।
মুখপানে তার শুধু চেয়ে থাকি,
সিক্ত সজল অপলক আঁখি,
মৌন আমার বন্ধুর মুখে রাজে শুধু মৃদু হাসি,
সে হাসির মাঝে শুনিলাম যেন 'তোমারেই ভালবাসি'।
ইংগিতে তার মুগ্ধ আবেশে চলিনু তাহার সাথে,
শেফালী বিছানো বনপথ বাহি' জ্যোৎস্না পুলক রাতে।
বন্ধু থামিল সাগর-বেলায়,
ভাসিনু দু'জনে জীবন-ভেলায়,
বন্ধু পরাল জীবন-মাল্য আপনার দুটী হাতে,
বন্ধুরে আমি দেখিনু আজিকে ঘুমের স্বপন রাতে।

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্ম হইয়াছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। তাঁহার পিতা বিনোদবিহারী বসু মহাশয় পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া ফরাসী চন্দননগরে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। বাল্যকালেই রাসবিহারী মাতৃহারা হইয়াছিলেন।

বিনোদবিহারী ছিলেন ভারত সরকারের ছাপাখানার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা ও সিমলায় বাস করিতে হইত। রাসবিহারীও মধ্যে মধ্যে তাঁহার পিতার সহিত সিমলায় গিয়া থাকিতেন। ইহার ফলে ভারতের নানা প্রদেশের অধিবাসীর সহিত মেলামেশার সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি ভারতীয় ভাষার কথা-বার্ত্তা বলার দক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজে পাঠের সময় রাসবিহারী ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। পরবর্ত্তীকালে কলিকাতার মর্টন স্কুলে পড়িয়া ইংরাজি ভাষাও ভাল করিয়া শিখিয়া লন; কিন্তু এই ভাষা শিক্ষা করা ব্যতীত বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের প্রতি তিনি বিশেষ আগ্রহ বোধ করিতেন না। ইহা অপেক্ষা নানাবিধ ক্রীড়ায় বরং তিনি অধিকতর আনন্দ বোধ করিতেন। মর্টন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়াই তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছিল। সেই সময়েই কিন্তু ইংরাজি ভাষায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধাদি নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইত।

রাসবিহারীর ক্রীড়াদক্ষতায় অনেকেই তাঁহার অনুরাগী ছিলেন। স্কুলে ছিলেন রাসবিহারী ছাত্রগণের নেতা। সকলের উপর নেতৃত্ব করিবার তাঁহার বিধিদত্ত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার সুন্দর বাচনভঙ্গীতে মুগ্ধ না হইয়া কেহ থাকিতে পারিত না। নির্ভীক রাসবিহারী সর্ব্বসময়েই সকল অন্যায়ের বিরোধী ছিলেন। কাহারও দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তিনি বিচলিত হইতেন।

১৯০৮ সালের ২রা মে যখন মুরারীপুকুর বাগানে খানাতল্লাসী হয়, তখন রাসবিহারী বসুরও দুইখানি পত্র পুলিশ তথা হইতে প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে রাসবিহারীর বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিবার আশু প্রয়োজন অনুভূত হয়। শশিভূষণ রায়চৌধুরী তৎকালে দেরাদুনে শিক্ষকতা করিতেন। নিজের চাকুরীটি তিনি রাসবিহারীকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে দেরাদুনে পাঠাইয়া দিলেন। রাসবিহারী সেখানে ১৯১০ সালে দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে একটি কেরাণীর পদও লাভ করেন এবং পরে ঐখানেই হেড-ক্লার্করূপে তাঁহার পদোন্নতি হয়—তখন তাঁহার বেতন হয় মাসিক একশত টাকা।

শিক্ষকতা ও চাকুরীর দ্বারা রাসবিহারী যাহা কিছু উপায় করিতেন, নিজের প্রয়োজন মিটাইতে তাহা হইতে ব্যয় করিতেন সামান্যই। উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত দরিদ্রদের জন্য। সেখানকার অধিবাসীরা এই কারণে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

রাসবিহারী ছিলেন একান্তভাবে একজন স্বাধীনতার উপাসক এবং তাঁহার ও তাঁহার জাতির স্বাধীনতাকে যাহারা খর্ব্ব করিয়াছে, তাহাদের সহিত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারই ছিল তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য। শঠের সহিত ছলনা করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না। স্বাধীনতাহরণকারী অত্যাচারীদিগের জন্য কোনও ক্ষমা তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। তাই তিনি প্রচার করিতেন,—"The life of a man is for working Independence and the general massacre of all foreigners in India is our primary object."

আপাতদৃষ্টিতে ভারতের অবস্থা শান্তিপূর্ণ মনে হইলেও ভারতের অবস্থা যে মোটেই শান্তিপূর্ণ নহে, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিয়া জগৎসমক্ষে তাহা ঘোষণা করাই যেন রাসবিহারীর ব্রত হইয়া দাঁড়াইল। সমগ্র উত্তর ভারতের বিচ্ছিন্ন পরস্পর পৃথক্ বিপ্লবী-দলগুলির শক্তিকে এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও চেষ্টায় কেন্দ্রীভূত করিলেন। আমিরচাঁদের সহিত রাসবিহারীর পরিচয় হইয়াছিল। তিনিই রাসবিহারীকে অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ, দীননাথ, রঘুবর শর্ম্মা ইত্যাদির সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। হরদয়ালের সহিতও পরে তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়া রাসবিহারী প্রথম আঘাত হানিবার চেষ্টা করিলেন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর। বসন্ত বিশ্বাস নামক একটি বালককে বালিকার বেশে সজ্জিত করিয়া পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক-ভবনের উপর হইতে তাহার দ্বারাই রাসবিহারী বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। ঘটনার পরই বসন্তকে সঙ্গে লইয়া তিনি দেরাদুনে ফিরিয়া যান—যাহাতে কাহারও সন্দেহ না হয় অথবা তাঁহারা ধরা না পড়েন। নিজেই উদ্যোগ করিয়া সেখানে এক সভা তিনি আহ্বান করাইলেন এবং তাহাতে বড়লাটের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বোমা নিক্ষেপের নিন্দা করিয়া এমন তীব্র ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, যে তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, বক্তৃতার সময় তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নেত্র ইহা প্রমাণ করিল যে, তিনি সকল সন্দেহের অতীত।

শ্রীহট্টের মৌলভী বাজারে মহকুমা হাকিম থাকার সময় ক্যাপ্টেন গর্ডন "জগৎসী-আশ্রম"-এর অধিবাসীদের উপর গুলি চালাইয়া ডাঃ মহেন্দ্রনাথ দে-কে হত্যা করায় বিপ্লবীরা ক্রুদ্ধ হইয়া একবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে—কিন্তু সে চেষ্টা তখন ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৯১৩ সালে গর্ডন সাহেব পাঞ্জাবে বদলী হইয়া যান। তখন তাঁহাকে খতম করিবার জন্য রাসবিহারী চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ সালেরই ১৭ই

যে তারিখে গর্ডন সাহেবের লাহোরের "লরেন্স পার্ক"-এ যাইবার কথা ছিল। রাসবিহারী তাহা জানিতে পারিয়া জনৈক ব্যক্তিকে দিয়া উক্ত পার্ক-এ যাইবার পথে সন্ধ্যার সময় একটি বোমা স্থাপিত করাইয়াছিলেন। বোমাটি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গর্ডন সাহেব স্থানত্যাগ করিবার পর বিস্ফোরিত হয় এবং তাহার ফলে নিহত হয় অপর এক ব্যক্তি। লাহোরে এই বিস্ফোরণের পর পুলিশ যখন অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিল, রাসবিহারী তখন পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে কাশী চলিয়া গেলেন। একটি গুলিভরা মসার পিস্তল প্রায় সকল সময়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। রাসবিহারী কাশীতে গমন করিবার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কথা আগেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে। গদর দলের শিখদিগের আগমনের বিষয় পাঞ্জাবের অধিবাসীদের জানাইবার জন্য এবং বিপ্লবের বাণী প্রচার করিবার জন্য রাসবিহারী পিংলেকে পাঞ্জাবে পাঠাইয়াছিলেন।

এখানে গদর দলের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। "গদর" অর্থে বিদ্রোহ। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হরদয়াল নামক একজন ছাত্র সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া ১৯০৫ সালে অক্সফোর্ডে পড়িতে গিয়াছিলেন। লালা লাজপৎ রায় তাঁহাকে বিপ্লববাদী করিয়া তুলেন এবং সরকারী বৃত্তি ত্যাগ করিয়া দুই বৎসর পরেই তিনি বিপ্লবান্দোলনে যোগদান করেন। ১৯০৮ সালে ভারতে ফিরিয়া পুনরায় তিনি ঐ সালেই ইউরোপে যান এবং ১৯১০ সালে আবার ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে লাহোরে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া বৃটিশ-শাসন অবসানের বিষয়ে তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯১১ সালে হরদয়াল কালিফোর্ণিয়ায় চলিয়া গিয়া সেখানে বৃটিশ-শাসনের বিরোধী নানারূপ প্রচার কার্য্যে লিপ্ত হইলেন।

স্বদেশে উপযুক্ত জীবিকার অভাবে বহু শিখ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিকান্বেষণে বহির্গত হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা, সাংহাই, হংকং, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি স্থানে অধিক সংখ্যায় তাঁহারা বসবাস করিতেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিণ শ্রমিকদিগের সহিত ইঁহাদের স্বার্থ সংঘাত আরম্ভ হওয়ায় ইঁহাদিগের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। বৃটিশ রাষ্ট্রদুত ও বাণিজ্য-দুতের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া কোনও ফল লাভ হইল না।

কানাডায় প্রবাসী শিখদিগের সংখ্যাধিক্যে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট আতঙ্কিত হইয়া নানারূপ ভারতীয়-বিরোধী আইন বিধিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ১৯১০ সালে রচিত একটি আইনে ইহা বিধিবদ্ধ হইল যে, দুইশত ডলার সঙ্গে না লইয়া কোনও এশিয়াবাসী কানাডায় প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং কানাডায় গমনকালে কোথাও যাত্রাভঙ্গ না করিয়া স্বদেশ হইতে তাহাকে সরাসরি কানাডায় যাইতে হইবে। যেহেতু তখন কোনও জাহাজই ভারত হইতে সরাসরি কানাডায় যাইত না, সেহেতু কৌশলে ভারতীয়দের কানাডায়-প্রবেশ অসম্ভব হইল।

আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাপ্রবাসী ভারতীয়দের মন যখন এইভাবে নানা কারণে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখন হরদয়াল সেখানে গিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। জমি প্রস্তুতই ছিল, কাজেই অবিলম্বে আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। হরদয়ালের পরিচালনায় হিন্দী, উর্দ্দু, মারাঠি ও গুরুমুখী ভাষায় "গদর" নামে একখানি পত্রিকা কালিফোর্ণিয়ায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরে এই "গদর" পত্রিকাখানিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিল "গদর" দল—যাহাদের লক্ষ্য হইল ভারতে বৃটিশ-শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। সোহন সিং ভাখনা, রামচন্দ্র পেশোয়ারী ও বরকতুল্লা প্রভৃতি পরে এই দলে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকা ও কানাডায় গদর দলের বহু শাখাপ্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা ছাড়া জাপান, মালয়, চীন,

রাসবিহারী বসু
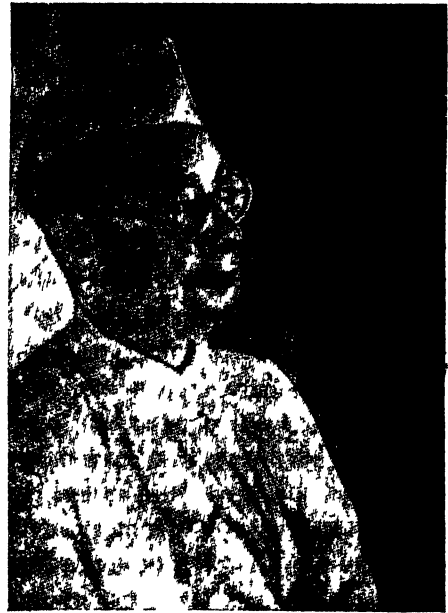
ফিলিপাইন, ফিজি, আর্জ্জেণ্টাইন ইত্যাদি স্থানসমূহেও গদর দল ছড়াইয়া পড়িয়া একটি জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। বিপদ বুঝিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকেই হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করিলেন। জামিনে খালাস পাইয়াই হরদয়াল ইউরোপে পলায়ন করিলেন।

ভারত সরকারের মারফতে কানাডায় এই অবমাননামূলক ইমিগ্রেশন এ্যাক্টের কোনও প্রতিকার হইল না দেখিয়া শিখগণ উত্তেজিত হইয়া নিজেরাই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন সিঙ্গাপুর ও মালয়ের বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর শিখ-নেতা বাবা গুরুদিৎ সিং।

কলিকাতা হইতে একখানি জাহাজ ভাড়া করিবার চেষ্টা করা হইল

—কিন্তু জাহাজ পাওয়া গেল না। বাবা গুরুদিৎ সিং তখন হংকং হইতে "কোমাগাটামারু" নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিলেন। ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল হংকং হইতে বহু শিখকে লইয়া জাহাজখানি যাত্রা করিল কানাডার উদ্দেশে।

প্রায় শ'চারেক শিখকে লইয়া কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পৌঁছাইতে জাহাজখানির পঞ্চাশ দিন সময় লাগিল। ২৩শে মে তারিখে তাঁহারা উক্ত বন্দরে পৌঁছাইলেন। কানাডা সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যাত্রীদিগকে যথারীতি অবতরণের অনুমতি না দিয়া উপরন্তু জাহাজে একদল পুলিশ পাঠাইয়া দিলেন কানাডা গভর্ণমেণ্টের আইন মান্য করাইবার জন্ম। ইহাতে যাত্রীরা অতিশয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গুলি চালাইয়া তাঁহারা পুলিশকে বিদূরিত করিলেন। রণ-তরীর দ্বারা তখন "কোমাগাটামারু"কে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলা হইল এবং বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া না গেলে ভয় দেখান হইল গোলাবর্ষণের।

যাহা হউক, দুই মাস পরে ২৩শে জুলাই তারিখে জাহাজখানি পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিল। জাহাজখানির প্রত্যাবর্তনের পথেই ইউরোপে প্রথম জগদ্ব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইয়া গেল।

যাত্রীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া যাঁহারা কানাডা যাইবার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন—ব্যর্থতায় তাঁহারা হইয়া উঠিলেন উন্মত্তপ্রায়। তদুপরি সিঙ্গাপুর ও হংকং-এ অবতরণকামী যাত্রীদের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অবতরণ করিতে না দেওয়ায় ইংরাজদের উপর তাঁহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় ১৯১৪ সালের ২৯শে (২৭শে?) সেপ্টেম্বর "কোমাগাটামারু" হুগলী নদীর মোহনায় বজবজে আসিয়া পৌঁছিলে যাত্রীরা শুনিলেন যে, তাঁহাদিগকে পুলিশের হেপাজতে সোজা পাঞ্জাবে লইয়া যাইবার জন্ম একখানি ট্রেণ প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট হইতে গোলমালের আশঙ্কাতেই গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থায় রাজি না হইয়া নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া দল বাঁধিয়া পদব্রজে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। পুলিশ ও সৈন্তগণ তাঁহাদের এই প্রচেষ্টায় বাধা দিল। ইহার ফলে দুইপক্ষে সংঘর্ষ সুরু হইয়া গেল। এই সংঘর্ষের ফলে ১৮ জন শিখ প্রাণ হারাইলেন। পুলিশ ও সৈন্তদের তরফেও কিছু হতাহত হইল। অবশেষে সন্ধ্যাকালে মাত্র ৬০ জন শিখকে জোর-জবরদস্তি করিয়া ট্রেণে চাপান সম্ভব হইয়াছিল। ২৮ জন শিখসহ বাবা গুরুদিৎ সিং কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। সুদীর্ঘ সাত বৎসর আত্মগোপন করিয়া থাকার পর ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাবা গুরুদিৎ সিং পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

"কোমাগাটামারু"কে উপলক্ষ করিয়া এই সকল ঘটনায় পাঞ্জাবে সৃষ্ট হইল দারুণ উত্তেজনা। সংবাদ পাইয়া বিদেশে অবস্থানকারী বহু শিখও ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকারী শিখদিগের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ম আইন তৈয়ারী হইল এবং দেশে ফেরার পরই হাজার হাজার লোককে করা হইল গ্রেপ্তার।

কিন্তু গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা তথাপি থামান গেল না। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে পাঞ্জাব বিপ্লবের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। ১৩ই অক্টোবর চৌকীমান ষ্টেশন হইল লুণ্ঠিত, আর ২৭শে নভেম্বর তারিখে পুলিশ ও বিপ্লবীদের মধ্যে লড়াই হইল ফিরোজপুর জেলায়। পাঞ্জাবের এই বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থায় রাসবিহারী, পিংলে, শচীন্দ্র সান্যাল, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি এই প্রদেশেই তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী বিপ্লবীদিগের একটি সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে মহাযুদ্ধের সুযোগে স্বাধীনতা লাভের জন্ম সকলকে জীবনপণ-সংগ্রামে লিপ্ত হইতে নির্দ্দেশ দান করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে একযোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একটি প্রচেষ্টা সুরু হইয়া গেল এবং সেই উদ্দেশ্যে জনসাধারণ ও সৈন্তগণের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিবার জন্ম নানা স্থানে দক্ষ লোক প্রেরিত হইতে লাগিল। রাসবিহারী ও পিংলে লাহোরের ইণ্ডিয়ান হোটেলে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্থির হইল যে পরে তাঁহারা অমৃতসহরে থাকিবেন।

সৈন্তদলের মধ্যে বিপ্লব-প্রচার কার্য্যে কর্ত্তার সিং সারাভা নামে একজন শিখ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেনানীর ছদ্মবেশে ব্যারাকে প্রবেশ করিয়া সৈন্তদের মধ্যে বিপ্লব-প্রচার করিতেও তিনি ভীত হইতেন না। সকলের সমবেত প্রচেষ্টা ও প্রচারকার্য্যের ফলে লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, ফিরোজপুর ইত্যাদি স্থানের এদেশীয় সৈন্তেরা বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। লক্ষ্ণৌ, মীরাট, কানপুর, জব্বলপুর, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি স্থানের সৈন্তদের নিকটও বিপ্লবের আহ্বান জানান হইল। সুদূর সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সৈন্তগণও বিপ্লবের বাণী শুনিতে পাইল।

লাহোর হইল বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র। অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল পুরাদমে। বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানীও চলিতে লাগিল। প্রস্তুত হইল বিপ্লবীদের নিজস্ব পতাকা, পোষাক ও প্রতীকচিহ্ন—রচিত হইল যুদ্ধের ঘোষণাপত্র।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সহর ও ক্যাণ্টনমেণ্টের উপর প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করিয়া অস্ত্রাগার প্রভৃতি দখল করিয়া দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পরিকল্পনা বিপ্লবীদিগের ছিল।

কিন্তু বিপ্লবীদের দলে ছিল পুলিশের এক গুপ্তচর—নাম কৃপাল সিং। তাহার নিকট হইতে পুলিশ পূর্ব্বেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিষয় জানিয়া ফেলিল। রাসবিহারী তখন ২১শের পরিবর্তে ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া সকল কেন্দ্রে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন।

তারিখ পরিবর্তনেও কিন্তু সুবিধা হইল না। পাঞ্জাবের গুরুত্বপূর্ণ সহরগুলিতে বৃটিশ সৈন্ত মোতায়েন করিয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতেই খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় সুরু হইল। অস্ত্রাগার ও সৈন্তনিবাস প্রভৃতিতে বসান হইল শক্তিশালী প্রহরা। পঞ্চকাল যাবৎ পাঞ্জাবে অত্যাচার-উৎপীড়নের আর অন্ত রহিল না। বিপ্লবীদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও পুলিশ হস্তগত করিল।

লাহোরের অবস্থা খারাপ দেখিয়া রাসবিহারী ও পিংলে আবার

কাশীতে ফিরিয়া গেলেন। কয়েকদিন পরে পিংলে গেলেন মীরাটে। সেখানে দ্বাদশ ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর থাকিবার ব্যারাকের মধ্যে মীরাটের সৈন্য-ব্যারাকটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার উপযোগী টিনের বাক্সে রক্ষিত দশটি বোমা সহ তিনি ২৩শে মার্চ্চ তারিখে ধরা পড়িলেন। কর্ত্তার সিং, জগৎরাম প্রভৃতি নেতারাও গ্রেপ্তার হইলেন।

স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে সর্ব্বসমেত মোট নয়টি ষড়্‌যন্ত্র মামলার বিচার হইল। আটাশ জন বিপ্লবীর বিচারে ফাঁসির আদেশ হইল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা কারাদণ্ড হইল অনেকের। বিদ্রোহের অভিযোগে দুইটি রেজিমেন্টের সৈন্যদেরও সামরিক আদালতে বিচার হইয়াছিল। পিংলে, কর্ত্তার সিং, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া যে লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে পিংলে, কর্ত্তার সিং, হরনাম সিং এবং আরও চারি জনের ফাঁসির আদেশ হয়। পিংলে ধরা পড়ায় রাসবিহারী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন; কারণ কার্য্যোপলক্ষে যাইবার পূর্ব্বে যখন রাসবিহারী তাঁহাকে তাঁহার বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তখন পিংলে নির্ভীকভাবে জানাইয়াছিলেন যে, রাসবিহারীর আদেশ সর্ব্ব সময়ই তাঁহাকে পালন করিতে হইবে; তাহাতে মৃত্যুকে বরণ করিতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ষড়্‌যন্ত্র মামলায় দীননাথ তলোয়ার রাজসাক্ষী হিসাবে যে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহাতেই রাসবিহারীর নাম সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই হইতেই পুলিশ রাসবিহারীর খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছিল এবং রাসবিহারীও আর কার্য্যে যোগদান না করিয়া নানা-স্থানে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বারো হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। দিল্লী লাহোর এবং বেনারস—এই তিনটি স্থানের ষড়্‌যন্ত্র মামলাতেই রাসবিহারীকে ধরাইয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল।

রাসবিহারীর ছদ্মবেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ানো সম্বন্ধে দিল্লী ও লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলায় নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত হইয়াছিল—

"Rashbehary floats down Lahore into the Presidency of Bengal. He goes down with moustache and comes up clean shaved. He goes down a Punjabi but comes a Bengalee."

কাশী হইতে রাসবিহারী চন্দননগরে আসেন—সেখান হইতে পরে নবদ্বীপে যান। নবদ্বীপ হইতে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। এই সময় ভারতের বাহির হইতে ভারতের বিপ্লবান্দোলনে সহায়তা করিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিদেশে পলায়নের একটা সুযোগও এই সময় জুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় জাপানে যাইবেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। রাসবিহারী "পি, এন, ঠাকুর" ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া ভারত-গভর্ণমেন্টের নিকট জাপানে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নাম দেখিয়া ভাবিলেন যে, তিনি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় এবং রবীন্দ্রনাথের জাপান-যাত্রার ব্যবস্থা ঠিক করিতেই বোধ হয় তিনি জাপানে যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহারাও অনুমতি প্রদান করিতে দ্বিধা করিলেন না। এইভাবে শচীন্দ্র সান্যাল এবং গিরিজাবাবু (নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী) প্রভৃতির উপর বিপ্লবান্দোলন পরিচালিত করার ভারার্পণ করিয়া এবং সকলকে আন্দোলন চালাইয়া যাইবার পরামর্শ দিয়া ১৯১৫ সালের ১২ই মে "সানুকিমারু" নামে একখানি জাপানী জাহাজে চাপিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাসবিহারী রাত্রিকালে ভারত ত্যাগ করিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই শচীন্দ্র সান্যাল প্রভৃতিও ধরা পড়িলেন। বেনারস ষড়্‌যন্ত্র মামলায় শচীন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল। গিরিজাবাবুও উক্ত মামলায় দণ্ডিত হইয়া আগ্রা জেলে অবস্থান-কালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

গদর দলের প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইউরোপ পলায়নের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হরদয়াল জার্ম্মাণীতে উপস্থিত হইলেন। চম্পকরমণ পিলে, ডক্টর তারকনাথ দাস প্রভৃতির চেষ্টায় বার্লিনে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল পার্টি" গঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত হরদয়াল, বরকতুল্লা, হেরম্বলাল গুপ্ত ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীও যোগদান করিলেন। ইঁহারা জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সংযোগবিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিল্লাই নামে একটি তামিল যুবক বার্লিনে জার্ম্মাণ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইয়াছিলেন।

এশিয়া মহাদেশে বিপ্লবীদের দুইটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল—একটি ব্যাঙ্ককে ও অপরটি বাটাভিয়ায়। ব্যাঙ্ককের কেন্দ্রের সহিত গদর দলের এবং বাটাভিয়ার কেন্দ্রের সহিত বাংলায় বিপ্লবীদের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ব্রহ্মদেশ ছিল তখন ভারতেরই একটি অংশ এবং ব্রহ্মদেশে শিখ পুলিশ ছিল প্রচুর। সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিবার পর বিপ্লবীরা ব্রহ্মের পার্শ্বস্থিত শ্যামদেশ হইতে ব্রহ্মদেশের উপর আক্রমণের একটি পরিকল্পনা ঠিক করিয়াছিল। তাহাদের আশা ছিল যে, এই ব্যাপারে ব্রহ্মস্থিত শিখ পুলিশদের সহায়তা তাহারা লাভ করিবে। ভারতে ও ব্রহ্মে তখন বৃটিশের সামরিক শক্তি দৃঢ় না থাকায় বিপ্লবীরা সাফল্যলাভের আশা করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশে নানা বৃটিশ-বিরোধী প্রচার-পত্র শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্ত-পথ দিয়া পাঠান হইতে লাগিল। হেরম্বলাল গুপ্ত জার্ম্মাণী হইতে আমেরিকায় চলিয়া গেলেন, এবং বোয়েম নামক একজন জার্ম্মাণ সেনাপতিকে শ্যামদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল ব্রহ্ম আক্রমণের উপযোগী সৈন্যদল গঠন করিবার জন্য। আমেরিকায় কার্য্য পরিচালনার জন্য পরে হেরম্ব গুপ্তের স্থলে চন্দ্র চক্রবর্ত্তী জার্ম্মাণ-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও হেরম্বলাল গুপ্ত পরবর্ত্তীকালে সানফ্রান্সিস্কো ভারত-জার্ম্মাণ ষড়্‌যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই মামলা আরম্ভ হইয়াছিল ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে গদর দলের বহু সদস্য শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরাজগণের যুদ্ধ ঘোষণায় ইস্‌লাম-স্বার্থ রক্ষাকল্পে

অবলম্বন হইয়া বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা সিন্ধী প্রভৃতি কাবুলে তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত করিলেন। অচিরে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, ওবেদুল্লা সিন্ধী, বরকতুল্লা, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের দ্বারা কাবুলে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠিত হইল। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের গদর-দল এবং কাবুলের বিপ্লবীদের সহিত হরদয়াল যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। বহির্ভারতের বিপ্লবী দলগুলি ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিয়া বিপ্লবান্দোলনে নানারূপে সহায়তা করিতে লাগিলেন। সর্দ্দার অজিত সিংহও এই সময় বিপ্লবীদের সাহায্যার্থে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। জার্ম্মাণরা কাবুল, আমেরিকা, সুদূর প্রাচ্য, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তা করিতে লাগিল।* ক্রমশঃ

* যে সকল বীর শহীদের রক্তদানে অথবা যে সকল বিপ্লবীর অসমসাহসিক কার্য্যাবলীর দ্বারা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম গৌরবোজ্জ্বল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদের জীবনকাহিনী সঙ্কলনে সহায়তা করিবার জন্ত তাঁহাদের ফটো এবং তাঁহাদের জীবনের জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ সরবরাহ করিতে সর্ব্বসাধারণের নিকট অনুরোধ জানান যাইতেছে। "ভারতবর্ষ" কার্য্যালয়ের ঠিকানায় উহা প্রেরিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। —লেখক।

অরণ্যচারী

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আসামের লামডিং থেকে বারকাটিং অবধি যে আরণ্যভূমি তার ভয়াবহ গ্রন্থিল বাহু প্রসারিত ক'রে আছে, তারই মাঝখানে কোনো একটি ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরে বসেছিলুম বাইরের দিকে চেয়ে। ঘরের সামনে রেলপথের সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়েই দৃষ্টি যেন সভয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। ধূসর রুক্ষ তরঙ্গিত পর্বতমালার উপর দিয়ে দুর্ভেদ্য অরণ্যের বিস্তার। দৃষ্টি যদিও ঘরের বাইরে, কিন্তু শ্রবণ ছিলো ঘরের কথাবার্তার দিকে উন্মুখ হ'য়ে। একজন ষ্টেশন মাষ্টারকে বলছিলেন যে, কাল পাশের ষ্টেশনে যখন প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়িয়ে তখন তার একটুখানি তফাৎ দিয়ে এক ভয়ংকর হিংস্র জন্তু রেলের লাইন অতিক্রম ক'রে চলে গেলো প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের চোখের সামনে দিয়ে। এই কথা শুনে আমি আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে বক্তার দিকে তাকালুম।

বাইরে তখন গভীর ঝিল্লিরব ও অন্ধকার নিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছে, বক্তার মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে শুনছি, সহসা ক্রিংক্রিং শব্দে ফোনটা বেজে উঠতেই ষ্টেশন মাষ্টার সেটা তুলে কানে দিলেন, তারপর ফোনটা রেখে আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন: 'গাড়ি আসচে, কিন্তু আজ রাত্তিরে ও ষ্টেশনে না গেলেই কি নয়?'

আমি করুণকণ্ঠে বললুম: 'আজ না গেলে কাল কাজ সেরে ভোরের ট্রেনে এখানে এসে আসাম মেল ধরতে পারব না। কাল আমার যাওয়া বড় দরকার।'

ষ্টেশন মাষ্টার বিমর্ষমুখে একটুখানি চুপ ক'রে বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন: 'তাহ'লে উঠুন। ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।'

আমি নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলুম। ঘরের ঠিক সামনেই আরণ্যভূমির নিচে পার্বত্য পথের উপর পাশাপাশি একজোড়া রেল লাইন পাতা। দেখলুম, সেই অরণ্য ও পাহাড় শ্রেণীর উপর অন্ধকার গাঢ়তর ও ঝিল্লীরব আরও গভীর হ'য়ে সমস্ত ভূখণ্ডের রূপকে কেমন যেন ভীতি ও রহস্যে ঘোরালো ক'রে তুলেছে। কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা এগিয়ে যেতে লাগলুম এবং ষ্টেশন ছাড়িয়ে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগলুম। সেই বহু বিস্তীর্ণ আরণ্যভূমি ও পার্বত্যপথের উপর সন্ধ্যা নামছে কিন্তু কোথায় বৃক্ষের শাখায় শাখায় নীড় প্রত্যাগত পাখীর সুধাক্ষরা কাকলী? অন্তরীক্ষে তাদের গতির পুলকে শিহরিত ডানার বিচিত্র স্বর? সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে পথের ধূলি উড়িয়ে গৃহপালিত পশুদের গৃহাভিমুখে উল্লাসরবমুখর প্রত্যাগমন কই? ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলুম, গৃহপালিত মমতাময় কমনীয় প্রাণের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। তাদের স্থান যেন এখানে নয়। দু'পাশে প্রাচীরের মত উন্নত পাহাড়-শ্রেণীর মাঝখানের পথ দিয়ে ভয়াল নাগিনীর মতো লোহার লাইন বঙ্কিম গতিতে কোথায় চলে গিয়েছে। এক অদ্ভুত স্তব্ধতা ঐ অরণ্যময় ভূখণ্ডের রহস্যময় বুকে নেমে আসছে চুপে চুপে।

গুম গুম গুম গুম।

চমকে উঠলুম। কিসের শব্দ? ঐ মৌন অরণ্য কি কাকেও তার রহস্যময় সংকেত ধ্বনি করলে? এই আসন্ন রাত্রিতে কাদের কাছে তার নিগূঢ় সংকেত এ? মনে হলো, এই বিচিত্র সংকেত ধ্বনি শোনবার জন্তে কারা যেন ওর গহনে শ্বাসরোধ করে উৎকর্ণ হ'য়ে আছে। সেই শব্দ অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখলুম, ঐ দূরে পার্বত্য পথের উপর দিয়ে এক অতিকায় জন্তু আমাদের দিক লক্ষ্য করে নিষ্ঠুর উল্লাসে ছুটে আসছে। ঐ এসে পড়ল। সভয়ে কয়েক পা পেছিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ ভূমিকম্পে আমার সর্বাঙ্গ যেন টলতে লাগল, পরক্ষণেই সেই অতিকায় জন্তুটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করে আমার সামনে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে লাগল। এতো বড় দীর্ঘ ট্রেন আমি আর দেখিনি

কিন্তু এ যাত্রীবাহী গাড়ী নয়। এর কক্ষে কক্ষে মানুষের কলরব নেই, নেই জীবনের তীব্র ও মৃদু স্পন্দন। এর গবাক্ষ পথে শিশুর চঞ্চল উৎসুক চাহনী, কোনো অনবগুণ্ঠিতার সকৌতুক দৃষ্টি চোখে পড়ে না, ক্লান্ত ব্যথিত প্রতীক্ষারত কোনো একখানি মুখও নিমিষের জন্যে দেখা গেলো না। অতিকায় জড় দানবের মতো সেই মালগাড়ী তার বুকের উপর বড় বড় কামান, যুদ্ধের বৃহদাকার সব মারণাস্ত্র, ভাঙা জীপ ও মিলিটারি লরি চাপিয়ে ছুটে চললো, মনে হ'লো থামবে না। আমার পায়ের তলায় ঠিক তেমনি ভূমিকম্প হ'তে লাগলো। সহসা তার প্রবল ঘূর্ণাবর্তময় চাকায় একটা তীব্র আর্তনাদ জেগে উঠতেই সেই বিদ্যুৎগতি মন্দ হ'তে হ'তে একসময় একেবারে থেমে গেলো। মুহূর্তে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা যেন পাথরের মতো চেপে বসল আমার বুকে। চেয়ে দেখলুম আমাদের সামনেই গার্ডের কামরা গাড়ীর একেবারে শেষে। সামনের ইঞ্জিন এখান থেকে ঠাহর হয় না এতো দীর্ঘ ঐ গাড়ী। ষ্টেশন মাষ্টারের ইঙ্গিতে কতকটা যেন যন্ত্রচালিতবৎ গার্ডের কামরার দিকে এগিয়ে গেলুম। গার্ডের হাতের এক চোখো লাল লণ্ঠন আমার মুখের উপর পড়ে যেন পৈশাচিক হিংসায় একবার জ্বলে উঠল। গাড়ীতে উঠতে উঠতে আমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল ঐ আলোয়।

প্রায় আধ মাইলব্যাপী-দীর্ঘ ও অতিকায় মালগাড়ী দুটি মাত্র ক্ষুদ্রকায় প্রাণীকে তার জঠরে ভ'রে আবার ছুটতে লাগল অন্ধকারের বুক চিরে। সজোরে লোহার হাতলটা ধ'রে দাঁড়িয়ে পার্শ্ববর্তী মানুষটির দিকে তাকালুম। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় দেহ, পরণে বড় বড় পেতলের বোতাম দেওয়া কোট ও প্যাণ্ট, হাতে দস্তানা, মাথা ও কান টুপিতে ঢাকা। অন্ধকার কামরার বাইরে হাত লণ্ঠনের অস্ফুট আলোয় সেই অতি বাস্তব মনুষ্যমূর্তি কেমন যেন অদ্ভুত ও অবাস্তব মনে হচ্ছিল আমার। আলাপ করতে গেলুম কিন্তু সে আমার ভাষা বুঝতে পারলে না, বোঝবারও কোনো গরজ দেখালে না, বাইরের দিকে চেয়ে যেন বোবা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে মুখ ও চোখে কি ভাষা তখন ফুটে উঠেছিল? তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলুম, অন্ধকার, নিকষ কালো অন্ধকার সমস্ত প্রকৃতিকে মুখব্যাদান ক'রে কখন গ্রাস ক'রে ফেলেছে। দু'পাশের অরণ্যময় পাহাড় প্রাচীরের মাঝ দিয়ে ট্রেণ যেন লাফাতে লাফাতে ছুটছে, সেই দুর্বার গতিময় চাকার আবর্তে আবর্তে জেগে-ওঠা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আঘাত করছে প্রাণের মূলে। কোথায় চ'লেছি এই পথ দিয়ে? দু'পাশের ঐ প্রকৃতি যে মূর্তি নিয়ে ক্রমশঃ ফুটে উঠল তাতে মনে হ'লো, এই যন্ত্র দানব ঐ রূপ দেখে যেন ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে, মাথার উপরকার ঐ অন্তরীক্ষ ভ'রে যেন একটা ভীতি রোমাঞ্চ জেগে। হাতের টর্চটা টিপে গার্ডের দিকে একবার তাকালুম, বাইরের দিকে চেয়ে সে পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে বসে। কি দেখছে সে বাইরে? কোন রূপ তাকে ঐ রকম পাথরের মতো নিশ্চল স্তব্ধ করেছে? আলো নিভিয়ে অন্য হাতে গাড়ীর হাতলটা আরও জোরে চেপে ধরলুম। ট্রেণ ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, তার আর্তনাদে ও ঝাঁকানিতে দেহ মন অবসন্ন হ'য়ে এলো।

যখন অরণ্যের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি, তখন কিন্তু আমি আমার মনশ্চক্ষে তার নিবিড় রূপ দেখেছিলুম। হয়তো ভারতীয় ঋষি কবিই আমাকে দেখিয়েছেন সে রূপ। কিন্তু ভারতের এক প্রান্তভাগে বিশাল ভূখণ্ডপ্রসারী এই অরণ্যের সঙ্গে যখন প্রত্যক্ষ পরিচয় হ'লো তখন আমার মনশ্চক্ষুর সামনে ঋষি-কবির সে অটবী-রূপ যেন রূপান্তরিত হ'লো। এ সে অরণ্যভূমি নয়—যেখানে বহুযোজনব্যাপী বিশাল পৌরুষযুক্ত দীর্ঘকায় বৃক্ষাবলী তাদের পত্রপুষ্পভরা ঘনঘটাচ্ছন্ন সহস্র গ্রন্থিজটিল শাখাপ্রশাখাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে অসীমের দিকে যাত্রা করেছে মাটির উপর পরম মমতার মতো সর্বশ্রান্তিহরা স্নিগ্ধ গহন ছায়াখানি ফেলে। এ সে অরণ্য নয়—ঋতুতে ঋতুতে যার বুকে রঙের ঝরণা ঝরে, যার শাখায় শাখায় নব নব কাঞ্চন-ঘন সৌরভে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভ'রে থাকে, পাখীরা নীড় বাঁধে, তাদের কণ্ঠের সুধাক্ষরা কাকলীতে অরণ্য সঙ্গীতময়। যার ধ্যানমৌন গম্ভীর শীতল বক্ষে 'অকূল শান্তি বিপুল বিরতি' যুগে যুগে ঋষিকে তার বুকে ধ্যানাসন পাতিয়েছে, যার ছায়ায় এসে চরম হিংসার রূপান্তর ঘটে, সর্ব জীবের পরম আশ্রয় সে অরণ্য এ নয়। এ অরণ্য জীবন্ত নয় জান্তব। এর বক্ষ কোথাও মুক্ত নয়, তার সমস্ত বহিরঙ্গ খরকণ্টকের ভীষণ ও কঠোর শাসনে রুদ্ধ দুষ্প্রবেশ্য। অবাধগতিসম্পন্ন আলো বাতাস পর্যন্ত তার কাছ থেকে পালিয়ে গেছে ভয়ে। ওর খরকণ্টকশাসিত দুর্ভেদ্য কুটিল বক্ষে যুগযুগান্তের মৃত্যুর রহস্যময় অন্ধকার ও স্তব্ধতা অমানিশার মতো ঘনিয়ে। সেখানে জান্তব হিংসা কত রহস্যময় রূপে বিচরণ করে। সেদিন ওর পাশ দিয়ে গাড়ীতে যেতে যেতে ওর ঐ কুটিল বুকে নানা রকম অদ্ভুত ও অতি অস্ফুট শব্দ শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, সমস্ত অরণ্য জুড়ে আজ কি যেন কানাকানি ফিসফিসানি চলছে, চারিদিকে মুহুর্মুহু কিসের যেন সংকেত; কিসের সন্ধান পেয়ে তারা চকিত উৎকর্ণ হয়ে কি বলাবলি করছে। সে কানাকানি ফিসফিসানি সংকেতধ্বনি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে—কিন্তু কেমন যেন একটা ভীতিকর রহস্যে আমার সমস্ত অনুভূতি ভ'রে উঠল। মাথার উপরকার রোমাঞ্চিত আকাশের অস্ফুট আলোকে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমরা পাশাপাশি স্তব্ধ নির্বাক হ'য়ে ব'সে।

অপ্রশস্ত পথের দু'দিকে অরণ্যের তলায় দেয়ালের মতো পাহাড়শ্রেণী এক অদ্ভুত রূপ নিয়ে চোখের সামনে দিয়ে স'রে যেতে লাগল। ইতিপূর্বে অনেকবার এই পথ দিয়েই গিয়েছি কিন্তু সেদিনের মতো তার প্রকৃত মূর্তিকে আর কখনো দেখতে পাইনি। ঐগুলি পাহাড় বটে কিন্তু তার মহিমা কোথাও নেই। অরণ্যের বক্ষাশ্রিত ঐ অতি প্রাচীন ভগ্ন বিধ্বস্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হ'তে লাগল, ঐ তরুজিত পাহাড়শ্রেণী যেন তার জীর্ণতার নির্মোক নিয়ে বালুস্তূপের মতো দাঁড়িয়ে। ঐ মহা অরণ্য যুগযুগান্ত ধ'রে তার বুকে চেপে হিংস্র দংষ্ট্রা দিয়ে তার অটল অক্ষয় কাঠিন্যকে কুরে কুরে খেয়েছে, লেলিহান ক্ষুধার

শোষণ ক'রছে তার নির্মম জৌলুষ। অরণ্যের হিংস্র দংষ্ট্রায় ও শোষণে তাই তার সর্বদেহে মহাবার্ধক্যের চিহ্ন, ভগ্ন ধ্বসা ফাটলে ফাটলে জর্জর। পাথরের সে কাঠিন্য, সে অবিচলিত ধৈর্য, সে অদ্ভুত জৌলুষ খুইয়ে শত শতাব্দীর মৃত্যুর পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা বুকে ধ'রে আজও সে জীর্ণতার নির্মোক নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার সর্বাঙ্গ সহসা যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হ'লো, যে হিংস্র লেলিহান ক্ষুধা পাথরের অক্ষয় দেহকে কুরে কুরে খেয়ে এমন ভগ্ন জীর্ণ বালুস্তূপে পরিণত ক'রেছে, তার জীবন্ত জৌলুষকে মরুর মতো শোষণ করে তাকে ক'রেছে প্রাণহীন, আর কিছুকাল পরে তার ঐ শেষ অস্তিত্ব পর্যন্ত মহারণ্যের ক্ষুধার গর্ভে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে, তারপর তার ঐ হিংস্র লেলিহান ক্ষুধার ইন্ধনের জন্তে অরণ্য কাকে আশ্রয় করবে?

হঠাৎ গাড়ীখানা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আমার সর্বদেহে একটা ঝাঁকানি দিয়ে আমাকে যেন জাগিয়ে দিলে। দেখলুম, অরণ্যের সুড়ঙ্গপথে গাড়ীর সেই বিদ্যুৎগতি যেন ধীরে ধীরে মন্দীভূত হ'য়ে আসছে এবং তীব্র গতিশীল চাকার আবর্তে আবর্তে জাগা সেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ক্রমশঃ মৃদু হ'য়ে আসছে। হঠাৎ গতির এই শৈথিল্য কেন? সামনে কী মূর্তি দেখেছে সে? এ পথে এ তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই বুঝি ঐ ভয়ংকরের সামনে তার এই বিদ্যুৎগতি এমন স্তম্ভিত হয়ে যাবার যো হলো, তার আর্তনাদের শক্তি পর্যন্ত বিলুপ্ত হতে চললো ঐ মূর্তি দেখে। দু'পাশের শোষিত জীর্ণ পাহাড় ও আঁধারমগ্ন স্তব্ধ অরণ্যের দিকে একবার চেয়ে ভয়ে ভয়ে আমার স্তব্ধ নির্বাক সাথীর দিকে তাকিয়ে একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেলুম। দেখলুম সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, তারপর শয়তানের জ্বলন্ত চোখের মতো আলোটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে পা-দানির কাছে এসে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে গাড়িখানি একেবারে দাঁড়িয়ে পড়তে সে আমাকে নামবার ইঙ্গিত করে নিজে নেমে পড়ল এবং আলো হাতে সামনে ইঞ্জিনের দিকে তাকাল। আমি তাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারলুম না, তার মূক ইসারায় কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতো নেমে দাঁড়ালুম। মুহূর্তকাল মাত্র, পরক্ষণেই সেই কালো মূর্তি আমাকে সম্মুখের দিশাহীন পথটা দেখিয়ে, জ্বলন্ত চোখওয়ালা কাটা মুণ্ডের মতো কালো লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে তুলে একবার নেড়েই গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে পড়ল। পরক্ষণেই রুদ্ধগতি অতিকায় যন্ত্র-দানবটা একবার নড়ে উঠে ভয়ে ভয়ে সামনের দিকে একটু গিয়ে সহসা প্রবল বেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে পুনরায় লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি সামনে দিশাহীন পথের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে। এ কোথায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলো? কোথায় ষ্টেশন? কোথাও তো কিছুর চিহ্নমাত্র নেই। প্রথমে যেন নিজেরই বিশ্বাস হ'লো না, আমি এইখানে পরিত্যক্ত হ'য়ে একা দাঁড়িয়ে আছি। তারপর যখন দেখলুম, এ দুঃস্বপ্ন নয় নির্মম বাস্তব সত্য, তখন ঐখানে পরিত্যক্ত হওয়ার ফলাফল এক মুহূর্তে উপলব্ধি করে আমার শিরায় শিরায় তুষার স্রোত প্রবাহিত হ'তে লাগল। কি যে করব ভেবে না পেয়ে আকুল হ'য়ে চারদিকে তাকাতে লাগলুম।

সহসা সেই রোমাঞ্চকর স্তব্ধতার মধ্যে দু পাশে অরণ্যের অভ্যন্তরে লক্ষ কোটি কীট-পতঙ্গ এক সঙ্গে অদ্ভুত সুরে ঐক্যতান জুড়ে দিল এবং সেই ওঁৎ পেতে দাঁড়ানো অরণ্যের ধারে একা দাঁড়িয়ে আমার মনে হ'লো, সমস্ত অরণ্য কিসের আনন্দে যেন নিষ্ঠুর উল্লাসধ্বনি করছে। আর তিলমাত্র অপেক্ষা না ক'রে আমি সামনের দিক লক্ষ্য করে দৌড়তে আরম্ভ করলুম, দৌড়তে দৌড়তে মনে হ'লো, আমার পলায়নের এই প্রয়াস দেখে ঐ অরণ্য যেন আরও উচ্চরবে অদ্ভুত সুরে নিষ্ঠুর উল্লাসধ্বনি করছে।

কার ভরসায় কিসের আশায় যে ছুটলুম তা আজও জানা নেই, শুধু এইটুকু মনে ছিলো গার্ড আমাকে সামনের দিকে যেতে বলেছে, এগিয়ে গেলে আশ্রয় মিলবে। একটুখানি ছোটবার পর হোঁচট খেয়ে কোন রকমে পতন থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়ালুম। দু'দিকে অরণ্য অন্ধকারে যেন ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তে টর্চের আলোয় আমার চোখে যে দৃশ্য আত্মপ্রকাশ করল তাতে নিমিষে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। আতঙ্ক বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে দেখলুম, খাড়া পাহাড়ের বুক কেটে কেটে উপর থেকে তলা পর্যন্ত সোপানের মতো নেমে এসেছে এবং উপর থেকে সেই সোপান দিয়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক অদ্ভুত চেহারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দলে দলে বুকে হেঁটে পথের উপর পর্যন্ত নেমে এসেছে নিঃশব্দে। এক মুহূর্তেই মনে হ'লো, মহা হিংসা ঐ অদ্ভুত রূপ ধরে ঐ অরণ্যের ইঙ্গিতে আমাকে লক্ষ্য ক'রে নেমে আসছে, নিমিষে রক্তবীজের মতো আমার সর্বাঙ্গে ছেঁকে ধরবে। সামনের দিকে যাবার উপায় নেই, পেছনে যাওয়াও নিষ্ফল। হঠাৎ মনে হ'লো, অরণ্যের সেই নিষ্ঠুর উচ্চ উল্লাসধ্বনি যেন একেবারে শুদ্ধ হ'য়ে গেছে। সে যেন আমার অব্যর্থ পরিণাম দেখবার আশায় স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। কম্পিত হাতে টর্চের আলো সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মহা-হিংসার মূর্তিগুলির উপর স্থিরভাবে ফেলে তাদের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করতে করতে আত্মরক্ষার উপায় ভাবছিলুম, সহসা ঘোর নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে যেন বিদ্যুতের মতো মনে হলো, তাইতো ঐ জীবগুলির তো কোনো গতি নেই, দেহের স্পন্দন নেই। যেন অসাড় স্তব্ধ হয়ে সমস্ত সোপান ভরে পড়ে আছে। আরও কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যখন দেখলুম ওগুলি কোনো জীব নয়, অরণ্যের কয়েকটি শিরা উপশিরা হিংসার মূর্তি নিয়ে ঐভাবে নেমে এসেছে তখন সর্বাঙ্গে সেই কম্পন, বুকের সেই দ্রুত স্পন্দন যেন জীবন রক্ষার আনন্দে শান্ত হবার উপক্রম হ'লো, মনে হ'লো, আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে গেলে দিশা মিলবে, কিন্তু সে পুলক সে আশাবাদ মুহূর্তকাল স্থায়ী হ'লো মাত্র, পরক্ষণেই অরণ্যের বুকে সুরু হলো ফোঁস ফোঁস ফিস ফিস শব্দ। এ আর ভুল হবার নয়। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, ঐ রহস্যের বুকে জোনাকীগুলি সাপের মাথায় মণির মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে।

মনে হ'লো সমস্ত অরণ্য বাসুকীর মতো রোষস্ফীত চাপা গর্জনে নিঃশ্বসিত হ'চ্ছে। সে নিঃশ্বাস কখনো দ্রুত, কখনো মন্দ, কখনো বিলম্বিত লয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ওঠা নামা করছে। সেই ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের

নিঃশ্বাসে তার বুকের কালকূট হাওয়ার সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারিদিকে। দেখতে দেখতে সেই বিষ-নিঃশ্বাস যেন বায়ুস্তরে কুহেলী জালের মতো তার আস্তরণ বিছিয়ে নীহারিকাপুঞ্জকে আমার কাছে অস্পষ্ট ক'রে দিলে। আমার সর্বাঙ্গ যেন হিম হ'য়ে আসতে লাগল। আঁকড়ে ধরব এমন আশ্রয় কোথাও নেই। মাথার উপর নক্ষত্রের যে করুণ সান্ত্বনাভরা দৃষ্টিপ্রদীপগুলি আমার দিকে অপলক চক্ষে চেয়েছিলো, ঐ বিষ-বাষ্প তাকেও আমার মুখের আড়াল ক'রে দিল, যেন শেষ সময় কোনো স্নেহ সান্ত্বনা ভাগ্যে না ঘটে। আতঙ্কে হাত পা আড়ষ্ট হ'য়ে আসছিলো, সেই অত্যুগ্র বিষ-বাষ্পে ঢ'লে পড়বার পূর্বেই সামনের দিকে টলতে টলতে ছুটতে লাগলুম আঁকাবাঁকা গতিতে, আত্মরক্ষার কৌশল প্রয়োগ করবার মতো বুদ্ধি তখনো কেমন ক'রে ছিলো তাই আজ ভাবি।

একটুখানি গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আবার একটা নতুন উপসর্গ এসে জুটল। পাহাড়ের মাথায় অরণ্যে কার যেন অতি অস্পষ্ট দ্রুত পদশব্দ। ত্রস্তভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখি, শিকারীর মতো ওৎপেতে দাঁড়ানো অরণ্য মাঝে মাঝে ভীষণ বেগে আন্দোলিত হ'য়ে উঠছে। ঐ দিকে চেয়ে আমার আর বুঝতে বাকী রইল না, এই বায়ুলেশহীন নিষ্পন্দ নিস্তব্ধ ভয়ংকর নিশীথে পাহাড়ের মাথায় ও কিসের পদশব্দ, অরণ্যে ও আন্দোলন কিসের? মনে হলো, ঐ পাহাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে কে যেন নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অনুসরণ ক'রে আসছে আমাকে অরণ্যের অমোঘ মূক ইঙ্গিতে! নিয়তির মতো নির্মম ক্রূর সে, অব্যর্থ তার লক্ষ্য। তারই নিঃশব্দ দ্রুতগতির সংঘাতে সংঘাতে অরণ্যের দেহে ঐ আন্দোলন। তাকে চোখে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু সর্বাঙ্গ যেন তার জ্বলন্ত ক্রূর অপলক দৃষ্টি অনুভব করছিলুম। পৌষ মাস, আসামের দুর্জয় শীতের বিরুদ্ধে আমার সতর্কতার অবধি ছিলো না। তথাপি সেই বরফের মতো ঠাণ্ডায় আমার জামা কাপড় ঘামে ভিজে গেলো। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমার মতো এক অতি নগণ্য জীবের জন্য ঐ মহা অরণ্যের এতো আয়োজন কেন? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতর থেকেই যেন তার আভাষ পেলুম।

রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে এই অরণ্যের সুড়ঙ্গ পথে যখন সেই যন্ত্র-দানবটা আমাকে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলো, তখন সমস্ত অরণ্য জুড়ে যে বিপুল উল্লাস সুরু হ'লো তা আমি এখনো ভুলিনি। আমাকে অরণ্যের মুখে না দিলে হয়তো ঐ যন্ত্রদানবের রেহাই ছিলো না। তারপর ধীরে ধীরে বাসুকীর মতো ঐ অরণ্য তার অতল বুকের কালকূট আমাকে কেন্দ্র ক'রে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ছাড়তে লাগল, তার সঙ্গে এক মূর্তিমান হিংসাকে লেলিয়ে দিলে আমার পেছনে। ঐ অরণ্য কি আজ বহুদিন উপবাসী? বহুদিনের লেলিহান ক্ষুধার অতৃপ্তি সে কি আমাকে দিয়ে তৃপ্ত করবে? ঐ অরণ্যের ক্ষুধা জীবের ক্ষুধা নয়, যে শুধু আহার্যে তার নিবৃত্তি হবে। ওর ক্ষুধা লেলিহান হিংসার, শত শত লোল জিহ্বা মেলে আছে। চরম হিংসায় বীভৎস ক্রূরতায় তার নিবৃত্তি। তাই বুঝি আমাকে নিয়ে সে এমনধারা করছে। আর আত্মরক্ষার প্রয়াস বিড়ম্বনা তথাপি পাহাড়ের মাথায় জ্বলন্ত টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে আঁকাবাঁকা গতিতে ছুটতে লাগলুম ধূসর পথরেখা ধ'রে। দু'পাশে অরণ্য ঠিক তেমনি ওৎপেতে দাঁড়িয়ে। কখনো তার উৎকট উল্লাস, কখনো তার রোষস্ফীত বিষ-নিঃশ্বাস, কখনো মৃত্যুর মতো তার অনুসরণ বুকের মধ্যে বেজে উঠছে। একটুখানি পথ অতিক্রম করেই আতঙ্কে অবসাদে নৈরাশ্যে অনুশোচনায় চলৎশক্তিরহিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। কিসের আশায় চলব আর? কোথায় আশ্রয়? আর কেবলই মনে হ'তে লাগল, কেন ষ্টেশন মাষ্টারের কথা শুনলুম না।

সহসা সামনের দিকে চিহ্নহীন পথের দিকে চেয়ে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। ও কি দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের বুকে? আলোর বিন্দু না? আলোর বিন্দুই তো বটে। পরক্ষণেই মনে হ'লো, এ অসম্ভব, আমার চোখের ভুল। কিম্বা যে অরণ্য আমাকে নিয়ে তার হিংস্র লেলিহান ক্ষুধা এই ভাবে চরিতার্থ করছে, এ তারই ভয়াবহ পরিহাস। আমি যখন ঐ আলোক রশ্মিকে ধরতে মরীচিকার টানে তৃষ্ণার্ত মৃগের মতো ছুটব, তখনই নিঃশব্দে অনুসরণকারী ঐ মৃত্যুদূত নিমিষে আমাকে ধরবে বজ্রমুষ্টি দিয়ে, সেই মুহূর্তে সমস্ত অরণ্য বিকট রবে অট্টহাস্য ক'রে উঠবে। ঐ অরণ্যকে আমি চিনি। আমি বিস্ফারিত চক্ষে ঐ আলোর বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে। বিন্দুটি যেন নড়ছে, যেন হাত নেড়ে ডাকছে। কিসের আহ্বান এ? পরম আশ্রয়ের, না মহানির্বাণের? কিসের আলোক বিন্দু? অরণ্যের হিংস্র স্ফুলিঙ্গ, না সুকোমল স্নেহনীড়ের সন্ধ্যাদীপের সান্ত্বনা শিখা? একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালুম, তারপর সহসা সমস্ত অবিশ্বাস-সন্দেহের মূলোৎপাটন করে ফেলে ঐ আলোক বিন্দুটি লক্ষ্য ক'রে আমি উন্মত্তের মতো ছুটতে লাগলুম। ভয়ের বুকে সংজ্ঞা হারাবার তখন আর একটুখানি বাকী ছিলো আমার।

আজ এই কাহিনী লিখতে লিখতে সেই রাত্রির অনেক কথাই মনে পড়ছে। শুধু এইটুকু স্মরণ করতে পারছি না, সেই আলোক বিন্দুটি লক্ষ্য ক'রে যখন তার কাছে পৌঁছে দেখলুম, পাহাড়ের গায়ে নিষ্ঠুর স্তিমিত চাপা হাসির মতো বিচ্ছুরিত একটি অনুজ্জ্বল ল্যাম্প-পোষ্টের নিচে ছোট হারিকেন হাতে কতকগুলি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে, তখন কী অনুভূতি আমার হ'য়েছিলো। শুধু মনে পড়ে তাদের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'চ্ছিল না।

সেই মনুষ্যমূর্তিগুলি দ্রুতপদে আমার কাছে এগিয়ে এলো, তাদের হাতে লাঠি ও লোহার রড প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। ভীতিপূর্ণকণ্ঠে বললে: 'বাবু, বাবুসাব এসেচেন আপনি! ড্রাইভার বোকুবি ক'রে গার্ডের গাড়ী হেথা না রেখে হেথা এঞ্জিনটা রাখলে। এই জঙ্গল দিয়ে আপনাকে এতোখানি পথ আসতে হ'লো বাবু। আর এখানে নয় চলুন। মাষ্টারবাবুরা দাঁড়িয়ে আছেন আপনার জন্ত।'

আমি নির্বাক হ'য়ে তাদের দিকে তাকিয়ে। এ কারা? মানুষ না আর কেউ? ষ্টেশন মাষ্টার আমার জন্য কোথায় অপেক্ষা করছে? ষ্টেশন কই? এ তো সেই অরণ্য আর শোষিত ভগ্ন পাহাড়শ্রেণী দু'দিকে? চক্ষের পলকে অতোগুলি কথা বলেই তারা ফিরে দাঁড়িয়ে

চলতে লাগল। আমিও তাকে অনুসরণ করলুম। কোথায় চলেছি কিছুই জানিনে।

কয়েক পা গিয়েই তারা দাঁড়াল। টর্চের আলোয় চোখে পড়ল, পাহাড়ের বুকে সোপানবলী যেন কার অতিকায় পদচিহ্নের মতো আঁকা। একজন আমাকে অতি সন্তর্পণে আলো দেখিয়ে এক এক ধাপ উঠতে লাগল, তার পেছনে আমি। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে উদ্বেগ ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠল: 'বাবু বাবুসাব, বড় বেঁচে গেলেন। এ পথে এলে ফিরেতেও কেউ ফেরে না।'

এ কথাতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল না। ঠিক যেন নিশি-পাওয়া অবস্থায় আমি তার সঙ্গে সোপানের পর সোপান অতিক্রম ক'রে উঠছি। বহু সোপান অতিক্রম ক'রে উপরে উঠে থমকে দাঁড়ালুম। পাহাড়ের উপর পর পর খান তিনেক ঘর, চারদিকে অরণ্য ঘিরে দাঁড়িয়ে। রাত্রি তিমিরময়ী, কিন্তু এই স্থানটুকু আলোয় রাঙা হ'য়ে উঠেছে। ওদিকে শেষ ঘরটির চত্বরে টুলের উপর কে একজন বসে। তার ঠিক সামনে খানিকটা জায়গা জুড়ে কাঠের আগুন জ্বলছে। সেই দিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলুম না। দেখলুম, চতুর্দিক থেকে অরণ্যের অন্ধকার তার বিরাট মুখব্যাদান ক'রে সেই আলোক কুণ্ডকে গ্রাস করতে ছুটে এসেছে এবং সেই জ্বলন্ত কুণ্ড থেকে অগ্নি-নাগিনীরা তাদের ক্রুদ্ধ সর্পিল সহস্র ফণা তুলে অমিত বিক্রমে সেই অন্ধকারের মুখ-গহ্বর দংশন করছে মুহুর্মুহু।

একখানি ঘর সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ঠিক সামনে। সেই ঘর থেকে ব্যস্তভাবে জন দুই বেরিয়ে আমার কাছে এলেন। তাঁদের ব্যাকুলকণ্ঠে গভীর স্নেহের আহ্বান। সেই প্রদীপ্ত শিখার আলোকে আমি তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। তাঁদের একজন এসে আমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন।

সেই পাহাড়ের উপর স্বল্পালোকিত রুদ্ধদ্বার একটি কক্ষে কয়েকটি মানুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যখন বসলুম এবং সকলে গভীর মমতায় আমার শ্রান্তি অবসাদ দূর করতে যত্নবান হ'লেন তখন মানুষের অতি-পরিচিত স্নেহ মমতা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকতে লাগল। এখানে মানুষ থাকে? এখানে স্নেহ মমতা এমন ক'রে উৎসারিত হয়?

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে অরণ্যের ঐ ভয়াবহ মূর্তি চোখের আড়ালে পড়ে গেলো। আড়াল পড়ল আলো অন্ধকারের ঐ ভীষণ দ্বন্দ্ব। মানুষের স্নেহ মমতাকে আবার স্বাভাবিকভাবে আশ্রয় করলুম। কিছুক্ষণ পরে আমার অবস্থা স্বাভাবিক হ'য়ে এলো। লণ্ঠন জ্বালা টেবিলে মুখোমুখী হ'য়ে বসে ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ চলতে লাগল।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম: 'এখানে কতদিন আছেন?'

ষ্টেশন মাষ্টার বললেন: 'সাত দিন। এবার যাবার সময় হ'য়ে এলো। রোজই দিন গুণছি।'

বিস্মিত হ'য়ে বললুম: 'এতো শিগগির ট্রান্সফার হ'চ্ছেন?'

ষ্টেশন মাষ্টার করুণ হেসে বললেন: এখানকার এই নিয়ম। দশ দিনের বেশী এ ষ্টেশনে কাকেও রাখা হয় না।'

কেন, এ প্রশ্ন বাহুল্য। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললুম: 'এ জায়গার কি রকম অভিজ্ঞতা হ'লো আপনার?'

ষ্টেশন মাষ্টার শুদ্ধ হ'য়ে রইলেন, তারপর সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন এখানকার কথা। আমি টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে লাগলুম। একটু আগে যে মানুষ ভয়কে দূর করতে, ভয় পাওয়া থেকে রক্ষা পেতে উদ্যত হ'য়ে উঠেছিলো সেই মানুষই তার একটু পরেই সে ভয়কে ভালোবেসে আহ্বান করছে। এই কথাটা তখন মনে উদয় হ'তে কেমন যেন একটা বিস্ময় জাগল। মানুষের মন কী বিচিত্র।

ষ্টেশন মাষ্টার বলতে লাগলেন, চাকরী উপলক্ষে তিনি আসামের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, কিন্তু এ রকম ভয়ংকর জায়গা তিনি দেখেন নি। চারিদিকে বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে হিংস্র অরণ্য রাজত্ব করছে। এর ত্রিসীমানায় কোনো মানুষ বা নিরীহ প্রাণী আসতে ভয় পায়। কোথাও কোনো আশ্রয়, কোনো বসতি নেই। মানুষের জীবনধারণের উপযোগী আহার্য মেলে না কোথাও। সপ্তাহে একদিন রেল-কোম্পানীর ব্যবস্থা মতো চাল ডাল আটা যা পাওয়া যায় এখানে, তাতে কোনো রকমে জীবন ধারণ করা চলে মাত্র, কিন্তু আহার্যের এই অভাব-জনিত কষ্ট বোধ করবার মতো মনের অবস্থা তাঁর নেই। এখানে মন একটি দিকে মাত্র নিবদ্ধ—সে আত্মরক্ষা। এখানে তাঁর দিনের প্রতি মুহূর্তটি তীক্ষ্ণ সচেতন উন্মুখ ও একমুখী।

এখানে ঐ পূর্বাচলে রঙের খেলা সুরু করে যে দিন আসে, সে এখানকার তিমিরময়ী রাত্রির আশ্বাস হতে পারে না। রাত্রি আর দিন দুই সমান এখানে। ঘরের সামনে ঐ যে জমিটুকু যাতায়াতের জন্য পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, প্রকাণ্ড দিবালোকে ঐখানে গিয়ে একা দাঁড়ালে সর্বাঙ্গ যেন ছম ছম করে। চারদিকের অদ্ভুত নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা বুকে পাথরের মতো চেপে ধরে। অরণ্যের দিকে চেয়ে মনে হয়, এ যেন ঝড়ের আগেকার থমথমে অবস্থা, যে কোনো মুহূর্তে একটা কিছু ঘটতে পারে। এর ওপর যাতায়াত করবার সময় জমি ও চারদিক খরদৃষ্টিতে বারবার দেখতে হয়; মনে হয়, এই বুঝি পায়ের পাশ দিয়ে লিকলিকে সরু কিছু চলে গেলো, ঐ নিবিড় পত্রান্তরালে কেউ বুঝি ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে। দিনে খানচারেক ট্রেণ এখানে এসে দাঁড়ায়। তখন সদলবলে তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচে নেমে ট্রেণ য়্যাটেণ্ড করেন। বেলা তিনটের শেষ ট্রেণ য়্যাটেণ্ড করে উপরে আসবার সময় পয়েন্টস্‌ম্যান জেলে দেয় ল্যাম্প-পোষ্টের বাতি। সাত দিন মাত্র এসেছেন কিন্তু এরই মধ্যে নিচের রাস্তায় ট্রেণ য়্যাটেণ্ড করবার সময় ও এর উপরে যে সব দৃশ্য তাঁর চোখে প'ড়েছে তা উপভোগ্যও নয়, সুখকরও নয়। তথাপি চাকরীর জন্যে এই ভয়ংকরের মুখে থাকতে হয়েছে সব জেনেও। সন্ধ্যা হবার আগেই কাঠ আর কয়লা দিয়ে দাউ দাউ করে আগুন জালিয়ে দেওয়া হয়, সারা রাত্রি সেই আগুন যাইরে

জেগে তাঁদের পাহারা দেয়। আগুন জেলে তারই কাছে একজন অস্ত্র নিয়ে বসে চারিদিক লক্ষ্য করে, কোনো কিছুর আভাষ পেলেই সংকেতে জানিয়ে দেয়। দ্বার বাতায়ন রুদ্ধ ট্রেণগুলি রাত্রে এই পথ অতিক্রম করবার সময় ইঞ্জিনগুলি থেকে বড় বড় কয়লার আগুন মুহুর্মুহু উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। সন্ধ্যার পর এ অঞ্চলের কোনো ষ্টেশনে ট্রেণ এসে দাঁড়ালে ষ্টেশন মাষ্টার ষ্টেশন ষ্টাফ নিয়ে বড় মশাল জালিয়ে অস্ত্র নিয়ে তবে ট্রেণ য়্যাটেণ্ড করেন। দিনের বেলাতেও দরজা বন্ধ করে বসার নিয়ম এইখানে—তথাপি কেবলই মনে হয়, এখনি বুঝি কেউ দরজা ঠেলে চক্ষের পলকে ঘরে ঢুকে পড়বে। চারিদিকে গভীর জঙ্গল ঘিরে আছে, তাই প্রতি মুহূর্তেই তো সেই সম্ভাবনা।

ঠিক সেই সময় রুদ্ধদ্বার ঠেলার শব্দে দুজনে চমকে উঠ্‌লুম। পরক্ষণেই পোর্টার দরজা খুলে অতি সন্তর্পণে একটি বড় থালা দু'হাতে ধরে ঘরে ঢুকে আমার সামনে থালাখানি রাখল। থালার উপর খানকতক হাতে গড়া রুটি, একখণ্ড পাটালি গুড় ও দু' গ্লাস চা। ষ্টেশন মাষ্টার অত্যন্ত স্নেহ মমতার সঙ্গে আমাকে সেই আহার্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর সে অনুরোধ না রাখাই আমার পক্ষে অসম্ভব হ'তো। চা খেতে খেতে আমি বললুম: 'দিনের বেলাতেও এইভাবে ঘর বন্ধ ক'রে থাকতে হয়?'

ষ্টেশন মাষ্টার মুখের কাছে গ্লাস তুলে চা খেতে খেতে আমার প্রশ্নের উত্তরে ঘাড়টি একবার হেলালেন শুধু। একটুখানি নীরবে চা খাবার পর সহসা বললেন: 'মাস তিনেক আগে এই ষ্টেশনের Confidential report পড়বার সুযোগ হয়েছিলো আমার। তখন ভাবতে পারিনি একদিন আমাকেই এই জায়গায় আসতে হবে।'

আমি সভয়ে বললুম: 'কি পড়েছিলেন সেই রিপোর্টে?'

ষ্টেশন মাষ্টার একটুখানি স্তব্ধ হ'য়ে থেকে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন সেই বিবরণ একের পর এক এবং শুনে শিখাময় অগ্নিকুণ্ডের প্রহরায়, রুদ্ধদ্বার কক্ষে মানুষের আশ্রয়ে বসেও আমার সর্বাঙ্গ বারংবার কাঁটা দিয়ে উঠল। আর আমার বুঝতে বাকী রইল না কেন প্রতি পদক্ষেপে ঐ মানুষ অমন করে ডরিয়ে ওঠেন, কেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে কার আকস্মিক প্রবেশের আশঙ্কা তাঁকে প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে। আর সেই দরিদ্র অসহায় ষ্টেশন মাষ্টারের সেই শোচনীয় পরিণামের কথা শুনে চোখে আমার জল এসে পড়ল। এইখানে অন্নের জন্যে চাকরী করতে এসে জীবন দিয়ে গেলো। এই ঘরের মেঝে থেকে তার রক্তের দাগ আজ মুছে গেছে।

সেই কাহিনী শেষ করে তিনি বললেন: 'যতক্ষণ জেগে থাকি এই রকম ভাবেই কাটে। রোজ বাড়িতে একখানা ক'রে চিঠি পোষ্ট করতে হয়। এখানে কখন যে কি ঘটবে কেউ বলতে পারে না।'

আমি আর কোনো প্রশ্ন করলুম না, ষ্টেশন মাষ্টারও নীরব হয়ে গেলেন। সেই স্তব্ধতার মধ্যে বসে আমার যেন বারংবার বোধ হ'তে লাগল, শত শত অগ্নি-নাগিনীর উদ্যত ফণাকে অতল মুখগহ্বরে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে এই ঘরের বাইরে অরণ্য যেন ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে।

সহসা চারিদিক প্রকম্পিত করে অরণ্য যেন গর্জন করে উঠল। মনে হলো, এ গর্জন যেন নিষ্ফলতার নিদারুণ রোষে, ক্রূর প্রতিহিংসায়, নির্মম আক্রোশে। আমি ষ্টেশন মাষ্টারের দিকে তাকালুম। সেই মুহূর্তে তাঁর মুখের সেই চেহারা আমি ভুলতে পারিনি। বাইরে অনেকগুলি দ্রুত ও ত্রস্ত পদশব্দ শোনা গেলো। পোর্টার, পয়েণ্টস-ম্যান সবাই ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, ষ্টেশন মাষ্টার তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে আমাকে অভয় দিয়ে। বাইরের সেই অগ্নিকাণ্ডের শত শিখাকে সহস্র শিখায় জাগিয়ে দেবার জন্য ষ্টেশন মাষ্টারের কম্পিত কণ্ঠের আদেশ একবার কাণে এলো।

সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ সচেতন উন্মুখ ক'রে ঘরের মধ্যে আমি বসে। প্রতি মুহূর্তে কি যেন ঘটতে পারে, কি যেন সংবাদ আসতে পারে তারই অপেক্ষায় শ্বাসরোধ ক'রে রোমাঞ্চিত হয়ে অপেক্ষা করছি। বাইরে অগ্নি-নাগিনী সহস্র ফণা তুলে ফুঁসিয়ে ফুঁসিয়ে দংশন করছে অন্ধকারের করাল মুখ-গহ্বরকে। কতক্ষণ কেটে গেলো সেই ভাবে।

ষ্টেশন মাষ্টারের মুখে এক সময়ে একটি পরমাশ্চর্য সংবাদ শুনে তাঁদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ধারে গিয়ে একবার দাঁড়ালুম।

দিগন্তে কৃষ্ণাতিথির চাঁদ সবেমাত্র উঠেছে। Sweet Benediction in the eternal curse.

সেই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল চারিদিকে দিগন্তের কোল পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়ে এই মহা অরণ্য তার ঐ বিশাল জটিল অসংখ্য শাখায় শাখায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত অঙ্গে অঙ্গে, তাণ্ডব হিংসার দুর্নিবার খরস্রোত, ঘূর্ণাবর্ত, আলোড়নকে সংহত ক'রে, উদয় থেকে অস্তাচল, ধূলিকণা থেকে নীহারিকা পর্যন্ত দুর্বোধ্য মূক ইঙ্গিত প্রসারিত ক'রে এক ভয়ংকর মৌনতায় অবিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

ওরই মুখে পৌষ রূপার শীতাংশু। এই ভয়ংকরের মুখে ঐ চাঁদকে দেখে আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল, এ তো চন্দ্রোদয় নয়, এ যেন চন্দ্রারতি। রাত্রি তার নীলকান্তি বিচ্ছুরিত দীপাধারে চন্দ্রের প্রদীপখানি ধ'রে স্থির অকম্পিত করে ঐ ভয়ংকরের আরতি ও মুখ বন্দনা করছে। রাত্রির এই চন্দ্রারতি ঐ ভয়ংকরকেও সুন্দর ও মহিমাময় ক'রে তুলেছে। অবাক হয়ে ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে এক অপরূপ রূপের চিত্ত চমৎকারীতে আমার মনশ্চক্ষু যেন ভ'রে উঠল। সব ভয় ভুলে গেলুম।

ঘরে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনাবলী সহসা এক নূতন অর্থে আমার চ'ক্ষে অর্থময় হয়ে উঠল। মনে হ'লো, আমি যেন বিংশশতাব্দীর প্রতীভূ। আমারই মতো এই শতাব্দী যেন হিংস্র অরণ্যের সুড়ঙ্গ যে দিশাহীন হয়ে হাতড়ে হাতড়ে চলেছে। সে পথ এমনি দুর্গম অন্ধকারাচ্ছন্ন হিংস্র খরকণ্টকশাসিত। মৃত্যু ধ্বংস বারংবার ব্যাহত করছে তার গতি তথাপি সে চলছে লক্ষ্যের পথে। আজ যেন শতাব্দী তামস তপস্যার ব্রতী। হয়তো একদিন তার এই তামস তপস্যারিষ্ট মুখ এমনি চন্দ্রারতিতে বন্দিত হবে—সেদিন ধন্য হবে, সার্থক হবে তার এই তপশ্চর্যা।

বিলাতের পুলিশ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার আই-পি, জে-পি

পৌষের ভারতবর্ষে বিলাতের পুলিশ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখেছিলাম। ইতিমধ্যে কলিকাতার রোটারী ক্লাবের তরফ থেকে 'বিলাতের পুলিশ ও আমার অভিজ্ঞতা' সম্বন্ধে ক্লাবের সাপ্তাহিক বৈঠকে কিছু বলার অনুরোধ এল। এতদিন শুনেছিলাম—"তোমার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই ; ভারতবর্ষে আধুনিক প্রথার কোন প্রয়োজন নেই। অনেক (!) পুলিশ অফিসার বিলেত ঘুরে এসেছে কিন্তু কোন লাভ হয় নাই ; সবাই একবাক্যে বলেছে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথা চল্‌বে না।" পাথরে মাথা ঠুক্‌লে, পাথর জখম হয় না ; যে মাথা ঠোকে তারই মাথা কাটে ; আমিও চুপচাপ ছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত, বহু দ্বিধার পর আমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লাম—বিলাতি কতটুকু এদেশে চালু করা চলে সে সম্বন্ধে কিছু না বলে, বল্লাম তাদের উৎকর্ষতা কতটুকু দেখেছি। আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আমাকে বহু প্রশ্ন করা হয়। অনেকেই জান্‌তে চাইলেন "আমাদের পুলিশ কেন ও দেশের মতন ভাল নয় ; কি কর্‌লে ও কতদিনে ওদের সমান করা চলে।" কয়েক মিনিটে উত্তর দিতে হবে। আমার উত্তর হ'ল—"আমরা ছিলাম এতদিন পরাধীন ; আমাদের পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদীর আদর্শে, কতগুলি স্বার্থান্বেষী, উদ্ধত ও অসৎ লোক নিয়ে। ইংরাজ তো বিদায় হল কিন্তু তাদের হাতে-গড়া বোঝা চাপিয়ে গেছে আমাদের উপর ; প্রথমে বোঝা নামাতে হবে—এইটাই হ'ল প্রথম কাজ, তার পর গড়্‌তে হবে নূতন ঢঙে নূতন কারিকর দিয়ে।"

একটু ব্যাখ্যার দরকার ছিল। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন—পুলিশের মধ্যে অনেকে দেশভক্তির পরিচয় দেবার জন্য ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা এঁটে বেড়িয়েছেন। উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন কর্‌তে চেয়েছেন যে তারাও দেশভক্তিতে কাহারও পিছনে নন্ ; অথবা মিথ্যা আবরণ সৃষ্টি করে লোক ঠকাতে চেয়েছেন। রাতারাতি ভোল বদলানো যায়, কিন্তু অভ্যাস ছাড়া যায় না। আমাদের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী সাহেব আছেন—মিষ্টার অথবা সাহেব—যথা মিঃ ব্যানার্জ্জি বা ব্যানার্জ্জি সাহেব। শ্রী ব্যানার্জ্জি (বন্দ্যোপাধ্যায়) কিংবা অমুক বাবু সম্ভাষণ তাদের কানে বেসুরো শোনায়। 'বন্দেমাতরম' ও 'জয়হিন্দ' অনেকের গলায় আট্‌কে গেছে ; যেমন দস্যু রত্নাকরের পাপে আড়ষ্ট জিহ্বায় রাম নাম সহজে উৎরায় নি।

পুলিশের অনেকেরই এ অবস্থা হয়েছে ; তাই ভেঙ্গে গড়ার কথা বলেছিলাম। নূতন পুরানো মিশিয়ে জোড়াতালি দেওয়া চলে, কিন্তু টেঁকসই জিনিষ গড়া চলে না।

এবার আসল কথা বলি। লণ্ডনে পৌঁছে ইণ্ডিয়া হাউসের নির্দ্দেশ মতন ২১শে এপ্রিল সাড়ে দশটার স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে হাজির হলাম। সাধারণ জ্ঞাতার্থে বলে রাখি—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড স্কটল্যাণ্ডে নয় ; মেট্রোপলিটান পুলিশের প্রধান কর্ম্ম কেন্দ্র। এ নামটীর একটু ইতিহাস আছে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজাদের লণ্ডনে বসবাসের একটী রাজপ্রাসাদ ছিল এবং এই পাড়াকে বলা হত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড। এই পাড়ার একটী বাড়ীতে ১৮৪০ সালে লণ্ডনের গোয়েন্দা বিভাগ খোলা হয় কিন্তু অফিসের নাম ক্রমশঃ পাড়ার নামে পরিণত হল ; কলিকাতার যেমন হয়েছে লালবাজার। আজকাল ইয়ার্ড অন্যত্র সরে গেছে। ১৮৯০ সালে টেমস্ নদীর তীরে নূতন বাড়ীতে "নূতন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড (New Scotland yard) স্থানান্তরিত হয়েছে। 'নূতন' কথাটি কিন্তু সাধারণে গ্রহণ করে নাই।

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে শুধু গোয়েন্দা বিভাগই নয়, এটা হচ্ছে পুলিশ কমিশনারের দপ্তর। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। লণ্ডন নগরীর পুলিশকে মেট্রোপলিটান পুলিশ (M. P.) বলা হয় ; তার কারণও আছে। এই নগরীর কেন্দ্রস্থলে এক বর্গমাইল স্থান হচ্ছে 'City of London' এবং ইহার পুলিশের ব্যবস্থা নাগরিক সভার উপর ন্যস্ত। এখানকার পুলিশকেই লণ্ডন পুলিশ বলা হয়। ইহা একটী স্বতন্ত্র পুলিশ, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পরিচালনার বাহিরে। সাবেকী আমলের ব্যবস্থা ; কাজের অসুবিধা যে হয় না তা নয়, তবে রক্ষণশীল ইংরাজ জাতি তাদের পুরাতন প্রথা বজায় রেখে চলেছে।

ইয়ার্ডের গেট খোলা—সেখানে প্রহরী নেই। সদর দরজা বন্ধ—Push লেখা আছে। ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুক্‌তেই একজন পোষাকপরা সিপাই বেরিয়ে এল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "আপনাকে কোনরূপ সাহায্য কর্‌তে পারি"—কথা বলার ধরণটা লক্ষ্য করা উচিত। আমাদের থানায় অভ্যর্থনা প্রায় ক্ষেত্রেই হয় "এ বাবু, কিয়া মাঙ্‌তা" ; বাঙ্গালী হলে বলে "কি চান্ মশায়" ; "কিছু দরকার আছে" আবার অনেক সময় কেউ মুখ ফিরিয়েও তাকায় না। আমরা যেদিন আমাদের পুলিশকে দিয়ে বলাতে পারবো "আপনাকে সাহায্য কর্‌তে পারি ?" সেদিন আমরা অর্দ্ধেক পথ এগিয়ে গেছি বলবো।

আমি বল্‌লাম "সহকারী কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। সিপাইটা আমাকে একটা দর্শন-প্রার্থীর ফর্ম দিলে। এইটা হ'ল আগন্তুক্‌দের ঘর ; সিপাইটা ছাড়া অন্য ধরণের পোষাক পরা আর একটা লোক ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল ; পরে জেনেছিলাম সে একজন Messenger—আমাদের দেশের অফিসের পিয়ন জাতীয়। তার কাজ হল আগন্তুকদের সঙ্গে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া এবং ফেরৎ নিয়ে আসা। বিলাতের প্রায় সকল বড় বড় অফিসেই এ ব্যবস্থা আছে। এ ঘরে আসবাবের মধ্যে ছিল, ছোট একটা টেবিল, দুইখানা চেয়ার ও একটা টেলিফোন। আশীলক্ষ লোকের বসতি লণ্ডন নগরীর পুলিশের প্রধান

দপ্তর অথচ দর্শন-প্রার্থীর ঘর খালি; একমাত্র দর্শনপ্রার্থী আমি—একেবারে অভাবনীয়।

আমার ফরম্ লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন সাদা পোষাক পরিহিত অফিসার এসে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং পরিচয় পাওয়া মাত্র আমাকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্ত অনুরোধ করলেন। পরে জেনেছিলাম তিনি একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার। তাঁর সঙ্গে বারান্দা দিয়ে অনেকটা পথ যেতে হল, কিন্তু দুজন লোক ছাড়া কোথাও ভিড় দেখ্‌লাম না। দুপাশে অফিস ঘর; সব দরজা বন্ধ, ভিতরে বসে যে যার কাজে ব্যস্ত। কোন হট্টগোল, লোকের ভিড়, গল্প গুজব কিছুই নজরে পড়্‌লো না। অফিসের দরজা আগ্‌লে আধা ঘুমন্ত পিওনের দলও দেখ্‌তে পেলাম না। এ একটা অভিনব অভিজ্ঞতা। লালবাজারের হট্টগোলের কথা মনে পড়ে গেল—কতদিন ধমক দিয়ে গোলমাল থামাতে হয়েছে।

ইন্‌স্পেক্টার কমাণ্ডার ইয়ঙ্ (young) এর কামরার দরজায় টোকা দিয়ে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং উভয়কে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কমাণ্ডার ইয়ঙ্-এর কাছে খবর পেলাম—সহকারী কমিশনার মিঃ হাও (Howe) পুলিশের আন্তর্জাতিক বৈঠকে যোগদান করতে প্যারি (Paris) সহরে গেছেন এবং সেজন্ত আমার ভার তাঁর উপরে পড়েছে। আমার জন্ত আগে থাক্‌তে মোটামুটি একটা কর্ম্মপন্থা স্থির করা ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দরকার মতন অদল বদল করা হল। আমি সর্ব্বত্রই সমাদরে ও সসম্মানে যেতে পেরেছি, যা দেখ্‌তে বা জান্‌তে চেয়েছি সকলেই উৎসাহ করে দেখিয়েছেন; কোথাও বিরক্তির চিহ্ন দেখি নাই; অনেক সময় আমার নিজেরই খারাপ লাগ্‌তো; মনে হ'ত আমি সকলকে কত ব্যতিব্যস্ত করছি। অবশ্যই সব চাইতে বেশী ঝক্কি সাম্‌লাতে হয়েছিল ডিটেকটিভ্ ইন্‌স্পেক্টার ষ্টোনকে নিয়ে—তার উপর ভার পড়েছিল আমার কাজের তালিকা রাখার ও তৎ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা করার। আমাকে প্রত্যেক বিভাগে নিয়ে যেয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে হত; ইয়ার্ডের বাইরে যেতে হলে গাড়ীর ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই তাকে করতে হত। সামান্ত ইন্‌স্পেক্টার হলেও প্রত্যেক বিভাগের কমাণ্ডার, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট চীফ্ ইন্‌স্পেক্টার তাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করেছেন। আমরা কিন্তু আমাদের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের হুকুম সমেত অফিসারকে পাঠালেও সর্ব্বত্র এরকম সহযোগিতা পাই না।

এখানে অনেকগুলি পদের উল্লেখ করছি। সহজ-বোধ্য করার জন্ত বিভিন্ন পদ ও এখানকার পুলিশের মোটামুটি কার্য্য বিধির খসড়া নীচে দিলাম।

কলিকাতার পুলিশের কার্য্যবিধির অনুরূপ একটী নক্‌সাও দিলাম।

লণ্ডন পুলিশের Ao. Deputy Ao. ও Commandant এর পদ যদি, আমাদের Do. ও Ao. ইর সমকক্ষ ধরি, তা হলে লণ্ডনে আমরা পাচ্ছি আমাদের ৩৪ এর অনেক কম, অথচ তাদের পুলিশের সংখ্যা আমাদের দ্বিগুণ।

বিভিন্ন পদের তালিকা দেখলে আর একটা কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে। লণ্ডনে অনেকগুলি বিভিন্ন পদ থাকায় থাপ গুলি হয়েছে ছোট। সে জায়গায় আমাদের থাপ গুলি হয়েছে বড় বড় ও অসংলগ্ন।*

প্রথম নক্‌সা থেকে লক্ষ্য করে থাক্‌বেন—এদের পোষাকধারী ও গোয়েন্দা বিভাগ (C. I. D) পৃথক অর্থাৎ দুই কর্ত্তার অধীন। C. I. D. বিভাগে সকলে সাধারণ ভদ্রলোকের বেশে কাজ করে। পুলিশের লোকের সাধারণ বেশ ছদ্মবেশেরই সামিল; এজন্ত ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত বিশেষ হুকুম ছাড়া পুলিশের লোক সৈনিকদের মতন কোন সময় এমন কি অবসর সময়েও পোষাক ছেড়ে প্রকাশ্যে বার হতে পারত না। পোষাক বিষয়ে এইরূপ কড়াকড়ির কারণ হ'ল ব্যক্তি স্বাধীনতা। আমরা অনেকেই পুলিশের অসাক্ষাতে নানা রকম কথাবার্তা চালিয়ে থাকি; ধারে কাছে পুলিশ রয়েছে, দেখ্‌ছে বা শুন্‌তে পাবে টের পেলে সাবধান হয়ে চলি। পুলিশ যদি আমাদের অজান্‌তে আমাদের ঘরের কথা জেনে ফেলে তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাক্‌তে পারে না। এই কারণে হুকুম হয়েছিল, অপরাধ তদন্ত করতে পোষাক পাবে যদি অপরাধী ধরা সম্ভব না হয় তা হলেই পোষাক বাদ দেওয়া চল্‌বে।

পোষাক পরে চোর, গাটকাটদের উপর নজর রাখা সম্ভব নয়; অথচ ওদের ধর্‌তে হলে অথবা চুরি বন্ধ কর্‌তে হলে কড়া নজর রাখা দরকার। এই কাজের জন্তই প্রথম থেকে সাদা-পোষাকী অর্থাৎ ছদ্মবেশী পুলিশের সৃষ্টি হ'ল।

১৮৭৮ সালে এক বিশেষ তদন্ত কমিটির নির্দ্দেশে ফরাসী দেশের দৃষ্টান্তানুসারে C. I. D. পুনর্গঠিত হয়। প্রথম পাঁচ ছয় বছর ভাল লেখাপড়া জানা সদ্বংশীয় ভদ্র-সন্তানদের গোয়েন্দা হিসাবে নেওয়া হত; কিন্তু—পুলিশের শিক্ষানবিশি না করায় তারা তেমন কাজে সুবিধা কর্‌তে পারে নাই।

আজকাল পোষাকপরা পুলিশের ভেতর থেকে ভাল ভাল লোকদের C. I. Dতে বেছে নেওয়া হয়। কিছুদিন পরখ করে—ভাল প্রমাণিত হলে, ডিটেক্‌টিভ ট্রেনিং স্কুলে পাঠানো হয়; পরীক্ষা পাশ কর্‌লে পাকাপাকি ভাবে C. I. Dতে নিযুক্ত করা হয়। একবার C. I. Dতে ঢুকলে অন্ত বিভাগে যাওয়া চলে না। লণ্ডনের কর্ত্তারা বলেন "অপরাধ তদন্ত-বিশেষজ্ঞের (Expert) কাজ; যে সে লোক তদন্ত কর্‌তে পারে না। এদের আলাদা শিক্ষা দেওয়া হয়; যেখানে এ শিক্ষার কোন মূল্য নেই অথবা কার্য্যকরী নয়, সেখানে এইরূপ শিক্ষিত লোক

* কলিকাতার ইন্‌স্‌পেক্টরেরা সাব ইন্‌স্‌পেক্টরের কাজ করিয়া থাকেন, সুতরাং ১২ ধাপের যায়গায় আমাদের পদস্থ কর্ম্মচারীর কাজ দেখা শুনার ভার প্রকৃতপক্ষে গিয়ে পড়েছে Assistant Commissioner-এর উপর।

পাঠাবার কোন মানে হয় না ; অর্থ ও শক্তির অপচয় মাত্র। এ ছাড়া অপরাধ তদন্ত করতে হলে প্রত্যেক অফিসারের চোর বদমাইসদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়, তাহাদের আবাস, আড্ডা ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান থাকা নিতান্ত দরকার ; ঘন ঘন অদল-বদল করলে নূতন লোকের পক্ষে কাজ করা মুস্কিল হয়ে পড়ে এবং চোর, বদমাইসেরাও এতে আস্কারা পায়।"

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা একটু বলি। আমাদের দেশে সহকারী সব-ইনসপেক্টার ও সব-ইনসপেক্টারেরা সাধারণতঃ কেস্ তদন্ত করে। তাদের তদন্ত সম্পর্কীয় শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। দু' চারজন নিজেদের স্বাভাবিক বা দেবদত্ত ক্ষমতার বলে ভাল কাজ করলে C. I. Dতে যেয়ে পড়ে ; কিন্তু সেখানে স্থিতির কোন স্থিরতা নেই। আজ C. I. D. কাল মটর বিভাগ, পরশু A. R. P. ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার। এই দ্রুত পরিবর্ত্তন অধস্তন কর্ম্মচারিদের মধ্যেই পর্য্যবসিত নয়। যার কোন দিন সামান্য তদন্ত সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, এমন লোকও তদন্ত বিভাগের ভার পেয়ে থাকেন। ফলাফল জনসাধারণ ভোগ করেন ; চোর ডাকাতের হয় সুবিধা।

পোষাকপরা টহলদারী পুলিশ যেমন সর্ব্বদাই জনসাধারণকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, C. I. Dর লোকেরাও ঠিক একই অনুপ্রেরণা নিয়ে কাজ করে। এদের কাজ আরও কঠিন, এদের দিন নেই, রাত নেই, কাজের নির্দ্দিষ্ট কোন হার নেই ; ঘড়ির কাটা ধরা হিসেব নেই। কেস্ এল সঙ্গে সঙ্গে ছোট—হাসিমুখে। এরা জানে লোকে দুঃস্থ না হলে পুলিশের কাছে ছুটে আসে না ; হয় অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে, নয় কোন ব্যক্তির শারীরিক জখম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হচ্ছে সংবাদ দাতাকে আশ্বস্ত করা, সহানুভূতি দেখানো এবং তাড়াতাড়ি অপরাধীকে ধরার ব্যবস্থা করা। অপরাধীকে ধরতে না পারাটা প্রত্যেক অফিসার অতি লজ্জাকর ব্যাপার মনে করে। C. I. Dর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা অনেকেই আমাকে বলেছেন "ছোট-খাটো দু একটা কেস ধরতে না পারলে কিছু আসে যায় না ; কিন্তু একটা রোমাঞ্চকর কেস্ যদি তাড়াতাড়ি কিনারা না হয়, তা হলে আমাদের মাথা লজ্জায় নুইয়ে পড়ে ; জনসাধারণ আমাদের কার্য্যদক্ষতায় আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং আমাদের প্রবল সাংবাদিক মহল আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে দেয়। এ সব কারণে প্রত্যেক C. I. D তার দায়িত্ব ও সুনাম সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ থাকে। সকলের মধ্যে এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান আছে বলেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এত নাম ডাক। গত ১০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৯৫টী মামলার আস্কারা হয়েছে। খুন ছাড়া অন্যান্য অপরাধও খুব উঁচু হারে ধরা পড়ে। এর পর এদের কার্য্যদক্ষতার অন্য প্রমাণের কোন প্রয়োজন হয় না।

(ক্রমশঃ)

বীরভোগ্যা

শ্রীনীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

দশহাজার বছর আগে। বন্য-বর্ব্বরতার যুগে। অ আর আ ব'লে দু'জন জোয়ান ছিল। পাশা পাশি দুটো গুহায় তারা থাকতো। তাদের সংগে থাকতো ই আর ঐ ব'লে দুটো মেয়ে। আধুনিক ভাষায় ব'ললে ব'লতে হয়, ই অ-র স্ত্রী ছিল, আর ঐ আ-র।

একদিন। আদিম পাহাড়ের মাথায় আদিমসূর্য্য তখন ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। ই নদীর জলে ঝুঁকে প'ড়ে তার নিজের ছায়া দেখছিল। অকস্মাৎ অ-র কথা মনে হ'তে তার গা শিরশির্ ক'রে উঠলো। ছায়াতে সে কী দেখলো জানিনা। কিন্তু নিজের সাজানো দাঁতগুলো নিজের ছায়াকে দেখিয়েই সে সহসা মুখ ভেংচে একটা বিচিত্র বন্য-হাঁসি হেঁসে উঠলো!

পাহাড়ের ঠিক মাথায় ব'সে তখন আ একটা পাথরের অস্ত্রে ঘন ঘন শান দিচ্ছিল। হঠাৎ ই-র হাঁসি তার বুকে ঝন্ ক'রে গিয়ে বাঁধলো! অস্ত্রখানা কোমরের বল্কলে গুঁজে ফেলে সে ছুটে নেমে এলো। তারপর ই-কে সজোরে লুফে কোলে তুলে নিয়ে আবার পাহাড়ের চূড়োয় উঠে গেল। সেইখানে গিয়ে ই একটু প্রতিবাদের ভংগীতে হাত-পা ছুঁড়লো। কারণ তার 'পুরুষ' অ আ-র চেয়ে অনেক বেশী জোয়ান ছিল। আর তা' ছাড়া অ থাকলে রোজ রোজ অনেক বেশী বেশী মাংসও খেতে পাওয়া যায়। কাজেই আ-র কাছে ই থাকতে রাজী হ'লো না। কিন্তু যেহেতু ই-র চেয়ে আ-র গায়ে অনেক বেশী জোর ছিল, একটু পরেই ই-র হাত পা ছোঁড়া বন্ধ হ'য়ে গেল। ই আর আ সেদিন পাহাড়ের চূড়োতেই অন্য একটা গুহায় পাশাপাশি শুলো।

অ ফিরে এসে সে-সন্ধ্যায় ই-কে খুঁজে পেলো না। কিন্তু এতো পশু সে যে আজ শীকার ক'রে এনেছে কা'কে তার ভাগ দেবে? একলা তো আর সব খাওয়া সম্ভব নয়! অগত্যা ঐ-কে ডেকে খাওয়ালো। ঐ-ও বাধ্যতায় প'ড়ে, বিশেষ ক'রে আ ফিরলো না দেখে, অনেকটা অ-র গায়ের জোরের কথা ভেবেই সে-রাত্রে অ-র পাশে শুতে আপত্তি ক'রলে না।

পরদিন সকালে অ আর আ দু'জনের দেখা হ'লো। অ ই-কে ফিরে চাইলো। আ 'ফুঃ' ক'রে উড়িয়ে দিলে। তখন হাতাহাতি বাঁধলো। অন্যেরা তাদের লড়তে দিলে। এইভাবেই তখন মীমাংসা হওয়ার নিয়ম ছিল। সুতরাং অ আর আ নিজ নিজ দেহশক্তির ওপর নির্ভর ক'রেই লড়তে লাগলো; অন্যেরা কেউ কারুর পক্ষ নিয়ে পক্ষপাতিত্ব দেখালে না। কেবল ওৎ পেতে রইলো কে হারে। হতভাগ্য অ-ই পা ফস্‌কে একটা খাদে প'ড়ে গেল। খাদ থেকে ওঠা তখনও যেতো না, এখনও যায় না। কাজেই ই বিজয়ী আ-র কাছেই থেকে গেল। সর্দ্দারকে আ বল্লে, ই স্বেচ্ছায় তার কাছে এসেছিল। শুনে সর্দ্দার সে-রাত্তির থেকে ঐ-কে বেমালুম নিজের সম্পত্তি ক'রে নিলে। অন্যান্য মরদরা আ-কে বাহবা দিতে লাগলো 'বীর' ব'লে। কারণ তখন থেকেই বসুন্ধরা 'বীরভোগ্যা' ছিল!

এর পর দশহাজার বছর বাদে। যন্ত্র-সভ্যতার যুগে। মোটরের চাকা, মেসিনের তেল আর কলের ধোঁয়ায় পরিশুদ্ধ হ'য়ে—শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সংস্কৃতিতে পৃথিবী যখন নাকি অনেক এগিয়ে গেছে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশীবছর 'সভ্য' আছে যে-দেশ সেই ভারতবর্ষে মানুষরা গর্ব্ব ক'রে ব'লেছে, 'এই ভারতের মহা-মানবের সাগর তীরে'। বাকি সবদেশের লোকেরা এসে নুনের পুতুলের মতো মিশে গেছে। যা' তা' ব্যাপার নয়! ভাবুন একবার! পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে সভ্যতার আলোক পেয়েছে এই মহান্ দেশ। এমন আলোক, যে অন্য কোনো বিদেশী এসে তা নিভিয়ে দিতে পারে নি। বরং শক হুণদল, পাঠান মোগল চীন, তাতার এরা নিজেরাই সব সেই আলোকে ঝল্‌সে গেছে!

সেই 'মহান্ দেশ' ভারতবর্ষের এক সভ্য-পল্লীগ্রামে দুটি সভ্য-লোক পাশাপাশি বাস ক'রতো। তাদের নাম হ আর ম। তারা নাকি একদেশের লোক ব'লে এক-রকম ভাই-ভাই ছিল। কেবল ধর্ম্ম তাদের আলাদা ছিল। অর্থাৎ মরবার পর দু'জনের দুটো আলাদা আলাদা স্বর্গে যাবার কথা। একে অবশ্য অপরের স্বর্গকে মনে মনে ঘেন্না ক'রতো। তবে মুখ ফুটে ব'লতো না সে-কথা। সভ্যযুগের এই নিয়ম!

দু'জনের বেশ সুখে দিন কাটছিল। কিন্তু একদিন একটা রুটীর টুক্‌রো ভাগাভাগি নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। সভ্যযুগে ঝগড়া হাতাহাতি দিয়ে মীমাংসা হয় না। কাজেই একজন নিরপেক্ষ বিচারক দরকার। সেই সময় সে-দেশে একজন বিদেশী বেণে এসেছিল ব্যবসা ক'রতে। তার চেহারাটা দেখতে ভাল ছিল। সেই দেখে হ আর ম মনে ক'রলে লোকটার চেহারার মতো মনটাও নিশ্চয় সাদা হবে! অতএব তারা দু'জনে তার কাছে আবেদন পেশ ক'রলে। বিচারক আশ্বাস দিলেন সুবিচারের। রুটিটি তিনি নিজের কাছেই রেখে দিলেন। তারপর গোপনে বাড়ী নিয়ে গেয়ে সেটার অধিকাংশ নিজেই খেয়ে ফেল্লেন। তারপর বাকীটুকু থেকে সামান্য সামান্য দু'জনকে ভাগ ক'রে দিলেন। হ-কে ম-র চেয়ে একটু বেশীই দিলেন। আর সুবিচার ক'রে ব'ল্লেন, বাকীটুক্‌রো তাঁর কাছে জমা রইলো, দু'জনের ঝগড়া মিটলে ভাগ ক'রে দেবেন।

ম রাগে ফুলতে লাগলো। হ-কে গালি দিয়ে ব'লতে লাগলো—তার জন্যেই সে আর বেশী রুটী পেলে না। ফলে, মিটমাট করা দূরের কথা, যে রুটীর আসলে কোন অস্তিত্বই আর নেই তার জন্যেই দু'জনে ক্রমাগত ঝগড়া চালাতে লাগলো।

হ বোঝাতে চেষ্টা ক'রলে বিচারক-ব্যাটাই বাকীটুকু মেরে দিয়েছে। সুতরাং নিজেরা ঝগড়া না ক'রে ওকেই শায়েস্তা করা যাক্। ম এক ধমকে সে কথা উড়িয়ে দিলে। এত কাঁচা-ছেলে সে নয়! হ-এর ফাঁদে পা দিয়ে আবার সে বিচারকের সংগেই ঝগড়া বাঁধাবে—যাতে আর কখন কোনো ভাগ না পায়! আর হ তাহ'লে একাই বাকীটুকু বিচারকের কাছ থেকে পেয়ে যায়! 'ওরে

আমার কে রে!' বিদ্রূপ ক'রে ব'ললে ম হ-কে, 'ব্যাটা আবার শয়তানী-বুদ্ধি দিতে এসেছে! ভাগ্!' হ-কে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে ম। ফলে আপোষের সব সম্ভাবনাই নষ্ট হ'য়ে গেল। আর তারপর থেকে সুরু হ'লো আরো তিক্ততা, আরো তীব্র-শত্রুতা। ম-র এখন একমাত্র চেষ্টাই হ'লো—কী ক'রে হ-কে 'আচ্ছা ক'রে' শিক্ষা দেওয়া যায়।

অবশেষে একদিন সুযোগ মিলে গেল। গাঁয়ের আরো কয়েকজন সেই-বিচারকের দ্বারা উৎপীড়িত হ'লো। ম রটিয়ে দিলে, 'এ-সমস্তর মূলেই ঐ শালা হ। বিচারকের সংগে ওর তলে তলে ষড় আছে।' গাঁয়ের লোকেরা তাই বিশ্বাস ক'রে নিলে। বিচারকের ওপর এতদিনে সবারই মন বিষিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিচারকের গায়ে হাত তোলার সাহস কারুর না থাকাতে, তলে তলে তারা যুক্তি আঁটতে লাগলো কী ক'রে হ-কেই জব্দ করা যায়।

সুযোগ একদিন মিললো। বিচারক তখন গাঁ ছেড়ে অনেক দূরে এক পাহাড়ে গিয়েছেন হাওয়া খেতে। গাঁয়ে মাতব্বর আর কেউ নেই। যারা আছে তারা ম-এর দলেরই লোক। সুতরাং একদিন সবাই মিলে হ-র ওপর অতর্কিতে আক্রমণ সুরু ক'রলে। হ-র দল-টল বিশেষ ছিল না। কিন্তু তাতে কী হয়! সভ্যযুগে তো আর 'বর্ব্বরদের' মতো একা একা কোন কাজ করা যায় না! সেটা নিন্দনীয়। কারণ একতাই সভ্যতার নিদর্শন। কাজেই দশে মিলে ম-রা নিঃসহায় হ-কে জোর ক'রে তার বাপের নাম ভুলে যেতে বাধ্য করালে। নতুন নাম দিলে তার নিজেরও। আর যে-স্বর্গে যাবার জন্য হ এতকাল কতো ভালো ভালো প্রার্থনা ক'রে ভগবানের মন প্রায় ভিজিয়ে এনেছিল, সেই চেনা-স্বর্গে হ যাতে কখন না যেতে পারে, তার জন্য জব্দ করার মতলবে ম তাকে নিজের ধর্ম্মে জোর ক'রে দীক্ষিত ক'রে নিলে। শুধু তাই নয়, পাছে মৃত্যুর পর তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হ তার আগের-স্বর্গেই বে-পথ দিয়ে ফস্কে চ'লে যায়, সেইজন্যে রোজ রোজ হ-কে দিয়ে নিজেদের-স্বর্গে যাবার জন্য ভগবানের কাছে আলাদা-প্রার্থনা করাতে লাগলো। হ অবশ্য অচেনা-স্বর্গে যেতে বিলকুল নারাজ ছিল। কিন্তু যেহেতু আপনি বাঁচলে তবে বাপের নাম, সেই কারণে তার স্বর্গীয়-বাপ তাকে মরার সময় পই পই ক'রে যে-স্বর্গে গিয়ে দেখা ক'রতে ব'লে গিয়েছিলেন সেই-স্বর্গে যাওয়ার আশা হ আপাততঃ বেঁচে-থাকার স্থূল ইচ্ছা বশতঃ ছেড়ে দিলে।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, অতো ঝঞ্ঝাট না ক'রে ম-রা হ-কে মেরে ফেললো না কেন! শত্রুতা থাকলে তো লোকে শত্রুর নাশ করার জন্যই প্রাণপণ করে। কিন্তু ম তা না ক'রে উল্টে শত্রুকে নিজেদের পাসপোর্ট পাইয়ে দিয়ে ফোকটে হ-র স্বর্গলাভ করার পথই পরিষ্কার ক'রে দিলে কেন? ক্ষতি ক'রে তার স্বর্গের পথ বন্ধ না ক'রে উল্টে ভালই ক'রে দিলে, এ আবার কেমন শত্রুতা! কেমন নয়, সভ্যযুগে এই হ'লো নিয়ম। দেখ্ছি, সভ্যতার আপনারা কিছুই খবর রাখেন না। এটা কী দশ হাজার বছর আগের সেই বন্য-বর্ব্বরতার যুগ, যে শত্রুতা হ'লো তো একে অপরকে নিধন ক'রে হাতাহাতি লড়ায়ে মীমাংসা ক'রে নিল! এটা হ'লো সভ্যতার যুগ। এখন দুম্ ক'রে প্রাণে মেরে শাস্তি দেওয়াটা নিতান্ত অসভ্য-প্রথা ব'লে গণ্য হয়। কারণ মেরে ফেল্লেই তো ফুরিয়ে গেল! তা হ'লে শাস্তি দেওয়া কী ক'রে হ'লো! ওসব ফাঁকি এখন পাবেন না। দেখলেন না, সেইজন্য গোয়েরিং লোকটা অসভ্যের মতো সুড়ুৎ ক'রে আগেই মরে গিয়ে শাস্তিটাকে এড়িয়ে গেল ব'লে সভ্য লোকদের কতো আফশোষ! সুতরাং এখন পট্ ক'রে মেরে ফেলে কাউকে শাস্তি এড়িয়ে যেতে দেওয়া হয় না। কই মাছের মতো জিইয়ে রেখে তার মনের ওপর উৎপীড়ন করা হয়। কারণ মন তো আর চট্ ক'রে মরে না। কাজেই বেশ চেখে চেখে তার শাস্তিটা উপভোগ করা যায়।

অতএব হ-কে ধর্ম্মচ্যুত ক'রে ম তার মনের ওপরে প্রথম এক চোট নিলে। এতে হ-র দেহ ঠিক রইলো বটে, কিন্তু মন রক্তাক্ত হ'য়ে গেল। তাতে ম-র আরো উৎসাহ বাড়লো। কারণ সভ্যযুগে রক্ত দেখলে ক্ষুধা বাড়ে! কাজেই ম তার ক্ষুধা চুটিয়ে মিটিয়ে নিতে লাগলো।

এখন আপনারা যদি আবার ভাবতে থাকেন যে এর পর ম খুব ক'রে হ-র ঐ রক্তাক্ত মনটাই উল্লাসের দূরবীণ ক'সে ক'সে কেবল দেখতে লাগলো, তবে—

আপনাদের ভাববার-শক্তি সম্বন্ধে আমাকে একেবারে হতাশ হ'তে হবে! কারণ, অতো কাঁচা বুদ্ধি ম-র মোটেই নয় যে ব'সে ব'সে একটা পুরাণো খাদ্যই সে রোজ খাবে! সে রীতিমত জ্ঞানী। তার ওপর সভ্য, আর শাস্ত্র জানে। সে জানে সভ্যশাস্ত্রে লেখা আছে 'দুষ্ট চারা সমূলে উৎপাটন ক'রবে।' সুতরাং কেবলমাত্র হ-কে উৎপাটন ক'রে কী হবে! অতএব ম আবার 'দশে মিলে' একতাবদ্ধ হ'য়ে হ-র বাড়ী গিয়ে চড়াও হ'লো। সেখানে হ-র ছেলেমানুষ বউ ন তখন ছোট একটা ছেলে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমুচ্ছিলো।

ম সোজা লাথি মেরে বীরদর্পে দরজা ভেঙে ন-র ঘরে ঢুকে গেলো। তারপর কোলের ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে দুটুক্‌রো ক'রে পেছনের খালে ফেলে দিয়ে বাড়্‌তি জঞ্জাল কমিয়ে দিলে। তারপর ন-কে জোর ক'রে জাপ্‌টে ধ'রে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে চল্লো।

ঘরে এসে সাড়ম্বরে ম এক সভা ডাকলো। তারপর সভ্য-প্রথাসম্মতভাবে সেই সভায় হ-র নাকের ওপরই ন-কে সে বিয়ে ক'রলে। ন অবশ্য প্রাণপণ বাধা দিলেন। কিন্তু ম-র গায়ে ন-র চেয়ে অনেক বেশী জোর ছিল এবং তাঁর স্বামীদেবতাটিও অর্থাৎ হ, দলে ভারী নয় ব'লে নিজের প্রাণের সম্বন্ধে এমন ভয়ানক ভয় বোধ ক'রতে লাগলো, যে নারীধর্ম্মের সম্মানের জন্য জীবনের শেষ-রক্তবিন্দুটি দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত না ল'ড়ে কাপুরুষের মতো আগেই হার স্বীকার ক'রে নিলে। কাজেই ম বিনা বাধাতে ন-কে শুধু যে নিজের অংকশায়িনীই ক'রে নিলে তাই নয়, পাঁচজনের কাছে গর্ব্ব ক'রে ব'ললেও যে, ন স্বেচ্ছায়ই তার কাছে চ'লে এসেছে। ন-র মনের খবর অবশ্য কেউ জানতে চাইলে না। কারণ সনাতন সত্যধর্ম্ম অনুযায়ী মেয়েদের 'মন' ব'লে বস্তুটা থাকে না।

এর পর ম-র অন্যান্য লোকেরা ম-কে 'বীর' ব'লে বাহবা দিয়েছিল কিনা ঠিক জানি না। তবে না দিয়ে থাকলে, দেওয়া উচিত ছিল! কারণ সভ্য লোকেরা বলেন, বসুন্ধরা নাকি আজও 'বীর ভোগ্যাই' আছে !!

স্বরূপ

শ্রীআভা দেবী

নাস্তিকের মত দম্ভ—স্পর্দ্ধা-ভরে
উচ্চে তুলি শির,
পাপ-পুণ্য কলরবে নিরন্তর
হ'তেছি অধীর।
বিচার বিতর্ক মাঝে ভাল মন্দ সন্দেহ ভাবনা,
জানি আমি অনুক্ষণ করিছি বঞ্চনা—
তোমার অনন্ত প্রেম হ'তে,
তবু চলি চিরন্তন সেই দ্বন্দ্ব স্রোতে।
তোমারে পাবার আশে তোমারে হারাই
যত খুঁজি, তত বুঝি, তুমি সেথা নাই।
দেহেরে ফেলিয়া দূরে অন্তরের পরম সম্পদ
অনুক্ষণ করেছি সাধনা—
আলোকে স্বরূপ তব মানি,
অন্ধকারে ভেবেছি ছলনা।
কামনারে বিবর্জ্জিয়া নিষ্কামের ভরিয়া অঞ্জলি
হেথা বসি কাটে মোর ব্যর্থ দিনগুলি।

মনে হয়, কিছু নয়, আলোকের তীব্র অহঙ্কার,
কেবল আড়ালে রাখে নির্ব্বিকার স্বরূপ তোমার।
প্রতিক্ষণে, প্রতি রূপে, প্রতি চিত্ত মাঝে,
কাম, ক্রোধ, মোহ মাঝে যে কথা বিরাজে,
হে সুন্দর সে কি তুমি নহ?
আলোকের দূত শুধু তুমি
আঁধারের নহ বার্ত্তাবহ?
নিবিড় নিশিথ রাত্রে নিকষ আঁধার,
নয়নে রাখিয়া যায় আনন্দের স্নিগ্ধ সমাচার।
হৃদয়ে রাখিয়া যায় সুদূরের পরম রাগিনি,
আমি জানি যে তোমারি বাণী।
হীন চক্ষে দেখি তাই অতি হীন এ বিশ্ব সমাজে
তোমার মরন দীপ যে আঁখিতে রাজে
সে আঁখিতে কোথায় আঁধার?
সংকীর্ণ মনের মোহে ভেদ জ্ঞান ভ্রষ্ট নয়নের
নহে তো প্রস্থার।

সাধুবাবা

বিজ্ঞপ্তি : বাবাজীর কবচ ধারণে—বশীকরণ বিদ্যা অব্যর্থ। অন্যথায় মূল্য ফেরত দেওয়া হয়। শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

বার্লিনে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব

গত জুন মাস হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; বিরোধের ক্ষেত্র জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিন। জুন মাসে লণ্ডনে ছয়টি শক্তির এক সম্মেলনে পশ্চিম জার্ম্মাণীতে অর্থাৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চলে স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিম জার্ম্মাণীতে প্রবর্ত্তিত হয় স্বতন্ত্র মুদ্রাব্যবস্থা। জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিন সোভিয়েট এলাকায় অবস্থিত। কিন্তু সমগ্র জার্ম্মাণীর মত বার্লিনেও চারিটি বিজয়ী শক্তির কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত—সমগ্র নগরটি চারিভাগে বিভক্ত। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পশ্চিম জার্ম্মাণীতে প্রবর্ত্তিত মুদ্রাব্যবস্থা তাঁহাদের অধিকৃত পশ্চিম বার্লিনেও চালাইতে চেষ্টা করেন। ইহা হইতেই গোলযোগের সৃষ্টি; সোভিয়েট রুশিয়া পশ্চিম বার্লিন অবরোধ করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করাইতে চাহে। ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ বিমানযোগে জিনিসপত্র যোগাইয়া সোভিয়েট রুশিয়ার অবরোধ ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করেন; সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁহাদের হুমকী। গত কিছুকাল ধরিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের যে বিরোধ চলিতেছে, ইহাকে রসিক সমালোচকরা "শীতল সংগ্রাম" বা "স্নায়ু-যুদ্ধ" নাম দিয়াছেন। বার্লিন উপলক্ষ করিয়া এই সংগ্রাম উষ্ণ হইয়া উঠিতে পারে, স্নায়ুর পরিবর্ত্তে পেশীর সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রচারটা প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত "শীতল সংগ্রামেরই" অঙ্গ, অর্থাৎ যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সোভিয়েট রুশিয়াকে নতি স্বীকার করাইবার চেষ্টা। কিন্তু সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ কিছুমাত্র নমনীয়তা প্রকাশ করেন নাই। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কড়া চিঠির ততোধিক কড়া উত্তরে তাঁহারা জানাইয়াছেন—পশ্চিম জার্ম্মাণীতে স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে ১৯৪৫ সালের পোটস্‌ড্যাম্ চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে। সুতরাং সেই চুক্তি এখন অচল; সেই চুক্তি অনুসারে বার্লিনে চতুঃশক্তির কর্ত্তৃত্ব আর চলিতে পারে না। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ জানাইয়াছিলেন যে, সমগ্র জার্ম্মাণী সম্পর্কে তাঁহারা আলোচনা করিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে পশ্চিম বার্লিনের অবরোধ তুলিয়া লইতে হইবে। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট উত্তর—আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে তাঁহারাও প্রস্তুত, কিন্তু অবরোধ তুলিয়া লওয়ার সর্ত্ত তাঁহারা মানিবেন না। ইতিমধ্যে পশ্চিম জার্ম্মাণীর ১০ লক্ষ অধিবাসীকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা সোভিয়েট রুশিয়া করিয়াছে। বিমানযোগে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সরবরাহ সম্পর্কে প্রচারটা যত ঢাক ঢোল পিটাইয়া হইতেছিল, প্রকৃতপক্ষে উহাতে কাজটা তত হইতেছিল না। ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ হম্বি তম্বি করিয়া, অনেক পাঁয়তাড়া কষিয়া শেষ পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা মস্কোয় রুশ পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভের সহিত—প্রয়োজন হইলে মঃ ষ্ট্যালিনের সহিত সমগ্র ব্যাপারটি আলোচনা করিবেন। বর্ত্তমানে মস্কোয় এই আলোচনার ব্যবস্থা হইতেছে।

বার্লিনে দুই পক্ষের এই বিরোধ আকস্মিক নহে; বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। ১৯৪৫ সালের পোটসড্যামের চুক্তিতে স্থির হয় যে, জার্ম্মাণী হইতে নাৎসীবাদ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে হইবে, জার্ম্মাণীর আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তি ধ্বংস করিতে হইবে, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ নূতন জার্ম্মাণী গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সকল সর্ত্ত যথাযথ পালন করা মার্কিণ নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পক্ষে সম্ভব নহে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর পররাষ্ট্রনীতি দ্বিবিধ; এক দিকে সে মার্কিণ নেতৃত্বে জগতের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সংহত করিতে চায়, অন্য দিকে সে পৃথিবীব্যাপী সোভিয়েট-বিরোধী সমরায়োজন সুসম্পূর্ণ করিতে প্রয়াসী। জার্ম্মাণীতে নাৎসীবাদের উচ্ছেদ করিতে হইলে ক্রুপস্, থাইসেন্ প্রভৃতি হিটলারের সহযোগী পুঁজিপতি শ্রেণীর উচ্ছেদ চাই। ইহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর নীতির বিরোধী। সোভিয়েট-বিরোধী সমরায়োজন পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য পশ্চিম জার্ম্মাণীর রূঢ় প্রভৃতি অঞ্চলের সমরশিল্প অক্ষত রাখাও তাহার প্রয়োজন। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে আমেরিকার তৎপরতা সম্পর্কে লণ্ডনের "নিউ ষ্টেট্সম্যান্ ও নেশান" পত্রিকা লিখিয়াছেন, "গোঁড়া পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণের দাবী সে ত্যাগ করিয়াছে; বিদেশস্থিত জার্ম্মাণ সম্পত্তি গোপন রাখায় সে আপত্তি করে নাই, শ্রমশিল্প প্রভৃতি জাতীয়করণ সম্পর্কে বৃটেনের যে মৃদু প্রচেষ্টা, উহা হইতে জার্ম্মাণ শ্রমশিল্পপতিদিগকে সে রক্ষা করিতেছে। আমেরিকা এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় যে, পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর (অর্থাৎ সোভিয়েট প্রভুত্বাধীন অঞ্চলের) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কর্ত্তৃক পশ্চিম অঞ্চলের পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রভাবিত হইবার মত কোনও সর্ত্তে জার্ম্মাণী ঐক্যবদ্ধ হইবে না।" পোটস্‌ড্যাম চুক্তির ভিত্তিতে এইরূপ নীতির সহিত কোনও আপোষ সম্ভব নহে। তাই জার্ম্মাণী সম্পর্কে গত তিন বৎসর যাবৎ বহু সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে জার্ম্মাণী সম্পর্কে সর্ব্বসম্মত মীমাংসার শেষ হইয়া গিয়াছে। "নিউ ষ্টেট্সম্যান" মার্কিণ নীতি যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন; পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বারা পশ্চিম জার্ম্মাণীর গোঁড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে প্রভাবিত হইতে দিতে আমেরিকা কিছুতেই প্রস্তুত নয়। এইরূপ অবস্থায় জার্ম্মাণীকে বিভক্ত করা ব্যতীত গত্যন্তর কি? পূর্ব্বাঞ্চলে সোভিয়েট প্রভুত্বাধীন এলাকার অর্থনীতি তো পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের আদেশে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না! জার্ম্মাণী সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আপোষ আলোচনার প্রকাশ্য অভিনয় চলিবার সময় পশ্চিম জার্ম্মাণীকে স্বতন্ত্র করিবার আয়োজন

চলিতেছিল। প্রথমে ট্রুম্যান নীতি অনুসারে পশ্চিম ইউরোপকে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংহত করিবার জন্য জোর প্রচার চলে, ইহার পর তথাকথিত "বেনেলিউক্স ইউনিয়ন" নামে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক মিলন সাধিত হয়। তাহার পর, পশ্চিম জার্ম্মাণীতে বৃটিশ, মার্কিণ ও ফরাসী এলাকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া ঐ অঞ্চলকে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গত জুন মাসের লণ্ডন সিদ্ধান্তে এই আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; স্বতন্ত্র মুদ্রার প্রচলন এই আয়োজনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিম জার্ম্মাণীর রূঢ়ে সোভিয়েট রুশিয়াকে বাদ দিয়া ৬টি শক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই হইয়াছে।

এই সব উদ্যোগ আয়োজনের ফলে বার্লিনের অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মত হইয়াছে। পশ্চিম জার্ম্মাণী যদি সর্ব্ব দিক হইতে সোভিয়েট-বিরোধী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট এলাকার অভ্যন্তরে বার্লিন সহরের ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্তৃত্বাধীন অংশটা ঐ শিবিরের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটী (Advanood Post) হইয়া দাঁড়ায়। সোভিয়েট রুশিয়া এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন চায়। তাহার মনোভাব এই—জার্ম্মাণী যদি সত্যই স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট এলাকায় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ঘাঁটী সে সহ্য করিবে না।

বার্লিন সম্পর্কে মস্কো আলোচনায় একটা সাময়িক মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু বার্লিনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অবস্থানের প্রশ্নটা সমগ্র জার্ম্মাণী সংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। জার্ম্মাণী সম্পর্কে মার্কিণ নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নীতি আমূল পরিবর্ত্তিত না হইলে বার্লিন সম্পর্কে স্থায়ী সুমীমাংসা অসম্ভব। কিন্তু এই নীতি এখন আর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। মস্কোর পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ নিজেদের মান বাঁচাইয়া বার্লিন সম্পর্কে একটা জোড়াতালি দিবার চেষ্টা করিবেন। পক্ষান্তরে, সোভিয়েট রুশিয়া এইরূপ একটা ব্যবস্থা আদায় করিবার চেষ্টা করিবে, যাহার ফলে পরবর্ত্তী ধাক্কায় বার্লিন হইতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে বহিষ্কার করা সম্ভব নয়।

এই সম্পর্কে একটি কথা, হয়ত নিশ্চয়তার সহিত বলা যায়; বার্লিন উপলক্ষ করিয়া অবিলম্বে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। মার্কিণ রণপিপাসুরা যতই বাহবাস্ফোট করুক না কেন, বর্ত্তমান অবস্থায় ইউরোপে সোভিয়েট রুশিয়াকে যুদ্ধে আহ্বান করিবার সাহস তাহাদের নাই। সোভিয়েট রুশিয়া যুদ্ধ চাহে না; তাহার রণ-ক্ষত সংস্কারসাধনে এখনও বিলম্ব অনেক। তবে সে বর্ত্তমান ইউরোপের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ এবং অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা ভালভাবে জানে এবং এই অবস্থায় পাশ্চাত্য শক্তিগুলির রণহুঙ্কারের যে কোনই মূল্য নাই, ইহা সে বোঝে। এই জন্যই সে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে বার্লিন সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে; প্রয়োজন হইলে অন্য ক্ষেত্রে কঠোর হইতেও সে ইতস্ততঃ করিবে না।

প্যালেষ্টাইন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত

প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের নিকটবর্ত্তী হয় নাই। এক মাস যুদ্ধ-বিরতির ব্যর্থ আলোচনায় অতিবাহিত হইয়াছে। জাতি-সঙ্ঘের সালিশ কাউণ্ট বার্ণাদোত্তে লেক্ সাক্সেসে যাইয়া প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। নিরাপত্তা পরিষদের আদেশে পুনরায় দশ দিনের জন্য প্যালেষ্টাইনে দুই পক্ষের বিরোধ বন্ধ আছে। এই সময়ের মধ্যেও সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হইতে পারিবে কি না, সন্দেহ।

প্যালেষ্টাইন একটি আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র; এখানকার সমস্যা স্থানীয় সমস্যা নহে—আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা। মিঃ হেন্‌রী ওয়ালেস্ প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, "মধ্য প্রাচ্যের তৈল-ব্যবসায়ে ইঙ্গ-মার্কিণ এক চেটিয়া অধিকারই মার্কিণ-রুশ ও ইহুদী-আরব বিরোধের মূল।" মধ্য-প্রাচ্যের তৈল ক্ষেত্রে এই এক-চেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই অতি ধূর্ত্ততার সহিত ইহুদী-আরব বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাহিরের শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিলে এই বিরোধ কখনই এতদূর তীব্র হইয়া উঠিতে পারিত না। মধ্য-যুগীয় আরব নৃপতি এবং ইহুদী ধনিক শ্রেণী বৈদেশিক শক্তির অনুচররূপে কাজ করিয়া প্যালেষ্টাইনে গৃহ-যুদ্ধের আগুন জ্বালাইতে পরোক্ষে সাহায্য করিয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অভ্যস্ত কৌশল। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে এই কৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে পরিপূর্ণভাবে।

মিঃ ওয়ালেসের এই কথাও সত্য যে, তৈল-ব্যবসায়ে ইঙ্গ-মার্কিণ একচেটিয়া অধিকার মার্কিণ-রুশ বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ। এই একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়াকে মধ্যপ্রাচ্য হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। এই প্রয়োজনের তাগিদেই প্যালেষ্টাইন্ সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘ কোনও সুনির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্যালেষ্টাইন্‌কে আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব জাতি-সঙ্ঘে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক সামরিক শক্তি-প্রয়োগ করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাজী হয় না; কারণ সোভিয়েট রুশিয়াকে বাদ দিয়া জাতি-সঙ্ঘের আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী গঠিত হইতে পারে না। এই ভাবে ইচ্ছা করিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারটিকে গৃহ-যুদ্ধের রূপ লইতে সাহায্য করিয়াছে। এখন অত্যন্ত কৌশলের সহিত সোভিয়েট রুশিয়াকে বাদ দিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির ঈপ্সিত পন্থায় এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। কাউণ্ট ফোক্ বার্ণাদোত্তে নামক যে সালিশটি নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের লোক। ইনি প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘকে কঠোরতা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন বটে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনী নিয়োগ করিতে বলেন নাই—তিনি চাহিয়াছেন যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য সামরিক "পর্য্যবেক্ষক।" এখন এক একটি দেশ হইতে এক হাজার করিয়া "পর্য্যবেক্ষক" প্যালেষ্টাইনে যাইতেছে। যে সব দেশ হইতে

পর্য্যবেক্ষকের নামে এক হাজার করিয়া সৈন্য পাঠান হইতেছে, তাহারা প্রত্যেকেই ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের অনুগত। এইভাবে অতি ধূর্ত্ততার সহিত সোভিয়েট রুশিয়াকে বাদ দিয়া প্যালেষ্টাইনে সামরিক শক্তি প্রয়োগের আয়োজন পূর্ণ করা হইতেছে। সোভিয়েট রুশিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের এই অভিসন্ধি বুঝিয়াছিল বলিয়াই ইস্রাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র সে উহাকে স্বীকার করিয়া লয়; মধ্যপ্রাচ্যে নাসিকা প্রবেশ করাইবার সুক্ষ্ম রন্ধ্র সৃষ্টি করে।

প্যালেষ্টাইনে সামরিক শক্তি প্রয়োগের এই যে কৌশলী আয়োজন, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে হয় না। আরব রাষ্ট্রগুলির নৃপতিরা যতই চীৎকার করুন, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিকে তাঁহারা সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে পারেন না; অর্থনৈতিক দিক হইতেও এই দুইটি শক্তির প্রতি তাঁহারা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আরব ও ইহুদী পক্ষের উগ্রপন্থীদিগকে ভয় দেখাইয়া নিষ্ক্রিয় রাখিবার জন্য সামরিক আয়োজন করিয়া রাখা হইল। ইহার পর, প্যালেষ্টাইন তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃত্ব যাহাতে শিথিল না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমস্যা সমাধানের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। সে প্রস্তাবে দুই পক্ষকে সম্মত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না। খুব সম্ভব আপাততঃ একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা হইবে এবং এই অস্থায়ী ব্যবস্থার কাল অতিক্রান্ত হইয়া স্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিণ চাই বার্ণাদোত্তে ও তাঁহার "পর্য্যবেক্ষক" বাহিনীকে প্যালেষ্টাইনে রাখিবার প্রস্তাব হইবে। মোট কথা, অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে প্যালেষ্টাইনের আরব ও ইহুদীদের কণ্ঠে সাম্রাজ্যবাদীর বন্ধন রজ্জুই দৃঢ়বদ্ধ হইতে যাইতেছে।

মালয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধ

সমগ্র মালয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে কমুনিষ্টদের তৎপরতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার বৃথা চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু অভ্যুত্থান যে সমগ্র মালয় রাজ্য ব্যাপী, এখানকার অধিবাসী মালয়ান্, চীনা, ভারতীয় সকলেই যে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, এই সত্য চাপা দেওয়া আর সম্ভব হইতেছে না। মালয়ের গেরিলা বাহিনী সম্পর্কে জনসাধারণ কোনও সংবাদ পুলিশকে জানায় না, তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও সাক্ষী দিতে রাজী হয় না। মালয়ান্ গেরিলা বাহিনী রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বৃটিশ মালিকের রবারের বাগিচা ও খনি প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করিতেছে; যেখানে তাহারা এতদিন নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, সেখানে তাহাদের জীবন আজ বিপন্ন। গেরিলাদের দমন করিবার জন্য হংকং হইতে সৈন্য গিয়াছে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে সমরোপকরণ গিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই ফল হইতেছে না। একটা জাগ্রত জাতিকে দমন করা কিরূপ অসাধ্য, মালয়বাসী তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। বৃটিশেরই হিসাব—গেরিলাদের সংখ্যা এক লক্ষের কম হইবে না; থানা এবং সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া তাহারা দ্রুত অস্ত্রসজ্জিত হইয়া উঠিতেছে। অদৃষ্টের পরিহাস, গেরিলারা এখন যে সব অস্ত্র ব্যবহার করিতেছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৃটেন এবং তাহার সহযোগীরাই তাহার অধিকাংশ সরবরাহ করিয়াছিল।

মালয়ে আজ যাহারা বৃটিশ-বিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত, তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি। সম্প্রতি পুলিসের সহিত সঙ্ঘর্ষে একজন গেরিলা নেতা নিহত হন। তিনি একজন ক্যাপ্টেন; ইনি মালয়ের জাপ-বিরোধী পিপ্‌লস্ আর্ম্মির পক্ষ হইতে লণ্ডনে ভিক্টরী প্যারেডে যোগ দিয়াছিলেন। এই পিপ্‌লস্ আর্ম্মির জাপ-বিরোধী যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য এক সময় মিত্রপক্ষ বিমানযোগে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিতেন।

মালয়বাসী এতকাল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও তাহার অনুচর দেশীয় নৃপতিদের শাসনে ও শোষণে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় তাহারা আশা করিয়াছিল যে, জাপানীরা তাহাদের বন্ধনদশা ঘুচাইবে। কিন্তু এই এশিয়াবাসী সাম্রাজ্যবাদীর শৃঙ্খল বিন্দুমাত্র সুসহ হয় না। অল্পকালের মধ্যে সমগ্র দেশে জাপ-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া মালয়বাসীর স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, তাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় হইল, জাপানীদের কবল হইতে মালয়বাসী মুক্তি পাইল; কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিল না, তাহাদের অতীতের শাসক ও শোষক শ্রেণী বাহিরের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আবার তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে আসিল। শুধু তাহাই নহে, যুদ্ধের পর আসিল দেশব্যাপী দুঃখ, কর্ম্মহীনতা, পণ্যসামগ্রীর দুর্ম্মূল্যতা, দিকে দিকে শ্রমিক-বিক্ষোভ দেখা দিতে লাগিল। বৃটিশ প্রভুরা ইহাকে কমুনিষ্টদের উস্কানি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, এই প্রচারে বিদেশে কোনও ফল হইয়াছে কিনা, তাঁহারাই বলিতে পারেন। কিন্তু মালয়ে এই শ্রমিক-বিক্ষোভে ঐ রাজ্যের সমগ্র অধিবাসীর মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত হইয়াছিল; আজ সেই বেদনাই মুক্তিকামী মালয়বাসীকে গেরিলা তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা

অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা'র প্রথম স্তবক প্রকাশিত হওয়ার পর তাহার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় দেশে প্রতিকূল সমালোচনাই হইয়াছে অধিক। এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ যে কিছু আছে তাহা নিশ্চয় সত্য, যেহেতু সকলে যে "পরিভাষা সংসদের" উপর পূর্ব হইতেই কোন বিরূপ মনোভাব লইয়া সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা নহে। বিশেষ করিয়া ইংরেজী-শিক্ষিত জনসাধারণ ও ছাত্রবৃন্দ এই পারিভাষিক শব্দগুলি একবার শুনিয়াই এই অদ্ভুত আমদানি শব্দগুলির প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিয়াছেন এবং কথায়-বার্তায় ও আলোচনায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন—ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু এই পারিভাষিক শব্দগুলির প্রতি দেশব্যাপী শিক্ষিত সাধারণের এই বিরূপতার কারণ কি? আমি এই প্রবন্ধে বিশেষজ্ঞগণকে বাদ দিয়া সাধারণ জনগণের মনোভাবের দিক হইতে বিষয়টির আলোচনা করিতেছি।

প্রথমত, বহুব্যবহৃত বহুপ্রচলিত 'পুলিস' (Police) শব্দটির স্থানে পরিভাষা সংসদ কৃত "আরক্ষা" শব্দটিকে আমরা অন্তরের সহিত পরিত্যাগ করিতে চাহিব। ভারতবর্ষে বহু প্রদেশে গ্রামবাসীদের মধ্যেও "পুলিস" শব্দ পরিচিত, ইহা বর্জন করিবার অজুহাত কি? "ডাক বিভাগ" না বলিয়া "প্রৈষ বিভাগ" আমরা বলিব কি? ডাক শব্দটিও বাংলার সীমার বাহিরেও প্রচলিত—ডাকঘর, ডাকখানা, সকলেই জানে। "Clerk" বা "কেরাণি" ছাড়িয়া "করণিক", রেজিষ্টার (Registrar) স্থলে "নিবন্ধক", টাইপিষ্ট (Typist) স্থলে "মুদ্র-লেখক", ব্যাঙ্ক (Bank) স্থলে "অধিকোষ", এই জাতীয় নূতন শব্দগুলির কোন প্রয়োজন আছে কি? দ্বিতীয়ত, উপ-মহাকারাপরিদর্শক" (Deputy Inspector-General of Prisons), উপ-প্রাদেশিকপরিবহন-মহাধ্যক্ষ" (Deputy Provincial Transport Commissioner), "মহানিবন্ধ পরিদর্শক" (Inspector General of Registration) প্রভৃতি নব-সংকলিত শব্দগুলি জনসাধারণের নিকট অবোধ্য এবং বিকটশ্রবণ বলিয়া মনে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতোই কিছুদিন অস্বস্তি ঘটায়,"—আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে নব-সংকলিত শব্দগুলি নূতন বলিয়াই আমাদের অস্বস্তি ঘটাইতেছে কিনা।

একজন সমালোচক নব-সংকলিত পারিভাষিক শব্দগুলির সাহায্যে কয়েক পংক্তি বাংলা রচনা করিয়া শব্দগুলির দুর্বোধ্য-শ্রুতিকটুতাদি দোষের ব্যঙ্গ উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পারিভাষিক শব্দগুলি নিত্য ব্যবহৃত গার্হস্থ্য শব্দাবলী নয়—শিশু বড় হইবার সময় ঘরে কথাবার্তার মধ্যে এই শব্দগুলির সহিত পরিচয় লাভ করে না, বিদ্যালয়ে পাঠ-শিক্ষাকালে শিক্ষকের ও গ্রন্থের সাহায্যে এই শব্দগুলি সে শিক্ষা করিতে পারে। বিনা ব্যাখ্যায় একরাশি নূতন পারিভাষিক শব্দ কয়েক পংক্তিতে সজ্জিত করিলে পাঠকের মনে আতঙ্ক বা হাস্যরসের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। ইহা শব্দগুলির যথাযথ পরিচয় দান নহে। রচনাদর্শটির কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

"আপ্ত-করণিক বলেন, স্থানপালের নিকট গেলেই আপনার এধের সমাচার মিলিবে। স্থানপাল বলেন, এখানে নয়, মহা-আরক্ষা পরিদর্শকের নিকট যান। মহা-আরক্ষা-পরিদর্শক জানান, অগার-সহায়কের স্মারক ভিন্ন কিছুই হইবে না—নিবেশন-অধিকারিকও দাবী করেন, ব্যাপার-নির্বাহকের-অনুস্মারক চাই।"

ইহা পাঠ করিয়া এক ব্যক্তি ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন আর একটি ব্যঙ্গ উদাহরণ রচনা করিয়াছেন। সেইটি—"আপনার সঙ্গে appointment ছিল, কিন্তু sorry আপনাকে entertain করতে পারছি না, excuse me। আমার এক cousin brother আজ death-bedএ, তার condition serious। আমাদের servantএর একটা telegram আজ morningএ receive করেছি। আপনার advice কি? আর late না করে immediately start করাই আমার duty, কি বলেন? without fail আমাকে train ধরতে হবে। Busএ ভারি rush। cycle নিয়ে short cut করে Lindsay street ধরে townএ গিয়ে Mr. Dasএর stationery shopএ cycleটি deposit রাখার একটা arrangement করতেই হবে। stationএর gateএ friendটি থাকলে বুঝবে good luck। ticket করার time নেই বলে, friend ভিতরে ঢুকতে allow করবে জানি; কিন্তু checker উঠে ticket check করতে পারে। guardকে inform করে দিলেই চলবে, next stationএও ticket করা যেতে পারে। Time short বলেই যত anxiety, তা না হ'লে don't care করতাম, আমার wifeও সঙ্গে যাবে কিনা।"

এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথে অবশ্য প্রকৃত বিষয় বোঝা যাইবে না।

উদ্ধৃত দ্বিতীয় উদাহরণটিতে অজ্ঞানের মধ্যে অত্যধিক ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিয়া বিকৃত বাংলা রচনা করা হইয়াছে, তথাপি অনেকেই স্বীকার করিবেন যে ইংরাজিশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বাঙালীর ঘরের বাহিরে বিশেষ করিয়া সমশ্রেণীর বন্ধুমহলে কথা বলিবার ভাষা বহুলাংশে ঐ জাতীয় এবং সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ ঐরূপ। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালী রাজভাষা ইংরাজিকে বিজেতার ভাষা, শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন—হীন বাংলাভাষার মধ্যে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিলে বিশিষ্টতার পরিচয় দেওয়া হয়। আমাদের সান্ত্বনার কথা এইটুকুই যে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের যুগ হইতে আমাদের মধ্যে যে জাতীয় অভিধানবোধের অপর একটি বিপরীতমুখী প্রবল স্রোতধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের প্রিয় বাংলাভাষাকে এই

অপমানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। কথ্যভাবে চলিলেও কোন বাঙালীই লিখিবার সময় দ্বিতীয় রচনাদর্শটির মত ভাষা ব্যবহার করিতে সাহস করেন না। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে কেহ কেহ বাংলাভাষার মধ্যে যে হারে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার এবং ইংরাজি শব্দপ্রয়োগ রীতি ও বাক্‌ধারার অনুসরণ করেন, তাহাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে উর্দুর ন্যায় একটি নূতন ভাষার উদ্ভব হইতে পারিত।

সর্বত্রই দেখা যায় বিজেতা জাতির ভাষা বিজিত জাতির ভাষার উপর প্রভাব রাখিয়া যায়,—বর্তমান কালে ইংরাজি ভাষা কথ্য বাংলার ঘাড়ে ভূতের বোঝার মত চাপিয়া বসিয়াছে. এইটি কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা নয়। উপরের উদাহরণের appointment, time, sorry, telegram, advice, late, duty, Lindsay Street, town, Checker, wife friend প্রভৃতি শব্দগুলি এইরূপ বাংলার ঘাড়ের ভূতের বোঝা। ইংরাজি ভাষা বাংলার উপর অংশুই প্রভাব রাখিয়া যাইবে, কিন্তু অনাবশ্যকভাবে উহা বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করুক, ইহা আমরা কেহই চাহিব না। রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন কোন বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোক স্বর্গ হইতে কিছু সময়ের জন্য বাংলাদেশে আসিয়া এখনকার ইংরাজীমিশ্রিত বাংলা কথ্য ভাষা শুনিলে যেমন বুঝিতে পারিবেন না, আমরাও সেরূপ সেযুগের ফারসী-সঙ্কুল বাংলা ভাষা শুনিলে বুঝিতে পারিব না। বর্তমানের ন্যায় সেটিও একটি যুগান্তর কাল,—ইংরাজ নূতন আসিয়াছে, পূর্ববর্তী আবশ্যক-অনাবশ্যক ফারসীশব্দের প্রভাব তখনও বাংলা ভাষা বহন করিয়া চলিয়াছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামরামবসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্রে"র ভাষার নমুনা,—"এবং শুবাজাতের কাগজাতও কিছু পাইলেন না যে তাহাতে এ তিন সুবার উশুল তহসিল সুমার তকসিল ওয়াকিফ হএন," "তাহারা গাফিল ছিল আচানক মারি পড়নেতে অনেক ২ মারা গেল, বক্রিরা আপন আপন সরঞ্জাম ফেলাইয়া কোনদিগে পলায়ণ করিল।" ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত "আলালের ঘরের দুলাল"—এর কথ্যভাষার নমুনা,—"আমার কত হুরমত—কত ইজ্জত", "আদালতের মদৎ আবশ্যক হইত," "খুব ওয়াজিব কথা বলিয়াছ," "মকর্দ্দমার সমস্ত সরেওয়ার সাহেবকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলেন" "তাহার জমা ভৌলে মুসমা ছিল," "আমার উপর এই তহমত"। সে যুগের বাঙালী যে ফারসী শব্দগুলি জানিত এখনকার বাঙালী দেখা যাইতেছে তাহার অধিকাংশ ভুলিয়াছে। এখনকার বাঙালী যেমন ইংরাজি শিক্ষা করেন, সে যুগের বাঙালী সেইরূপ ফারসী পড়িত। এখনকারই মত বিদেশী প্রভাব এখনকার দিনেও জন সাধারণের তুলনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেই অধিক ছিল। সে যুগেও অনেক বাঙালী বাংলার মধ্যে অধিক ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতে পারায় গৌরব বোধ করিত। কিন্তু ফারসীর দিক দিয়া আজ সেদিনের পরিবর্তন হইয়াছে। তথাপি ফারসী শব্দ হাওয়া, লাল, দোয়াত কলম, কম, বেশি বাংলা ভাষার মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। পর্তুগীজশব্দ পেঁপে, আলমারি, আনারস, চাবি, আতা, আলকাতরা, আলপিন, গির্জ্জা, পেরেক, মিস্ত্রী, মার্কা, ফিতা, গামলা প্রভৃতি কেহ বাংলাভাষা হইতে তাড়াইতে পারিবে না, কিন্তু বর্তমান সময়ে যে সহস্র সহস্র অপ্রয়োজনীয় ইংরাজিশব্দ বাংলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ চাহিলেও কি সেগুলি বাংলায় চিরস্থায়ী করা চলিবে? পূর্ব পূর্ববার ভাষায় এই সকল শব্দ গ্রহণ বর্জন কার্যের অনেকখানিই প্রকৃতির আপন নিয়মে কালক্রমে সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান যুগের হাওয়া অন্যরূপ। এখন আমাদের আহার্য এবং পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত পরিমিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের ভাষাও সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন—তাহার প্রমাণ "সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা" পুস্তিকাটি। এইরূপ অবস্থায় আমাদের সকলেরই বিশেষভাবে সচিন্ত ও সক্রিয় হওয়া উচিত।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ সময়ে বাংলাভাষার উপর ফারসীর যে আধিপত্য ছিল, তদপেক্ষা অধিক আধিপত্য ছিল হিন্দী ভাষার উপর। অধিক ফারসী বহুল হিন্দীরই নামান্তর উর্দু। শত বৎসর পূর্বে ব্রজ-ভাষায় অথবা আওধীতে রচিত পদ্যসাহিত্যের বাহিরে হিন্দী বলিয়া একটি ভাষা আছে, নাগর বালিয়া একপ্রকার হরফ আছে, এই অধিকারটুকু তদানীন্তন বিদেশী সরকারকে বুঝাইয়া দিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। যে কীর্তিমান পুরুষের চেষ্টাতে হিন্দীভাষা রক্ষা পায়, নাগর হরফ সংযুক্ত-প্রদেশের স্কুলসমূহে প্রচলিত হয়, তাঁহার নাম রাজা শিবপ্রসাদ। ইনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সংযুক্ত প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর পদ লাভ করিয়া এই কার্যগুলি করিয়াছিলেন। যে মহাশয় ব্যক্তি হিন্দীর জন্য এতটা করিয়াছিলেন, তিনিই আবার তাঁহার, "ইতিহাস তিমির নাশক" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ইংরাজি ভূমিকাতে লিখিতেছেন, "I may be pardoned for saying a few words here to those who always urge the exclusion of Persian words, even those which have become our household words from our Hindi books, and use in their stead Sanskrit words quite out of place and fashion or those coarse expressions which can be tolerated among a rustic population." হিন্দী গদ্যভাষাকে তখন অনেকে "গেঁও ভাষা" বলিতেন। রাজা শিবপ্রসাদের ব্যবহৃত Household Persian wordsএর দু' একটি নমুনা এরূপ—"আম-ফহম", "আলিম-ফাজিল," "ইন্সাজরত।" পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল লিখিতেছেন, রাজাসাহেবের রচনার ভাষায় ক্রমশ ফারসী শব্দের প্রয়োগ বাড়িতে থাকে, "ইসকা কারণ চাহে জো সমঝিএ। যা তো যহ কহিএ কি অধিকাংশ শিক্ষিত লোগোঁ কী প্রবৃত্তি দেখকর উন্‌হোনে ঐসা কিয়া অথবা অঁগরেজ অধিকারিয়োঁ কা রূখ দেখকর"। ফারসী শব্দপ্রয়োগ রাজাসাহেবের ভাষায় বাড়িবার একটি অনুমিত কারণ হইতেছে তখনকার অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের প্রবৃত্তি।

বর্তমানেও এই শিক্ষিত জনগণের একটি অংশ "সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা" গুলি দেখিয়া আহত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট নিবন্ধক (Registrar), উপ-প্রাদেশিকপরিবহন মহাধ্যক্ষ (Deputy Provincial Transport Commissioner) প্রভৃতি নূতন শব্দগুলি দুর্বোধ্য এবং বিশ্রী। ইংরাজি শব্দগুলি প্রচলিত থাকুক ইহাই তাঁহারা

চাহিয়া থাকেন ; কিন্তু অগণিত জনসাধারণের কাছে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট ইংরাজি এবং নবসংকলিত বাংলা শব্দ বড় জোর সমান দুর্বোধ্য হইতে পারে। অধিকাংশ বাংলা পারিভাষিক শব্দগুলি ইংরাজি প্রতিশব্দগুলি অপেক্ষা অনেক অধিক সুবোধ্য হইবে, যথা— বনপাল (conservator of forests), বনরক্ষক (Forest Ranger), উপবনরক্ষক (Deputy Ranger), বনকর্মী (forester), পৃষ্ঠলেখ (Endorsement), ধূমবারণ কৃত্যক (Smoke Nuisances Service), ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দগুলি ব্যবহার করিতে গিয়া কয়েকবার শুনিলে ব্যবহৃত নাগরা জুতার ন্যায় অক্লেশ ব্যবহার্য এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। বর্তমান সময়ে অস্বাভাবিক কারণে যে অজস্র ইংরাজি শব্দ বাংলার ইংরাজিশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত মহলে চলিতেছে, সেগুলি বর্জন করিতে কাহারও কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

আবার যাঁহারা বাংলা পরিভাষা চান, তাহারাও অনেকে এ জাতীয় সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ পছন্দ করিতে পারিতেছেন না। অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা শব্দ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সংস্কৃতানুগ শব্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে। পৃথক পৃথক প্রত্যেকটি শব্দচয়ন সমর্থন না করিয়াও পরিভাষা সংসদের অনুসৃত শব্দসংকলন এবং শব্দ গঠনের মূল নীতিটি সমর্থন করা যায়। অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ এবং পরিচিত শব্দও অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ না করিতে পারার কারণগুলি "পরিভাষা সংসদ" তাঁহাদের পুস্তিকাটির মুখবন্ধে দিয়াছেন। এই কারণগুলির একটি হইতেছে,—"নির্ধারিত বাংলা প্রতিশব্দগুলি যেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গৃহীত না হইলেও বোধগম্য হইতে পারে। যে সমস্ত কারণে সংসদকে সংস্কৃত ভাষার সাহায্য অধিকমাত্রায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে একটি প্রধান।" এই মন্তব্যটির পর আরও অগ্রসর হইয়া আমাদেরও মন্তব্য করিতে হয়,—Prime Minister, Private secretary, Presidency Magistrate, Accountant-General, Deputy Postmaster-General, Mayor, Ministry of Health প্রভৃতি শব্দগুলির প্রতিশব্দ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে বোধগম্য করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রহণ করিলেই হইল না, এই শ্রেণীর শব্দগুলি সর্বসম্মতিক্রমে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা গঠিত এক সভা দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত। Prime Minister, Accountant-General, Magistrate প্রভৃতি শব্দগুলির প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় একই প্রতিশব্দ প্রচলিত হওয়া উচিত। ইহার সুবিধার দিক বুঝাইয়া বলা বাহুল্য। পণ্ডিতরা একত্র বসিয়া সভা করিয়া যখন আমাদের ব্যবহারযোগ্য শব্দ নির্বাচন করিয়া দিতেছেন এবং এইরূপে নির্বাচিত শব্দগুলি প্রতিবেশী প্রদেশবাসিগণের নিকট অর্থবোধ্য করিবার জন্য যখন সংস্কৃতের ভাণ্ডার আহরণ করা হইতেছে, তখন জনসাধারণের এবং রাষ্ট্রের দিক হইতে এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন যাহাতে বিভিন্ন প্রদেশে একই রীতিতে সৃষ্ট একটি শব্দের বিভিন্ন পারিভাষিক রূপ প্রচলিত না হইয়া সকল প্রদেশের জন্য একই শব্দ গ্রহণীয় হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, অনতিবিলম্বে বিভিন্ন প্রদেশের একক চেষ্টাগুলি সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত করিবার একটি ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। ইহার জন্য শ্রমিক সমস্যা, উৎপাদক যন্ত্রের অভাব বা ডলার-সমস্যা কোন কিছুই আমাদের অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে না—একমাত্র অভাব কেন্দ্রীয় সরকারের শুভ ইঙ্গিতের।

পরিভাষা নির্মাণ করিতে হইলে "পরিভাষা সংসদের" অনুসৃত পথই যে একমাত্র পথ, এ বিষয়টি বুঝিতে বিলম্ব করিলে বৃথা কালক্ষয় করা হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের একক চেষ্টা এই একই পথ অনুসরণ করিতেছে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ" আমাদের সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতেই আহরণ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'কৃ' এই একটি ধাতু হইতে পরে বিভিন্ন প্রত্যয় ও পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ করিয়া বহু প্রচলিত এবং নূতন শব্দ পাওয়া যাইতে পারে, যেমন—কার্য, কর্ম, কৃত্য, অকৃত্য, উপকৃত্য, উপকার্য, সুকৃত্য, দুষ্কার্য, অকর্ত্তব্য, করণীয়, কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, প্রতিকর্ত্তব্য, প্রতিকার্য, করণ, বিকার, আকার, উপকার, অধিকর্ত, উপকর্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু বাংলা "কর্" ধাতুটি হইতে আমরা বিশেষ নূতন শব্দ গঠন করিতে পারি না, বড় জোর "করিয়ে," ("কারক" অর্থে) পর্যন্ত যেমন—"সে ভাল বলিয়ে-কইয়ে এবং কাজ-করিয়েও।" এইভাবে সামান্যই নূতন শব্দ বাংলার সাহায্যে সৃষ্ট হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"প্রার্থনা সংস্কৃত শব্দ, তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ 'চাওয়া'। 'প্রার্থিত' ও 'প্রার্থনীয়' শব্দের ভাবটা যদি ঐ খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ পর্যন্ত কোন দুঃসাহসিক 'চায়িত' ও 'চাওনীয়' বাংলায় চালাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই।"

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলিয়াই যদি মানিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে এ কথাও মানা চাই যে তার যোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন।" বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃতের কোনরূপ অত্যাচার রবীন্দ্রনাথ মানিতে পারেন নাই, তথাপি "সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে"—এ কথাটি তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে পরিভাষাগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে আমরা বুঝিব, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে সংস্কৃতকে বাংলার সহায়ক বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। "শব্দতত্ত্বে"র শেষে রবীন্দ্রনাথ আহৃত বহু পরিভাষার একটি তালিকা আছে, আমরা যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

Superintendent = অধিকর্মী	To scrape off = অপলিখন
Advocate = অধিবক্তা	Certificate = অভিজ্ঞানপত্র
Governing Body = অধিষ্ঠায়কবর্গ	Curved line = তরঙ্গ রেখা
Side road = অনুরথ্যা	Apparatus = উপস্কর
Oculist = অক্ষিভিষক্	Discordant sound = অপস্বর

One who has fulfilled his promise = তীর্ণপ্রতিজ্ঞ

লোকোত্তর প্রতিভাশক্তিসম্পন্ন দূরদর্শী কবির পথেরই অনুসরণ করিয়া

চলিয়াছেন আমাদের "পরিভাষা সংসদ।" যতক্ষণ না নূতন পথ কেহ দেখাইতে পারিতেছেন, ততক্ষণ আমাদের মনে হইতেছে, ইহা ছাড়া সুগম আর অন্য পথ নাই।

এখন আমরা ধরিয়া লইলাম যে পূর্বে ফারসীর বেলায় যেমন হইয়াছে, ইংরাজ শাসনের অবসানে বাংলার মধ্যে প্রবিষ্ট ইংরাজি শব্দের বেলায়ও সেইরূপ হইবে এবং আমাদের তথা অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় পিতামহস্থানীয় সংস্কৃত ভাষার সহায়তায় আমরা যতদূর সম্ভব নূতন পারিভাষিক শব্দ গঠন করিয়া লইব। তাহা বলিয়া কি আমরা "পুলিস" শব্দটির পরিবর্তে "আরক্ষা," "ডাক" পরিত্যাগ করিয়া "প্রৈষ," "আপিস" ছাড়িয়া "করণ," "টাইপিষ্ট" স্থলে "মুদ্রলেখক" "রেজিষ্ট্রার" স্থলে "নিবন্ধক," ব্যাঙ্ক স্থলে "অধিকোষ" গ্রহণ করিব? "কম-বেশি-হাওয়া-লাল"-এর মত টেবিল, চেয়ার, গেলাস, বেঞ্চি এখন পুরাপুরি বাংলা হইয়া গিয়াছে—এই জাতীয় শব্দগুলি সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ার আশঙ্কা কম। কিন্তু সর্বজনবোধ্য "পুলিস" শব্দটি অনেকে রাখিতে চাহিলেও অনেকে বলিবেন, ইংরাজদের পূর্বে কি আমাদের দেশে "পুলিস" ছিল না? আরক্ষিক বা রক্ষী বলিলেও তো সর্বজনবোধ্য হয়। পুলিস বলিতে আমরা বাংলাতে "পুলিসম্যান" বুঝি, এবং সেই অর্থে "আরক্ষা" শব্দটি অভ্যর্থনা লাভ করিতে পারে নাই। "পুলিস" শব্দের ইংরাজিতে প্রকৃত অর্থ "রাষ্ট্রের অন্তর্গত শান্তি রক্ষা বিভাগ অথবা বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দ (বহুবচনে)"। আরক্ষা বিভাগ, আরক্ষা পরিদর্শক (Inspector of Police) এইরূপ ব্যবহার চলিতে পারে, কিন্তু "পরিভাষা সংসদ" Policeman এর বাংলা করিয়াছেন "আরক্ষিক"—"রক্ষী"ও চলিতে পারে। ইহা বাঙালীর কাণে খুব খারাপ শুনাইবে না। Inspector General of Police = মহা আরক্ষা পরিদর্শক, এইরূপ স্থানে "পুলিস" শব্দটি বজায় রাখা অসুবিধাজনক হইবে না কি?

কতকগুলি ইংরাজি শব্দের পরিভাষা সংস্কৃতের সাহায্যে রচিত হইলে বাংলায় বহুপ্রচলিত বাকি ইংরাজি শব্দের কতকগুলিরও পরিভাষা রচনা করা বহু ক্ষেত্রে আবশ্যক হইয়া পড়ে। ক্লার্ক, হেড ক্লার্ক বাংলায় হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু Inspection clerk = "পরিদর্শ করণিক" (পরিভাষাসংসদ-কৃত) না করিয়া "পরিদর্শ ক্লার্ক" কি মানাইবে? Correspondence clerk = "পত্রকরণিক" না হইয়া "চিঠি কেরাণী" বা "পত্রক্লার্ক," Land acquisition clerk = "ভূমিগ্রহকরণিক" না হইয়া "ভূমিগ্রহ কেরাণী" কি কাজ হইবে? "কেরাণী" শব্দটির মধ্যে অবজ্ঞার ভাব বর্তমান, সেই দিক হইতেও শব্দটি বর্জনীয়। কিন্তু হেড ক্লার্ককে "প্রধান করণিক" বলিতে পারিলে আমাদের আর কোথায়ও বাধিবার মত কিছু থাকে না। তাহার পর—

Office = করণ	Accounts clerk = গণন করণিক
Secretariat = মহাকরণ	Municipal clerk = পৌরসংঘ
Audit clerk = নিরীক্ষা করণিক	করণিক ইত্যাদি

Registration-এর বাংলা "নিবন্ধন" সুন্দর প্রতিশব্দ হইয়াছে, Inspector of Registration Offices হইবে "নিবন্ধকরণপরিদর্শক" এবং Registrar হইবে "নিবন্ধক"। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrarকে কিন্তু "করণাধ্যক্ষ" বলিতে হইবে। Typistকে "মুদ্রলেখক" বলিতে অসুবিধা হওয়ার মত কিছুই কারণ দেখা যায় না, কিন্তু "ডাক" শব্দটির স্থলে "প্রৈষ" আমার এখনও ভাল লাগিতেছে না, ডাকঘর, ডাক-বিভাগ, ডাক-তার অধিকর্তা ইত্যাদি খারাপ হয় না।

ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও প্রথম শ্রবণে Police, clerk, Bank প্রভৃতি সাধারণ প্রচলিত ইংরাজি শব্দগুলির বাংলা পরিভাষা ভাল লাগে নাই, কিন্তু কয়েকদিনের অভ্যাসে পূর্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। Post-এর হিন্দী ডাঃ রঘুবীর "প্রৈষ" করিয়াছেন দেখিয়া এই শব্দটি সম্বন্ধে পুনরায় চিন্তা করিতে হইতেছে। আমি বহু ছাত্রের সহিত নূতন পরিভাষাগুলি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি তাহাদের মনের প্রথম বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরে বিস্তারিত আলোচনার পর ক্রমে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সাধারণভাবে পরিভাষা রচনা করিতে হইলে বহুবিধ প্রয়োজনে বহুক্ষেত্রে বহু প্রচলিত ইংরাজি ফারসী শব্দগুলির স্থলে সংস্কৃতমূলক নূতন পরিভাষা রচনা করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে। এইরূপ অবস্থায় আমাদের মত সাধারণজনের কর্তব্য হইবে, প্রচলিত বিদেশী শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌গুলিকে প্রচলিত রাখা প্রয়োজন এবং কোন্‌গুলিই বা বর্জিত হইবে ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসাভার সর্বভারতীয় প্রতিনিধিমূলক বিশেষজ্ঞগণ গঠিত একটি সংসদের উপর অর্পণ করা।

সাধারণভাবে সমর্থন করিলেও "পরিভাষা সংসদ" সংকলিত সবগুলি পারিভাষিক শব্দ নির্বাচনই যে ভাল হইয়াছে একথা আমরা বলিতে পারিব না, সংসদের সভ্যবৃন্দ নিজেরাও তাহা বলেন নাই। যাঁহারা গঠনমূলক সমালোচনা করিতে সক্ষম তাঁহাদিগের সহযোগিতা থাকিলে পরিভাষা পুস্তকটি স্থানে স্থানে অধিকতর উপযোগিতা লাভ করিতে পারিবে। আমি মাত্র দুই একটি স্থলে আমার মতামত জানাইয়া প্রবন্ধটি শেষ করিতেছি।

Communications এর পরিভাষা করা হইয়াছে "সংসরণ," Ministry of Communications = সংসরণ মন্ত্রক। Communication-এর সাধারণ অর্থ (১) বার্তা (২) সংযোগ ব্যবস্থা। "সংসরণ" শব্দটি বহু পুরাতন, পালি ভাষাতেও ইহার ব্যবহার আছে, ইহার অর্থ "গমনাগমনের বিস্তৃত পথ"। সম্ভবত এখানে Communications এর পরিভাষা "বার্তাসংবহ" বা "সমাযোজন" ভাল হইবে।

Engineer শব্দটি লইয়া পরিভাষা সংসদ সুবিধা করিতে পারেন নাই। পরিভাষা সংসদ দিয়াছেন—

Engineer = বাস্তুকার।

" Mechanical = যান্ত্রিক, যন্ত্রবিৎ।

" Agricultural = কৃষিবাস্তুকার।

Chief Engineer, Irrigation Department = মুখ্যবাস্তুকার, সেচনবিভাগ।

Chief Engineer, Public Health Department = মুখ্যবাস্তুকার, স্বাস্থ্যবিভাগ।

Engineerকে বাস্তুকার বলিলে ঠিক হয় না, "নির্মাণবিৎ" চলিতে পারে কি?

Engineer, Mechanical = যান্ত্রিক নির্মাণবিৎ।

" Electrical = বৈদ্যুতিক নির্মাণবিৎ ইত্যাদি পূর্বপদগুলি বিশেষণ করা হইল। Civil Engineer = বাস্তু নির্মাণবিৎ—পূর্বপদটি বিশেষ্য রহিল। Chief Engineer, Irrigation Department = মুখ্যনির্মাণবিৎ, সেচন বিভাগ। পরিভাষা সংসদ Entomologist = কীটবিৎ, Botanist = উদ্ভিদবিৎ করিয়াছেন।

Forest Ranger = বনরক্ষক, Forest Guard = বনরক্ষী, এ দুইটি বাংলা শব্দ আর একরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

গান ও স্বরলিপি

তাল—দাদরা

কেন এলে ফুল দলে ;—
শ্যামলে হিরণে হাসি রূপ গানে
জোছনায় লীলাছলে !

গভীর আঁধার সেই ছিল ভালো—
শূন্য কুটীরে জ্বালে নাই আলো ;
যা কিছু আমার দিয়েছি বিলায়ে
তোমার চরণ তলে।

বীণা বেণু রবে নূপুরের তালে
ধরা দিতে চাও, জানি—
অরূপ রঙ্গে সুর-তরঙ্গে
দিয়ে যাও হাতছানি।
যেতে চাও যদি চ'লে যাও দূরে—
আমি যে রহিব স্বপনেরি পুরে—
অসীম আঁধারে করিব আরতি
ভাষাহীন আঁখি জলে।

কথা ও সুর ঃ—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়   স্বরলিপি ঃ—শচীন দাশগুপ্ত

স্থায়ী ঃ—
+ ০ + ০
II প গ স | ণ ধ পধ | পন্ধ প - | - - - II
কে ন এ লে ফু ল- দ- লে - - - -

+ ০ + ০
[II স ম ম | স প প | স ধ ধ | পধ ণ ণ
শ্যা ম লে হি র ণে হা সি রূ প- গা নে

+ ০ + ০
(ধ ণ স | ণর্স ণ ধ প |) IIগ ম পধ | ণর্স ণধ পম
হা সি রূ প- - গা নে জো ছ না- -য় লী - লা -

+ + + ০
ধপ মর সন্‌ | র - - | র ণ ধ | প প ধ
ছ- লে- - - - - - কে ন এ লে ফু ল

+ ০
ন্ধ প - | - - - |]
দ লে - ঃ - -

অন্তরা ঃ—
+ ০ + ০
II ম প র্স | র্স - - | র্স র্র র্স | ণ ণধ পণ
গ ভী র আঁ ধা র সে ই ছি ল ভা- - -

+ ০ + ০
ণধ পধ ধ | ধ প - | র্স র্স ণধ | ণ ণ ণধপ
ল- - - - - - শূ - ন্য- কু টী রে-

+ ০ + ০
ধ ধপ ম | গ গম রগ | ম - - | - - - II
জ্বা লে- না ই আ- - - লো - - - - -

+ ০ + ০
II স গ গ | র ম ম | গ প প | ম ধ ধ I
যা কি ছু আ মা র দি য়ে ছি বি লা য়ে

+ ০ + ০
I ধ ণ র্স | [illegible] ধ পণ | ধ প - | ম গ - I
তো মা র চ র ণ- ত -লে - - - -

```
              +                 ০                 +                 ০
*সঞ্চারী :—II স  র  র  র  |  -  র  গ  ম  |  গ  -  -  -  |  গ  র  স  ধ্
              বী -  ণা -     -  বে ণু র     বে -  -  -     -  -  -  -
              +                 ০                 +                 ০
              ধ্ স  স  র  |  -  র  গ  ম  |  গ  -  -  -  |  -  -  -  -
              বী -  ণা -     -  বে ণু র     বে -  -  -     -  -  -  -
              +                 ০                 +                 ০
              ম  প  প  ক্ষ |  প  ক্ষ প  ক্ষ |  প  ধ  প  ক্ষ |  প  ম  গ  ক্ষ
              নূ পু রে র     তা -  লে -     ধ  -  রা দি    -  তে চা ও
              +                 ০                 +                 ০
              ক্ষ প  প  -  |  -  -  গ  ক্ষ |  ক্ষ প  প  -  |  -  -  -  -
              জা -  নি -     -  -  ও গো    জা -  নি -     -  -  -  -
              +                 ০                 +                 ০
              র্স র্স ণ  ধ  |  ণ  ণ  ণধ প  |  ধ  ধ  প  ম  |  প  প  ম  গ
              অ  -  রূ প     র  ং  গে--     সু -  র  ত     র  ং  গে -
              +                 ০                 +                 ০
              গ  ম  প  -  |  প  -  -  -  |  গ  ম  গ  র  |  গ  র  স  ন্
              দি য়ে যা -     ও  -  -  -     দি -  য়ে যা    -  ও  হা ত
              +                 ০                 +                 ০
              র  র  স  স  |  -  -  গ  ম  |  প  -  -  -  |  প  -  স  ন্
              ছা -  নি -     -  -  দি য়ে    যা -  -  -     ও  -  হা ত
              +                 ০
              র  র  স  স  |  -  -  -  -  II
              ছা -  নি -     -  -  -  -

              +                 ০                 +                 ০
              গ  প  প  |  র্স র্স -  |  র্স র্রর্গ র্সণ |  র্সণ ণধ পধ
              যে তে চা    ও  য  দি    চ  লে- যা-     ও-  দূ- --
              +                 ০                 +                 ০
              ণধ পধ ধ  |  ধ  প  প  |  র্স র্স ণধ |  ণ  ণ  ধপ
              রে- -  -     -  -  -     আ  মি যে-    র  হি ব-
              +                 ০                 +                 ০
              ধ  ধ  প  |  ম  গম রগ |  ম  -  -  |  -  -  -  II
              স্ব প  নে    রি পু- --    রে -  -     -  -  -

              +                 ০                 +                 ০
           II (স  গ  গ  |  র  ম  ম  |  গ  প  প  |  ম  ধ  ধ) II
              অ  সী ম     আঁ ধা রে    ক  রি ব     আ  র  তি
              +                 ০                 +                 ০
              ধ  ণ  র্স |  র্স ণ-ধ পণ |  ণধ প  প  |  ম  গ  -
              ভা ষা হী    ন  আঁ- থি-    জ- লে -     -  -  -
              +                 ০                 +                 ০
              প  গ  স  |  ণ  ধ  পধ |  পক্ষ প  -  |  -  -  -
              কে ন  এ     লে ফু ল-    দ- লে -     -  -  -
```

* সঞ্চারী......বীণা বেণু রবে......হাতছানি পর্য্যন্ত কার্ফা তালে গাহিতে হইবে—ছন্দ একই থাকিবে।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দিন কয়েকের মধ্যেই জোর ধর-পাকড় শুরু হয়ে গেল শহরে।

হালদার কোম্পানির দোকান লুঠ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে চারদিকে। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা মুকুন্দপুরের জীবনে আর কখনো ঘটেনি। কোতোয়ালী থানা থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরের মধ্যে এই ডাকাতি। তাড়াতাড়ি এর একটা সুরাহা না করতে পারলে সমস্ত পুলিশ আর গোয়েন্দা বাহিনী কলঙ্কিত হচ্ছে।

পুলিশের দাপটে দিনকতক একবারে তটস্থ রইল সমস্ত। ধনেশ্বরের আহার নিদ্রা বন্ধ হয়েছে, একটা সাইকেলে করে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে দিনরাত। লোকটাকে দেখলেই গায়ের মধ্যে নিস্‌পিস্‌ করে। গুলি করে নয়, গলা টিপে খুন করতে ইচ্ছে হয় লোকটাকে। অথবা কোনো কালী মন্দিরের সামনে বাজনা বাজিয়ে নরবলি দিতে। কল্পনায় ভেসে ওঠে ধনেশ্বরের রক্তাক্ত কবন্ধটা।

ধরেছে অনেককেই। কিন্তু আশ্চর্য, যাদের ধরা উচিত ছিল তাদের টিকিটি ছুঁতে পারে নি এ পর্যন্ত। 'তরুণ-সমিতি'র লাইব্রেরী এসে খুঁজেছে তচনচ করে, জিমন্যাষ্টিক ক্লাবের কয়েকজন ডাগড়া ডাগড়া ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। ধনেশ্বর নিজে এসে দেখা করে গেছে বেণুদার বাড়িতে। কী বলে গেছে সেই জানে। পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারেনি রঞ্জু।

মনের মধ্যে যতই জোর আনতে চেষ্টা করুক—বুক ধড়ফড় করে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠে, যেন শুনতে পায় পুলিশের বুটের শব্দ। স্বপ্নে দেখে ধনেশ্বর ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছে। ঘুম ভেঙে যায়, নিজের দুর্বলতায় নিজেরই লজ্জার সীমা থাকে না।

করুণাদির কথাই কি ঠিক? সে কি পথের অযোগ্য?

কিন্তু এ অযোগ্যতা মেনে নেওয়ার চাইতে আত্মহত্যা করাও ভালো।

তরুণ-সমিতি'র লাইব্রেরী আজকাল বন্ধ। জিমন্যাষ্টিক ক্লাবে এক্সারসাইজও হয় না আজকাল। এখন দেখাশুনো, কথাবার্তা সব আড়ালে, সব রাত্রির অন্ধকারে। আনন্দ, উত্তেজনা আর ভয়ের একটা গুরুভার যেন সব সময়ে হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে বসে থাকে এখন। ফাঁসি-কাঠের জ্যোতির্ময় পথটা ক্রমশ যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে দৃষ্টির সামনে। পরিমলের সঙ্গে একবার দেখা করা জরুরি দরকার।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, শীতের আকাশে জমেছে খানিকটা থমথমে বাদলের সংকেত। বিদ্যুতের রক্তাক্ত কশা যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে যেন এক পাল পাগলা হাতীর মতো একদল ঝোড়ো মেঘকে।

বাড়ি থেকে বেরুনো দরকার। কিন্তু এখন আর শাসন নেই তেমন। ছ মাস আগে বেদনাতুরা বন্ধন মুক্তি হয়ে গেছে, তিন দিনের জ্বরে মা হারিয়ে গেলেন। সেই থেকে বাবারও কী হয়েছে—বাইরে বাইরেই ঘোরেন, বাড়িতে আসেন মাসে দুদিন কি একদিন। দাদা তার থিয়েটারের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত, মেজদা বরাবর কলকাতায় মামার কাছে থেকে লেখাপড়া করে—সেও ছুটি-ছাটায় আসে এখানে। বাড়িতে ছোট বোনেরা আর ঠাকুরমা ছাড়া তত্ত্বাবধানের লোক নেই কেউ। আর ঠাকুর মা। দুবেলা পা ছড়িয়ে বসে তাঁর কান্না চলে মায়ের জন্যে। মা-কে হারানোর ব্যাপারটার চাইতে ও কান্নাটাকে আরো বেশি অসহ, আরো দুঃসহ মনে হয়।

তবু একদিক থেকে এই ভালো হয়েছে। অবাধ মুক্তি—প্রচুর স্বাধীনতা। যতক্ষণ খুসি বাইরে থাকো, যেখানে খুসি যাও। তিরিশ সালের বন্যায় ঘর থেকে বেরিয়ে একটা অসীম সমুদ্রের অভিসারে যাত্রা করতে চেয়েছিল; বিপ্লবীর আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল সব কিছু বাঁধনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে অজানিতের স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। মায়ের জন্য অসহ্য কষ্ট হয় মধ্যে মধ্যে, ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে এক একদিন রাত্রে—তবু এই ভালো। অনেকটা ক্ষতিকে মেনে না নিলে অনেক বড়কে পাওয়া যায়না, মহত্তর দুঃখই তো বয়ে আনে মহত্তম গৌরব।

তাই আকাশে মেঘ দেখেও বেরিয়ে পড়ল। ঠাকুরমা যথানিয়মে তাঁর বিলাপ আরম্ভ করে দিয়েছেন। ওই কান্নাটা যেন মাথার মধ্যে হাতুড়ি ঠোকার মতো আঘাত করতে থাকে। মানুষ মরলে আর ফিরে আসে না। তবু ওই কান্নার জের টেনে কেন এই ব্যর্থ শোককে জীইয়ে রাখা? কী সার্থকতা আছে—যে ক্ষত আপনা থেকেই শুকিয়ে আসছে তাকে বারে বারে খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত করবার?

পথ অন্ধকার। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া ভিজে ভিজে লাগছে—তারই ঝাপটায় বোধ হয় নিবে গেছে রাস্তার আলোগুলো। বিদ্যুতের হাসি চমকে চমকে উঠছে। গুর্ গুর্ করে মেঘের একটা ছোট ডাক কানে এল।

সব মৃত্যুই কি মনে রাখবার মতো? অন্যমনস্কভাবে চলতে লাগল রঞ্জু। জীবনে প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। সে দেখেছে অবিনাশবাবুর ভেতরে; মৃত্যুর মৃত্যুহীন কাহিনী পড়েছে 'শহীদ সত্যেন' 'ফাঁসির ডাক' আরো অজস্র বইয়ের পাতায় পাতায়। সে মৃত্যু দেয় বাঁচবার প্রেরণা, দশজন দেশকর্মীর বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে ওঠে দশলক্ষ পরাধীন মানুষের মুক্তির অমৃত-রসায়ন। কিন্তু মার মৃত্যু শুধুই ব্যথা মাত্র, তাতে করে দুঃখ ছাড়া আর কোনো পাথেয়ই তো মেলে না।

ভুলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু ঠাকুরমা ভুলতে পারেন না, ভুলতে দেনওনা কাউকে।

—টিপ্-টিপ্-টিপ্—

বৃষ্টি নামছে। শীতের বৃষ্টি, ভিজলেই নিমোনিয়া। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল পরিমলদের বাইরের ঘরে। আর ঘরে পা দিতেই বাগানের হেনার ঝাড়ের ওপর বৃষ্টির জোর ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ল, একটু দেরী করলেই ভিজিয়ে একেবারে ভূত করে দিত।

বাইরের ঘরটা প্রায় খালি। উঁচু একটা লম্বা তেপায়ার মাথায় ঘষা-কাচে ঘেরা বিচিত্র চেহারার একটা আলো জ্বলছে—সেই আলোয় যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে নৃত্যরত নটরাজের ব্রোঞ্জ মূর্তিটা। আর বাইরের সঙ্গে বৃষ্টি ভেজা ধুলোর গন্ধের সঙ্গে ঘরের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে মহীশূর চন্দনের সৌরভ।

আলোটার ঠিক নীচে সেটিতে হেলান দিয়ে শুয়ে মিতা কিছু একটা পড়ছিল; ওকে ঢুকতে দেখে বইটা নামিয়ে রেখে ভারী মিষ্টি করে হাসল।

—খুব বেঁচে গেছো রঞ্জু-দা, একটু হলেই ভিজিয়ে দিত।

—হুঁ—বড় জোর বৃষ্টিটা এসে পড়েছে—রঞ্জু পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

তেমনি মিষ্টি করে হেসে মিতা বললে, তারপর এই বৃষ্টির মধ্যে কী মনে করে?

—কয়েকটা জরুরি কথা আছে। পরিমল কোথায়?

—দাদা তো বাড়িতে নেই।

—বাড়িতে নেই? কোথায় বেরিয়েছে?

—বাবার সঙ্গে। বাবা গাড়ি নিয়ে ওঁর এক মক্কেলের বাড়িতে গেছেন নরোত্তমপুরে—সেখানে নেমন্তন্ন আছে। দাদাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। ফিরতে রাত হবে—বৃষ্টিবাদলা বেশি হলে আজ নাও ফিরতে পারেন।

—তাই তো!—চিন্তিত মুখে রঞ্জু বললে, কী করা যায়?

—খুব বিপদে পড়েছ, তাই না?—মিতা এবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল: বেশ হয়েছে। যা বৃষ্টি নেমেছে, সহজে পালাতে পারবে না। আবৃত্তি শোনাও বসে বসে।

—অত সময় নেই আমার—একুণি বাড়ি যেতে হবে।

—কেন, এত তাড়া কিসের?

—বাঃ, তাড়া থাকবে না? আর পনেরো ষোলো দিন বাদে টেস্ট্ পরীক্ষা, তা জানো?

—জানি মশাই—মিতা ভ্রূভঙ্গি করলে: এও জানি যে টেস্ট না দিলেও হেড্ মাষ্টার তোমায় অ্যালাউ করে দেবে।

—ফাজলেমী কোরো না এখন, মুড নেই—রঞ্জু বিরস ভাবে বললে, দোহাই লক্ষীটি, চটপট্ একটা ছাতার ব্যবস্থা করো দেখি।

মিতা গম্ভীর হয়ে বললে, ছাতাটাতা নেই আমাদের। তবে আমার একটা প্যারাসোল্ আছে সেইটে নিতে পারো।

—তা হলে ভিজেই যাব আমি—বীরের মতো রঞ্জু উঠে দাঁড়ালো।

—থাক, অত বীরত্বে কাজ নেই—মিতা কৌতুকভরা গলায় বললে, ওর পরিণামটা তো জানি। স্রেফ দশটি দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। কেমন বৃষ্টি নেমেছে দেখছ না?

সত্যিই প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমেছে। বাইরের হেনার কুঞ্জে উদ্দাম মাতামাতি। জল আর বাতাসের গর্জন উঠছে ক্ষ্যাপা কতগুলো জানোয়ারের আর্তনাদের মতো। বিদ্যুতের আলোয় কোটি কোটি অস্ত্রের তীরের মতো বর্ষার ধারা ঝলকে উঠছে। এই বৃষ্টিবাতাসে ছাতাও কোনো কাজ দেবে না।

মিতা বললে, দেখছ তো?

—হুঁ।

—তা হলে?

—তাই তো।—মিতার মুখের দিকে বিব্রত জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালো রঞ্জু, কিন্তু পরক্ষণেই দৃষ্টি তার কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেখানেই স্থির হয়ে রইল। কী সুন্দর—কী চমৎকার দেখাচ্ছে মিতাকে, কী অপরূপ লাগছে ঘষা কাচের বাতিটার আলোতে। রঙীন পাতলা ঠোঁট দুটিতে চমৎকার ভাবে নিবদ্ধ হয়ে আছে সরু হাসির রেখা, চোখ দুটি চকচক করছে কৌতুকে। সোনার চুড়িপরা দুখানি হাত যেন ঘরের ভেতরে সাজানো ওই সব মূর্তিগুলোর মতো শ্বেত পাথরে নিখুঁত ভাবে খোদাই করা। ফিকে-লালরঙের শাড়ীতে একখানা আশ্চর্য সুন্দর ছবির মতো দেখাচ্ছে তাকে। পশমী ফিতে বাঁধা একটা বেণী গলার পাশ দিয়ে ঘুরে তার বুকের ওপরে এসে পড়েছে, শ্বেত পাথরের মতো শুভ্র গ্রীবায় সরু হারের রেখাটা যেন থেমে আছে স্থির বিদ্যুতের মতো।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ। ঘরের ভেতরে মহীশূর ধূপের গন্ধ। ছবির মতো বসে আছে মিতা। এক মুহূর্তে সবটা মিলিয়ে যেন কেমন অবাস্তব বলে মনে হল তার। অকারণে ইচ্ছে করতে লাগল ওই শ্বেত পাথরের মূর্তিটাকে সে স্পর্শ করে, ওই হাত দুটো হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে দেখে সত্যিই তাদের প্রাণ আছে কি না।

রঞ্জুর দৃষ্টি লক্ষ্য করে মিতা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল।

—রঞ্জুদা?

—উঁহু—মুখের ঘোর ভেঙে লজ্জিত অপ্রতিভ ভাবে সে জেগে উঠল।

—কী ভাবছিলে?—স্নিগ্ধ নরম গলায় প্রশ্ন করলে মিতা।

কিন্তু এতক্ষণে রঞ্জু নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে। না—এ ভালো কথা নয়। মিতাকে দেখলে এ যে কী একটা বিপর্যয় ঘটে যায় নিজের ভেতর—এর অর্থ নিজেই সে বুঝতে পারে না। মনে হয় পুলিশের ভয়ের চাইতেও আরো একটা বড় ভয় আছে কোথাও, আছে আরো কোনো ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা। কী যেন এসে শরীরটাকে আচ্ছন্ন করে ধরে, বছর দুই আগে না জেনে এক গ্লাস সিদ্ধি খাওয়ার পরে যেমন হয়েছিল, তেমনি ঘোর ঘোর লাগে সমস্ত চেতনায়। আর তাই থেকেই কি আসে ওই স্বপ্ন? ছেলেবেলার উষার সঙ্গে একাকার

হতো যায় মৃত্যুঞ্জয়ার মুখখানা, করবা আর্দ্রেন্দ্র মুড়ীবালামের ধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে?

অসীম লজ্জায় রঞ্জু ভাবতে লাগল এ বাড়িতে সে আর আসবে না, আর কখনো মুখ তুলে চাইবে না মিতার দিকে। মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক নয়, কোথায় একটা অপরাধ লুকিয়ে আছে এর আড়ালে।

—রঞ্জনদা?

—অ্যাঁ?

—আবৃত্তি করবে না?

—ভালো লাগছে না।

—ওঃ—মিতাও চুপ করে রইল। তারও যেন রঞ্জুর মনের ছোঁয়া লেগেছে, সেও যেন স্পষ্ট করে কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। দুজনেই বসে রইল মাথা নীচু করে, শুধু থেকে থেকে মিতার মুখের ওপর রক্তের এক একটা উচ্ছ্বাস খেলা করে যেতে লাগল।

—ইস্—বৃষ্টির ছাট আসছে যে—

রঞ্জুর সামনে দিয়েই মিতা এগিয়ে এসেছে এ পাশের বড় জানালাটা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু, জানালার কব্জায় কেমন মরচে পড়ে শক্ত হয়ে গেছে, কিছুতেই সেটা বন্ধ হয় না।

—সরো আমি দেখছি—

রঞ্জু উঠে পড়ল: সরো—

জানালাটা এবার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল ঘটনাটা। কেমন করে তার হাতের মধ্যে যে আর একখানা হাত এসে পড়ল কে জানে। যা শ্বেত পাথরের মতো দেখতে, কিন্তু যা ফুলের মতো নরম।

রঞ্জুর শরীরে বিদ্যুৎ চমকে গেল, আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল মিতার মুখের ওপর একটা অপরূপ আলো ছড়িয়ে দিয়ে। রঞ্জু টের পেল, মহীশূর ধূপের গন্ধ ছাপিয়েও তার স্নায়ুকে বিহ্বল করে দিচ্ছে আর একটা অপরূপ গন্ধ—সে কি মিতার চুলের? তার হাতের মধ্যে ফুলের মতো, ছোট পাখির মতো একখানা হাত কাঁপছে, মিতাও কি কাঁপছে?

—ছিঃ—এ কি হচ্ছে!

মনের মধ্যে বেদনার গর্জন শোনা গেল, আকাশে শোনা গেল মেঘের ধমকানি। এবার রঞ্জুও কেঁপে উঠল। তারপর মিতার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল, দাঁড়ালো এসে বৃষ্টির ছাটলাগা অন্ধকার বারান্দাটায়। ঘরের মধ্যে মিতার ওপর এর প্রতিক্রিয়াটা কী হয়েছে দেখবার জন্ত পেছন ফিরে একবারও সে তাকাতে পারল না আর।

এগারো

'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।'

উদয়াস্তের সীমা-চিহ্ন দিয়ে আঁকা। এক একটি দিন যেন একটি করে পর্দা সরিয়ে নিয়েছে আরো গভীর, আরো নিবিড়, আরো বিচিত্র এক একটি রহস্যময়তার ওপর থেকে। প্রতিদিন নিজেকে আবিষ্কার করা হয়েছে তিলে তিলে, নিজেকে জানার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি করে জেনেছি পৃথিবীকেও। আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জানলাম।

'আমার চেতনার পান্নার রঙে পৃথিবী হল সবুজ,' রবীন্দ্রনাথের কথা। শুধু চেতনার পান্নার রঙ নয়, চুণীর রঙও বটে। দিকে দিকে দেশে দেশে সবুজ মাটির ওপর ক্ষরিত হয়ে পড়ছে চুণীর মতো, পদ্মরাগের মতো মানুষের রক্ত। এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ইয়োরোপের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর, আমেরিকার কালো নিগ্রোদের কালো কালো বুক লক্ষ্য করে অবিরাম চলেছে মানুষ-শিকারীদের সাম্রাজ্যবাদী বেয়নেট সন্ধান। তাই চামড়া বাঁচাবার জন্ত একদল হয়েছে পোষা বুলডগ, আর একদল নিরক্ত বর্ণহীন একসার ছায়ামূর্তি। শুধু সুড়ঙ্গের অন্ধকারে, কালো অরণ্যের ছায়ায়, কারাগারের আড়ালে, দ্বীপান্তরের ওপারে জন কয়েক সত্যিকারের মানুষ তপস্যা করে চলেছে; প্রতীক্ষা করে চলেছে রক্ত-সমুদ্রে অবগাহন করে সভ্যতার দিক্চক্রে কবে দেখা দেবে নতুন সূর্য। তাদের চেতনার পান্নার রঙে উদ্ভাসিত হয়েছে নতুন পৃথিবী। চুণীর রক্তরাগ মুছে গেছে, সবুজ আর নতুন ফসলে ভরা রক্তের মালিন্যহীন উত্তর সাগর দক্ষিণ-সাগর পরিব্যাপ্ত মহা পৃথিবী।

কিন্তু সে কবে? কত দেরী তার?

নানা রঙের দিনগুলি নানা ভাবে তার উত্তর এনেছে। কখনো আশার উত্তেজনায় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠেছে হৃৎপিণ্ড, মনে হয়েছে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে যেতে আর তো দেরী নেই। 'বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা এত ঋণ?' জালিয়ানওয়ালাবাগে যত রক্ত ঝরেছে, তার হিসেব নিকেশ করবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ চট্টগ্রাম। আয়ার্ল্যাণ্ড ছেড়ে একদিন মানে মানে পালাতে পথ পায়নি ইংরেজ; আমেরিকায় ঘাড় ধাক্কা খেয়ে সিংহের জাতি একদিন ভীরু কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পাড়ি দিয়েছে আটল্যাণ্টিক; বুয়র যুদ্ধে সামান্ত কয়েকজন চাষার দুর্জিত প্রতিরোধের গর্জনে 'রুল্ ব্রিটানিয়ার' জয় সঙ্গীত আপনা থেকেই রুদ্ধ-কণ্ঠ হয়ে গেছে।

আমরাও পারব। নিশ্চয় পারব। এত বড় ভারতবর্ষ আমাদের, এই কোটি কোটি মানুষের দেশ। আজ যারা ঘুমিয়ে আছে, রুদ্র ভৈরবের পদপাতে তারা জাগবেই। সব্যসাচী দুঃখ করেছিল: কসাইখানা থেকে গোরুর মাংস গোরুতেই বয়ে আনে, বিদেশীর হুকুমে দেশের মানুষই দেশ-প্রেমীর গলায় পরিয়ে দেয় ফাঁসির দড়ি। কিন্তু এ দুঃখও একদিন থাকবে না। নিজেদের অপরাধ, নিজেদের লজ্জায় ভারে তারা একদিন মিশে যাবে মাটিতে। 'জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ, পুড়বে সকল বন্ধ'—

তবুও—

দ্বিধা আসে। কতটুকু শক্তি আমাদের, কীই বা সামর্থ্য, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স্, তার সংশোধিত ফৌজদারী আইনের নাম দিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। কতটুকু দাম বিনয় বসু, দীনেশ মজুমদার, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ গুপ্ত অথবা প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের আত্মদানের? কোন্ মূল্য আছে অনন্তহরি, প্রমোদরঞ্জন, কাকোরীর রাজেন লাহিড়ী, আসফাক-

উদ্ধা আর লাহোরের ভগৎসিংহের আত্মবলির? দেশের সাধারণ মানুষ—যাদের নিয়ে দেশ; যাদের মুক্তি দেবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় আমরা ঘর ছাড়লাম, কী কৃতজ্ঞতা পেলাম তাদের কাছ থেকে? সুযোগ সুবিধে পেলেই তারা ইন্‌ফর্মার হয়, নেত্র সেনের মতো অবলীলাক্রমে ধরিয়ে দেয় পুলিশের হাতে, ভারতবাসী আই-বি পুলিশ মিথ্যে ষড়যন্ত্র মামলা তৈরী করে, সওয়াল করে ভারতবাসী পাবলিক্ প্রসিকিউটার, শাস্তি দেয় কালো বিচারক। তবে কার জন্ত এই স্বাধীনতার সংগ্রাম, কিসের সমর্থনে?

ইতিমধ্যে একটা বিচিত্র বই পড়েছে রঞ্জু। নতুন নেতার হাতে গড়া একটা নতুন দেশ। অদ্ভুত বই। কথাগুলো ভালো বোঝা যায় না। যিনি লিখেছেন তিনি ভালো করে বোঝাতেও পারেন নি। তবু চমক লেগেছে। সমস্ত মানুষের রাষ্ট্র, তোমার আমার চাষার শ্রমিকের সকলের গড়া রাষ্ট্র। ছোট বড় কেউ কোথাও নেই। সকলের জন্তই সেখানে সব।

রঞ্জুর বিশ্বাস হয়নি। রূপকথার গল্পের চেয়েও আরো অবিশ্বাস্ত আর অসম্ভব বলে মনে হয়েছে সে লেখা। একি সম্ভব? এমন কি হতে পারে? তোমার আমার সকলের দেশ। কেউ বড়লোক নেই, কেউ ছোট নয় কারুর চাইতে। এ কী করে হয়?

বেণুদাকে প্রশ্ন করেছিল: এ কী করে হয়?

বেণুদা বলেছিলেন, ঠিক জানি না।

—আপনার মনে হয় সম্ভব?

—ঠিক ভেবে দেখিনি এখনো।—অনাসক্তভাবে বেণুদা জবাব দিয়েছিলেন: তবে যতটা শুনেছি—ওরা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছে রাশিয়ায়। এক্সপেরিমেণ্টের ফল কী হবে তা অবশ্য এখনো নিশ্চয় করে বলা শক্ত।

—কিন্তু কী চমৎকার!—উচ্ছ্বসিত ভাবে রঞ্জু বলেছিল: যদি এ সম্ভব হয়—

বেণুদা চিন্তিত মুখে বলেছিলেন: যতটা ভাবছ অত চমৎকার হয়তো নয়। ও সম্বন্ধে দু একটা লেখা আমি হালে পড়েছি ইংরেজি কাগজে। ওরা নাকি সাম্যবাদের নামে মানুষের ওপরে বড় বেশি অত্যাচার চালাচ্ছে। ঘর থেকে নিরীহ মানুষকে পথে বের করে দিচ্ছে, টাকা পয়সা লুঠ করছে। এমন কি মেয়েদের সতীত্বের মূল্য পর্যন্ত রাখছে না, তাদেরও সোশিয়ালাইজড্ করে ফেলেছে।

রঞ্জু শিউরে উঠল।

কী ভয়ানক!

বেণুদা বললেন, হ্যাঁ ইংরেজী কাগজগুলো তাই লিখছে। আরো বলেছে যে ওদের যিনি সত্যিকারের নেতা ছিলেন, মতভেদ হয়েছে চক্রান্ত করে দেশ থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই এখনি এত খুশি হয়ো না, পৃথিবীর লোকেরা কেউই ওদের ভালো বলছে না।

রঞ্জু চুপ করে রইল। যেমন ব্যথা বোধ হয়, তেমন বিশ্বাস করতে কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু দির প্রসঙ্গ তুলে তোমার দল যেমন একদিন কালি ছিটিয়ে দিয়েছিল [illegible] আর কবাবাড়ীর [illegible] করে এই নতুন স্বপ্ন-বিলাসকেও যেন কলঙ্কিত করে দিলেন বেণুদা। মেয়েদের সতীত্বের যারা মূল্য দেয় না, তাদের এই সাম্যবাদের অর্থ কী? এতো পাপ—এ অন্যায়, এ ক্ষমার অযোগ্য।

তবু—

তবু শুধু ওইটুকু বাদ দিলে কী চমৎকার হত! বড় লোকের টাকা পয়সা কেড়ে নিক, কোনো আপত্তি নেই রঞ্জুর—হালদার, বিধুবাবু, বাজারের নবীনমাধব সাহা কিংবা মাধোলাল দাগা মাড়োয়ারী—এদের সর্বস্ব লুট করে নিলেও খুশিই হবে রঞ্জু। শীতের দিনে এই শহরের রাস্তাতেই তো ভিখিরীকে ঠাণ্ডায় জমে মরে যেতে দেখেছে সে—কী ক্ষতি হয় রামনগর জমিদার বাড়িটাকে দখল করে ওখানে ওই সব ঘর-ছাড়া মানুষের মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে দিলে? আমার রাষ্ট্র—তোমার রাষ্ট্র। কার ওপর কী অবিচার হয়েছে বা না হয়েছে সে কথা জেনে তার কোনো লাভ নেই; কিন্তু সমস্ত মানুষের এই যে বিপ্লব, এই যে তোমার রাষ্ট্র, আমার রাষ্ট্র—এ বোধ যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোকের প্রাণের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠত! কত বড় কাজ হত তা হলে, কত সহজ হয়ে যেত!

কিন্তু ওই সতীত্বের কথা। সব আলোকে যেন কালো করে দেয়।

আর—বেণুদা বলেছিলেন: ওসব বড় বড় কথা ভাববার সময় নেই এখন। আগে তো ইংরেজ তাড়াতে হবে। তারপরে দেখা যাবে কতটা সম্ভব ও সমস্ত।

তা তো বটে। কিন্তু ইংরেজ তাড়ানো কি সোজা? কত অস্ত্র, কত সৈন্ত-সামন্ত, কত বড় প্রতিরোধ। এর সামনে কী করে দাঁড়াবে তারা, বাধা দেবে কোন শক্তিতে? তিরিশ সালের বন্তার মতো তিরিশের অহিংস আন্দোলনও শুধু কতগুলো অপমৃত্যুরই স্বাক্ষর রেখে গেল, তার বেশি কিছুই না। এ রক্তের বন্তাও কি শেষ পর্যন্ত তাই হবে? বারে বারে যেমন ব্যর্থ হয়েছে—ব্যর্থ হয়েছে গদর দলের অভিযান, সিপাহী ব্যারাকে পিংলের বিদ্রোহের চেষ্টা, রাসবিহারী বোস, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য আর অবনী মুখোপাধ্যায়ের সাধনা, বাঘা যতীনের আপ্রাণ প্রয়াস—আর চট্টগ্রামের প্রাণবলি?

—নাঃ

নিজের মনকে নিয়ে রঞ্জু ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। বিপ্লবের রঙীণ স্বপ্ন কাজের জটিল পথে এসে ঘা খাচ্ছে বারে বারে। ক্লান্তি, হতাশা, নৈরাশ্য। মৃত্যুর রোমান্স্ কেটে গেছে, মাঝে মাঝে পীড়িত বোধ হয় নিজেকে। কতদিন চলবে এইভাবে? শুধু চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে চলা, শুধু ফিস্ ফিস্ করে কথা বলা, বড় জোর দুটো একটা ডাকাতি, আর দিনরাত পৃথিবীশুদ্ধ মানুষকে অবিশ্বাস করে চলা!

দেশের কাজ করছি, অথচ সমস্ত দেশ বাধা দিচ্ছে—আশ্চর্য!

উনিশ শো তিরিশের আন্দোলন তো এ বাধা দেয়নি। লম্পট ব্রিজবিহারী থেকে শুরু করে রেল ষ্টেশনের কুলি পর্যন্ত সাড়া দিয়েছিল

সেদিন—এমন [illegible] মতো [illegible] এই প্রেমায়ের বন্দনা গেয়েছিল : তু হামারা দিলকা রোশনী, তু হামরা জান—

তবে ? এই রক্তঝরা পথে তারা নেই কেন ? ভয় পায় ? তাও তো বিশ্বাস হয় না। সেই মদের দোকানের সামনে বোতলের ঘা খেয়ে যার মাথা কেটেছিল, ক্লাশের সেরা ছেলে মৃগাঙ্ক—যে পুলিশের লাঠির মুখে সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল, তারা কি তাদের চাইতেও কাপুরুষ ? তবে ?

এ প্রশ্নের উত্তর আজকের রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জেনেছে, নিঃসঙ্গ এই অন্তরীণ-বন্দী। কিন্তু সেদিনের রঞ্জু জানত না।

ওই বইটাই মাথার মধ্যে ঘোরে। যদি ওরকম হত—সমস্ত মানুষের রাষ্ট্রে ছোট বড়ো সব মানুষ এক সঙ্গে এগিয়ে আসত লড়াইয়ের জন্যে ? কত সোজা হয়ে যেত এ কাজ। এই রক্তঝরা জটিল নিঃশব্দ যাত্রা যদি রূপায়িত হত লক্ষ কোটি মানুষের জয়যাত্রায় ?

'আয় আয় আয় ডাকিতেছি সবে, আসিতেছে সবে ছুটে'—

গুরু গোবিন্দ। রাশিয়ার লেনিন। কিন্তু এ দেশে কে আছে ? কে দেশের সব মানুষকে এনে ফেলতে পারে এক মহাবিপ্লবের প্রাণ-বন্যায় ?

ধ্যেৎ। অর্থহীন যত ভাবনা। মনের মধ্যে পশ্চাদপসরণের পঙ্গু ভাববিলাস। এ হওয়া উচিত নয়। এর পেছনে কি করুণাদির সেই দুর্বোধ্য কথাগুলোর কোনো প্রেরণা আছে ? কবি শিল্পীর জন্ম এই ক্লান্তির কালো মেঘ নয়, তার শুধু সৃষ্টি, শুধু গান, শুধু স্বপ্ন ?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা তো মনে পড়ে। 'কবি, তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ'—

তবু করুণাদির কথাগুলোকে ভোলা যায় না। ওই কথাগুলোর অন্তরাল থেকে কী একটা উঁকি দেয়, মনকে অস্বস্তির কাঁটায় প্রায়ই পীড়িত করে তুলতে থাকে। কিসের ব্যর্থতা করুণাদির ? এই বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ-সূত্রই বা কোন্‌খানে ? বেণুদার বোনের মুখে এই নৈরাশ্যবাদ মনে হয় দুর্বোধ্য একটা প্রহেলিকার মতো।

আর তা ছাড়া তার কবিতার সত্যিকারের মর্যাদা সে তো পেয়েছে। বিপ্লবী বাংলার বিপ্লবী কবি সে—এই সম্মান তাকে দিয়েছে আর একজন, দিয়েছে তার প্রতিভার সব চেয়ে বড় পুরস্কার। সে মিতা !

হঠাৎ ছলাৎ ছলাৎ করে উঠল বুক।

না—মিতা নয়। এবার থেকে মিতাকে সে মুছে ফেলে দেবে মন থেকে। সেই বর্ষার সন্ধ্যা। আকস্মিক একটা ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটায় যেন শ্বেতপাথরে খোদাই করা হাতখানা ফুলের মালা হয়ে রঞ্জুর মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছিল। কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল তার চোখদুটো, তার মুখখানা। সে তো কোনো বিপ্লবী-নায়িকার মুখ নয়, সে মুখের সঙ্গে মিল আছে রঞ্জুর প্রথম বধূ সেই ছোট মেয়ে উষার, সে চোখের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে সূর্যের শেষ আলোর রাঙা নারিকেল-বীথি মর্মরিত কোনো প্রবালদ্বীপের প্রাসাদে বন্দিনী শঙ্খমালার।

—[illegible]হীন আর বিশ্বাসঘাতকের একই দণ্ড আমরা দিই—সে মৃত্যুদণ্ড !

বেণুদার গলা। গলা নয়, মেঘের গর্জন। রঞ্জুর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথর করে। মিতা নয়, লেনিনের রাশিয়াও নয়। 'একলা চলো, একলা চলো'—

ইতিমধ্যে একদিন আর একটা ঘটনা ঘটে গেল।

শনিবার। অরোরা বায়োস্কোপ হল থেকে ওরা 'বেঙ্গল ল্যাক অ্যাণ্ড দি বিন্ টি,' আর চার্জ অব্ দি লাইট ব্রিগেড্' দেখে বেশ ছোটখাটো একটি দল ওদের। রঞ্জু, পরিমল, জিমন্যাষ্টিক্ ক্লাবের ষণ্ডা ছেলে রোহিণী আর বিশ্বনাথ।

পরিমল বললে, আয়, একটা করে লেমোনেড্ খাওয়া যাক।

লেমোনেডের সন্ধানে রেস্তোরাঁর দিকে এগোতেই একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য চোখে পড়ল। ভেতরের বেঞ্চে চার পাঁচটি ছেলে খুব তরিবৎ করে চা আর চপ-কাটলেট খাচ্ছে। ওরা অনুশীলনের ছেলে, কাজের চাইতে নাকি চেঁচামেচি ওদের বেশি, আর পুলিশের হাতে বোকার মতো পটাপট ধরা পড়তে ওরা ওস্তাদ। এ জন্যে রঞ্জুরা ওদের করুণা করে—অশ্রদ্ধাও করে। আর এম্‌নি মজার ব্যাপার, ওরাও নাকি রঞ্জুদের দলের সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা ঘোষণা করে থাকে।

ওরা চপ-কাটলেট খাক বা না খাক সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু সব চাইতে যেটা আশ্চর্য—তা হল ওদের দলের মধ্যে বসে আছে অজয় দত্ত।

অজয় দত্ত! ওদের নতুন রিক্রুট ছেলে, সে কেমন করে গিয়ে ভিড়ল অনুশীলনের ওই ছোকরাদের পাল্লায় ? লেমোনেড্ আর খাওয়া হল না, এরা কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে রইল।

তারপরে গর্জন করল রোহিণী : হোয়াটস দ্যাট ? হাউ ইজ্ ইট্ ?

ক্লাসে বরাবর ইংরেজিতে ফেল করে রোহিণী। তাই গালি-গালাজ করবার সময় ইংরেজি ছাড়া তার মুখ দিয়ে আর কিছু বেরুতে চায় না।

অনুশীলনের দলটা মুখ ফিরিয়ে তাকালো এদিকে—দেখল এদের। মুহূর্তের জন্যে অজয় দত্তের মুখ পাংশু হয়ে গেল, সে চকিতে মাথা ঘুরিয়ে নিলে অপরাধীর মতো।

রোহিণী বললে, অজয়, কাম্ অ্যাওয়ে।

ও দলের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়ালো। তারও জিমন্যাষ্টিক-করা শক্ত চেহারা, আড়ে বহরে রোহিণীর কাছাকাছিই হবে সে। মারামারির ব্যাপারে শহরের নাম করা ছেলে—বিশু নন্দী।

বিশু নন্দীর গায়ে একটা কলারওয়ালা গেঞ্জী—তার নীচে ফুলে উঠেছে চওড়া বুকখানা। কুদে কুদে চোখে একটা মারাত্মক জিঘাংসা, খাড়া দুটো চোয়ালে উদ্যত খাঁড়ার মতো ভঙ্গি।

বিশু নন্দী শান্ত গলায় বললে, কেটে পড়ো চাঁদ, তোমাদের পাখি পালিয়েছে।

রোহিণীর চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা : নো—[illegible] নট।

বিশু নন্দী তেম্‌নি শান্ত স্বরে বললে, ইয়েস।—তারপর [illegible]

ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়িয়ে আদেশ করলে, চলো সব। অনু[illegible]দলটা উঠে ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরিমল ডাকলে, অজয়, শোনো।

অজয় জবাব দিলে না, যেন শুনতেই পায়নি। কিন্তু জবাব দিলে বিশু নন্দী। কথা বললে না, তার বদলে মুখ ঘুরিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসির চাইতে জুতোর ঘা-ও সহ্য করা সহজ। যেন একটা ধারালো র‍্যাঁদা ঘষে ওদের পিঠের চামড়া শুদ্ধ ছুলে দিয়ে গেল একেবারে।

তাও সহ্য হত, কিন্তু বিশু নন্দীর একজন সহচর যাওয়ার আগে মন্তব্য করে গেল: কাওয়ার্ড-পার্টি!

কাওয়ার্ড-পার্টি! রোহিণী গর্জন করে বললে, দি লাই ইু ইন্ ক্যামেল-ব্যাক্!

ইংরেজিটা ভুল বলেছে রোহিণী, রঞ্জুর একবার ইচ্ছে করল সংশোধন করে দেয় কথাটাকে। কিন্তু রোহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভ্রম সংশোধনের সাহস হলনা আর। খুন চড়েছে রোহিণীর মাথায়, রক্ত চড়েছে চোখে। দাঁতে দাঁতে একটা অদ্ভুত শব্দ করল সে, যেন ধারালো একটা অস্ত্র দিয়ে কেউ আঁচড় কাটছে শক্ত পাথরের গায়ে।

—ফলো মি ফ্রেণ্ডস্—

মৃদু কণ্ঠে পরিমল বললে, মারামারি করবে নাকি?

—মারামারি! না তো কি এই ইন্সাল্ট পকেটিং করব?

—কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?—রঞ্জু জিজ্ঞাসা করল।

—কাউয়ার্ডস্ গো ব্যাক।—খোলার ওপর থেকে ছিটকে পড়া খইয়ের মতো জবাব দিলে রোহিণী: আমাকে গাল দিলে আমি ডাইজেষ্ট করতে পারতাম, কিন্তু তাই বলে পার্টিকে অপমান। যে উইল হ্যাভ্ এ গুড্ লেসন।

—তবু—

—নো—নো!—রোহিণী এবারে হুঙ্কার ছাড়ল: রিভেঞ্জ চাই। আই হ্যাভ লষ্ট মাই টেম্পারেচার—ফলো মি অর গো ব্যাক্।

কথাটা টেম্পারেচার নয়, টেম্পার—রঞ্জু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হন্ হন্ করে এগিয়েছে রোহিণী। সুতরাং অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। বুক দুর দুর করছে, অস্থির চঞ্চলতা জেগেছে সমস্ত শরীরে। কিন্তু পার্টিকে অপমান করা হয়েছে, সব সহ্য হবে, কাপুরুষতার অপমানকে বরদাস্ত করা যাবে না।

পরিমল একবার [illegible] বললে, [illegible]।

রোহিণী শুনতে পেলনা, শুনলে [illegible] ঘুষি ঝেড়ে দিত একটা। কিন্তু বেশি দূর এগোতে হল না [illegible]। সামনেই একটা নির্জন জায়গা, তার ডান দিকে জেলখানার মস্ত মাঠ, বাঁ দিকে প্রকাণ্ড আমের বাগান। সেই আমবাগানের ভেতর দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্নায় দেখা গেল দলটা চলেছে সেই পথ দিয়ে।

রোহিণী জোর পায়ে হাঁটছিল। প্রায় কাছিয়ে এসে একটা হাঁক দিলে: ষ্টপ!

ওরা থেমে দাঁড়ালো। আলো-আঁধারিতে দেখা গেল নক্ষত্রগতিতে ফিরে দাঁড়াল বিশু নন্দী।

রোহিণী বললে, কে বলেছে কাউয়ার্ড পার্টি?

বিশু নন্দী শান্ত গলায় বললে, আমি।

—ড্যাম্ উইথ অনুশীলন পার্টি।—

বিশু নন্দী বললে, হোয়াট!

রোহিণী বললে, কাম অন্!

তারপরেই যা ঘটল সেটা একটু আগেই দেখা চার্জ অব লাইট ব্রিগেডের চাইতেও রোমাঞ্চকর ও ক্ষিপ্র। আকাশ থেকে যেন ঘুষির পর ঘুষি উড়ে পড়তে লাগল, রঞ্জুও চোখ বুজে হাত ছুঁড়ে যেতে লাগল। আঘাত করবার উদ্দেশ্যে নয়, আত্মরক্ষার জন্যে।

—বাপ্—

বিশু নন্দী বসে পড়ল মাটিতে। নাক চেপে ধরেছে এক হাতে, বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ফিকে ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখা গেল তার হাত বেয়ে নেমে আসছে কালো একটা সরু ধারা—রক্ত। রোহিণীও ততক্ষণে মাতালের মতো টলছে। হঠাৎ কতগুলো মানুষের গলার আওয়াজ—কারা যেন আসছে। মুহূর্তে দু-দল দু-দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল, অনেকখানি রাস্তা পালিয়ে পথের ওপর যখন ওরা এসে দাঁড়ালো, তখন ক্ষত-বিক্ষত রোহিণীকে যেন চেনা যায় না। বিশু নন্দীর হাতও ভালোই চলেছে। প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে রোহিণী বললে, খুব শিক্ষা দিয়েছি ব্যাটাদের। কাউয়ার্ডস্।

পরিমল মৃদু হাসল: শিক্ষা কে বেশি পেয়েছে বলা শক্ত। কিন্তু যাক, যথেষ্ট হয়েছে। চলো এবার।

(ক্রমশঃ)

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

যে পথ দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে সেটি পাথরে বাঁধানো। খুব প্রশস্ত না হলেও, নিতান্ত সরু নয়। পথের একধারে পাথরে গড়া অভ্রভেদী উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের কোলে বরাবর বেশ উঁচু টানা রক। সৈন্যগণ এর উপর থেকে দুর্গ রক্ষা করতো। প্রাচীর গাত্রে তীর ধনুক ও বন্দুক ছোঁড়বার উপযুক্ত গবাক্ষ কাটা আছে। অপরদিকে খাড়া পাহাড়, তার উপর দুর্ভেদ্য চিতোর দুর্গের বিপুল সৌধ বা গড়। পথের ধারে ধারে মাঝে মাঝে সূর্য্য, গণেশ, শিবশক্তি, বিষ্ণু ও রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি দেবদেবী ও নানা পৌরাণিক মূর্ত্তি পাথরে উৎকীর্ণ করা আছে। দুর্গের সপ্তদ্বার পার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পর্ব্বত-চূড়ায় উপস্থিত হলুম। পর্ব্বতচূড়া মাটি থেকে প্রায় ৫০০ ফুট উঁচু হবে। উপরে পৌঁছে আমরা গাড়ী থেকে নামলাম। রাজপুতানী তখন একে একে আমাদের দেখাতে লাগলো—

চিতোর দুর্গের ভগ্নাবশেষের মধ্যে

এইখানে ছিল বাপ্পারাওর হাভেলি, এইখানে ছিল বীর হাম্বীরের ঝোপড়া—এইখানে ছিল রাণা কুম্ভের মহল। দুই চোখ আমাদের জলে ভরে উঠলো। 'নাই—নাই—কিছু নাই তার।' সমস্তই ভেঙে চুরে গেছে। পড়ে আছে শুধু কিছু কিছু শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এও যে বেশীদিন থাকবে তা মনে হয় না, কারণ, উদয়পুরের মহারাণার পক্ষ থেকে পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবময় এই ঐতিহাসিক প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি দেখা গেল।

অজস্র আতা গাছ, বনজঙ্গল, কাঁটা লতা, আর বড় বড় ঘাসে ভর্ত্তি হয়ে গেছে পরিত্যক্ত চিতোরের ভগ্ন দুর্গ প্রাঙ্গণ। রাণাকুম্ভের মহলের একদিকের দেওয়ালে একটি আধভাঙা গম্বুজ খাড়া আছে এখনো। যেখানে জহর ব্রত হয়েছিল—দেখলুম সেখানটা ধ্বসে পড়েছে। কাছেই একটি সুড়ঙ্গ পথ। তার মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। শোনা গেল মহারাণী মীরা এই পথে নিত্য গোমুখীতে স্নান করতে যেতেন। এখন সে পথ বন্ধ। প্রবেশ নিষেধ লেখা। আমরা অন্য পথে ঘুরে গোমুখী দেখতে গেলুম। খুব নিকটেই পাহাড়ের কোলে—একটি ঝর্ণার জলকে বাঁধ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি কৃত্রিম জলাশয়। তার
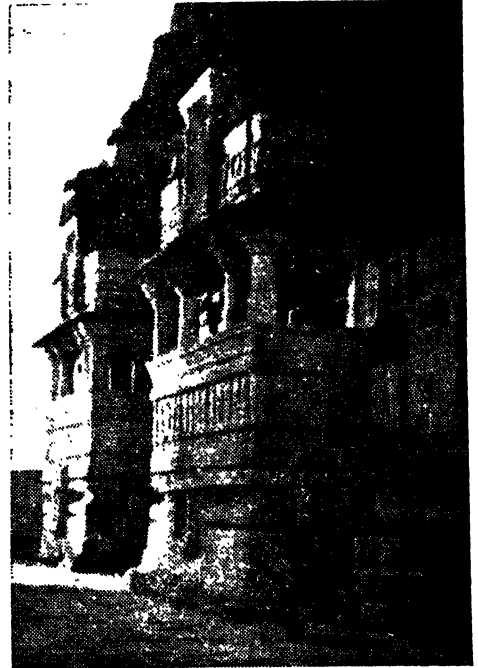
মীরার মন্দিরের মূলদেশ

একদিকে বাঁধানো পাথরের সিঁড়ি ও ঢাকা স্নানের ঘাট আছে। অসূর্য্যম্পশ্যা মেয়েরা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে এখানে স্নান করতে পারেন। কারুর দৃষ্টিপথে পড়বার সম্ভাবনা নেই। জলের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ চোখে পড়লো। কাকচক্ষু স্বচ্ছ শীতল জল। বাবাজী ও বান্ধবী স্নান করলেন। আমরা শুধু জলস্পর্শ করলেম। চিতোর দুর্গের মধ্যে নীলকণ্ঠ শিবের মন্দির ও চিতোরেশ্বরী কালীর মন্দির দেখলুম, কালী মন্দিরের সামনে যূপকাষ্ঠ, বলির পশুরক্তে তখনও লাল হয়ে রয়েছে! এর মধ্যে—আবার জৈন মন্দিরও একটি আছে।

অনেকটা দিলওয়ারা মন্দিরের মতোই। নানা মূর্ত্তি ও অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত। এটিও ভেঙে প'ড়ছিল। তবে জৈনরা সম্প্রতি বহু অর্থব্যয়ে এর সংস্কার ও মেরামত সুরু করেছেন দেখলুম। মীরাবাঈয়ের হরি মন্দির ও জয়মল্লের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখে আমরা বিজয় স্তম্ভ দেখবার জন্য অগ্রসর হলুম। পথে বাঁহাতি একটি জলাশয় চোখে পড়লো। জলাশয়টি মাঝারি আকারের। এটির নাম সূর্য্য কুণ্ড। পদ্মিনী মহলের অবস্থা আরও শোচনীয়। যেখানে রাণা ভীমসিংহের সঙ্গে পদ্মিনীর বিবাহ হয়েছিল আমাদের রাজপুতানী পথপ্রদর্শিকা সেস্থানটি বিশেষ করে আমাদের দেখালেন। শোনা গেল মহীশূরের মহারাজা নাকিহ্' চারদিন আগে এখানে এসে এক যজ্ঞ করে-ছিলেন। যজ্ঞের চিহ্ন অবশ্য রয়েছে

দুর্গপ্রাচীরের ভিত্তিমূলের কারুকার্য্য

মীরার মন্দিরের শীর্ষদেশ

সেখানে তখনো। দুর্গ মধ্যেই নবনির্ম্মিত ফতেসিংহের প্রাসাদে মহারাজা তখনও রাজার অতিথি হয়ে রয়েছেন। আমরা ফতেসিংহের প্রাসাদ দেখে হতাশ হয়েছিলুম, যেমন হতাশ হয়েছিলুম উদয়পুরের মহারাণার জগমোহন প্রাসাদ দেখে। বড়বাজারের ধনী মাড়োয়ারীদের বাড়ী তৈয়ারীর রুচি যে এই সব প্রাসাদ দেখেই হয়েছে, এটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সেই ডিশভাঙা রঙীন কাঁচ বসানো মেঝে ও আয়না লাগানো দেয়াল। দেওয়ালের গায়ে উদ্ভট রংকরা সব চিত্র বিচিত্র ছবি। সৌন্দর্য্যহীন—শোভাহীন—বিকৃত রুচির এক বিদখুটে বিরাট বাড়ী!

চিতোরের জয়স্তম্ভ দেখে কিন্তু, খুশী হলুম। এটিকে তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের দয়ায় Ancient monument Preservation Act অনুসারে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে দেখলুম। লর্ড কর্জন আমাদের যত শত্রুতাই করে থাকুন, ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। এই সঙ্গে টড্ সাহেবের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি যদি রাজস্থানের ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করে না যেতেন, কে আসতো ছুটে আজ রাজপুতানার মরুভূমিতে—আরাবল্লী পর্ব্বতের এই দুর্ভেদ্য উপত্যকায়? চিতোর দুর্গতো আজ এক মহাশ্মশান! কিন্তু, এই শ্মশানের প্রতি ধূলিকণা আজ প্রত্যেক দেশ-প্রেমাভিমানী ভারতবাসীর কাছে পবিত্র তীর্থরেণু বিশেষ।

চিতোর প্রদক্ষিণ করতে করতেই আরাবল্লীর শিখর অন্তরালে সূর্য্য অস্ত গেল। যেমন করে অস্ত গেছে একদিন রাজপুতের গৌরব সূর্য্য। আমরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলুম। জয়স্তম্ভের সন্নিকটেই আমাদের গাড়ী অপেক্ষা করছিল। আমরা যে যার গাড়ীতে উঠে পড়ে ষ্টেশনের রিটায়ারিং রুমের দিকে রওনা হলুম। রাতটুকু এখানে কাটিয়ে পরদিন সকালের গাড়ীতে আমরা আজমীর ও পুষ্কর হয়ে জয়পুর যাত্রা করবো স্থির ছিল।

(আজমীঢ় ও পুষ্কর)

আমাদের ভ্রমণ-সূচী অনুযায়ী আমরা পরদিন সকালে স্নানাহার সেরে বেলা ১২টার ট্রেণে চিতোরগড় ছেড়ে আজমীঢ় রওনা হ'লুম।

পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে 'রিটায়ারিং রুম'খানি খালি পাওয়ায় আমাদের আর হোটেল বা ধর্ম্মশালা খুঁজতে শহরে যেতে হল না। 'রিফ্রেশমেন্ট রুমে' নৈশ ভোজের ব্যবস্থা সেরে একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়া গেল।

ভোরে উঠে প্রভাতী চা ও প্রাতরাশের পর আমরা দুখানি টংগা নিয়ে শহর ঘুরতে বেরুলাম। ভারতের প্রাচীন মোগল শহরগুলির মতো আজমীঢ় প্রবেশেরও অনেকগুলি ফটক আছে। দিল্লী গেট, আগ্রা গেট ইত্যাদি।

চিতোরগড়ের অভ্যন্তরস্থ শিব মন্দির

চতুর্দ্দিকে গগনস্পর্শী উচ্চ পর্ব্বত পরিবেষ্টিত এই আজমীঢ় শহর রাজপুতানার গৌরব স্বরূপ। একদিকে ৮০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'তারাগড়' দুর্গ, আর একদিকে সাবিত্রী পাহাড় ও পুষ্কর হ্রদ আজমীঢ়কে তীর্থ-লোভী ভারতবাসীদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল একটা যোগ রক্ষা করবার সুযোগ দিয়ে এসেছে।

তারাগড় দুর্গ সম্বন্ধে বিশপ হেবার তার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন যে 'আধুনিক য়ুরোপীয় কৌশলের সামান্য কিছু সাহায্য নিতে পারলে এই আজমীঢ় দুর্গ দ্বিতীয় জিব্রল্টার দুর্গের মতই দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে পারে।' এই তারাগড় দুর্গের এমন একটা নিজস্ব স্বাভাবিক সংরক্ষণী রয়েছে যে দেখে মনে হয় প্রকৃতি যেন একে আপনার নিরাপদ অঞ্চল-ছায়ে আগলে রাখতে চান। ভারতের ইতিহাসে তাই তারাগড় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। কর্ণেল টড তাঁর রাজস্থানে এই দুর্গ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন যে, "বিশাল রাজপুতানার প্রবেশ দ্বারে সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে এই দুর্গ।" একে 'পৃথুগড়'ও বলে। মহারাজ পৃথ্বীরাজের দুর্ভেদ্য কেল্লা ছিল এটি। আজ শুধু ভগ্নাবশেষ। তারাগড় দুর্গ অতিক্রম করে আমরা গেলুম আজমীঢ়ের প্রসিদ্ধ 'আয়না সাগর' নামে সরোবর দেখতে।

কুসুমিত তরুলতা ও নানা বৃক্ষরাজি শোভিত 'দৌলতবাগ' উদ্যানের কোলে মার্ব্বেল পাথরে তৈরী এক বিশাল ঘাট বা চাঁদনীর কোলে এই বিশালতর জলাশয়—'আয়না সাগর'। এখানে শুভ্র গভীর নির্জ্জনতার

চিতোরগড়ের অভ্যন্তরস্থ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত জৈন মন্দির

মধ্যে সজল শ্যামল বনশ্রীর রূপ এমন অপরূপ হয়ে উঠেছে যে অত্যন্ত নীরস প্রকৃতির মানুষের চিত্তও এখানে ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ না হয়ে পারে না। এটি স্বাভাবিক জলাশয় নয়। তাজমহলের পরিকল্পক শিল্পী সম্রাট শা'জাহান এই কৃত্রিম হ্রদ এখানে স্থাপন করেছিলেন। সম্ভবত এই বাণিজ্যপ্রধান শহরের অসহ্য হট্টগোল থেকে নিজেকে দূরে রাখবার জন্য!

শা'জাহানের ফুলবাগিচা এই 'দৌলতবাগ' ও 'আয়না-সাগর'-তীরের দুগ্ধশুভ্র মর্ম্মরনিবাস ছেড়ে আর আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু,

আরও অনেক কিছু দেখবার বাকী আছে বলে উঠে পড়তে হ'ল। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া ও আতর পান নিয়ে দুটি মুসলমান পাণ্ডা সকালেই ষ্টেশনে আমাদের সঙ্গে দেখা করে পীর খাজাসাহেবের দরগা আর 'আড়াই-দিন্‌কা-ঝোপ্‌ড়া' দেখতে যাবার জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছলেন। হিন্দু তীর্থযাত্রীরা যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন নন, এটা এঁরা জানেন বলেই অমুসলমানদের আহ্বান করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নি। আজমীড়ের এই পীর খাজা সাহেবের দরগা সকল সম্প্রদায়ের লোকের কাছেই চির অবারিত। যে সর্বত্যাগী ইসলাম ফকিরের সমাধি মন্দির এই দরগা—তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন। আপনার উদার চরিত্র মহিমায় এই ভগবানে আত্মনিবেদিত

ভারতের মহাতীর্থ পুষ্কর হ্রদ

সাধু হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর সে সাত্ত্বিক পবিত্রতার প্রভাব আজও অন্তর্হিত হয়নি। তাই আজও কত শত শতাব্দী কালসাগরে মিলিয়ে যাবার পরও এই ধর্মাত্মা সাধুর সমাধিস্থলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এখনও তাদের সশ্রদ্ধ সেলাম নিবেদন ক'রে যায়। শিরণী ও পূজা দিয়ে আসে। প্রসাদ নেয়।

'আড়াই-দিনকা ঝোপ্‌ড়া' নামটার একটু ইতিহাস আছে। এটি ছিল একটি প্রাচীন জৈন মন্দির। অদ্ভুত কারুকার্য্যখচিত এই মন্দিরটিকে মহম্মদ ঘোরী লুঠ করেও আড়াই দিনের মধ্যে ভেঙে চুরে বদলে এটিকে মুসলমানী মসজিদের রূপ দেবার চেষ্টা করে। কতকটা সাফল্যলাভ যে হ'য়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে, এখনও চেনা যায়। এটি এখন একটি ইসলাম ধর্মের উপাসনা মন্দির। রম্য স্থাপত্যকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন এই মসজিদের সর্ব্বাঙ্গে। শোনা যায় মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে বহু শিল্পী নিয়োগ করে এই হিন্দু মন্দিরের রূপান্তর সাধন করা হয়েছিল। বাস্তুশিল্পের দিক থেকে নির্ম্মাণ সৌকর্য্যে ও গঠন সৌন্দর্য্যে দিল্লীর প্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদকেও এই উপাসনা মন্দিরটি অতিক্রম করেছে বলা চলে। সর্ব্বত্রই শ্বেত মর্ম্মরের ছড়াছড়ি। এটি যে এককালে চৌহানরাজ বিশলদেবের তৈরী একটি হিন্দু মন্দির ও বিদ্যালয় ছিল একথা আজ আর কারুর স্মরণ নেই।

খাজাসাহেবের দরগার মধ্যে আকবরীমশজিদ্ এবং শাজাহানের তৈরী জুম্মামশজিদ ছাড়া আরও একটি দ্রষ্টব্য হ'ল 'বুলন্দ দরওয়াজা' বা বিরাট এক তোরণ দ্বার। এর মধ্যে 'মহ্‌ফিলখানা' আছে এবং নমাজ করবার পূর্ব্বে উপাসনার্থীদের ওজু করবার জন্ত একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। বুলন্দ্ দরওয়াজার দুই পাশে দুটি বিশাল লৌহ-কটাহ বা ডেকৃচি বেদীর উপর বসানো আছে। শোনা গেল যে ফকির সাহেবের স্মৃতি উৎসবের দিন প্রতি বৎসর এর মধ্যে প্রচুর চাউল ঘৃত চিনি ও কিসমিস বাদাম পেস্তা এলাচ লবঙ্গ ইত্যাদি দিয়ে অতি সুস্বাদু পোলাও রান্না হয় এবং দরিদ্র ভিক্ষুকদের ইচ্ছামত এই সুস্বাদু পোলাও লুট ক'রে নিয়ে খেতে দেওয়া হয়। এক হাঁড়ি পোলাও রান্নার ব্যয় এখন ৮০০০্ টাকা! আগে নাকি দু' হাজার টাকায় হ'ত!

আজমীড়ের অপর দিকে সম্রাট আকবরের প্রবাসবাসের জন্ত একটি প্রাসাদ ছিল সেটি আপাতত একটি চমৎকার রাজপুত শিল্পের যাদুঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা অনেকক্ষণ এই যাদুঘরটি ঘুরে ঘুরে দেখলুম। সমগ্র রাজপুতানার বিবিধ বিচিত্র প্রাচীন শিল্প সম্ভার এখানে সঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। রাজপুতের দেশের এমন কোনও ললিতকলা, রম্য শিল্প, চারু কারু এবং চিত্র ও ভাস্কর্য্য নেই, যার নিদর্শন এই আজমীড় মিউজিয়মে দেখতে পাওয়া যায় না।

মিউজিয়ম দেখে ফেরবার পথে আমরা আজমীড়ের প্রসিদ্ধ জৈন বিলাস সৌধ 'সোনীমন্দির' বা সোনা মন্দির দেখে নিলুম। এটি কলকাতার পার্শনাথের মন্দিরের মতো একটি খেলাঘর বলে মনে হল। এর মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে যে সব ঘর বাড়ী বাগান পুতুল জীবজন্তু রথ ও খেলনা ইত্যাদি ও অন্তান্ত সৌখীন সামগ্রী তৈরী করে রাখা হয়েছে সেগুলি শিশু ও কিশোরদের উপভোগ্য বটে! নবনীতা এই সোনা মন্দির দেখে ভারী খুশী! এর মধ্যে যা দেখে তাই ওর নিয়ে খেলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোনোটাতেই হাত দেবার উপায় নেই। কাঁচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চারিদিকে বড় বড় আয়না লাগানো। শোনাগেল এই খেলনা-গুলি তৈরী করতে শিল্পীদের নাকি পঁচিশ বছর সময় লেগেছে এবং কোটী টাকার উপর ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের চেয়ে অপব্যয় বললেই ভাল হয়। কারণ, এটি দেখে মনে হ'ল—কোনোও এক অপরিণত-মন কোটীপতির হাস্তকর খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। সম্ভবত: শৈশব কেটেছিল তাঁর অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে। খেলনার প্রতি একান্ত লোভ ছিল কিন্তু দৈন্তের জন্তু অর্থাভাবে খেলনা নিয়ে খেলবার কোনও সুযোগ পান নি। সেদিন সেই দুঃখী ছেলেটি বোধ হয় মনে মনে এই সংকল্প করেছিল যে ভগবান যদি কখনো আমাকে যথেষ্ট পয়সা দেন তবে আমি আমার মনের সাধ মিটিয়ে এমন এক খেলাঘর বানাবো যে রকম পৃথিবীর কোনও ছেলের নেই! তাঁর সে সংকল্প এ মন্দিরে সিদ্ধ হয়েছে দেখলুম।

আজমীড়ের বর্ত্তমান গৌরব হল এর 'মেয়ো কলেজ'। রাজপুতানার যুবরাজদের বিতালয়! প্রত্যেক রাজা মহারাজার দানে ও দত্তে এটি একটি বিশাল আবাসিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে!

ফিরে এসেই দেখি পুষ্কর সাবিত্রীর পাণ্ডাঠাকুর এসে অপেক্ষা করছেন। শ্রীমতী বললেন আমি ও ছুটোই একাধিকবার দেখে এসেছি। আমি আর যাব না, বড় ক্লান্ত। অগত্যা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত চৌকীদার হিসাবে আমাকেও থাকতে হ'ল। তখন পাণ্ডার সঙ্গে রওনা হলেন বান্ধবী, নবনীতা ও বন্ধুপুত্রটি।

আমরা তখন 'পাঠশালার' তদানিন্তন প্রাহিকা কুমারী নন্দিতা চ্যাটার্জ্জির নিমন্ত্রণ রাখতে আজমীড়ে তাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। সে কলকাতায় আমাদের বাড়ী এসে নিমন্ত্রণ করে গেছলো। বাঙালীদেরও এখানে একটি কীর্ত্তি আছে। নন্দিতা চ্যাটার্জ্জির জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য এখানে বাঙালীদের জন্ত একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন করেছেন। ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠাতা বৃদ্ধ চাটুজ্যেমশাই নিজে আমাদের সঙ্গে করে দেখিয়ে নিয়ে এলেন। দ্বিতল বাড়ী রাস্তার উপর। আলো বাতাস আছে। এই অতিথি-শালার নীচেই এঁদের চেষ্টায় বাঙালীদের জন্ত একটি মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছে। এঁদের স্বজাতি প্রীতি প্রশংসনীয়। 'পুষ্কর' ও 'সাবিত্রী' যাত্রী বাঙালীদের সকল অসুবিধা এঁরা দূর করেছেন। আমাদের এঁরা খুব আদর যত্ন করেছিলেন। পরদিন সকালে ওরা ষ্টেশনে দেখা করতে এল। নবনীতা তার নন্দিতা দিদির কাছে একটি পেপার ম্যাশের রঙীণ পাখী উপহার পেয়ে ভারী খুশী। আজমীড়ের বাঙালীদের সম্বন্ধে কত গল্প শুনলুম। নন্দিতার বাবা এখানকার একজন বড় ডাক্তার।

চিতোরগড়ের অভ্যন্তরে ফতেসিংহের নবনির্ম্মিত প্রাসাদ

পুষ্কর ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ। আজমীড় থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে। পুষ্করের পবিত্র জলে অবগাহন স্নান করলে কোটী জন্মের পাপ ক্ষয় হয়। ভারতের অতি প্রাচীন তীর্থ এই পুষ্কর। কাব্যে ও পুরাণে এর উল্লেখ আছে। বহু ধর্ম্মশালা ও পাণ্ডাদের আশ্রয় ছাড়াও এখানে মহারাজা ভরতপুরের রাজবাড়ীতে তীর্থযাত্রীদের আশ্রয় দেওয়া হয়। বাড়ীখানি একেবারে পুষ্কর হ্রদের এক কোণ ঘেঁসে উঠেছে। এখান থেকে হ্রদের চারিদিক বেশ দেখা যায়। এই পুষ্কর হ্রদ ঘিরে বহু ধর্ম্মপ্রাণ রাজা মহারাজা 'অত্তে নারায়ণ ব্রহ্মপদ' লাভের আশায় ছোট বড় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে রেখেছেন। হ্রদের জলে পাহাড়ের ছায়া

এবং প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির প্রতিবিম্ব ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো দেখায়। হ্রদের মধ্যস্থলে ছোট একটি পাহাড়ের উপর প্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞবেদী

সাবিত্রী পর্ব্বতের পথে ডুলির মধ্যে নবনীতা

আছে। সারা ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র নানা দেবদেবীর অসংখ্য মন্দির ও মূর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার মন্দির মাত্র এই পুষ্করেই একটি আছে। অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরও এখানে আছে, যেমন লক্ষ্মীমন্দির ইত্যাদি, কিন্তু পিতামহ ব্রহ্মাকে ভারতবর্ষে আর কোথাও এমন মন্দির গড়ে সম্মানিত করেনি তাঁর অকৃতজ্ঞ সন্তানেরা। এই মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উপর চতুর্ম্মুখের বাহন শ্রীহংস বিরাজ করছেন।

দেবদেবীদের মতো পুষ্করের দুবেলা আরতি ও পূজা হয়। যেমন মথুরায় যমুনার আরতি ও পূজা হয়। পুষ্করের পাশেই সাবিত্রী পাহাড়। নাগ পর্ব্বত ভেদ করে একটি গিরিপথ এই দুই তীর্থস্থানে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা করে দিয়েছে। সাবিত্রী পাহাড়ের সঙ্গে সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যানের কোনও সম্বন্ধ নেই। ব্রহ্মার দুই পত্নী গায়িত্রী ও সাবিত্রী। গায়ত্রী দেবী এখানেই ব্রহ্মার বিরাট মন্দিরের মধ্যে চতুর্ম্মুখের পাশেই বিরাজ করছেন। কিন্তু, সাবিত্রী দেবী বোধ করি সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা ও স্বামীর প্রতি অভিমান করে ভিন্ন এক পর্ব্বতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন! কিন্তু, পূজা তার পুষ্করের জলেই হয়, আর আয়তী রক্ষার ব্যাকুল সতীদের মধ্যে এঁরই শাঁখা সিঁদুর ও হাতের 'নোয়া'র জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়! কত টন লোহা যে এই ষ্টীল কণ্ট্রোলের যুগে এখানে বিনা পারমিটে বিক্রয় হ'চ্ছে তার সংখ্যা হয় না। সিঁড়ি বয়ে পাহাড়ে ওঠা শক্ত বলে বান্ধবীসহ নবনীতা ডুলি চড়ে উপরে উঠেছিলেন। তাঁরা ফিরে এলেন প্রায় সন্ধ্যার পর। (ক্রমশঃ)

সঙ্কলন

আমেরিকা হইতে আমদানী 'হোয়াইট-অয়েল' নামক একপ্রকার সাদা স্বাদগন্ধহীন তরল পদার্থ লক্ষ লক্ষ পিপা জাহাজ হইতে নামিয়া কলিকাতার তৈলব্যবসায়ীদের গুদামে আসিয়া জমিতেছে। ঐ তৈলসদৃশ দ্রব্যের দর মাত্র ৩৬৲ টাকা মণ। ঐ তৈল অতিলোভী ব্যবসায়ীগণ বাঙ্গালীর নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরিসার তৈল ও নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সরিসার তৈল প্রায় ৭৫৲ টাকা, নারিকেল তৈল প্রায় ৬৮৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে। আমাদের সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগীয় ধুরন্ধরগণ যে তৈল নাকি ব্যবহার করেন তাহা অন্ততঃ খাঁটি বলিয়া জনসাধারণের ব্যবহার্থ তৈলের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। কলিকাতার বক্ষে যে-এরূপ মানুষ-মারা ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা কি তাঁহারা অবগত নহেন? —দামোদর

* * *

কয়েকমাস পূর্ব্বে যখন পশ্চিম বঙ্গে বস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হইল তখন জনসাধারণ কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া তো দূরের কথা, দেখিতেও পাইল না। অকস্মাৎ যেন বাজার হইতে কাপড় হাওয়া হইয়া গেল এবং তাহাতেও যাহা বা মিলিল তাহারও এত অসম্ভব উচ্চ মূল্য যে জনসাধারণের পক্ষে তাহা ক্রয় করা দুষ্কর। অথচ সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে, নিয়ন্ত্রণের সময়ে যে পরিমাণে বস্ত্র প্রেরিত হইত এই কয়েক মাসে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী কাপড় পাঠানো হইয়াছে। আর কাপড়ের মূল্যের জন্য সরকারকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সরকার যেদিন হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়াছে, সেদিন মিলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা গিয়াছে। আর এত অধিক পরিমাণে কাপড় বা কেন লাগিতেছে? একথা কাহারও আজ অজানা নাই যে এই কাপড় পশ্চিম বঙ্গের লোকে ব্যবহার করিতেছে না, বহু কাপড়ই চোরাই হইয়া পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছে। আর এই চোরাই কারবারী কাহারা? শিক্ষিত জনসাধারণ, ছাত্র, অধ্যাপক, ডাক্তার পর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত। সরকারকে দোষ দেওয়া হইতেছে, কেন এই চোরাকারবারীদের দমন করা হইতেছে না? কিন্তু আমাদের উত্তর এই যে পূর্ব্বপাকিস্থান সীমান্তের ২০০ মাইল পাহারা দিবার জন্য যে রক্ষী বাহিনী প্রয়োজন তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে হইলে সরকারের অন্য সমস্ত খরচ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই দুর্নীতি প্রতিরোধের খুব সহজ ব্যবস্থাই হইতে পারে যদি জনসাধারণ নিজেরাই উদ্যোগী হয়। প্রত্যেক পল্লীতে যদি একটা সমিতি গঠন করিয়া দেখা হয় যে সেই পল্লীতে কাহাকেও এই চোরাকারবার করিতে দেওয়া হইবে না বা কাহাকেও এই অন্যায় সাধনায় কোনও প্রকার সহযোগিতা করা হইবে না, তবে অনেক পরিমাণে এই চোরাকারবার কমিয়া যাইবে। কিন্তু কোথাও এতটুকু

সহযোগিতা তো নাইই, এমন কি জনসাধারণের মধ্যে এতটুকু সুষ্ঠু চিন্তাধারারও লেশ নাই। আছে কেবল তিক্ত কটু সমালোচনা, যে সমালোচনা শুধু জনসাধারণের মনে সরকারের অন্যায় বিদ্বেষেরই সঞ্চার করে, কিন্তু দেশের এতটুকুও কল্যাণ করে না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষিত সংবাদপত্রসেবীদের মধ্যেও এই রোগ বিস্তারলাভ করিয়াছে। তাঁহারাও স্বাধীনতার নামে সংবাদ বিতরণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিতেছেন। —'নির্ণয়'

* * *

বোম্বাইএর পুলিশ কমিশনার 'জনস্বাস্থ্য ও ভদ্রতার' জন্য সহরের সিনেমা হলগুলিতে ধূমপান নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বোম্বাই পুলিশ আইনের ২৪৯ ও ২৬৯ নিয়মানুসারে এই নির্দ্দেশ জারী করা হইয়াছে এবং ইহা অমান্য করিলে অর্থদণ্ড হইবে। বোম্বাই-এর পুলিশ কমিশনারের এই সুবিবেচনার জন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি এবং কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মহাশয়কেও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ট্রামে, বাসে, সিনেমা ও থিয়েটার হলে অধিকাংশ ধূমপায়ীই অবিবেচক এবং পার্শ্ববর্ত্তীর অসুবিধা সম্বন্ধে উদাসীন। অপরের গায়ে ছাই পড়িলে অথবা আগুনের ফুলকিতে জামা কাপড় পুড়িলে ধূমপায়ী কদাচিৎ লজ্জিত হয়, যেন ইহা অতি সাধারণ ঘটনা। সিনেমা হলের বদ্ধগৃহে চুরুট, সিগারেট ও বিড়ীর মিশ্রিত গন্ধে নারী ও শিশুদের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। আবেদন করিয়া লোককে এই নিন্দনীয় অভ্যাস হইতে বিরত করা সম্ভবপর নহে। অতএব কলিকাতার পুলিশ কমিশনার যদি জনস্বাস্থ্য ও শালীনতার জন্য অবিলম্বে বোম্বাই-এর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি বিরক্ত ও উপদ্রুত নাগরিকদের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

—অরণি

* * *

ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা স্যার বি এন রাও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবে জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে আগামী ৩০ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা হইবে ৬০ কোটি। জনসংখ্যা যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে খাদ্যোৎপাদন নাকি সেই হারে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই। স্যার বি এন রাও'এর মতে ইহাই ভারতের মূল এবং প্রধান সমস্যা। যেখানে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না, সেখানে লোকসংখ্যা যাহাতে অতি দ্রুত বৃদ্ধি না পায় সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বলা বাহুল্য, তাহা করিতে হইলে শুধু শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, তজ্জন্য উপযুক্ত আইনের আশ্রয়ও লইতে হইবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

* * *

পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে ষষ্ঠবিংশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দিরের পক্ষ হইতে বিহার গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার সে অনুমতি দান করেন এই সর্তাধীনে যে, অধিবেশনে কোনরূপ রাজনৈতিক অথবা প্রাদেশিক ব্যাপারের আলোচনা করা চলিবে না। এইরূপ সর্তারোপ অতিশয় অনিষ্টকর ও অপমানজনক বোধে প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য ডেপুটি কমিশনারের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া পাঠান, কিন্তু অধিবেশনের নির্ধারিত তারিখ অতিবাহিত হইয়া যাইবার পরেও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহার কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। সম্পাদক মহাশয় ডেপুটি কমিশনারের নিকট লিখিত তাঁহার পত্রে রাজনীতি ও প্রাদেশিকতা শব্দ দুইটির সুস্পষ্ট অর্থ জানিতে চাহেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ইহাও জানাইয়া দেন যে, ওই শব্দ দুইটির সঙ্কীর্ণতর অর্থে যাহা বুঝায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ঐতিহ্য তাহার বহু উর্দ্ধে অবস্থিত, কিন্তু উদার ও ব্যাপকতর অর্থে রাজনীতি বলিতে যাহা সাধারণতঃ বুঝা যায়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানরূপে সাহিত্য মন্দির তাহার আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে পারে না, কারণ রাজনীতি বস্তুতঃ সংস্কৃতির প্রভাবাধীন। সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি ও যুক্তির মধ্যে কুণ্ঠা বা কপটতার লেশমাত্র নাই, তাহা অতি সুস্পষ্ট। এরূপ ক্ষেত্রে 'বিহার গবর্ণমেণ্ট যদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সততা ও মর্য্যাদাবোধের উপর নির্ভর করিয়া প্রার্থিত অনুমতি প্রদান করিতেন তাঁহাদের পক্ষে সুবিবেচনার কার্য হইত, তাহা না দেওয়া অন্যায় হইয়াছে এবং সম্পাদকের পত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকা হইয়াছে আরও অসঙ্গত ও অশোভন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

* * *

গত ৩রা ভাদ্র সাংবাদিক সম্মেলনে কয়লা কমিশনার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সিংহ বলেন, গত ১৮ মাস ধরিয়া কয়লাশিল্প নানারূপ বিপদ-আপদের মধ্য দিয়া চলিয়াছে এবং বর্ত্তমান অবস্থাকে—সঙ্কট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। খনিগুলিতে রেলের অব্যবস্থার জন্য ২৫ লক্ষ টন কয়লা পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল "উৎপাদন বৃদ্ধি কর, না হয় ধ্বংস হও।" কয়লার ব্যাপারে দেখা যাইতেছে উৎপাদন বৃদ্ধি করাতেই ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে; কারণ, কুলীমজুরের বেতন দিয়া কয়লা তুলিয়া তাহা যদি চালান করিয়া বিক্রয় করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ বিত্তশালী খনিওয়ালা ব্যতীত অপরকে ঘোর অসুবিধায় পড়িতে হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ দিয়া কলিকাতায় সকল রকমের প্রত্যহ ১৫০ মালগাড়ী আসিবার ব্যবস্থা সরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ ধানবাদ হইতে কলিকাতায় প্রত্যহ ৭০ খানির অধিক কয়লাবাহী মালগাড়ী আসে না। অবস্থার ইহা একটি নমুনা মাত্র; কারণ, কলিকাতাই সমগ্র ভারতরাষ্ট্র নহে। সর্ব্বত্র এই অনিয়ম চলিতেছে।

—হিন্দুস্থান

* * *

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর ছবি প্রত্যেক সরকারী অফিসে রক্ষিত হইবে। গান্ধীজীর প্রায় এক হাজার ছবি বিভিন্ন অফিসে প্রেরিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই নির্দেশ সর্বান্তঃকরণে সমর্থনযোগ্য। কিছুকাল আগে সংবাদ বাহির হইয়াছিল যে, মাদ্রাজ প্রদেশের একটি জটিল মামলা মহাত্মাজীর ছবির প্রভাবে আপোষে মিটিয়া গিয়াছিল। বাদী ও বিবাদী পরস্পর আত্মীয়স্থানীয়। মামলাটি নিতান্ত জেদের মামলা। বিচারক বাদী ও বিবাদীকে আদালত গৃহে রক্ষিত গান্ধীজীর ছবি দেখাইয়া মামলা মিটাইয়া ফেলিতে অনুরোধ করেন। মামলাটি মিটিয়া যায়। গান্ধীজীর প্রভাবের ইহা একটি সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া আপোষে বিবাদ মিটানো যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, আদালত গৃহ ও অন্যান্য কর্ম স্থল তাঁহার ছবি রাখিবার প্রকৃষ্ট স্থান। গান্ধীজীর ছবি সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিবে—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

* * *

আধুনিক চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণ যাহাতে গ্রামাঞ্চলে থাকিয়া জীবিকা অর্জনে উৎসাহিত হন, তাহার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। চিকিৎসক, ঔষধ এবং হাসপাতাল—এই তিনটি বিষয়েরই গ্রামাঞ্চলে বড় অভাব। দেশের রাজস্বের বড় অংশের যোগান দিয়াও গ্রামবাসী আজ পর্য্যন্ত সরকারী দান এবং অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। যেমন চিকিৎসক সমাজ তেমনি হাসপাতালগুলি, উভয়েই সহরে ভীড় করিয়া রহিয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন তাহা করিতে থাকুন, কিন্তু দেশের চিকিৎসক সমাজের প্রতি গ্রামবাসী সাধারণের বিশেষ একটি দাবী আছে। তাহা হইল মানবতার দাবী। চিকিৎসক সমাজ যদি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বর্তমান গ্রামজীবনের অসুবিধা কিছুটা স্বীকার করিয়া, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসাব্যবসায়ে উদ্যোগী হন, তবে তাঁহারা নিতান্ত জীবিকা অর্জনের সন্তোষ নহে, মানবসেবার আনন্দও অর্জন করিবেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে যোগদানান্তে সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট তাঁহার ইংলণ্ড ভ্রমণ সম্পর্কে যে বিবৃতি তিনি দিয়াছেন তাহাতে ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখদুর্গতির বিষয়ে তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রাণধারণোপযোগী অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের একান্তই অভাব। বাসস্থানের সমস্যা ততোধিক। এই কঠোর পরিবেশে ইংলণ্ডে অবস্থানকারী ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের যে নানাবিধ অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতে হইতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। ইহার উপর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে ভর্তি হইবার অসুবিধা, কারিগরী শিক্ষায়তনগুলিতে উপযুক্ত সুযোগের অভাব ভারতীয় ছাত্রদের দুর্গতিকে আরও বহুগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের শুধুমাত্র ডিগ্রী লাভার্থে ইংলণ্ডে শিক্ষালাভের জন্য যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার সুনিশ্চিত অভিমত এই যে কেবল মাত্র উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষালাভের জন্যই ভারতীয় ছাত্রদের ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বারস্থ হওয়া উচিত।

—স্বরাজ

* * *

বিদ্যালয় শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে আবশ্যক সুপারিশাদি সহ তাঁহাদের রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টের বরাবরে দাখিল করিয়াছেন। গত ২০শে শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এক সাংবাদিক বৈঠকে উক্ত রিপোর্টের প্রধান প্রধান ধারাগুলি ঘোষণা করেন। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে তাঁহাদের রিপোর্ট দিয়াছেন। বর্ত্তমান রিপোর্টের ফলে বিদ্যালয় শিক্ষার সর্ব্বশেষ স্তর পর্য্যন্ত কমিটির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল। অবশ্য বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির কাজ এখনও শেষ হয় নাই; বর্ত্তমানে কমিটির বিভিন্ন সাব-কমিটি প্রস্তাবিত বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যতালিকা প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। সাব-কমিটিগুলির সুপারিশ বিবেচনা করিবার পর শিক্ষা কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন।

—যুগান্তর

* * *

মালয়, বর্ম্মা, শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, চীন—এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আজ অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, কোথাও বৈদেশিক ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হইয়াছে, কোথাও বা স্থানীয় জনসাধারণের দুই পরস্পর-বিরোধী অংশের মধ্যে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে অথবা বাঁধিবার উপক্রম দেখা দিয়াছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে আজ যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার পরিণাম কি হইবে এবং আমাদের দেশের উপর ও সাধারণভাবে সমগ্র এশিয়া মহাদেশের উপর ইহার কিরূপ প্রভাব পড়িবে সে সম্পর্কে আমাদের পক্ষে আজ আর উদাসীন থাকা সম্ভব নয়।

—পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

* * *
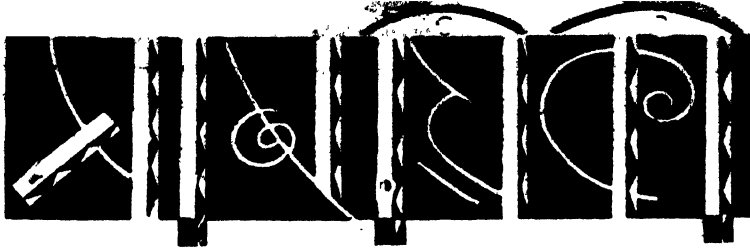
স্বাধীনতার এক বৎসর—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—গত ১৫ই আগষ্ট সর্ব্বত্র তাহার সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। এই এক বৎসরে স্বাধীন ভারতে দরিদ্র জনগণের কি সুবিধা ও অসুবিধা হইয়াছে, দেশবাসী ঐ দিন তাহারই আলোচনা করিয়াছে। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতা লাভের কয় মাস পরেই ভারতের রাষ্ট্রীয় পিতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান ঋত্বিক মহাত্মা গান্ধী গত ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে ভারতকে খণ্ডিত করিয়া ভারতের মধ্যে স্থায়ী বিরোধের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের এক সীমান্তে অবস্থিত হইলেও উহা পশ্চিম হইতে ভারতে প্রবেশের পথ স্বরূপ ছিল—উহা পাকিস্তানের মধ্যে যাওয়ায় সীমান্ত সমস্যা লইয়া এক চিরন্তন বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের চারিদিকে ভারতীয় রাজ্য অবস্থিত—কাজেই এখানেও সীমান্ত সমস্যা, লোকজনের যাতায়াত সমস্যা প্রভৃতি সর্ব্বদা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগকে বিব্রত করিতেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর কাশ্মীরের যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত প্রায় এক বৎসর ধরিয়া কাশ্মীরে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে কত লোক ক্ষয় হইয়াছে ও কত অর্থ নষ্ট হইয়াছে, সে কথা আজ বলার প্রয়োজন নাই। কবে যে সে যুদ্ধ থামিবে, তাহাও বলা কঠিন। তাহার পর হায়দ্রাবাদ রাজ্য মুসলমান-শাসিত হইলেও তাহার অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু, রাজ্যের চারিদিকে হিন্দুস্থান এলাকা। তাহা সত্বেও হায়দ্রাবাদের শাসক নিজ রাজ্য পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করায় সে সমস্যাও ক্রমে সঙ্গীণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবাছে। সেখানেও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ও তাহার ফল উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই ভীষণ ক্ষতিকর হইবে সন্দেহ নাই।

স্বাধীনতা দিবসে লাটপ্রাসাদে আর্ট সোসাইটির সদস্যবৃন্দ সহ প্রদেশপাল

ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই এতকাল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় একত্রে বাস করিত। আজ পাকিস্তান স্বতন্ত্র হওয়ায় পাকিস্তানে হিন্দুর পক্ষে বাস করা অসম্ভব হইয়াছে। তাহার ফলে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ, সিন্ধুদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে সকল হিন্দু চলিয়া আসিয়া হিন্দুস্থানে বাস করিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান চারিদিকে হিন্দুরাজ্য বেষ্টিত হইলেও সেখানে হিন্দুরা আর নিরাপদে বাস

করিতে পারিতেছে না।" কতক ভয়ে ও কতক অর্থ-নৈতিক কারণে পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া প্রায় সকল হিন্দু পশ্চিম বাঙ্গালায় চলিয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় সেই সকল বাস্তত্যাগীদের সমস্তা সমাধান করা হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রপরিচালকদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই-ভাবে বহু মুসলমানও রাষ্ট্রনীতিক সুবিধা লাভের জন্ত পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে। লোক বিনিময় না হইলেও লোক স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া বাস্ত ত্যাগ করায় কত লোক যে কষ্টে পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে যে সর্ব্ব ভারতীয় (হিন্দুস্থান) মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, তাহার সদস্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম
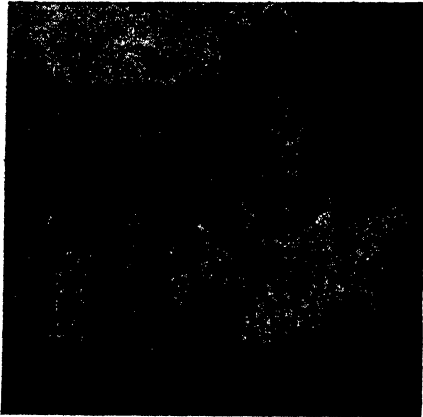
বঙ্গভাষাপ্রসার সমিতিতে স্বাধীনতা উৎসব

ও অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও এই বাস্তত্যাগী সমস্তার সুসমাধান করিতে পারেন নাই, তাহা করাও কোনদিন সম্ভব নহে।

এই সকল বড় সমস্তা ছাড়াও নূতন ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে বহু ছোট ছোট সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে—গত ৬।৭ বৎসর বিরাট যুদ্ধের ফলে সকল দেশেই যেমন অর্থনীতিক বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে, ভারতেও সেইরূপ মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিষম অর্থনীতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে এখানে গত কয় বৎসর ধরিয়া ধনিক-শ্রমিক সমস্তাও ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। সে সমস্তার সমাধান আদৌ সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। জাপানের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে বৃটেন ভারতকে যুদ্ধ-কেন্দ্রে পরিণত করায় ভারতের খাদ্য-সমস্তা, বস্ত্র-সমস্তা, যানবাহন-সমস্তা সমস্তই এমনভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তাহা সুসংবদ্ধ করিতে বহু শ্রম, অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। তাহার উপর রাষ্ট্রের নূতন কর্ণধারগণের রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে অভিজ্ঞতাও ছিল না। সেজন্ত প্রায় এক বৎসর কাল ভারতের রাষ্ট্র-পরিচালকগণ লর্ড মাউন্টবেটেনের মত একজন অভিজ্ঞ রাষ্ট্রচালককে ভারত রাষ্ট্রের বড়লাট করিয়া রাখিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া দেশশাসন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া কেন্দ্রে বা প্রদেশসমূহে যাঁহারা মন্ত্রীর কাজ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, সততা, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি থাকিলেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা না থাকায় একদল

শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ
(সম্প্রতি ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন)

স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারী উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেশকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কয় বৎসরের মহাযুদ্ধ ও তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ ভারতবাসী জনগণের যেমন শারীরিক ক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, তেমনই তাহাদের মানসিক অবনতিও সাধন করিয়াছে। তাহার ফলে দেশে জনগণের মধ্য হইতে সততা ও সদ্‌বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া সর্ব্বত্র দুর্নীতি বিকটভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে।

এই অবস্থায় এক বৎসরের মধ্যে সকল অভিযোগের প্রতীকার করা কাহারও পক্ষে সাধ্যায়ত্ত বা সম্ভব নহে—একথা আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর চিন্তা করার বিষয়। সকলেই আশা করিয়াছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল অভাব দূরীভূত হইবে, আমাদের

সকল অভিযোগের অবসান ঘটিবে। কিন্তু তাহা না হইয়া বরং নূতন অবস্থায় জনগণের দুঃখকষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে—খাদ্যসমস্যা আরও সঙ্কটজনক হইয়াছে। ভারতে যে খাদ্য উৎপাদিত হয়, তাহা দ্বারা ভারতবাসীর বৎসরে ৭।৮ মাসের অধিক চলে না—কাজেই বাকী ৪।৫ মাসের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমদানী কার্য্য বর্ত্তমানে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য—বিদেশে খাদ্য-শস্যের মূল্য বাড়িয়াছে, জাহাজ প্রভৃতির ভাড়া ও শ্রমিকদের দেয় পারিশ্রমিক বাড়িয়াছে—কাজেই ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে খাদ্যশস্যের মূল্য সুলভ করা ত দূরে থাক—পূর্ব্বমূল্য রক্ষা করাও সম্ভব হয় নাই—খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে—মূল্য হ্রাস করা বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্র পরিচালকগণের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শুধু খাদ্যের বেলায় নয়, সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্বন্ধেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রত্যাহৃত হওয়ায় একদল দুর্নীতিপরায়ণ ধনী বস্ত্র-সমস্যা এমনভাবে আপন করায়ত্ত করিয়াছিল যে সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে বস্ত্র সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে ও বস্ত্র মূল্য দ্বিগুণ এবং কোন কোন স্থলে তিনগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সেজন্য আবার গভর্ণমেণ্টকে নূতন করিয়া বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে হইয়াছে। যানবাহন-সমস্যা সমাধানেরও কোন উপায় স্থিরীকৃত হয় নাই। গত কয় বৎসরে ভারতবর্ষের সকল রেল-এঞ্জিন ও রেলগাড়ী অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এদেশে প্রচুর পরিমাণে রেলগাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা নাই। এখন বিদেশ হইতেও তাড়াতাড়ি ঐ সকল জিনিষ তৈয়ার করিয়া আনা সম্ভব নহে। ইউরোপের সকল দেশের কারখানাই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সে সব দেশ আগে নিজেদের চাহিদা মিটাইয়া তবে বিদেশে জিনিষ সরবরাহ করিবে। এ অবস্থায় রেল ব্যবস্থা উন্নততর করিতে অন্ততপক্ষে আরও ৫ বৎসর সময় লাগিবে। মোটরগাড়ী সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা যায়। মোটরের জন্য ব্যবহৃত পেট্রল-সমস্যাও ভারতবাসীকে বিব্রত করিয়াছে। কাশ্মীরের যুদ্ধে প্রচুর পেট্রল ব্যবহৃত হইতেছে—হায়দ্রাবাদ যুদ্ধের জন্য পেট্রল মজুত রাখিতে হইতেছে—কাজেই লোক নিত্য-প্রয়োজনের উপযোগী পেট্রলের সরবরাহ পায় না। তাহার উপর দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা পেট্রল চুরি করিয়া তাহা কালোবাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে।

বলিতে গেলে, ভারতের আপামর জনসাধারণ দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের বিশ্বাস করা যায় না, আদালতে বিচারকের রায়ের উপর আস্থা স্থাপন সম্ভব হয় না—যে-দেশে লোক মুখের কথায় জমী আদান-প্রদান করিত, কোনরূপ লিখিত দলিল করার প্রয়োজন অনুভব করিত না, যে দেশে চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া লোক টাকা লেন-দেন করিত—সে দেশের লোক মিথ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না—এ অবস্থায় সর্ব্বসাধারণকে যে দারুণ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইয়াছে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এজন্য শুধু সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের উপর বা মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর দোষারোপ করিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করি—কিন্তু একথা একবারও

স্বাধীনতা দিবসে লাটপ্রাসাদে সূত্রযজ্ঞ ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

চিন্তা করিয়া দেখি না—এই দুর্দশার জন্ম আমরা নিজেরা কতটা দায়ী। সেজন্ম আজ কারখানাগুলিতে শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। শ্রমিক তাহার কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে সম্পাদন করে না, অথচ মালিকগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অনুরোধ করে।

স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্পাদনের সময় বার বার সকলের মনে এই কথারই উদয় হইয়াছে—স্বাধীনতা লাভ করিয়াও কেন আমরা আমাদের অন্নবস্ত্রের সমস্তার সমাধান করিতে সমর্থ হই নাই। কিন্তু আমরা কি ভাবিয়া কেহই তাহা করি নাই—কাজেই আজ দুঃখেরও অন্ত নাই। গান্ধীজি সকলকে সহরের মোহ ত্যাগ করিয়া গ্রামে যাইয়া কৃষিকার্য্যে মন দিতে উপদেশ দিতেন। কেহই সে কথা শুনে নাই। যে যান্ত্রিক সভ্যতা পর পর দুইবার সমগ্র ইউরোপকে ধ্বংস করিল, সেই যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আমরা সহরের দিকে ছুটিতেছি ও পতঙ্গ যেমন অগ্নির দিকে ছুটিয়া গিয়া নিজের ধ্বংসের কারণ হয়, আমরাও তেমনই ভাবে চলিতেছি। তাহার ফলে আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। গত ৫০ সালের দুর্ভিক্ষ আবার তাহারা চরম

পূর্ব আফ্রিকায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন'—জাঞ্জিবার বাগে এক জনসভার দৃশ্য
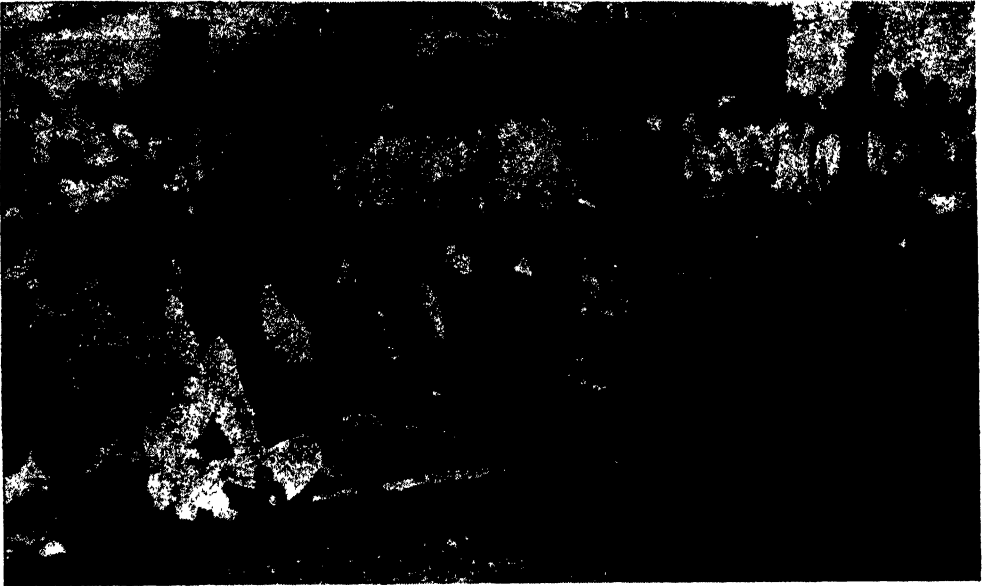
দেখিব না যে আমাদের দোষেই আজ আমাদের এই নিদারুণ অন্নবস্ত্রসমস্তার উদ্ভব হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী গত ২৭ বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী সকলকে দিনের পর দিন কাপাসের চাষ করিয়া তুলা উৎপাদন করিতে, সেই তুলা হইতে চরকায় সুতা কাটিতে ও সেই সুতায় তাঁতে কাপড় বুনিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভারতবাসী যদি সে কথায় কর্ণপাত করিত, তবে আজ ১২ টাকা জোড়ার ধুতি বা ২০ টাকা জোড়ার সাড়ী (সাধারণ) কিনিতে কাহাকেও চোরা-বাজারে যাইতে হইত না। আমরা অবস্থা আনিয়া দিয়াছে। গ্রামে থাকিয়া যে সকল লোক কৃষিকার্য্য করিত, দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের শতকরা ৫০ জন না খাইয়া মরিয়া গেল। সরকার বা দেশবাসী কেহই তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। শতকরা বাকী যে ৫০ জন বাঁচিয়া রহিল তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ শতকরা ২৫ জন কলকারখানায় চাকরী করিবার জন্ম সহরে চলিয়া গেল। যুদ্ধের সময় যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের জন্ম বহু অস্থায়ী কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল—যুদ্ধের পর সেগুলি বন্ধ হইয়া গেল। ফলে তাহাদেরও অধিকাংশ শ্রমিক অনাহারে মারা

গেল। এখন কৃষিকার্য্য করিবার লোকের অভাবে বাঙ্গলা দেশে চাষ হয় না—যেখানে হয়, সেখানেও তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। তাহার অন্য বহু কারণও আছে। সেচের ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীসমূহ মজিয়া গিয়াছে, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি কচুরীপানায় পূর্ণ হইয়া ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে। যাহাদের সে সকল বিষয়ে মন দিবার কথা, তাহারা দেশত্যাগী হইয়া কিছুই করে নাই। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া ইংরাজ যে শিক্ষা এদেশে প্রচার করিয়াছে, তাহা লাভ করিয়া মানুষ বিকৃত মনোভাবাপন্ন হইয়াছে—ভারতের প্রকৃত আদর্শ ও জীবনের পথ ভুলিয়া গিয়া সে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর এখনও আমরা সে কথা চিন্তা করিতে শিখি নাই। দেশের সকল ব্যবস্থার অবিলম্বে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন প্রয়োজন—সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন শিক্ষা-ব্যবস্থা। দেশবাসীকে এদেশের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হইলে লোক আবার নিজ ধারায় চিন্তা করিয়া নিজ নিজ সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারসমূহ গত এক বৎসরে দেশকে উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ও সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করা যায়, আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে দেশকে আবার সমৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া দেশের জনগণের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হইবে। পণ্ডিত জহরলালের চেষ্টায় ভারতের নানাস্থানে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র ও সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণ বিধানের জন্য বড় বড় শিল্প-কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার গঙ্গার বাঁধ বাধিয়া এবং দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশকে শস্যশ্যামলা করার চেষ্টা হইতেছে। সকলই সময়-সাপেক্ষ। যতদিন এ সকল কার্য্য সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন আমাদের ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে হইবে ও এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য আমরা যতটুকু সম্পাদন করিতে পারি, সে বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গালার অবস্থা আরও সঙ্গীণ। স্বাধীনতা লাভের পর ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এখানে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হয় নাই। আজ আর তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া লাভ নাই—কিন্তু সে মন্ত্রিসভা জনপ্রিয়ও হয় নাই। তাহার পর সূচ্যগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত

স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতার গড়ের মাঠে প্রদেশপাল ও প্রধান মন্ত্রীর সম্মুখে ভারতীয় পুলিসদের কুচ-কাওয়াজ

হয়। কিন্তু এক দল বিরুদ্ধবাদী ডাক্তার রায়ের মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু তাহারা তাহাতে সমর্থ হয় নাই। ডাক্তার রায় তাঁহার মন্ত্রিসভায় একদিকে যেমন কংগ্রেসকর্ম্মীদের গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই নানা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কর্ম্মীদেরও গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য ব্যবস্থা পরিষদের বাহির হইতে তাঁহাকে ৪ জন মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। সকলের সমবেত যত্ন ও চেষ্টায় পশ্চিম বাঙ্গালাকে অচিরে আবার সমৃদ্ধ সম্পন্ন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহারা কেহই ম্যাজিক জানেন না—কাজেই একদিনে বা এ

ঘণ্টায় তাঁহাদের কাহারও পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব নহে, যাহা দ্বারা দেশ এখনই লাভবান হইতে পারে। তবে একথা বলা যায়, দেশবাসীর সহযোগিতা ও সাহায্য লাভ করিলে মন্ত্রীরা দেশের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অন্নকষ্ট, বস্ত্রসঙ্কট—সকল বিষয়েই ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন। হয়ত প্রথমদিকে তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে বহু দোষ ত্রুটি থাকিয়া যাইবে—দেশবাসী সে সকল বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ক্রমে তাঁহারা সে সব ত্রুটি সংশোধনে ব্রতী

স্বাধীনতা দিবসে লাট প্রাসাদে বৃক্ষরোপণ উৎসব
ফটো—শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

হইতে পারেন। স্বাধীন দেশের লোকের মন যেন স্বাধীন হয়—স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নহে—এ কথা মনে রাখিয়া আমরা যেন সর্ব্বদা কর্ম্মপথে অগ্রসর হই। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের কর্ত্তব্য আরও কঠোর হইয়াছে। যে ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের ধর্ম্ম ভারতকে চিরদিন জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে, সেই ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের মধ্য দিয়া আমরা আবার ভারতকে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিব—আমাদিগকে নূতন করিয়া সেই ধর্ম্মে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সংস্কার—

প্রস্তাবিত হিন্দু কোড বিল সম্বন্ধে গত মাসে আমরা আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে, ঐ বিলের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবাদ জানাইয়া প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, আইনসচিব প্রভৃতির নিকট পত্র দিয়াছেন। সেজন্য ভারতীয় পার্লামেন্টের বহু সদস্য ঐ বিলের আলোচনা স্থগিত রাখার প্রস্তাব করায় কর্তৃপক্ষ তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। অতঃপর আশা করা যায় যে আর কোন সময়েই ঐ বিলের পুনরালোচনা হইবে না। কারণ ঐ বিল দেশ ও জাতির ক্ষতি ভিন্ন কোন উপকার করিবে না।

শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার—

গত ২৩শে আগষ্ট ভারতীয় পার্লামেণ্টে শ্রমসচিব শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম যে নূতন বিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারের সনদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। উহা পাশ হইলে এই দেশের যে কোন নাগরিকের ন্যায় শ্রমিকগণ সকল অধিকার লাভ করিবে। ঐ বিল সম্পর্কে শ্রমসচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন—কেবল শ্রমিকদের স্বার্থেই নহে, শিল্পপতিদের স্বার্থেও এই বিল উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং শিল্পপতিগণ যদি তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন না করেন, তাঁহারা যদি শ্রমিকদিগকে মানুষের মত না দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের ধ্বংস ডাকিয়া আনিবেন। যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইবে যে, আমি জোর করিয়া কিছু চাপাইয়া দিতেছি—কিন্তু শিল্পপতিগণ পরে বুঝিতে পারিবেন যে, আমি তাহাদিগকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছি।

কাশ্মীরে বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস—

গত ২২শে আগষ্ট শ্রীনগর হইতে খবর আসিয়াছে, কাশ্মীর রাজ্যে গিলগিট অঞ্চলে পাকিস্তানী হানাদারগণ বৌদ্ধ মঠগুলি ধ্বংস করিয়াছে এবং মঠের ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী-দিগকে হত্যা করিয়াছে। ৫ শতাধিক বৌদ্ধকে হত্যা করা হইয়াছে ও বহু বৌদ্ধকে ভয় দেখাইয়া মুসলমান করা হইয়াছে বলিয়াও খবর পাওয়া গিয়াছে। গিলগিট অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠগুলি তাহাদের সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিল। সে সকল ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ শুধু জাতিবিরোধী নহে, কাজেই শত্রুর হস্তে ধর্ম্মস্থান রক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধ অধিবাসীরা এ বিষয়ে ইউ-এন-ও অর্থাৎ জাতি সংঘের নিকট আবেদন করিলে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইতে পারে।

পরলোকে কালীকুমার সেনগুপ্ত—

গত ৩রা ভাদ্র হুগলী ত্রিবেণীর খ্যাতনামা কংগ্রেস সেবক ও শ্রমিককর্ম্মী কালীকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে টাইফয়েড রোগে কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আজীবন দেশের মুক্তি কামনায় বিপ্লবাত্মক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও

৺কালীকুমার সেনগুপ্ত

বহু বৎসর শ্রমিক-মঙ্গল কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন এবং কিছুকাল 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতেন। তাঁহার মত নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর জীবনের লোক অতি অল্পই দেখা যায়। সম্ভ্রান্ত বংশ বা উচ্চশিক্ষার গৌরব তাঁহার মধ্যে কখনও দেখা যায় নাই।

রুসিয়ার বিশ্বজয় পরিকল্পনা—

রুসিয়া যে বিশ্বজয়ের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে এ বিষয়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছে, সম্প্রতি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পরিকল্পনা ছিল এইরূপ—(১) তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত করা (২) জার্ম্মাণী, ইতালী ও ফ্রান্সে কমুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট গঠন (৩) চীন, গ্রীসে ও প্যালেষ্টাইনের গোলমালের সুযোগ গ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য সাধন (৪) বৃটেন জয়ের পরিকল্পনা (৫) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জয়। রুসিয়া যে সারা জগতের ভীতির কারণ হইয়াছে একথা সর্ব্বজনবিদিত; উপরোক্ত পরিকল্পনা সত্য হউক আর নাই হউক, জগতে যে আবার একটা ভীষণ দুর্দ্দিন আসিতেছে, তাহা বাহিরের আবহাওয়া হইতে বুঝা যায়। এইবারের যুদ্ধ কি তবে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় আনয়ন করিবে?

ইনাও ও বসুবা

এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপরেশনাথ দাসগুপ্তের 'ইনাও'এর পৌরাণিক কাহিনী নামক প্রবন্ধের একটি দৃশ্য

হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূম শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ঐ অঞ্চলের পতিত জমীগুলি শস্যশ্যামলা হইয়াছিল ও পাদপহীন দেশ বৃক্ষবহুল হইয়াছে। গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিক উৎসব দিনেও রাষ্ট্রপতি সেজন্য এদেশে বৃক্ষরোপণ উৎসব করিতে নির্দ্দেশ

দিয়াছিলেন। মানুষের মন কৃষিবিমুখ হওয়ায় লোক এখন আর বৃক্ষও রোপণ করে না। যেটা মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল, আজ আমাদের দ্বারা তাহা অবহেলিত। সুখের বিষয় ১৫ই আগষ্ট দেশের সর্ব্বত্র নূতন বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। সেগুলি ফুলফলে সমৃদ্ধ হইয়া দেশবাসীর যখন উপকার করিবে তখন আমরা ইহার সার্থকতা অনুভব করিতে পারিব। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে অতি অল্প লোকই নূতন আমের বাগান করিয়াছে। অথচ বাগান করিবার মত স্থান বহু লোকেরই আছে। তাহার ফলে আজ দেশে আম দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যুদ্ধের সময় বহু পুরাতন আম-বাগানের গাছ কাঠের জন্য অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। সেই সকল স্থানে যদি নূতন আমবাগান প্রতিষ্ঠায় লোক মনোযোগী না হয়, তবে এদেশে আর কখনও আমের প্রাচুর্য্য আসিবে না। স্বাধীনতা দিবসে পশ্চিম বাঙ্গালায় অন্যান্য গাছের সহিত বিশেষ করিয়া আম-গাছ রোপণের ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বাহ্নে নির্দ্দেশ দিলে ভাল কাজ হইত।

ভারতে নূতন সৈন্যবাহিনী—

ভারতে একটি নূতন সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য গত ২৩শে আগষ্ট ভারতীয় পার্লামেন্টে দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেব সিং এক নূতন বিল আনিয়াছেন—নূতন সৈন্যবাহিনীর কাজ হইবে (১) দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ গড়িয়া তোলা ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনীকে সৈন্য সরবরাহ করা (২) জরুরী অবস্থার সময় আভ্যন্তরীণ দেশরক্ষা ব্যাপারে সাহায্য করা (৩) বিমান আক্রমণ নিরোধ ও উপকূল রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং (৪) মাতৃভূমি রক্ষার জন্য ভারতীয় যুবকদের অস্ত্রশিক্ষার সুযোগ দান করা। বিলের উদ্দেশ্যগুলি মহৎ—যত সত্বর ইহা কার্য্যে পরিণত করা যায়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। স্বাধীন ভারতে দেশরক্ষার ভার দেশবাসীদিগকে গ্রহণ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে সকলকে সে জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সে জন্য যে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থায় ব্রতী হইয়াছেন, ইহা সকলের পক্ষে আশা ও ভরসার কথা।

ভারতে দ্রব্যমূল্য হ্রাস ব্যবস্থা—

কি করিয়া ভারতে সর্ব্বসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির দাম কমাইয়া যুদ্ধ-পূর্ব্ব সময়ের মূল্যে পরিণত করা যায়, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিবার জন্য ভারত গভর্ণমেন্টের অর্থ বিভাগ একটি কমিটী গঠন করিয়াছিলেন —কমিটীর সদস্য ছিলেন—অধ্যাপক কে-টি-সাহা, ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হীরেন্দ্রলাল দে, অধ্যাপক সি-এন-ভকীল, ডাঃ জ্ঞানচাঁদ, অধ্যাপক ডি-আর-গ্যাড্‌গিল, মিঃ ডি-কোষ্টা, ডাঃ রে ও ডাঃ নারায়ণপ্রসাদ। গত ১৮ই হইতে ২২শে আগষ্ট ৫ দিন আলোচনার পর কমিটী তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষে ঐ মন্তব্যানুসারে কাজ করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি কমিটীর সদস্য ছিলেন, তাহারা সকলেই খ্যাতনামা অর্থনীতিক পণ্ডিত। তাঁহারা অবশ্য এমন কথা বলেন নাই, যাহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব হইবে। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সত্বর উদ্যোগী হইলে দেশবাসী স্বাধীনতা লাভের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইবে।

বৃটেনের চক্রান্ত—

বৃটেন ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে কাশ্মীর রাজ্যটি পাকিস্তানকে উপহার দিবার জন্য যে চক্রান্ত করিয়াছিল এবং সেই চক্রান্ত সম্পর্কে সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর সার জর্জ্জ কানিংহাম ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর তদানীন্তন সর্ব্বাধিনায়ক সার রব লকহার্ট নামক দুইজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী কি গোপন ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। লর্ড মাউণ্টবেটেন তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন—যখন এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পায়, তখনও তিনি ভারতের বড়লাট। এখন তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া এই দুইজন চক্রান্তকারী ইংরাজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না? কানিংহাম ও লকহার্ট ভারতের সরকারী চাকুরিয়া থাকার সময়েই ঐ অন্যায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন—কাজেই এ বিষয়ে শাস্তি প্রদান বা বিচারের ব্যবস্থা করিবার অধিকার বৃটীশ সরকারের আছে। পণ্ডিত জহরলালেরও এ বিষয়ে বৃটীশ গভর্ণমেন্টের নিকট সকল কথা নিবেদন করিয়া দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত। ঐ সকল নেমক-হারাম বৃটীশ কর্ম্মচারী চক্রান্ত না করিলে আজ কাশ্মীর সমস্যা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে এরূপ বিব্রত করিতে পারিত না।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৪৮ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ১-০ গোলে ভবানীপুর ক্লাবকে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের তৃতীয় জয়, অন্যদিকে উপর্য্যুপরি দুবছর শীল্ড পাওয়া হ'ল। একমাত্র মহমেডান দল ছাড়া অপর কোন ভারতীয় দল পর্য্যায়ক্রমে দু'বছর আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়নি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব উপর্য্যুপরি দুবছর শীল্ড পায় ১৯৪১ সালে কে ও এস বি-কে ২-০ গোলে এবং ১৯৪২ সালে ইষ্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারিয়ে। শীল্ড খেলায় উপর্যুপরি তিনবার (১৯০৮-১৯১০) শীল্ড বিজয়ী হয়ে প্রথম রেকর্ড করেছিলো গর্ডন এইচ এল আই। এ রেকর্ড এ পর্য্যন্ত কোন দল অতিক্রম করতে পারেনি তবে রেকর্ডের সমান করেছে অর্থাৎ উপর্যুপরি তিনবার শীল্ড নিয়েছে ক্যালকাটা ১৯২২-১৯২৪ সালে এবং সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান শেরউড ফরেষ্টার্স ১৯২৬-১৯২৮ সালে। সব থেকে বেশীবার শীল্ড বিজয়ের রেকর্ড করেছে ক্যালকাটা ক্লাব। তারা এ পর্য্যন্ত ৯বার শীল্ড বিজয়ী হয়েছে এবং রানার্স আপ হয়েছে ৭বার। অবশ্য এর একটা প্রধান কারণ,শীল্ড খেলার প্রথম বছর থেকেই ক্যালকাটা যোগদান করে এসেছে। শীল্ড খেলার প্রথম বছরে একমাত্র ভারতীয় যোগদানকারী শোভাবাজার দল অনেক দিন আগেই উঠে গেছে। উপর্যুপরি বেশীবার শীল্ড ফাইনালে উঠে রেকর্ড করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। তারা ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত উপর্যুপরি ৫বার শীল্ড খেলার ফাইনালে উঠে। এর মধ্যে দু'বার শীল্ড বিজয়ী হয় ১৯৪৩ সালে পুলিসকে ৩-০ গোলে এবং ১৯৪৫ সালে মোহনবাগানকে ১-০ গোলে হারিয়ে। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য শীল্ড খেলা হয়নি। ভারতীয় দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ১৯১১ সালে মোহনবাগান ইষ্টইয়র্কসকে ২-১ গোলে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়। মোহনবাগান ক্লাবের এ সাফল্য কেবলমাত্র দলগত ব্যাপার ছিল না, এ সাফল্যে সকল ভারতবাসী

আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনালে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর সঙ্গে মোহনবাগান ও ভবানীপুর দলের খেলোয়াড়গণ ফটো—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

গর্ব্বিত হ'ল। মোহনবাগানের জনপ্রিয়তা এই থেকেই। এই সাফল্যকে কেন্দ্র ক'রে মোহনবাগান ক্লাবের পিছনে এক বিরাট সমর্থক এবং শুভাধ্যায়ীর দল গড়ে উঠে। এক অধীর আগ্রহে দেশের অসংখ্য ক্রীড়ামোদী শীল্ডে মোহনবাগানের প্রতি খেলার দিন মাঠে উপস্থিত হয়, খেলার ফলাফল জানবার উৎসাহে রাস্তায় ভীড় করে। অফিস ও স্কুল-কলেজের কথা ভুলতে হয়। ১৯১১ সালের পর ১৯২৩ সালে মোহনবাগান শীল্ডে ক্যালকাটার কাছে ৩-০ গোলে হেরে গিয়ে ক্রীড়ামোদীদের নিরাশ করলো। কিন্তু দর্শকদের উৎসাহ একটু কমলো না এবং শুভেচ্ছার অভাব দেখা দিল না। সুদীর্ঘ ১৭ বছর কেটে গেল। ক্রীড়ামোদীরা অধীর হয়ে উঠল। জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবকে ১৯৪০ সালের ফাইনালে এরিয়ান্সের কাছে ৪-১ গোলে হারতে দেখে দলের ক্রীড়ামোদীরা খুবই হতাশ হ'ল এবং তাদের পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষাকে এইভাবে ব্যর্থ হতে দেখে অভিমানের রেশ দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে দারুণ লজ্জা। মোহনবাগানের জনপ্রিয়তার অটুট গাঁথুনিতে এবার বুঝি সত্যিই ভাঙ্গন দেখা দিবে এরকম কথাও প্রকাশ পেল। এর পর পুনরায় শীল্ড ফাইনাল, ১৯৪৫ সাল। মোহনবাগান তার অতি নিকট প্রতিবাসী ইষ্টবেঙ্গলের কাছে হেরে গিয়ে সমর্থকদের হতাশ করে। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম বছরের শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান শীল্ড বিজয়ী হয়ে সমর্থকদের প্রভূত আনন্দ দান করেছে।

ভারতীয় দলের মধ্যে শীল্ড বিজয়ী হয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৩৬, ১৯৪১ ও ১৯৪২), এরিয়ান্স (১৯৪০), ইষ্টবেঙ্গল (১৯৪৩ ও ১৯৪৫), বি এ আর (১৯৪৪)। এ পর্য্যন্ত শীল্ড খেলায় সব থেকে বেশী গোলের ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে রেকর্ড করেছে ক্যালকাটা, ১৯০০ সালে শীল্ডের দ্বিতীয় দিনের খেলাতে ডালহৌসীকে ৬-০ গোলে হারিয়ে।

এ বছরের শীল্ডের ফাইনাল খেলা প্রথম দিন ড্র যায়। উভয় পক্ষেই একটি করে গোল হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মোহনবাগান খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে গোল দেয়। এই এক গোলেই শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান বিজয়ী হয়। শীল্ডে মোহনবাগানের এ জয়লাভ যেমন গৌরবজনক অন্যদিকে ভবানীপুর দলের পরাজয়কেও নিঃসন্দেহে গৌরবজনক বলা যায়। এ বছরের প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় তেরটি ক্লাবের মধ্যে ভবানীপুর নবম স্থান পেয়েছে। লীগের দু'টি খেলাতেই মোহনবাগান ক্লাব ভবানীপুর দলকে সহজেই পরাজিত করেছিল। কিন্তু শীল্ডের খেলায় মোহনবাগানকে যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রে বিজয়ী হতে হয়েছে। শীল্ড খেলার পূর্ব্বে লীগে মহমেডান দলের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলাটি ভবানীপুর ২-২ গোলে ড্র করে। ভবানীপুরের পক্ষে মহমেডান দলের সুদক্ষ গোলরক্ষককে দু'বার পরাজয় করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। সে খেলা দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়েছিল। এরপর শীল্ডের সেমি-ফাইনালে লীগের তৃতীয় স্থান অধিকারী শক্তিশালী ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে ১-১ গোলে ভবানীপুর দল ড্র করে। দ্বিতীয় দিনের সেমি-ফাইনালে ভবানীপুর ভাল খেলে ১-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দেয়। তাদের শীল্ডের ফাইনালে উঠা ক্রীড়ামোদীদের চমৎকৃত করলেও খেলার দিক থেকে কোনরূপ অসঙ্গত বা 'বেড়ালের ভাগ্যে সিকা ছেঁড়ার' মত হয় নি।

এবার শীল্ড খেলার চতুর্থ রাউণ্ডে এবছরের দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান রাজস্থান ক্লাব প্রথম বিভাগের লীগবিজয়ী মহমেডান দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে চারিদিকে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল দলের কাছ থেকে এতখানি সাফল্য কেউ আশা করতে পারে নি। যে এক গোলের ব্যবধানে তারা বিজয়ী হয়েছিল তা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়, রীতিমত বল টেনে নিয়ে গিয়ে, একাধিক মহমেডান দলের খেলোয়াড়কে পরাস্ত করে গোল করেছে। সেমি-ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে মাত্র ১টি পেনাল্টি গোলে তাদের পরাজয়ও যেমন দুর্ভাগ্য, অন্যদিক থেকে তেমনি গৌরবজনক। কারণ যে কারণে রেফারী পেনাল্টির নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তা লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডের সামিল হয়েছিল বলে গোল পোষ্টের নিকটস্থ দর্শকদের অভিমত। উভয় দলের গোলরক্ষক যেমন কয়েকটি অবধারিত গোল রক্ষা করেছিলেন তেমনি আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের খেলার দোষে একাধিক গোলের সুযোগ নষ্টও হয়েছিল। আমরা আশা করি রাজস্থান ক্লাব আগামী বারে লীগ ও শীল্ডে আরও কৃতিত্ব দেখাতে পারবে।

খেলা-ধূলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড সফরকারী অষ্ট্রেলিয়া দলের ক্রিকেট সফর এখন সমাপ্তির পথে। ১৯৪৮ সালের এই ইংলণ্ড সফর অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসের গৌরব-উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে চিরকাল অষ্ট্রেলিয়া-বাসীদের মনে জাগরূক থাকবে। ক্রিকেট জগতের বিস্ময় ডন ব্র্যাড-ম্যানের নেতৃত্বে দুদ্ধর্ষ অপরাজিত অষ্ট্রে-লিয়ান ক্রিকেট দল এই ইংলণ্ড সফরে যে অভূতপূর্ব্ব সাফল্য অর্জ্জন করেছে তা এর আগে আর কোনও দেশের ক্রিকেট দলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সমস্ত তালিকাভুক্ত খেলার মধ্যে একটিতেও পরাজয় বরণ না করে এবং পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জয়লাভ করে যে বিরাট সাফল্যের পরিচয় এই অষ্ট্রে-লিয়ান ক্রিকেট দল দিয়েছে তা ক্রিকেটের ইতিহাসে দুর্লভ। এরূপ সাফল্যের পরিচয় ভবিষ্যতে আর কোনও দেশের ক্রিকেট দল দিতে পারবে বলে মনে হয় না। অষ্ট্রেলিয়া দলের এই বিরাট সাফল্য, এই চমকপ্রদ ক্রীড়ানৈপুণ্য ও এই অপূর্ব্ব দলগত শক্তির পশ্চাতে রয়েছে ডন্ ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্ব ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড় তৈরীর ট্রেডিসান্। এই ট্রেডিসান্ সমানে চলে আসছে ছেদহীনভাবে কালের বিধ্বংসী প্রভাবকে অগ্রাহ্য করে। অষ্ট্রেলিয়ার এই ট্রেডিসানই আজ দিয়েছে হ্যাসেট ও মরিসের মতন ব্যাটস-ম্যান, লিণ্ডওয়াল ও মিলারের মতন বোলার, ট্যালন ও স্যাগারস্‌এর মতন উইকেট কীপার। যদিও ইংলণ্ড ক্রিকেটের জন্মভূমি কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া হয়ে উঠেছে ক্রিকেটের তীর্থস্থান! অষ্ট্রেলিয়া বললেই মনে পড়ে ক্রিকেটের কথা

সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাড্‌ম্যান। ২৭শে আগষ্ট ১৯০৩ সালে নিউ সাউথ ওয়েলসএর কুটামুণ্ড্রাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সাল থেকে ক্রিকেট খেলছেন এবং এই মরশুমের শেষে অবসর গ্রহণ করবেন। এখন তাঁর বয়স ৪৭ বৎসর।

আর তার সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে উইনষ্টন চার্চ্চিলের পরেই যিনি সবচেয়ে পরিচিত সেই ক্রিকেটের যাদুকর ডন্ ব্র্যাডম্যানকে।

আজ ক্রিকেটের এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অবসর গ্রহণ করেছেন। ব্র্যাডম্যানের এই অবসর গ্রহণ করায় পৃথিবীর ক্রিকেট গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক আজ অস্ত গেল! এরূপ জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব পৃথিবীর ক্রিকেট গগনে আর কখনও হবে কিনা জানি না। তবে সে আশা যে খুবই কম তাতে কোনও সন্দেহই নেই। এই নাতিদীর্ঘ, প্রশস্তস্কন্ধ, ঈগলচক্ষু, দুর্ধর্ষ ব্যাটসম্যান যদি আরও কিছুদিন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাপ, শোভিত মস্তকে ব্যাট হাতে এসে দাঁড়াতে পারতেন, তাহলে বিশ্বের ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীগণ যে কত সুখী হতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনেকে হয়ত ব্র্যাডম্যানের কূটনীতিপূর্ণ নেতৃত্ব ও ধূর্ত্ততাপূর্ণ খেলোয়াড়ী চাল পছন্দ করেন না এবং এর জন্য তাঁকে unsportsmanও বলেছেন। কিন্তু যুদ্ধ ও প্রেমের ক্ষেত্রে যেমন অশোভন কথার স্থান নেই, টেষ্ট যুদ্ধেও তেমনি অসঙ্গত বলে কিছু নেই—অবশ্য খেলার নিয়মকানুন বজায় রেখে। টেষ্ট ম্যাচ হচ্ছে টেষ্ট ম্যাচই—Exhibition বা friendly ম্যাচ নয়। টেষ্ট ম্যাচের জয় পরাজয়ের উপরই নির্ভর করছে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ দুইটির ক্রিকেট সম্মান। তাই প্রকৃত যুদ্ধের মত এই ক্রিকেট টেষ্ট-যুদ্ধেও দরকার হয় কূটনৈতিক চাল ও ধূর্ত্ততাপূর্ণ দল পরিচালনা। এর জন্য প্রয়োজন হয় বুদ্ধিমত্তা, প্রচুর অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী শক্তির। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনেক অধিনায়কেরই থাকে, কিন্তু সেই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে দরকার মত কাজে লাগান এবং উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নূতন নূতন কূটনৈতিক চাল আবিষ্কার করে বিপক্ষ দলকে বিমূঢ় করে ফেলা সহজ কথা নয়। ব্র্যাডম্যান এ বিষয়ে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্বই যে অষ্ট্রেলিয়া দলের এই বিরাট সাফল্যের একটি প্রধান কারণ তাতে কোনও সন্দেহই নেই। ক্রিকেটের এই দুর্জ্জয় যোদ্ধা আজ ক্লান্ত। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে আজ তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন উন্নত মস্তকে, গৌরবের উচ্চতম শিখা থেকে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানরূপে। পৃথিবীর ক্রিকেট ক্রীড়ারত দেশগুলিতে প্রথম শ্রেণীর বড় বড় খেলা আরও হবে, যে সব দেশে খেলার রাজা ক্রিকেটের চলন নেই সেখানেও ক্রিকেট খেলার চলন হবে, নূতন নূতন খেলোয়াড়ও অনেক তৈরী হবে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্র্যাডম্যান আর হবে না! তবে আশা করি ব্র্যাডম্যান অবসর গ্রহণ করলেও তাঁর অভিনব ট্রেনিং দ্বারা খেলোয়াড় তৈরী করে এবং তাঁর অতুলনীয় অভিজ্ঞতা প্রসূত সমালোচনা দ্বারা বিশ্বের ক্রিকেট ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাড়াতে সাহায্য করবেন। আমরা এই বিশ্ব-ক্রিকেটের প্রতীক এই ক্রিকেট বীরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছি এবং তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ম্যাচ খেলার ফলাফলের ভিতর দিয়ে উভয় দলের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর

ডেনিস কম্পটন

ক্রিকেট ক্রীড়ারত দেশগুলির মধ্যে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই দুইটি দেশের মধ্যে কে যে শ্রেষ্ঠ সে কথা বলা শক্ত ছিল। ইংলণ্ড

যেমন দিয়েছে হ্যামণ্ড, হবস্‌, সাট্‌ক্লিফ, জারডিন, লারউড, ফারনেস্‌, ভেরিটী, টেট্‌ প্রভৃতি অষ্ট্রেলিয়া তেমনি দিয়েছে,

রে লিণ্ডওয়াল

ব্র্যাড্‌ম্যান, ও'রিলী, ফিঙ্গলটন, ম্যাকার্টনে, ম্যাকক্যাব, ওল্ডফিল্ড, আয়রন মঙ্গার, চীপ্যাক্স প্রভৃতি। টেষ্ট রবার জিতে কখনও অষ্ট্রেলিয়া নিয়ে গেছে 'এ্যাসেস্‌' ইংলণ্ডের হাত থেকে আবার কখনও ইংলণ্ড ফিরিয়ে এনেছে 'এ্যাসেস্‌' অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে। তখন দুই দলই ছিল সমকক্ষ; শক্তিতে কেউই কারুর চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে ইংলণ্ড হারিয়েছে তার ক্রিকেট শক্তি। অদূর ভবিষ্যতে টেষ্ট রবার জিতে অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে "এ্যাসেস্‌" ফিরিয়ে নেওয়া তো দূরের কথা, ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটা টেষ্টেও জয়লাভ করলে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করবে। তবে ইংলণ্ডের পক্ষে আশার কথা এই যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের মতন পরাজিত হলেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে না বা "ইন্‌ফিরিয়রিটী কম্‌প্লেক্সে" ভোগে না। শোচনীয় পরাজয় তাদের ভগ্নোৎসাহ করতে বা তাদের জয়লাভের অদম্য স্পৃহাকে দমিয়ে দিতে পারে না। ইংরাজ চরিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে এইখানে। পরাজয়ের পর পরাজয় দেখিয়ে দিয়েছে ইংলণ্ডকে তাদের দলের দুর্ব্বল স্থানগুলি। এখন তাই ইংলণ্ড উঠে পড়ে লেগেছে দলের দুর্ব্বল স্থানগুলিকে সবল করে দলকে পরিপূর্ণ শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে।

ইংলণ্ডের সবচেয়ে দুর্ব্বলতা দেখা যায় বোলিংএ। অনেক সময় ব্যাটসম্যানরা পর্য্যাপ্ত রাণ তুলতে সমর্থ হলেও দেখা গেছে বোলাররা শেষ রক্ষা করতে পারে নি। হয়ত অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের কম রাণে নামিয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে আর দুদ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়ান

লেন হাটন

ব্যাটস্‌ম্যানদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। ফিল্ডিংও এক এক সময়ে ইংলণ্ডের খুব খারাপ হয়েছে, বিশেষ করে

তুর্থ টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে। এই ইনিংসে ্যাড্‌ম্যানের কয়েকটি সোজা ক্যাচ্‌ ফিল্ডাররা ধরতে ারেন নি। ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যান হাটন ও ়াসব্রুক প্রথম প্রথম যথেষ্ট অসাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ষের দিকে অবশ্য তাঁরা ভালই খেলেছেন। এড্‌রিচ, ার উপর ইংলণ্ড অনেকখানি নির্ভর করেছিল, মোটেই াল খেলতে পারেন নি। তাঁর 'ফর্ম', বিশেষ করে াটিংএ, এ মরসুমে একেবারে পড়ে গেছে। ফিল্ডিং ও ালিংএ তাঁর প্রয়োজন আছে বলেই এখনও তিনি দলে ান পাচ্ছেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ইংলণ্ডের এক নম্বর াটস্‌ম্যান ডেনিস কম্পটনই হচ্ছেন একমাত্র খেলোয়াড় ার উপর ইংলণ্ড সব সময়ে নির্ভর করতে পারে। এই

মহাযুদ্ধে নিহত ইংলণ্ডের বিখ্যাত ল্যাটা বোলার হেড্‌লী ভেরিটি। ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদকে এখন ভেরিটির সঙ্গে তুলনা করা হয়।

ম্পটন ছাড়া ইংলণ্ডের আর কোন খেলোয়াড় নেই যার পর ইংলণ্ড সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারে। হাটন ও ়াসব্রুকের উপর আস্থা থাকলেও সম্পূর্ণ নির্ভর করা ল বলে মনে হয় না। ইয়ার্ডলী ও ইভান্স-এর সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। ইংলণ্ড দলের নির্ব্বাচকেরা এখন ঠতি খেলোয়াড়দের টেষ্ট দলে স্থান দিয়ে তাঁদের 'ফর্ম', াচাই করে দেখতে আগ্রহান্বিত। ইংলণ্ড বোঝে যে ই সব তরুণ খেলোয়াড়দের ভাল করে গড়ে তোলার উপরই নির্ভর করছে ইংলণ্ডের ক্রিকেট-ভবিষ্যৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব নবাগত খেলোয়াড়রা বিপুল শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে সফলতার পরিচয় দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছেন।

আগেই বলেছি অষ্ট্রেলিয়ার তুলনায় ইংলণ্ড সব চেয়ে বেশি দুর্ব্বল বোলিংএর দিক দিয়ে। আজ ইংলণ্ড হ্যারল্ড-লারউড্‌ ও হেড্‌লী ভেরিটীর অভাব বোধ করছে খুব বেশি করে। মহাযুদ্ধে যদি ভেরিটীর আকস্মিক মৃত্যু না হত তা হলে কখনই অষ্ট্রেলিয়ার হাতে ইংলণ্ডের এরূপ শোচনীয় পরাজয় হত না। চতুর্থ টেষ্টে শেষ দিনের খারাপ উইকেটেও ইংলণ্ড ভাল স্পিন্‌ বোলারের অভাবে অষ্ট্রেলিয়াকে নামাতে পারল না। ইংলণ্ড অধিনায়ক নর্মান ইয়ার্ডলির জয়লাভের শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল। স্পিন্‌ বোলারের চেয়ে

বহু নিন্দিত বহু প্রশংসিত ইংলণ্ড ফাষ্ট বোলার হ্যারল্ড লারউড্‌। এঁর মারাত্মক "বডি লাইন বোলিং" ১৯৩২-৩৩ সালের অষ্ট্রেলিয়া সফরের সময় অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাটস ম্যানদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। অষ্ট্রেলিয়া এতদিন পরে এর কিছুটা শোধ নিয়েছে মিলার ও লিণ্ডওয়ালের সাহায্যে।

প্রকৃত 'ফাষ্ট' বোলারের প্রয়োজনই কিন্তু এখন ইংলণ্ডের সবচেয়ে বেশি। এই 'ফাষ্ট' বোলার না থাকায় যেমন এক-দিকে ইংলণ্ডের আক্রমণ যথেষ্ট শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তেমনি অপরদিকে দেশে প্রকৃত 'ফাষ্ট' বোলার না থাকায় 'ফাষ্ট' বোলিং এর বিরুদ্ধে খেলার অভ্যাসও ইংলণ্ডের ব্যাটস্‌ম্যানরা পাচ্ছেন না। 'ফাষ্ট' বোলিং এর বিপক্ষে ভালভাবে খেলে রাণ তুলতে না পারলে এবং 'ফাষ্ট' বোলারের

সাহায্য না পেলে টেষ্ট ম্যাচে শক্তিশালী দলকে পরাজিত করা একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়ে। খুব বেশি দিনের কথা নয় যখন এই ইংলণ্ডই তার বিখ্যাত ফাষ্ট-বোলার হ্যারল্ড লারউডের সাহায্যে অষ্ট্রেলিয়াকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। ইংলণ্ডের দর্শকেরা আজ মিলারের বাম্পার বোলিংএর প্রতিবাদে ব্যারাকিং করেছেন, কিন্তু তাঁদের লারউডের "বডি লাইন বোলিং" এবং 'লেগ থিওরীর' কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ইংলণ্ডের যদি আজ লারউডের মতন 'ফাষ্ট' বোলার থাকত তা'হলে ইংলণ্ড বাম্প করাতে কিছুমাত্র দ্বিধা করত বলে মনে হয় না। এড্‌রিচকে দিয়ে সে চেষ্টাও ইংলণ্ড করে দেখেছে।

অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের তুলনা করলে দেখা যায় যে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্রথমেই রয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ডন্ ব্রাডম্যান, যাঁর সমকক্ষ বর্ত্তমান পৃথিবীতে কেউ নেই—এবং ভবিষ্যতে হবে কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। তাঁর খেলার কথা বাদ দিলেও তাঁর দল পরিচালনায় বিচক্ষণতা ও কূটনীতি সত্যই অপূর্ব্ব। যদিও যুদ্ধ পূর্ব্বেকার 'ফর্ম' ব্রাডম্যানের নেই এবং ইংলণ্ডের ডেনিস কম্পটনের অপূর্ব্ব ব্যাটিং সাফল্যে ব্রাডম্যানের গরিমা খানিকটা ম্লান হয়ে গেছে, তবুও নিঃসন্দেহে সত্য যে ব্রাডম্যান এখনও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান। ব্রাডম্যানের পরেই হচ্ছে সহ-অধিনায়ক লিণ্ডসে হ্যাসেট, যাঁর খেলার সহিত ভারতবাসী সুপরিচিত, তারপর মরিস, বার্ণেস, হার্ভে ও মিলার। ইংলণ্ডের অধিনায়ক নর্মান ইয়ার্ডলি দল পরিচালনায় ব্রাডম্যানের সমকক্ষ না হলেও যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ইংলণ্ড-বাসীর প্রশংসাভাজন হয়েছেন। ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে ইংলণ্ডের প্রথমেই পড়েন ডেনিস কম্পটন। তারপর হচ্ছেন লেন হাটন্, সিরিল ওয়াসব্রুক, বিল এডরিচ্, নর্মান ইয়ার্ডলি ও ইভান্স। তুলনা করলে দেখা যায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ছয়জন ব্যাটস্‌ম্যান অপেক্ষা ইংলণ্ডের প্রথম ছয়জন ব্যাটস্‌ম্যান, অবশ্য কম্পটন ছাড়া, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। একমাত্র কম্পটন ছাড়া ইংলণ্ডের আর কেহই অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান ব্যাটস্‌ম্যানদের 'চ্যালেঞ্জ' করবার যোগ্য নয় বলেই মনে হয়। হাটন ও এডরিচের 'ফর্ম' পড়ে না গেলে তাঁরা যে মরিস বা হ্যাসেটের সমকক্ষ হতে পারতেন তাতে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা তাঁদের পূর্ব্বের অপূর্ব্ব ক্রীড়াশক্তি, যার জোরে ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যান লেন হাটন অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলে ব্যাটিংএ টেষ্ট ম্যাচের নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সে রেকর্ড আজও কেউ ভাঙ্গতে পারে নি, তা হারিয়েছেন বলে মনে হয়। অবশ্য পঞ্চম টেষ্টে হাটন তাঁর যুদ্ধ-পূর্ব্বেকার ফর্মের কিছুটা পরিচয় অষ্ট্রেলিয়ান বোলারদের দিয়েছেন। এই পঞ্চম টেষ্টে ইংলণ্ডের দুইটি ইনিংসেই যখন ডেনিস্ কম্পটন্ সমেত ইংলণ্ডের নামকরা সব ব্যাটস্‌ম্যানই ব্যর্থতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিলেন তখন একমাত্র হাটনই অষ্ট্রেলিয়ার দুর্দ্ধর্ষ বোলিং শক্তির বিপক্ষে দৃঢ়তাপূর্ণভাবে খেলে ইংলণ্ডের সম্মান বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সে নির্ভীক প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি। হাটন আউট হবার পর ইংলণ্ডের আর কোনও ব্যাটস্‌ম্যানই অষ্ট্রেলিয়ার বোলিংএর সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হন নি এবং ইংলণ্ড দল অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজেদের দেশে খেলে প্রথম ইনিংস মাত্র ৫২ রাণে শেষ করে ন্যূনতম রাণ সংখ্যার রেকর্ড করতে বাধ্য হয়। কিন্তু হাটন পঞ্চম টেষ্টে ভাল খেলছেন বলে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা ইংলণ্ডের সমীচীন হবে না। হাটনকে এখন আর তারুণ্যের কোঠায় ফেলা যাবে না এবং বয়সের সঙ্গে তাঁর ফর্ম আরও পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তিনি আবার তাঁর যুদ্ধ-পূর্ব্বেকার ফর্ম ফিরে পাবেন কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। তাই ইংলণ্ডের আজ নূতন ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যান গড়ে তোলার দরকার হয়েছে। হার্ডষ্টাফ্ ও এড্‌রিচের ব্যাটিং ফর্ম পড়ে যাওয়ায় "ওয়ানডাউন" বা তিন নম্বর ব্যাটস্‌ম্যানের সমস্যাও ইংলণ্ডের দেখা দিয়েছে। এই তিন নম্বর ব্যাটস্‌ম্যান নির্ব্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এঁর উপর খেলার অনেকখানি নির্ভর করছে বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংলণ্ড এখনও সে রকম উপযুক্ত খেলোয়াড় পায় নি। ইংলণ্ডের গোড়ার দিকের ব্যাটস্‌-ম্যানদের মতন শেষের দিকের ব্যাটস্‌ম্যানরাও অষ্ট্রেলিয়ার শেষের দিকের ব্যাটস্‌ম্যানদের সমকক্ষ নয়। এই শেষ দিককার ব্যাটস্‌ম্যানরা (tail enders), যাঁদের বেশীর ভাগই বোলার, অনেক সময় পর্য্যাপ্ত রান তুলে খেলায় জয়লাভের সহায়তা করে থাকেন। এর প্রমাণ অষ্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেষ্টে তাদের প্রথম ইনিংসে ভাল করেই দিয়েছে লিণ্ডওয়ালের সাহায্যে।

বোলিংএর কথা আগেই বলেছি। প্রকৃত 'ফাষ্ট' বোলার এবং ভেরিটির মত ল্যাটা স্পিন বোলারের

দরকার এখন ইংলণ্ডের খুব বেশী। সারের আলেক বেডসার এবং কেণ্টের ডগলাস রাইটের কাছ থেকে ইংলণ্ড অনেক কিছু আশা করে এবং ভবিষ্যতে পাবেও বলে মনে হয়। যদিও রাইট এ মরসুমে আঘাতের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটিমাত্র টেষ্ট ছাড়া খেলতে পারেননি তবুও মনে হয় তিনি খেলতে পারলে অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাটস্‌ম্যানদের যথেষ্ট বেগ দিতে পারতেন। তবে বেডসার ও রাইটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে ইংলণ্ডকে এখন মনোনিবেশ করতে হবে হ্যারল্ড লারউড বা রেলিণ্ডওয়ালের মতন প্রকৃত ফাষ্ট বোলার গড়ে তোলার দিকে এবং এই প্রচেষ্টার সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংলণ্ডের ভবিষ্যত ক্রিকেট সাফল্য।

যদিও ইংলণ্ডের পক্ষে আশার কথা যে তাদের জয়লাভের প্রধান অন্তরায় এবং তাদের বোলারদের নির্ম্মম শত্রু ব্র্যাডম্যান আজ অবসর গ্রহণ করেছেন কিন্তু তা বলে ইংলণ্ডের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ব্র্যাডম্যান অবসর গ্রহণ করলেও তিনি দিয়ে গেছেন মরিসকে, হ্যাসেটকে, লিণ্ডওয়ালকে, ট্যালনকে এবং এঁদের বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভ করা আজ ইংলণ্ডের পক্ষে খুবই দুরূহ।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মহামানব জাতক" (মহারাজা রাও স্যার যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয়ের জীবনী)—৩৲
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র সম্পাদিত গল্প-গ্রন্থ "মৃত্তিকা-শৃঙ্খল"—২৲
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "পরম আত্মদর্শন বা স্বরূপ-স্থিতি"—১৲
শ্রীবিভাস দে প্রণীত "ভারত কি ক'রে স্বাধীন হ'ল"—৷৶৹
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীজগবন্ধু হরি লীলামৃত" (১২শ খণ্ড)—১৷৹
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মহামানব মহাত্মা গান্ধী"—৪৷৹
শ্রীসুরেশ বিশ্বাস প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "রাসলীলা"—১৷৷৹
শ্রীরবিদাস সাহারায় প্রণীত "ছোটদের জওহরলাল"—১৷৹
সব্যসাচী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অপরাধের কারখানা"—১৲
হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত ডিটেকটিভ উপন্যাস "মিষ্টিরিয়াস ষ্টেজ"—১৷৷৹
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত "যৌনবিকৃতি ও যৌনাপরাধ"—৪৷৹
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ"—১৲
অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু প্রণীত "বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ"—৭৲
ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শ্রীশ্রীমনসা পূজা ও কথা"—৷৴৹

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

সবিনয় নিবেদন ঃ—ভারতবর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে; সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব কার্ত্তিক মাসের জন্য বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এখন হইতে "ভারতবর্ষে" চিত্র ও নাট্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনও গ্রহণ করা হইবে; সুতরাং এই সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের সহযোগিতা কামনা করা যাইতেছে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

হিজ মাষ্টারস্‌ ভয়েসের নব-প্রকাশিত রেকর্ড-গীতি—

ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিতর দিয়ে হিজ মাষ্টারস ভয়েস এবার যে গানগুলি পরিবেশন করেছেন, তা সত্যই উপভোগ্য হয়েছে। এ মাসের প্রত্যেকখানি গানই তার মাধুর্যে ও বৈশিষ্ট্যেপূর্ণ। বাঙ্গলার বিশিষ্ট শিল্পীদের গাওয়া এই গানগুলি শ্রোতাদের যে তৃপ্তি দিতে পারবে, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এগুলি গেয়েছেন ঃ—বেচু দত্ত—"ভালবাসা সে কি প্রভাতের ফুল" ও "পাহাড়ী ঝরণা" (N 27897), শ্রীমতী বীণা চৌধুরী—"রাতের পাপিয়া কাঁদে" ও "একটি জীবনে মিটিবে না" (N 27899), সন্তোষ সেনগুপ্ত—"বিদায় সন্ধ্যা আসিল ওই" ও "হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে" (N 27900), শ্রীমতী রমা দেবী—"হায় কী পেলে ভগবান" ও "ওগো চিরদিনের সাথী" (N 27903), সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়—"নৃত্যের তালে তালে" ১ম ও ২য় (N 27906), তুষারকণা পাল—"সখি আমিই না হয় মান করেছিনু" ও "বঁধু কি আর কহিব আমি" (N 27907), শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ—"এই কথাটি মনে রেখো" ও "আমার সকল রসের ধারা" (N 27916), শ্রীজগন্ময় মিত্র (সুরসাগর)—"চিঠি" ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ (N 27919), মৃণালকান্তি ঘোষ—"আজি নাহি কিছু মোর" ও "আর কত দুখ দেবে" (N 27920), সত্য চৌধুরী—"হৃদয় যমুনা তারি দুই তীরে" ও "পথ ছেড়ে দাও প্রিয়া" (N 27950), শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া)—"হরি গ্যাও মধুপুর" ও "হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা" (N 27951), কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)—"কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী" ও "মুক্তির মন্দির সোপান তলে" (P 11897)।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
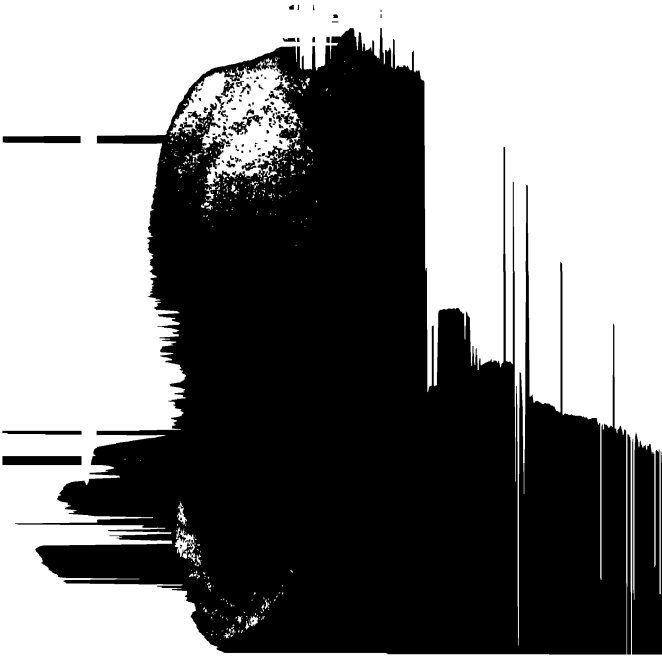
কার্ত্তিক—১৩৫৫

প্রথম খণ্ড | ষটত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

পদার্থের স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে এম-এস্‌সি

পদার্থ অবিচ্ছিন্ন নিরেট মনে হইলেও বস্তুতঃ কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কণিকা লইয়া গঠিত—বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের বলেন 'অণু'। কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কিন্তু এই অণুগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। নব্য পদার্থবিজ্ঞানের নানা জটিল উপায়ে ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ ও গুণাবলী অনুধাবন করা সম্ভব। এক ঘন ইঞ্চি জলের মধ্যে ৬×১০^২৩ (অর্থাৎ ৬এর পিঠে ২৩টি শূন্য দিলে যে বিরাট অঙ্ক হয় ততগুলি) অণু রহিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় অণু কত ক্ষুদ্র। আবার ইহারা গায়ে গায়ে লাগিয়া নাই। বেশির ভাগই ফাঁক। অণুগুলি তাপের দরুণ ভীষণবেগে ছুটাছুটি করিতেছে। এই ছুটাছুটির মধ্যে কোন নিয়ম নাই। তাপ কমাইলে গতিবেগ কমে। গতিবেগ সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইলে তাপ কমাইয়া ০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাত্রার ২৭৩° ডিগ্রি নীচে নামিতে হয়। অপরপক্ষে তাপ বাড়াইতে আরম্ভ করিলে অণুগুলির গতিবেগ বাড়িয়া চলে এবং শেষে এমন হয় যে ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে চাহে। এই অবস্থায় পদার্থ গ্যাসীয়-রূপ পরিগ্রহ করে। গ্যাসের অণুগুলি অনেকটা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং অবিরত একটা আর একটার গায়ের উপর গিয়া ধাক্কা দেয়।

আমরা যত রকম বিভিন্ন পদার্থ (লক্ষ লক্ষ) দেখিতে পাই তত রকম বিভিন্ন অণু আছে। কিন্তু যে কোন অণুকে আরও বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইহা কয়েকটি ক্ষুদ্রতর কণিকা লইয়া গঠিত—ইহাদের বলা হয় পরমাণু। মাত্র বিরানব্বই রকমের পরমাণু আছে—ইহারা বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু। এই পরমাণুর বিভিন্ন মিলনে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন পদার্থ গঠিত। পরমাণু সজ্জার রদবদল ঘটাইয়া পদার্থকে পদার্থান্তরে

পরিবর্ত্তন করা যায়। কিন্তু মধ্যযুগের রাসায়নিকদের শত সহস্র চেষ্টাতেও এক পরমাণুকে অন্য পরমাণুতে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতেই শেষে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে পরমাণু মৌলিক এবং অবিভাজ্য।

পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে পূর্ব্বোক্ত মত ঠিক নহে। এখন আমরা জানি যে পরমাণুর গঠন জটিলতাপূর্ণ। প্রত্যেক পরমাণুর একটি কেন্দ্রীণ (Neucleus) আছে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া এক বা ততোধিক ইলেকট্রণ বৈদ্যুতিক শক্তির জোরে ঘুরিতেছে। কেন্দ্রীণ ধনতড়িৎযুক্ত, আর ইলেকট্রণ বা বিদ্যুতিন ঋণতড়িৎযুক্ত। এক একটি ইলেকট্রণের বৈদ্যুতিক শক্তিকে একক পরিমাণ ধরা হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস একটি মূল পদার্থ। একটি জলের অণু দুইটি হাইড্রোজন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু লইয়া গঠিত। হাইড্রোজন সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা এবং ইহার গঠনও সর্ব্বাপেক্ষা সরল। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীণ একক পরিমাণ ধনতড়িৎযুক্ত এবং এই কেন্দ্রীণের চারিদিকে একটি ইলেকট্রণ ঘুরিতেছে। হিলিয়ম গ্যাসের কেন্দ্রীণে দুই একক ধনতড়িৎ বিদ্যমান, আর চারিদিকে দুইটি ইলেকট্রণ ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপে কেন্দ্রীণ তিন, চার ইত্যাদি ক্রমে বিরানব্বই একক পর্য্যন্ত ধন তড়িৎযুক্ত হইয়া থাকে; এবং চারিদিকে তিন, চার ইত্যাদি ক্রমে বিরানব্বইটি ইলেকট্রণ ঘুরিয়া বেড়ায়, কেন্দ্রীণে ধন তড়িতের একক সংখ্যা ও ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রণ সংখ্যা একই। প্রত্যেক পরমাণুতে সম পরিমাণ ধন ও ঋণ তড়িৎ থাকাতে পরমাণুটি বিদ্যুত ধর্ম্মহীন। কেন্দ্রীণের গঠনও জটিলতাপূর্ণ। কিছুকাল পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন কেন্দ্রীণ প্রোটন ও নিউট্রণ এই দুই রকম মৌলিক জড়কণা লইয়া গঠিত। পূর্ব্বে যে ইলেকট্রণের কথা বলা হইয়াছে তাহা ঋণতড়িৎযুক্ত ক্ষুদ্রতম জড়কণা। প্রোটন একক পরিমিত ধন তড়িৎযুক্ত এবং ইলেকট্রণ অপেক্ষা প্রায় ১৮০০ গুণ ভারী জড়কণা। নিউট্রণ প্রোটনের সমান ভারবিশিষ্ট বৈদ্যুৎ শক্তিহীন জড়কণা। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে একটি প্রোটন আছে এবং চারিদিকে একটি ইলেকট্রণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীণ দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রণ লইয়া গঠিত, চারিদিকে দুইটি ইলেকট্রণ ঘুরিতেছে এবং ইহা হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা চারিগুণ ভারী। তৃতীয় মৌলিক পদার্থ লিথিয়ম—ইহার পরমাণু কেন্দ্রীণ ৩টি প্রোটন ও ৪টি নিউট্রণ লইয়া গঠিত, চারিদিকে ৩টি ইলেকট্রণ ঘুরিতেছে এবং ইহা হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ৭গুণ ভারী। এই রকমে অন্যান্য মূল পদার্থের পরমাণুও গঠিত। মৌলিকের তালিকায় সর্ব্বশেষ মূল পদার্থ ইউরেনিয়ম ধাতু—ইহার কেন্দ্রীণ ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রণ লইয়া গঠিত; চারিদিকে ৯২টি ইলেকট্রণ ঘুরিতেছে এবং ইউরেণিয়ম পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ২৩৮গুণ ভারী।

প্রথমতঃ মনে করা হইয়াছিল কেন্দ্রীণ বুঝি অবিভাজ্য। কিন্তু অক্লান্তকর্ম্মী লর্ড রাদারফোর্ডের চেষ্টায় এই কেন্দ্রীণকে ভাঙ্গা সম্ভব হইয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্র আল্ফাকণা বা হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রীণকে গোলারূপে ব্যবহার করিয়া তিনি প্রথম নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীণ ভাঙ্গেন, তারপর গত ২৭৷২৮ বৎসরে কেন্দ্রীণ সম্বন্ধীয় পদার্থ বিজ্ঞানে বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কেন্দ্রীণের প্রতিক্রিয়া আলোচনায় দুইটি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে (১) কেন্দ্রীণের ভাঙ্গাচোরাতে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় (২) এই ভাঙ্গাচোরার ব্যাপার বিরাট্‌ভাবে করিবার বিঘ্ন প্রচুর। ইলেকট্রণের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক গোলা কেন্দ্রীণের উপর সোজাসুজি গিয়া ধাক্কা দিতে পারে। আবার কেন্দ্রণে গিয়া পৌছিলেও শত সহস্রের মধ্যে দুই একটি কেন্দ্রীণকে ভাঙ্গিতে পারে। নিউট্রণ আবিষ্কারের ফলে এবং একটা নিউট্রণের ধাক্কায় একাধিক নিউট্রণ নির্গত হইতে পারে বলিয়া অধুনা প্রচুর পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করিতে পারা যাইবে আশা হয়।

ইউরেণিয়ম্ এবং থোরিয়ম নামক মৌলিক দুইটির কেন্দ্রীণ বিভাজনে একাধিক নিউট্রণ নির্গত হয় কিন্তু এই দুইটি মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে খুবই কম পাওয়া যায়। কি করিয়া অন্যান্য মৌলিকের কেন্দ্রীণ শক্তিকে ব্যবহার করিতে পারা যাইবে তাহাই সমস্যা। তাহাদের কেন্দ্রীণে লুক্কায়িত প্রচুর শক্তি কোন গোলা নিক্ষেপে আত্মপ্রকাশ করে না। কিন্তু পার্থিব বীক্ষণাগারে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই এই রকম অত্যধিক তাপমাত্রায় এই শক্তি সূর্য্যতারাতে স্বতঃ প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহাই সূর্য্য তারকার

অফুরন্ত তেজের উৎস। বিজ্ঞানী কেন্দ্রীণে নিহিত এই শক্তি ভাণ্ডারকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টায় আছে। আপাততঃ তথাকথিত এটম্ বোমার ব্যবহারে ইউরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রীণে নিহিত শক্তির ব্যবহার হয়।

এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানী জানিতে পারিয়াছেন ইলেক্ট্রণ, প্রোটণ, নিউট্রণ ব্যতীত পজিট্রণ (ইলেক্ট্রণের সম ওজন বিশিষ্ট এবং একক পরিমাণ ধন তড়িতযুক্ত) এবং পাঁচ রকমের মেজন কণা (meson বা mesotron) এই মোট নয় রকম জড়কণা এবং ফোটন (Photon) ও নিউট্রিণো (Newtrino) দুই রকম শক্তিকণা সর্ব্বসমেত এগার রকম কণার ভাঙ্গাগড়াতেই দৃশ্যমান জগৎ। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, পদার্থের গঠন হয়ত এত বিভিন্ন জড়কণা সমবায়ে জটিল নহে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জড়কণা হয়ত জটিল গঠনের এবং তাহাকে ভাঙ্গিয়া হয়ত সরলতর কণা লইয়াই তাহারা গঠিত বলিয়া জানিতে পারা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরাম নাই। প্রকৃতি পদার্থের স্বরূপতত্ত্ব লইয়া মানুষের সহিত বহুদিন ধরিয়া লুকোচুরি খেলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন যুগে বিজ্ঞানীদের মনে হইয়াছে—এই বুঝি পদার্থের স্বরূপের পরিচয় পাইলাম। কিছুদিন পরেই সে বুঝিয়াছে তাহার ভ্রম। এক সময়ে ৯২ মৌলিক পদার্থের পরমাণুতেই পদার্থের অন্তিম স্বরূপ মনে করা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল জটিলতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে মানুষ। তারপর মনে হইল ইলেক্ট্রণ ও প্রোটণ এই দুই রকম জড়কণাই সকল রকমের পরমাণুর মূলে। কিন্তু শেষে দেখা গেল পরমাণুর স্বরূপ জটিলতাপূর্ণ—পরমাণু প্রচণ্ড শক্তির আধারও বটে, আবার ইলেক্ট্রণ, প্রোটণ ব্যতীত উপরিলিখিত অন্যান্য জড়কণাগুলিও পরমাণুর মধ্যে ধরা দিয়াছে। বিজ্ঞানী আবার জটিলতার মধ্যেই গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার সত্যানুসন্ধানের বিরাম নাই। অনুসন্ধানের মধ্যে তাহার মৌন প্রার্থনা রহিয়াছে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

'সুবর্ণময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে; হে জগৎপোষক, সত্যধর্ম্মা, আমার দৃষ্টির জন্য তুমি উহা অপসারিত কর।'

সুমেরু রায়

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

সবে ভোর হয়েছে। শাশুড়ী মাটীর ঘরের দাওয়ায় বসেছিল। বধূ উঠে গোয়ালের দিকে গেল গোয়াল পরিষ্কার করবার জন্য। আগলের কাছে দাঁড়িয়ে একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে 'মা, তুমি কাল রাত্রে গোয়ালঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলে?'

শাশুড়ী উত্তর দেবার আগেই সে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, 'আরে, ঘরের মধ্যে কে শুয়ে আছে!'

এবার শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। বল্লে, কি সকালে উঠে 'শোর' 'শোর' (গোলমাল) করছিস্। একবার বল্লি আগল বন্ধ করি নি, আবার বলছিস্ ঘরে কে, ক্ষেপে গিছিস্?

তৎক্ষণে বধূর স্বামী আর দেবর উঠে এসেছে রকের উপর। বধূ বেরিয়ে এসেছিল ভীতভাবে, এখন স্বামীকে দেখে ওড়নার অবগুণ্ঠন দীর্ঘ করে উচ্চভাষেই বল্লে, 'দেখনা কেন ঘরে এসে?'

এবারে দেবর, স্বামী, শাশুড়ী সব একে একে ঘরে ঢুক্‌ল—পিছনে পিছনে দুই বৌও ঢুক্‌ল।

সকলের সঙ্গে ঘরে আসায় এখন নির্ভয় কৌতূহলী বধূ এগিয়ে গিয়ে কোণ থেকে একটু উঁকি মেরে দেখে নিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠ্‌ল—'আরে এ যে উমদাবাই!' উমদা মানুষ হিসেবে মানে চমৎকারিণী, জিনিষ হিসাবে ভালো।

গোয়ালের অন্যদিকে প্রকাণ্ড আটা-পেষা এক যাঁতার ঘেরা জায়গার একদিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছে একটী তরুণী। মাথায় নীল ওড়নার অবগুণ্ঠন তাকে ঘিরে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে আছে। লাল সুতা ও জরী জড়ানো দীর্ঘ বেণী যাঁতার তলায় লুটিয়ে রয়েছে। গায়ে

লাল রংয়ের আঙ্‌রাখা (অঙ্গরক্ষা অর্থাৎ জামা), আধময়লা পীত ঘাগ্‌রা পাদুখানি ঘিরে পড়েছে। গলায় রূপার হাঁসুলী, মাথায় রূপার সিঁথি, কানে সারি গাঁথা ছোট ছোট সোনার মাকড়ী, পায়ে রূপার মোটা মল, বেড়ার ফাঁকে আসা রৌদ্রে ঝকমক করছে। সেকালের কবি হলে তার রূপ বর্ণনা করতে পারতো হয়তো—'কন্দুলী পুষ্পের' মত অধর, 'তিলফুল জিনিনাসা' 'দশন মুক্তার পাঁতি হরিণ নয়ন' ইত্যাদি বলে। কিন্তু দেখবার রূপের সম্বন্ধ চোখের সঙ্গে, লেখবার রূপ দেখার বাইরে। সত্যিকারের রূপ লেখায় বোঝান যায় না বোধ হয়।

যাই হোক, বধূর কথায় কিম্বা সমবেত দলের উপস্থিতির জন্য তার ঘুমটা কেমন হঠাৎ ভেঙে গেল। সে উঠে পড়ল। তারপর অবাক হয়ে চেয়ে রইল। যেন তার মনে হচ্ছে না ঠিক—এটা জাগা না স্বপ্ন, অথবা কি! আর কোন জায়গা এটা!

এইবার তার বড়ভাই জিজ্ঞাসা করলে কঠোরভাবে 'তুই কোত্থেকে এলি? কখন এলি?'

ততক্ষণে সে ভাল করে জেগেছে, সব মনেও পড়েছে। সে কিছু উত্তর দেবার আগেই তার মা জিজ্ঞাসা করলে 'কার সঙ্গে এলি? কেন এলি?'

এতক্ষণে সে সোজা হয়ে বসে মাথায় ওড়না তুলে দিয়েছিল। এবারে দুষ্ট ঘোড়ার মত কারুর পানে না চেয়ে অন্য একদিকে তাকিয়ে মার কথার জবাব দিলে, 'একলা এসেছি।'

মা ভাইরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'এই রাত্রে একলা এসেছিস?'

সে নির্বিকারভাবে গরুগুলের দিকে চেয়ে রইল। অসহ্য রাগে বড়ভাই কটু একটা গালি দিয়ে বলে উঠ্‌ল, 'তুই কি পাগল হয়ে গিছিস? লোকে আমাদের কি বলবে তা জানিস না? তোকে আজ আমি মেরে খুন করে ফেল্‌ব।'

সে চুপ করে একগুঁয়ের মত সেই দিকেই তাকিয়ে রইল। এবার ছোটভাই বল্লে, 'আচ্ছা, ওকে এই গোয়ালেই দরজা বন্ধ করে রেখে দাও, খেতে দিও না। যতদিন না ওর শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা এসে আবার নিয়ে যায়।'

এইবার সে মুখ তুল্লে, তারপর স্থিরভাবে বল্লে, 'আমি না খেয়ে মরে গেলেও সেখানে যাব না। সেখানে তারা মারে, গালাগাল দেয়। রাতদিন কাজ করায়, খেতে দেয় না ভাল করে। কক্ষনো যাব না। দাদা মেরেই ফেলুক।'

ওড়নার পাশ থেকে তার বাহুর ওপর মুচ্‌ড়ে যাওয়া কালশিরে কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল। চোখে তার জল ছিল না, মিনতি বা বিনীত করুণা যাচ্ঞার ভাবও মুখে নেই। গৌরসুন্দর কিশোর তনু, আরও উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর নিখুঁত মুখ ভোরের বেলায় অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোয় যেন গৌরীর মূর্ত্তির মত দেখাচ্ছিল। সহসা বাইরে কে ডাক্‌ল, ভাইরা বেরিয়ে গেল। জননীও এগিয়ে গেল দরজার দিকেই।

বধূ ননদের কঠিন স্থির মুখের দিকে চেয়ে ভীতভাবে কিছু না বলে গরুর দিক পরিষ্কার করতে লাগল। উমদা এবারে ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল। দু'রাত্রি সে হেঁটেছে। খেতে পায়নি। দিনে হাঁটতে সাহস করেনি, পাছে কেউ দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। গোয়ালের দুটী গরু দুটী বাছুর চুপ করে চেয়েছিল শান্তভাবে উমদার দিকে। যেন তারাও বুঝতে পারছিল—কি একটা হয়েছে, আর উমদাকে চিনতে পেরেছিল।

২

ভাইরা বাইরে এলো।

হাতে মোটা একটা লাঠি, মাথায় সাদা আধময়লা পাগড়ী, গায়ে রেজীর (খদ্দর) মেরজাই, মোটা ধুতি, পায়ে রূপার কড়া (মল) পরা এক দীর্ঘকায় মস্ত গোঁফওয়ালা জাঠ চাষা দাঁড়িয়েছিল।

ভাইরা তটস্থ হয়ে বল্লে, 'এসো, এসো, যমুনালালজী, খবর সব ভালো? এত সকালে?'

যমুনাসিং বল্লে, 'হ্যাঁ সব ভালো। কিন্তু বৌকে কাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না, এখানে এসেছে?'

বড়ভাই বল্লে, 'হ্যাঁ, এসেছে তো।'

আশ্চর্য্য হয়ে যমুনাসিং বল্লে, এসেছে! একলা চলে এসেছে পরশু রাত্রে। তা থাক ও এখানেই। আর ওকে নিয়ে যাব না। আমরা ভাইয়ের আবার বিয়ে দোব।

যমুনা সিং উঠে দাঁড়াল।

এবার ছোট ভাই বল্লে, 'না না, বসুন। আপনি রাগ করবেন না। ও বড়ই ছেলে মানুষ। আমার পিতামহ ওকে আদর দিয়ে 'উমদা পরী' (সুন্দরী পরী) বলে ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন। আমরা ওকে বুঝিয়ে আবার পাঠিয়ে দোব।'

মাও এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বল্লে, 'বেটা, আমিও ওকে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। মেয়ে মানুষ, ওর সাহসও তো কম নয়! এই রাত্রে একলা পথ চলেছে! ওকে তোমাদেরই হাতে দিচ্ছি, তোমরাই মেরে বকে শাসন করো।'

যমুনা সিং বল্লে, 'ওকে শাসন করে আমরা কিছুই করতে পারি না। ও ভারী একজেদী। তাছাড়া ও কারুকে মানে না। সুন্দর বলে ভাইয়ের বিয়ে দিলাম। ঐ সুন্দর বলেই মুস্কিল হয়েছে। যত গাঁয়ের মেয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে ও কথা কয় লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাদের চাষার ঘরে ওমেয়ে চল্‌বে না। সবাই নিন্দে করে, হাসে।'

ব্যাকুল হয়ে জননী বল্লে, 'তা হোক, ওকে তোমরা শাসন করো।'

ছোট ভাই তামাক সাজতে বস্‌ল কুটুম্বের জন্য। তারপর উমদার বড় ভাই আর ভাসুর নীরবে বসে তামাক খেতে লাগল। মা ভেতরে গেল কুটুম্বের অভ্যর্থনার যোগাড়ের জন্য।

অনেকক্ষণ পরে উমদার ভাসুর বল্লে, 'এক কাজ করা যায় ওকে শাসন করবার জন্য। আমাকে আমাদের গাঁয়ের একজন বলছিল।'

বড় ভাই বল্লে, 'কি কাজ?'

যমুনা সিং বল্লে, 'সে বল্লে, আগে আগে অনেক সময়ে দুরন্ত বৌ মেয়েকে লোকে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে ঝি করে রেখে দিত। একেবারে বন্দী হয়ে থাকত। তাতে বাইরে বেরুনো, কারুর সঙ্গে কথা কওয়া—বাজে গল্প সব বন্ধ হয়ে যেত। তারপর সিধে হয়ে গেলে দু'তিন বছর পরে নিয়ে আস্‌ত।'

মা ফিরে এসেছিল। ভাইরা, মা, চুপ করে রইল। ছোট ভাই বল্লে, 'তারা কি সকলের মেয়ে নেয়?'

যমুনা সিং বল্লে, 'তা নেয় না। জানাশোনা লোক দিয়ে ঠিক করতে হয়।'

মা বল্লে, 'কতদিন রাখতে হবে?'

'তা জিজ্ঞাসা করে বলা কওয়া করে নেওয়া যাবে।'

বড় ভাই তেজ সিং বল্লে, 'তা গঙ্গা সিং কি বলে?'

গঙ্গা সিং উমদার বর।

যমুনা সিং আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, 'বাবা রয়েছেন, মা রয়েছেন, তাদের মত আছে, আমি বড় ভাই মত দিচ্ছি। ওর আবার মত কি!'

অতিশয় অপ্রস্তুত হয়ে তেজ সিং আর মা বলে উঠ্‌ল, 'নিশ্চয়। তাতো বটেই।'

গোয়াল, গরু, গোবর ও যাঁতার ধূলোর পাশে নিদ্রিতা ক্লান্ত উমদা বাঈয়ের ভাগ্যলিপিকায়, তার জীবনের বিধাতাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে নূতন এক রেখাপাত হয়ে গেল।

৩

উমদার ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। সে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে, গোয়ালের দরজা খোলা, কেউ বন্ধ করে রাখেনি। সে বেরিয়ে এলো বাইরে। মা রান্না ঘরে রুটী করছে। মাও কিছুই বল্লে না। সে একটু ভয়ে ভয়ে মার কাছে খাবার চাইল। মা দিল।

খাওয়ার সময় মা বল্লে, 'তোর ভাসুর এসেছে।'

চকিত হয়ে নিমেষে সে উঠে দাঁড়াল, বল্লে, 'আমি সেখানে যাবনা। আমি পালিয়ে যাব।'

মা একটু চুপ করে রইল, তারপর বল্লে, 'আচ্ছা যাসনি।'

বিচলিত চঞ্চল উমদা বিকালের দিকে ভাজের কাছে শুন্‌ল, তাকে নিয়ে ওরা সব সহরে যাবে, রাজার বাড়ীতে সে থাকবে এখন থেকে, সেখানে কাজ করবে। ভাসুর আর ভাইরা এই বলেছে। উমদা অবাক হয়ে গেল।

রাজার বাড়ী? রাজ-প্রাসাদ! রাণীরা? মহারাজা? সেখানে চাকরী করবে বা কি কাজ করবে, সেকথা উমদার মনে এলো না। অবাক হয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল, রাজার বাড়ীর কথা, রাণীদের কথা, তাদের ঐশ্বর্য্যের কথা। যে ঐশ্বর্য্য সে দেখেনি সেকথা তার কল্পনায় এলো না। সে স্বপ্ন, তার জানা ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নের চাক্কি, চুলা, (যাঁতা উনান) পাকা বাড়ী, গহনা কাপড় অতিক্রম করে যেতে পারে না। তবু সে ভাবতে থাকে,

মুগ্ধ ভাবে ঘুরে ফিরে—গহনা কাপড় পরা অজানা রাণীদের কথা, তার জানা দেখা বড় বাড়ীর কথা।

৪

তারপর একদিন যাত্রার দিন এসে পড়ল। উমদার রুক্ষচুলে ঘি মাখিয়ে আঁচড়ে, মোম মাখিয়ে পেটী পেড়ে, উচু খোঁপা রুক্ষ তালুর পিছনে বেঁধে, যথাসম্ভব গহনা পরিয়ে, পরিষ্কার ঘাগরা লুগড়ী কাঁচুলী ও জামা পরিয়ে মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে—তাকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার উপযুক্ত সাজে সাজিয়ে তার ভাই, ভাসুর আর মা তাকে নিয়ে সহরের দিকে রওনা হ'ল। আর রাজপ্রাসাদের স্বপ্নমুগ্ধ কিশোরী উমদা এই যাত্রায় কোনো বাধাও দিল না, প্রতিবাদ ও করল না।

নানা তদ্বির, নানা মানুষ, বহু দেখা সাক্ষাৎ করার পর একদিন সন্ধ্যায় তারা অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি পেল।

গ্রাম্য জাঠ চাষা উমদার ভাই আর ভাসুর ধুলিমলিন জামা-কাপড় পাগড়ী ধুয়ে পরিধান ক'রে, মোটা লাঠিটা হাতে নিয়ে সপ্ত তোরণ প্রাসাদের প্রথম তোরণে বিনীত ভাবে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল এবং মা আর মেয়ে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে একজন খোজার সঙ্গে কোনো এক রাণীর প্রধানা সখির দরবারে গিয়ে পৌঁছল। উমদার ধূলিধূসর মেহেদী-পরা দুখানি গাঢ় রক্তবর্ণ চরণকমল উচু ধরণের গ্রাম্য ঘাগরার তলা থেকে দেখা যাচ্ছিল। মেহেদী-আঁকা দুখানি করপল্লব জোড় করে উমদা মার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

প্রধানা সখি একটু রূঢ়ভাবে বল্লে, 'অত ঘোমটা দিয়েছিস্ কেন? চল্ রাণীজীর কাছে নিয়ে যাই, যদি রাখেন। যদি তোর কপালে থাকে।'

তারা রাণী তোমরজীর (তোমর বংশের কন্যা) মহলের দুয়ারের একপাশে এসে দাঁড়াল।

উমদা-জননী-বর্ণিত উমদার অবাধ্যতা ও চঞ্চলতার সমস্ত কাহিনী রাণীর কাছে বর্ণনা করে বড়ারণজী (বড় সখি) তাকে ডেকে নিয়ে বল্লে, 'এই, মুখ তোল্! দেখ্ এমনি করে কুর্ণিশ কর্।'

কুর্ণিশ করা দেখবার জন্ত মাথার গুণ্ঠন সরিয়ে কুর্ণিশ করে উমদা বিনীত ভাবে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। ঝাড়ের মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোতে অলিন্দের পাখী, ফুল আঁকা রঞ্জিত দেওয়ালের এবং কক্ষতলে বিছানো সুন্দর গালিচার রংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাণী তার দিকে চেয়ে এই গ্রাম্য কৃষক বালিকার রূপে অবাক হয়ে গেলেন। সখিরা এবং খোজাও আগে দেখেনি, তারাও আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

আর উম্‌দাও তার কল্পলোকের অজানা এই বিরাট প্রাসাদ এবং প্রাসাদবাসিনীদের অপূর্ব্ব বেশভূষা দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তাকে দেখে যে তারাও অবাক হয়ে গেছে, সে কথা সে বুঝতেও পারল না।

৫

কয়েকটা বছর কেটে গেছে।

সহসা একদিন গঙ্গা সিং এসে দাঁড়ালো তেজ সিংয়ের বাড়ী। শাশুড়া আর তেজ সিংকে নিয়ে সে সহর থেকে উমদাকে আনতে চায়। এতদিনে নিশ্চয় সে শান্ত হয়েছে। বড় হয়েছে। স্বামীর ঘর করবার মত তার বুদ্ধিও হয়েছে।

তেজসিং চুপ করে রইল। তার কানে বোনের 'পদোন্নতি'র খবর, তার ওপর রাজ মিত্রের 'নেক নজরে' পড়ার আভাসও একটু যেন পৌঁচেছিল। সেদিন সরল জাঠ কৃষক তাতে গর্ব্বিত হয়েছিল কিনা কে জানে, আজ গঙ্গা সিংয়ের কথায় হঠাৎ সে যেন লজ্জিত আর দুঃখিত হল। তারা তো কিছুদিন পরে বোনকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে আনবে ঠিক করেই ওখানে দিয়েছিল। কিন্তু আনা তো হয়নি!

তেজসিং বল্লে, 'তুমি এতদিন আসনি কেন?'

গঙ্গা সিং বল্লে, 'মা মরে গেল, বাপ মরে গেল, ভাইয়ের অসুখ হ'ল, অজন্মা হ'ল, আমি ভাবলাম সে যদি আবার এসে চলে যায়। তারপর আমি পলটনে চাকরী নিলাম, ছুটী পাইনি। এখন ভাল কাজ করি, তাই এলাম। প্রকাণ্ড তলোয়ারখানি কোলে নিয়ে পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘদেহ মস্ত-গোঁফওয়ালা মস্ত-পাগড়ীপরা জোয়ান গঙ্গাসিং স্ত্রীর কথা বলতে বলতে গ্রামের লোকের মত সরল লজ্জিত-ভাবে একটু হাসলে।

বৃদ্ধা শাশুড়ী গর্ব্বিত স্নেহভরে তার দিকে চেয়েছিল,

বল্লে 'চল যাই, নিয়ে আসি তাকে। এমন সিপাহী জামাতা, অমন সুন্দরী মেয়ে!'

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গুম্ফ সুশোভিত রৌদ্রম্লান মুখ, দুটী মাঠ-চাষা পুরুষ আর তাদের বৃদ্ধা জননী সহর অভিমুখে আবার যাত্রা করল।

সেবারের মতই তারা প্রাসাদের প্রথম তোরণে অপেক্ষা করতে লাগল, জননীকে অন্দরমহলের দেউড়ীর দিকে পাঠিয়ে।

প্রহরীমণ্ডলীর কাছে বৃদ্ধা এসে দাঁড়াল। তারা জিজ্ঞাসা করে, কাকে চায়, কি আবেদন?

উমদাকে দেখতে চায়, নিয়ে যেতে চায়? কে উমদা? কোনো উমদাকে তারা চেনে না। কোন্ রাণীর দাসী?

তোমরজীর? আচ্ছা, খবর দিচ্ছি।

'বড়ারণজী আর প্রধান খোজার কাছে যা কেউ এত্তেলা দে।' বহু দর্শনার্থীর দলে বৃদ্ধাও অপেক্ষা করতে লাগল। দেখা হ'ল। ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রধানা সখি বড়ারণজী চেয়ে রইল, 'কাকে চাও? কে তুমি?'

প্রধান খোজাও এসে দাঁড়াল। উম্দা? উমদার মা তুমি? তাকে নিয়ে যেতে এসেছ? কোন উমদা?'

বিনীতা বৃদ্ধা কন্যার পরিচয় জানায়। সহসা কি মনে পড়ে ঈষৎ হাসির একটা রেখা খোজার মুখে ফুটে উঠ্ল।

বড়ারণজীর মুখে হাসি এবার স্পষ্ট ও উচ্চ হয়ে উঠ্ল।

খোজা বল্লে, 'ওহো! তোমরা জানো না বুঝি? উম্দা বাই তাঁর নাম নেই আর। তাঁর নাম খেতাব শোনো নি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মেয়ে তিনি জানি। কিন্তু তিনি এখন পর্দ্দায়েত্। তাঁর মস্ত নাম, খেতাব সুমেরু রায়। মহারাজার কাছে পেয়েছেন। কি বললে? দেখা করবে? কি বল্‌ছিস্ তুই? তোর মেয়ে সে, তাকে দেখতে চাস্? কি বল্‌ছিস্ তার বর নিতে এসেছে? তুই পাগল হয়ে গেছিস? ওকথা আর মুখেও আনিস নি সহরে দাঁড়িয়ে। তোর মেয়ে তিনি তা জানি। এখন আর তোর মেয়ে নেই, তিনি রাণী। বুঝেছিস রাণী! পথে ঘাটে তাঁকে 'মেয়ে' 'মেয়ে' করলে তোর 'ফাটক' হয়ে যাবে। বুঝলি? একেবারে গেঁয়ো। যা গাঁয়ে ফিরে যা'।

খোজারা আর সখিরা উপহাসের হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল।

৬

সুমেরু রায়ের কানে এ কাহিনী পৌঁছায় কিনা কে জানে। ঐশ্বর্য্য বিলাসময় নিরবকাশ দিনের মাঝে কে কার দুঃখময় পূর্ব্ব জীবনের কথা বা দুঃখদাতা স্বজনের কথা মনে রাখে। কার এমন সাহস যে কোন গণ্ডগ্রামের গোঁয়ার চাষাকে আজ বলে, রাজ-প্রেয়সী সুমেরু রায়ের স্বামী! আর এক স্থবির গ্রাম্য বৃদ্ধাকে বলে তাঁর মা!

হয়ত শুনেছিলেন, নয়ত শোনেন নি। যাক্। কিন্তু তাঁর যৌবন আর রূপ তো সীমাহীন নয়, আর প্রকৃতির মত নিত্য নূতনও হয় না এবং বিপুল পৃথিবীতে সুন্দরী নারীরও অভাব নেই।

অকস্মাৎ সহরের লোকেরা, ক্রমে গ্রামবাসিনী তার জননী তার ভাইয়েরাও শোনে, সুমেরু রায় বা উম্দা বাইয়ের ওপর গঙ্গাদেবার আবির্ভাব হয়।

সহসা একদা এক বৈশাখ পূর্ণিমার রাত্রে 'মছ্লী' ভবনের (স্নানাগারের) শ্বেত মর্ম্মর কুট্টিমে নিজ শুভ্র সূক্ষ্ম বসনে প্রস্রবণের ধারাস্নাত তনু এখনো তন্বী রূপসী উম্দা বাই ওরফে সুমেরু রায় রবিবর্ম্মার গঙ্গাবতরণের ছবির মত গঙ্গাদেবী রূপে রাজগোচরে আবির্ভূত হয়েছেন।

মদিরামুগ্ধ রাজা মূঢ়ভাবে প্রেয়সী নারীর এই অপরূপ নবশোভাময় রূপের দিকে চেয়ে থেকে শুনলেন, গঙ্গা-দেবীর আদেশে আজ এখন আর তিনি সুমেরু রায় নন—তাঁর ইষ্টদেবী গঙ্গাদেবীর অবতার।

তারপর কখনো জ্যোৎস্না রাত্রে, কখনো নক্ষত্র-খচিত চমৎকার তিমির রাত্রে দেবীর আবির্ভাব হয় তাঁর উপর।

রাজ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যা, নানা কথা, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অতীতের মীমাংসা হয় সেদিন।

আর সঙ্গে সঙ্গে উম্দা বাইয়ের বা পর্দ্দায়েত সুমেরু বাইয়েরও রাজার ওপর প্রভাব হ্রাস হয়ে যাবার আতঙ্ক থাকে না। ধর্ম্মের মোহময় ভয় রাজার নানা নারীর মোহ বিলাসকে দেবীর কাছে অপরাধ ভয়াবিষ্ট করে রাখলে।

আর গঙ্গাদেবী আবিষ্ট সুমেরু রায় প্রত্যাদেশ পান এবং রাজাকে আদেশ দেন—কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিনী নারীকে 'কোতল' করতে; কখনো রাণীদের অসম্মান করতে; কখনো রাজ্যের কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা উলট পালট

করতে। লোকে সভয়ে অনুভব করে, বলাবলি করে, জাহাঙ্গীরের নূরজাহানের মত সুমেরু রায়ই রাজা এখন।

তবু অবতারত্বের ইন্দ্রজালের মহিমা একদিন সহসা মিলিয়ে গেল, রাজার মৃত্যুতে।

আর প্রত্যাদেশ পেলেও আদেশ শোনবার জন্য মুগ্ধ হ'য়ে কেউ বসে নেই এবং আর প্রত্যাদিষ্টও হন না সুমেরু রায়।

মানুষের বিশ্বাস এত টলমলে, কয়েক দিনেই সহরের গ্রামের সকলে বুঝতে পারল, সুমেরু বাইয়ের ওপর যে 'ভর' হ'ত গঙ্গাদেবীর—সব ছলনা, কিছুই নয়! যারা উৎপীড়িত হয়েছিল, যারা বঞ্চিত হয়েছিল, যারা লাঞ্ছিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে সমস্ত রাজ্যের সকলেই অবিশ্বাসেও যেন এক হয়ে গেল।

রাজার মৃত্যুতে রাণীদের রাজ্ঞীত্ব আর থাকে না বটে, পদেরও পরিবর্ত্তন হয়, মর্য্যাদারও প্রকার ভেদ হয়, কিন্তু তাঁদের মাজী সাহেব বা রাজমাতারূপে সম্মান প্রতাপ কিছু কম হয় না।

কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরের প্রমোদপ্রাসাদবাসিনী অসংখ্য বিলাস-ক্রীড়নক নারীদের সঙ্গে সুমেরু বাইও এক নিমেষেই মূঢ় মর্য্যাদাহীন সাধারণ বার-নারীর পর্য্যায়ে মিশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্ত্তেই ইঙ্গিতে অঙ্গুলী হেলনে রাজ্যের নানা রকম বিপর্য্যয়, যথেচ্ছাচার ঘটাবার অধিকারও তার মিলিয়ে গেল।

প্রাসাদের বিরাট নারীশালায়, মহলে মহলে অন্য মেয়েদের মত তারও জীবনযাত্রা চিরকালের মত বন্দী হ'য়ে গেল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, তখনও রূপবতী, সুমেরু বাইয়ের আশে পাশে আর স্তুতিবাদকারিণীদের ভিড় জমে না।

৭

এমন সময়ে একদিন এক সখির মুখে শুনলেন বৃদ্ধা জননীর কথা, তার এখানে আসার কথা, আর ফিরে যাওয়ার কথা। বিস্মৃত শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। সুমেরু বাই ঈষৎ বিমনাভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে তোরা অন্দরে আনলিনি কেন? আমাকে এত্তেলাও (খবর) দিস্‌নি তো?'

এখন নির্ভয়ে সখি প্রগলভ্‌ভাবে হেসে বল্লে, 'তার যা ময়লা গেঁয়ো কাপড়-চোপড়—আর কথাবার্ত্তা শুনে সে যে আপনার মা তাই বিশ্বাস হয় নি। তারপর একটু মুখ টিপে হেসে বল্লে, 'সে আবার বলছিল সঙ্গে আছে তার জামাই আর তার ছেলে, আপনাকে তারা দেখতে চায়। দেখা করতেও এসেছে, নিতেও এসেছে!'

সুমেরু রায় ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তার দিকে চেয়েছিলেন, এখন আর ওরা তাঁকে আগের মত সম্ভ্রম করে কথা বলে না। সে যেন সমানে সমানে হাসছে গল্প করছে।

তাঁর ভ্রূকুটীতে ভ্রূক্ষেপ না করে সে আবার বল্লে, 'তা খোজা সাহেব আর বড়ারণজী হেসেই খুন। তারা ওদের বল্লেন, 'যা' পালা দেশ ছেড়ে, তোর মেয়ে এখন রাণী হয়ে গেছে। ওই 'গাওয়ার'টাকে তার স্বামী বলে পরিচয় দিলি, তোদের ফাটক হয়ে যাবে।'

সুমেরুবাই চুপ করে রইলেন। মনে হতে লাগল—মা আছে, না নেই? ভাইরা বেঁচে আছে নিশ্চয়। আর গ্রামের মুক্তজীবন! রাজ-অন্তঃপুরের সুখ বিলাসহীন ঐশ্বর্য্যহীন সে জীবন! সহসা আজকে এতদিন পরে বহু আকাঙ্ক্ষিত এই জীবনকে যেন বন্দীশালার জীবন মনে হ'তে লাগল। রত্ন-অলঙ্কার-ভূষিত দেহের পরিচর্য্যাকারিণী দাসীসখিবেষ্টিত বহু বিলাসময় প্রাসাদের মহিমা গৌরবের মোহ, রাজার মৃত্যুতে তাঁর ক্ষমতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সখিটা বলতে থাকে—'তারপর আবার সেদিনও এসেছিল তারা!' এবারে অপেক্ষা করে—প্রশ্নের।

সুমেরু বাইয়ের পদমর্য্যাদায় সম্ভ্রমের চেয়ে কৌতুহল বেশী হয়। বল্লেন, 'কে এসেছিল? মা? কেন?'

সখি হাসে একটু। তারপর বলে, 'আপনার মা ভাই আর তার জামাই আর ছেলে। আছে তারা সহরে।'

সুমেরু বাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা এসেছে? ছেলে কার?'

'ছেলে জামাইয়ের। সেপাইয়ের না, চৌকিদারের চাকরীর জন্য এসেছে তারা। এই বড়ারণজী বল্‌ছিলেন। তা এখন তো আর আপনাকে বল্লে হবে না, এখন মহকুমা খাসের হুকুম লাগবে।'

সুমেরুবাই আবার ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন।

স্পর্দ্ধা বেড়েছে ওদের! স্পষ্ট করে বলাব এই সাহস হয় নইলে! কিন্তু চুপ করেই বইলেন। যেন কথা বললেই ওদেব স্পর্দ্ধা আব প্রগল্‌ভতা বেড়ে যাবে বুঝতে পারলেন।

কিন্তু তিনি না কথা বল্লেও—সে আবাব বল্লে, 'আব ছেলেটা নাকি এমন সুন্দব দেখতে। ১২।১৩ বছবেব ছেলে মস্ত তলোয়াব কোলে নিযে চুপ করে তার মামা আর বাপের পাশে বসেছিল। যেন মেওয়াবের গল্পেব বীর বাদল। খাঁটি বাজপুতেব বাচ্ছা হাজাব হোক। স্পর্দ্ধিত কৌতূহলে সে জিজ্ঞাসা কবে 'আচ্ছা, ওকি আপনার ছেলে?'

সুমেরুবাই গম্ভীবভাবে বল্লেন, 'যা, খসখসেব পর্দাগুলো ফেলে দিযে তাতে জল দিতে বল। আব পাখা টানতে বল্। আমি শোব।'

তবু প্রতিদিনই নির্ভযে কোনো না কোনো গল্প গুজবেব অবতাবণা কবে সখিবা কেউ না কেউ।

ক্রমে সুমেরু বায়েব সযে যায। আব প্রশ্ন কবতে ইচ্ছে কবে। গ্রামেব কথা মনে হয, মাযেব কথা মনে হয়, পারিবারিক জীবন যে কেমন তাও মনে হয। সঙ্গোপনে ভাবেন, তাহলে স্বামী বিবাহ কবেছিল? সন্তানও হযেছে? অমন সুন্দর সন্তান? সপত্নী নিশ্চযই রূপবতী।'

কেমন কৌতুক হয। সব সময মনে হয কেবলি, একবাব গ্রামে যেতে পাবা যায় না? বৃদ্ধা জননী ও ভাইদেব কাছে। তাবপব রূপসী সতীনকে দেখে আসতে পাবে। তাব চেযে কি সুন্দবী সে হবে! আশ্চর্য্য, সপত্নীব সঙ্গে কিবা সম্বন্ধ, আব কিবা প্রযোজন, তবু ঘুরে ফিরে কিশোর কুমার তাব ছেলেব কথা মনে হয। কেমন দেখতে তারা—দেখতে কৌতূহল হয। তাব কি তাতে? তবু।

আস্তে আস্তে পদগৌববের নীহাবিকা মণ্ডল মিলিযে আসে, সুমেরুবাই সহবেব গল্প শোনেন, গ্রামেব গল্প জানতে চান। সখিরা পাযে হাত বুলোতে বুলোতে চুল বেঁধে দিতে দিতে সব কথা বলে।

সবশেষে একদিন এক বিশ্বস্ত সখির কাছে বলে ফেল্লেন, 'একবার গাঁয়ে যাওয়া যায় না?'

'সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। গ্রামে—গাঁয়ে? বাই সাহেবার কি মাথা খাবাপ হযে গেল? মুখে বল্লে, 'সে হুকুম তো কারুর নেই। কেউই তো কখনো 'হারেম' ছেড়ে বেরুতে পারে না। শুনিনি তো।'

সুমেরুবাই নীরব হযে যান।

আবার কতদিন যায। এবারে একদিন বল্লেন; 'আচ্ছা, চুপি চুপি বাসনমাজাব দাসীর সঙ্গে চলে যাই যদি, আবাব দু'চাব দিন বাদে ফিবে আসব!'

দ্বিধাভবে সখি চুপ কবে থাকে। এবারে বল্লেন, 'যদি সব গহনা টাকা নিযে তোকে নিযে দুজনেই চলে যাই! এখানে বন্দী থেকে আব কি সুখ?'

সুমেরুব সিন্ধুকভবা ধনবত্ন, অলঙ্কার গহনা সে দেখেছে। লুব্ধভাবে সে চুপ কবে থাকে, প্রতিবাদ করে না।

প্রতিদিন আলোচনা কবতে কবতে ভয যায ভেঙে। আশা হয দুর্বাব। অবশেষে ঠিক হ'ল দুজনে যাবেন আগে পবে কবে। প্রথমে ধন অলঙ্কার হস্তান্তব করবে আবো দু'একজন দাসীকে দলে নিযে, তাবপব যেমন করে হোক চলে যাবেই।

মহলেব পব মহল, তাতে প্রবেশেব জন্য সুড়ঙ্গেব পর সুড়ঙ্গ পথ, প্রাসাদেব মধ্যে মহলেব আব বাড়ীর সমুদ্র যেন। বিবাট কেল্লাব মধ্যে প্রাসাদ, তাব তোবণে তোরণে প্রহবী, তাদেব খববদাবী। বিপুল জনতা তাব মাঝে আসে যায। কিন্তু যাবা কবে একদিন শৈশবে না কৈশোবে ঐ বিবাট অন্তঃপুবে প্রবেশ করেছিল, সেই নাবীবা আব তো সেই ব্যূহ কখনো ভেদ কবে বাইবে ফিবে আসেনি। তাদেব পাযে নেই সহজ গতি, মনে নেই সহজ সাহস, চোখের সামনে নেই চেনা কোনো সহজ পথ।

এক মুহূর্ত্তে সুমেরু বাই সখি ও সবশুদ্ধ আবার প্রাসাদে ফিরে এলো। এবাবে প্রহরী খোজার সঙ্গে।

এবারে মহলে বন্দীশালা আবও দৃঢ় হ'ল। আর ধনবত্ন সব মহারাণীব হুকুমে তাঁব কোষে বাজেয়াপ্ত হযে গেল।

সুমেরুবাই শুনতে পান, তাঁর ধন ঐশ্বর্য্য নিয়ে এক প্রকাণ্ড মন্দির গঠিত হচ্ছে, মহারাণী করাচ্ছেন স্বামীর নামে।

অহঙ্কৃতভাবে ভাবেন তিনি—তাঁরও নাম থাকবে সেখানে, তাঁরই তো ঐশ্বর্য্য! তৈরী হলে দেখতে যাবেন—আগের মত সমারোহে পাল্কী বন্ধ গাড়ী খোজা ও দাসী সমভিব্যাহারে।

মন্দির শেষ হয়ে যায়, দেবদর্শনে রাণীরা যান, কেরাণী যায়, সাধারণ মেয়েরা যায়। কিন্তু সুমেরু বাইয়ের কোন হুকুম পাওয়া যায় না।

প্রাসাদের ভিতরে সুরক্ষিত সুন্দর মহলে একদা প্রতাপান্বিতা রাজপ্রেয়সী, গঙ্গাদেবীর অবতার, সুন্দরী উমদাবাই পরে সুমেরুবাই, স্থবিরের মত বসে থাকেন, কিছুই ভাবতে পারেন না আর। শুধু অবশিষ্ট সামান্য সম্পদ আর মাসোহারা নিয়ে। আর তোষামোদ করে এবং পুরাতন প্রভাব দিয়ে সংগ্রহ করেন মদির পানীয়।

আচ্ছন্নমনে খাপছাড়াভাবে ভাবেন ভুলে যাওয়া গ্রাম্য জীবনের কথা, আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধা জননীর কথা এবং না-দেখা কোন্ সুন্দর তনয়শালিনী অজানা এক সপত্নীর কথা।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

পঞ্চম স্তবক

(অনেকগুলি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি)

* * * *

বহুদিন পরের কাহিনী

আজ সেই দিন, যে দিন দুলেরা আমরা প্রাসাদে এসেছিল, যেদিন মহবৎ খানও দরবারে এসেছিলেন। তাদের সাক্ষাৎ হল, খান বিরূপ হয়ে গেলেন, একজন সামান্য গায়ক! তার কি প্রয়োজন আছে পতাকা আর অনুচরের। যখন একজন মহাজন ব্যক্তি পথে হেটে চলে—মানুষ পথ ছেড়ে দেয়, কিন্তু নর্ত্তকীর পুত্রের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে, সে তার অশ্বপৃষ্ঠে পুতুলের মতন বসেছিল।

লজ্জায় আমার মাথা অবনত হয়ে পড়ল—আমি আমার অন্তঃপুরে আশ্রয় নিলাম। অতি দীন ভিক্ষুণীর মতন আমি নিভৃত গৃহ কোণে নিজকে লুকিয়ে ফেল্লাম। আমি ও একদিন আমার পিতা সম্রাট শাহ্‌জাহানের নয়নমণি ছিলাম, নুরজাহান আর তাজ বেগমের মতই আমি সাম্রাজ্যশাসন কর্ত্তে পার্ত্তাম। কিন্তু আমার নিষাদ রাজ নলের মত অথবা অযোধ্যা রাজকুমার রামের মতন স্বামী ছিল না, আমার ছিল একটি তরুণ—সে তরুণের একমাত্র আভিজাত্য ছিল, বাদশাবেগমের ঐশ্বর্য্যের রাজদীপ্তি।

আমি আমার বসন ছিন্ন করে ফেললাম। আমার সহোদর দারাও রাণাদিলকে ভালবেসেছিল. রাণাদিল দিল্লীর পথচারিণী নর্ত্তকী ছিল, সম্রাট শাহ্‌জাহান দারার সঙ্গে রাণাদিলের বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন। রাণাদিল সম্রাট আকবরের পৌত্রী নাদিরার সপত্নী হবার অধিকার পেয়েছিলেন। রাণাদিলের শিবিকা দরবারের পথে কখনো অবরোধ করা হয় নি।

শোকার্ত্ত গৃহ তলে বসে আমি কেবল আকাশ পাতাল ভাবছি, চিন্তার শেষ নেই। অভিমানিনী জাহানারা বেগম! তোমার প্রাণ যদি উপবাসী না হত……লজ্জাশীলা জাহানারা, যদি আজ তুমি তোমার প্রেমপাত্রকে পৃথিবীর চক্ষে সম্মানিত করবার চেষ্টা না করতে……আমার ছিন্ন বসনাঞ্চল কুড়িয়ে নিয়ে গবাক্ষের সম্মুখে অগ্রসর হলাম। আমি দেখছি উদ্যানের মালাকর চলেছে দিনের কাজের শেষে সাইপ্রাস বীথির পাশ দিয়া গৃহের পানে। তার একমাত্র পত্নী আজ তার প্রথম পুত্র সন্তানের জননী হয়েছে।

কি গৌরব এই নারীর আজ! এই সামান্যা নারীরও একটা রাজ্য আছে, সে রাজ্যে আছে অজস্র ফুলফল, তার স্বামী আছে তার প্রিয়তম; তার সন্তান আছে—সে যে তার ভবিষ্যতের আশা।

কি দীন এই দুঃখিনী বাদশা বেগম! তার বিবাহ বন্ধন আজ ছিন্ন হয়ে গেছে।

আমার চোখ বেয়ে চলছে অজস্র অশ্রুবন্যা। আমি মনশ্চক্ষে এক দৃশ্য দেখছি—ঊর্দ্ধে নীল আকাশ নক্ষত্রখচিত—আমার বিবাহ বাসরের চন্দ্রাতপ, এক অশরীরী বর এসেছে আমার। মৃদু বাতাস আমার মুখে লাগছে —বলছে প্রিয়তম আসছে। বহুদূর থেকে সঙ্গীতের রেশ ভেসে এসে বলছে আর্ত্ত মৃদুস্বরে, ওগো, তোমার প্রিয়তম আসছে। সমুদ্রের নীরব সঙ্গীতের মত একটা ধ্বনি আমার কাণে ভেসে আসছে—এই সঙ্গীত যে পৃথিবীর প্রথম অজ্ঞতা।

স্থান কাল আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে, প্রাচীর-গাত্রে জানালার উপরে আমার মস্তক অবনত করলাম। আকাশের তারার দিকে চক্ষু দুটি— কখন নিদ্রা এসে শান্তি দিল।

বেগম নূরজাহানের জৈসোমিন প্রাসাদে আমার [illegible]— অজস্র বর্ষার বর্ষণ চলেছে—[illegible] দূরের আকাশে মেঘ খণ্ড [illegible]

স্রোতের মত—বন্যাধারা যেন মানুষের দৃষ্টির পথ থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত জীবনীশক্তি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ঐ মেঘ আবরণ মুক্ত হল, প্রাসাদের অন্তর ভেদ করে একটা গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ ছুটে চলেছে। বাতাসের সুর ছিল করুণ শোকার্ত্ত, তারপর হল তীব্র, অবশেষে আর্ত্তনাদ করে চন্দ্র প্রান্তর অতিক্রম করে, আমি দেখছি যমুনার জলতরঙ্গ আবর্ত্তের বেগে দুর্নিবার হয়ে উঠেছে; ঝঞ্ঝার বেগে আসছে আমার একটা অতীত স্মৃতি—বঙ্গের রাজবংশের সন্তান নজবৎ খান ছিলেন বীর পুরুষ। যখন সম্রাট শাহ্‌জাহানের অন্তপুরের জীবনের সীমা-দীর্ঘতর হতে লাগল, তার সঙ্গে দেওয়ান-ই-আমে তাঁর সমস্ত সভার অধিবেশন ও হ্রস্বতর হতে লাগল, আমিই তখন সম্রাটের পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতাম। এমন কি নজবৎ খানের সঙ্গেও আমি রাজকার্য্য আলোচনা করেছি—বঙ্গের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যাপারেও আলোচনা করেছি।

আজকের মতন আর একদিনের শাহ্‌জাহানাবাদের কথা মনে পড়ছে। আমি জুম্মা মসজিদ থেকে শিবিকায় আমার প্রাসাদে ফিরে এসেছি, আমি প্রার্থনা কর্ত্তে চেষ্টা করছিলেম—পারিনি, ভিক্ষা দান করেছিলাম, সে ভিক্ষা ধূলিতে পরিণত হয়েছিল। আমার অন্তর ছিল অশান্ত, শূন্য—তাই আমার হস্তের দানের মধ্যে ছিল না আশীর্ব্বাদ।

আমার উদ্যানে লতাগুল্মের অন্তরালে অনেক গোলাপ ফুটেছিল, কয়েকটা পদ্মের মৃণাল ভেঙ্গে পড়েছিল, আমি আমার বিছানায় পড়েছিলাম, কিন্তু বিশ্রাম পাইনি, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল একখণ্ড শীতল পাষাণে যদি মাথা দিয়ে শুতে পারতাম। পৃথিবীর সমস্ত আলো কি আজ চিরতরে নিভে গেছে? আমি বাহিরে পথের উপর অশ্বক্ষুর ধ্বনি শুনলাম। আমার সহোদর দারা অশ্বপৃষ্ঠে আসছিলেন। তরুণ যুবকের মত উদ্ভাসিত মুখে দারা আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—সমস্ত শরীর দিয়ে জলধারা বেয়ে পড়ছিল। আমি নজবৎ খানকে বিবাহ করব কি? সম্রাটও বিলাস ব্যসনে ব্যস্ত—তাঁর অসম্মতি দেওয়ার অবসর কোথায়?

অল্প দিনের মধ্যেই দারা সিংহাসনে আরোহণ করবে। নজবৎ খানই হবে রাষ্ট্রের প্রধান আশ্রয়। যুবরাজ দারা বল্লেন আজ রাত্রেই সম্রাটের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করবেন। আমি অনুভব করলাম—আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে সেই বীর সেনাপতি—যেন বিশাল বনানীর অভ্যন্তরে বৃক্ষ রাজির মধ্যে উন্নততম বৃক্ষটি। রাজ রক্তের চিহ্নটি তার সমস্ত দেহে উদ্ভাসিত। তারপর দেখলাম, ফুলেরা বেতসখণ্ডের মত বাতাসে দুলছে, সেই জন্যই ফুলেরা আমার অত প্রিয়—তার মতও আর দ্বিতীয় নেই। তার সঙ্গীত ভেসে আসত, বাতাসে যেমন আসে সূর্য্যালোকে নৃত্যের ছন্দ।

জীবনে অনেক খেলা খেলেছি, খেলায় আর রুচি নাই, আমি যদি কোন বিরাট বংশকে আশ্রয় করি—জাহানারা বেগমের গৌরব কি তারা দান করবে না?

আমি আমার সহোদরের দিকে চেয়ে দেখলাম—তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

"আমি নজবতের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করব আজ সন্ধ্যায় পিতার কাছে,"—বলে দারা চলে গেলেন।

সন্ধ্যা সমাগত, আমি আপাদমস্তক ঘনকৃষ্ণ বোরখার আবরণে ঢেকে লোক চক্ষুর অগোচরে রাজ প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলাম। আমি হায়াৎ বকস বাগের (১) মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি। অমরাবতীর এদেন নন্দনকাননের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছি—আজকের মতন অমন ফুলের উৎসব আর কোন দিন হয়নি। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় উজ্জ্বলতায় বর্ষণমুখর মেঘখণ্ডগুলি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রক্ত আলোর শিখা মর্ম্মর প্রাসাদ ও শিলাদলকে অপরূপ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করেছে। নীল-লোহিতের আভার মধ্যে ফুটে উঠেছে রক্তমুখী প্রেম-পল্লব—কুসুম, গাঁদা (merry gold) কুম্ কুম্-রাগ রক্ত আভা ছড়িয়ে দিয়েছে, রাশি রাশি গোলাপ অন্তরের অঙ্গনে রক্তিম হয়ে উঠেছে;—গোলাপ তার সুবাস ছড়িয়ে, দিনের দেবতার শেষ পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে দিল। অস্ত সূর্য্যের ম্লান রশ্মিকে স্পর্শ করার জন্য নদীর জল আকুল আবেগে হাত তুলে ইঙ্গিত করছে। সুবর্ণমণ্ডিত শিবির-শীর্ষে জলকণা নীল আকাশের প্রচ্ছদপটে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আলো আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, মদির গন্ধ আমাকে অচেতন করে দিয়েছে—আমি ত্রস্তপদে কমলালেবুর বাগিচায় প্রবেশ করলাম। ছায়ার অন্তরালে প্রস্তর খণ্ডর উপরে বসলাম। তীব্র জ্বালার দহনে আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেল্লাম। আমি হব-নজবৎখানের পরিণীতা! সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে আমি যাকে ভালবাসি না, তার আদেশ বহন করে বেড়াব?……এখনো আমার মনে পড়ে তার কুটিল দৃষ্টি—যখন সে বঙ্গ রাজ্যের কথা বলছিল, আমার মনে চমক খেলে গেল—সে যেন দুটি বিভিন্ন সুরে কথা বলেছিল—এক শান্ত মিষ্ট কণ্ঠ, অন্যটি গভীর আর্ত্ত। নজবৎ বলেছিল—"যদি আমি বঙ্গের অধীশ্বর হই……তখন রাজকুমারী তুমি হবে……" আমার মনে নূতন স্রোত বয়ে গেল মুহূর্ত্তের জন্য "হা রাজকুমারী জাহানারা হবে নজবতের……" ভাবলাম।

দেওয়ান-ই-আম থেকে সঙ্গীত ভেসে আসছিল, একটা বিরাট ঢেউএর মতন সঙ্গীতের সুর ভেসে এল—সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন ভেসে চলেছি। আমি আনন্দ রথে উর্দ্ধে আকাশে উঠলাম, তারপরে পড়ে গেলাম দুঃখের উপত্যকায়। একটি ধ্বনি সমস্ত শূন্যকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল, আমাকে যেন ছুরিকার আঘাতে বিদ্ধ করল। সে ব্যথাও আমার অচেনা নয়। এই ব্যথা আমি আর একবার অনুভব করেছিলাম, যে দিন আমি রাখীবন্দ ভাইয়ের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম—আর কোন দিন করিনি।

---

(১) ফুলের জন্য বিখ্যাত হায়াৎ-বক্স বাগ প্রাণদায়িনী উদ্যান, উদ্যানে অনেকগুলি ফোয়ারা ছিল, প্রত্যেক ফোয়ারা বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তর-মণ্ডিত ছিল, কোনটা লাল, কোনটা নীল, কোনটা সবুজ, বর্ণ সমাবেশে কি জলকণা বিভিন্ন বর্ণ পরিগ্রহ করে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হত, গ্রীষ্মে পুরনারীরা এই উদ্যানে ভ্রমণ করে ক্লান্তি অপনোদন করত।

আমার মনে হল—কে যেন একজন কথা বলছে, আর সকলেই কাঁদছিল। যে কথা বলছিল—সে যেন স্বপ্নের আবেশে আচ্ছন্ন, আমার রাখীবন্দের বোন্, প্রয়োজন আছে কি তাঁর কাছে? সে রাখী হয়ত আজ অন্য কোন বাহুকে বেষ্টন করে আছে। আমি মসজিদে বসে যে পত্র পড়ছিলাম—তার অর্থ কি?—মনে আছে তখন একটি অজ্ঞাতনামা পাখী অশুভ ধ্বনি করছিল—প্রাচীরের উপরে বসে। আমি কিন্তু তৃপ্ত ছিলাম—আমার জীবন তখন আনন্দের সঙ্গীতে সুর দিচ্ছিল। আমার সমস্ত দেহ মন পুষ্পোদ্যান হ'য়ে উঠেছিল।

আমি আকাশের দিকে বাহুদ্বয় প্রসারিত করলাম—দুটি বাহুর মধ্যে কি বিরাট শূন্যতা! আমার হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রাখবার মতন কোন বস্তুই পেলাম না, আমার অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করবার মত কোন কিছু হৃদয়ে রাখতে পারলাম না। মাতা সন্তানের জন্য ত্যাগ করে, তাতে তার আনন্দ; সে ত্যাগ যদি নিষ্ফল হয়, তবে সে ত্যাগ হয়ে উঠে বিরাট ভার। পতিবিহীনা নারীর জীবন সূর্য্যবিহীন দিবস।

দেওয়ান-ই-আমের সঙ্গীত উদ্দাম হয়ে উঠল। আমার হৃদয়ও উদ্দামতর হয়ে উঠল। মনুষ্যত্বের অপমানকারী ঔরঙ্গজেবের অধীনে যে রাজ্য চালনা করে, তার নিকট সম্রাট আকবরের রাষ্ট্রধারার মূল্য কি!—কোন মূল্যই নাই। সত্যি কি চৌহান কুলতিলক—মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের মহিমা ভুলে গেছে যেমন? সে আমাকে ভুলে গেছে—আমাকে ত্যাগ করেছে? তুমি না আমাকে তোমার "সংযুক্তা" নামে সম্বোধন করেছিলে?……

গভীর শোকোচ্ছ্বাস আমার মন ভরে দিল, বাঁশীর করুণতান, করতালের কলরোল—সম্মিলিত সুরে আমার কর্ণকুহর রুদ্ধ করে দিল। ঐ দূরে দিক চক্রবালে সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা! মনে হ'ল এক রক্তরঞ্জিত বিরাট বস্ত্রখণ্ড সমস্ত আকাশ জুড়ে রয়েছে।

আমার ভ্রাতার দেওয়ান-ই-খাস থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হয়েছে, আমি একটি গোপন পথে আমার মহলের পার্শ্বে তার সঙ্গে দেখা করব। যথা সম্ভব শীঘ্র আমার অদৃষ্টের বিধান শোনবার জন্য আমি উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছিলাম—তাই সেখানে গিয়েছিলাম। হয়ত বা শেষ সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে বাধা দিলে একটা ব্যবস্থা হলেও হ'তে পারে।

দেওয়ান-ই-খাসের পথে শুনলাম একটা শব্দ, আমি দুজন মানুষ দেখলাম—বস্ত্র হরিদ্র ও উষ্ণীস—পরিধানে রাজদত্ত ভূষণ, মন কূপ খালর খুলে পড়েছে। কূপের গভীরতম প্রদেশ থেকে উত্থিত শব্দের মতন ঝঙ্কার দিয়ে সে মানুষটি-কথা বলছিল। বৃক্ষপত্রের অন্তরালে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম, নজবৎখান!

লোক দু'জন শিলাতল অতিক্রম করে দাঁড়াল, অর্দ্ধনগ্নভাবে ব'লছিল:—"মনে হয় যেন শাহজাদা দারা ভাব্‌ছে সে সিংহাসনে আরোহণ করেছে। তার সাধ্য নেই যে আমার মুষ্টিতে তরবারি উন্মুক্ত থাকতে সে দিল্লীর সিংহাসনে বসবে।" তার অধরে কি ঘৃণার ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল যখন সে বলেছিল, "সম্রাট আমার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না, আমার মনে হয়, সম্রাট তাঁর কুমারী বেগমকে অন্তঃ-পুরেই রাখতে অভিলাষী…।"

তারপর আবার অগ্রসর হল নজবৎখান ও তার সঙ্গী—তারা আবার এল সেই বিরাট চীন বিটপীর তলায়, বৃক্ষতলে বিস্তৃত মখমলের তার আস্তরণের উপর বসল। আমি একটি ক্ষুদ্র আবরণের অন্তরালে এসে তাদের অলক্ষ্যে তাদের আলোচনা শুনলাম। "সম্রাটকে শীঘ্রই মত পরিবর্ত্তন করতে হবে, কারণ তাঁর সিংহাসন রক্ষার জন্য তাঁকে শক্তিমানের সাহায্য গ্রহণ করতেই হবে, শাহজাহান যেমন একদিন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন—ঔরঙ্গজেব তেমনই একদিন সাম্রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, নূরজাহান তার সাক্ষী। জাহানারা বেগম সুন্দরী, সুচতুরা অর্থশালিনী। সমস্ত সুরাট বন্দরের শুল্ক তার প্রাপ্য—সেই অর্থ তার তাম্বুলের জন্যই ব্যয় হচ্ছে…।"

এবার নজবৎখান উঠে পড়ল, তার সমস্ত শরীর ক্রোধে কম্পিত হচ্ছিল। নজবৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল—আমি জাহানারা বেগমের পাণিপ্রার্থী ছিলাম না, শাহজাদা দারা অহঙ্কারী, প্রশংসাপ্রিয়; দারা আমাকে এই ব্যাপারে জড়িয়েছে। আমি জাহানারা বেগমকে দেখেছি মাত্র অবগুণ্ঠনের আবরণে, তার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি আছে, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী আছে একাধিক। দুলেরাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পাবে—আর অনেকেই জানে—তাদের নাম দিল্লীর প্রাচীরের পার্শ্বে শোনা যায়। আমি বিবশর বিদ্ধ বনের হরিণীর মত তার কথাগুলি স্তব্ধ হয়ে শুনে গেলাম। নজবৎ উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল—"আমি জানি কেমন করে আমার রাজবংশের সুনাম রক্ষা কর্ত্তে হবে। চাগতাই রাজকুমারীর বিবাহ অলঙ্কারের আবরণ নিয়ে আমার বংশ মর্য্যাদাকে অলঙ্কৃত করার প্রয়োজন নাই। আমার পথ আমিই সংযত করব—অন্যের প্রয়োজন হবে না।" আমি প্রায় মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম, আমার শিরার রক্তস্রোত যেন ফুটে বেরিয়ে আসছিল। আমি তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে দেখলাম—মনে হল যেন এই লোকটি সুপুষ্ট শিকারী, সর্ব্বদাই নূতন শিকারের সন্ধানে ব্যস্ত। তার চোখে ভেসে উঠছিল একটি তীক্ষ্ণ ক্রূর দৃষ্টি, সে বল্ল "আমীর, তোমার মনে নেই কি সেদিন অগ্নিকাণ্ডের সময় রাজকুমারীর দেহ দগ্ধ হল, তবুও অন্যকে দেহ স্পর্শ কর্ত্তে দিল না…তার চরিত্রের খ্যাতি (?) সেদিন কি শোন নি?"

অবজ্ঞাভরে নজবৎ উত্তর দিল—"তার রক্তে চলেছে বহু রক্তের মিশ্রণ। প্রয়োজন হলে তার প্রেমাস্পদকে লাভ করবার জন্য জাহানারা বেগম প্রাণপণ কর্ত্তে পারে, সেই প্রেমপাত্র সেদিন কোথায় ছিল? অন্ততঃ আমি সে লোক নই। আমি যদি জানতাম সেই প্রেমিকের নাম—আমার তরবারি তার মাথার উপরে সোজা পেত। চল, এখান থেকে চলে যাই। কে যেন আমাকে, আমার চরণকে আবদ্ধ করে রেখেছে।

আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। নজবৎ দাঁড়াল, রক্তরঞ্জিত আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বল্ল—"বন্ধু জাফর! একদিন এক রাজকন্যাকে দেখেছিলাম, প্রভাতে গবাক্ষ পাশে দাঁড়িয়ে সে ঊষার সূর্য্যোদয় দেখছিল, সেদিন ছিল কি পবিত্র কিশোরী! অনাঘ্রাত

পুষ্পপাত্র, তাকে আমি আমার অন্তঃপুরের রাণী করে নিতাম, তার চরণে আমি নিবেদন কর্তাম আমার সমস্ত মুক্তারাজি, তার দৃষ্টি ছিল নীলকান্ত-মণির মতন উজ্জ্বল। সে দৃষ্টিতে আমার চোখের সমুখে উন্মুক্ত হোত সপ্তম স্বর্গের দ্বার। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় সে ইহলোক ত্যাগ করে গেল...”

তারপর আবার সে বলে চল্ল—“আমার অন্তঃপুরে সকল নারীই বন্দগিরি শিখরচ্যুত তুহিনের মত পবিত্র, অভূতপূর্ব্ব। এবার আমি প্রমোদ কাননে যাব—সেখান থেকে রক্ত গোলাপ তুলে নেব—ইচ্ছামত সে গোলাপ আমার অধরে স্পর্শ করব...”

জাফরকে আমি জানতাম; জাফর ছিল ঔরঙ্গজেবের বন্ধু! জাফর ভারতবাসীকে ঘৃণা করে, সে নজবৎখানের করমর্দ্দন করে বল্ল, ভাই, তবে দেখ, তুমি যদি মোঘল সাম্রাজ্যের সর্ব্বোত্তম নারী রাজকুমারী জাহানারাকে শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নেও, তবে কে তোমাকে প্রতিরোধ কর্ত্তে পারে? জাহানারা বেগম যখন তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে, তোমার অন্তঃপুর হয়ে উঠবে নন্দন-কানন। জাহানারা হয়ে উঠবে কুমারী।”

নজবৎখানের দৃষ্টি কম্পিত ছিল না, সে সদম্ভে বল্ল—“আমি যদি কোন নারীকে শত্রুর হস্ত থেকে জোর করে নিতে চাই তবে সে শত্রু হবে আমার সমকক্ষ সমবংশ। কিন্তু জাহানারা যদি আমার অন্তঃপুরকে উপেক্ষা করে কোন বিধর্ম্মীর আশ্রয় গ্রহণ করে তবে সে নিশ্চয় জাহানারাকে স্বর্গের ‘পুরীর’ সন্ধান দিয়ে কৃতার্থ হবে।”

আমি আর শুনতে পেলাম না—আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেল্লাম। যখন আমি আমার চৈতন্য ফিরে পেলাম তখন ভোরের শিশির সম্পাতে আমার শোণিতধারা ঘনীভূত হয়ে গিয়েছিল।

সে লোক দুটি চলে গেছে, নিকটে আর কোন মানুষ ছিল না। আমি আমার অজ্ঞাতে মহতব বাগের (১) দিকে গেলাম, সেখানে ক্রীতদাসেরা লণ্ঠনের আলোকে কৃষ্ণ সর্পের সন্ধান করছিল—আকাশে তখন আলো ছিল না।

আমাকে কেউ দেখতে পায়নি, আমারও ইচ্ছা ছিল না যে কেউ আমাকে দেখে। আমার পাশে সমস্ত জগৎ যূথী, গোলাপ, পদ্ম, কবরীর গন্ধে ভরে গেছে। এখানে বাগিচার ফুলগুলি শুভ্র—সেই শুভ্র পুষ্প গন্ধ আমার ব্যথায় প্রলেপ হস্ত বুলিয়ে দিল। দুই পাশের দীর্ঘ সাইপ্রাস শ্রেণী যেন প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে আছে, শ্বেত পদ্মগুলি যেন ফোয়ারার উৎস-জলে তারার মতন শোভা পাচ্ছিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার এবং নির্জ্জনতা সমস্ত স্থানটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি মখমলের মত মসৃণ তৃণদলের উপর দিয়ে পদ-বিক্ষেপে চলেছি। মখমলের সূক্ষ্ম মসৃণ রেশমগুলি আমার পদ-চুম্বন করে কৃতার্থ হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল যেন কে আমাকে তার বাহুর মধ্যে অতি সন্তর্পণে তুলে নিল।

আমি সাইপ্রাসের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেলাম। সর্পভীতি আমায় অভিভূত করেনি। একটা বিষধর সর্প আমার মনকে দংশন করছিল। একটা উচ্ছ্বসিত ঝরণার পাশে আমি বিশ্রাম করলাম, সেখানে কিংকর প্রদীপ দিয়ে গেছে, বিশ্রামের জন্য ক্ষুদ্র একটা চন্দ্রাতপ সাজান ছিল।

—নারী জন্ম কি ভীষণ অভিশাপ! আমার ইচ্ছা হল—মরুভূমিতে অসহ্যভারাক্রান্ত উষ্ট্রের মতন বিকট চিৎকার করে উঠি—যেন সমগ্র দিল্লীবাসী আমার চিৎকারে চমকিত হয়ে উঠে।

মানুষ নারীর শুচিতা রক্ষা করার জন্য নারীকে অবরোধ করে রাখে, কারণ সে চায় যেন অনাঘ্রাত পুষ্পের গন্ধ উপভোগ কর্ত্তে পায়, কিন্তু মানুষ কি জানে, নারীর রক্তে কি আগুন জ্বলে? স্রষ্টা নারীকে সৃষ্টি করেছিল মাতৃত্বের জন্য, সে নারী শীর্ণ শুষ্ক হয়ে গেছে নীরবে নির্জ্জনে। পুরুষের তাতে কি আসে যায়? পুরুষ তার আখ্যা দিয়েছে সতীত্ব। যদি পুরুষ নারীকে আকাঙ্ক্ষা করে—নারীর কি তাতে মূল্য বাড়ে? হয়ত মুহূর্ত্তের জন্য নারী পুরুষের উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠে—কত দ্রুত সেই মুহূর্ত্তটির অবসান হয়। ইন্দ্রের পাপের চিহ্ন আজও নারীর দেহে বর্ত্তমান...

আমি জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। জলের রূপ দেখলাম, হীরক খণ্ডের মতন স্বচ্ছ—দুঃখের পাষাণের মতন নির্ম্মম—আমার নয়ন সেই পাষাণে অবগাহন করল। আমার মনে হল, আর যেন কোন দিনই জীবনে আমার দৃষ্টি নির্ম্মল হবে না। তারপর আমি চরণে দলিত রামধনুর মতন উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু রামধনু আবার নূতন করে আকাশে উঠবে সেই ত প্রকৃতির বিধান।

বিশালবপু নজবৎখান বিরাট খর্জ্জুর বৃক্ষের মত—তুমি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিলে—তোমাকে দেখছি সিকামোর বৃক্ষের মত যেদিকে বায়ু বহে সেদিকেই তুমি অবনমিত হচ্ছ। তোমার ক্ষমতা নেই যে, তুমি নারীর দুঃখের ভার তুলে নেও। তুমি মূর্খের মত ক্রোধবশে যে কয়টি নাম উচ্চারণ করেছ, তার বাইরে তুমি আমার বিষয়ে কি জান? সে আখ্যা যদি মানুষকে দেওয়া যায়—সে হবে বিষ্ণু বা শিবের মৃণ্ময় মূর্ত্তি; তার প্রতীকও আমি খুঁজে পায়নি। ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হ'য়েছিল, সেখানে কোন দেবতার মন্দির রচিত হয়নি—বিরাট শিখার আধার নেই।

একজনকে আমি ভালবাসছি। বনের হরিণী যেমন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য হিমালয়ের জলধারা আকণ্ঠ পান করে—আমিও তেমনি তার

১। মহতব-বাগ—চন্দ্রালোক উদ্যান, মহতব অর্থাৎ চন্দ্র। এই বাগিচার সমস্ত ফুলগুলি ছিল শুভ্রবর্ণ। মোঘল রাজান্তঃপুরে বিভিন্ন বাগিচার ফুলদল বিভিন্ন বর্ণের। বাগিচার অভ্যন্তরে বিশ্রামাগার ছিল, সেখানে আলোর ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন বর্ণের। আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত হয়ে ফুলগুলি বিভিন্ন বর্ণ সম্পাত করত। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন বাগিচা ব্যবহৃত হত; কারণ ফুলের উপর নির্ভর করত বাগিচার সৌন্দর্য্য এবং সম্ভোগের আনন্দ।

বীরত্বের গৌরব কামনা করেছি। বনানীর মাঝে বিভ্রান্ত পথিক যেমন পর্ব্বত শিখরে তুহীনশীর্ষের ঔজ্জ্বল্যকে স্বর্গের প্রবেশ পথ বলে কল্পনা করে, আমিও তেমনি আগ্রহে তাঁর আত্মার শুচিতা কামনা করেছি।

এই ভারতবর্ষে হিন্দু নারীরা লিঙ্গ পূজা করে, তারা সর্ব্বোত্তম মুক্তাহার সেই লিঙ্গ দেবতার চরণে উপহার দেয়। তপোবনে স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধি জ্বালিয়ে চন্দ্র দেবতার অর্ঘ্য দেয়। তারা প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি প্রতীককে নতজানু হয়ে অবনত মস্তকে অভিবাদন করে। খৃষ্টান শাস্ত্রে নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বকে শ্রদ্ধার্পণ করে। খৃষ্টানের ঈশ্বর স্বয়ং নিষ্পাপ কুমারী মাতার সন্তান। তবে কেন মানুষের জন্ম হবে পাপের মধ্য দিয়ে?

আমি চিন্তার ভারে শ্রান্ত হয়ে পড়লাম। দুঃখের সঙ্গীতের সুরে বয়ে চলেছে জলধারা—বাতাস পদ্ম গন্ধে ভারাক্রান্ত, সুগন্ধি ধূপ পাত্রের মতন মধুকরা আমার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। থাকাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপের মতন রাত্রির বুকে জ্বলছে। ঐ দূরে দীর্ঘশীর্ষ সাইপ্রাস বৃক্ষের উপরে তারকা জ্বলছে আকাশের গায়ে। পাষাণের শিলাতলে আমি নিজকে বিছিয়ে দিলাম। আমি অনুভব করলাম একখানি শীতল হস্ত আমার কম্পিত দেহ অতিক্রম করে চলে গেল।

তারপর আমার অন্তর্দৃষ্টিতে একটা দৃশ্য অনুভব করলাম, সে দিন দরবারে একটা সিংহের খেলা দেখান হয়েছিল। সিংহটা তার মাথা অবনত করে মানুষের মতন ঘন ঘন মৃদু গর্জ্জন করে উঠছিল। আমার মনে হল যেন সিংহটা তার সঙ্গিনীর বিরহ কাতর। তারপর আবার দেখলাম মরুস্থানে যুগল সিংহ। স্রোতস্বতী ঝলমল করছিল, খর্জ্জুর বৃক্ষ-শাখা ছড়িয়ে ছায়া বিতরণ করছিল; আকাশে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র; সেই ছিল সিংহ—যুগলের পৃথিবীর পরিধি। কিন্তু তারা খুব সুখী ছিল, কাশ্মীর পর্ব্বত মালার সানুদেশে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করত। স্রষ্টার কি উদ্দেশ্য ছিল তাদের ভিতর এই শক্তির বিকাশে?

আমি অনুভব করলাম দিবস নিশীথের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কি নিবিড়ভাবে বৃক্ষলতা পশু পক্ষী জীবন যাপন করে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যেন আমিই একমাত্র একা। কোথায় সেই পুরুষ যে ভারতবাসীর চক্ষে আমাকে সম্মানের আসন দান করতে পারে? কবে সে দিন আসবে? বিবাহ বাসরের পরিশ্রুত শুভ্র রত্নমণির দীপ্তি কবে আমার নয়নে ভেসে উঠবে?

সন্ধ্যাকাশের রক্তিম পটভূমিকায় আমার নয়নে ভেসে উঠল একটী শুভ্র উষ্ণীস আর দুটি উজ্জ্বল আঁখি। যেমন প্রহেলিকার উত্তর একটী মাত্র শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনি হৃদয়ও একটীমাত্র হৃদয়ের স্পর্শে মুক্তিলাভ করে—অবশ্য সে হৃদয়টা তারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি হয়।"

আমি খুঁজছি তার প্রথম পত্রখানি—যেখানি আমি আমার বুকের মধ্যে কবচ করে রেখেছিলাম। তার সর্বশেষ পত্রের কয়েক ছত্র আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—"চৌহান রাজ পুত্রের ছবি মুঘল রাজ-কুমারী চিত্র সংগ্রহের মধ্যে স্থান পেতে পারে না।"

সে কি নজরৎ খানের মতনই চিন্তা করছিল? একটা লৌহ হস্ত যেন আমার হৃদয়কে বজ্র মুষ্টিকে আঘাত করল। আমার চারদিকে পৃথিবী বিরাট হয়ে উঠল—অবাস্তব হয়ে উঠল। সাইপ্রাস বৃক্ষ আকাশের সমান উঁচু হয়ে উঠল।—তারা যেন আমার ব্যথার পরিমাপ। আমার ব্যথা এত গুরুভার হয়ে উঠল যে, আর শিলাতলে আমার স্থান সংকুলান হল না, আমার মনে হল যেন শূন্যতার সীমাহীন গহ্বরে আমি বিলীন হয়ে আছি। আমার চৈতন্য বিলোপ হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমার দুঃখ একটা বিকট চিৎকারে মূর্ত্ত হল,—আমার সেই বিকট চিৎকারের শব্দ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে ছুটে চলল—সমস্ত প্রাসাদে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'ল।

প্রভাতে শুনলাম—তারা বলছিল যে, মহতব বাগে রাত্রিতে বেগম জাহানারাকে সর্প দংশন করেছিল।

গান

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বপন দেউলে প্রেমের ভিখারী
পরাণ যাচিয়া ফিরে
নয়নে ব্যথার কাজল আঁকিয়া
আঁধার তন্দ্রা তীরে।

নিঝুমা রজনী চন্দ্রা মগনা
রজনী গন্ধা জড়িত পবনা…
প্রেম ব্যাকুলিয়া নীরব উদাসী
সিনানে নয়ন নীরে।
নয়নে ব্যথার কাজল আঁকিয়া
আঁধার তন্দ্রা তীরে।

মদির জোছনা মধুর লগনে
আসিয়া মুদুল পায়
মরম ভিখারী মরম যাচিয়া
কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়।

অলস স্বপন সায়র বেলায়
আমি আনমনা ফিরানু হেলায়
ভিখারী অধর লগ্ন বাঁশরী
স্বপনে মিলায় ধীরে।
প্রেম ব্যাকুলিয়া নীরব উদাসী
সিনানে নয়ন নীরে।

বনফুল

২২

ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে ব্রজেশ্বরবাবুও যখন 'হল'-ঘরে প্রবেশ করলেন তখন প্রমাদ গণতে হল সুশোভনকে। কি বলবে ভগবানই জানেন। সরে পড়ারও তো উপায় নেই কোনও। ব্রজেশ্বর 'হলে' ঢুকেই পকেট থেকে রুমাল বের করে' হেঁট হয়ে পায়ের গোছ আর জুতো থেকে ধুলো ঝাড়লেন। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে সুশোভনের দিকে চাইলেন তিনি। সুশোভনের দৃষ্টি অবশ্য স্থির ছিল না মোটেই। একটা জিনিস কিন্তু তার মনে হল। ভদ্র-লোকের ভাবভঙ্গী বেশ ভদ্রই, শত্রুতার কোন আভাস তো পাওয়া যাচ্ছে না। দৃষ্টি থেকে যা বিকীর্ণ হচ্ছে তা বেশ ভদ্র। বিস্মিত হল।

"মশায়ের নামটি কি জানতে পারি"—আচমকা যদিও প্রশ্নটা করলেন তিনি, কিন্তু শান্তভাবে।

যথাসম্ভব সাহস সংগ্রহ করে' মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে সুশোভন, তারপর জবাব দিলে, "কেন বলুন তো"

"হুজুরে মনে হচ্ছে আপনি আমার স্ত্রীর বন্ধু একজন। কৌতূহলটা সুতরাং অহেতুক নয় নিতান্ত"

"আমার নাম সুশোভন নন্দী"

"ও, নমস্কার"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। প্রতি-নমস্কার করলে সে।

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে কতদিন থেকে আলাপ আপনার। অনেক দিনের, নয়?"

"হ্যাঁ, তা হবে বই কি"

"আমার পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, আশা করি"

"না। আপনার নাম তো আপনার বাক্সেই লেখা রয়েছে"

"ও, ওটা আমারই বাক্স তাহলে"

ব্রজেশ্বরবাবুর বাম ভ্রূটা ঈষৎ নড়ে উঠল উপরের দিকে।

"ওটা আপনার বাক্স নয়?"

"কি জানি! হয় তো ওটাও আপনি দাবী করে' বসবেন এখনি স্বচ্ছন্দে"

পুনরায় উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হল বাম ভ্রূ।

কাছে-পিঠে অপ্রত্যাশিত গল্প ছাড়লে আমরা যেমন-ভাবে নাক কোঁচকাই, সুশোভন তেমনি করলে দু'একবার! কোনও জবাব দিলে না।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন, "দেখুন, গত চব্বিশঘণ্টার মধ্যে এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে যার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আপনি হয়তো কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারবেন। মনে হচ্ছে—আমার স্ত্রী কাল তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারেন নি এবং এখানে কাল রাতটা কাটিয়ে গেছেন। আপনিও ছিলেন না কি তাঁর সঙ্গে?"

"থাকবার বাধাটা কি"—হঠাৎ বেখাপ্পা এবং ঈষৎ অভদ্র জবাবটা বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে।

"ছিলেন তাহলে?"

"ছিলাম"

"ছিলেন। কেন?"

"থাকবার বাধাটা কি"—আবার বললে সুশোভন। ব্রজেশ্বরের ভ্রূটা আবার নড়ে উঠল উপরের দিকে।

"বাধা কোনও নেই জানি। আমার প্রশ্নটা সে সম্পর্কে নয়। আমি শুধু জানতে চাইছি আমার স্ত্রী এবং আপনি কি করে' এই হোটেলে এসে পড়লেন একসঙ্গে"

"কারণ আমরা দুজনে একসঙ্গে একই ট্রেন ফেল করেছিলাম"

"ও, তাই বুঝি? তারপর"

"আমরা দুজ'নে ট্রেন ফেল করলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী করল না"

"আপনার স্ত্রী"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আমারও স্ত্রী আছে"

"ও"

এই 'ও'টার মধ্যে সুশোভন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর শুনতে পেলে যেন। চটে গেল তৎক্ষণাৎ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও স্ত্রী আছে একটি, নেহাৎ খারাপও নয়। আশা করি আমার স্ত্রী থাকায় আপত্তি নেই আপনার'

"মোটেই না। কিন্তু ঘটনাটা কি শুনি! আপনার স্ত্রী ট্রেন ফেল করেন নি, কিন্তু আপনি করেছিলেন। আমার স্ত্রীও করেছিলেন"

"হ্যাঁ। আমরা সবাই দিগ্বিজয় সিংহরায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। আমি ট্রেন ফেল করে' একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম, আপনার স্ত্রীও আসতে চাইলেন আমার সঙ্গে। এখান থেকে মাইল দুই দূরে ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেল। তখন কি আর করি—খবর পেলুম এখানে এই হোটেলটা আছে—দুজনে এসে আশ্রয় নিলাম এখানে। মোটামুটি এই হল ব্যাপার। আর কিছু জানতে চান কি"

"বেশী কিছু না। এইটেই যদি আর একটু বিশদ করে' বলেন বাধিত হব"

ব্রজেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করে' নিজের লাঠিটার দিকে চেয়ে রইলেন। সুশোভনের মনে হল লাঠির গাঁটের মতো লোকটার ভ্রূতেও গাঁট পড়ে গেল যেন। বিশদভাবে শুনতে চায় সব! মানে? সুশোভনের বুকের ভিতরটা কেমন যেন জ্বালা করতে লাগল। আচ্ছা কাঠখোট্টা বেরসিক লোক তো! বিশদ করে' বলা যায় না কি সব! সান্ত্বনার মতো মেয়ে কি করে' এই নীরস লোকটাকে পছন্দ করে' বিয়ে করেছে! আশ্চর্য্য।

"আপনি নিজে যখন বিবাহিত"—ব্রজেশ্বর বললেন ধীরে ধীরে—"তখন আমার মনোভাব নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার ফলে আমার স্ত্রীর কোনও অসুবিধা হয়েছিল কি না তা জানতে চাওয়াতে আশা করি আপনি রাগ করছেন না। এখানে তো দেখছি স্থানাভাব খুবই। আপনাদের শোওয়ার খাওয়ার কষ্ট হয় নি তো"

"সে আমরা ব্যবস্থা করে' নিয়েছিলাম একরকম করে'"—সুশোভন যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে বলল।

"ব্যবস্থা করে' নিয়েছিলেন? নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখানে ঘর তো মোটে নেই দেখছি। একটিমাত্র স্পেয়ার রুম, শোবার জায়গাও পেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ"—ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এমনই একটা ভাব দেখিয়ে সুশোভন এগিয়ে গেল জানলার দিকে।

"পেয়েছিলেন? আপনাকে তাহলে গোঁসাইজির সঙ্গে শুতে হয়েছে বলুন। কারণ দ্বিতীয় ঘরটিতে তো একটি অসুস্থ মহিলা রয়েছেন। তৃতীয় ঘর তো আর চোখে পড়ল না। তাহলে আপনি—"

প্রত্যুত্তরে সুশোভন বোঁ করে' ঘুরে এমন কয়েকটা কথা বলে' ফেললে যা অনুত্তেজিত অবস্থায় সে বলতো না হয় তো।

"বিশ্বাস করুন মশাই, কোনও রকম নোংরামির মধ্যে ঢুকি নি আমরা। সান্ত্বনা দেবীর মতো সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে আপনার যদি সন্দেহ হয়, তাহলে এ-ও আমি বলব যে আপনি ওরকম স্ত্রীর যোগ্য নন"

ব্রজেশ্বরের মুখভাবে কোনও রকম উষ্মার লক্ষণ দেখা গেল না। তাঁর শান্ত চোখ দুটি একটু প্রদীপ্ত হয়ে উঠল শুধু। মনে হল ক্ষণিকের জন্য যেন তিনি ঈষৎ অসংযত হলেন যখন এগিয়ে গিয়ে সুশোভনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "চটবেন না—"

"কোনও রকম নোংরামি ছিল না, বিশ্বাস করুন"

"নোংরামির কথা বারবার বলছেন কেন। ও কথা তো আমি একবারও ভাবি নি। আমার স্ত্রীকে আমি চিনি ভাল করে'"

সুশোভন ক্ষণকাল হাঁ করে' চেয়ে রইল একথা শুনে। "ভালোভাবে চেনেনই যদি, তাহলে আর এত জেরা করবার মানেটা কি!"

"তাহলে আর এত সব খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনটা কি বলুন"—না বলে' পারলে না সে।

"ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানতে চাই। সব খুলে বলুন দিকি"

"খুলে বলবার তো কিছু নেই। আপনি অনর্থক এরকম একটা গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাব নিয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। এরকম ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলবারই বা মানে কি। আপনার স্ত্রীর যাতে কোনওরকম কষ্ট বা অসুবিধা না হয় আমি তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্যাঁচেও পড়েছি তার জন্য, বেশ কিছু ঘোল খেয়েছি, খাচ্ছি এবং আরও কিছু খেতে হবে সম্ভবত। আর এতক্ষণ পরে' আপনি এসে অনুসন্ধান করছেন। আপনি কি মনে করেন যে সুবোধ বালকেরা যেমন দাঁড়িয়ে স্কুলে গড়গড় করে' পড়া বলে যায় তেমনি করে' আমি কালকে রাত্রে যা যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে' যাব? তা করলে সান্ত্বনার প্রতি একটু অবিচার করা হবে না কি?"

মাথাটি ঈষৎ ঝুঁকিয়ে ব্রজেশ্বর বললেন, "মানছি—আপনার কথা। যতটুকু খোঁজ করেছি তাতে বুঝেছি যে শোওয়ার ব্যাপার নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন আপনারা। হয় তো আমার অজ্ঞাতসারে এমন দু' একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে যা আপনার 'ঠেস' বলে' মনে হচ্ছে, মাপ করবেন সে জন্যে। আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি আমি, আপনিও আমার অবস্থাটা বুঝুন। কি হয়েছিল বলুন দেখি সব খুলে"

উত্তরে সুশোভন অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে নাকের ডগাটা ধরে' কচলালে একটু। তারপর ঢোঁক গিলে বললে, "বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কি?"

"খুব যদি অবিশ্বাস্য হয়"—গম্ভীরকণ্ঠে বললেন ব্রজেশ্বর—"তাহলে স্ত্রীর মুখ থেকে সমস্ত না শোনা পর্য্যন্ত খুব সম্ভব বিশ্বাস করতে পারব না। তবু শুনিই না, শুনতে তো ক্ষতি নেই"

"ছাড়বেন না যখন শুনুন"—আবার নাকটা চুলকুলে সুশোভন—"কিন্তু আগেই বলে রাখছি বিশ্বাস হবে না। মনে হবে বানিয়ে বলছি"

"বলুনই তো"

দু'জনে বসলেন দুটো চেয়ারে।

"কিন্তু দেখুন, বলবার আগে, মানে আমি আবার জিগ্যেস করতে চাই আপনাকে—সান্ত্বনার, মানে আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে মনোভাব আপনি এইমাত্র প্রকাশ করলেন, অর্থাৎ তাকে ভালোভাবেই চেনেন আপনি, সেটা ঠিক তো, মানে তার চরিত্রের সম্বন্ধে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ যদি হ'য়ে থাকে তাহলে মশাই আমি—কারণ—"

"দেখুন অনেক বিষয়েই হয় তো আপনার সঙ্গে আমার মতের গরমিল হবে। ধরুন যেমন, শোওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে, যতদূর বুঝতে পারছি, আপনার ব্যবস্থাটা হয় তো সুবুদ্ধিসঙ্গত মনে হবে না আমার। কিন্তু যে বিষয়ে সামান্যতম মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা নেই তা নিয়ে আপনি অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। আপনি যদি বারম্বার বলেন যে আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান, তা হলেই বরং আপনার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যেতে পারে আমার। আমি যখন বলেছি যে আমি আমার স্ত্রীকে ভালোভাবে চিনি তখন তাই কি যথেষ্ট নয়"

"বেশ, বলছি তবে সব। দেখুন 'লোকতঃ ধর্ম্মতঃ' বলে' যে কথাটা আছে তার ধর্ম্মতঃ অংশটুকু ঠিক আছে, লোকতঃ অংশটুকু হয় তো নেই। ওটুকু বাঁচাতে গিয়ে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, তবু হয় তো বাঁচাতে পারি নি, তা আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি। এতে যদি আপনি চটে ওঠেন তাহলে—"

"আহা, আপনি সুরুই করুন না—"

সুরু করাটাই শক্ত মনে হতে লাগল সুশোভনের। তবে ব্রজেশ্বরবাবুর কথাবার্ত্তা থেকে মনে বল পেয়েছিল সে। ভদ্রলোক শত্রুভাবাপন্ন নন মোটেই। তবু কাহিনীর যে অংশটুকু ঈষৎ 'ইয়ে'-গোছের সেখানটায় সে বারম্বার হোঁচট খেতে লাগল। ব্রজেশ্বর গম্ভীরভাবে শুনে যেতে লাগলেন। মুখের একটি পেশীও বিকম্পিত হল না তাঁর। সুশোভন গোপনও করলে না কিছু, একাধিক স্থানে হোঁচট খেতে হল যদিও, তবু গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটার বিশদ বর্ণনা করে গেল সে। ব্রজেশ্বর দেওয়ালের দিকে চেয়ে নির্ব্বিকারভাবে শুনলেন সব।

সমস্ত বলবার পর সুশোভন হাত উলটে বললে, "এই হয়েছে। বিরাট জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে একটা।

এর জন্যে আপনি আমাকেই যদি দায়ী করতে চান—চাইবেন নিশ্চয়ই—তাহলে তাই করুন"

ব্রজেশ্বরবাবুর চোখ দেওয়ালেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। কেবল বিস্ফারিত হল ঈষৎ।

একটু থেমে তিনি বললেন, "হ্যাঁ। দায়ী আপনাকেই আমি করব। কিন্তু জগা খিচুড়ির চেয়ে ঢের বেশী গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করেছেন আপনি। উপযুক্ত কথা খুঁজে পাচ্ছি না"

"খুবই দুঃখিত আমি, সত্যি বলছি"—এ ছাড়া আর অন্য কোনও কথা জোগাল না সুশোভনের মুখে।

"দেখুন, আমার পরিবার, মানে সান্ত্বনাদেবী"—ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন এবং এতক্ষণ পরে সুশোভনের দিকে চাইলেন—"অত্যন্ত সহৃদয় মহিলা। চলতি বাংলায় যাকে 'বুঝদার' বলে। তার জন্যে কারও কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে এ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তার এই কোমলতার সুযোগ নেওয়াটা আপনার উচিত হয় নি"

"আমি নিই নি তো"

"নিয়েছেন বই কি। যাক্, আমরা দু'জনে এখনই মুচুকুন্দ—কুন্তলেশ্বরী যাচ্ছি, সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা হলে একথা তাকে বলবেন না যেন। তার এই সদয় সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহারে যে আমি আপত্তি করেছি এ কথা যেন সে না শোনে"

"আরে, গ্র্যাণ্ড লোক তো"—হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে। তারপর সামলে নিয়ে বললে, "সত্যি, চমৎকার লোক আপনি মশাই। সাধারণত, এরকমটা চোখে পড়ে না। বাঃ, গ্র্যাণ্ড"

সুশোভনের ভীতু-ভাবটা কেটে গেল।

"আমি ভাল লোক কি না জানি না, তবে আমি যুক্তিকে অনুসরণ করতে ভালবাসি। যুক্তিকে অনুসরণ করতে ভালবাসি বলেই একটা অনুরোধ আপনাকে করছি, আশা করি তা আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না"

"নিশ্চয় না। কি বলুন"

"আপনি চলুন আমার সঙ্গে মুচুকুন্দ-কুন্তলেশ্বরীতে। আর একটা কথাও বলছি, ক্ষমা করবেন, আপনি এতক্ষণ যা বললেন তা এমনই অদ্ভুত যে আমার স্ত্রীর মুখ থেকে তার সমর্থন না পাওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না"

হঠাৎ ব্রজেশ্বরবাবুর মুখভাব ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল।

"বেশ তো"—সুশোভন হেসে উত্তর দিলে বটে, কিন্তু তার হাসিটা কাষ্ঠ-হাসির মতো দেখালো—"বেশ, চলুন যাই আপনার সঙ্গে"

"দেখুন সুশোভনবাবু, আপনি যা বললেন তার সঙ্গে সান্ত্বনাদেবীর বর্ণনা যদি না মেলে অর্থাৎ আমি যদি বুঝতে পারি যে আপনি জোর করে' তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সহৃদয়তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছেন, তাহলে হয়তো হঠাৎ আমি মধ্যযুগীয় হয়ে পড়ব অর্থাৎ আপনাকে নাগালের মধ্যে পেলে খুশী হব"

"ভয় নেই পালাব না আমি, কারণ একটি কথাও আমি গোপন করি নি"

"ধন্যবাদ। এ ব্যবস্থায় আপনার আপত্তি নেই জেনে সুখী হলাম"

"কিচ্ছু আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আছে। আমার স্ত্রী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমার স্ত্রীকেও আমি তুলে নিতে পারি আমাদের সঙ্গে। আমার স্ত্রী হয় তো বেঁকে দাঁড়াবে প্রথমটা, যেতে চাইবে না, কারণ আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ নানা কথা বলে' এতক্ষণ তাকে হয় তো এমন করে' তুলেছেন যে"—

"আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণ কি সব ঘটনা জানেন ?"

"এখনও জানেন না। কিন্তু জেনে ফেলবেন"

"আমার মনে হয় যতক্ষণ না আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একা দেখা করছেন ততক্ষণ তাঁকে, মানে আপনার শাশুড়ী ঠাক্রুণকে, ব্যাপারটা পুরোপুরি জানতে না দেওয়াই ভালো"

"তাতো বুঝছি। কিন্তু ঠেকাব কি করে' ?"

"বলছি। আমি একজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে তবে এখানে এসেছি, তা না হলে তো আমি এখানে আসতামই না। এখন বুঝতে পারছি তিনি অপর কেউ নন, তিনি আপনাদের বন্ধু সদারঙ্গবিহারীলাল"

"ও, সেই বাক্যবাগীশ লোকটা—"

"আপনার স্ত্রী এবং শাশুড়ীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তা যদি হয়ে থাকে তাঁরা হয় তো নানা রকম সন্দেহ করছেন আপনার সম্বন্ধে। আমাদের ধরে' নেওয়াই বোধহয় ভালো—যে তাঁরা শুনেছেন সব এবং তদনুসারে চলা উচিত"

"কি করে' ?"

"মানে, সত্যকে যদি একটু—"

"তাতে আমার আপত্তি নেই। শাশুড়ীকে ভাঁওতা দেবার জন্যে অনর্গল মিছে কথা বলতে রাজি আছি আমি। কিন্তু তাঁকে আপনি চেনেন না। একটি 'চীজ' যাকে বলে। সহজে তাঁকে বাগানো যাবে বলে' মনে হয় না। অথচ সত্যি কথাও বলা যাবে না, তাতে ভয়ানক বিপদ। আপনি যেমন ভদ্রভাবে ব্যাপারটা নিলেন, উনি তেমনভাবে নেবেনই না। আমি অবশ্য আপনাকে আমার জন্যে মিছে কথা বলতে অনুরোধ করতে পারি না, নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু মানে—"

ব্রজেশ্বরবাবু তড়াক করে' উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। তড়াক করে' ওঠাটা ব্রজেশ্বরবাবুর মতো লোকের পক্ষে বেমানান একটু। মনে হল কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপার যেন ভুলে গিয়েছিলেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাঁর মুখের ভাবও বদলে গেল। কণ্ঠস্বরে নূতন সুর বাজল একটা।

"দেখুন সুশোভনবাবু, অত্যন্ত ভীত হয়ে আমি এই হোটেলে ছুটে এসেছিলাম। মনে হয়েছিল আবার বুঝি নূতন আর একটা বিপদ ঘনিয়ে এল। সান্ত্বনার সুনামের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু নেই। সে সুনাম ইতিপূর্ব্বে একবার বিপন্ন হয়েছিল। আপনাকে অবশ্য ধন্যবাদ দেওয়ার বিশেষ কিছু নেই, যদিও আপনি আপনার দিক দিয়ে সে সুনাম রক্ষা করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিপদ এখনও কাটে নি এবং সেটুকু কাটাবার জন্যে যে কোনও উপায় অবলম্বন করতে আমি পশ্চাৎপদ হব না—তা সে 'সু' 'কু' যাই হোক—"

"বাঃ, চমৎকার। আমি যে জটটা পাকিয়ে ফেলেছি, বিশ্বাস করুন, তার জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত আমি। কিন্তু এ-ও বিশ্বাস করুন সে জট ছাড়াতে প্রাণপণে সাহায্য আমি করব আপনাকে"

ব্রজেশ্বরবাবু কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "বেশ, আপনি তাহলে আপনার স্ত্রীকে বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। তাঁর সঙ্গে কে কে থাকবেন আশা করেন"

"শাশুড়ী তো থাকবেনই, শ্বশুরও হয়তো আছেন শ্বশুর মশাই লোক ভালো, তিনি কোনও গোলমাল করবেন না, কিন্তু শাশুড়ীকে সামলানোই মুস্কিল"

"তাঁকে আমি সামলাব"

"ও তাহলে তো বেঁচে যাই। টেলিফোনে আমি যা শুনলাম তাতে তো তাঁদের এতক্ষণ এখানে এসে পড়া উচিত ছিল। কি ভাবে 'প্রসিড্' করব তা আগে থাকতে একটু ঠিক করে' নিলে হত না ?"

ব্রজেশ্বরবাবু সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন।

গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "একটু চায়ের চেষ্টা করা যাক আগে"

"ঠিক বলেছেন" (ক্রমশঃ)

যদি ঘুম ভাঙে তবে স্মরিয়ো মোরে—

বন্দে আলী

ঘুমাও ঘুমাও প্রিয় হয়নিকো নিশি ভোর
বাতায়ন হতে চাঁদ চেয়ে রয় চোখে মোর।
বিহগের কলগানে
ব্যথা যদি জাগে প্রাণে—
ক্ষণেক স্মরিও মোরে যদি ভাঙে ঘুম ঘোর।

শুকতারা জাগে নভে দূর হতে চেয়ে রয়
ভবন-কপোতী জাগি কপোতেরে কথা কয়,
সমীরণ ধীরে আসে
তোমার শয়ন পাশে
ফিরে যায় ভ্রমরা গো কুসুমের বাসে ভোর।

ঈভ্ কুরী ও জহরলাল নেহরু

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-এ

[ঈভ্ কুরী খনামধন্যা বিজ্ঞানী মাদাম-কুরীর কন্যা; বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও ভারতে ক্রীপস মিশনের আলোচনাকালীন ঈভ্ কুরী বিলাতের কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সে সকল দেশের বিশিষ্ট নেতাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। এ প্রবন্ধে পণ্ডিত জহরলালের সঙ্গে ঈভ্ কুরীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেওয়া হলো—তাঁর লেখা-'জার্নি এমঙ্গ দি ওয়ারিয়রস্'এর উপর নির্ভর ক'রে।]

কলিকাতা-দিল্লী-গামী এয়ার-কণ্ডিসণ্ড্ ট্রেণখানি জনবহুল এলাহাবাদ ষ্টেশনে এসে থামলো। জহরলাল প্লাটফর্ম দিয়ে এগিয়ে এসে আমায় সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। যেন কতদিনের পরিচয় আমাদের! কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আমার লাগেজগুলো মোটরে রাখার ব্যবস্থায় মন দিলেন এবং আমার চীন দেশ পরিভ্রমণের কথাও জিজ্ঞেস করলেন—যেখানে নেহরুর অনেক ভক্ত রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সহযাত্রী সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস সভ্য ডাঃ বি, সি, রায়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে কথোপকথন আরম্ভ ক'রে দিলেন। ডাঃ রায়ই এলাহাবাদে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু নেহরুর বাসভবনে আমার থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি আর এলাহাবাদে নামলেন না—তিনি চলেছিলেন সোজা দিল্লী অভিমুখে।

আমি দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলাম—গান্ধীর পরেই যে জহরলাল জাতীয়তাবাদী নেতা, তিনি অবাধে ভারতীয় ও ইংরেজ যাত্রীদের মধ্যে, এমন কি নানা শ্রেণীর ফেরিওয়ালাদের মধ্যে সকলের নজর এড়িয়ে ষ্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জনসাধারণ তাঁকে চিনুক বা না-ই চিনুক, তারা তাঁর বাধা সৃষ্টি করলো না। বস্তুতঃ নেহরুই একটি থার্ড ক্লাশ গাড়ীর কাছে ছুটে গেলেন, সেখানে কতকগুলো ভারতীয় লোক গাড়ীর কাছে ভিড় জমিয়ে কলরব করছিল। একটি কলহের সূত্রপাত হ'য়েছিল মাত্র। এ কলহের কারণ নির্দ্ধারণের জন্যই নেহরুর তথায় গমন। এ থেকে জহরলালের বালকসুলভ চাপল্য ও সজীবতার পরিচয় আমি পেলাম। অনেক যাত্রী অপর কোনো এক যাত্রীর আসনখানি দখল ক'রে বসেছেন—এই হ'লো কলহের কারণ। তাঁর রাষ্ট্রনীতির শক্তি ও জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে তিনি এ কলহের উপর চাপ দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না। দেখতে পেলাম, তিনি ভিড় থেকে বের হ'য়ে আসছেন, অসন্তোষ-জনতার কলহের অংশ গ্রহণ না করেই।

নেহরুকে কেমন দেখাচ্ছিলো? ঠিক যেন রূপকথার সুন্দর রাজপুত্রের মতো। সুন্দর শুভ্র পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত তাঁর দেহ, কংগ্রেসের লাল ও সবুজ ব্যাজ্ রয়েছে তাঁর দেহাবরণে সংলগ্ন, পরিধানে রয়েছে আঁটা পায়জামা ও মাথায় গান্ধীটুপি। দেখতে কৃশ ও একটু খাটো। যদিও তাঁর চুল শাদা দেখাচ্ছিল, মাথায় একটু টাকও পড়েছিল, তবুও গান্ধী টুপিতে তাঁকে অল্পবয়স্ক বলেই মনে হচ্ছিল। যখন টুপিটি তিনি খুলে ফেললেন, তখনই মনে হলো—তাঁর বয়স বাহান্ন স্পর্শ ক'রেছে। শুধু তাঁর সুন্দর অবয়ব ও সুন্দর কালো চোখ দু'টির জন্যই তাঁকে ভুলতে পারিনি তা' নয়। তাঁর অনুভূতি-সমাশ্রয় পাণ্ডুর মুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত করলে, যে কেউ তাঁর অন্তরের ভাবের কথা জানতে পারেন—তা' দুঃখেরই হোক বা আনন্দেরই হোক। তাঁর মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে রয়েছে, সুরসিকের ছাপও তাতে পরিস্ফুট। ঝড়ের দিনে আকাশের মতোই দ্রুত পরিবর্তন আসে তাঁর মুখে নেমে।

তাঁর বাড়ীটির নাম "আনন্দ-ভবন"। নেহরু তাঁর আইনজ্ঞ পিতা ও ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নেতা মতিলাল নেহরুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে এটি লাভ করেছেন। সুবৃহৎ শ্বেত অট্টালিকার মাথার উপর গোলাকৃত একটি ডুম বসানো। বিস্তৃত উদ্যানে সুন্দর ফুল ও ছোটো ছোটো গাছগুলো মিলে শোভা বৃদ্ধি করেছে। নীচের তলায় শিশুর দল, অতিথিরা, নেহরু পরিবারের লোকেরা এবং দাসদাসী মিলে বাড়ীটি মুখরিত ক'রে তুলেছে। আমরা মোটরগাড়ী থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ছাত্র তাঁদের আদর্শ নেতা নেহরুর কাছে অগ্রসর হ'য়ে এলেন—অটোগ্রাফ নেবার অভিপ্রায়ে।

জহরলালকে পাওয়া ও দেখা খুব সহজ। কারণ, তিনি সরল ও সহজ ভাবে থাকেন, আর ভালোবাসেন মানুষকে। অবশ্য এমন সময় গিয়েছে যখন তিনি তাঁর দর্শনপ্রার্থীদের ভিড়ে অস্থির হ'য়ে উঠতেন। তখন তিনি লিখতে বাধ্য হ'য়েছিলেন: "শুধু লোক আর লোক,—এতো কাজ হাতে, তবুও কেন দর্শনপ্রার্থী এসে ভিড় জমায়?" কিন্তু সব দিক থেকে বিচার করতে গেলে, বলতে হয়—তিনি খুব মিশুক। জহরলাল জানেন, তাঁকে প্রথম দেখে কেহ অপছন্দ করবে না। তিনি প্রকৃতই ভক্তদের দৃঢ় অনুরাগের আবহাওয়ায় তাঁদের সান্নিধ্য বেশ উপভোগ করেন। হয় তো দেরাদুন ও লক্ষ্ণৌ জেলের একাকিত্বের অভিজ্ঞতার ফলেই—বন্ধু আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ গৃহের আবহাওয়াটুকু তাঁর ভালো লাগতো! নেহরু তাঁর জীবনের প্রায় আটটি বছর কারাকক্ষে কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ের কাছে একবার একটি চিঠিতে তিনি তাঁর জীবনের গতির কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন: "অনেক জিনিষের সংস্পর্শেই আমি এসেছিলাম। কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ হয় আমার বিজ্ঞান নিয়ে, পরে আইন ও অতঃপর জীবনে জন্মায় নানা বিষয়ে অনুরাগ, অবশেষে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কারা-বরণের পালা।"

'আনন্দভবনে' পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরেই নেহরু আমায় বলেন, কাল

তাঁর গৃহে ৭০ জন অতিথি আসবেন—তাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে। কংগ্রেস সভ্যদের মতো বর ও খদ্দর পরবেন বিয়ের সময়। জহরলাল একটু গর্বের সঙ্গেই প্রকাশ করলেন, রূপোর জরি শোভিত বিয়ের গোলাপী রঙের যে শাড়ীখানি তৈরী করা হ'য়েছে, তার সুতো তিনি নিজেই কেটেছেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখে তিনি আরও বল্লেন, "হয়তো আপনি একথা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বস্তুতঃই জীবনে বন্দীশালায় কয়েক বছর ভালো সুতোই কাটতে পারতাম।"

দ্বিতলের একটি ঘরে আমার জিনিষপত্তরগুলো খুলে ফেল্লাম। শীতল জলে স্নান সেরে পরিষ্কার পোষাক পরে, বাড়ির অন্যান্য লোক ও অতিথিদের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে নীচে নেমে এলাম। বিদেশী পোষাক পরিহিত যে কোনো বিদেশী লোক নিঃসন্দেহে এ বাড়ির যে কোনো সুন্দর লোককে দেখে ঠিক ক'রে নিতে পারেন যে, এঁরা নেহরুরই আত্মীয়। নেহরুর ভগ্নী মিসেস্ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বেশ সুন্দরী। কমনীয়তা তাঁর অবয়বে পরিস্ফুট, শুভ্র কেশ সুন্দরভাবে পরিপাটি করা। তিনি হ'লেন কংগ্রেস-শাসিত একটি প্রদেশের মন্ত্রী এবং 'অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির' সদস্য। নেহরুর মেয়ে ইন্দিরাও বেশ সুন্দরী। ছিপ্‌ছিপে লম্বা, পাণ্ডুর ও বিষন্ন মুখখানি গ্রীক পরিকল্পনারই প্রতীক। গ্রীসে জন্মালেও অশোভন হ'তো না।

নেহরু পরিচয় করিয়ে দেবার পালাটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, আমি তাঁর পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের পরিচয়ই নিজে সংগ্রহ ক'রে নেবো। কিন্তু বস্তুতঃ তা' আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি। ইন্দিরার বর ফিরোজ গান্ধীকে বের করা আমার পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হ'য়েই দাঁড়িয়েছিল। ফিরোজ গান্ধী হ'লেন পার্শী যুবক। সুপ্রসিদ্ধ গান্ধীর সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক নেই। বাড়ীর আঙিনায় উজ্জ্বল কালো কালো চোখযুক্ত যে সব শিশুরা খেলা কচ্ছিল, তারা কাদের ছেলে তা' জানার আগ্রহ ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রশস্ত ললাটযুক্ত বুদ্ধিমতী মহিলাকে আবিষ্কার করতে আমার কিছু সময় লেগেছিল। ইনি যে ভারতীয় আধুনিক নারী-কবি, প্রাক্তন কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট ও ভারতীয় গণজাগরণের একজন অগ্রবর্তিনী—সরোজিনী নাইডু—আর কেউ নয়, এ সত্যটুকু আমার কাছে ধরা পড়লো।

কতিপয় খদ্দরপরিহিত সদাশয় ব্যক্তি একটি প্রকোষ্ঠে যাতায়াত কচ্ছিলেন, সেখানে তাঁদের পরামর্শ সভার বৈঠক বসেছিল। মাঝে মাঝে তাঁরা জহরলালকে ঘিরে ধরছিলেন তাঁর মতামত ও উপদেশের আশায়। এঁরা হ'লেন হিন্দু রাজনীতিজ্ঞের দল। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপসের সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভবিষ্যতে যে আলাপ আলোচনা চলবে সে সম্বন্ধেই তাঁরা আলোচনা কচ্ছিলেন। নেহরুর মেয়ের বিয়ের সময়টায় এ ভাবে ভারতবর্ষে আসা স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সের পক্ষে মোটেই শোভনীয় হয়নি। একদিকে মেয়ের বিয়ের বিরাট আয়োজন, অপরদিকে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা—এ দুয়ের মধ্যে নেহরুর সময় উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কেটে চলেছিল।

আমরা প্রায় বারজন লোক মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছিলাম। ভারতীয় খাদ্যের প্রচুর আয়োজন করা হ'য়েছিল। আমরা শুধু হাতেই সেগুলোর সৎকার কচ্ছিলাম। চার ভাঁজ-করা আটার রুটি, সঙ্গে মাংস ও তরকারী। সত্যি কথা বলতে কি—এগুলো আমি যতটা না উপভোগ কচ্ছিলাম, তার চেয়ে "নেহরু" শব্দটির ভেতর কতটা জটিল সমস্যা লুকিয়ে আছে, তারই কথা আমার মাথায় চিন্তাস্রোত প্রবাহিত ক'রে দিয়েছিল। এই যে ধনী ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ঘরে বসে শুধু হাতে মাংস খাচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন কাশ্মীরের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব, পিতামাতার একমাত্র পুত্র। ইনি ইংরেজ গভর্ণেস্ দ্বারা প্রতিপালিত। শিক্ষা পেয়েছেন আইরিশ শিক্ষকের কাছে। তারপর ইংরেজ উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের মতোই শিক্ষা লাভ করেছেন—হ্যারো ও ট্রিনিটি কলেজে। তিনি হলেন আধুনিকভাবাপন্ন পাশ্চাত্য ভাবধারার ছাঁচে গড়া, একজন 'মার্কসিস্ট সোসালিষ্ট।' যিনি আজ ভারতীয় জনসাধারণের একজন প্রিয় ও আদর্শ নেতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। মাদাম চিয়াং কাইসেক যেমন মার্কিণ ছাঁচে গড়া চীনদেশের একজন নেত্রী, তেমনি জহরলালও ইংরেজদের আবহাওয়ায় গড়া ভারতীয় নেতা—'ব্রিটেনেই গড়া, ব্রিটেনের শত্রু।'

ইউ-এস্-এ, 'লেকচারটুর' সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। জহরলালকে একটু ঠাট্টা করার ছলেই আমি বলে উঠলাম: "বক্তা হিসেবে ষ্টেটস্ (States) এ গিয়ে আপনি মোটেই সাফল্যলাভ করতে পারবেন না (যদিও আন্তরিক ভাবে ঠিক উল্টো কথাই আমার মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল)। অপলক নেত্রে জহরলাল আমার দিকে চেয়ে রইলেন। যেন একটু আহত হয়েই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

আমি বল্লাম: "তার কারণ, আপনার উচ্চারণ ভঙ্গী। আমেরিকানরা ভারতীয়দের বরদাস্ত করতে পারে না—যেমনটি ইংরেজরা আমেরিকানদের বেলায়"—এই বলে সবাই আমরা হেসে উঠলাম। নেহরু তাঁর মার্জ্জিত ইংরেজী ভাষায়—ইংরেজদের কারাগারে তাঁর বন্দী জীবনের যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন, তা বস্তুতঃই অদ্ভুত!

ভারতের শাসকদের সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ইংরেজদের সঙ্গে নেহরুর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ—এ দু'টোর সমন্বয়ে নেহরু ব্রিটিশদের সম্বন্ধে যে মতবাদ পোষণ করতেন, তাতে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধবাদ করেননি—যেমন "মানসিক অত্যাচারের" জন্য স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করতে চায়,—পরন্তু নেহরু তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনকেই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে নেহরুর সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্বন্ধ বন্ধুত্বের। তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা ও মনের দিক দিয়ে তিনি গ'ড়ে উঠেছিলেন তাঁদেরই আবহাওয়ায়। এ কথা তিনি তাঁর আত্মচরিতেও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যখনি তিনি ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে ছাড়িয়ে ইংলণ্ড ও সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়েছেন, তখনই সে বর্ণনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে গভীর নৈরাশ্যের। নেহরুর কথায়: "ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষ অধিকার করেছে অবৈধ বল প্রয়োগে। তারা ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের কথা জানে না—জানবার চেষ্টাও করেনি। তারা তার চোখের দিকে লক্ষ্য করেও দেখেনি। কারণ তাদের চোখে জেগেছে ঘৃণা, আর লজ্জা ও নিষ্পেষণে

অবনত হ'য়ে আছে ভারতবর্ষ। শতবর্ষের যোগাযোগ সত্ত্বেও তারা যেন একের কাছে অপরে অপরিচিত—ঘৃণার পাত্র।"

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নেহরু হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কংগ্রেসের দু'জন নেতা তাঁকে নিয়ে তাঁর অফিসে উধাও হ'য়ে গেলেন। স্থির করলাম, দুপুরে এলাহাবাদের দৃশ্য দেখে সময় কাটানো যাবে। কিন্তু সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রতাপে বাইরে বের হ'বার সাহস হ'লো না। বাড়ীতে অলসভাবে ব'সে রইলাম। 'মা'র মৃত্যুর পর গৃহের বন্ধন আমার কাছে শিথিল হ'য়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ গৃহের শান্তি ও আনন্দের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। গৃহের কল্পনা আমার একদিকে যেমনি এনে দিল আনন্দ, অপর দিকে তেমনি বিষণ্ণতা! এখানে একদিকে শিশুদের খেলা-ধুলা ও দুষ্টুমির বহর দেখছি, অপর দিকে বসে বসে সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে কথা বলার আনন্দ উপভোগ কচ্ছি। তাঁর সাহচর্য্য অপূর্ব আনন্দদায়ক। তীক্ষ্ণ কথা, গভীর জ্ঞান আর আন্তরিকতা তাঁর প্রতি কার্য্যে প্রতীয়মান। আমাদের ঘরের চতুর্দিকে ফ্রেম্ করা ফটোগুলো সাজানো, নেহরু পরিবার ও বন্ধুবর্গের। তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরুর রুগ্ন মুখখানি আমার নজরে পড়লো। ১৯৩৬ সালে সুইজারল্যাণ্ডে ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর (জহরলাল যাকে 'বাপুজী' বলে সম্বোধন করেন) প্রশান্ত মুখ দু'খানিও আমার নজর এড়ালো না।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস্ পণ্ডিত ও ইন্দিরার সঙ্গে বাড়ীর বাইরের পেছন দিকটায় গিয়ে বসলাম। আগামী কালের ভাবী বধূর কাছে একজন সওদাগর নিয়ে এলেন এক ঝুড়ি ভর্ত্তি কাঁচের ব্রেস্‌লেট, রামধনুর সমস্ত রঙ উজাড় করে ঝলক দিচ্ছে সেগুলো। ইন্দিরা সেগুলো থেকে তাঁর পছন্দ মতো ব্রেস্‌লেটগুলো বেছে নেবার আনন্দ উপভোগ কচ্ছিলেন। তাঁর শাড়ীর সঙ্গে যেগুলো মানানসই হবে, তেমনি সব ব্রেস্‌লেট তুলে নিচ্ছিলেন অতি সন্তর্পণে। ইন্দিরা বল্লেন: "কাঁচের ব'লে এগুলো সর্ব্বদাই ভাঙ্‌বে, কিন্তু এতই সুলভ যে, যে কেউ পুনরায় এগুলো অনায়াসে ক্রয় করতে পারে। দশটা কি বারোটা এক সঙ্গে পরতে বেশ আনন্দ হয়।"

নেহরু বন্দীশালা থেকে একবার তাঁর মেয়ের কাছে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে। তা' বস্তুতঃই অপূর্ব। পরে 'Glimpses of world History' নামে চিঠিগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর একাদশবর্ষীয়া প্রবাসী মেয়ের নিকট তিনি অপূর্ব কৌশল ও আকর্ষণীয় ক'রে—যিশুখ্রীষ্ট, কার্ল মার্কস্, আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট্, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, নেপোলিয়ন ও যোশেফাইন্ প্রভৃতির গল্প বর্ণনা করেছেন। তিনি ইন্দিরাকে স্বদেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাই শিখিয়েছেন। নেহরু ইন্দিরাকে রীতিমত দেশভক্ত ক'রে তুলেছেন।

চা পানের পর 'আনন্দভবনে' একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। নেহরু পরিবারের সকলে, শিশুরদল এবং খদ্দর পরিহিত প্রায় বারজন কংগ্রেস সভ্য—সকলে এসে মিলিত হ'লেন বৃত্তাকার একটি হল ঘরে। নেহেরুও বাদ পড়লেন না। ভাবলাম এঁদের ভেতর আবকার ব্যাপারে হয়তো কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈঠক বস্‌বে এবং আমি ও তাতে উপস্থিত থাকবো। কিন্তু সে সব কিছুই নয়। নেহরু আমার দিকে হঠাৎ ফিরে বল্লেন: "আমরা এখন পাঞ্জাব থেকে আগত জনৈক পাখীর শব্দ অনুকরণকারীর অনুকরণ নৈপুণ্য শুনতে যাচ্ছি, পৃথিবীর ভেতর তিনি নাকি এ বিষয়ে খ্যাতনামা অনুকরণকারীদেরই একজন।"

এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যে এলাহাবাদ কংগ্রেস হেড্‌কোয়ার্টারে একজন পাখীর শব্দ অনুকরণকারীর আবির্ভাব হ'তে পারে, এতে আমি বিস্মিত হ'য়ে গেলাম। নেহরু বল্লেন, এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটিকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর পরিবারবর্গের কাছে তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে। পাখীর শব্দ অনুকারণকারী পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি সে কথা বিস্মৃত হননি। তিনি সুদূর পাঞ্জাব থেকে 'আনন্দভবনে' এসে হাজির হ'য়েছেন।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি ঘরে এসে ঢুকতেই তাঁর আলোচনা আরম্ভ হ'লো নেহরুর সঙ্গে। নেহরু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কতক্ষণ লাগ্‌বে আপনার এ সব খেলা দেখাতে?" ভদ্রলোকটি প্রত্যুত্তরে বল্লেন: "চল্লিশ মিনিট।" নেহরু যেন নিরুৎসাহ হয়ে গেলেন! চল্লিশ মিনিট ধ'রে পাখীর ডাক শুনতে তিনি যেন প্রস্তুতই ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে বিদায় দিয়ে অসন্তুষ্ট ক'রে অফিসে যাবার ইচ্ছে ও নেহরুর মনে সাড়া দিল না। নেহরু হাবভাবে বুঝিয়ে দিলেন, প্রদর্শনীটি সংক্ষিপ্ত করা হোক। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি স্বাগত ভাবেই এর প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বল্লেন: "প্রদর্শনীটি চল্লিশ মিনিটের, এ থেকে একটুকু বাদ দিলেও সমস্ত প্রদর্শনীটিই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। অতএব এটি সংক্ষিপ্ত করা চল্‌বে না।" নেহরু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁর কথায় রাজী হলেন। একটু কৌতুকের সঙ্গে নেহরু বল্লেন, "আমি আর কি করতে পারি? যে ক'রেই হোক পাখীর ডাক শোনা যাক!" তিনি বিহ্বল হ'য়ে বসে পড়লেন। তাঁর মধুর ব্যবহারটুকুর জন্য নেহরুকে আমার খুব ভালো লাগলো। আমরাও আসন গ্রহণ করলাম।

পাঞ্জাবী কৃষকায় ভদ্রলোকটি তাঁর আঙুলের ভেতর দিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পাখীর দল যেন সুদূর বৃক্ষচূড়া ও আকাশ থেকে একে একে আবির্ভাব হ'তে লাগলো। খুব বড় পাখী থেকে আরম্ভ ক'রে নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পাখীর ডাক পর্য্যন্ত অনুকরণ করলেন তিনি। ভদ্রলোকটি অপূর্ব নৈপুণ্য দেখালেন, আমরা প্রশংসা না ক'রে পারলাম না। আমাদের প্রশংসার ফল খারাপই হ'লো। অনুকরণকারী ভদ্রলোকটি আমাদের প্রশংসা পেয়ে মোরগের ডাক আরম্ভ ক'রে দিলেন, পরে একে একে সমস্ত পশুর ডাকই আমাদের শোনাতে আরম্ভ করলেন, ঘোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে মায় মশা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ রইল না। এমন কি প্রথমে পুরুষ ও পরে মেয়ে মশার ডাকও তিনি আমাদের শোনালেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন চিড়িয়াখানার প্রশংসনীয় অনুকরণকারী, তা'তে সন্দেহ রইল না। পশুর চীৎকারে ঘরটি মুখরিত হ'য়ে উঠলো, ঘরের অপর পার্শ্বে নেহরু যেন অস্বস্তি বোধ কচ্ছিলেন, তাঁর মুখ

থেকে বিরক্তিকর ক্ষীণ শব্দ বের হ'য়ে আসছিলো। কিন্তু এতে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির মোটেই চেতনা হচ্ছিল না। ঠিক চল্লিশ মিনিট পর প্রদর্শনী শেষ হ'লো—৩৯ মিনিটেও নয়! স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নেহরু উঠে দাঁড়ালেন, তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। কংগ্রেস সভ্যদের সঙ্গে পুনরায় একত্রিত হ'য়ে তাঁদের সঙ্গে কাজ করার অভিপ্রায়ে নেহরু চ'লে গেলেন। পশুপাখীর শব্দ অনুকরণকারী পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি যে ষ্টাফোর্ড ক্রীপশের খুব সাহায্যে আসতে পারতেন, এ কথাই আমার মনে হ'লো। একটি মাত্র লোক বারো জন বিশিষ্ট কংগ্রেস সভ্যকে একটি ঘণ্টার জন্ত নির্বাক ও নিশ্চল ক'রে রাখলেন। তাঁদের কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি নিজের কথাই তাঁদের শুনিয়ে গেলেন।

সে রাত্রেই আহারের পর নেহরুর সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লাম। আলোচনায় এতোই মগ্ন হ'য়ে গিয়েছিলাম যে, সময়ের জ্ঞান আমাদের ছিলই না। বিশেষ ক'রে আমার। রাত্রি অনেক হ'য়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে অতিথিরা ও নেহরুর পরিবারবর্গ আমাদের কথায় ক্লান্ত হ'য়ে বস্‌বার ঘর থেকে একে একে বিদায় নিলেন—শয্যা গ্রহণের আগ্রহে। অনেক পরে আমাদের চেতনা হ'লো মশার দংশনের জালায়। আমরা আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হ'লাম। মশাগুলো বর্বরের মতো আমাদের নির্মমভাবে দংশন ক'রে যাচ্ছিল। আমরা হাত পা চুলকাচ্ছিলাম, কিন্তু তবুও আমাদের কথার যেন সমাপ্তিই ঘটছিলো না।

নেহরুর গল্প বলার ভঙ্গীটি খুব সুন্দর। এমন আকর্ষণীয় ক'রে গল্প বলেন যে, নিজেও বর্ণনা করতে করতে যেন অভিভূত হ'য়ে পড়েন। মাঝে মাঝে এক কথা বলতে গিয়ে অন্ত এক ঘটনায় চলে আসেন, ভুলে যান কি কথা উত্থাপন করেছিলেন তিনি। তারপর হেসে উঠে বলেন: "যাই হোক—" এবং পুনরায় তাঁর গল্প চল্‌তে থাকে। রোমান্টিক কিশোর ব'লে তাঁকে অনেকে আখ্যা দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁকে আই-ডিয়ালিষ্টদের শ্রেণীভুক্ত করাও অশোভন হ'বে না। নেহরুর কথায় আমার ফরাসীর প্রাক্তন মন্ত্রী Leox Blum এর কথাই স্মরণ হয়।

নেহরুর চিন্তাধারার সঙ্গে অন্তান্ত কংগ্রেস নেতৃবর্গের চিন্তাধারার পার্থক্য হ'চ্ছে, বিশেষ ক'রে মিঃ গান্ধীর সঙ্গে, এইটুকু—নেহরু বিশ্বাস করেন—ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে পৃথিবীর অগ্রগতির সংযোগ। দেশভক্ত নেহরু সংগ্রাম ক'রে চলেছেন—স্বদেশের মুক্তি কামনায়। বস্তুতঃ নেহরু কোনো একটি বিশেষ দাবীর সংগ্রামেই লিপ্ত ন'ন, পরন্তু বহু সমস্তার সমাধানেই জড়িত। প্রথমতঃ ভারতের মুক্তি কামনা, দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধবাদ, তৃতীয়তঃ ফ্যাসিষ্টবাদের বিরোধিতা এবং পরিশেষে মার্ক্সিষ্ট নীতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধান।

অন্তান্ত ভারতীয়দের মতো নেহরুও সঠিক ভাবে কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে পারেননি—যা'তে ক'রে মুসলমান, হিন্দু, শিখ ও হরিজন-দের মধ্যে মতান্তরকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। তিনি শুধু পুনরাবৃত্তি করলেন, যতোদিন ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ না করবে ও ডিভাইড এণ্ড রুল নীতি ত্যাগ না করবে—ততোদিন এ-সমস্তার সমাধান হওয়া অসম্ভব। তৃতীয় শক্তি হিসেবে যতোদিন ব্রিটেন ভারতে অবস্থান করবে ততোদিন হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে।

চীন ও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থার যে একটুকু ঐক্য আছে, নেহরু সে কথাটি বেশ ভালো ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। হাজার হাজার চীনবাসী যেমন তাদের শত্রুর বিপক্ষে শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মরক্ষার জন্ত—ভারতবর্ষও বিপদের মুখে এমনি সাহস ও ধৈর্য্য নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হ'বে প্রয়োজন হ'লে। তাঁর ঘরে বহু ইংরেজী পুস্তকের সঙ্গে সাজানো রয়েছে তাঁর প্রিয়দর্শিনী কন্তা ইন্দিরার, জেনেরালিসিমো, মাদাম চিয়াংকাইসেক এবং শনিয়াৎ সেনের বাঁধানো ফটোগ্রাফ। নেহরুর সঙ্গে যখন পরদিন দুপুরে বহু আলোচনা হচ্ছিল, নেহরু আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "মাদাম সানিয়াৎ সেন কেমন আছেন?" বললাম, "তিনি খুব দুঃখিনী।" নেহরুর মুখে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বল্লেন, "সত্যি, তিনি খুব দুঃখিনী।" মাদাম সানিয়াৎ সেনকে কতটা তিনি অনুভব করেন, এ থেকেই তা' পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌লো।—

প্রচুর উপহার বহন ক'রে এলাহাবাদ ও নেহরুর বাসভবন থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। জহরলাল তাঁর লেখা সমস্ত বইগুলোই আমাকে দিলেন। বিজয়লক্ষ্মী ও তাঁর রচিত পুস্তক আমায় উপহার দিলেন। সরোজিনী নাইডু আইভরির তৈরী সুন্দর ছোট একটি মূর্ত্তি আমার হাতে তুলে দিলেন।

দিল্লী-গামী ট্রেণখানির উত্তপ্ত কামরায় বসে আছি—ধুলায় ধুসর হ'য়ে উঠেছে আমার পরিচ্ছদ, আর ভাব্‌ছি জহরলালের কথা। এতো বড় হ'য়েও কেমন সরল ও অমায়িক তিনি, সবাই তাঁকে ভালোবাসে। এখনও আমি যেন চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছি, খদ্দরপরিহিত জহরলাল তাঁর গৃহে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছেন। প্রায়ই তাঁকে নগ্ন পদে দেখা যেতো। তাঁর পায়ের শব্দ কারো শ্রবণগোচর হ'তো না। আমি তাঁকে দেখার পূর্বে—দেখতে পেতাম তাঁর ছায়াটিকে বারান্দায় প্রতি-ফলিত হ'তে, আর শুন্‌তে পেতাম তাঁর যুবকসুলভ হাস্ত কলরব।

নেহরুর মতো অপূর্ব গুণসম্পন্ন মানুষটিকে কি ক'রে আটটি বছর কারাগারে বন্দী ক'রে রাখলো—তা' ভাব্‌বার বিষয়। কে সে জেলার—যে জহরলালকে বন্দীশালায় বন্দী ক'রে তাতে তালা লাগাতেও কুণ্ঠা বোধ করে না? সে চাবি আমি ঘুরাতে পারতাম না! জহরলালের মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে জেলে আট্‌কে রাখা যায় না। তাঁরা যে চির মুক্ত, কোনো বন্ধনই তাঁদের বাঁধতে পারে না। নেহরুর সঙ্গে ভারতবর্ষ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। নেহরুকে দেখেছি আমি, তাঁকে দেখে—ভারতবর্ষের সঙ্গেও যেন কিছুটা পরিচয় আমার হ'য়ে গেছে।

দু'টো চোখ

শ্রীযামিনীমোহন কর

প্রদীপের স্তিমিত আলোকে দু'টো চোখ যেন জলছে। সর্পের চেয়ে ক্রূর, ব্যাঘ্রের চেয়ে হিংস্র।

সাধুচরণ বসে আছে, একলা বসে ভাবছে। যতই ভাবছে ততই তার চোখের মধ্যে দানবতা ফুটে উঠছে।

কাল ভোরে তাকে এই কুটীর ছেড়ে চলে যেতে হবে। জমীজমা ছেড়ে। খাজনা দিতে পারে নি অনেকদিন থেকে। বছর চারেক তো বটেই। বৃদ্ধ জমীদার দয়াপরবশ হয়ে কিছু বলেন নি। বলেছিলেন—'আহা, বহুদিনের পুরোনো প্রজা। চিরকাল ঠিকমত খাজনা দিয়ে এসেছে। এখন নেই, দিতে পারছে না। হলে নিশ্চয়ই দিয়ে দেবে।'

বছর দুই হ'ল তিনি মারা গেছেন। তাঁর ছেলে এখন জমীদার। সহরেই থাকেন বেশীর ভাগ সময়। যখন আসেন সঙ্গে আসে অনেক লটবহর। ডজনখানেক মোসাহেব, গুটি তিনেক অপ্সরা, আর গোটা ত্রিশেক কাঠের বাক্স। দিন পনেরো, বড় জোর হপ্তা তিনেক থাকেন, আদায়ের সময়। তারপর আবার সহরে ফিরে যান।

তিনিও দু'বছর খাজনা না দিতে পারার জন্য সাধুকে কিছু বলেন নি। বলবার মধ্যে বলেছিলেন—'সুবিধামত দিও হে। আমারও আজকাল বড্ড টানাটানি।'

সুতরাং আজকের উচ্ছেদের কারণ খাজনা না দিতে পারা নয়। যদিও ঐটাই কারণ হিসেবে দেখান হয়েছে, আসল কারণ কিন্তু অন্য। ভাবতে ভাবতে সাধুর চোখ দু'টো দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বার হতে লাগল।

বৃদ্ধ সাধুচরণ। ছোকরা জমীদার। একজন অর্থের অভাবে, অনাহারে মৃতপ্রায়। তবু এখনও পেশীর যা জোর আছে অনেক যুবককে কাহিল করে দিতে পারে। আর একজন অর্থের প্রাচুর্য্যে, অত্যধিক আহারে ও বিহারে মৃতপ্রায়। জোয়ান বয়সে শিথিল পেশী। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও যেন কষ্ট হয়।

পূর্ব্বতন জমীদারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল সাধুচরণ। বয়সকালে নামকরা লাঠিয়াল ছিল। পূজোর সময় বিভিন্ন গ্রামের লাঠিয়ালরা আসত, লাঠি খেলা দেখাবার জন্য। সাধুর সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। জমীদার কতদিন তাকে নিজের কাছারীতে চাকরী দিতে চেয়েছেন, কিন্তু স্বাধীন প্রকৃতি সাধুচরণ কিছুতে রাজী হয়নি। বলেছে—'হুজুর, আপনাদের খেয়েই তো আছি। যখন প্রয়োজন হবে, হুকুম করবেন। স্নেহে, সম্মানে তার দিন কেটেছে। আর আজ এই অপমান। ভাবতে ভাবতে সাধুচরণের দেহের পেশীগুলো যুবকের মত শক্ত হয়ে ফুলে উঠল। হাতের কাছে সেই পুরোনো দিনের লাঠিটা ছিল। শক্ত করে চেপে ধরল।

দিন কয়েক আগে সাধুচরণের নাতনী রাধা এসেছিল দাদুর কাছে বেড়াতে। নাতজামাই এসে দিয়ে গিছল। দুপুরে ঘাটে স্নান করতে গিছল। ওপারে জমীদার স-পরিষদ মাছ ধরতে বসেছিলেন। সকাল থেকেই বসে থাকেন। রোজই। সঙ্গে দূরবীণের মত কি একটা থাকে। রাধা অত লক্ষ্য করে নি। তাঁরা ছিলেন একটা গাছের আড়ালে। জল থেকে ওঠবার সময় নজর পড়ল। তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন। জমীদার চোখে দূরবীণ দিয়ে দেখছেন। তাড়াতাড়ি রাধা বাড়ী ফিরে এল।

সেইদিনই সন্ধ্যায় জমীদারবাবুর পায়ের ধুলো পড়ল সাধুচরণের ভাঙ্গা কুঁড়েতে। কি আদর আপ্যায়ন। রাধার জন্য জমকালো শাড়ী এনেছিলেন। তারপর—

সাধু আর ভাবতে পারছে না। চোখের সামনে নাতনীর হাত ধরলে। জমীদার দেবতার তুল্য। নিজে হাতে যত্ন করে কাপড় দিতে এসেছেন। পূর্ব্বতন জমীদার নিজে হাতে পূজোর সময় সাধুচরণের স্ত্রীকে শাড়ী দিয়েছিলেন সেবার, যখন সাধু সকল লাঠিয়ালকে হারিয়ে জমীদারের মুখোজ্জ্বল করেছিল। 'মা' বলে সম্বোধন করে বৃদ্ধ সাধুর কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই না করলে। আর তার ছেলের এই ব্যবহার। ছিঃ ছিঃ—

জমীদারকে সেদিন ঘাড় ধরে সাধু বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিল। টুটি যে টিপে ধরেনি এই ভাগ্য। রাধার ভয়ার্ত্ত চীৎকার এখনও সাধুর কানে বাজছে। সেই রাত্রেই সে রাধাকে স্বামীর ঘরে পৌছে দিয়ে এসেছে।

জমীদার সে অপমান ভোলেন নি। অবশ্য রাধার গায়ে হাত দেবার কথা অথবা নিজের ঘাড় ধাক্কা খাবার কথা কোনটাই তিনি কাউকে বলেন নি। কিন্তু সেই অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন সাধুকে পৈত্রিক ভিটে থেকে উৎখাত করবার নোটিশ দিয়ে। বাড়ীর জিনিষ-পত্তর কিছুই নিয়ে যেতে পারে না। অবশ্য কিই বা তার আছে। চার বছরের অজন্মা, আর হাঙ্গামাতেই সব গেছে। তবু—

আজ রাত্রেই সাধুচরণ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু যাবার আগে জমীদারকে সে শিক্ষা দিয়ে যাবে। সন্ধ্যার পর ইয়ার-মোসাহেব আর সহর থেকে আনা মেয়েমানুষ নিয়ে বাগান বাড়ীতে রাত্রি কাটান। সঙ্গে লাল পানিও চ'লে প্রচুর পরিমাণে। কারো বাগানে যাওয়া বারণ। আজ রাত্রেই দেয়াল টপকে প্রমোদ-ভবনে গিয়ে—লাঠি ধরবে সে—এখনও সে ভোলে নি সেই অপমান।

আর একটু রাত হোক। সাধুচরণ বসে আছে বিশ্ব সুষুপ্তিতে নিমগ্ন হবার অপেক্ষায়। তারপর প্রতিশোধ। বাড়ীর মেয়েছেলের অঙ্গস্পর্শ করবার শিক্ষা। ভাবতে ভাবতে কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠছে।

দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে আছে সাধুচরণ। ক্রমাগত উসখুস করছে। হঠাৎ কড়িকাঠের কাছে টিকটিকির টিকটিক ধ্বনিতে সে ওপর দিকে চাইল। সেইখানেই দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়ে রয়ে গেল। দেয়ালে ঐ জায়গাটায় ছিল চৈতন্যদেবের ছবি। চারিদিকে ধুলো পড়েছে, কিন্তু যেখানে কাঠের ছবিটা ছিল সেটা রয়েছে পরিষ্কার, সাদা। মনে হচ্ছে যেন শুভ্র বেশ পরিহিত চৈতন্যদেব দাঁড়িয়ে। প্রেমোন্মত্তভাবে গদগদ। মাথার ওপর দু'হাত তুলে নৃত্য করছেন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে রইল সাধুচরণ।

সাধুচরণ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে—কি হবে প্রতিশোধে। যে নিষ্ঠুর হয়ে আঘাত করেছে তাকে প্রেম দিয়ে মধুর করে তোল।

চমকে উঠলো সাধুচরণ। তাই তো, একি করতে যাচ্ছে সে। চৈতন্যদেবের ভক্ত বলে নিজেকে, আর তারই এই মনোভাব। যার বাপ আদরে স্নেহে তাকে মানুষ করেছিল, তারই ছেলের ওপর সে আঘাত হানবে নিষ্ঠুর ভাবে। কেন? কি প্রয়োজন? অপমানই যদি সহ্য না করতে পারলে তাহলে বৈষ্ণবভাব কোথায়? সব বিলিয়ে দিয়ে সর্ব্বত্যাগী হবার এমন সুযোগ আর কবে পাবে? সখ করে ছাড়া যায় না, ভগবান দয়া করে সব ছাড়িয়েছেন।

ভাবতে ভাবতে সাধুচরণ বিমুগ্ধ হয়ে গেল।

প্রদীপের স্তিমিত আলোকে দু'টো চোখ যেন হাসছে। সরোবরের মত নির্ম্মল, মায়ের চোখের মত কোমল।

সাধুচরণ বসে আছে। একলা বসে আছে। যতই ভাবছে ততই তার চোখের মধ্যে মানবতা ফুটে উঠছে।

* * *

পরদিন সকালে পেয়াদারা এসে দেখলে বাড়ী খালি। সাধুচরণ নেই, চলে গেছে। জমীদার সব শুনে বললেন—'গেছে, ভালই হয়েছে। বেটা ভয়ানক বজ্জাত ছিল। বাবাকে ঠকিয়েছিল, আমাকেও ঠকাবার চেষ্টায় ছিল।'

রাম-রাম সংঘর্ষ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

তুলনামূলক পাঠ

দাশরথী রাম ও ভৃগুপতি রাম

চারি কবি ইহাদের বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতের দুই কবি—বাল্মিকী ও কালিদাস; পরাধীন ভারতের দুই কবি—তুলসী দাস ও কৃত্তিবাস। আদি কবির বর্ণনা (অনুবাদে)—

সীতা স্বয়ংবরের পর রাজা দশরথ সপুত্র, সবধূগণ ও সৈন্য পরিবৃত হইয়া বনপথে চলিয়াছেন। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সঙ্গে।

এমন সময় বনের মধ্যে তুমুল কোলাহল হইল। পাখী সকল চীৎকার করিতে লাগিল। মৃগগণ রাজাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পলাইতে লাগিল। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া দশরথ ভীত হইলেন। শকুনশাস্ত্রবিৎ ঋষি বশিষ্ঠকে ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, পাখীদের কলরব ভয় সূচনা করিতেছে, কিন্তু মৃগদিগের প্রদক্ষিণ প্রণালী শুভ সূচকই বটে। অতএব ভয়ের কোনও কারণ নাই।

পরশুরাম আসিতেছেন।

প্রচণ্ড বায়ু বহিল। মেদিনী কম্পিত হইল। মহাদ্রুম সকল উৎপাটিত হইতে লাগিল। অন্ধকারে সূর্য্য আবৃত হইল। লোকে দিক বিদিক জানিতে পারিল না। সৈন্যসকল ভস্মাবৃত হইয়া বিমূঢ়ের স্তায় রহিল। কেবল বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও সপুত্র রাজা সচেতন রহিলেন।

তাহারা সম্মুখে দেখিলেন জামদগ্ন ভার্গব। বাল্মিকী রামায়ণে ভার্গবের এই বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভীম মূর্ত্তি, জটামণ্ডলধারী রাজ-বিমর্দ্দন, কৈলাসের মত দুর্দ্ধর্ষ, কালাগ্নি সদৃশ দুঃসহ, তেজ দ্বারা জলন্ত সদৃশ, সাধারণ লোকের দ্বারা দুর্নিরিক্ষ। স্কন্ধে তাহার পরশু ও বিদ্যুৎগণোপমধনু। হস্তে বাণ গ্রহণ করিয়া তিনি ত্রিপুরারি শিবের মত শোভমান।

বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ তাহাকে সম্যক পূজা সহকারে গ্রহণ করিলেন।

বাল্মিকীর (কালিদাসেরও) রাম, পরশুরাম উভয়েই মহাবীর চিত্র। উহাদের কথাবার্ত্তা ও আচরণে কোথাও নীচতা বা দাম্ভিকতা বা হ্যাবলামি নাই। বাল্মিকীতে ভার্গবের মাতৃহত্যার কোনও উল্লেখ নাই। ক্ষত্রিয় নিধনের কথা আছে কিন্তু শিশু ক্ষত্রিয় নিধনের কথা নাই। বরং তিনি রামের সহ যে ব্যবহার করিলেন তাহাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি সমবল ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের সহ যুদ্ধ করিতেন না।

ঋষিদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া ভার্গব রামকে যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে কোনও রূপ গালাগালি বা আস্ফালন নাই। জামদগ্ন বলিলেন, হে বীর দাশরথি রাম—তোমার অদ্ভুত বীরত্বের কথা শুনিয়াছি, এই অচিন্ত্য ও অপূর্ব্ব ধনুর্ভঙ্গের বিবরণ শুনিয়া আমি অপর ধনু লইয়া আসিয়াছি। ক্ষত্র ধর্ম্ম পুরস্কার করিয়া এই ধনুগ্রহণ কর ও উহাতে শর যোজনা কর। যদি এই কার্য্যে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমাকে আমার সমতুল্য বীর বলিয়া ঠিক করিব এবং তোমাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দিব।

রাম পিতার জন্য যন্ত্রিতকথ হইয়া বলিলেন—আপনি আমাকে বীর্য্য-হীন, ক্ষত্রকর্ম্মে অসক্ত ভাবিতেছেন, এক্ষণে আমার পরাক্রম দেখুন। এই বলিয়া রাম ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ ধনু ও শায়ক গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, আপনি ব্রাহ্মণ, বিশেষত বিশ্বামিত্রের আত্মীয় বলিয়া পূজ্য—আপনার প্রতি এই প্রাণহর শর নিক্ষেপ করিতে পারি না। কিন্তু এই বৈষ্ণবশর অব্যর্থ ফল, অতএব আমি ইচ্ছা করিতেছি, হয় আপনার গতিশক্তি নয় আপনার তপস্যার দ্বারা অর্জিত লোক সকল নাশ করি।

রামের এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া জামদগ্ন গতবীর্য্য হইয়া জড়ীভূত হইলেন। রামকে দেখিতে দেখিতে, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি পৃথিবী জয় করিয়া গুরু কাশ্যপকে দান করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে আদেশ দিয়াছিলেন, আমার অধিকারে বাস করিতে পারিবে না। সেই অবধি আমি পৃথিবীতে নিশাযাপন করি না। তুমি আমার তপস্যাদ্বারা অর্জিত অপ্রতিম লোক সকল নাশ কর ; আমি মনের মত বেগবান গতি-শক্তি দ্বারা মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিব।

ভার্গব আরও বলিলেন

> অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্।
> ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ ॥
> ন চেয়ং মম কাকুৎস্থ ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি।
> ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃত ॥

তোমার ধনুগ্রহণ হইতে আমি বুঝিতেছি তুমি অক্ষয়, মধুদৈত্যহন্তা, সুরেশ্বর। তোমার মঙ্গল হউক। ত্রৈলোক্যনাথ তোমার দ্বারা পরাভূত হওয়ায় আমার কোনও লজ্জা নাই। তুমি শর নিক্ষেপ কর, আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করি। ভৃগুপতির কথামত রাম শর নিক্ষেপ করিলেন। ভার্গবের তপস্যার্জিত লোক সকল বিনষ্ট হইল। তিনি রাম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া এবং নিজে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

কালিদাসেরও বর্ণনায় দুই রামই বাল্মিকীর মত বীরভাবে বর্ণিত। উভয়েরই গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব অতুলনীয়। তবে আমাদের বর্ত্তমান কালের রুচির নিকট কালিদাসের ভাষা অপূর্ব্ব।

পরশুরামের আগমন :—(কালিদাস হইতে রঘু বংশে) তেজসঃ সপদি রাশিরুত্থিত :

> প্রাদুরাস কিল বাহিনী মুখে।

সৈন্যগণের সমক্ষে যেন তেজের রাশি উত্থিত হইল। রাজবংশ নিধনে দীক্ষিত ভার্গবকে দেখিয়া এবং নিজের বালক পুত্রকে দেখিয়া রাজা দশরথ বিষন্ন হইলেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজা অর্ঘ দাও, অর্ঘ দাও বলিলেন। ভার্গব তাঁহাকে না দেখিয়াই ভরতাগ্রজের সমীপস্থ হইলেন।

> তেন কার্ম্মুক নিষক্ত মুষ্টিনা রাঘবো বিগতভীঃ পুরোগতঃ।
> অঙ্গুলী বিবরচারিণং শরং কুর্ব্বতা নিজগাদ যুযুৎসুনা ॥

বিগতভী রাঘব তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভার্গবেরমুষ্টিতে কার্ম্মুক, অঙ্গুলি বিবরে শর এবং তিনি যুদ্ধেচ্ছু। ভার্গব তাঁহাকে ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া শর আকর্ষণ করিতে বলিলেন। আর বলিলেন, যদি আমার পরশুর ধার দেখিয়া কাতর হও—তবে তোমার বৃথা জ্যা-নিঘাত কঠিন অঙ্গুলিগুলিকে যাচক্ষাঞ্জলিতে পরিণত কর।

> এবমুক্তবতি ভীমদর্শনে ভার্গবে স্মিতবিকম্পিতাধরঃ।
> তদ্ধনু গ্রহণমেব রাঘবঃ প্রত্যপদ্যত সমর্থমুত্তরম্ ॥

ভীমদর্শন ভার্গব এইরূপ বলিলে স্মিতবিকম্পিতাধর রাঘব ধনুগ্রহণ-রূপ উপযুক্ত উত্তর দিলেন।

> পূর্ব্বজন্মধনুষাসমাগতঃ সোঽতিমাত্র লঘুদর্শনোঽভবৎ।
> কেবলোঽপি সুভগো নবাম্বুদঃ কিংপুনস্ত্রিদশচাপলাঞ্ছিতঃ ॥

পূর্ব্ব জন্মের ধনুগ্রহণ করিয়া রাঘব অতিমাত্র প্রিয়দর্শন হইলেন। নবীনমেঘ নিজেই সুন্দর। তাহা যদি আবার ইন্দ্রধনু যুক্ত হয় তখন আরও সুন্দর হইয়া উঠে।

ভার্গব পরাজিত হইবার পর :—

> প্রত্যুবাচ তমৃষির্ন তত্ত্বতস্ত্বাং ন বেদ্মি পুরুষং পুরাণম্।
> গাংগতস্য তব ধাম বৈষ্ণবং কোপিতোহ্যসি ময়া দিদৃক্ষুণা ॥

তুমি যে পুরাণ পুরুষ তাহা জানিনা এমন নহে। পৃথিবীতে আগত

তোমার বৈষ্ণব তেজ দেখিবার জন্ত আমি তোমাকে কোপিত করিয়াছি।

ভস্মসাৎকৃতবতঃ পিতৃদ্বিষঃ পাত্রসাৎ বসুধাং সসাগরাং।
আহিত জয়বিপর্য্যয়োঽপি মে শ্লাঘ্য এব পরমেষ্ঠিনা ত্বয়া॥

আমি পিতৃ শত্রুগণকে ভস্মসাৎ করিয়াছি। সসাগরা বসুধাকে পাত্রসাৎ করিয়াছি। পরমেষ্ঠি তোমার দ্বারা আমার জয়ের বিপর্য্যয় ঘটিল তাহা শ্লাঘ্যই।

তদ্‌গতিং মতিমতাং বরেপ্সিতাং পুণ্যতীর্থগমনায় রক্ষ মে।
পীড়য়িষ্যতি ন মাং খিলী কৃতা স্বর্গপদ্ধতিরভোগলোলুপম্‌॥

হে মতিমানদিগের শ্রেষ্ঠ আমার পুণ্যতীর্থ গমনের গতি রক্ষা কর। ভোগলালসাহীন আমাকে স্বর্গপথ নষ্ট হওয়ায় কষ্ট দিতেছেন।

কালিদাস প্রধানত বাল্মিকীরই অনুসরণ করিয়াছেন। তুলসীদাস তা করেন নাই। তাঁহার বর্ণনায় ভার্গবের আবির্ভাব হরধনুভঙ্গর অব্যবহিত পরেই—জনকের সভায়। তুলসীদাস পরাধীন ভারতের লোক। তাহার সমীপে বীরত্বের আদর্শ মূর্ত্ত ছিল না। তাহার শ্রোতৃবৃন্দের ও সেই অবস্থা। তাহারা আস্ফালন, গালাগালি, চীৎকার, দর্পসহ কথাবার্ত্তাকেই বীরত্ব ভাবিত। তাই তুলসীদাসের বর্ণনায় এইসকল প্রচুর পরিমাণে আছে। বাল্মিকী ও কালিদাসের ভার্গব ব্যাপারে লক্ষ্মণের কোনও পাঠ নাই। তুলসীদাস ভার্গব-লক্ষ্মণের যে সুদীর্ঘ বাক্‌যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর গালাগালি, রাগারাগি, দর্প ও দম্ভ আছে। বর্ত্তমানকালের রুচি অনুসারে ইহা প্রহসনের মত হইয়াছে।

তুলসীদাস হইতে কিছু উদ্ধার :—

তেহি অবসর শুনি শিবধনু ভঙ্গা।
আয়ে ভৃগুকুল কমল পতঙ্গা॥

সেই অবসরে শিবধনু ভঙ্গ শুনিয়া ভৃগুকুলকমল সূর্য্য (পরশুরাম) আসিলেন।

সন্তবেশ করণী কঠিন, বরণি ন যায় স্বরূপ।
ধরি মুনিতনু জনু বীর রস আয়উ জহঁ সব ভূপ॥

তাহার সাধুর বেশ কিন্ত কার্য্য কঠোর। তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। যেখানে ভূপ সকল ছিল সেখানে যেন মুনি তনু ধরিয়া বীর রস আসিলেন।

দেখত ভৃগুপতি বেষ করালা।
উঠে সকল ভয় বিকল ভূয়ালা॥
পিতু সমেত কহি কহি নিজ নিজ নামা।
লগে করণ সব দণ্ড প্রণামা॥

করাল বেশধারী ভৃগুপতিকে দেখিয়া ভূপাল সকল উঠিয়া পড়িল। পিতৃনাম সহ নিজ নিজ নাম করিয়া সকলে দণ্ডবত প্রণাম করিতে লাগিল।

তুলসীদাসের পরশুরাম বাল্মিকীর ভার্গবের মত গম্ভীর স্বভাব নহেন। ইনি কথায় কথায় রাগিয়া উঠেন এবং লোককে দুর্ব্বাক্য বলেন।

জনকের নিকট হইতে চাপভঙ্গ ব্যাপার শুনিয়া তাহাকে বলিতেছেন—

কহ জড় জনক ধনুষ কে হি তোড়া।
বেগি দেখাও মূঢ় তনু আজু॥
উলটৌ মহি জহঁ লগি তব রাজু।

হে মূর্খ জনক ধনু কে ভাঙ্গিল বল। শীঘ্র তাকে দেখাও, নহিলে তোমার সমস্ত রাজ্য উলটিয়া দিব।

এইবার লক্ষ্মণ আসিয়া মুনিকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

বিহসি লখণ বোলে মৃদু বাণী।
অহো মুনীশ মহা ভটমানী॥
পুনি পুনি মোহিং দেখাও কুঠারা।
চহত উড়াবন ফুঁকি পহারা॥

লক্ষ্মণ হাসিয়া মৃদু বাণী বলিলেন। আহা মুনি, তুমি মহা অভিমানী যোদ্ধা। তুমি আমাকে বার বার কুঠার দেখাইতেছ। তুমি ফুঁ দিয়া পাহাড় উড়াইতে চাহ।

লক্ষ্মণ ও ভার্গবের এই বাক যুদ্ধ খানিকক্ষণ চলিবার পর রাম মুনিকে মিষ্ট কথা বলিলেন। এ রামও বাল্মিকীর রাম নহেন; ইনি অতি বিনয়ী।

রাম বচনগুলি কছুক জুড়ানে।
কহি কছু লখণ বহুরি মুসকানে॥
ইসত দেখি নখ শিখ রিসি ব্যাপী।
রাম তোর ভ্রাতা বড় পাপী॥

রামের বচন শুনিয়া মুনি কিছু শান্ত হইলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণকে কিছু ঠাট্টা করিয়া হাসিতে দেখিয়া তাহার নখ-শিখাব্যাপী রাগ হইল। বলিলেন রাম তোর ভ্রাতা বড় পাপী।

লক্ষ্মণ যখন মুনিকে খুব রাগান্বিত করিয়াছেন তখন—

অতি বিনীত মৃদু শীতল বাণী।
বোলে রাম জোড়ি যুগ পাণি॥

রাম দুই হস্ত জুড়িয়া অতি মৃদু বাণী বলিলেন। বাল্মিকী বা কালিদাসের রাম এত মৃদু নহেন।

রাম বলিলেন—

কৃপা কোপ বধ বন্ধ গুনাই।
মোপর করিয় দাস কি নাই॥

দাসের পর লোকে যেরূপ করে সেইরূপ আমার প্রতি কৃপা, কোপ, বধ ও বন্ধ দণ্ড বিধান কর।

স্বাধীন ভারতের ও পরাধীন ভারতের কবিদের রামের বর্ণনায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখান হইল।

তুলসীদাস ভক্ত কবি। যেখানে ভক্তির কথা আছে সেখানে তাহার ভাষা প্রাণস্পর্শী।

পরাভূত ভৃগুপতি রামচন্দ্রের স্তব করিলেন :—

জয় জয় রঘুবংশ কমল বন ভানু।
গহন দনুজ কুল গহন কৃশানু॥
জয় সুর বিপ্র ধেনুহিতকারী।
জয় মদ মোহ কোহ ভ্রমহারী॥

জয় রঘুবংশকমল বনভানু। ঘন দনুজ কুলরূপ বনের অগ্নি স্বরূপ যিনি তাহার জয় হউক। জয় জয় বিপ্র ধেনু হিতকারী। জয় মদ মোহ, ক্রোধ, ভ্রম হারী।

কৃত্তিবাসের বর্ণনা অনেকটা বাল্মিকীর অনুগামী। কিন্তু তাহার রাম পরশুরাম প্রভৃতি পরাধীন দেশের কবির বর্ণনার অনুরূপ। কবিত্বে এবং ভক্তিরসের বিকাশে কৃত্তিবাস তুলসীদাসের নীচে।

কৃত্তিবাস হইতে কিছু উদ্ধার :—

পরশুরামের আবির্ভাব—

হেন কালে জামদগ্ন হাতেতে কুঠার।
রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার॥

ভার্গব দর্শনে দশরথের অবস্থা :—

মহা ভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির।
দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর॥
এক হাতে ধরি রামে অপরে লক্ষ্মণে।
মুনির চরণে রাজা দিল সেই ক্ষণে॥

পরশু রামের রাগ :—

মহাক্রোধে জ্বলিয়া বলেন ভৃগুরাম।
মম সম করি রাখিয়াছ পুত্র নাম॥
বলেন পরশুরাম আরক্ত নয়ন।
তুচ্ছ জ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥

লক্ষ্মণের আস্ফালন :—

রুষিয়া কহেন শক্ত সুমিত্রা কুমার।
কথায় কি ফল কর বীরের আচার॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ তুমি করেছ যখন।
তখন না জন্মে ছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

কৃত্তিবাস এই দুর্যোগে একটু হাস্যরস অবতারণা করিয়াছেন।

পরশুরাম রামের হস্তে ধনু দিবার পর :—

জানকী ভাবেন নম্র করিয়া বদন।
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ॥
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ।
আর বার ধনুক আনেন ভৃগু মুনি॥
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী॥

পাকিস্থানে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

১

এ কি চণ্ডীর সাজে মা, আজিকে
সেজেছ জন্মভূমি!
বিদায় দিয়েছ তাদিগে যাহারা
ছিল তব পদ চুমি'?
আহা ফাটে বুক—কোথা নাহি কেহ,
হাহা করে যত জনহীন গেহ,
ধূধূ শ্মশানের মাঝে জাগো শুধু
করালীর বেশে তুমি!

২

মন্দিরে হেথা বাজেনাকো শাঁখ
কাঁসরের রোল সনে,
স্তব্ধ পল্লী যাপিছে প্রহর
কি যেন দুঃস্বপনে!
কোথা নাহি আর শুনিবারে পাই
কীর্তন সেই মনোহরসাই,
ভাগবত-পাঠ করে না কথক
আজি পূজাপ্রাঙ্গণে!

৩

কোথা গেল সেই সবহারাদল
শান্ত সরল প্রাণ?—
গোহালে যাদের ছিল ধেনুদল
আর গোলাভরা ধান!
দিয়েছ তাড়ায়ে কোল থেকে হায়,
তিতি' আঁখিনীরে তারা চ'লে যায়,
তাদের বেদনঘন মসীলেপে
আজি শারদীয়া ম্লান!

৪

অয়ি রাক্ষসী, একবার মনে
জাগে না তাদের কথা?—
তব শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে যারা—
আনিয়াছে স্বাধীনতা!
ছাড়ি' দারাসুত সংসার-সুখ—
মৃত্যুর আগে পেতে দিল বুক—
কোথায় তাহারা? আজিকে তাদের
কে বুঝিবে আকুলতা!

শিলালিপি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আবার বিষণ্ণ আর বিতৃষ্ণ হয়ে গেছে রঞ্জুর মন।

বিশু নন্দীর দল মার খেয়েছে, মেরেছেও ওদের। একটা শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেল। কিন্তু কেন এই মারামারি? কেন এই নিজেদের মধ্যে এমন অশোভন বিরোধ? সবাই তো দেশকর্মী, সবাই তো দেশের জন্যে প্রাণ দিতেই এগিয়ে এসেছে। লক্ষ্য এক, পথও এক। তবু এই বিভেদ কেন? কর্মী হিসেবে বিশু নন্দী কোনোদিক থেকেই রোহিনীর চাইতে খাটো নয়, বরং অনেক বড়। অনুশীলন দলের আরো দু-চারজন যাদের সে চিনত, তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই তার শ্রদ্ধা আছে। সহরের বহু সেরা ছেলে ওদের দলে, রঞ্জুদের মতোই তারা খাঁটি আর অক্লান্ত কর্মী। তবু কেন এই অশোভন মারামারি? একই পরাধীন দেশের মানুষ, একই শোষণ যন্ত্রে শোষিত হচ্ছে সবাই, একই কাঁটামারা বুটের নীচে দলে যাচ্ছে সকলেরই হৃৎপিণ্ড। আর তার প্রতীকারের জন্যে একই পথ সকলে বেছে নিয়েছে। তবে?

প্রতি পদে পদে বিরোধ। সেই বইতে পড়া অদ্ভুত মানুষটিকে মনে পড়ে। জাতি বর্ণ অর্থ গৌরবহীন মানুষের রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্র কি গড়ে উঠেছিল এম্‌নি দলাদলি আর বিভেদের মধ্য দিয়েই? কে জানে!

বাড়ি ফেরবার পথে পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা ভাই, একি ভালো?

পরিমল জবাব দিলে, ভালো মন্দ জানি না, এই নিয়ম।

—নিয়ম! নিয়ম কেন?

—তা ছাড়া আর কী? আমরা ভালো ছেলে রিক্রুট করব, তাকে ওরা ভাঙিয়ে নেবে? আর আমরা সয়ে যাব সেটা?

—তাই বলে নিজেদের মধ্যে এভাবে মারামারি করতে হবে?

রঞ্জুর স্বরে বেদনা প্রকাশ পেল।

—মারামারি তো ভালো, খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায় কোথাও কোথাও।

—সর্বনাশ!—রঞ্জু শিউরে উঠল।

—কেন, ভয় করছে নাকি বিশু নন্দীকে?—পরিমল খোঁচা দিয়ে হাসল।

—না, বিশু নন্দীকে ভয় নয়—রঞ্জু গম্ভীর হয়ে গেল: নিজেদের সকলকেই ভয় হচ্ছে। এইভাবে মারামারি করতে থাকলে সব উৎসাহ যে এইখানেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধটা হবে কেমন করে?

—সে ভাবনা দাদারা ভাববেন, আমরা নই।

তা বটে, দাদারা ভাববেন। এতদিনে এ সত্যটা অন্তত রঞ্জু আবিষ্কার করেছে যে তাদের ভাববার জন্যে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই আর—সে দায়িত্ব দাদারাই মাথায় তুলে নিয়েছেন। তারা শুধুই সৈনিক, ভাববার দায় তাদের নয়, তাদের কর্তব্য শুধু আদেশ পালন করে যাওয়া। চিঠি দিয়ে এসো, অমুকের সঙ্গে দেখা করে অমুক খবরটা দিয়ে এসো, সাইকেল চুরি করো, বন্দুক চুরি করো, আর এক আধটা বড় কাজ—যেমন হালদারের ওপরে এক হাত নেওয়া—এ জাতীয় সুযোগ কখনো কখনো যদি জুটে যায় তবে তার চাইতে সৌভাগ্যের কথা আর কিছুই নেই।

প্রশ্ন কোরো না, কৌতূহল পোষণ কোরো না মনের মধ্যে। শুধু মন্ত্রগুপ্তি, শুধু আচরণ ডিসিপ্লিন। কিন্তু তবুও প্রশ্ন আসে, নির্বোধ মন জর্জরিত হয় কৌতূহলের তাড়নায়। আর জেগে থাকে অস্বস্তি, অতি তীব্র অস্বস্তি। অস্বীকার করে লাভ নেই, খানিকটা আশাভঙ্গ হয়েছে রঞ্জুর। কল্পনা-প্রখর অনুভূতি-স্পন্দিত তার চেতনা; জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল দূরচারী রূপকথার জগতে বন্ধনবিহীন নিঃশঙ্ক যাত্রার স্বপ্নাতুর সম্ভাবনায়। এলেন অবিনাশবাবু, সেই স্বপ্নে এনে দিলেন আর এক অদেখা সমুদ্রের আলোড়ন। বকুল বনের গন্ধভরা ছায়ার নীচে ঘাসের ওপর বসে অশ্বিনী শুনিয়েছিল 'নিখিলিষ্ট,' আর ক্ষুদিরামের গল্প—সে তো আরো আশ্চর্য রূপকথা। তারপর এল তিরিশ সালের বন্যা। সেই বন্যায় মন ভেসে গেল—সেই বন্যা তাকে প্রথম ডাক দিলে সর্বনাশা ভাঙনের অভিসারে, সর্বধ্বংসী একটা বিপুল প্রবাহে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার দুরন্ত প্রেরণায়। আর সেই বন্যারই জীবন-রূপ সে দেখল উনিশ শো তিরিশ সালে। উনিশ শো তিরিশ সাল। অন্নপূর্ণা ভারতবর্ষ দেখা দিলেন রুধিরাপ্লুতা ছিন্নমস্তারূপিণী হয়ে।

এল পরিমল। শোনালো জ্যোতির্ময় আকাশ-গঙ্গার বাণী—যেখানে রিভলভারের মুখে ছুরির ফলার মতো ধারালো নীল আগুন, যেখানে রক্তের প্রবাহে শতদলের মতো ফুটে আছে শত শহীদের বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড, যেখানে বীরের কণ্ঠে বরণের মণি-মালিকার মতো ডাক পাঠাচ্ছে ফাঁসির রশি। সে কি উন্মাদনা, নিজের বুকের ভেতরে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো কী যেন ফেটে পড়তে চায়। টেগরা, বীরেন গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, —আরো, আরো অনেকে। কিন্তু—

কিন্তু কোথায় সে উত্তেজনা? কোথায় সে কাজের রক্তমাতাল পরিকল্পনা? শুধু কথা, শুধু সতর্কতা, শুধু দুটো একটা অস্ত্র আর কিছু অর্থ সংগ্রহের আকুলতা। অথচ কত কাজ যে চোখের সামনেই আছে। গুলি করা যায় ওই টিকটিকির সর্দার বুলডগ্‌ ধনেশ্বরটাকে, অনায়াসেই তাদের স্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের সময় শেষ করে দেওয়া

চলে জেলার শাদা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে। কিন্তু কিছুই হয় না। যথেষ্ট শক্তি আমাদের নেই, এভাবে আমরা নিজেদের ক্ষতি করতে পারি না। শুধু অতি ধীরে, অতি সাবধানে চলা।

চট্টগ্রাম?

ওদের কথা আলাদা। বেণুদা জবাব দিয়েছিলেন, একেবারেই আলাদা ব্যাপার ওদের। সব দলগুলোকে ওরা এক সঙ্গে মিলিয়ে অত বড় কাজে হাত দিতে পেরেছিল। তা ছাড়া সব বাছা বাছা নেতা ওদের—ওদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা হয় না।

কেন হয় না? ভাবতে চেষ্টা করল রঞ্জু। চট্টগ্রাম যদি মিলতে পেরেছিল, তা হলে আমরাই বা পারি না কেন? কোথায় আমাদের বাধে? অনুশীলনের ওরা তো দেশের শত্রু নয়।

না, তা নয়। ওরা ওরাই, 'আমরা আমরাই'—সংক্ষেপে রঞ্জুর কথার জবাব দিলে পরিমল।

—কিন্তু ওরা আমরা কি কখনো একসঙ্গে মিলতে পারব না?

—সে দাদারা বলতে পারবেন।

বাস্তবিক, যা দাদাদের বলা উচিত, তা আমাদের বলতে চেষ্টা করাটা অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মন খুশি হয় না, অনবরত খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে।

—আর এইভাবে মারামারি চালাতে হবে?

—হাঁ, দরকার হলে।

রঞ্জু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল: এ রকম করে চালালে দেশের স্বাধীনতা শুধু স্বপ্নই থাকবে। কোনোদিনই তা আসবে না—আসতে পারেও না।

—রঞ্জু!

রঞ্জু চমকে উঠল। তীব্র একটা দৃষ্টি পরিমল ফেলেছে তার মুখের ওপর।

থতমত লাগল: অ্যাঁ?

—আমাদের অধিকারের একটা সীমা আছে, তা ছাড়িয়ে যেয়োনা।

রঞ্জু চুপ করে রইল।

পরিমল কঠিনভাবে বললে, ওঁরা যা বলবেন আমরা তাই করব। সমালোচনার স্পর্ধা আমাদের মুখে শোভা পায় না। তা ছাড়া এ বিপ্লব-বাদের পথ, ছেলেখেলা নয়।

পরিমল আর কোনো কথা বললে না, রঞ্জুও না। বলবার কিছু নেই। কিন্তু সত্যিই কি নেই? আদেশ দাও নেতা, আমরা পালন করে যাব। তোমাদের হুকুমে মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তো সব সময়েই প্রস্তুত হয়ে আছি। তবু একটি মাত্র জিজ্ঞাসা: এই আত্ম-বিরোধ, এই দলাদলি—একি অনিবার্য?

নাঃ—আর পারা যায় না নিজেকে নিয়ে। বাড়িতে ফিরে রঞ্জু ভাবতে লাগল সত্যিই সে অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যায় মাঝে মাঝে। উত্তেজনার খানিকটা ভাবালুতা নিয়ে এ পথে চলা যাবে না, ভাবতে হবে অনেক, বিচার করতে হবে তার চাইতেও অনেক বেশি। ইচ্ছে হলেই তো চারদিকে বিপ্লবের খানিকটা দাবানল জ্বালিয়ে দেওয়া যায় না। তার জন্যে অস্ত্র চাই, চাই প্রস্তুতি।

নিশ্চয় করুণাদির প্রভাব। করুণাদি সম্পর্কে তার মনে যে স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে এ সব তারি প্রতিক্রিয়া। সন্ধ্যার একটা অপরূপ অন্ধকারে, টোটা চুরি করার উত্তেজনায় বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ স্নায়ুতে তাঁর চোখে সে জল দেখেছিল। আভাস পেয়েছিল তাঁর ব্যক্তি জীবনের অতি গভীর একটা দুর্বোধ্য বেদনার সন্ধান, শুনেছিল তাঁর অশ্রুভরা আকুতি: এ পথ তোমার নয় ভাই—এ তুমি ছেড়ে দাও—

চুলোয় যাক—চুলোয় যাক সমস্ত। অগ্নিদীক্ষা যে নিয়েছে তার আর ফেরবার পথ নেই। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি। নেতার আদেশ। মুক্তি না পাও, মৃত্যুকে বরণ করে নাও।

প্রশ্ন নয়, সংশয়ও না।

করুণাদি? তাঁর স্নেহ?

নিজের মনের জন্যেই তোলা থাক—বিপ্লবী রঞ্জনের জন্যে নয়।

এরই দিন তিনেক বাদে বেণুদা ডেকে পাঠালেন।

—শোনো, একটা জরুরি কাজ করতে হবে তোমাকে।

রঞ্জু আগ্রহ-ব্যাকুল মুখে তাকিয়ে রইল। কাজ করতে হবে। একটা কঠিন, দুরূহ, রোমাঞ্চকর কাজ? রক্ত দিয়ে যা চিহ্নিত, জীবনের মূল্য দিয়ে যা সমাপ্ত করা চলে? সমস্ত প্রাণ যেন দোলা খেয়ে উঠল। এই ছোট ছোট কাজের খুঁটিনাটি নয়, যার ভেতর দিয়ে আত্ম-ঘোষণা আর আত্মপ্রতিষ্ঠা করা চলে—দু-হাত ভরে দাও সেই কাজের গৌরবে।

—পারবে কিনা বুঝতে পারছি না।—বেণুদা চিন্তিত আর শান্ত জিজ্ঞাসায় ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—পারব, নিশ্চয়ই পারব।

—বেশ, ভালো কথা। একদিনের জন্যে তোমাকে বাইরে যেতে হবে একটু। বাড়ি থেকে যেতে দেবে?

— তা দেবে।—বিষণ্ণভাবে রঞ্জু হাসল। মা নেই, ঠাকুরমার অবস্থা প্রায় অপ্রকৃতিস্থ; বাবা যেন দিনের পর দিন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে যাচ্ছেন। বেদনা-ভরা বন্ধন-মুক্তি ঘটে গেছে তার।

—তা হলে আজ সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে একবার রংপুর যেতে হবে তোমাকে। ষ্টেশনে একটি মেয়ে আসবে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, নামিয়ে দেবে রংপুর ষ্টেশনে। আর কিছুই করতে হবেনা। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করবে, তারপর যে ফেরার ট্রেন পাবে তাইতে করে চলে আসবে।

—শুধু এই?

—হ্যাঁ, শুধু এই।—রঞ্জুর আশাহত মুখের চেহারাটা লক্ষ্য করে বেণুদা হাসলেন: তাই বলে কাজটা একেবারে বাজে নয়, অত্যন্ত জরুরি। পারবে তো?

রঞ্জু ঘাড় নাড়ল।

—তবে এই নাও টাকা। বেশিই দিলাম। দু'খানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট করবে।

—সেকেণ্ড ক্লাস ?

—হাঁ, সেকেণ্ড ক্লাস্।—বেণুদার মুখে আবার মৃদু হাসির রেখা দেখা দিলে: অনেকখানি বাজে খরচের পাট বাঁচাতে হলে কখনো কখনো একটু বেশি খরচ করতে হয়। আচ্ছা, যাও তুমি।

রঞ্জু চলে এল। জরুরি কাজের আশ্বাস মিলেছে বটে, কিন্তু খুশি হয়নি মন। পদ্ধতিটাই খারাপ লাগছে। একটি মেয়ের খবরদারী করা, তাকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ যা কিছু গুরুত্ব তা মেয়েটিরই—সে শুধু দেহরক্ষী ছাড়া আর কিছুই নয়।

তা হোক—নিজের ভেতরে আর সে প্রশ্ন তুলবে না। নিজের সংশয়ের ভারটা যেন নিজের মনের ওপরেই প্রতিদিন চেপে বসছে তার। সুতরাং যথা সম্ভব উৎফুল্ল হওয়ার চেষ্টা করলে সে, একটা বৃহৎ এবং মহৎ কাজের অধিকার লাভের গৌরবে অনুপ্রাণিত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করলে।

ষ্টেশনে এল একটু আগেই, সাড়ে ছটায় সময়। দু-খানা টিকেট করে প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারী করতে লাগল। কিন্তু লোকের ভিড়ে বেশিক্ষণ চলা-ফেরা করতে ভালো লাগেনা। ধনেশ্বরের টিক্‌টিকিরা ট্রেনগুলোর ওপর কড়া নজর রাখে তাদের।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল প্ল্যাটফর্মের একটা কোণায়। এদিকটা প্রায় অন্ধকার, ষ্টেশনের নাম লেখা ঝাপসা আলোটায় বিশেষ কিছু পরিচ্ছন্ন ভাবে চোখে পড়ে না। শুধু এক পাশে স্তূপাকার প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে, আর তাদের ভেতর থেকে উঠছে পচা মাছের একটা চিমসে কটু গন্ধ।

পেছন থেকে আস্তে কে তাকে স্পর্শ করল। চমকে উঠল রঞ্জু, বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো ফিরে দাঁড়ালো।

একটি দশ বারো বছরের ছোট ছেলে। আস্তে আস্তে বললে, আপনাকে ডাকছে।

—কে ?

আঙুল বাড়িয়ে প্যাকিং বাক্সের স্তূপের একদিক দেখিয়ে দিলে ছেলেটি, তারপর চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রঞ্জু এগিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে প্রায় মিলিয়ে দিয়ে একটি মেয়ে বসে আছে।

—রঞ্জনবাবু ?

—হ্যাঁ, আমি।

—টিকেট করেছেন ?

—হুঁ।

—ট্রেন এলে গাড়ির সামনে দাঁড়াবেন। আমি উঠলে তার দু-মিনিট পরে উঠবেন অন্তত। এমন ভাব দেখাবেন না, যেন এক সঙ্গে যাচ্ছি আমরা।

—আচ্ছা—

—বেশ, আপনি যান—

রঞ্জু সরে এল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও চিনতে ভুল হয়নি তার। ছায়া মূর্তির মতো দেখা দিয়েই সে ছায়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল, পলকের জন্যে যেন ঝলসে উঠেছিল একখানা খাপ খোলা তলোয়ার। গলার স্বরে তীক্ষ্ণ তেজস্বিতা, যেন বেণুদার প্রতিধ্বনি। সুতপা।

সুতপা !

করুণাদিকে চেনে, সংঘমিত্রা তার মনে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই মেয়ে? এক লহমায় দেখলেই চেনা যায় এ আগুন, এ চট্টগ্রামের প্রীতিলতার দলের। বুড়ি বালামের তীরে দাঁড়িয়ে যদি পুলিশের গুলির সামনে কেউ বুক পেতে দিতে পারে তা হলে তা এই মেয়েই পারবে, মিতা নয়। কিন্তু এর পাশে দাঁড়ানো। না—সে জোর রঞ্জুর নেই।

—ঠন্-ঠন্-ঠনা ঠন্—

ঘণ্টা পড়ল—প্রথম ঘণ্টা। প্লাটফর্মের ওপর তেমনি সতর্ক পদচারণা, আর মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা ধনেশ্বরের লোক কোথাও থাবা গেড়ে অপেক্ষা করছে কিনা। সুতপা! হাতের শেষ আংটি, তার মায়ের স্মৃতি চিহ্নটিও অসংকোচে পার্টির কাজে বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাও তো দেখা দিলে না। নিজের জন্যে কিছু রাখবার নেই, এতটুকুও না। অথচ মিতা! পাশাপাশি একটা অবাঞ্ছিত তুলনাবোধ দেখা দিয়ে ভাবনাকে হঠাৎ বিতৃষ্ণ করে তুলল। মিতার সারা গায়ে ঝলমল করছে গয়না, দামী শাড়ী আর সুগন্ধে সে অপরূপ হয়ে আছে। কতটুকু তার ত্যাগ? দেশের সম্পর্কে খানিকটা সৌখীন সহানুভূতি ছাড়া—

হঠাৎ একটা অশ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। অশ্রদ্ধা এল মিতার ওপর, এল নিজের সম্পর্কেও। মিতা সুন্দর, মিতা অপরূপ, তার শ্বেত পাথরে খোদাই করা নিটোল নিখুঁত আঙুলগুলোতে ফুলের মতো কোমলতা। আবেশ-জাগানো গন্ধ তার চুলে, তার নিশ্বাসে। তবু—

মুহূর্তের আচ্ছন্নতায় যেন বিবশ হয়ে আসতে চাইল শরীর। কিন্তু প্রবলভাবে একটা ধিক্কার দিয়ে নিজেকে সজাগ করে তুলল সে। হোক সুন্দর, তবু সে একটা পুতুলের চাইতে তো বেশি নয়। দোলাক মনকে, কিন্তু বিপ্লবীর জীবনে পথ চলার প্রেরণা তো সে দেয় না।

—'প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী'—

নজরুলের লাইন। কিন্তু সে বিজয়লক্ষ্মী কি মিতা? চোখে ঘুম ঘনিয়ে আসে—মনে হয়, ওর কথা ভাবতে ইচ্ছে করে সন্ধ্যার আকাশের মোহ জাগানো 'সাত ভাই চম্পার' দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। না, কোনো দিন মিতা তরবারি তুলে দেবে না হাতে। কপালে রক্তচন্দন আর মাথায় উষ্ণীষ পরিয়ে তাকে বিদায় দেবেনা কোনো জালালাবাদ অথবা বুড়ি বালামের কঠিন অভিযাত্রায়।

তবে ?

—ঠন্-ঠন্ ঠনা ঠন্ ন্-ন্—

দু নম্বর ঘণ্টি। রঞ্জু চকিত হয়ে উঠল। দূরে সার্চ লাইটের আলো ঝলমলিয়ে উঠেছে, কাঞ্চননদীর ব্রীজে গুম গুম শব্দ। ট্রেণ এসে পড়ল।

ঘটাং ঘট্। লাইন ক্লিয়ার। ঝড়ের মতো শব্দ করে আমির গাঁ-এলাহাবাদ প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়ালো।

সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট খুঁজে পেতে দেরী হলনা। সামনে যেটা সেটাতে কিছু লোক আছে। আর একটু এগিয়ে আর একখানা—একেবারে খালি।

—সরুন, উঠতে দিন—

মেয়েলি গলার ধমক। রঞ্জু সরে পাশের ইন্টার ক্লাশটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখল না—দেখবার প্রয়োজন নেই। নিরাসক্তভাবে সে অপেক্ষা করতে লাগল, যেন গাড়িটার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই তার।

অল্প ষ্টপেজ। গণ্ডগোলে আর কুলির চীৎকারে কোথা দিয়ে চলে গেল সময়। গার্ডের বাঁশি বাজল, সাড়া দিলে এঞ্জিনের হুইশেল, গাড়ি নড়ল। চল্‌তি গাড়িটার হাতল ধরে উঠে পড়ল রঞ্জু।

—আসুন, বসুন—

সুতপা ডাকল।

এবারে পরিষ্কার দেখা গেল খাপ খোলা তলোয়ারকে। ছোট কামরা, গাড়িতে আর দ্বিতীয় যাত্রী নেই। মুখোমুখি দুখানা লম্বা সিট। ওদিকের সিটে গাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে সুতপা। পা তুলে দিয়েছে বেঞ্চির ওপরে, একখানা শাদা আলোয়ানে ঢেকে নিয়েছে কোমর পর্যন্ত। জানলার ওপর বাহু রেখে কপালের পাশে হাত দিয়ে বসেছে নিশ্চিন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে।

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসে পড়ুন।—সুতপা হাসল: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি পাহারা দিচ্ছেন নাকি?

—না তা নয়—সপ্রতিভ জবাব দিয়ে সে বসে পড়ল।

মেয়েদের সম্পর্কে এমনিতেই তার সংকোচ বেশি, আর মিতার স্পর্শ সে সংকোচ আরো বেশি বাড়িয়ে তুলেছে আজকাল। কেমন চোখ তুলে তাকাতে পারেনা মেয়েদের দিকে, ভয় করে। এই জাতটাকে সে বুঝতে পারেনা, এদের সম্পর্কে রয়েছে তার একটা সভয় জিজ্ঞাসা। মালঞ্চমালা পাশাবতীকে যত সহজে কাছে পাওয়া যেত, বাস্তবে তারা এমন করে দূরে সরে যায় কেন কে বলবে? তাই কি মিতার কাছেও সে সহজ হতে পারেনা, ক্রমাগত জট পাকাতে থাকে নিজের ভাবনার ভেতরে?

চোরা-চাহনি তুলে একবার দেখে নিলে সুতপাকে। জানলার বাইরে চেয়ে আছে, দেখছে পেছনে ছিটকে ছিটকে সরে যাওয়া শহরের আলোগুলোকে। চিন্তামগ্ন একটা নিবিষ্ট ভঙ্গি তার। এখানে বসবার সঙ্গে সঙ্গে যেন হারিয়ে ফেলেছে বাইরের পরিবেশকে, তলিয়ে গেছে নিজের একটা অতলস্পর্শ গভীরতার আড়ালে। যেন চারদিকে রচনা করেছে একটা কঠিন ব্যূহ, একটা দুর্ভেদ্য আবরণ। সে আবরণ ভাঙা যায় না, তার ভেতর দিয়ে ওর কাছে এগোবার মতো এতটুকু পথও খোলা নেই।

চোরাদৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখতে লাগল রঞ্জু।

বয়েসে ওদের চাইতে বেশ বড়ই হবে। ঠিক ফর্সা নয়, ঝকঝকে মাজা রঙ। চোখা নাক, টানা টানা চোখ; পাতলা ঠোঁট দুটো শক্ত ভাবে চাপা, হেলানো গ্রীবায় যেন একটা গর্বিত ভঙ্গি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার। মাথার চুল বেশি বড় নয়, তাও রুক্ষ, খোঁপাটা ভেঙে কাঁধের ওপর বিস্রস্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে। সম্পূর্ণ নিরাভরণ, হাতে গাছ কয়েক রূপোর চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিন্তু আভরণ নাই থাক, রঞ্জুর মনে হল, হয়তো কল্পনার খেয়ালেই মনে হল: সুতপার কৃশ মসৃণ শরীরে একটা তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্য ঝকঝক করছে। মেয়েদের মধ্যে এ উজ্জ্বলতা সে কোনোদিন দেখেনি। চট্টগ্রামের বিপ্লবী মেয়েদের কথা জেনেছে, জেনেছে কুমিল্লার সেই দুটি মেয়ের কাহিনী: যাদের রিভলভারের গুলি খেয়ে শাদা সাহেব শেষ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। ওই সব মেয়েদের সম্পর্কে একটা বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা জেগে ছিল তার, সুতপাকে দেখে যেন সে জিজ্ঞাসার উত্তর মিলল।

তলোয়ার? তার চাইতে আরো বেশি। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। জোয়া কিগনার। মাদাম হালিদা এদিব। আরো কে আছে?

—ঝরাং ঝরাং—

ট্রেণ দ্রুত চলছে, ঝাঁকুনি শুরু হয়েছে। সুতপা দৃষ্টি ফেরালো, সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জু চোখ ঘুরিয়ে নিলে বাইরের দিকে।

—শুনুন?

সুতপা ডাকছে।

—কিছু বলছিলেন?

একটা ছোট স্যুটকেস্ রঞ্জুর দিকে এগিয়ে দিয়ে সুতপা বললে, এটা রাখুন আপনার কাছে।

—দিন।

আবার চুপচাপ। রঞ্জু কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না, সুতপা কী ভাবছে সেই জানে, অন্তত ইচ্ছে করেই ওদিক থেকে নিজের মনোযোগ সরিয়ে রেখেছে। ট্রেণ চলছে অন্ধকারের সমুদ্রে একটা অতিকায় জন্তুর মতো সাঁতার দিয়ে; এক আধটা আলোর টুকরো ফেনার ফুলের মতো ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে।

—শুনুন?

আবার ডাকল সুতপা। আবার চকিতের মুখ ফেরালো রঞ্জু।

—শুনেছি খুব ভালো কবিতা লেখেন আপনি।

রঞ্জু রাঙা হয়ে গেল: কে বলেছে?

—সবাই। আপনি জানেন না, আপনার বৈপ্লবিক কবিখ্যাতি কী ভয়ানক ছড়িয়ে পড়েছে।

বৈপ্লবিক কবিখ্যাতি! কথাটা যেন ঠাট্টার মতো শোনালো। সন্দিগ্ধ শঙ্কিত ভাবে সুতপার মুখের চেহারাটা একবার লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলে সে। মিতার মুখে যা সত্যিকারের খ্যাতির মতো মনকে প্রসন্ন করে তুলত, সুতপার কাছে তা বিদ্রূপের মতো লাগে। দুজনের জাত আলাদা। একজন মুগ্ধ, একজন প্রখর; একজনকে মানায় ছবির

মতো বাগানটার নীল-নয়না হরিণীর পাশে শকুন্তলার মতো, আর এক-জনকে দেখা যায় কোনো ঝোড়ো রাত্রিতে—কোনো তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের তলোয়ারের মতো খর-আলোয়। কিন্তু—

সুতপা হেসে উঠল : লজ্জা পেলেন তো। কিন্তু বিপ্লবীর তো এ-ভাবে লজ্জিত হওয়া উচিত নয়।—হাসিটা অকস্মাৎ থেমে গেল, কথার সুরে এল গভীরতা : সমস্ত সংসারকে তুচ্ছ করে তার মাথা তুলে দাঁড়ানো উচিত, জয় করা উচিত ভয়কে, দুর্বলতাকে। লজ্জাটা অলঙ্কার নয়, অসম্মান।

রঞ্জু হঠাৎ দৃষ্টিটা তুলে ধরল সোজাভাবে। শিল্পীর অহমিকায় ঘা লেগেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার সংশয় আছে, কিন্তু মেয়েদের উপদেশে তার শ্রদ্ধা নেই। তা ছাড়া সুতপা করুণাদি নয়—একটা অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ হ'ল চকিতের মধ্যে।

—কিন্তু নিজেকে বেশি করে প্রচার করাই কি খুব বড় জিনিস? জোর এক—জোরের ভাপটা আলাদা।

সুতপার মুখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। বেশ বোঝা গেল ছেলেটিকে আরো ছেলেমানুষ বলেই আশা করেছিল সে। যেন কথা বলবার ঝোঁক চেপে গেল রঞ্জুর। সতেজ আত্মপ্রতিষ্ঠ সুরে বলে গেল : জোর যেদিন আসবে সেদিন নিজেকে প্রচার করব বইকি। কিন্তু যতদিন তা না আসে ততদিন অপেক্ষা করাই কি ভালো নয়?

—বেশ, অপেক্ষা করুন।—সুতপা যেন পরাভূত বোধ করলে নিজেকে : কিন্তু সময় যখন আসবে তখন যেন সংকোচে নিজেকে আড়াল করে রাখবেন না।

—নিশ্চয়ই রাখবনা।

সুতপা এবার ভারী মিষ্টি করে হাসল : কবির সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। একদিন তর্ক করব আপনার সঙ্গে। কিন্তু জানেন, আমিও এক সময়ে কবিতা লিখতাম।

—সত্যি? রঞ্জু এতক্ষণের সংশয় কাটিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠল : তবে লেখেন না কেন আজকাল?

—লিখিনা কেন? কারণ আপনারা লিখতে দিলেন কই?

—মানে?

—মানে থার্ড ইয়ারে পড়বার সময় হঠাৎ নিজের প্রতিভার ওপরে শ্রদ্ধা জেগে গেল। এক গাদা কবিতা পাঠালাম নানা মাসিক পত্রিকায়। কিছু ফেরত এল, কিছু এলনা।

—সেগুলো ছাপা হল বুঝি?

—না—শান্ত হাসিতে সুতপার মুখ আরো বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল : গেল সম্পাদকের বাজে-কাগজের ঝুড়িতে। ফেরৎ দেবার দরকার ও বোধ করলেন না তাঁরা।

রঞ্জু ক্ষুব্ধভাবে বললে, ভারী অন্যায়।

সুতপা কিন্তু সহানুভূতিটা গায়ে মাখল না : অন্যায় কিছু হয়নি। সম্পাদকেরা বুদ্ধিমান লোক, আমার কবিতা সম্বন্ধে তাঁরা স্নেহে অন্ধ ছিলেন না। অতএব কবিতাগুলো তাদের যোগ্য মর্যাদাই পেয়েছিল। সে যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আর। পৌঁছুতে তো এখনো ঘণ্টা তিনেক দেরী আছে, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন।

রঞ্জু বুঝতে পারল। যত সহজে কথাটা আরম্ভ করেছিল সুতপা তত সহজেই সেটাকে সে থামিয়ে দিতে চায়। বিপ্লবিনী সুতপা, তার নিরা-ভরণ দেহের চারদিকে যেন বিকীর্ণ করে রেখেছে একটা আগ্নেয় বৃত্ত; সে বৃত্তের থেকে চকিতের জন্য বাইরে এসে পড়েছিল সহজ মানুষের কাছাকাছি, তাই যেন আবার নিজেকে সংকুচিত করে নিলে সে, আকস্মিকভাবে থামিয়ে দিলে অন্তরঙ্গতার স্বাভাবিক অগ্রগতিটাকে।

—আমার এখন ঘুম আসবে না, আপনি শুয়ে পড়ুন।

—আচ্ছা—

আর একটি কথাও বললে না সুতপা। চাদরটা বুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর চোখের ওপর হাত দিয়ে আড়াল করে ধরলে আলোকটাকে।

রঞ্জু প্রশ্ন করলে, নিবিয়ে দেব আলোটা?

—না, না—প্রায় আর্তস্বরে কথাটা বললে সুতপা। তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো রঞ্জুর দিকে, প্রায় আধখানা উঠে বসল ক্ষিপ্রগতিতে। তারপরেই কোমল হয়ে এল দৃষ্টি, স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা দিলে ঠোঁটের কোনায়। না, ভুল হয়নি, একেবারে ছেলেমানুষই বটে।

—দরকার হলে নেবাতে পারেন—মৃদুস্বরে জবাব দিয়ে এবারে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু আলো নেবালনা রঞ্জু। তার দৃষ্টি তখন বাইরের দিকে—প্রবাহিত অন্ধকারের স্রোতের মধ্যে। হঠাৎ মনে একটা নতুন প্রশ্ন জেগেছে : আলো নেবাবার কথায় অমন করে চমকে উঠল কেন সুতপা? বিপ্লবী মেয়ে, আগুনের মতো ধারালো মেয়ে, সে খালি অন্ধকারকে ভয় পায় কেন?

(ক্রমশঃ)

স্মৃতি

শ্রীভোলানাথ ঘোষাল

ভুলি নাই আজো ভুলি নাই তব স্মৃতি
ভুলি নাই সেই ক্ষণিকের পরিচিতি!
একদা চকিতে কবে যেন কোন ক্ষণে
তোমার পরশ লেগে ছিল মোর মনে।

আজো তাই নিয়ে চলিছে পরিক্রমা
সঞ্চয় শুধু তব স্মৃতি মনোরমা।
জীবন হইতে জীবনান্তরে যাই
তোমার পরশ সন্ধান করি তাই।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় জয়-যাত্রা

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

বহির্ভারতে ভারত সেবাশ্রমসঙ্ঘের কর্মবিস্তারের একটা ক্ষীণ আশা সঙ্ঘ পরিচালকগণের অন্তরে বহুদিন হইতেই বাসা বাঁধিয়াছিল। পরাধীন ভারত-মাতার কাতরতা, নিপীড়িত দেশমাতৃকার হাহাকার আর্ত্তনাদ—স্বদেশসেবী রাষ্ট্রবাদী সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীগণের হৃদয়ে বিরাট আঘাত হানিত; তাই সেই ক্ষীণ আশাকে রূপায়িত করিবার কোন চেষ্টা এতদিন পরিলক্ষিত হয় নাই। সুদীর্ঘ দিনের কঠোর সংগ্রাম, অশেষ ক্লেশবরণ, অমানুষিক অত্যাচারের প্লাবন সহ্য করিয়া যেদিন ভারত জননীর পদযুগলের লৌহ-নিগড় উন্মোচিত হইবার পরমপুণ্য মুহূর্ত্তটুকুও ক্রূর-নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বিষজর্জ্জর হইয়া উঠিল—বিদেশী ক্ষীর-কদলী-পুষ্ট কালনাগিনী যখন ভারত-মাতার জাগরণের প্রাক্‌মুহূর্তে ঈর্ষা বশে বাৎসল্যময়ী ভারত জননীর যুগলচরণে দংশন করিয়া সাম্প্রদায়িক কলহের বিষ ঢালিয়া দিল—সেদিনও সঙ্ঘ-পরিচালকগণের প্রাণে বহির্ভারতে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার কোন আকাঙ্ক্ষাই জাগে নাই। তারপর কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, নোয়াখালির বীভৎস অত্যাচার, পাঞ্জাবের চেঙ্গিস তৈমুরের মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার পুনরভিনয় হইল; সেই সমস্ত অপ্রাকৃত ঘটনায় সঙ্ঘ নানাভাবে সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তখন পর্য্যন্ত বহির্ভারতে সেবা-সম্ভার লইয়া প্রচারাভিযানের সংকল্প সঙ্ঘ-সন্তানের হৃদয়ে মাঝে মাঝে জাগিলেও তাহা পরিপূরণের কোন আশাই প্রকাশ পায় নাই।

মহাত্মা গান্ধীজির অমানুষিক তপঃশক্তির প্রভাবে পরিশেষে শান্তি ও মুক্তি-রাজ্য গঠন করিবার সংকল্পের বীজমন্ত্রে সুরক্ষিত জীবনের বিনিময়ে যখন ভারত-বক্ষে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হইল, ভারত-মাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণের সুযোগ্য হস্তে দেশ-শাসনের ভার আসিল,—স্বতন্ত্র ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থ ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যখন বিশ্বের দিকে দিকে চতুর রাজদূত প্রেরিত হইয়া ভারত মাতাকে বিশ্ব-জননীর আসনে অধিষ্ঠিতা করিবার প্রয়াস পাইল—সেদিন সঙ্ঘ পরিচালকগণের অন্তরে লুক্কায়িত বহির্ভারতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রচারের ক্ষীণ আশাও—ক্ষুদ্র বীজের অন্তরে লুক্কায়িত মহাশক্তি যেমন স্থান, কাল, পরিমিত জলবায়ু ও আলোকসম্পাতে মহামহীরুহে পরিণত হয় সেইরূপ এই সুবর্ণ সুযোগে বিরাট আকার ধারণ করিল।

এইবার প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায় সঙ্ঘ হইতে সেবাকার্য্যের ভার লওয়া হইয়াছিল। সেবাকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর স্বীয় সাধনোপলব্ধ সনাতন ধর্ম্মের যুগোপযোগী স্বরূপ বা 'যুগধর্ম' এবং সমাজ সংগঠনে সন্ন্যাসী সমাজের দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কেন্দ্র তথা সরকারের প্রচার কেন্দ্রে সঙ্ঘ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দের তেজোদীপ্ত বক্তৃতায় সমগ্র সন্ন্যাসী সমাজ, যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী, আইন সভার সভাপতি, ভারত সরকারের কর্ণধার পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ সমগ্র বিদ্বৎ সমাজে একটা নবীন আলোড়ন জাগাইল। কুম্ভমেলার অবসানে সুজলা সুফলা স্রোতস্বিনী-মেখলা পূর্ব্ববঙ্গের স্বনামখ্যাত বাজিতপুর সঙ্ঘ-সিদ্ধপীঠে কলিযুগোত্তা মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীআচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের শুভ জন্মোৎসব তিথি। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত—"আগামী ৺মাঘী পূর্ণিমার দিনে তপঃশক্তি তপস্তেজ ও তপঃপ্রভাবের পরিপূর্ণ বিকাশের দিনে যাহাতে তোমরা সকলে সঙ্ঘ-নেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁর পূর্ণ শুভদৃষ্টি, শুভাশীর্ব্বাদ ও তপঃপ্রভাব গ্রহণ করিয়া নবীন সংকল্প ও কর্ম্মপ্রেরণা লাভ করিতে পার—প্রাণে মনে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা আকুলতা ও ব্যাকুলতা লইয়া আসিতে প্রবৃত্ত হও"—এই মহাবাণী স্মরণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কর্ম্মরত সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীগণ এই সিদ্ধপীঠে শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার শ্রীচরণমূলে সমবেত হন। সঙ্ঘ পরিচালকগণের অন্তরে যে ক্ষীণ আশা এতদিন অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল শ্রীশ্রীমাঘী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীসঙ্ঘদেবতার শুভ আশীর্ব্বাদ ও প্রেরণা লাভ করিয়া তাহা শ্রাবণের জলধারা-বাহিতা জাহ্নবীর ন্যায় বেগবতী ও বিশালরূপ ধারণ করিল।

এবার ক্ষেত্র নির্ব্বাচনের পালা। কেহ ইউরোপ, কেহ আমেরিকা, কেহ বা অন্য মহাদেশের নাম করিল—কিন্তু জানিনা কোন মহান্ শক্তির অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে ভারতের সহিত নিকট সম্বন্ধে সংযুক্ত আফ্রিকা মহাদেশই ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল।

সঙ্ঘের ছয়টী চারণদল (Procession Party) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্মপ্রচার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত আছে; বোম্বাই প্রদেশে যে দলটি কার্য্যরত ছিল তাহার উপর সঙ্ঘের আদেশ আসিল—আফ্রিকায় প্রচারাভিযানের।

যাঁহার বিরাট শক্তির একটি সামান্য অংশে এই চরাচর বিশ্ব কর্ত্তব্য-পালন করিয়া চলিয়াছে বোধহয় তাঁহারই ইচ্ছায় পূর্ব্ব আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান 'হিন্দুমণ্ডলের' উপর 'পাসপোর্ট' সংগ্রহের ভার পড়িল। আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যেই 'পাসপোর্ট' পাওয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যায় সঙ্ঘ-সম্পাদক-প্রধান শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজীর নিকট হইতে আফ্রিকা গমনের অপ্রত্যাশিত আদেশ পাইয়া সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু যখন শুনিলাম যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাসপোর্ট পাওয়া গিয়াছে—এমন কি যাত্রার দিনও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তখন যথাসম্ভব অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া ৫ই মে, যুগ যুগ সঞ্চিত মহিমা গরিমা বক্ষে ধারণ করিয়া যে মহান্ মূর্ত্তিমান জীবন্ত বিগ্রহরূপে আজিও ভারতের শান্তি ও মুক্তির প্রথম সোপানস্বরূপ বিরাজ করিতেছে সেই মহানগরী দিল্লী অভিমুখে রওনা হইলাম।

আমাদের প্রচার-ব্যপদেশে আফ্রিকা যাত্রার সংবাদ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গণনেতা রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রভৃতি নেতাগণের সহিত সাক্ষাত করিয়া জানাইলাম। তাঁহারা প্রত্যেকেই আমাদের এই অভিযানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের 'মিশন'কে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া আফ্রিকা সরকার, আফ্রিকায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার এবং নেতাগণকে বহু পত্র এবং তারবার্ত্তা প্রেরণ করিয়া দিলেন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচীর পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের এই মিশনের প্রয়োজনীয়তা ও ইহার সফলতার উপায় সম্পর্কে বহু আলাপ আলোচনা এবং অনেকগুলি সাহায্যকারী যুক্তি বা পরামর্শ দান করিয়া বলিলেন—"স্বাধীন ভারতের মতবাদ, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ভারতের সন্ন্যাসীর দ্বারাই সম্ভব। ভারত এখন স্বাধীন হইয়াছে—ভারতীয় সন্ন্যাসীগণের এখন সরকারকে এই ভাবে সহায়তা করা উচিত।" এই ভাবে নানা আলোচনার পর তিনি পূর্ব্ব আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, কতিপয় বিশিষ্ট নেতা এবং কয়েকটী দৈনিক পত্রের সম্পাদককে আমাদের এই মিশনকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পত্র লিখিয়া দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লীর কাজ শেষ করিয়া আমরা* সঙ্ঘের স্থায়ী কেন্দ্র সুরাটে পৌঁছিলাম।

সুরাটে পৌঁছিবার পর হইতেই আফ্রিকা যাত্রার উদ্যোগ পর্ব্ব সুরু হইল। এদিকে বোম্বাইয়ে কর্ম্মরত সঙ্ঘের চারণদল শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই বোম্বাইয়ের মফঃস্বল হইতে সুরাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কতকগুলি অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে আমাকে বোম্বাইয়ে আসিতে হইল। বোম্বাইয়ে আসিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বি, জি, খের ও অন্যান্য মন্ত্রীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের আফ্রিকা যাত্রার সংবাদ জানাইলাম। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীযুত খের মিশনের সাফল্য কামনা করিয়া জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকারে এই মিশনকে সাহায্য করিতে আবেদন-পত্র লিখিয়া দিয়া বলিলেন—"মনে রাখিবেন বোম্বাই সহরের অধিবাসী আপনাদের একটি কর্ম্মকেন্দ্র বোম্বাই সহরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। আপনারা জয়যুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসুন—তাহার পর সে চেষ্টা করা যাইবে।"

বৈকালে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত এস্-কে-পাতিল এবং জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত এস্ এল্ সিলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। পরম আগ্রহভরে কোন সময় 'মিশন' বোম্বাই পৌঁছিবে, কোথায় অবস্থান করিবে ইত্যাদি জানিয়া লইয়া দৈনিক পত্রাদিতে সংবাদ প্রেরণ করিয়া দিলেন। কী ভাবে ষ্টেশনে মিশনকে সম্বর্দ্ধনা জানানো যায় তাহা পরামর্শের জন্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। স্থানীয় পিপলস্ হলে মিশনকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানানোর সমস্ত ব্যবস্থাই অল্প সময়ের মধ্যে করিয়া তবে আমাকে বিদায় দিলেন। নানা কাজের মধ্য দিয়া কয়েকদিন আমার বোম্বাইয়ে কাটিল। ক্রমে 'মিশন' বোম্বাইয়ে পৌঁছিল। ষ্টেশনে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত এস-কে পাতিল, জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত এস এল সিলম্, সেক্রেটারী মিঃ ভাতিলাল মিশনের নেতা শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজীকে মাল্য বিভূষিত করিলেন।

এইবার বিদায় সম্বর্দ্ধনার আয়োজনে বোম্বাইয়ের দিকে দিকে সাড়া পড়িয়া গেল। যেন প্রতিযোগিতা করিয়া বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাইবে। প্রথমে বোম্বাইয়ের নাগরিকগণের পক্ষ হইতে স্থানীয় 'মাধব-বাগ' হলে সভার আয়োজন হইল। সভাপতি শ্রীদীক্ষিতজী মিশনের সর্ব্বতোভাবে সাফল্য কামনা করিয়া বলেন—"ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এই সংস্কৃতিক মিশনের নিকট হইতে শুধু আফ্রিকা মহাদেশে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার আশা করি না—পরন্তু সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার করুক—ইহাই বোম্বাইয়ের নাগরিকগণের সহিত আমি আশা করি।" সম্বর্দ্ধনার উত্তরদান প্রসঙ্গে মিশনের নেতা শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ বলেন, "শান্তি তথা মৈত্রীর বাণী প্রচার করিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সমগ্র বিশ্বে অভিযান করিবে।"

তৎপর দিবস প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "পিপল্‌স্ হলে"—(Peoples Hall) সম্বর্দ্ধনা সভা। সভাপতি শ্রীযুত এস-কে পাতিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামতীর্থ প্রভৃতি মহান পুরুষগণ বহির্ভারতে ভারতীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারে গিয়াছিলেন—পরাধীন ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশা ও মর্ম্মবেদনা বহন করিয়া কিন্তু আজ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এই সংস্কৃতিক মিশন যাইতেছে—স্বতন্ত্র ভারতের নাগরিকের মর্য্যাদা লইয়া অপর প্রদেশকে ভারতের সহিত সংস্কৃতি তথা মৈত্রী ও সখ্যতার সূত্রে আবদ্ধ করিতে। যে মহান্ সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রীভগবান যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন—যে মহান্ সংস্কৃতির প্রেরণায় স্বামী প্রণবানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি সাধক, মহামান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধীজি প্রভৃতি মহান কর্ম্মীগণ আজীবন সাধন করিয়া গিয়াছেন আমি বোম্বাই প্রদেশের জনতারূপী নারায়ণের পক্ষ হইতে সেই মহান্ সংস্কৃতির প্রচারোদ্দেশ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তথা ভারত সরকার প্রেরিত এই সাংস্কৃতিক মিশনের সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।" সম্বর্দ্ধনার উত্তরদান প্রসঙ্গে মিশনের নেতা শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী বলেন—"যে মহান্ দায়িত্ব লইয়া আমরা আজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীমঙ্গলময় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে উদ্‌যাপিত হইবে। যে সংস্কৃতির মহা সমন্বয় আমি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীশ্রীচণ্ডী, অর্জ্জুন, হনুমান প্রভৃতির জীবনে পরিস্ফুট দেখিয়াছি তাহাই আমাদের প্রচার্য্য বিষয় হইবে। ভারতীয় জাতি কখনও ধর্ম্মকে ধরিয়া রাজনীতিকে বিসর্জ্জন দেয় নাই—আবার রাজনীতিকে যথাসর্ব্বস্ব করিয়া অত্যাচারের পসরা কোন দুর্ব্বলের উপর হিংস্রভাবে চাপাইয়া দিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে নাই।

* আমি এবং শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী।

পাশ্চত্য ভোগবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জগত আজ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে—সেই ভোগবাদী পরশ্রীকাতর অর্থলোলুপ পাশ্চাত্যে আজ স্বাধীন ভারতের ন্যায় নীতি, ত্যাগ, সেবায় প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ বহন করিয়া আমাদের 'মিশন' চলিয়াছে। সমগ্র জগতে আজ স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতির 'রামরাজ্যে'র আদর্শ প্রচার করিতে হইবে। জগতে আবার তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রস্তুতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—এমতাবস্থায় ভারতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের (Universal Brotherhood) আদর্শই তাহাকে পরিত্রাণ করিতে পারে। ভারতের সেই সমস্ত উদার মতবাদ প্রচার করিতেই আমরা ভারত-বক্ষ ত্যাগ করিতেছি।" তারপর দিন বোম্বাই বাঙ্গালী ক্লাব এবং তারপর দিন স্বামী মাধবানন্দের আশ্রমে সন্ন্যাসীকর্ম্মী ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর পক্ষ হইতে আমাদের মিশনকে বিদায় অভিনন্দন জানান হইল।

আমরা ১লা জুন বোম্বাই ত্যাগ করিয়া আরবসাগরের আশ্রয়প্রার্থী হইবার জন্ত সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। (ক্রমশঃ)

দখিনা হাওয়া

শ্রীজনরঞ্জন রায়

তের বছরে পা দিতে চলিয়াছে দীনতারিণী, কিন্তু ভব্য-সভ্যতা কি একটুও নাই···সোমত্ত ধিঙ্গী···তা'র ওপর আবার ভাবনের ঢঙ দেখনা···যেমন রূপ তেমনি কি রুচি! ···কিসের রং লাগাইয়াছে হাতে-মুখে?

দীনতারিণীর মা কাত্যায়নী সকড়ি হাত ধুইতে ধুইতে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে-হাসিতে তাঁর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আঁচলের খুঁট দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন—কেই বা নেবে এই মেয়েটাকে?··· হয়তো শেষে ঐখানেই দিতে হবে···ঐ পাঁচুর সঙ্গে···নইলে হরিণবাড়ি থেকে কামারপুর পর্য্যন্ত কত জায়গায় তো খোঁজা হ'ল···কেউ তো নিতে চায় না।···কিন্তু ঐ পাঁচু ছেলেটা—কেমন যেন খামখেয়ালী।

কাত্যায়নী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। বড় ছেলে ও স্বামীকে খাওয়াইয়া তিনি হাত ধুইতেছিলেন। দুইজনেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার···বেলা পৌনে ন টার ট্রেণে কলিকাতা যাইবেন।

কাত্যায়নীর বড় ছেলে রমেন তাড়াতাড়ি খাকির কোট-পাতলুন পরিয়া লইল। সে ট্রামগাড়ির কন্‌ডক্টার। তার স্ত্রীর নাম লতা। আদরের নাম লতা, পুরা নাম তড়িৎলতা। কলিকাতার শ্যামবাজারের মেয়ে। সে সর্ব্বদাই এমন একটা ভাব দেখায় যে, এই পাড়াগাঁয়ে অসভ্য লোকদের ঘরে আসিয়া সে তাহাদের ধন্য করিয়াছে। স্বামীর কোটের পকেটে সে আলগোছে ফেলিয়া দিল ছোট একটি টিনের কৌটা। তাহাতে আছে দুখানি রুটি, খান কয়েক আলু-ভাজা ও একটি পানের খিলি। ইহা রমেনের টিফিনের খানা। তারপর যেন তড়িৎচমক দিয়া লতা বলিল—আনতে বুঝি মনে থাকে না···রোজ রোজ বলছি—একটা হিমানী আর একটা নেল্‌-পেণ্ট···আমাদের বাড়ি থেকে বৌদির কাছে চাইলেই তো তিনি দেন্‌···চাইতে যদি বাধে তো কিনে আনলেই হয়···মাইনে না কি বেড়েছে ক'টাকা! রমেনও রাগিয়া গিয়াছে। সেও চড়া সুরে শুনাইল—তা আমার কথা শুনলে তো আমি তোমার কথা শুনবো··· দীনতারিণীকে একটু কোরে দ্বিতীয় ভাগ খানা পড়ালেও তো হয়···দিনরাত তো কাটে ভাবনে আর নবেল পড়ায়। তারপর সুর নামাইয়া বলিল—সংসার চলে না আমার ওভারটাইম না খাটলে···তার ওপর ছোট ভাইটার এক-জামিন, ফিঃ কি কোরে দেবো ভেবে উল্‌কুল্‌ পাচ্ছিনে··· দু'দিন বাদে তার বিয়ে হবার ঠিক হচ্ছে···তুমি তখন হবে বড়বৌ···এখনো তোমার নখে রঙ করা, মুখে হেজলীন মেখে সঙ সাজার সখ ষোল আনা রয়েছে দেখছি···বিয়ের পর দশ বছর এসব তো খুব হোল।

—সে দৌড়িতেছে···আর বুঝি ট্রেণধরা যাইবে না··· দেখিল তার আগে-আগে তার বাপও দৌড়াইতেছেন··· তিনি রোজ কলিকাতা থেকে দেশের দোকানদারদের ফরমাস মতো জিনিষপত্র কিনিয়া আনেন, কমিশন পান।

রমেন তার ছোট ভাই ধীরেনকে কিছুতেই বিয়ে করিতে রাজি করাইতে পারিল না। রমেনের ইচ্ছা ছিল ধীরেনের বিয়েতে যাহা কিছু পাইবে তাহা দিয়া দীন-

তারিণীর বিয়ে দিবে। কিন্তু ধীরেন তার দাদাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিল—আর সংসারের বোঝা বাড়িও না দাদা আমার বিয়ে দিয়ে। তুমি তোমার প্রভিডেন্ট-ফণ্ড থেকে ধার নাও···আমি মুটেগিরি কোরে ধার শোধ দেব সারা জীবন ধরে···মোট কথা এমন পাত্র হাত ছাড়া কোর না··· পাঁচু খেয়ালী হলেও সে ভদ্রবংশের ছেলে। শেষে ধারকর্জ্জ করিয়াই দীনতারিণীর বিয়ে হইল। ঠিক কি কারণে ভাঙা-বাড়ির নিকুঞ্জবনের কবি পূর্ণচন্দ্র দীনতারিণীকে নিল তাহা কেহই আন্দাজ করিতে পারিল না। জমিদারবংশের জমিদারী গিয়াছে, বাড়িটাও পড়ে-পড়ে, তাই লোকে তার নাম দিয়াছে ভাঙাবাড়ি। বংশের এক মাত্র সলিতা পূর্ণচন্দ্র। পাঁচুঠাকুরের দোর-ধরা বলিয়া পাঁচু আখ্যা পাইয়াছে। সে আমোদপ্রিয়, সৌখিন, আখড়াবাড়ি করিয়া কুস্তিকসরৎ করে, কাব্যচর্চ্চাও করে। সে ভাঙাবাড়ির খানিকটায় বাগান করিয়াছে। তার নাম দিয়াছে নিকুঞ্জবন। আপন মেজাজেই থাকে···গ্রামের কম লোকের সঙ্গেই মিশে। দীনতারিণীকে সে দেখিয়াই ভালবাসিয়াছে। ভালবাসিয়াছে তার চোখ দুটোকে···তার সুঠাম দেহকে। কিন্তু তার মাথাটায় যে কিছুই নাই তাহা পাঁচু জানিতে পারে নাই। বিয়ের রাতেও কি জানিতে পারে নাই? দীনতারিণীর বড়বৌদি লতা তা' জানাইয়া দিবার ফন্দি করিয়াছিল পাঁচুকে বাসর ঘরে। দীনতারিণীকে লতা বাসর ঘরে নিয়া যাইতে-যাইতে বলিল—বরকে দেখে লজ্জা করিস নে বাসর-ঘরে···একেবারে তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খাবি। বাসর ঘরে দীনতারিণী পাঁচুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাজার চুমা খাইল···পাগলীর কাণ্ড দেখিয়া, মুখে কাপড় দিয়া যুবতীর দল সবাই বাসরঘর ছাড়িয়া পলাইল। তখনও কি পাঁচু বুঝিতে পারে নাই যে, মেয়েটার মাথায় বস্তু নাই? বুঝি তা' পারে নাই পাঁচু। সেও সেই নির্জ্জন বাসরে দীনতারিণীর চোখ দুটিতে বারবার চুমো খাইল···!

যুদ্ধের সময় পাঁচুর ভাবালু মনে রঙের ঘোর লাগিয়াছে। গ্রামের ভিতর দিয়া রংরুট-কুচ্-কাওয়াজ্ হয়···বলিষ্ঠ যুবক পাঁচু মাতিয়া ওঠে। একদিন সে দীনতারিণীকে কাছে বসাইয়া বলিল—তোমায় সুখী করবার পথ খুঁজিছি···ভাঙা-বাড়ি নতুন করে গড়তেই হবে···।

যুদ্ধের সরঞ্জামের একটা কারখানায় দিনরাত খাটে ধীরেন। রোজগারের টাকা থেকে বোনের বিয়ের দেনা শোধ করিয়া ফেলিয়াছে। ধীরেনের মা কাত্যায়নী ছেলের বিয়ের ঠিক করিলেন। কাত্যায়নীর মনে সুখ নাই দীনতারিণীর জন্য। বড় বৌয়ের ছেলেপুলে হয় নাই, কিন্তু তিনি শুধু দেহ ঘষা-মাজা নিয়াই থাকেন···নিজে ডেলি-প্যাসেঞ্জারের রান্না কতদিন একভাবে কাত্যায়নী করেন? তাই ধীরেনের বিয়ে দিতে কাত্যায়নীর একটা ঝোঁক চাপিয়া গেল। কিন্তু যে বৌটি আসিতেছে সেও বড়বৌয়ের বোন··· তাদের ঝাড়ই যে সুন্দরী। বড়বৌ লতার বোন লাবুর সঙ্গেই ধীরেনের বিয়ে হইল।

ফুলশয্যার রাত্রি···যুবতীদের আনন্দের আর সীমা নাই। গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান বাজিতেছে···

তুফান তুলেছে প্রাণে দখিনা হাওয়া—

সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল···হেলিয়া দুলিয়া ও আসে কে আসরে অপরূপ রূপসীটি···দীনতারিণী না? মুখে বুঝি এক শিশি হিমানীর সবটাই মাখিয়াছে···নখের রঙ ঠোঁটে দিয়াছে···খোঁপায় জড়াইয়াছে ফুল শুদ্ধ খানিকটা মাধবীলতা। সকলে হাসিয়া অস্থির। প্রসাধনরতা বড়বৌ এই হাসির হররা শুনিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সকলেরই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তার উপর···সকলের চোখে মুখে একই প্রশ্ন—দীনতারিণীর এই রসের উৎস আসিল কোথা হইতে···সে তো আজকাল কারো সঙ্গে মিশিত না? বড়বৌ বলিল—তোরা ওকে আজ নাচ্তে দে···নাচ্তে দে···সত্যিই আজ ওর প্রাণে দখিনে হাওয়ার তুফান উঠেছে।···তোরা কি জানিস না ঘণ্টা দুই আগে পাঁচু ঠাকুর-জামাই ফিরে এসেছে···চার বছর যুদ্ধে গিয়েছিল, একখানা চিঠিও দেয়নি কোন দিন···আজ হঠাৎ ফিরে এসেছে হাবিলদার পি, ঘোষ···কি চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে ঐ পোষাক পরে। দীনতারিণীকে নিয়ে যাবে। যুবতীর দল সকলেই উঠিয়া পড়িল পাঁচুকে দেখিতে। দখিনা হাওয়ার-তুফানে দীনতারিণী তখনো নাচিতেছে···গ্রামো-ফোন রেকর্ডে এখনো গান হইতেছে—

তুফান তুলেছে প্রাণে দখিনা হাওয়া!
ভেলা বুঝি আর আজ যায়না বাওয়া।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

৭ই জুন। আজ আমরা সানফ্রান্সিসকো যাচ্ছি। বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে এসে জিনিষ-পত্তোর গোছাতে লেগে গেলাম। বাড়তি কয়েকটা বাক্স এই হোটেলে রেখে অল্প কিছু মাল নিয়ে রাত ৮।০টায় আমরা এয়ারওয়েজ টার্মিনালে উপস্থিত হলাম। যাত্রাকালে আকাশে কালো মেঘের ঘনঘোর ঘটা দেখে একটু ভয় হ'ল। পথেই সুরু হ'লো ঝড়, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ চমকানি। যথাসময়ে আমরা বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছে T. W. Aএর একটি বড় বিমানে উঠলাম। বিমান আকাশে উঠল, মুহূর্মুহু বিদ্যুতের আলোয় অন্ধকার আকাশ আলোয় আলো হয়ে উঠল। আমরা যেন আকাশ পথে বিজলী বাতি জেলে চলেছি। ঘন মেঘের স্তরের ভেতর আলো জ্বলে উঠছে দেখে মনে হল বিরাট পাহাড়ের গায়ে আগুন লেগেছে, আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে তার গভীর খাদ কাটল ও বড় বড় গুহা। এ দৃশ্য কবির কল্পনায় অতি মধুর, চিত্রকরের তুলিতেও মনোমুগ্ধকর। মনে হচ্ছিল দিদিমণি (কবি রাধারাণী দেবী) যদি সঙ্গে থাকতেন, সুন্দর একটি কবিতা পেতুম আমরা ! কিন্তু বাস্তব জীবনের চলার পথে বিশেষ করে বিমানযাত্রীর পক্ষে এ আকাশ যেমন ভয়াবহ, তেমনি বিপজ্জনক। প্লেন দশহাজার ফিট ওপর দিয়ে তীরের মত ছুটে চলেছে। যাত্রীরা সব একে একে পরদা টেনে শুয়ে পড়লো। আমরা প্রায় আমেরিকার মধ্যভাগের উপর এসে পড়েছি। আমেরিকার পশ্চিমে California stateএর প্রসিদ্ধ বন্দর San Fransisco প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। আমরা পশ্চিমের শেষ সীমানার দিকে চলেছি। পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব ৩০০০ মাইল। তখন রাত্রি গভীর। জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি আকাশ মেঘমুক্ত, ঘন অন্ধকার রাতে আকাশের গায়ে তারা জ্বল জ্বল করছে। নীচে সার্চ লাইটের আলো ঘুরছে, সারা পথেই এই রকম আলোর সারি বরাবর রয়েছে। মাঝে মাঝে আলোর সাগর দেখে বুঝলাম সহর পেরিয়ে চলেছি। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত সারা দেশটা জুড়ে একই রকমে এবং সমানভাবে উন্নতি লাভ করেছে। কোন দেশটি বড়, আর কোনটি ছোট বোঝা কঠিন। বেণ্ট বাধার জন্ত আলো জ্বললো Colorado stateএ driver সহরের বিমান ঘাঁটিতে বিমান নামালো। বিমান ঘাঁটিতে বিমান থামলেই যাত্রীদের নামতে হয়। এই প্রথমবার, আমাদের বিমান থেকে নামতে হলো না। এই বিমান ঘাঁটিতে যে রকম আলোর বহর দেখছি তেমন আর কোথাও দেখিনি, যেন দিনকে হার মানাতে চায়। সারা রাত আকাশ পথেই কাটলো। সকালে উঠে জানলায় তাকিয়ে দেখি Rocky Mountainsএর পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়ে চলেছি। চারিদিকে শুধু কাঁকর আর পাথর। এর মধ্যেই Breakfast সাজানো ট্রে দিয়ে গেল ; তাতে রয়েছে একটু ফলের রস, কিছু Cornflake, একটি ডিমের অমলেট, রুটী, মাখন ও এক গেলাস গরম কফি। জানলায় ফিরে দেখি নীচে অসংখ্য পর্ব্বতের চূড়া, কোথাও বা বরফে ঢাকা। মনে হচ্ছে যেন সাগরোত্থিত ফেনিল তরঙ্গমালা নীথর নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে বরফ ছড়ানো, পাশেই নদীগুলি শুকিয়ে সরু কাঁকরভরা পথের মত পড়ে আছে। প্রাণীবাসের পক্ষে একেবারেই অযোগ্য স্থান। একটি তৃণকুটও কোথাও দেখা যায় না। বিমান এত উঁচু দিয়ে যাচ্ছে যে ওভারকোট গায়ে দিয়েও শীত মানে না। তাকের ওপর থেকে কম্বল পেড়ে গা ঢেকে বোসলাম। বেলা প্রায় ১০টায় Californiaর Los Angelesএ বিমান নামলো। T. W. A.এর আরেকটি বিমানে করে বেলা ১টায় San-Fransisco পৌঁছলাম। Sir-Francis Drake Hotelএ পূর্ব্ব থেকেই ঘর রিজার্ভ করা ছিল। San-Fransiscoতে এখন International Rotary Conventionএর খুব চলেছে। তাতে

সান্ ফ্রান্সিস্কোর পথে (উড়ন্ত বিমানের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য)

সানফ্রান্সিস্কো শহর

যোগ দেবার জন্তে দেশদেশান্তরের Rotarianরা এসে সমবেত হয়েছেন। কাল ১ই জুন, Conventionএর উদ্বোধন দিবস। আমরা ঘরে জিনিষ পত্তোর রেখে কিছু আহারাদির পর সোজা Civic Auditorium এ যাবার জন্তে একটি Cb নিলাম। এই Civic Auditorium হ'চ্ছে এদের Town Hall; ভিতরে ঢুকতেই চারিদিক থেকে Rotarianরা এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। নানারকম ভাবে ফোটো তোলার ধুম পড়ে গেল। আমরা Registration Roomএ গিয়ে তিন জনে তিনখানা Rotary Badge নিয়ে চারিদিক ঘুরে দেখতে লাগলাম। এখানে ছোট খাট খুঁটিনাটি থেকে আরম্ভ করে বৃহৎ ব্যাপার পর্য্যন্ত সমস্তই নিখুত ভাবে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। একখানা ডাকটিকিট থেকে আরম্ভ করে এ্যারোপ্লেনের Reservation পর্য্যন্ত সবই এইখানে পাওয়া যায়। মোটের ওপর Civic Auditoriumটি একটি ছোটখাটো সহরে পরিণত হয়েছে।

আমেরিকান জাতির উন্নতির অনেকখানি কারণই হোলো—তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি। প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে একটি নিখুঁত প্ল্যান
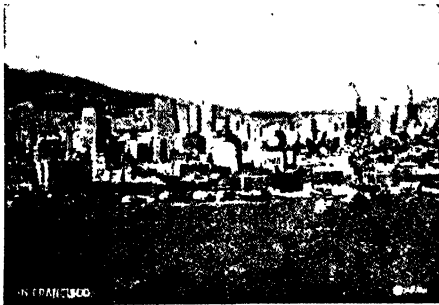
উপসাগর-তীর শহরের দৃশ্য

করা এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে তাকে সুচারুরূপে কার্য্যকরী করে তোলাই হচ্ছে এদের বৈশিষ্ট্য। এই রকম কর্ম্মপদ্ধতি এদের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। গত ৫০ বৎসরে শিক্ষার (Mass Education) ক্ষেত্রে এরা কী উন্নতিই না করেছে। ১৯০০ সালে এদের High Schoolএ ১১ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের ছেলেদের শতকরা ১১ জনের বেশী পড়াশুনা কোরতো না, কিন্তু গত ৪৫ বৎসরের চেষ্টায় আজ শতকরা ৯৩টি High Schoolএ বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হ'চ্ছে এবং প্রত্যেক আমেরিকান সন্তানকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ কর্ত্তে হয়। অবশ্য এই সব ফ্রী স্কুলকে চালু রাখার জন্তে গভর্ণমেন্টকে ট্যাক্স বাড়াতে হয়েছে। ট্যাক্স আমাদের দেশেও বাড়ছে কিন্তু শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে কি? আমেরিকার হাই স্কুলের আর একটি বিশেষত্ব দেখলাম—এই স্কুলগুলো শুধু যে কলেজের জন্ত ছাত্র তৈরী করে তা'নয়; এখানে ছোট ছোট কুটীর শিল্পের ব্যবহারিক শিক্ষার (Vocational Training) বেশ ভাল রকম বন্দোবস্ত আছে। এই High School থেকে বেরিয়ে বেশীর ভাগ ছেলে মেয়েরা নিজেদের জীবনযাত্রার পথ খুঁজে নিতে পারে। আমাদের দেশের মত হাজারে হাজারে ছেলেরা কলেজে যায় না এবং বি-এ, এম-এ পাশ করে ৩০ টাকার কেরাণীগিরির জন্ত উমেদারী কর্ত্তে হয় না। এদের সুশৃঙ্খলিত-কর্ম্ম-পদ্ধতির একটি নমুনা পাওয়া গিয়েছিলো গত যুদ্ধের সময়। যতগুলো High School ছিলো একদিনেই Militay Schoolএ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। যুদ্ধের জন্ত সৈনিক চাই এবং যুদ্ধের উপকরণ তৈরীর জন্ত চাই Trained লোক—তাই High School থেকেই সুরু হ'লো শিক্ষার ব্যবস্থা। Short Term Course করে দিনে এবং রাত্রিতে সমানভাবে চললো, Military Training, Aeronautical Training, Mechanical, Electrical Automobile engineering, Drafting, Blueprint reading, Radio, Public health এবং Home nursing training; যাদের যুদ্ধে যেতে হ'বে তারা
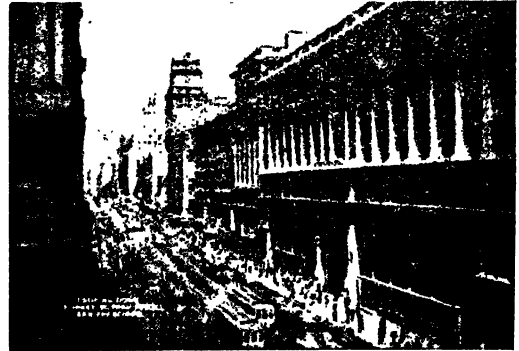
সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরের রাজপথ

তৈরী হ'য়ে গেল এবং যারা দেশ রক্ষার এবং স্বাস্থ্যের ভার নেবে তারাও প্রস্তুত। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এই স্বাধীনতাকে সুষ্ঠু এবং কার্য্যকরী করতে হ'লে আমাদেরও এই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'বে। এ দেশে আর একটি জিনিষও বড় ভাল লাগলো—সেটা হচ্ছে এদের New Progressive School অর্থাৎ ছেলে মেয়েদের Text Bookএর গণ্ডীর ভেতর সীমাবদ্ধ করে না রেখে তাদের নানারকম Problems দেওয়া হয়। যেমন একজনকে দেওয়া হ'লো "কি করে একটি ছোট দোকান তৈরী করতে হবে" সে সম্বন্ধে ব্যবহারিক দিক থেকে যা যা দরকার সব কিছু সন্ধান করে শিক্ষালাভ করা। পরে হয়ত এই ছেলেই আমাদের Army Navy কিংবা Hall & Anderson এর মত একটা মস্ত বড় দোকান করতে পারবে। অন্য একজনকে হয়ত দেওয়া হ'লো যে কি করে একখানা বই Publish করতে হয়, এ রকম বহু ছোট ছোট জিনিষের ভেতর দিয়ে ছাত্রদের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়; জীবন যাত্রার একটি নির্দ্দিষ্ট পথের সন্ধান তারা পায়। হাই স্কুলে আসর সময় বয়স্কদের শিক্ষার জন্ত নানা প্রয়োজনীয় বিষয় দিয়ে

Lecture দেয়া হয়। ছোট ছোট সহরের স্কুল গুলিতে স্থানীয় লোকদের পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা পাবার জন্তে Parent Teacher's Association আছে। স্কুলএর কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে এদের অনেকটা হাত থাকে।

৯ই জুন। সকালে Breakfast এর পর Street Carএ করে সমুদ্র তীরে গেলাম। San Fransisco পাহাড়ে জায়গা, সহরের সর্ব্বত্রই উঁচু নীচু। কয়েকটি রাস্তা খুবই খাড়াই; এত খাড়া রাস্তার ওপর দিয়ে ট্রাম চলতে দেখলে মনে হয় এখনি বুঝি পড়ে যাবে. এ সব রাস্তায় হেঁটে চলাই দায়। রাস্তাগুলি ধাপে ধাপে ওপর থেকে নীচে বহুদূর পর্য্যন্ত নেমে গেছে—দেখতে ঠিক যেন সিঁড়ির ধাপের মত। রাত্রে আলো জ্বললে রাস্তাগুলি দেখতে বড় সুন্দর লাগে। এ দেশে অধিকাংশ অধিবাসীই হ'ল Spain দেশের লোক। রংবেরং এর টালি দেওয়া নক্সা করা ঢালু ছাদের রঙিণ কুটীরগুলি Spanish শিল্পেরই নিদর্শন সবুজ মাঠের মাঝে নানা রঙের ফুল ফুটেছে, আর তার মধ্যে এই রঙিণ Spanish বাড়ীগুলি বেশ মনোরম দেখাচ্ছে। সারা দেশটাই যেন ফুলের বাগান। এমন রংএর ছড়াছড়ি আমি আর কোথাও দেখিনি। california নাতিশীতোষ্ণ দেশ। এখানকার আকাশ অতি স্নিগ্ধ ও মধুর। লোক সংখ্যা এদেশে বেশী নয়। আমেরিকার দুই দিকের এই দুই সমুদ্র উপকূলের আবহাওয়া. জলবায়ু ও মানুষের জীবন যাত্রা একেবারেই বিপরীত ও ভিন্ন রকমের। অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরের তীর বড় বড় সহর ও বন্দরে ভরে গেছে। এই দিকেই সকল ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রধান আড়ত। ইংরেজ সর্ব্বপ্রথম এই পূর্ব্ব দিকে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো। আজ সেই সব স্থানেই Sky Scraper এর সারি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমে এই বিশাল পার্ব্বত্য অঞ্চলটি থাকায় পূর্ব্বপশ্চিম সংযোগের বিশেষ ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব্বের মত পশ্চিম তীর মহানগরীর কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে ওঠেনি। শিল্প সম্ভারেও এদেশগুলি ততোধিক সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠতে পারেনি।
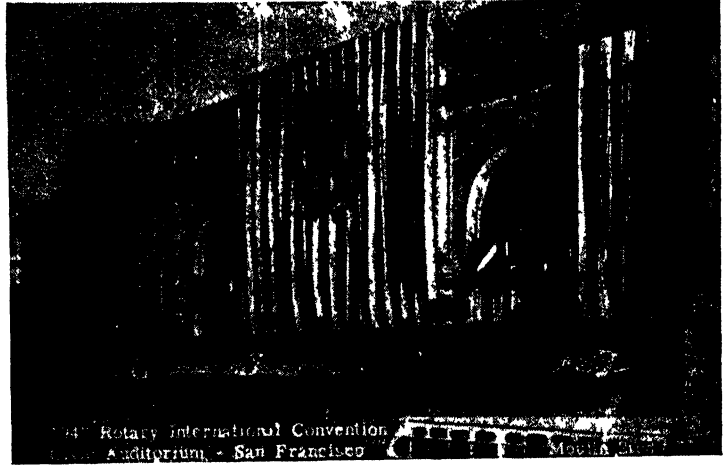
সান্ ফ্রান্সিকো টাউনহল (Civic Aditorium)

(১৯৪৭ সালের International Rotary Convention উপলক্ষে সর্ব্বজাতির পতাকা সজ্জিত)

(ক্রমশঃ)

ভয়

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

কিশলয় কহে ডাকি' স্নিগ্ধ মৃদু স্বরে
ভূপতিত ধূলিম্লান জীর্ণ পত্রটিরে:
"জননীর কোল ছাড়ি' গেছ বহু দূরে—
অগ্রজ আমার তুমি; কৌমুদী শিশিরে
অরুণ আলোকস্নানে পবন হিল্লোলে
নাহি তব প্রয়োজন। নবমঞ্জরীরে
বিকাশের অবকাশ দিয়া কুতুহলে
মিশিছ মৃত্তিকাসনে অতি ধীরে ধীরে…
আমার সেবায় রত সন্তানবৎসলা
জননী প্রকৃতি; আমি অতি পুলকিত;
তবু কোথা' হ'তে আসি' গভীর উতলা
একটি নিঃশ্বাস মোরে করে চমকিত!—
তোমরা যেতেছ আর গিয়েছ যেখানে
আমি কি চলেছি সেথা প্রবাহের টানে!"
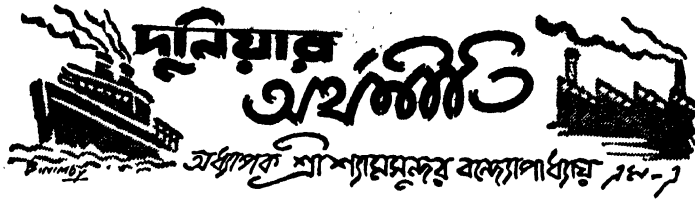
অর্থসদস্যের পদত্যাগ

মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দুইজন সদস্য পদত্যাগ করিলেন। গত এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করিয়াছিলেন বাণিজ্য সদস্য মিঃ সি এইচ ভাবা এবং আগষ্ট মাসে অর্থ সদস্য মিঃ সমুখম চেট্টি পদত্যাগ করিয়াছেন। শাসনব্যবস্থায় বাণিজ্য এবং অর্থ দুইটিই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, কাজেই এই দুইজন সদস্য উপর্য্যুপরি পদত্যাগ করায় সারা দেশে একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া দেখা দিয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা মিঃ ভাবা বা মিঃ চেট্টি দুজনের কেহই কংগ্রেসের লোক নন, মন্ত্রীসভাকে শক্তিশালী এবং প্রতিনিধিমূলক করিবার উদ্দেশ্যে যোগ্যতর ব্যক্তি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ইহাদের দুজনকেই আহ্বান করিয়াছিলেন। উভয়েই প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, অল্পদিন কাজ করিলেও দুজনেই কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্য হিসাবে নানাভাবে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, কাজেই ইহারা পদত্যাগ করায় কেন্দ্রীয় সরকার যেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা হইতে অকংগ্রেসী দুইজন বিশিষ্ট সদস্য সরিয়া আসায় মন্ত্রীসভার গৌরবও তেমনি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইল।

মিঃ ভাবার সময় অবাঞ্ছিত পারমিট প্রদান ইত্যাদি কতকগুলি গোলমেলে ঘটনার গুজব শুনা গেলেও শেষপর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি বাণিজ্য সদস্যের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ চেট্টির ব্যাপারটা কিন্তু স্বতন্ত্র। স্বেচ্ছাকৃত না হইলেও মিঃ চেট্টির কাজে একটি মারাত্মক ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের কংগ্রেসী সদস্যদের দাবীতে একরূপ বাধ্য হইয়াই মিঃ চেট্টি পদত্যাগ করিয়াছেন।

গত ১৩ই আগষ্ট পার্লামেন্টের কংগ্রেসী সদস্যেরা একটি পার্টি মিটিংয়ে মিঃ সমুখম চেট্টির কার্য্যের কঠোর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। ইহার দুইদিন পরে, অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট মিঃ চেট্টি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নিকট তাঁহার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলে প্রধানমন্ত্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইহা গ্রহণ করেন এবং ১৬ই আগষ্ট সরকারী-ভাবে অর্থ সদস্যের পদত্যাগ পত্র পেশের ও প্রধানমন্ত্রী কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইবার সংবাদ প্রকাশিত হয়।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ চেট্টি যখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট প্রস্তুত করিতেছিলেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে বাজেট ফাঁসের একটি গুরুতর অভিযোগ কোন কোন মহলে শোনা গিয়াছিল। এই শ্রেণীর অভিযোগের জন্যই ইংলণ্ডের জনপ্রিয় অর্থসচিব ডাঃ হিউ ডালটনকে সম্প্রতি পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। তখন যদি এইরূপ অভিযোগ সপ্রমাণিত হইয়া মিঃ চেট্টিকে অবসর গ্রহণ করিতে হইত, তাহাতে বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার কিছু থাকিত না। সেবার ভারত-সরকার এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করেন নাই এবং ভারতীয় পার্লামেন্টেও ইহা লইয়া উল্লেখযোগ্য হৈ চৈ হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত মনে হইয়াছিল মিঃ চেট্টিকে হয়তো লোকে মিথ্যাই বাজেট ফাঁসের জন্য দায়ী করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছিল না; দায়িত্ব থাকিলে এত বড় ব্যাপারে একটা বড় রকমের গোলমাল অবশ্যই হইত।

এবার মিঃ চেট্টির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহার আইনগত ভিত্তি অপেক্ষা নৈতিক ভিত্তি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ চেট্টি স্বয়ং বিবৃতি দিয়া এই অভিযোগের যথার্থতা মানিয়া লইয়াছেন, তবে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে কাজটি যখন তিনি করেন তখন ইহার নৈতিক দায়িত্বের কথা তাঁহার মনে হয় নাই। এইরূপ বিস্মৃতি অস্বাভাবিক নয়, তবে যে উপলক্ষে এই বিস্মৃতিটি ঘটিয়াছে তাহার গুরুত্ব অত্যধিক বলিয়া শুধু দুঃখপ্রকাশেই ইহার সমাপ্তি ঘটে নাই।

ঘটনাটি আয়কর সংক্রান্ত এবং ইহার সহিত ভারতসরকারের বিরাট আর্থিক স্বার্থ ঘনিষ্টভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে মিঃ চেট্টির অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে ভারতসরকারের বহু টাকা ফাঁকি পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল এবং এই ফাঁকি দিবার সুযোগ যাঁহারা পাইতেছিলেন তাঁহারা এদেশের ধনকুবের শ্রেণীর লোক। বলা নিষ্প্রয়োজন, এখনকার ফাঁপা টাকার বাজারে এইভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিরা যদি গভর্ণমেন্টের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দিবারও সুযোগ পান, তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির অসুবিধা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে এবং ফলে দেশের অসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইবে। রাজনৈতিক মুক্তি সম্পাদনের সহিত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্পাদনও কংগ্রেসের লক্ষ্য। এমনি বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের জন্য বর্ত্তমানে কংগ্রেস এই আদর্শনিষ্ঠার বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারিতেছে না, ইহার উপর কংগ্রেসী সরকারের আমলে সরকারী অব্যবস্থায় যদি বড়লোকেরা অবশ্য প্রদেয় কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পায়, তাহাতে সারা দেশে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এইজন্যই ব্যক্তিগতভাবে মিঃ চেট্টির অনুরাগী হইয়াও অনেক কংগ্রেস সদস্য অর্থসদস্যের অমনোযোগিতাজনিত ত্রুটির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চাপে পড়িয়া অর্থসদস্যকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

ঘটনাটি নিম্নরূপ :—

যুদ্ধের সময় এদেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ঘটায় একশ্রেণীর লোক সেই সুযোগে কল্পনাতীত মুনাফা লুটিতে থাকেন। তখন আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফাকর যে হারে আদায় করা হইত, তাহাতে সরকারের

প্রকৃত পাওনা মিটাইয়া দিলে বাস্তবিকই এইসব মুনাফাভোগীদের পক্ষে বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছান সম্ভব হইত না। ইহাদের জন্যই দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ এত বাড়িয়া গিয়াছে। টাকার জোরে ইহারা সরকারী রাজস্ববিভাগকে ফাঁকী দিয়া বহু ন্যায্য করপ্রদানের দায়িত্ব এড়াইয়া যান। পণ্ডিত নেহেরুর পরিচালনায় ভারতে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে এইসব প্রবঞ্চনাকারীর সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠে এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট অধিবেশনে একটি আয়কর তদন্ত কমিশন (Income-Tax Investigation Commission) গঠনের ব্যবস্থা হয়। স্থির হয় যে, এই কমিশন ট্যাক্স ফাঁকিদারদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ বিবেচনা করিবেন, এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইবে। এই কমিশন গঠনের ব্যবস্থা হওয়াতেও বিশেষ কাজ হইল না, কারণ তদন্ত কমিশন সংক্রান্ত বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইবার ফলে কমিশনের ক্ষমতা ও কার্য্যকলাপে নানা সঙ্কোচনের ব্যবস্থা হইল। যাহা হউক, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতের অনেকগুলি নামজাদা ধনীর বিরুদ্ধে কমিশনের নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। কমিশনের তদন্ত চলিতেছিল এমন সময় গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তদন্ত কমিশনের নিকট উপস্থাপিত কতকগুলি অভিযোগ আইনগত অসুবিধার জন্য ভারতসরকার তুলিয়া লইবেন। এইভাবে আইনের প্রশ্ন তুলিয়া সন্দেহজনক ব্যক্তিকে রেহাই প্রদান যে দেশবাসীর কাছে বিসদৃশ ঠেকিবে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ গুজব রটিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের নানাদিক হইতে প্রতিবাদ উঠে। ইহার পরই অর্থসদস্য মিঃ চেট্টি ১লা মার্চ্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে আয়কর তদন্ত কমিশন সংশোধন সম্পর্কে একটি বিল আনেন এবং এই বিলে বলা হয় যে, আয়কর তদন্ত কমিশনের নিকট অভিযুক্ত কোন লোকের নাম তালিকা হইতে বাদ দিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে কমিশনের সম্মতি লইতে হইবে। অর্থসদস্যের এই সংশোধনী প্রস্তাব দেশব্যাপী বিক্ষোভ যে সর্ব্বাংশে বিদূরিত করে তাহা না বলিলেও চলিবে। প্রকৃতপক্ষে এই সংশোধনী বিল আনিয়া মিঃ চেট্টি দেশবাসীর ধন্যবাদভাজনই হইয়াছিলেন এবং সকলেই আশা করিয়াছিল যে, পাছে অভিযুক্ত ধনকুবেররা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া রেহাই পাইবার বন্দোবস্ত করে, তজ্জন্যই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থসদস্য এই বিলটি উপস্থাপিত করিয়াছেন।

সংশোধনী বিলটি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করিবার সময় মিঃ চেট্টির মনে অবশ্যই সদিচ্ছা ছিল, কিন্তু এই বিল আনিবার পর তিনিই এ সম্পর্কে একটি মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিলেন। আগেই বলা হইয়াছে, ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি গুজব শুনা গিয়াছিল সরকার কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনের অসুবিধার জন্য মুক্তি দিবেন। এই গুজব সত্যে পরিণত হইল এবং অর্থসদস্য মিঃ চেট্টি হঠাৎ ১২ই মার্চ্চ এইরূপ কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তিপ্রদানের নির্দ্দেশ দিয়া বসিলেন। ১লা মার্চ্চ পার্লামেন্টে তাঁহার আনীত সংশোধনী বিলে বলা হইয়াছে যে, তদন্ত কমিশনের অনুমতি না লইয়া অভিযুক্ত কাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে না, আবার ১২ই মার্চ্চ তিনিই একমাস আগেকার সংকল্প অনুসারে কয়েকজন অভিযুক্তকে মুক্তিপ্রদানের নির্দ্দেশ দিলেন—তাঁহার ন্যায় দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ কাজ অবশ্যই অশোভন এবং অসঙ্গত। ইহার উপর যাহারা মিঃ চেট্টির নির্দ্দেশে মুক্তি পাইলেন তাঁহারা প্রসিদ্ধ ধনী এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহাদের কাহারও কাহারও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া শুনা যায়। বলা বাহুল্য, এইরূপ ধনী ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিযুক্ত হইয়াও আইনের ফাঁকে বিনা বিচারে মুক্তি পাইলে কংগ্রেসী সরকারের সুনাম সম্পর্কে লোকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিতে পারে। ভারতীয় পার্লামেন্টের কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দও ব্যাপারটিকে এই দিক হইতে বড় করিয়া দেখিলেন। কোন বিলের আইনগত মর্য্যাদা নাই এ কথা সত্য, কিন্তু অর্থসদস্য স্বয়ং যে বিল আনিয়াছেন, বিল পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হইয়া সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইবার পর সিলেক্ট কমিটির সহিত পরামর্শ না করিয়া তাঁহার পক্ষে সেই বিলের বিপরীত কাজ করা একান্ত অস্বাভাবিক। মিঃ চেট্টিও এই অস্বাভাবিকত্ব স্বীকার করায় অবস্থার গুরুত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ চেট্টির উক্তিতে প্রকাশ, তদন্ত কমিশনের নিকট অভিযুক্ত কয়েকজনের অভিযোগ প্রত্যাহারের সময় তিনি এই অভিযোগ উত্থাপন সম্পর্কিত সুবিধা অসুবিধার কথাই ভাবিয়াছিলেন, সংশোধনী বিলের নৈতিক দায়িত্বের কথা তাঁহার খেয়াল হয় নাই। এই অসাবধানতাটুকুর জন্যই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইল।

কংগ্রেসের সুনাম রক্ষার জন্য তাঁহার পদত্যাগের প্রয়োজন হইয়াছে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য, তথাপি মিঃ চেট্টির ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির মন্ত্রীসভা হইতে অপসারণে আমরা গভীর দুঃখিত হইয়াছি। স্বাধীন শিশু রাষ্ট্রকে সসম্মানে বাঁচাইয়া রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাহাতে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার সময়কার হৃদয়াবেগ বা আন্তরিকতাই বড় কথা নয়, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাও সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। এ হিসাবে কংগ্রেস সরকারে মিঃ চেট্টির স্থান লাভে অনেকেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। মিঃ চেট্টির অতীত নিষ্কলঙ্ক নয়, ব্রিটিশ স্বার্থসংরক্ষক ভারত সরকারের তাঁহার প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ ছিল এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কুখ্যাত অটোয়া চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষরকারী হিসাবে ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যিক বাণিজ্য সুবিধাদানে সম্মত হইয়া তিনি এদেশের ক্ষতিই করিয়াছিলেন। তবু অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাহার পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। ষ্টার্লিং চুক্তির ব্যাপারে তাঁহাকে নানা বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে তথাপি তিনি খাস লণ্ডনে বসিয়া ধুরন্ধর ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সহিত যে ভাবে বোঝাপড়া করিয়া ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য অভিজ্ঞ মহলে তাঁহার সুনাম হইয়াছে। (ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে আমার 'ষ্টার্লিং চুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যুগে এখন ভারত সরকারে তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য

ব্যক্তির প্রয়োজন যথেষ্ট। এই সঙ্কটজনক সময়ে অর্থসদস্য মিঃ চেট্টির পদত্যাগ সত্যই দুঃখের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলিয়া পারা যায় না যে, যে ব্যাপারে মিঃ চেট্টি পদত্যাগ করিলেন তজ্জন্য পদত্যাগ করিতে তিনি ঠিক বাধ্য ছিলেন না। ১৩ই আগষ্ট কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্য তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, কিন্তু পার্টি মিটিংয়ে তাঁহারা যাহাই করুন, ভারতীয় পার্লামেন্টে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনীত হয় নাই। পার্লামেন্টে সংশোধনী বিল উপস্থাপিত করিবার পর সেই বিলকে অমর্য্যাদা করা যত অশোভনই হউক, বিল বিলই, আইন নয়, তাহা না মানিলে দেখিতে শুনিতে খারাপ হইলেও তজ্জন্য শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা করা যায় না। ইহা সত্ত্বেও কাজটা ভাল হয় নাই, ইহা মিঃ চেট্টি নিজেই যখন স্বীকার করিলেন, তখন এই ক্রটির জন্য পদত্যাগ শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তিনি গভীর আত্মমর্য্যাদারই পরিচয় দিয়াছেন। যে কংগ্রেস সরকারে তিনি একজন মন্ত্রী, তাহার সুনাম রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। কংগ্রেস সরকারের জনপ্রিয়তা সংরক্ষণে সাহায্য করিয়া মিঃ চেট্টি আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহাকেই প্রকৃত "খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি" বলে।

ভারতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় পণ্যোৎপাদনবৃদ্ধি। ভারতবর্ষে যুদ্ধোত্তরকালে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, কাজেই এখন পণ্য উৎপাদন বাড়াইবার দিকে অধিকতর দৃষ্টি না দিলে যোগান ও চাহিদার অসামঞ্জস্য থাকিবার ফলে পণ্যমূল্য কিছুতেই নামিবে না এবং জনসাধারণের দুঃখদুর্গতি কমিবে না। বলা বাহুল্য, এই পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই একটি সুশৃঙ্খল উৎপাদন-ব্যবস্থা। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থায় কিছুতেই শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতেছে না। মালিকদের ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছা এবং স্বার্থপরতা, শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান অভাবজনিত নিরুৎসাহবোধ, সরকারী পরিকল্পনার অভাব, রাজনৈতিক স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি নানা কারণে ভারতীয় শিল্পজগতে বর্ত্তমানে একটা আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

শ্রমিকদের অসন্তোষের জন্যও ভারতীয় শিল্পের কম ক্ষতি হইতেছে না। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দেও শ্রমিক অসন্তোষ ভারতীয় শিল্পের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছিল, সেবারও বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা বোম্বাই, বাউড়িয়া-চেঙ্গাইল লিলুয়া, জামসেদপুর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে কয়েকটি বড় বড় ধর্ম্মঘট করিয়াছিল; কিন্তু সেবার সেই অশান্তি অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয় এবং সারা ভারতে তাহা ছড়াইতে পারে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এখন কিন্তু অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এখন ধর্ম্মঘটাদি হইতেছে সারা ভারতের নানা কারখানায় এবং এজন্য অত্যধিক কাজের দিন নষ্ট হইয়া বর্ত্তমান পণ্যাভাবের দিনে নিদারুণ উৎপাদনহানি ঘটাইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে, সেই বৎসর ভারতে মোট ৪০৬টি ধর্ম্মঘট হয় এবং তজ্জন্য মোট ৪৯,৯২,৭৯৫টি কাজের দিন নষ্ট হয়। যুদ্ধের সময় কতকটা আইনের কড়াকড়ির জন্য এবং কতকটা শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্ট থাকায় ধর্ম্মঘটাদির সংখ্যা কিছু কমে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মোট ৩৫৯টি ধর্ম্মঘট হয় এবং তজ্জন্য কাজের দিন নষ্ট হয় ৩৩,৩০,৫০৩টি। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর হইতেই এদেশে শ্রমিক বিক্ষোভ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মোট ৬৫৮টি ধর্ম্মঘটে ৩৪, ৪৭, ৩০৬টি কাজের দিন নষ্ট হয়, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮২০টি ধর্ম্মঘটে ৪০, ৫৪, ৪৯৯টি কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থা আরও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। এই দুই বৎসরে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা যথাক্রমে ১,৬২৯ ও ২,২৫১ এবং তজ্জন্য নষ্ট কাজের দিনের সংখ্যা যথাক্রমে ১,২৭,১৭,৭৬২ ও ১,৬৫,৪৪,৬৬৬। বর্ত্তমান ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থার যে উন্নতি হইবে এমন কোন আশা দেখা যাইতেছে না। এ বৎসর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এই দুই মাসে ভারতে ২৪২টি ধর্ম্মঘটে মোট ১১,৮৬,৯০৫টি কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। কংগ্রেস জনগণের প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসী সরকারের আমলে এই ক্রমবর্দ্ধমান বিরাট শ্রমিক বিক্ষোভ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিয়া অনতিবিলম্বে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ ভারতবর্ষকে উন্নত করিয়া তুলিতে না পারিলে স্বাধীন ভারত পৃথিবীতে উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভে কিছুতেই সক্ষম হইবে না, এ সময় জাতীয় শিল্পপ্রগতির পরিপন্থী এই শ্রমিক বিক্ষোভ বন্ধ করিতে কংগ্রেস সরকারের সক্রিয় একটি বলিষ্ঠ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।*

---

* এই প্রবন্ধের সংখ্যাগুলি 'দি ইণ্ডিয়ান' লেবার গেজেটের এপ্রিল সংখ্যা হইতে গৃহীত।

(প্রবন্ধটি আশ্বিনের ভারতবর্ষের জন্য লিখিত, কিন্তু স্থানাভাবে আশ্বিনে প্রকাশিত হয় নাই।) ৩০।৮।৪৮

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

মাধবেন্দ্র পুরী হেরে অপূর্ব্ব স্বপন,
শিয়রে বসিয়া যেন গোপিকারমণ,
কহিছে মধুর স্বরে,
"মাধবেন্দ্র মোর তরে—
মলয়-চন্দন আনো নীলাচল হ'তে,
এ অঙ্গের তাপ নাহি যায় কোন মতে।"

শুনি' মাধবেন্দ্র পুরী চলে নীলাচলে,
রেমুণায় উপনীত ভ্রমি' কুতূহলে।
অযাচিত বৃত্তি তাঁর,
না মিলিলে অনাহার,
অপার আনন্দে মগ্ন, রত হরিপদে,
সতত বিরাজে কৃষ্ণ চিত্ত-কোকনদে।

রেমুণায় গোপীনাথ দেখিতে সুন্দর,
নানা উপাচারে ভক্ত পূজে নিরন্তর।
গোপীনাথ সেবাতরে—
অতি স্বাদু ক্ষীর করে;
জানিল সকল তত্ত্ব পূজারীর কাছে,
শুনি' আনন্দিত সাধু প্রেমানন্দে নাচে।

সহসা উদিল মনে অপূর্ব্ব বাসনা,
ক্ষীর স্বাদ পেলে করি শ্রীভোগ রচনা!
ভোগাকাঙ্খা নাহি যাঁর
একি তাঁর ব্যবহার?
ক্ষীর-স্বাদ পেতে চায় মাধব গোসাঞি,
বৈষ্ণবের এ কামনা নিন্দিত সদাই।

এত ভাবি' মাধবেন্দ্র গেল দূর বাটে,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে হাট তেপান্তর মাঠে।
করিল গ্রহণ শয্যা,
অন্তরে দারুণ লজ্জা—
"গোপীনাথ ক্ষম' মোরে অপরাধ হ'লে,
চিরদিন চিরকাল রব পদতলে।"

এদিকে পূজারী দেখে নিশীথে স্বপন,
গোপীনাথ কহে, "মোর ভক্ত একজন
মাঠে রয় অনাহারে,
ক্ষীর দিয়া এস তারে,
পূজার বেদীর মধ্যে রেখেছি লুকায়ে
ধন-পুষ্প অন্তরালে অঞ্চলের ছায়ে।

ক্ষীর লয়ে যাও যেথা মাধবেন্দ্র পুরী
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে করিয়াছি চুরী।
ক্ষীর ভাণ্ড লয়ে যাও,
সাধুরে প্রসাদ দাও—
মোর অতি প্রিয়জন ক্ষীর স্বাদ যাচে,
ক্ষীর ভাণ্ড লয়ে যাও হাটে তাঁর কাছে।"

স্বপন ভাঙ্গিয়া গেলে পূজারী উঠিয়া
দেখে গোপীনাথ রাখে ক্ষীর লুকাইয়া!
লয়ে ক্ষীর ভাণ্ড হাতে,
চলিল নিশীথ-রাতে,
অনাহারে মাধবেন্দ্র পুরী আছে মাঠে,
জনহীন তেপান্তরে শূন্য ভাঙ্গা হাটে।

সুধাইল হাটে গিয়া কোথায় গোসাঞি
তোমা সম গোপীনাথ ভক্ত আর নাই।
নিজে ক্ষীর চুরি করে,
পাঠাইল তব তরে,
হে গোসাঞি, আনিয়াছি ক্ষীর ভাণ্ড বয়ে,
আমারে নিস্কৃতি দাও এই ক্ষীর লয়ে।"

হেথা মাধবেন্দ্র পুরী ভাবি' অপরাধ,
বারম্বার গোপীনাথে স্মরে, অকস্মাৎ
শুনিল কে নাম ধরে,
ক্ষীর ভাণ্ড লয়ে করে,
উপনীত হাটে, ডাকে উচ্চকিত স্বরে,
(গোপীনাথ জয়গান বাজে মনোপুরে!)

কহিল, "কে তুমি? আমি হেথায় মাধব,
কেন ডাকিতেছ মোরে? কহ বার্ত্তা সব।"
শুনি' সব বিবরণ,
হায় হায় করে মন!
ধন্য হে পূজারী তুমি শুনেছ আদেশ,
আমি শুধু ক্ষীর পেনু, হা কৃষ্ণ রাকেশ!

ধন্য মাধবেন্দ্র পুরী তোমার কাহিনী,
লিখিয়া হইনু ধন্য, নারায়ণ বিনি—
তিনি ক্ষীর চুরি করে,
মাধবেন্দ্র তব তরে!
স্মরণে কৃতার্থ হনু মাধব গোসাঞি,
তব কৃপা-কণা যেন চিরদিন পাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বহির্ভারতে ও ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লবের প্রস্তুতি এইভাবে চলিতেই লাগিল। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গেলেও তাহা সমূলে বিনষ্ট হইল না। ২১শে ফেব্রুয়ারীর বিদ্রোহ সম্পর্কে রাসবিহারীর সহিত বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েরও বার কয়েক যুক্তি পরামর্শ হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ তখন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী-নেতা।

নদীয়া জেলার কয়া গ্রামে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১২৮৬ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ) তাঁহার মাতুলালয়ে যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল যশোহর জেলার বিনখালি নামক গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া যতীন্দ্রনাথ তাঁহার মাতুলালয়েই লালিত-পালিত হন।

কৃষ্ণনগর এ-ভি স্কুল হইতে ১৮৯৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কিছুদিন কলিকাতার সেণ্ট্রাল কলেজে এফ-এ পড়িয়াছিলেন। খেলা-ধূলায় যতীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল প্রচুর এবং নানা শ্রমসাধ্য কার্য্যে তিনি পটু ছিলেন। একবার তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া গেলে তিনি নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার মানসে কুস্তীর আখড়ায় ভর্ত্তি হইয়াছিলেন এবং নিয়মিত শরীরচর্চ্চার দ্বারা অমিত শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ-রাইটিং শিখিয়া তিনি কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার একটি সাহেবী সওদাগরী অফিসে মাসিক ৫০৲ বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি মজঃফরপুরে যান এবং সেখানে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার কেনেডি সাহেবের (যাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হইয়াছিলেন) অধীনে ষ্টেনোগ্রাফার হিসাবে মাসিক ৮০৲ বেতনে কাজ করিতে থাকেন। পরবর্ত্তীকালে বাংলা গভর্ণমেণ্টের ষ্টেনোগ্রাফার হইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের ষ্টেনোগ্রাফার হিসাবে কাজ করিবার সময় তাঁহাকে কলিকাতা ও দার্জ্জিলিং উভয় স্থানেই থাকিতে হইত। যতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয় এই সময় হইতেই। ১৯০৩ সালে যতীন্দ্রনাথ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের অদ্ভুত শারীরিক শক্তি ও সাহস ছিল। একবার তিনি যখন দার্জ্জিলিং যাইতেছিলেন, তখন শিলিগুড়ি ষ্টেশনে এক গ্লাস জল লইয়া আসার সময় চারিজন গোরা-সৈন্য তাঁহাকে স্বেচ্ছায় ধাক্কা দেয় এবং ইহার ফলে তাঁহার হস্তধৃত কাচের গ্লাসটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ যখন তাহাদের আচরণের প্রতিবাদ করিলেন, তখন একযোগে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনিও বাধ্য হইয়া তখন প্রতি-আক্রমণ করিলেন। সৈন্যদের একজন ছুরি বাহির করিয়া হঠাৎ এক সময় তাঁহাকে আঘাত করিয়া বসিল—কিন্তু ইহাতেও তাহারা যতীন্দ্রনাথকে কাবু করিতে পারিল না। বাংলার বীর-সন্তান শূন্য হস্তে একাকী লড়াই করিয়াই একে একে চারিজনকেই ধরাশায়ী করিলেন। ইহা লইয়া গোরা চারিজন যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পরে আদালতে মামলা রুজু করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলা প্রত্যাহার করিয়া লয়।

একবার একটি অল্পবয়স্ক বালক পথে খেলা করিবার সময় একটি চানাচুরওয়ালার সহিত তাহার ধাক্কা লাগিয়া যায় এবং তাহার ফলে সকল চানাচুর রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে। চানাচুরওয়ালা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ছেলেটিকে প্রহার করিয়া আরও নানাবিধ উপায়ে তাহাকে পীড়ন করিতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ সেই সময় সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। ঘটনাটি অবগত হইয়া তিনি চানাচুরওয়ালাকে বলিলেন ছেলেটিকে ছাড়িয়া দিতে এবং চানাচুরওয়ালার কথামত তাহার চানাচুরের মূল্য পাঁচ টাকা দিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিলেন। লোকটি তবুও ছেলেটিকে ছাড়িয়া না দিয়া যতীন্দ্রনাথের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। একজন সাহেবও সেই সময় সেখানে আসিয়া চানাচুরওয়ালার পক্ষ লইল। যতীন্দ্রনাথ তখন জোর করিয়া চানাচুরওয়ালাটির নিকট হইতে ছেলেটিকে

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)

ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন। সাহেবটি ইহাতে খাপ্পা হইয়া যতীন্দ্রনাথের উপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিল, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিল যে ঠাঁই বড় কঠিন। যতীন্দ্রনাথ তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন।

কয়াগ্রামের নিকটে একটি গ্রামে একবার বাঘের উপদ্রব হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথের মামাতো ভাই বন্দুক লইয়া গিয়াছিলেন বাঘ শিকার করিতে—যতীন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে কেবলমাত্র একখানি ভোজালি ছিল। বাঘটিকে বাহির করিবার জন্ত সঙ্গের লোকজন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের জঙ্গলে গিয়া চারিদিকে তাড়া দিতে লাগিল। বাঘটিও তাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল—যতীন্দ্রনাথ যেদিকে ছিলেন সেই দিকেই। তাঁহার মামাতো ভাই বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন, কিন্তু তাহাতে বাঘটি সামান্ত আহত হইল মাত্র। গুলির শব্দে ও আঘাতে বাঘটি আরও ক্ষেপিয়া গেল এবং যতীন্দ্রনাথকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। সেই সঙ্কটজনক মূহূর্ত্তেও তিনি সাহস হারাইলেন না। কৌশলে তিনি ব্যাঘ্রের মস্তকটি নিজের বাম বগলে চাপিয়া ধরিলেন এবং ভোজালি দ্বারা উপর্য্যুপরি তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে যতীন্দ্রনাথ পড়িয়া গেলে বাঘটি কামড়াইয়া ও নখ বসাইয়া তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। নিজের গুরুতর আঘাত অগ্রাহ্য করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ কোনও রূপে বাঘটিকে নিহত করিলেন। মৃতপ্রায় যতীন্দ্রনাথকে বহুদিন শয্যাশায়ী থাকিয়া বহু চিকিৎসায় অতি কষ্টে আরোগ্য লাভ করিতে হইয়াছিল।

তাঁহার এই ব্যাঘ্র-নিধন এবং অসাধারণ শৌর্য্য-সাহসের জন্তই তিনি সকলের নিকট "বাঘা যতীন" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এবং অরবিন্দ-প্রবর্ত্তিত বিপ্লব-পন্থার সহিত যতীন্দ্রনাথের ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সামশুল আলমকে হত্যার পর বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত পুলিশের নিকট যে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহাতে সে জানায় যে, হত্যার উদ্দেশ্তে যতীন্দ্রনাথের দ্বারাই সে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার ফলে ১৯১০ সালের ২৭শে জানুয়ারী যতীন্দ্রনাথ পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হইলেন। মার্চ্চ মাসে. যতীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্র রায়), সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ৫০ জনের বিরুদ্ধে হাওড়া ষড়্‌যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইল।

গ্রেপ্তার হইয়া তাঁহাদের সকলকে বৎসরাধিককাল জেল হাজতে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ও নির্য্যাতনের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছিল। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ এই সময় যতীন্দ্রনাথের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া ভয় দেখাইয়া স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করিত। একদিন একজন ফিরিঙ্গী পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার স্বীকারোক্তি লাভের আশায় তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইল,—"You will get fine girls and best wines." ইহা শুনিয়া যতীন্দ্রনাথ তাহাকে থামিতে বলিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলে ক্রোধে এরূপ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে টেবিলটির নাকি কিয়দংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে পুলিশের স্বীকারোক্তি আদায়ের উৎসাহ কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

এই কঠোরতার মধ্যেও কিন্তু স্নেহপ্রবণ যতীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত পুলিশের নিকট যতীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার কাছে কেহ কিছু বলিতে আসিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। বীরেন্দ্রনাথের কথা তাঁহার মনে পড়িলেই তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক, পরিণামে হাওড়া ষড়্‌যন্ত্র মামলা ফাঁসিয়া যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই মুক্তিলাভ করেন (এপ্রিল, ১৯১১)।

যতীন্দ্রনাথ মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সরকারী চাকুরী আর রহিল না। জীবিকানির্ব্বাহের জন্ত তখন তাঁহাকে কন্‌ট্রাক্টরী ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইল। এই কার্য্যের সংস্রবে তাঁহাকে নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় প্রায়ই যাতায়াত করিতে হইত। পুলিশের গুপ্তচরগণ প্রায়ই ঘুরিত তাঁহার পিছনে পিছনে, কিন্তু তথাপি এই ভ্রমণ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে নানা ব্যক্তি ও সভা-সমিতির সংস্পর্শে আসিয়া নানা কার্য্যে যোগদানের সুযোগ-সুবিধা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর গুলিতে এই সময় একদিন এক গুপ্তচর আহত হইল।

হাওড়া ষড়্‌যন্ত্র মামলায় যতীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রধান আসামী। বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সদস্তেরা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এই মামলাতে। যতীন্দ্রনাথ প্রধান আসামীরূপে স্থাপিত হওয়ায় এবং তাঁহার অসামান্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই মামলায় অভিযুক্ত অন্তান্ত দলভুক্ত বিপ্লবীরাও স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাকে নেতারূপে মানিয়া লইয়াছিলেন। মামলা হইতে মুক্তিলাভ করিলে এই কারণেই প্রায় সকল বিপ্লবীদলই যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ক্রমশঃ একত্রিত হইল। তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য নেতা বাংলাদেশে তখন আর কেহ ছিলেন না। ইহা ব্যতীত ১৯১৩ সালের দামোদর বন্যা উপলক্ষে যে সেবাকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতেও বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং সকলেরই পারস্পরিক সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের একত্রিত হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইল। পরবর্ত্তীকালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিপ্লবীদের এই সহযোগিতার মনোভাব আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পর বাংলাদেশে গুপ্ত আন্দোলন পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার নিদর্শন মিলিতেও বিশেষ বিলম্ব হইল না। ১৯১৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার গোলদীঘির পার্শ্বে তিনজন বিপ্লবীর দ্বারা হেড কনষ্টেবল হরিপদ দে গুলির আঘাতে নিহত হইল। এই মাসেই ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী ময়মনসিংহে প্রাণ দিল বোমার আঘাতে।

২৯৬-১নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে বোমা প্রস্তুত হইত সিগারেটের টিনে। পুলিশ উক্ত বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া বিপ্লব-বিষয়ক নানা কাগজপত্র ও বোমা তৈয়ারীর টিন হস্তগত করে। রক্তপাত ও হত্যার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার নির্দ্দেশমূলক একটি লিখিত কাগজও পাওয়া যায়। তল্লাসীর ফলে শশাঙ্ক ওরফে অমৃতলাল হাজরা

এবং আরও তিনজন বিপ্লবী ধৃত হইলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ১৯১৩ সালে রাজাবাজার বোমার মামলা আরম্ভ হয় এবং বিচারে শশাঙ্কের প্রতি আদেশ হয় ১৫ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডের। রাজাবাজারে প্রস্তুত বোমার ন্যায় বোমা মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান সমূহেও ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়।

১৯১৪ সালের ১৯শে জানুয়ারি গোয়েন্দা-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রে ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে ট্রাম হইতে অবতরণের সময় প্রাণ হারাইল নির্ম্মলকান্ত রায় ও অপর এক ব্যক্তির রিভলভারের গুলিতে। অনন্ত তেলী নামে একটি ছোট ছেলে পলায়ন কালে নির্ম্মলকান্তের চাদর ধরিয়া ফেলিয়াছিল। বাধ্য হইয়া নির্ম্মলকান্ত গুলি চালাইয়া তাহাকে নিহত করেন। হাইকোর্টে নির্ম্মলকান্তের দুইবার বিচার হয় এবং অধিকাংশ জুরির মতে দুইবারই নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া নির্ম্মলকান্ত মুক্তি পান। অপর ব্যক্তিকে ধরা সম্ভব হয় নাই। নৃপেন্দ্র ঘোষকে নিহত করিয়াই সে পলায়ন করিয়াছিল। এই সালেই কতকগুলি স্বদেশী ডাকাতিও অনুষ্ঠিত হয়—বৈদ্যবাটী, আড়িয়াদহ, বরানগর ও আলমবাজারে।

রড়া কোম্পানীর মশার পিস্তল চুরি এই সময়ের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৪ সালের ২৬শে আগষ্ট উক্ত কোম্পানীর কতকগুলি বাক্স বোঝাই পিস্তল ও গুলিবারুদ আসিয়া পৌঁছাইল Taotioian নামক একখানি জাহাজে। কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী শ্রীশচন্দ্র সরকার কাষ্টমস্ হাউস হইতে মালগুলি ছাড় করাইয়া আনিবার জন্য কোম্পানীর দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২০২ বাক্স অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি বারুদ খালাস করিয়া চারিটি গরুর গাড়ীতে তাহা বোঝাই করা হয় এবং তিনটি গরুর গাড়ীতে মোট ১৯২ বাক্স মাল উক্ত কোম্পানীর গুদামে জমা দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ১০ বাক্স অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি-বারুদ বোঝাই গাড়ীটি লইয়া শ্রীশবাবু ২৮শে অক্টোবর নিরুদ্দিষ্ট হন। ঐ ১০টি বাক্সে ৫০টি বড় মশার পিস্তল ও প্রায় ৪৬০০০ রাউণ্ড বুলেট ছিল। গাড়ীটিকে প্রথমতঃ মলঙ্গা লেন ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের কাছে লইয়া আসা হয়, পরে একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে বাক্সগুলি বোঝাই করিয়া বহুবাজারের জেলেপাড়ায় লইয়া গিয়া বাক্সগুলি খালাস করা হয়। মলঙ্গা লেনের অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বহুবাজারের গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবীরা এই পিস্তল চুরি ব্যাপারের সহিত জড়িত ছিলেন। বাংলার নানাস্থানের বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে এই সকল পিস্তল ও গুলি-বারুদ বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধায়, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতাগণ এই পিস্তল বণ্টন ব্যাপারের তদ্বির করিয়াছিলেন।

অনুশীলন সমিতির সভ্যদের দ্বারা ১৯১৪ সালের শেষ ভাগে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ-বিভাগের বিখ্যাত অফিসার বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুসলমান পাড়া লেনস্থ বাসভবনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বসন্তবাবু অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়া যান এবং বোমানিক্ষেপকারীদেরই কয়েকজন ইহাতে আহত হন।

১৯১৪ সালে ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হওয়ার পর ভারতীয় বিপ্লবীরা ১৯১৫ সালের প্রথম দিকেই যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এ ব্যাপারে বহির্ভারত হইতেও তাঁহারা সাহায্য পাইতেছিলেন। বাংলার বিপ্লবীরা এই সময় একজনের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া যতীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের নেতৃপদে বরণ করিলেন। বাংলার বিপ্লবীদের সহিত ব্যাঙ্কক ও বাটাভিয়ার বিপ্লবীদের সংযোগ স্থাপিত হইল এবং বিদেশ হইতে বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর চেষ্টা চলিতে লাগিল।

কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যতীত এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নহে; তাই চারিদিকে আবার স্বদেশী ডাকাতি আরম্ভ হইয়া গেল। ১৯১৫ সালে নদীয়া জেলার প্রাগপুরে এবং হাওড়ার শিবপুরে দুইটি এইরূপ ডাকাতি হইল। এই বৎসরই ১২ই জানুয়ারি তারিখে বার্ড কোম্পানীর একজন দরোয়ান যখন টাকা লইয়া গার্ডেন রীচে উক্ত কোম্পানীর মিলে যাইতেছিল, তখন তাহার নিকট হইতে ১৮০০০৲ টাকা ছিনাইয়া লওয়া হয়। যতীন্দ্রনাথ ও বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশেই গার্ডেন রীচের ডাকাতি হইয়াছিল।

১৯১৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবীরা স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বেলিয়াঘাটার এক চাউল ব্যবসায়ীর কেসিয়ারের নিকট হইতে ২২০০০৲ টাকা লুঠ করিয়া আনেন। যে ট্যাক্সিতে চাপিয়া তাঁহারা ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন, ডাকাতির পর সেই ট্যাক্সির চালক বিপ্লবীদের কথামত চলিতে অস্বীকার করে। তাহাকে তখন গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়।

জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামক জনৈক ব্যক্তি ১৯১৫ সালের মার্চ্চ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ভারতীয় বিদ্রোহে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিবার জন্য জার্ম্মাণী খুবই উৎসুক। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্ব্বেই যতীন্দ্রনাথের দ্বারা ব্যাঙ্ককে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাটাভিয়াস্থিত জার্ম্মাণদের সহিত কর্ম্মপন্থা স্থির করিবার জন্য বিপ্লবীদের তরফ হইতে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এপ্রিল মাসে তথায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া নরেন্দ্রনাথ ছদ্ম নাম গ্রহণ করিলেন মিঃ সি, মার্টিন। অবনী মুখোপাধ্যায়কেও জাপানে পাঠান হইল।

থিয়োডোর হেলফারিক নামক একজন জার্ম্মাণ বাটাভিয়ায় নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে জানাইলেন যে, "মেভারিক" নামক একখানি জাহাজযোগে ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে ত্রিশ হাজার রাইফেল, বহু গুলি-বারুদ এবং দুই লক্ষ টাকা ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য করাচী বন্দরে যাইতেছে। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আগ্রহাতিশয্যে সাংহাইস্থিত জার্ম্মাণ-রাজদূতের সহিত পরামর্শের পর উক্ত জাহাজখানি বাংলায় আনা স্থির হইল। সেই অনুযায়ী জাহাজখানি হনলুলু হইতে বাংলার পথে যাত্রা চলিল। স্থির হইয়াছিল যে, সুন্দরবনের রায় মঙ্গল নামক স্থানে "মেভারিক" জাহাজের মাল খালাস করা হইবে। সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য জুন মাসে বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। যতীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবীরা পরামর্শ করিয়া "মেভারিক" জাহাজের মাল তিন স্থলে ভাগ করিয়া লইবার পরিকল্পনা রচনা করিলেন। তদনুযায়ী হাতিয়ায়, কলিকাতায় এবং বালেশ্বরে—এই তিন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ভাগ করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বাংলার বিপ্লবকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য কলিকাতায় আসিবার তিনটি প্রধান রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। স্থির হইল যে, বালেশ্বরে থাকিয়া সহকর্ম্মিগণসহ স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ রেলপথ এবং চক্রধরপুরে থাকিয়া সহকর্ম্মিগণসহ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এন, রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন; আর অজয় নদের উপর ই, আই, রেলপথের সেতু বিধ্বস্ত করিয়া দিবার ভার পড়িল সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপর। বিপিন চক্রবর্ত্তী ও নরেন্দ্র চৌধুরীকে হাতিয়ায় পাঠান হইল। তাঁহাদের উপর ভার রহিল বিপ্লবীদের সাহায্যে পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলি অধিকার করিয়া কলিকাতার সহিত সংযোগ-স্থাপনের। "মেভারিক" জাহাজে আগত জার্ম্মাণ অফিসারগণ পূর্ব্ববঙ্গের বিপ্লবীদিগকে শিক্ষাদান করিবেন বলিয়া ঠিক হইল। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইল কলিকাতার নেতৃত্ব। কলিকাতার সকল অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম দখল এবং ইংরাজ সৈন্য প্রভৃতিকে পর্য্যুদস্ত করিবার ভার তাঁহাদের উপর রহিল।

কথা ছিল যে, রায়মঙ্গলের নিকট রাত্রিকালে "মেভারিক" জাহাজ আসিয়া পৌঁছাইবে এবং জাহাজে খাড়াভাবে সারি সারি আলো জ্বলিতে দেখিয়া বিপ্লবীরা বুঝিয়া লইবে যে, উহাই "মেভারিক" জাহাজ। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনায় রায়মঙ্গলের নিকটস্থ এক জমিদার জাহাজ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র নামাইবার জন্য লোকজন ও যান-বাহন দিয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অতুল ঘোষ নৌকা করিয়া রায়মঙ্গলের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন মাল খালাসের জন্য; কিন্তু দশদিন সেখানে অপেক্ষা করিয়াও নির্দ্দিষ্ট জাহাজের সাক্ষাৎ মিলিল না। জুন মাসের মধ্যেই যে জাহাজের আসিয়া পৌঁছিবার কথা—জুন মাস শেষ হইয়া গেলেও তাহা আসিয়া পৌঁছিল না।

এই সংবাদে বিপ্লবীরা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একজন বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের আত্মারাম নামক এক শিখ বিপ্লবীর নিকট হইতে সংবাদ আনিলেন, শ্যামদেশস্থ জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত কর্ত্তৃক নৌকাযোগে পাঁচ হাজার রাইফেল, গুলি-বারুদ ও এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে প্রেরিত হইয়াছে। বিপ্লবীরা ভাবিলেন, যে, "মেভারিক" জাহাজের অস্ত্র-শস্ত্রের পরিবর্ত্তেই বুঝি ঐ নৌকায় অস্ত্র-শস্ত্র পাঠান হইয়াছে। সেই জন্য অস্ত্রাদি প্রেরণ সম্পর্কে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত ব্যবস্থায় কোনও ব্যতিক্রম যাহাতে না করা হয়, তাহা হেলফারিককে জানাইবার জন্য ঐ বাঙ্গালীটি আবার বাটাভিয়া হইয়া ব্যাঙ্ককে ফিরিয়া গেলেন। অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র যাহা পাঠান হইবে—তাহা হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও বালেশ্বরে পাঠাইবার জন্য বলিয়া দেওয়া হইল।

যতীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই পূর্ব্বপরিকল্পনামত বালেশ্বরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার অপর চারিজন সঙ্গী—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং জ্যোতিষ পাল।

চিত্তপ্রিয়ের বাড়ী ছিল খালিয়া গ্রামে এবং নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের বাড়ী খৈয়ারভাঙ্গা গ্রামে। তাঁহারা তিনজনেই ছিলেন মাদারীপুর স্কুলের ছাত্র। খৈয়ারভাঙ্গার মাইল পাঁচেক দূরেই ছিল বিপ্লবী পূর্ণ দাসের জন্মস্থান এবং চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন তিনজনেই ছিলেন পূর্ণ দাসের দলের অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলি ডাকাতি উপলক্ষে পুলিশ ১৯১৩ সালে নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন চিত্তপ্রিয়, পূর্ণ দাস, কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ২৭জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করে, কিন্তু মাস আষ্টেক মামলা চালাইবার পর মামলা তুলিয়া লয়। মুক্তি পাইবার পর চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের মাদারীপুর স্কুলে আর প্রবেশানুমতি মিলে নাই। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহারা কলিকাতায় আসেন এবং ভর্তি করে চিত্তপ্রিয় কেশব একাডেমিতে ও নীরেন্দ্র-মনোরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হন। পুলিশ কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহাদের পশ্চাতে লাগিয়া রহিল।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সকল বিপ্লবীদল সঙ্ঘবদ্ধ হইবার পর পূর্ণ দাস—চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনকে যতীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। বেলেঘাটা ট্যাক্সি ডাকাতিতে নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন অংশ গ্রহণ করেন। গার্ডেন রীচ ডাকাতিতেও তাঁহাদের কেহ কেহ জড়িত ছিলেন। (ক্রমশঃ)

নূতনের অভিযান

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অপরূপ রূপ রাগে
ভারতের রবি জাগে;
উদয় শিখরে নবারুণ আভা
ধরণীর বুকে লাগে।

শ্যামল বনানী মাঝে
মিলন রাগিণী বাজে;
আকাশ বাতাস সাগরের হিয়া
রঞ্জিত রাঙা ফাগে।

নরনারী সবে করিল বরণ
অরুণ কিরণ-ভাতি;
গৌরবে আজ ফুটেছে প্রভাত,
কেটেছে তিমির রাতি।

এলো জীবনের গান,
নূতনের অভিযান—
চঞ্চল আজি তরুণ ভারত
উচ্ছল অনুরাগে।

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জয়পুর

আজমীড় থেকে আমরা সোজা জয়পুর যাবো স্থির ছিল।

জয়পুরের রাজকীয় শিল্প ও কলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বন্ধুবর কুশলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আগ্রা ষ্টেশনে যখন দেখা হয়েছিল, তখন শিল্পী বন্ধুটি আমাদের জয়পুরে যাবার জন্য সাদর-আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আবু যাবার পথেই তিনি আমাদের জয়পুরে নামাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা তখন নামিনি। ফেরবার পথে নিশ্চয় নামবো বলে তাঁকে কথা দিয়েছিলুম। তদনুসারে আজমীড় থেকে আমরা বন্ধুবরকে একটি তারবার্ত্তায় জানিয়ে দিলুম যে আমরা অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক গাড়ীতে জয়পুরে গিয়ে পৌঁছবো। তিনি যেন কোনও ভালো হোটেল বা কিং-এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল যাত্রীনিবাসে দ্বিতলের একটি সুট আমাদের জন্য ঠিক করে রাখেন।

জয়পুরের বর্তমান মহারাজা

আজমীড় থেকে আমরা সকাল ৮টায় আমেদাবাদ দিল্লী এক্‌সপ্রেস ধরে রওনা হলুম। জয়পুর পৌঁছবার কথা সন্ধ্যে ৭টায়। গাড়ীতে রেষ্টুরেন্ট কার ছিল। মধ্যাহ্ন ভোজটা গাড়ীতেই সারা গেল। কিন্তু গাড়ী হয়ে গেল লেট। জয়পুর পৌঁছলুম যখন, তখন রাত্রি ৮টা বেজে গেছে। সহযাত্রিণীদের নামিয়ে কুলি ডেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছি এমন সময় দ্রুতপদে একজন সাহেব এসে হাজির। মাথায় ফেল্টের টুপী, গায়ে দামী চেষ্টার-ফিল্ড কোট—“হ্যালো! একঘণ্টা লেট তোমরা! আমি সাতটা থেকে ষ্টেশনে ওয়েট করছি!” চোস্ত বাংলা বুলি শুনে ভাল করে মুখের দিকে চেয়ে দেখি—আমাদের কুশল!

রাত্রে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মের অল্প আলোয় ইংরিজী পোষাকপরা মানুষটিকে সাহেব বলেই মনে হয়েছিল। কুশল প্রিয়দর্শন সুপুরুষ, শিল্পীর মতই দীর্ঘ তনু তার। সাহেব বলে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে সকলের করমর্দ্দন করে বললে—চলো, আমার মোটর এনেছি। তোমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাই। জিনিসপত্র সব আমার আর্দ্দালি আর চাপরাসী এসেছে, ঘোড়ার গাড়ী করে নিয়ে যাবে পরে।

ধীরেনের বাড়ীর সামনে ('মাপুহ' ও আমরা)

আমাদের সঙ্গে ভৃত্য ভোলানাথ তো ছিলেনই। জিনিসপত্রের তালিকা তাঁর নখদর্পণে। তাঁকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে বন্ধুকে বললুম—কাষ্টমের হাঙ্গামার কী হবে?

কুশল হেসে বললে—কোনো হাঙ্গামা হবে না। ভয় নেই। আরদালীকে বলে দিলে—আবগারী দারোগাকো বোল্ দেনা ইয়ে প্রিনসিপাল সাবকা মেহ্‌মান লোককো সামান হায়।

কথাটার অর্থ বোধগম্য না হওয়ায় কুশল বুঝিয়ে দিলে—

তোমরা আমার 'অতিথি' শুনলে তোমাদের একটা জিনিসও ওরা ছোঁবে না।

বুঝলুম—জয়পুরে বন্ধুবরের প্রভাব প্রতিপত্তি অপ্রমেয়।

নিজের মোটরে আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে সার মির্জা

জয়পুর আর্টস্কুল

জয়পুর প্রাসাদের তোরণদ্বার

ইসমাইল রোডে একটি নবপ্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট হোটেলে। হোটেলটির নামের সঙ্গে আমাদের কলকাতার একটি বহুখ্যাত হোটেলের মিল আছে। তাই প্রথমটা ভয় পেয়েছিলুম, হয়ত খরচায় কুলিয়ে উঠতে পারবো না।

হোটেলের প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে দেখলুম কুশলের খুবই খাতির। সবচেয়ে বড় এবং ভাল ঘরখানা তিনি আমাদের জন্ত ছেড়ে দিলেন। পৃথক একখানি ড্রয়িংরুমসহ দৈনিক পনেরো টাকা ভাড়া স্থির হল। খাওয়া দাওয়ার খরচ আলাদা। ইতিমধ্যে দুই ফীটনে করে আমাদের সমস্ত মাল এসে পড়লো। কুশলকে জিজ্ঞাসা করে গাড়ী ভাড়া ও কুলি ভাড়া মিটিয়ে দিলুম।

আমাদের গুছিয়ে বসতে রাত্রি দশটা বাজলো। কুশল কাল আবার আসবে বলে চলে গেল। যাবার সময় একথাটাও জানিয়ে গেল যে তার বাড়ীতে অনেকগুলি অতিথি রয়েছেন, নইলে সে আমাদের হোটেলে উঠতে দিত না।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা 'পুষুমা'র (শ্রীমতী পুষ্প সেন) বিবাহ হয়েছিল জয়পুরের প্রসিদ্ধ সংসার সেনেদের বংশে। জামতা ধীরেন্দ্রনাথ জয়পুর মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী। 'পুষুমা' বহুবার আমাদের জয়পুরে ডেকেছিল। তাই আমরা স্থির করলুম কাল সকালে উঠেই পুষুমার বাড়ী গিয়ে মেয়েটাকে অবাক ক'রে দিতে হবে!

সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রদ্ধেয়া জ্যোতির্ময়ী দেবীর পিত্রালয় জয়পুরে। তিনি ধনামধন্য স্বর্গীয় সংসার সেনের পৌত্রী। জ্যোতিদিদি বলেছিলেন আমরা জয়পুরে তাঁর দাদার সঙ্গে যেন অতি অবশ্য দেখা করি। জয়পুরে যাতে আমাদের কোনও অসুবিধা না হয় তিনি তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমরা পরদিন তাঁর সঙ্গেও দেখা করে আসবো ঠিক করলুম। জয়পুরে সব আছে কিন্তু ট্যাক্সী নেই। শুধু টংগা আর ফীটন পাওয়া যায়। যারাই এখানে জয়পুর শহর দেখেশুনে ঘুরে বেড়ায়, তারা হয় টংগা নয় ট্যাক্সীতে যাতায়াত করে। কুশল আমাদের জন্য তারই জানা শোনা একজন ফীটনওয়ালাকেও পাঠিয়ে দেবে বলে গেছল। আমরা যে কদিন জয়পুরে থাকবো সে সারাদিন আমাদের নিয়ে জয়পুর ঘুরিয়ে দেখিয়ে বেড়াবে। সে ব্যক্তি 'গাইড' ও 'গাড়োয়ান' কম্বাইন্‌ড্‌। ভাড়া খুব বেশী লাগবে না। যা হয় পরে হিসেব করে মিটিয়ে দিলেই হবে। শুনে মনটা খুশী হল।

সে রাত্রের মতো গ্র্যাণ্ড হোটেলের খাওয়া খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিলুম। খাবার দাবার এদের ভালো। পুরী তরকারী ডাল রুটি মাছ মাংস ডিম চপ কাটলেট আমলেট খাট্টা মিঠাই দধি পাঁপর সবই পাওয়া যায়। যার যা অভিরুচি খাও। দাম কলকাতার চেয়ে সস্তা। অভাব শুধু ভাতের। চাল নেই রাজপুতানায়। আর এই সময়, অর্থাৎ আমরা যখন গেছলুম, তখন ওখানে 'মিল্ক অর্ডিন্যান্স' জারি হয়ে গেছে। দুধ নিয়ে কারুর ছানা মালাই ক্ষীর সর প্রভৃতি তৈরী করা নিষেধ হয়েছে। কাজেই রসগোল্লা সন্দেশ ছানাবড়া পেঁড়া কিছুই পাবার উপায় ছিল না। আমি আবার একটু মিষ্টির ভক্ত। নোন্তা খাবার খেতে পারিনি। দেবভোগ্য সন্দেশেই রুচিবেশী। কাজেই বিপন্ন বোধ করলুম। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ম্যানেজারও প্রোপ্রাইটার দু'জনেই অতি ভদ্র। প্রিনসিপাল সাহেবের মেহ্‌মান বলে আমাদের খুব খাতির যত্ন করছিলেন।
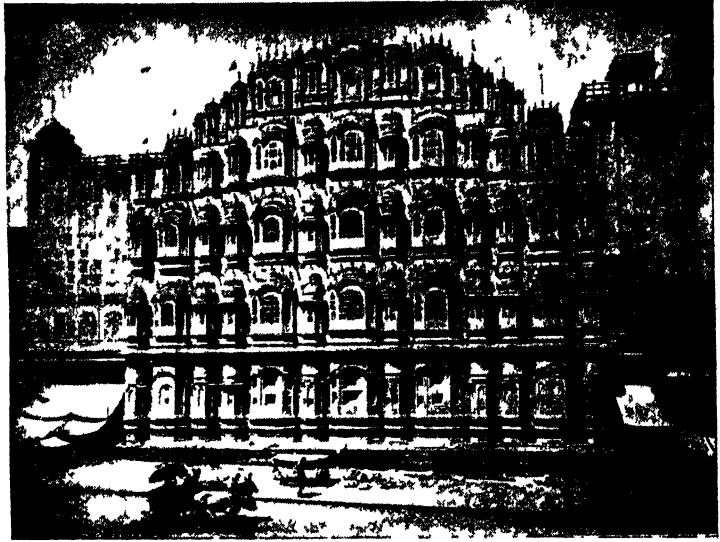
হাওয়া মহল

সকালে উঠে মুখহাত ধুয়ে প্রাতরাশ করছি, এমন সময় গাড়োয়ান এসে সেলাম করে জানালে গাড়ী হাজির। আমরাও কাপড় চোপড় বদলে বেরিয়ে পড়লুম। মেয়েরা মধ্যাহ্ন ভোজনের গোছ ব্যবস্থা করে, বস্ত্র পরিবর্তন ও প্রসাধন সেরে বেরুতে বেলা ১০টা বাজিয়ে ফেললে। আমরা গাড়োয়ানকে বললুম—মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারী ধীরেনবাবুর বাসায় যাবো। তুমি কি তাঁর বাসা চেন?
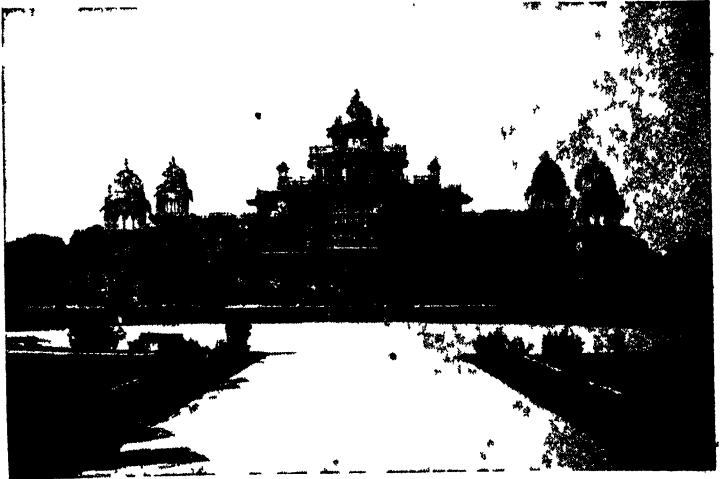
গাড়োয়ান সেলাম ক'রে বললে—জী হুজুর! উনিই তো আমাদের মা বাপ! ওঁর হাতেই আমাদের লাইসেন্স, নম্বর সব। নিয়ে এলো সে ঠিক আমাদের মাপুত্র বাড়ী। ধীরেন বাবাজী তখন বাড়ী নেই, অফিসে গেছেন। মেয়ে তো আমাদের পেয়ে একেবারে আহ্লাদে আটখানা!

হোটেলে এসে উঠেছি শুনে খুব বকলে। আমরা কৈফিয়ৎ দিলুম—কুটুমবাড়ী অতিথি হওয়া ঠিক নয়, বিশেষতঃ সঙ্গে আমাদের একটি বান্ধবী ও একজন বন্ধুপুত্র রয়েছেন। তাঁদের তোমরা চেন না। তোমাদের এখানে উঠলে [illegible]দের অসুবিধা হ'তো। আমরা একলা হলেও যা কথা ছিল।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশ কেমন লাগছে কাকাবাবু?

এ্যালবার্ট মিউজিয়ম (জয়পুর)

বললুম—এটা তোমার শ্বশুর বাড়ীর দেশ নয়। রাজপুতের দেশ। তোমার শ্বশুর বাড়ীর সবাই বহু পুরুষ ধরে এখানে বসবাস করছেন বটে, কিন্তু তাঁরা রাজপুতের দেশের মানুষ নন। তাঁরা এখানে প্রবাসী বাঙালী। বৃহত্তর বঙ্গের অঙ্গ স্বরূপ বলতে পারো। তবে, হাঁ

রাজপুতানার সমস্ত প্রাচীন শহর ঘুরে এলুম কিন্তু জয়পুরের কাছে কেউ লাগে না। পরিচ্ছন্ন শহর, প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর ঘরবাড়ী। শহর সমস্ত যেন চিত্রকরের আঁকা একখানি ছবি!

পুতুয়া বললে—সামনেটা বেশ সাজানো গোছানো বটে, ভিতরে ঢুকলে দেখতেন পুরোনো অঞ্চলগুলোয় আজও যেমনি ধুলো—তেমনি নোংরা!

বললুম—তা' হোক। সে দোষ সব শহরেরই আছে। কিন্তু, তোমাদের এই জয়পুরেই প্রথম দেখছি 'টাউন প্ল্যানিং' বলে বাস্তুবিদ্যাটা যেন স্বীকার করে নিয়ে একটা নক্সা অনুযায়ী শহরটা গড়া হয়েছিল। এলো মেলো যেখানে সেখানে লোকের বসবাস হ'তে হ'তে আপ্‌সে নগর গড়ে ওঠেনি। রীতিমতো পরিকল্পনা অনুসারে এর পত্তন হয়েছিল বোঝা যায়। হাজার হোক মানসিংহ লোকটির একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গতানুগতিক ব্যবস্থার বিরোধী মনোভাব ছিল। তিনি নিঃসন্দেহ প্রগতিশীল ছিলেন, নইলে মোগল সম্রাটের সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহ দিতেন না। জাতিধর্ম্মের প্রভেদ যে এদেশের মানুষকে ছোট ক'রে রেখেছে এটা তিনি বুঝেছিলেন। তাই সকলদিক দিয়েই সংস্কারের চেষ্টা করে গেছেন। বল বীর্য্য বুদ্ধি সাহস ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে মানসিংহ ভারত ইতিহাসের একটা অসামান্য চরিত্র! রাণাপ্রতাপ কোনদিক দিয়েই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। মেবারের প্রতাপসিংহকে একটি প্রচণ্ড 'ফ্যানাটিক' বলা চলে। কিন্তু মানসিংহ ছিলেন ধীর স্থির ও জ্ঞানী। বিদেশী শাসকের অধীনে কাজ নিয়েছিলেন সম্ভবতঃ দেশের লোকের দুর্ব্বলতা দেখেই। তাই প্রতাপকে বার বার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে তাঁর কাছে। মানসিংহেরই বংশধর মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ ১৭২৮ সালে এই নূতন জয়পুর শহর নির্ম্মাণ করেন। হুগলী জেলার বাঙালী বাস্তুকার ও পূর্ত্ত বিশারদ স্বর্গীয় বিদ্যাধরদেব এই শহরের রাজবাড়ী প্রাসাদ, হাওয়ামহল, সংস্কৃত বিদ্যামন্দির ও পথঘাটপূর্ণ গৃহাদির পরিকল্পনা করেছিলেন। বাঙালীর আর কিছু থাক বা না থাক, একটা রম্য রুচিবোধ ও তীক্ষ্ণকলা জ্ঞানের পরিচয় সে বরাবরই দিয়ে এসেছে। জয়পুরের প্রত্যেক রাজ পথটি ১০০ ফুটের উপর চওড়া। প্রত্যেক পথটি সোজা সরল রেখায় চলে গেছে। দুধারের প্রত্যেক বাড়ীগুলি একই ধরণে তৈরী। প্রত্যেক বাড়ীর একই রকম গোলাপী রং-শহরটিকে যেন একটি সুছন্দ কাব্যের মতো সুন্দর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে। মোড়ে মোড়ে জলের ফোয়ারা, ছোট একটু বাগান ও বিশ্রামের আসন বিছানো। সুদৃশ্য বিজলী আলোক স্তম্ভ কাছাকাছি স্থাপিত। প্রত্যেক চৌমাথায় বিভিন্ন বাজারের চক্‌। শহরটির চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা। মাঝে মাঝে বড় বড় গম্বুজওয়ালা তোরণ দ্বার। স্থাপিত জয়পুর শহর ৮ বর্গমাইল বিস্তৃত, কিন্তু জয়পুর রাজ্যের বিস্তৃতি ১৫৬০১ বর্গমাইল। জয়পুর শহরের লোকসংখ্যা ১,৭৫৮১০, সমগ্র রাজ্যের লোকসংখ্যা ৩০,৪০৮৭৬, আয় বছরে ৩ কোটি টাকা। ১৭২৮ সালে স্থাপিত জয়পুর শহরকে খুব প্রাচীন বলা চলে না। বরং এটিকে নতুন শহরই বলা যায়। এখান থেকে ৮ মাইল দূরে 'অম্বর'। এইটিই জয়পুরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী। পার্ব্বত্য দুর্গ ও পরিখা বেষ্টিত এই অম্বর মাথা উঁচু ক'রে সদা জাগ্রত প্রহরীর মতো আরাবল্লী উপত্যকার গিরিপথ ও সুদূর প্রান্তর সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে যেন!

কুশলকুমার মুখোপাধ্যায়

পুতুকে বললুম—আমরা কাল অম্বর দেখতে যাবো।

পুতুয়া আমাদের জয়পুরে কি কি দেখবার আছে এক নিঃশ্বাসে বলে দিলে। ফেরবার সময় গৃহিণী মেয়ের কাছ থেকে এক ঝুড়ি হুকারের কাঠকয়লা, দুখানি পাঁউরুটি, এক বোতল কেরোসিন এবং কিছু উৎকৃষ্ট চালের ব্যবস্থা করে এলেন। চাল এখানের বাজারে গোপনে বিক্রয় হয়। দর ৮০৲ টাকা মণ!

ফেরার পথে গাড়োয়ান আমাদের স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরাট প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দেখিয়ে দিলে। জয়পুরের সঙ্গে বাংলার একটা নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করে গেছেন যাঁরা—স্বর্গীয় সংসারচন্দ্র সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁদের মধ্যে প্রধান। কান্তিবাবু ও সংসারবাবু সামান্য স্কুলমাষ্টার থেকে নিজেদের সদ্‌গুণে ও চরিত্রবলে জয়পুর রাজ্যের মন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেছিলেন।

৺সংসার সেনের পৌত্র ধৃতিবাবু, যাঁকে ওখানে সবাই বিভুবাবু বলে, আমাদের জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর দাদা তিনি। জ্যোতিদি'র চিঠি নিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলুম তিনি শিকারে দেহাতে চলে গেছেন। তিনিও জয়পুর ষ্টেটের একজন উচ্চ রাজ-

কর্মচারী। শিকারের ঝোঁক খুব। ছুটী পেলেই নাকি শিকারে ছোটেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বললে—তিনি সোমবারে ফিরবেন। জ্যোতিদির চিঠিখানা ছেলেদের কাছে দিয়ে আমরা আর একদিন আসবো বলে চলে এলুম। কিন্তু সেই আর একদিন যাওয়া আর আমাদের হ'য়ে ওঠেনি এবং ধৃতিবাবুও কোনওদিন গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে বা লোক পাঠিয়ে আমাদের কোনও খোঁজ খবর নেওয়াও প্রয়োজন মনে করেননি। সম্ভবতঃ, আমরা আর একদিন যাবো বলে আসায় তিনি অনির্দ্দিষ্টকালের জন্ম সেই দুর্দ্দিনের প্রতীক্ষা করছিলেন! কিন্তু, ওঁদেরই বাড়ীর ছেলে ধীরেন বাবাজী অফিস থেকে বাড়ী ফিরে আমাদের জয়পুরে আসার খবর পেয়ে—সেই রাত্রেই তার মোটর বাইক নিয়ে আমাদের হোটেলে এসে হাজির!

আমাদের বাংলা দেশে একটা গ্রাম্য ছড়া আছে, "যদি কন্যা পারে পাত্রে, কিবা করে শত্রুপুত্রে?" হেমেন্দ্রবাবুর জামাতা ভাগ্যবান। আমরা যে কয়দিন জয়পুরে ছিলুম ঘরের ছেলের মতো প্রত্যহ এসে আমাদের খবর নেওয়া, দুষ্প্রাপ্য চাল সংগ্রহ করে দেওয়া প্রভৃতি করেছিল। কিছু কেনাকাটার জন্ম বাজার করতে গেলে পাছে পরদেশী দেখে দোকানদারেরা আমাদের ঠকায় এজন্ত নিজে আমাদের সঙ্গে থেকে ঘুরে ঘুরে জয়পুরের রঙীণ মীনার কাজ করা প্রাচীন ভারতীয় জড়োয়া অলঙ্কার, ছাপা শাড়ী, ফুলকরা রেশমী বেড-কভার, শ্বেত পাথরের ও রঙীণ মিনার কাজ করা পিতলের জিনিসপত্র ওদের জানাশোনা দোকান থেকে ন্যায্য মূল্যে কিনিয়ে দিয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে গত ২২শে জুলাই বৃহস্পতিবার ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন প্রতিভাশালী সন্তান হারাইল। বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্পী-রসিকদিগের নিকটে হেমেন্দ্রনাথ সুপরিচিত। তাঁর চিত্র কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেশীয় রাজ্যের রাজাদের রাজপ্রাসাদ অলঙ্কৃত করিয়া আছে। জনসাধারণ তাঁর চিত্রের "এলবামের" সহিত সুপরিচিত। কাজেই হেমেন্দ্রনাথ ধনীর প্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সমানভাবে পরিচিত ও সমাদৃত। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করিতে পারেন এমন একজন শিল্পীরও নাম করা যায় না। রংএর ঔজ্জ্বল্যে, অপূর্ব্ব বর্ণ সমাবেশে, বিষয়বস্তুর মাধুর্য্যে হেমেন্দ্রনাথ সকলেরই মনোহরণে সমর্থ ছিলেন।

তিনি রংএর যাদুকর—অয়েল কলার, ওয়াটার কলার, প্যাষ্টেল চক্ ইত্যাদি চিত্রাঙ্কনের বিভিন্ন প্রণালীতে এমন সমান পারদর্শী শিল্পী এদেশে কেন বিদেশেও দুর্লভ বলা চলে।

একাধারে পোর্ট্রেট, সাবজেক্ট পেন্টিং, ল্যাণ্ডস্কেপ, পেন এণ্ড ইঙ্কস্কেচ, সর্ব্ব বিষয়েই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এর যেকোন একটি গুণের অধিকারী যদি কোন শিল্পী হন তবে রসিক সমাজে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ এক শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারো মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না।

৺হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভায় সমস্ত ভারত সমুজ্জ্বল। ভারতে যতগুলি শিল্প

বিদ্যালয় (আর্ট স্কুল) আছে, সেগুলির অধ্যক্ষ সমস্ত পদ গুলিই বাংলাদেশের অবনীন্দ্র-শিষ্যরাই এতাবৎ কাল পূরণ করিয়া আসিয়াছেন। সে কারণেই আজ ভারতে অবনীন্দ্র-পন্থী চিত্র-শিল্পীই সমধিক।

সিক্ত বসন শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

যাঁহারা যে কোন দিক দিয়াই নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা মহা শক্তিশালী ব্যক্তি একথা না বলিলেও চলে। যে কালে ও যে স্থানে এই প্রকারের শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়, যে স্থানে ও সেকালে অপর কোন প্রতি[illegible] সমধিক প্রসার লাভ করিতে পারে না। কারণ, মহা ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাদের প্রতিভা প্রায়ই নিষ্প্রভ হইয়া যাই[illegible] বাধ্য। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তেমনই একজন শিল্পের নব

স্নানান্তে শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

যুগ প্রবর্ত্তক। লুপ্তপ্রায় ভারত-শিল্পের পুনরুত্থান করাইয়া তিনি যে সুকীর্ত্তি রাখিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসী চিরকাল পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবে। কিন্তু

এই বিরাট প্রতিভার এত নিকটে থাকিয়াও হেমেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়াছেন। ইহা এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁর চিত্রে অবনীন্দ্রনাথের ছোঁয়াচ পর্য্যন্ত লাগে নাই, সম্পূর্ণ নিজের ভাবে ও নিজের ধরণে তাঁর চিত্র প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁর অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধবই অবনীন্দ্র-শিষ্য—চারিদিকে অবনীন্দ্র প্রভাব, কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ—বিদ্রোহী হেমেন্দ্রনাথ—চির-জীবন একভাবে নিজের উদ্ভাবিত পন্থাতে শিল্প-চর্চ্চা করিয়া আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া গিয়াছেন।

তিনি সাধারণতঃ 'সাবজেক্ট পেন্টিং' করিতেন, "সিক্ত বসন" অঙ্কনে তার তুল্য প্রতিভা আর কেহ দেখাইয়াছেন কিনা জানিনা। দেহের যে অংশে বসন লাগিয়া আছে এবং যে স্থানে তাহা লাগিয়া নাই, রংএর অতি সামান্য তারতম্যে এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিতে কোন শিল্পীকে সাধারণতঃ দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি সমস্ত প্রকার রং দিয়াই সমানভাবে অঙ্কন করিতে সমান দক্ষ ছিলেন। তবে "অয়েল কলারে" "সাবজেক্ট" পেন্টিংএ তিনি সমধিক আনন্দ পাইতেন।

প্রসাধন শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

আজ একটা কথা অতি দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে অবনীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত ভারত শিল্পের আলোচনা দেশময় যতই বর্দ্ধিত হইতেছে—'অয়েল কলারে' সাবজেক্ট পেন্টিংএর বা "ফিগার কম্পোজিসনের" যেন ততই অনাদর হইতেছে। আজ বাংলাদেশে বৃদ্ধ যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, অতুল বসু, সতীশ সিংহ প্রভৃতি দু'চার জন শিল্পী ছাড়া "অয়েল কলারে" "সাবজেক্ট পেন্টিং" কেহই বড় একটা করেন না। ইহা শিল্পী সমাজের পক্ষে অতি দুর্লক্ষণ।

অতিরিক্ত পরিশ্রম, অসময়ে স্নানাহার, বিশ্রামের অভাব প্রভৃতি অনিয়মের জন্য হেমেন্দ্রনাথ বহুদিন যাবৎ অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছিলেন। ছবি আঁকিতে বসিলে তাঁর কোন জ্ঞানই থাকিত না। স্নান আহারের তাগাদা তাঁর রুদ্ধ দরজা হইতে ফিরিয়া যাইত। দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইয়া যাইত, ঘর বন্ধ করিয়া হেমেন্দ্রনাথ প্যালেট হাতে ইজেলের সামনে দাঁড়াইয়া "ক্যানভাসে" রংএর তুলি বুলাইতেছেন। এই
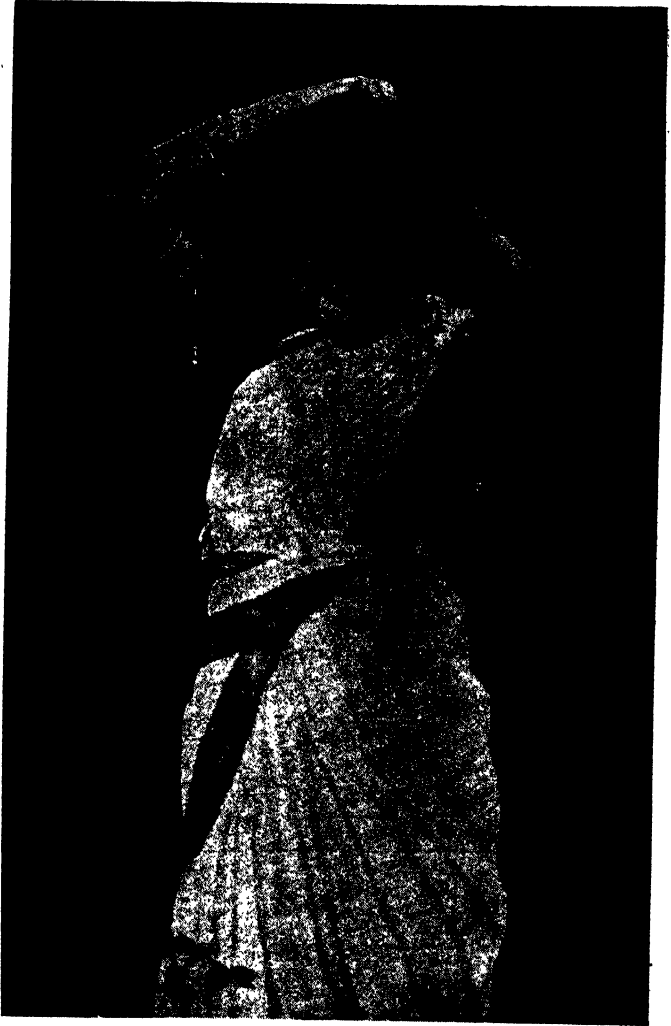
বেহিসাবের জীবন দীর্ঘ হয় না, অকালে ডাক আসিল এবং যাইতেও হইল। গত বৎসর "ইডেন গার্ডেনে" যে অল্ ইণ্ডিয়া একজিবিসন হইয়াছিল, তাহাতে হেমেন্দ্রনাথের নূতন চিত্রগুলি যাহারা দেখিয়াছেন তাহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। ছবিগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, গ্রাম্য চাষীর জীবন হইল ছবিগুলির বিষয় বস্তু, ক্ষেতের আলে বসিয়া "দুই চাষী" বন্ধুর তামাক খাওয়া, "ক্ষেতে শস্য কাটা" "মাছ ধরা" ইত্যাদি পল্লী জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাগুলি নিয়া হেমেন্দ্রনাথ

পল্লী কৃষাণ শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

অতি নিখুঁতভাবে ঐ বৃহদাকার ছবিগুলি আঁকিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি অসুস্থ হইয়া তাঁর দেশের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। সেই অসুস্থ অবস্থায় পল্লী জীবনের বহু চিত্র তিনি ওয়াটার কলারে স্কেচ্ করিয়াছিলেন। সেই ছোট স্কেচ্গুলি হইতে এক একটী বৃহদাকার "ওয়েল পেন্টিং" করা যে কতদূর পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহই জানে না। তৎকালে তিনি অসুস্থ ছিলেন, অথচ ঐ ছবি "একজিবিসনের" জন্য শেষ করিতে হইবে, তিনি একেবারে মাতিয়া উঠিলেন।

অপটু শরীর এরূপ দুরূহ পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিল না। মনের জোরে ছবি শেষ করিলেন বটে, কিন্তু শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। আমাদের ধারণা বিগত "অল্ ইণ্ডিয়া একজিবিসনই" তাঁহার অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

যাহারা লেখক হইবেন তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই অংকের খাতায় লুকাইয়া কবিতার আরাধনা করেন, তেমন যাদের ছবি আঁকায় পাইয়া বসে, তাহারাও জ্যামিতির নোট বইএ ছবি আঁকেন। প্রত্যেক শিল্পী ও সাহিত্যিকের শৈশবে ইহা সমান ভাবে প্রযোজ্য। ঠিক্ তেমন ভাবেই আমাদের হেমেন্দ্রনাথকে অতি শৈশব হইতেই ছবি আঁকায় পাইয়া বসিয়াছিল। ময়মনসিংহ জিলার গোচিহাটা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া না করিয়া ভদ্রলোকের ছেলে ছবি আঁকিবে কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন অভিভাবক ইহা পছন্দ করেন না। হেমেন্দ্রনাথের অভিভাবকরাও তা করেন নাই। কিন্তু শেষে লেখাপড়া ও ছবি আঁকার দ্বন্দ্বে ছবি আঁকাই জয়ী হইল।

হেমেন্দ্রনাথ আসিলেন গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে, কিন্তু রুটীন মতন কাজ করা এবং ধরা-বাঁধা কয়েকটি জিনিষ মাত্র আঁকা, ইহাতে তাঁহার মন সায় দিল না, তাই হেমেন্দ্রনাথ এই স্কুলে বেশী দিন থাকিলেন না। অধুনা-লুপ্ত "জুবিলী আর্ট স্কুলে" ভর্ত্তি হইয়া তিন বৎসর শিক্ষা লাভ করেন। এই জুবিলী আর্ট স্কুল আমাদের বাংলা দেশের চিত্র শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার অধ্যক্ষ অথবা শিক্ষক ছিলেন শিল্পী রণদা গুপ্ত। বহুলোকেই তার নাম জানে না. কিন্তু এমন মহান চিত্র-শিক্ষক আমাদের দেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁর মাত্র কয়েকটি শিষ্যের পরিচয় দিলেই তার চিত্রাঙ্কনে পাণ্ডিত্যের কিছুটা আভাষ পাওয়া যাইবে। গুরুর কথা কিছুটা বলা হয়, শিল্পী অতুল বসু, ৺হেমেন্দ্র মজুমদার, ৺যোগেশ শীল, ৺নরেন সরকার, ৺প্রহ্লাদ কর্ম্মকার, ভাস্কর প্রমথ মল্লিক—এঁরা সকলেই রণদাবাবুর সুযোগ্য ছাত্র। বারান্তরে এই রণদাবাবু ও জুবিলী আর্ট স্কুল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

হেমেন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে প্রথমবারে বোম্বে আর্ট একজিবিসনে কয়েকখানি ছবি পাঠান। তাঁহার অঙ্কিত সুবিখ্যাত "স্মৃতি" চিত্রখানির জন্যে সর্ব্ব প্রথম পুরস্কার স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁর বহু ছবি প্রকাশিত হয়, "ভারতবর্ষে" তৎকালে তাঁহার বহু ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঐ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রতি বৎসরই বোম্বে, মাদ্রাজ, সিমলা, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের শিল্প প্রদর্শনীতে বহু স্বর্ণ পদক ও অর্থলাভ করেন। তৎকালের বহু প্রথিতযশাঃ ব্যক্তি হেমেন্দ্রনাথের চিত্রের অনুরাগী ছিলেন। স্যার আর-এন-মুখার্জ্জি, ব্যারিষ্টার এস-আর-দাস হেমেন্দ্রনাথের বহু চিত্র ক্রয় করেন।

এই সময় ময়ূরভঞ্জের মহারাজা স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে বিশ হাজার টাকার চিত্র ক্রয় করেন।

১৯৩১ সালে কাশ্মীরের মহারাজা হেমেন্দ্রনাথকে ছবি আঁকিবার জন্য নিজের নিকটে লইয়া যান। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া তিনি পাতিয়ালার মহারাজের দরবারে মাসিক ২০০০৲ টাকা বেতনে রাজ-শিল্পী নিযুক্ত হন। পাতিয়ালার মহারাজের জন্য হেমেন্দ্রনাথ তিনখানি ছবি দিয়া একখানি "পার্টিসন্ স্ক্রীন্" অঙ্কিত করেন। সেই স্ক্রীন্‌খানি তাঁর কাজের মধ্যে অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ কাজ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। উহা এখন পাতিয়ালার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। পাতিয়ালাতে অবস্থানকালে তিনি জয়পুর, যোধপুর ও বিকানীরের মহারাজ-দরবারে বহু ছবি অঙ্কন করেন।

ভারতের প্রত্যেক "নেটিভ্ ষ্টেটে" শিল্পী হেমেন্দ্রনাথের ছবি অতি সমাদরের সহিত স্থান লাভ করিয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ পাতিয়ালার মহারাজ দরবারে পাঁচ বৎসর কাল কাটাইয়া মহারাজের মৃত্যুর পর দেশে ফিরিয়া আসেন।

হেমেন্দ্রনাথ "ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব আর্ট" নামে একখানি শিল্প-পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। রঙ্গিণ চিত্র শোভিত ও মুদ্রণ পারিপাট্যে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা ভারতে পূর্ব্বে আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান মাষ্টার" নামক চিত্রসংগ্রহ এলবামগুলি অতুলনীয়। তাহাতে ভারতের প্রায় সমস্ত চিত্র শিল্পীর চিত্রই সন্নিবেশিত হইয়াছে। এরূপ বহু ব্যয় ও শ্রম সাধ্য ব্যাপার তিনি অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

দেশের লোক একজন গুণী শিল্পীকে হারাইয়াছে, কিন্তু আমরা শিল্পীগোষ্ঠী হারাইয়াছি—আমাদের এক পরমাত্মীয়কে। এমন সুরসিক, বন্ধুবৎসল, সদাহাস্যময়, বন্ধু হারাইয়া আমরা শোকে অভিভূত। তাঁহার বিধবা পত্নী ও একমাত্র পুত্র সন্তোষকুমারকে প্রবোধ দিবার ভাষা আমাদের নাই। শ্রীভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধুর আত্মার সদ্‌গতি করেন।

সরকারী পরিভাষা

শ্রীরাজশেখর বসু

আশ্বিনের ভারতবর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ 'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা' পড়িয়া সুখী হইলাম; তিনি সংস্কার মুক্ত হইয়া বিচারের চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন পরিভাষা সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল আছে। তাঁহাদের প্রতি এই অনুরোধ—বিচারকালে তাঁহারা যেন এই কয়টি বিষয় মনে রাখেন।—

(১) বর্তমান ইংরেজী পরিভাষা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সমগ্র ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে, কোনও বিশেষ প্রদেশের জন্য রচিত হয় নাই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কতকগুলি প্রতিশব্দ চলে বটে (যেমন—আদালত, দারোগা, কোতোয়ালি, আবকারি, মাসুল, কানুন, মুৎতরঙ্গ, মুসন্না ইত্যাদি), কিন্তু কেবল ইংরেজী পরিভাষাই সর্বভারতে সাধারণভাবে রাজকার্যে চলে।

(২) যদি ইংরেজী শব্দ বর্জন করা হয়, তবে তৎস্থানে এমন শব্দ নির্বাচন করিতে হইবে যাহা সর্বভারতে গ্রাহ্য হইতে পারে, কেবল প্রদেশ-বিশেষের উপযোগী করিলে চলিবে না। এই সর্বভারতীয় পরিভাষা রচনার উদ্‌যোগ কেন্দ্রীয় সরকারেরই করা উচিত ছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁহারা এদিকে মন দেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে পরিভাষা সংকলন হইতেছে। শুনিতেছি বোম্বাই, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশেও শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

(৩) সর্বভারতীয় পরিভাষা যেমনই হউক, এখন যেমন সংবাদপত্রাদিতে এবং লৌকিক প্রয়োজনে কতকগুলি প্রাদেশিক প্রতিশব্দ চলে (আদালত, দারোগা, ইত্যাদি), ভবিষ্যতেও সেরূপ চলিবে। 'বাজেট, পুলিস' প্রভৃতি অনেক ইংরেজী শব্দও চলিবে, অবশ্য কালক্রমে এইরূপ শব্দের অধিকাংশ লুপ্ত হইবে। পূর্বপ্রচলিত বহু ফারসী শব্দের এই গতি হইয়াছে, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। আরও মনে রাখা উচিত—যে শব্দ বাঙালীর বোধ্য তাহা সর্বভারতের উপযোগী না হইতে পারে। বাংলায় 'সরবরাহ'—supply, কিন্তু হিন্দীতে এ অর্থ চলে না।

(৪) নূতন পরিভাষা সুবোধ্য হইবে, অর্থাৎ তাহা শুনিলেই উদ্দিষ্ট অর্থের জ্ঞান হইবে এমন আশা করা অন্যায়। বর্তমান ইংরেজী পরিভাষা কি শুনিলেই বোধগম্য হয়? Administrator general & Official Trusteeর অর্থ কয়জন জানে? সকল ক্ষেত্রে শব্দের ব্যুৎপত্তি বা বাচ্যার্থ হইতে উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝা যায় না, প্রয়োজনের বশেই আমরা নূতন শব্দের প্রয়োগ শিখি। 'সিনেমা' কাহাকে বলে তাহা সাধারণে স্বচক্ষে দেখিয়া বা পরের মুখে শুনিয়া শিখিয়াছে, শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গতি, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয় নাই। 'ব্ল্যাক-আউট, সেল-ট্যাক্স, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ, কালো-বাজার, মুদ্রা-স্ফীতি' প্রভৃতির অর্থ দশ বৎসর পূর্বে কয়জন বুঝিতে পারিত? আমরা দায়ে পড়িয়া এগুলির অর্থ শিখিয়াছি। সর্বভারতীয় পরিভাষার সমস্ত (বা অধিকাংশ) শব্দ সর্ব প্রদেশে সুবোধ্য করা অসম্ভব, যাহাতে সর্ব প্রদেশে গ্রহণযোগ্য হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত। নূতন শব্দ লোকে কালক্রমে ধীরে ধীরে শিখিবে, যেমন এক কালে ফারসী শব্দ এবং তাহার পর ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছে।

(৫) বর্তমান ইংরেজী শব্দগুলির প্রতিশব্দ খাপছাড়া ভাবে নির্বাচন করিলে চলিবে না, এক-একটি নাম হইতে উদ্‌ভূত অন্যান্য নামেরও প্রতিশব্দ হইবে। শুধু Inspector নয়, Sub-Inspector, Inspector-general, Deputy Inspector general প্রভৃতিরও সুসংগত প্রতিশব্দ চাই।

(৬) প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে এবং সন্ধি-সমাসের সাহায্যে সংক্ষেপে পরিভাষা রচনার অসামান্য শক্তি সংস্কৃত ভাষার আছে, ফারসীরও অনেকটা আছে। সংস্কৃত-ফারসী মিশ্রিত খিচুড়ি পরিভাষাও হইতে পারে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। সংস্কৃত বা ফারসা বর্জন করিয়া পরিভাষা রচনার শক্তি কোনও প্রাদেশিক ভাষার নাই। সংস্কৃত ভাষা ভারতের সকল প্রদেশে মান্য এবং সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দ সহজে স্থান পাইতে পারে। তামিল তেলেগু প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতজাত না হইলেও প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের যে প্রভাব

ফারসীর তাহা নাই, বিশেষত দক্ষিণ ভারতে নগণ্য। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'পরিভাষিক শব্দের গঠন' প্রবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা ফাল্গুন ১৩৫৪) সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বিদেশীর শাসনকালে ভারতীয় প্রজা বিদেশী পরিভাষায় ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়াছে। নবভারতে যাঁহাদের সংস্কৃতের সহিত সম্পর্ক নাই, তাঁহারাও কালক্রমে সংস্কৃতজাত পরিভাষা শিখিতে পারিবেন। ইহার জন্য ভাষাজ্ঞান বা ব্যুৎপত্তিজ্ঞান অনাবশ্যক। ফারসী আরবী না জানিয়াও আমরা বহু ফারসী আরবী শব্দ শিখিয়াছি।

(৭) পশ্চিমবঙ্গে, মধ্যপ্রদেশে ও যুক্তপ্রদেশে সংস্কৃতের ভিত্তিতেই পরিভাষা সংকলিত হইতেছে। নির্বাচিত শব্দগুলি সকল ক্ষেত্রে সমান না হইলেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে। ইহা সুখের বিষয়—কারণ, উদ্দেশ্য ও আদর্শ যখন সমান, তখন ভবিষ্যতে মিলিত আলোচনার ফলে একই শব্দাবলী গৃহীত হইবার সম্ভবনা আছে।

(৮) উল্লিখিত প্রদেশগুলিতে যে শব্দাবলী সংকলিত হইতেছে তাহা চূড়ান্ত নহে, মিলিত আলোচনার ফলে অনেক পরিবর্তন হইবে, অতএব এক-একটি শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়া এখন বিশেষ লাভ নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ভিন্ন সর্বভারতীয় পরিভাষার প্রতিষ্ঠা হইবে না। কেন্দ্রীয় কর্তাদের অভিরুচি কি প্রকার তাহা এখনও অজ্ঞাত। রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হইবে কি হিন্দুস্থানী হইবে, তাহা এখনও বিবাদের বিষয়। গণপরিষদে হিন্দীর জয় হইলে সরকারী পরিভাষা সংস্কৃতপ্রধান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানীর জয় হইলে ফারসী শব্দের বাহুল্য হইবে এবং সেরূপ পরিভাষা বাঙালী ওড়িয়া মারাঠী গুজরাটী দ্রাবিড়ী প্রভৃতির পক্ষে সংস্কৃত অপেক্ষা সুখ্‌বোধ্য সুখোচ্চার্য সুশ্রাব্য হইবে না। ইহাও সম্ভবপর যে প্রবল মতভেদের ফলে বর্তমান ইংরেজী পরিভাষাই বজায় থাকিবে। 'কেরানী, কনষ্টেবল, নির্মাণবিৎ' ভাল, কিংবা 'করণিক, আরক্ষিক, বাস্তুকার' ভাল—এ বিতর্ক এখন তুচ্ছ। ভাবিবার বিষয় এই—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজভাষার উপর কোন্ ভারতী ভর করিবেন, সংস্কৃত, ফারসী, না ইংরেজী ?

স্বপ্ন-পুরী শিল্পী—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার বিপ্লববাদের জন্মদাতা স্বামী নিরালম্ব

শ্রীজীবনতারা হালদার এম্‌-এস্‌সি

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলায় যে বিপ্লববাদের সূচনা হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে তাহাই সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ সুগম করিয়াছিল। সুখের বিষয় এই সত্য আজ উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং বাংলার এই অসামান্য অবদান সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈদেশিক শাসনের বিশ্লেষণে এই বিপ্লব প্রচেষ্টা লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত গুপ্তভাবে পরিচালিত হইত। এইজন্য ইহার নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু বাংলার বিপ্লবের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশিত হইলে বহু আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

সেই যুগে যাঁহারা জাতির নবচেতনা উদ্‌বুদ্ধ করিতে

স্বামী নিরালম্ব

সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বরণীয় রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, পণ্ডিত যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলের সুপরিচিত।

কিন্তু ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করিতে রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, এই পরিকল্পনা যাঁহার মনে প্রথম উদয় হইয়াছিল তাঁহার নাম প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনে তাঁহার নাম ছিল শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্ত্তীকালের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামের সহিত তাঁহার নামের সাদৃশ্য থাকায় তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বাঘা যতীন শৌর্য্যে, বীর্য্যে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরন্তু যতীন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী নিরালম্ব নাম পরিগ্রহ করিয়া নির্জ্জনে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেন।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলার বিপ্লববাদের জন্মদাতা—"ব্রহ্মা প্রপিতামহ।" সুখের বিষয় অধুনা তাঁহার পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার সহকর্ম্মী ও সহযোগীরা প্রকাশ্যে তাঁহার যথোপযুক্ত সম্মান দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী খানা জংসন (ই, আই, আর) ষ্টেসন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর দিকে চান্না গ্রামে ১৮৭৭ খৃঃ ১৯শে নভেম্বর তারিখে যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পার্শ্বে একটি ছোট পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত—নাম "খড়ে"। স্বাস্থ্যকর স্থান, অপরূপ পল্লীদৃশ্য। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসীম সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। ছয়ফুট লম্বা দেহ, সুগঠিত শরীর, প্রশস্ত বক্ষস্থল, সুবিশাল বাহু সম্বলিত তাঁহাকে প্রায় পাঞ্জাবীদের মত দেখাইত।

মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে—এই উদ্দেশ্য কোথায় সিদ্ধ হইবে, যৌবনকালে যতীন্দ্রনাথ তাহাই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তখন বাঙ্গালীকে সকলেই ভয় করিত, কোন প্রদেশে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হইত না। (অবশ্য বাঙ্গালী ভারতের সর্ব্বত্র গৌরবের সহিত চাকুরী করিয়াছে।) অনুমান ১৮৯৭ খৃঃ তিনি দেশীয় রাজ্য বরোদায় গমন করেন এবং নিজের নাম বিকৃত করিয়া "যতীন উপাধ্যায়" নামে তথাকার অশ্বারোহী বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। দৈবযোগে সেই সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া বরোদা রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হ'ন। এই সুযোগে যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সহিত মন্ত্রণা করেন যে বিদেশে পড়িয়া থাকা

বৃথা, শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয়—বাংলায় ফিরিয়া বিপ্লবের আয়োজন করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়া তাঁহারা অনুমান ১৯০৩ সালে বাংলায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া শ্যামপুকুরে ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ী মিলিত হইলেন—একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পরে ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ জন্য যে "স্বদেশী আন্দোলন" হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

ইহারই ফলে মাণিকতলা মুরারীপুকুরে সুবিদিত বোমার কারখানার উদ্ভব ও বৈপ্লবিক কর্ম্মের প্রসার। এই বোমার কারখানায় শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেক বিপ্লবী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখন বাংলার বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত হইলেন ও শাসনকার্য্য প্রায় অচল হইল। বাংলার সহিত বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ ভারত ভ্রমণ করেন। বিশেষতঃ এইজন্য তিনি পঞ্জাব যান এবং তথায় বিপ্লবীদলের এক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সূত্রে প্রসিদ্ধ "গধর পার্টি"র নাম উল্লেখযোগ্য। "কোমাগাটামারু" খ্যাতির বাবা গুরুদিৎ সিংও যতীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সৈন্যদলের সহযোগিতা করিবার প্রবোচনার জন্য তিনি, প্রথম হইতেই সচেষ্ট ছিলেন।

অপরদিকে বিদেশী সরকারও নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহাদের গুপ্তচরের সাহায্যে পুলিশ মাণিকতলায় "বোমার আড্ডা" আবিষ্কার করিয়া উহার নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদের বন্দী করিল এবং ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে কার্য্যকারী কোনও প্রমাণ না থাকায় তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাদিগকে কিরূপ দক্ষতার সহিত গোপনে এই সকল কঠিন কার্য্য করিতে হইত ইহা হইতেই তাহা প্রতিভাত হইবে।

সবই করিলেন, অথচ ধরা ছোঁয়া নাই। তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া সকলকে কার্য্যের নির্দ্দেশ দিতেন। হয়ত প্রমাণ পাইলে অন্যান্য শহীদের ন্যায় তাঁহাদেরও প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর হইত। বাংলার বিপ্লব সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক স্থলেই যতীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কর্ম্মের ইঙ্গিত আছে। এই আলিপুর বোমার মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের প্রারম্ভে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অনুমান ১৯০৭ খৃঃ যতীন্দ্রনাথ শ্রীমৎ সোঽহং স্বামীর (ঢাকার বাঘ-মারা শ্যামাকান্ত) সংস্পর্শে আসেন এবং গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও তদবধি স্বামী নিরালম্ব নামে পরিচিত হ'ন। সন্ন্যাসী হইয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করেন এবং বহুদিন হিমালয়ে বিচরণ করিয়া তিব্বতে মানস সরোবর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। পরিশেষে নিজ জন্মস্থান চান্নাগ্রামের বহির্দ্দেশে লোকালয় হইতে দূরে, নির্জ্জন প্রান্তরে, নদীতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই স্থানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতেন এবং বৎসরে দুই একবার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য বসাক ফ্যাক্‌টরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবিজয়বসন্ত বসাক মহাশয়ের বরাহনগরস্থ উদ্যানবাটীতে থাকিতেন।

স্বামী নিরালম্ব অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক রাজযোগী, আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ। তাঁহার সান্নিধ্যে দেহমন অনুপম সান্ত্বনা লাভ করিত, এক অপূর্ব্ব চিদানন্দের অনুভূতি হইত। নানাশাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি সর্ব্ববিধ সংস্কার বিমুক্ত ছিলেন এবং ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, বিদ্বান-মূর্খ, হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলেরই প্রতি সমান প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আকৃষ্ট করিতেন। সস্নেহ আপ্যায়নে সকলকেই প্রিয়জন করিয়া লইতেন।

তাঁহার আশ্রম নিতান্ত আড়ম্বর হীন, পূর্ণ কুটীর মাত্র। নদীতীরে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য—অতীব চিত্তাকর্ষক। পৌরাণিক যুগের বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম স্মরণ করাইয়া দেয়। তথায় অনাবিল শান্তি বিরাজমান। বাস করিলে স্বর্গসুখ অনুভব হয়।

সুবিখ্যাত সিদ্ধযোগী ভগবান্ তিব্বতীবাবার সহিত নিরালম্ব স্বামীর অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। সেই সূত্রে

তিব্বতীবাবার অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পাইত। তিনি স্বয়ং প্রায় ১৫০ বৎসর প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন এবং প্রার্থীদের দিতেন। চিকিৎসক পরিত্যক্ত কলেরা রোগীকে দেশীয় ঔষধ দ্বারা আশ্চর্য্যভাবে নিরাময় করিয়াছেন।

১৯৩০ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামী নিরালম্ব বরাহনগরে শ্রীবিজয়বসন্ত বসাক মহাশয়ের ভবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার নশ্বর দেহের ভস্মাবশেষ লইয়া চান্না আশ্রমে সমাধি রচনা হয়।

গার্হস্থ্য জীবনে শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবীর সহিত যতীন্দ্রনাথের পরিণয় হইয়াছিল। পরে তিনিও সন্ন্যাসিনী হইয়া স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে ধর্ম্মসাধনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও শিষ্যদিগের মাতৃ-স্বরূপিনী ছিলেন। তিনি স্বামীর পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। আশ্রমে তাঁহারও সমাধি আছে।

আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী নিরালম্বের প্রধান শিষ্য স্বামী প্রজ্ঞানপাদ বর্ত্তমান। তিনিও রাজযোগী আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। বিপ্লববাদে তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্-বি।

যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জনৈক লেখক অঙ্কিত প্রকাশ করিয়াছেন যে "বাংলায় নবযুগের সূচনা করিয়াছেন দুইজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—ধর্ম্মক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্ম্মক্ষেত্রে স্বামী নিরালম্ব।" ইহা বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয়। বস্তুতঃ নিরালম্ব স্বামীর অননুভূত প্রেরণা না পাইলে ও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার নির্দ্দেশ না থাকিলে বাংলার বিপ্লবী যুবকবৃন্দ স্বাধীনতা যজ্ঞে স্মিতমুখে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আত্মাহুতি দিতে পারিত কি? স্বাধীনতা যুদ্ধ সফল হইত কি?

লেখকের পরম সৌভাগ্য যে স্বামী নিরালম্বের ন্যায় মুক্ত পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সেবা করিবার এবং আশ্রমে তাঁহার সংসর্গে থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল।

দেবতার বংশ বিভ্রাট

স্থানীয় বিশেষজ্ঞ—মূর্ত্তির প্রতিলিপি দেখে মনে হয় দাক্ষিণাত্যের চোল সাম্রাজ্যের সমসাময়িক কাল।

বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক—বল কি হে, শেষ পর্যন্ত দেবতার বংশ-বিভ্রাট ঘটিয়ে ছাড়লে! দেখছ না গণপতি গ্রীক প্রভাবে অভিভূত। কাপড়ের ভাঁজই তার প্রমাণ। গান্ধার স্কুল যেন দেবতাকে আগলে বসে আছে।

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

আধ্যাত্মিক সাধনা ও তন্ত্র

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

মানব শিশুর মনে জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ার গোড়া থেকেই প্রশ্ন শুরু হয় এটা কী, ওটা কেন? তার 'কী ও কেন'র প্রশ্নের ঠেলায় বাপ-মা আর বয়স্ক অভি-ভাবকদের হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। শিশু বড় হ'তে থাকে, বাইরের দেহর সঙ্গে প্রাণের তাগিদ বাড়ে, তাদের চাহিদা যোগাতে হয় পদে পদে, সমাজের ছাঁচে তাকে তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। তার আসে অন্নচিন্তা, অর্থচিন্তা, সবরকম পুরুষার্থলাভের চিন্তা—সমাজে প্রতিষ্ঠা, সম্মান, দেহ-প্রাণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, এই নিয়েই তার মন ব্যাপৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর কৌতুহল-প্রিয়তা চাপা পড়ে যায় পরিণত বয়সের কর্মশীলতার চাপে। কিন্তু চাপা পড়লেও, তা তো লোপ পায় না—অবকাশ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়।

যখন মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বদলে আসে অসুখ ও অস্বাচ্ছন্দ্য—যখন সে খ্যাতির আশা করে পায় অখ্যাতি, যশের বদলে আসে তার অপযশ, সম্মানের বদলে অসম্মান—সাফল্যের চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পরিণত হয় এবং নিজের সাধারণ কর্ম ও চেষ্টা দিয়ে সে যখন তার ব্যতিক্রম করতে পারে না, তখন তার অন্তর থেকে প্রশ্ন উঠে না। সে তখন জানতে চায়, কী করলে এই অসুখ, অস্বাচ্ছন্দ্য, ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর্ত চায় তার দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি, অর্থার্থী চায় তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি, অথচ লৌকিক কোন চেষ্টায় তাদের এ আর্তিনাশ হয় না, সহস্র কৌশলেও কাম্য করায়ত্ত হয় না।

মানুষের দুঃখ দূর করা এবং কাম্যলাভের আকাঙ্ক্ষা সফল করার উদ্দেশ্যে বাইরের দিক দিয়েও তার চেষ্টার অন্ত নেই। এই চেষ্টার ফলেই মানুষের দুঃখ দূর করা ও তার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার অভিপ্রায়ে জড় প্রকৃতির দৃশ্য ও অদৃশ্য কতকগুলি শক্তিকে তার কাজে লাগান সম্ভব হয়েছে এবং এই শক্তিগুলিকে ভিত্তি ক'রেই নানা-রকমের জড়বিজ্ঞানের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ বাইরের এই জড়শক্তি দিয়ে তার দুঃখ-নিবৃত্তির এবং আকাঙ্ক্ষা-পূর্তির যতই চেষ্টা করুক, তার দুঃখ বা আকাঙ্ক্ষা কোনটাই মিটছে না। এক রকমের দুঃখ নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যরকমের দুঃখ মাথা খাড়া করছে। একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছে। মোট কথা দুঃখেরই হোক আর আকাঙ্ক্ষারই হোক, কোনটারই অত্যন্ত নিবৃত্তির পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না। সুখ ও সাফল্যের আশার পিছনেই দুঃখ ও ব্যর্থতার আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছে। বাইরের শক্তি এবং প্রকাশ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন তার দুঃখ দুর্দশার কোন কিনারা করতে বা তার মনের অপূর্ণ কামনা বাসনা পূর্ণ করার কোন হদিশ দিতে পারে না, তখন সে খোঁজে এমন কোন গুহ্য শক্তি বা গুহ্য বিজ্ঞান আছে কিনা—যা তার দুঃখ কষ্ট মোচন কিম্বা বাসনা পূর্ণ করতে পারে। তখন তার মনে জাগে এই গুহ্যশক্তি ও গুহ্যবিজ্ঞানের দর্শন কামনা। যা করলে এই শক্তি বা জ্ঞানলাভ হ'তে পারে সেই চেষ্টা সে করতে চায় এবং তাই হয় তার সাধনার উদ্দেশ্য।

মানুষের মধ্যে আবার অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, যাঁদের শৈশবের সেই 'কী ও কেন' আর থামতে চায় না। তাঁদের বাইরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত বাড়তে থাকে, তাঁদের এই জিজ্ঞাসাও তত বেড়ে চলে। তাঁদের সুখ-দুঃখ সাফল্য-বিফলতার অভিজ্ঞতা তাঁদের শুধু দুঃখ দূর করবার বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার উপায় খোঁজার প্রেরণাই দেয় না, তাঁদের মনে জিজ্ঞাসাও নিয়ে আসে—"কী এই সুখ দুঃখ? এই কামনা বাসনা? কেন এই অভিজ্ঞতা? এর সার্থকতা কী?" বাইরের বিজ্ঞান-দর্শন তাঁদের তৃপ্তি দিতে পারে না—তাঁদের মনে প্রশ্ন থেকেই যায় "ততঃ কিম্?"—তার পরে কী? কোথায় এর শেষ? তাঁদের এই জিজ্ঞাসা তাঁদের এই অজানার সন্ধানে প্ররোচিত করে এবং তাই হয় তাঁদের সাধনা।

অতএব সাধারণ মানুষের সাধনার দুটো উদ্দেশ্য থাকে—(১) শক্তিলাভ, যে শক্তি দিয়ে সে তার দুঃখ দূর করতে, স্বস্তি পেতে বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু-লাভ করতে পারে—(২) জ্ঞানলাভ, যে জ্ঞান দিয়ে তার সকল কৌতুহল নিবৃত্ত হ'তে পারে। অন্ততঃ মানুষের মনের বাইরের দিকে এই দুটো উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়।

বাইরে এইভাবে প্রকাশ পেলেও, গুহ্য সাধনার আসল তাৎপর্য কিন্তু এ নয়। সকল আর্ত, সকল অর্থার্থী, সকল জিজ্ঞাসু, গুহ্য সাধনার দিকে অগ্রসর হয় না। এঁদের মধ্যে যাঁদের প্রেরণা আসে, তাঁরাই শুধু এদিকে ঝুঁকে পড়েন। এই প্রেরণা যে কী ক'রে আসে, সে এক রহস্যময় ব্যাপার, কিন্তু এই প্রেরণা যার যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ সে গুহ্য সাধনার অধিকারী হয় না। প্রেরণা না এলে, আসে না শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকলে কেউ কোন কাজে বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারে না। যুক্তি-তর্ক দিয়ে কারো শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস আনা যায় না। যার যে বিষয়ে আকর্ষণ সে তারই অনুকূলে যুক্তি খোঁজে, যে বিষয়ে তার বিরাগ তার স্বপক্ষের যুক্তি সে প্রতিকূল যুক্তি দিয়ে খণ্ডিত করতে চায়। সেই জন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে "নৈষা মতিস্তর্কেনাপনেয়া"—সেই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন" তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"। অর্থাৎ তত্ত্ব যদি কেউ জানতে চায়, তার প্রথম প্রয়োজন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, যা বাইরের আচরণে প্রণিপাতের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর পরিপ্রশ্ন, অর্থাৎ যা তা এলোপাতাড়ি প্রশ্ন নয়, সেই ধরণের প্রশ্ন বোঝবার আন্তরিক ইচ্ছার উপর যার ভিত্তি, তার পর সেবা—যার অর্থ হচ্ছে অহঙ্কার ত্যাগ। সুতরাং গোড়াতে দরকার গুহ্য বিদ্যার দিকে আকর্ষণ, যা না হ'লে কোন সাধনা সম্ভব নয়।

গুহ্যবিদ্যার দিকে এই যে ঝোঁক বা অনুপ্রেরণা এর আসল তাৎপর্য্য হচ্ছে একদিকে বাইরের জড়প্রকৃতির বাঁধন থেকে অপর দিকে সেই জড়প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব। জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কোন কোন

বিষয়ে তার উপর একটু আধটু অধিকার স্থাপন করছে এবং তাকে দিয়ে একটু আধটু কাজ করিয়ে নিচ্ছে বটে, কিন্তু জড়বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হোক্, যতই চমকপ্রদ নতুন নতুন আবিষ্কার করুক, জড়ের বাঁধনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার শক্তি তার নেই। তার সকল আবিষ্কার সকল উদ্ভাবন স্থূল জড়ের নিয়মকে স্বীকার ক'রে নিয়ে, সেই জড় প্রকৃতির অধীনে—জড়প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রে নয়—জড়বিজ্ঞান দিয়ে মানুষ প্রকৃতির অধীনে তার চলাফেরার গণ্ডী বাড়িয়েছে, কিন্তু শক্তির মূল উৎস, তার আসল তত্ত্ব জানা না থাকাতে, প্রকৃতির অধীনতার গণ্ডী সে ছাড়াতে পারে নি। প্রকৃতির এ বাঁধন কাটিয়ে যে স্বাধীন হওয়া যেতে পারে এ কল্পনাও জড়বিজ্ঞানে স্থান পায় নি। উলটে, যা স্থূল-জড় নয় সেই প্রাণ-মনের ব্যাপারগুলিকেও সে স্থূল-জড়ের জন্য নির্দিষ্ট আইন কানুনের মধ্যে বেঁধে, তার বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে চেয়েছে। জড়বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা অর্জন নয়, বন্ধনের নিয়ম আবিষ্কার ক'রে, সেই নিয়মের অধীনে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা। জড়বিজ্ঞান গোড়াতেই ধ'রে নিয়েছে প্রকৃতি কতকগুলি কাটা ছাঁটা নিয়মে বাঁধা—যা সার্বভৌম, কোন দেশে কোন কালে যার নড়-চড় হয় না, সুতরাং মানুষ কোনকালে কোন অবস্থায় এ নিয়মের নাগপাশ থেকে মুক্ত হ'তে পারে না। এই নিয়মগুলি আবিষ্কার ক'রে এবং তা মেনে চললে তার স্বচ্ছন্দ্য কতকটা বাড়াতে পারে, এইমাত্র। জড়বিজ্ঞান প্রাণ-মনের স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার করতে চায় না, সে মনে করে প্রাণ-মনও স্থূলজড়েরই একটা অভিব্যক্তি মাত্র। কাজেই স্থূল জড়ের নিয়মে তারাও নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে গুহ্যবিদ্যার তফাৎ ঐখানে। গুহ্যবিদ্যার আসল উদ্দেশ্য জড়প্রকৃতির এই নিয়ম-কানুনের বাঁধনের উপরে গিয়ে তার শক্তির রহস্য, তার মূল উৎস, তার গুহ্যতত্ত্ব আবিষ্কার করা এবং সেই শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে তার সাহায্যে জড় নিয়মের বাঁধন মুক্ত হওয়া, সেই গুপ্ত শক্তি দিয়ে মন প্রাণকে আয়ত্ত করা এবং মন প্রাণের মিলিত শক্তি দিয়ে জড়দেহ ও জড়শক্তির উপর অধিকার স্থাপন করা। জড়বিজ্ঞান যেখানে চাইছে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন প্রাণ ও স্বাধীনতর মনকেও জড়ের নিয়মে বাঁধতে—জড়প্রকৃতির অধীনে আনতে, গুহ্যবিদ্যা সেখানে দাবী করছে মনের স্বাতন্ত্র্য, প্রাণ ও জড়ের জগৎকে মনের শক্তিতে চালিত করতে। প্রাণ ও জড়ের শক্তি সে অস্বীকার করছে না, কিন্তু সে শক্তির প্রভুত্ব সে মানতে রাজী নয়, সে শক্তিকে সে নিজের খুসীমত নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। জড়বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষ যেখানে দিনের পর দিন জড়প্রকৃতির নিয়মের নাগপাশ আবিষ্কার ক'রে অবাক হ'য়ে, তার চরণে মাথা নত ক'রে, তার কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে, গুহ্যবিদ্যার সাধনায় সেখানে সে একটু একটু ক'রে এই নিয়মের বেষ্টনী ভেঙে, তার কর্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে, স্বাধীন হ'তে চাইছে। সিদ্ধ জড়বিজ্ঞানী যতই অগ্রসর হোন, তিনি জড়প্রকৃতির দাস; সেই প্রকৃতির বাঁধা নিয়মে তাকে সেবা ক'রে তার অধীনতা স্বীকার ক'রেই তাঁর যা কিছু প্রাপ্তি—ওরই মধ্যে তাঁর ঐশ্বর্য্যের সীমা। সিদ্ধগুহ্যবিদ্যাবিদ্ কিন্তু জড় প্রকৃতির সহযোগী, তার প্রভু; তাঁরই ইচ্ছামত জড়প্রকৃতি চলতে বাধ্য। তিনি ইচ্ছা করলে জড়-প্রকৃতিকে তাঁর ধরা-বাঁধা নিয়মে কাজ করতে দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে তার ব্যতিক্রম করাতেও পারেন, তাঁর ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। জড়বিজ্ঞানী যতই অগ্রসর হোন, তিনি প্রকৃতির পাশবদ্ধ জীবই র'য়ে যান, সে জীবত্ব থেকে তাঁর মুক্তি নেই। কিন্তু গুহ্যবিদ্যাবিদ্ প্রকৃতির পাশ থেকে মুক্তিলাভ ক'রে শিবত্ব প্রাপ্ত হন। এই হচ্ছে গুহ্যবিদ্যার চরম সাধনা পরম লক্ষ্য।

সাধারণ মানুষের সাধারণ মন সংশয় প্রকাশ না ক'রে পারে না। এও কি সম্ভব? এ কখনও হ'তে পারে? বিশেষ ক'রে এযুগের শিক্ষায় গঠিত সাধারণ মানুষের মন বাইরের দৃশ্য জগৎকেই একমাত্র সত্য ব'লে বুঝতে শিখেছে, সে ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে সেইটেই বাস্তব, সেইটেই সত্য—যা বাইরে অনুভব করা যায়, যার অস্তিত্বের প্রমাণ বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করা যায়, কাজেই এই গুহ্যশক্তির ব্যাপারকে সে সহজে আমল দিতে চায় না। যদি দৈবাৎ কোন অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয় তাকে অমূলক কল্পনা, বিভ্রম বা ফাঁকি ব'লে উড়িয়ে দিতে পারলে মন যেন স্বস্তি পায়। তবু সাধারণ মানুষেরও অন্তশ্চেতনায় এমন একটি কিছু আছে, যা তাকে অদৃশ্য জগতের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু যা অজানা, যা অসাধারণ, তার দিকে মানুষের আকর্ষণ থাকলেও, সঙ্গে সঙ্গে তার সম্বন্ধে একটা আশঙ্কাও থাকে। সেইজন্যই গুহ্যবিদ্যার দিকে আকর্ষণটাকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে বা অস্বীকার ক'রে সে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। কিন্তু যা সত্য তাকে চোখ বুজে অস্বীকার করলেই তার সত্তা বা ক্রিয়াশীলতা লোপ পায় না। কাজেই তাকে যতই মন থেকে সরিয়ে দিই, তা থেকে থেকে মনের মধ্যে উঁকি দিতে ছাড়ে না।

এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে। আজকার শিক্ষিত সমাজে এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁরা মনে করেন গুহ্যশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার চেষ্টা ও গুহ্যশক্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করা মানবতা বা মানব ধর্মের বিরোধী। অনেকে একে আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী ব'লে প্রচার করতেও কসুর করেন না। এঁরা মানবতা, মানবধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বোঝেন, কে জানে! এঁরা কি বলতে চান যে, আজকার মানুষ তার মন বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু জানতে বা বুঝতে পারে এবং তার শক্তিতে যতটুকু করতে পারে সেইটুকুই মানবতার সীমা? তার মন-বুদ্ধির সেই শক্তির বিকাশ কি তার মানবতার বিরোধী যে শক্তি দিয়ে অজানা জগতের সঙ্গে তার পরিচয় হ'তে পারে এবং সেই অজানা জগতের শক্তিকে তার কাজে লাগাতে পারে? আশ্চর্য লাগে যে, বাইরে জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কার উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা বা সাধনা বাইরের জ্ঞান দিয়ে দুঃখ দূর করার চেষ্টা, কাম্য-সিদ্ধির প্রয়াস, স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম—এর কোনটাই আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী ব'লে তাঁরা মনে করেন না, কিন্তু গুহ্যবিদ্যা বা গুহ্যশক্তির সাহায্যে কিছু করতে গেলেই তা হ'য়ে ওঠে আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী!

আসল কথা, আজকার মানুষের যে মানসিক ব্যক্তিত্ব (Mental Ego) তাকেই তাঁরা মানবতার প্রকাশ ব'লে মনে করেন এবং মানসিক চেতনার যতদূর সম্ভব অনুশীলনকে ধর্ম ব'লে ধরে নিয়েছেন। এই মানসিক চেতনার সর্বাঙ্গীণ পরিণতিকেই তাঁরা মানবতার চূড়ান্ত ব'লে মনে করেন এবং তাঁরা ভাবেন পাশ্চাত্য দার্শনিক নীটশের কল্পিত সুপারম্যানের (মহামানব বা অতিমানবের) মত একটা মহান্ ব্যক্তিত্বই মানবতার চরম। মানুষের মধ্যে মানসিক ব্যক্তিত্বের চেয়ে উচ্চতর ও ঢের বেশী শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের বিকাশ যে সম্ভব, তার চেতনা মানসিক ধারা অতিক্রম ক'রে যে তার চেয়ে উচ্চতর কোন ধারা আশ্রয় করতে পারে, এ কল্পনা করতেও শিউরে ওঠেন। তাঁদের ধারণা এই মানসিক ব্যক্তিত্বের আশ্রয় ছাড়লেই, মানুষের জীবনের রসধারা সব শুকিয়ে উঠবে; তার সকল আনন্দ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে; থাকবে শুধু একটা একঘেয়ে বৈচিত্র্য-হীনতা বা একেবারে শুষ্ক, রসলেশহীন। এঁরা মুখে আধ্যাত্মিকতার বুলি আওড়ান এবং এঁদের মনেও সম্ভবত: আধ্যাত্মিকতার একটা ধারণা বা আদর্শ গ'ড়ে তোলেন, কিন্তু কোনমতেই বুঝতে পারেন না—তাঁরা যাকে আধ্যাত্মিকতা বলছেন সেটা আসলে তাঁদের মনের একটা বিলাসমাত্র—তাঁদের মনের দর্প আধ্যাত্মিকতার একটা বিকৃত প্রতিচ্ছায়া। হয়ত তাঁরা মনে করেন—মন দিয়েই মানসিক চেতন দিয়েই আত্মাকে চেনা বা বোঝা যাবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক শব্দটির মানেই হচ্ছে চেতনার রূপান্তর—মানুষের মধ্যে মনের চেতনার বদলে আত্মিক চেতনার উন্মেষ। সে চেতনার মধ্য দিয়ে মানুষ এমন এক জগতের সন্ধান পাবে, যা মানস চেতনা দিয়ে ধারণা করাও সম্ভব নয়। সে জগৎ তার মানস চেতনা দিয়ে গড়া জগতের চেয়ে ঢের বড়—তার ব্যাপকতা, তার বিশালতা, তার অভিজ্ঞতা মনের ধারণার অতীত। সে জগৎ বৈচিত্র্যহীনতায় নীরস তো নয়ই, বরং সত্য শিব-সুন্দরের নানামুখী বিকাশে সমৃদ্ধতর। একই জগতে থেকেও পশুর চেতনা যেমন মানুষের মানস চেতনায় প্রকট জগতের বৈচিত্র্য বুঝতে পারে না, তেমনি মানুষের মানস-চেতনাও আত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মহামানব বা অতি মানবের সম্মুখে অভিব্যক্ত জগতের বিশালতা ও সৌন্দর্যের ধারণা করতে পারে না। গুহ্য সাধনার আসল উদ্দেশ্য বা তাৎপর্যই হচ্ছে মানুষের আত্মিক চেতনার উদ্বোধন, তাকে মানস চেতনার নিম্নভূমি থেকে আত্মিক চেতনার ঊর্ধ্ব-লোকে উন্নীত করা—সুতরাং গুহ্য বিদ্যার তত্ত্ব ও গুহ্য শক্তির কার্যকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী তো নয়ই, বরং তা আধ্যাত্মিক-তার পথে অগ্রগতিই সূচনা করে।

আজকার মানুষের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা মনে করেন, প্রকৃতির অনুবর্তন করাই মানুষের ধর্ম; সুতরাং তাঁদের কাছে গুহ্য বিদ্যার জ্ঞানলাভ ক'রে, বাহ্য প্রকৃতিকে অতিক্রম করার চেষ্টা যে অধর্ম বা অস্বাভাবিক ব'লে মনে হবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু যদি প্রকৃতির মধ্যে ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়, তাহ'লে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, প্রকৃতি যেমন তাঁর সৃষ্টিকে একদিকে নিয়মের বাঁধনে বেঁধেছেন, অপর দিকে তাকে সেই বাঁধন থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীন হওয়ারও ইঙ্গিত করছেন। তাঁর সৃষ্ট প্রাণহীন জড়জগত নিয়মের বাঁধনে একে-বারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দেখলে মনে হয় না—সেখানে কোথাও কোনকালে স্বাধীন ইচ্ছার স্থান বা অবসর আছে। এই জড়ের মধ্যে যখন প্রাণের প্রকাশ হ'ল তখন এই নিয়মের বাঁধনের মধ্যেও কোথায় যেন স্বাধীন ইচ্ছার আমেজ জেগে উঠল, ঠিক সুস্পষ্টভাবে নয়, ঘুমন্ত শরীরের নড়া-চড়ার মত একটা অব্যক্ত মগ্ন চেতনার মধ্যে। জড় নিয়মের নাগপাশ শিথিল না হ'লেও, আবেষ্টন হিসাবে নিজেকে গ'ড়ে তোলার মধ্যে কোন কোন ব্যাপার তার পছন্দ না-পছন্দের ইঙ্গিতের মধ্যে যেন স্বাধীন ইচ্ছার একটা অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা পাওয়া যেতে লাগল। উদ্ভিদের চেয়ে এটা একটু স্পষ্ট হ'ল জীব জগতের মধ্যে। জীব জগতের সূচনায় কীট পতঙ্গের মধ্যে এই স্বাধীন ইচ্ছা ততটা স্পষ্ট বা সজাগ নয়, কিন্তু উন্নততর পশুর মধ্যে তার অভিব্যক্তি পরিণত না হ'লেও, স্পষ্টতর। উন্নততর পশু, জড় প্রকৃতির হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ ক'রে ব'সে থাকে না, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য, দৈহিক সুখস্বস্তির জন্য, সে নিজের ইচ্ছামত একটু আধটু কৌশলও অবলম্বন ক'রে কিছু উদ্ভাবনী শক্তিরও পরিচয় দেয়। অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম সে করতে পারে না, কিন্তু তার পরিবেশনের মধ্যে প্রকৃতির শক্তির সকল অভিব্যক্তি সে বিনা প্রতি-বাদে মাথা পেতেও নেয় না। প্রকৃতির যে সব শক্তির খেলা তাকে পীড়া দেয় তা থেকে বাঁচবার জন্য, সে তার জ্ঞানবুদ্ধিমত চেষ্টাও ক'রে থাকে, তার কাম্যবস্তু পাওয়ার পথে প্রকৃতির সৃষ্ট বাধা অতিক্রম করার জন্য সে একটু আধটু কৌশলও অবলম্বন করে। সব জায়গায় তার চেষ্টা সফল হয় না, কিন্তু যেখানে তার ব্যর্থতাও আসে, সেখানেও তার প্রাণ মন আক্রোশ বা আর্তনাদ দিয়ে প্রতিবাদ জানায়। এর মানে আর কিছু নয়, জড়ের কাটা ছাঁটা প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে মুক্তির জন্য প্রাণ মনের বিদ্রোহ—তাদের স্বাধীনতার কামনা।

মানুষের মধ্যে এই স্বাধীনতার কামনা বা স্বাধীন ইচ্ছা আরও প্রকট। মানুষ পশুর মত শুধু জড় প্রকৃতির বিকশিত শক্তিগুলি কাজে লাগিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, তার অনভিব্যক্ত শক্তিগুলি আবিষ্কার ক'রে, সেই শক্তি দিয়ে তার দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা দূর করার এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার পথ উদ্ভাবন ক'রে জড় প্রকৃতির রূপ বদলে দিতেও চাইছে। মানুষ জড় প্রকৃতির নিয়মের ধারা আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞান গ'ড়ে তুলছে এবং সেই বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ সে করছে, তাতে ক'রে প্রকৃতির সৃষ্ট জগৎ একটা নতুন রূপ গ্রহণ করছে। মানুষ তার সুবিধার জন্য, তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, প্রকৃতির শক্তি দিয়েই প্রকৃতির সৃষ্ট উদ্ভিদ্ থেকে শুরু ক'রে, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানুষ সবাইকেই নতুনভাবে গ'ড়ে তুলতে চাইছে। এ যেন প্রকৃতির স্বৈরতান্ত্রিক সাম্রাজ্যকে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা। যদিও প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম মানুষ করতে পারে নি, তবু সেই নিয়মের ধারা আবিষ্কার ক'রে, প্রকৃতিকে দিয়ে সে এমন কতকগুলো কাজ করিয়ে নিচ্ছে, যা প্রকৃতি আপনা হ'তে কোনদিন করত কিনা সন্দেহ। আজ মানুষের হাতে পৃথিবীর উপরের

দিকটা যে ভাবে তার রূপ বদলেছে, তা কখনই হ'ত না, যদি পৃথিবীতে পশু সৃষ্টির পর প্রকৃতি মানুষের সৃষ্টি না করতেন। প্রাকৃতিক নিয়মের নাগপাশে বাঁধা, সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির খেয়াল ও খুসির অধীন এই জড়-জগৎ; তার বুকে এই যে ক্রমশঃ উদ্ভিদ্, কীট, পশু, মানুষের অভিব্যক্তি, এ থেকে কি এইটেই মনে করা স্বাভাবিক নয় যে, প্রকৃতি যে শক্তি ও জ্ঞান তাঁর মধ্যে সংগুপ্ত রেখেছেন, তা তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যেই ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করতে চান? তিনি চান এমন শরীর যে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে, তাঁর স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারবে? মানুষ আজ তাঁর তত্ত্ব কিছু কিছু জানতে পেরেছে, তাঁর শক্তি কিছুটা সে আয়ত্ত ক'রে কাজে লাগাতে পেরেছে, কিন্তু এখনও তার জানার চেয়ে না-জানাই বেশী, তার শক্তির চেয়ে অক্ষমতাই প্রকটতর। প্রকৃতির জ্ঞান শক্তির মূল রহস্য, সে ভাঁড়ারের চাবিকাঠি প্রকৃতি এখনও নিজের হাতেই রেখেছেন—তা মানুষের কাছে এখনও গুহ্যাতিগুহ্য, তার রক্ষয়িত্রী প্রকৃতি এখনও নিজেই। তবু মানুষকে তিনি যে তাঁর অধিকারের এতটুকুও ছেড়ে দিয়েছেন, এর মধ্যে তাঁর ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি বলতে চাইছেন—এসো বীর, এগিয়ে এস, জয় কর, স্বাধীনতা তোমার—"যো মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতি বলেন লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।" জীব শিবত্ব অর্জন করুক, তাঁর পদতলে শবরূপে প'ড়ে না থাকে, তাঁর ভর্তা হ'য়ে, তাঁর সহযোগী হ'য়ে তাঁর পাশে উঠে দাঁড়াক, এই হচ্ছে তাঁর কামনা। গুহ্য-সাধনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই—মানুষকে এই পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং এই সাধনা যে ধারাই অবলম্বন করুক, তা মানুষের প্রবর্তিত রীতি নীতি-বিধান মানুক আর না-ই মানুক, তা যদি আন্তরিক হয়, তা যে সকল সাধনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রকৃতি চান মানুষ তাঁর এই জ্ঞান, তাঁর এই শক্তি লাভ করুক। সেই জন্যই মানুষের জ্ঞানের পিপাসা কোন মতেই নিবৃত্ত হ'তে চায় না—তার শৈশব থেকে যে জিজ্ঞাসা শুরু হয়, জীবনের শেষ প্রান্তেও তা থামে না। সেইজন্যই কোন অবস্থাতেই সে সন্তুষ্ট নয়—ক্রমাগত সে বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়। স্বাধীনতার জন্য চেষ্টায় সে যতই অবস্থার অদল বদল করুক, তার কাম্য স্বাধীনতা কোন অবস্থার মধ্যেই সে পায় না। যদি চোখ-কাণ বুজে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলাই তার ধর্ম হয়, তাহ'লে তার মনে এই অফুরন্ত জিজ্ঞাসা, স্বাধীনতা বা বন্ধন-মুক্তির এই অদম্য পিপাসা জাগে কেন? সেই আদর্শের কল্পনা মানুষের মনে কোথা হ'তে আসে, যার অভিব্যক্তি বা আভাষ ব্যক্ত জগতের কোনখানে খুঁজে পাওয়া যায় না? মানুষের মনে এই যে জিজ্ঞাসা, এই যে কামনা, এইযে কল্পনা, এ তো তার এগিয়ে চলার জন্য প্রকৃতিরই ইঙ্গিত। প্রকৃতি শুধু তার নিয়মের বাঁধনের মধ্যেই জীবকে খানিকটা প্রশস্ততর বিচরণ ক্ষেত্র দিয়েই খুসি নন, তিনি চান জীব অবাধভাবে তাঁর নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে না থেকে, নিজেই নিজের গণ্ডী নিজের নিয়ম রচনা করুক। প্রকৃতির রচিত এই জগৎ, তাঁর নিয়ম, তাঁর ধারা যদি পছন্দ হয়, সে গ্রহণ করুক, না হয়, সে তার নিজের নিয়ম দিয়ে নিজের পরিবেশ গ'ড়ে তুলুক। মোটকথা সে যাই করুক, নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়, আনন্দের সাথে করুক, বাইরের চাপে বাধ্য হয়ে নয়। প্রকৃতির এই ইঙ্গিত কাজে পরিণত করার জন্যই গুহ্যবিদ্যার সৃষ্টি।

গুহ্যবিদ্যা আপাততঃ গুহ্য এবং গুহায় নিহিত হ'লেও, একদিন তা উন্নততর জীবের প্রকাশ্য সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আজ যা মানুষের কাছে অসামান্য অলৌকিক, একদিন তা জীব জগতে সামান্য ও লৌকিক হ'য়ে উঠবে। সেই জীব কি এই মানুষ? না, ক্রমবিকাশের ধারায় উন্নততর প্রাণশক্তি ও দেহগঠন নিয়ে কোন অভিনব জীবের আবির্ভাব ঘটবে, এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনও সম্ভব নয়। হয়ত, এ নির্ভর করবে সমগ্রভাবে মানব সমাজের ভবিষ্যৎ আচরণ ও এ ব্যাপারের দিকে তার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। কে জানে! কিন্তু বর্তমান মানুষের মধ্যেও এই বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করবার এবং গুহ্য জগতের সঙ্গে পরিচয় ও গুহ্যশক্তির উপর অধিকার লাভ করার বীজ যে সুপ্ত আছে, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ নেই। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এ সম্বন্ধে জ্ঞান ও শক্তিলাভ ক'রে, তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রচারও ক'রে গেছেন। সুতরাং মানুষ যদি অবহেলা না করে এবং চেষ্টা না ছাড়ে, তাহ'লে মানুষের দেহেই একদিন এই উন্নততর জীবের আবির্ভাব ঘটবে, এ আশা অমূলক বা অসঙ্গত নয়।

কিন্তু এই যে মানুষের মানস-চেতনায় আত্মিক চেতনায় রূপান্তর, তা তো সমগ্রভাবে একদিনে অকস্মাৎ ঘটা সম্ভব নয় এবং সকল মানুষের মধ্যে তার বিকাশ একভাবেও ঘটতে পারে না। মানুষের মধ্যে মানসচেতনা যেমন এক ব্যক্তির মধ্যে এক এক ভাব নিয়ে ক্রমশঃ বিকাশলাভ করেছে, আত্মিক চেতনার বেলাতেও তার অন্যথা হওয়ার কারণ নেই। মানুষের মধ্যে কারো বা চিন্তাশীলতা, কারো বা জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে, কারো বা ভাবালুতা বা অনুভূতির মধ্য দিয়ে, কারো বা কোনরকম শক্তির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই আত্মিক চেতনার আংশিক অভিব্যক্তি দেখা যেতে পারে। কোথাও হয়ত সে অভিব্যক্তি স্থায়ীরূপ নেবে, কোথাও হয়ত তা ক্ষণিক দীপ্তিরূপে প্রকাশ পাবে। কোথাও তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে গ'ড়ে উঠে মানস চেতনার ধারাকে বদলে দেবে, আবার কোথাও বা তা মানস চেতনার মধ্যেই একটা অস্পষ্ট আকার নিয়ে দেখা দেবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কেন না, ব্যক্তিগতভাবে কোন একজনের মধ্যেই হোক্ বা সমষ্টিগতভাবে জীব সমাজের মাঝেই হোক্, একটা নতুন ধারার বিকাশ এই ভাবেই ঘটে এসেছে। এবং ভবিষ্যতে যদি সেই ভাবেই ঘটে, তা হ'লে বিস্ময়ের কী আছে? কোন না কোন দিক দিয়ে এই আত্মিক চেতনার আংশিক বিকাশের সম্ভাবনীয়তা অনেক মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু তা অনুশীলন-সাপেক্ষ্যকার কোনদিক দিয়ে বা কীভাবে এ বিকাশ সম্ভব, তা নির্ভর করছে তার দেহ, প্রাণ ও মনের গঠনের উপর; এর একেবারে ধরাবাঁধা এমন কোন নিয়ম নির্দেশ করা সম্ভব নয়, যা

সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। তন্ত্রের সাধনার এইখানেই বিশেষত্ব। যে যেভাবে অনুশীলন ক'রে তার আত্মিক চেতনার উদ্বোধন বা গুহ্যশক্তির বিকাশ করতে চায়, যার যে ধরণের উপযোগিতা আছে, তন্ত্রের মধ্য থেকে সে সেইভাবের, সেইধরণের সাধনার ইঙ্গিত পেতে পারে। সাধকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহানুভূতি রেখে সাধনার ধারা নির্দ্দেশের এমন সুসঙ্গত ব্যবস্থা আর কোন সাধন শাস্ত্রে নেই। এখানে শ্রীঅরবিন্দের Life Divine থেকে এ সম্বন্ধে তাঁর মত একটু উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পাচ্ছি না।

This ampler maturity Can be Still seen intact in the remarkable system of the Tantras; it was not only a many sided science of the super normal but supplied the basis of all the occult elements of religion and even developed a great and powerful of spiritual discipline and self realisation. For the highest occultism is that which discovers the secret movemants and dynamic supernormal possibilities of mind and life and spirit and uses them in their native force or by an applied process for the greater effectivity of our vital, mental and spiritual being.

Life Divine Vol II, PP 711—712

অর্থাৎ—

গুহ্যবিদ্যার এই সমৃদ্ধ পরিণতি এখনো দেখতে পাওয়া যায় তন্ত্রশাস্ত্রগুলির অপূর্ব পদ্ধতির মধ্যে; এ কেবল অতি-সাধারণের বা অতিলৌকিক ব্যাপারের এক বহুমুখী বিজ্ঞান মাত্রই নয়, প্রচলিত ধর্মরীতিগুলির যা কিছু গুহ্যতত্ব তার আসল মাল মসলাও এ যুগিয়েছে। তা ছাড়া আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও আত্মোপলব্ধির একটা শক্তিশালী পদ্ধতিও গ'ড়ে তুলেছে এই তন্ত্র। কারণ, সকলের চেয়ে বড় গুহ্যবিদ্যা বলতে হবে তাকেই যা মন, প্রাণ ও আত্মার গোপন ক্রিয়া এবং তাদের অতিলৌকিক সম্ভাবনীয়তা আবিষ্কার করতে পারে এবং যথাযথভাবে কিম্বা কোন বিশেষ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেগুলিকে প্রাণময়, মনোময় ও আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকতর সার্থকতার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে পারে।

তন্ত্রের সাধন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে, তারমধ্যে সর্বধর্মসমন্বয়ের বীজ তো আছেই, তা ছাড়া প্রত্যেকের নিজের ভাবে ও নিজের ধারায় আত্মোপলব্ধির সুযোগ এতে পাওয়া যায়। সাধনার উদ্দেশ্য যদি হয় আত্মিক চেতনা ও তার শক্তির উদ্বোধন, তা হ'লে তান্ত্রিক সাধনার উপযোগিতা স্বীকার করতেই হবে। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে সর্ব ধর্ম সমন্বয় নিজের সাধন-জীবনে প্রত্যক্ষ দেখিয়েছিলেন' তার মূল ছিল ঐ তান্ত্রিক সাধনায়। এখানে এর বেশী বলা বাহুল্য।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে "ভারখণ্ড"

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের কতকগুলি পালানিবদ্ধ পদাবলী "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির পর পর অনেকগুলি সংস্করণও হইয়াছে। কৃষ্ণ কীর্ত্তন লইয়া বহু আলোচনা ও বাদপ্রতিবাদও হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্যের প্রতি আমি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত, প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা বৈষ্ণবপদাবলীর অন্যতম উৎস। গ্রন্থখানির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অনুকরণে ইহার পালাগুলির নাম খণ্ডান্ত—যথা, জন্ম খণ্ড, তাম্বুলখণ্ড ইত্যাদি। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড কবির মৌলিক রচনা। কৃষ্ণ কীর্ত্তনে রসশাস্ত্রের নিয়মানুসারে কাব্যরচনার বিপ্রলম্ভের পূর্ব্বরাগ, মান, করুণ ও প্রবাস এই চারিটি বিভাগ গৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণ কীর্ত্তনে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতানুসারেই রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলী।

"ভারখণ্ড" কৃষ্ণ কীর্ত্তনের একটি পালা। মনে হয় ইহার প্রাচীন মূল ছিল। বহরমপুর হইতে রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত "শ্রীরাধাপ্রেমামৃত" নামক একখানি সংস্কৃত শ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩৩৫ সালের শ্রাবণে প্রকাশিত এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ আমার নিকট আছে। এই গ্রন্থখানি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া একটি কিম্বদন্তী আছে। কাহারো কাহারো মতে ইহা গোপালভট্ট গোস্বামীর রচিত। এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলিবার উপায় নাই। "রাধাপ্রেমামৃত" নাম কাহার দেওয়া তাহাও জানা যায় না। এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিটি লীলার বর্ণনা আছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনের" মত ইহার পালাগুলির নামও খণ্ডান্ত। প্রথম

বস্ত্রাপহরণ খণ্ড, দ্বিতীয় ভারখণ্ড, তৃতীয় নৌকাখণ্ড, চতুর্থ দানখণ্ড। গ্রন্থখানির রচনা কবিত্বপূর্ণ।

ভারখণ্ডের উপাখ্যান সংক্ষেপে এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ একদিন ব্রজবালাগণকে দধিবিক্রয় জন্য ভার-লইয়া মথুরা যাইতে দেখিয়া তাহাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অপার মায়াশালী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অনুরোধবশতঃ লীলাহেতু নিজ স্কন্ধে ভারগ্রহণপূর্ব্বক কৌতূহল এবং কাপট্য অবলম্বন করিয়া যমুনাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে সকল ভার-বাহিকার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দেখিয়া কহিলেন, —যদুনাথ, ব্রজবাসিনী মৃগনয়নাগণ নিজ নিজ ভার লইয়া দ্রুতগতিতে মথুরা চলিয়া গেল এবং এতক্ষণে বোধ হয় ঘোল প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। আর তুমি কত বিলম্ব করিতেছ? নবনীত ও ঘোলাদি সুলভে পাইয়া লোকে ক্রয় করিয়া ফেলিবে। শেষে গেলে আমার জিনিস কে কিনিবে? দয়া করিয়া সত্বর চল, যাহাতে আমিও গিয়া দধি আদি বিক্রয় করিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া কহিলেন—চপললোচনে, আমার পা চলিতেছে না, দুই স্কন্ধে অত্যন্ত বেদনাবোধ হইতেছে, রৌদ্রতাপে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। অতএব এই মনোহর কুঞ্জে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। শ্রীরাধা বলিলেন, কিছুদূর চল। শ্রীকৃষ্ণ দুইচারি পদ গিয়া বলিলেন—সুন্দরি, আমি দধি-দুগ্ধ ভার বহনে ক্লান্ত, তুমিও গুরু পয়োধরভারে খিন্ন; অতএব অয়ি মৃগনয়না, এই মন্দ মারুত সুখদ কুঞ্জে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।

শ্রীরাধা রোষ ভরে বলিলেন, তুমি ত দুইচারি পদ গিয়াই পরিশ্রান্ত হইতেছ। তোমায় আমি ভালরূপেই জানি; তথাপি আজিকার ব্যবহার যে সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। আচ্ছা, তুমি ভার রাখিয়া গোবৎস চরাইতে যাও, আমি অন্য একজন দক্ষ ভারবাহক আনিতেছি। কিছুক্ষণ উত্তর প্রত্যুত্তরের পর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এস, তুমি আমি দুইজনেই দধি-দুগ্ধনবনীত কিছু কিছু খাইয়া ফেলি, তাহা হইলে কিছু ভার কমিবে। শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর। অবশেষে দ্বিগুণ পারিশ্রমিকের প্রলোভন দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন পারিশ্রমিকস্বরূপ আলিঙ্গন ভিক্ষা করিলেন। শ্রীরাধা বলিলেন—বেতনগ্রাহীর এ কেমন অভিলাষ? শ্রীকৃষ্ণ কপট ক্রোধে ভার ফেলিয়া চলিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা তখন মৌন সম্মতি দান করিলেন। উভয়ের মিলন হইল। বিবিধ জল ক্রীড়ার পর উভয়ে মথুরায় গেলেন। শ্রীরাধার নিকট ভার রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর এক জীর্ণ তরী লইয়া যমুনা তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ভারখণ্ডের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ— শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বড়াই, চিরকাল রাধিকার দর্শন নাই। মন স্থির হইতেছে না। একবার তাহাকে আনিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। এখন শরৎকাল; রাধিকাকে বলিও, এ সময় তড় পথে পায়ে হাঁটিয়া লোকে যমুনাপার হইতেছে। সেখানে কানাইয়ের অধিকার নাই। এদিকে আমি অন্য পথে ভার লইয়া মজুরিয়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, সে যেন আমাকে ভার বহায়। বড়াই বলিল—ভাল কথা বলিয়াছ; আমি রাধাকে লইয়া মথুরার হাটে যাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ মাঝ বৃন্দাবনে গিয়া চামড় গাছের ডাল কাটিলেন। মাঝখানটা মোটা রাখিয়া দুই পাশ ছুঁচাল করিলেন এবং ছুঁচাল দুই পাশের শেষাংশ মুঠীর আকারে চাঁচিলেন। বাহুকটি ঝামা দিয়া ঘসিয়া চিকণ করিয়া তুলিলেন। নালিচা কাটিয়া জলের মাঝে বার পহর রাখিয়া তাহা শুকাইয়া বাছিয়া সুসার পাটে চারিগুণ দড়ি পাকাইয়া দুই গাছি শিকা তৈরী করিলেন এবং তাহার তলে দুইটি বিঁড়া গাঁথিয়া দিলেন। বাহুক জুড়িয়া কানাই যমুনার পারে গেলেন।

বড়াই গিয়া রাধার শাশুড়ীকে অনেক প্রকারে বুঝাইল। অনেক দই দুধ জমিয়া গিয়াছে। বৌকে হাটে পাঠাইয়া দেও। আয়ানের মাতা সম্মত হইলেন। শাশুড়ীর কথায় দধি দুধে পসরা সাজাইয়া রাধা সকলের সঙ্গে মথুরার দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যমুনার পারে গিয়া অতিশ্রমে কাতরা হইয়া পসরা নামাইলেন। বড়াইকে বলিলেন—শরতের রৌদ সহিতে পারিতেছি না। একজন মজুরিয়া ডাকিয়া আন। ভারে দুই ভাগ করিয়া আমার পশ্চাতে বহিবে। বড়াই বলিল—তুমিই ডাক দাও না, এখনই মজুরিয়া আসিয়া হাজির হইবে। কৃষ্ণ ভার লইয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ভার বহিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি ভার বহিলে সংসারে বিপর্য্যয় উপস্থিত

হইবে। ব্রহ্মা বেদ ও ইন্দ্র জল হরিয়া লইবে ; কপিলা ক্ষীর ও বসুমতী শস্য হরণ করিবে, ইত্যাদি। রাধা বলিলেন, —মজুরিয়া হইয়া তুমি অন্য কথা কহিতেছ ; সকল গোয়ালা জাতিই ত ভার বহে। তোমার লজ্জা নাই, তুমি বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে চাহ। যমুনার ঘাটেই এক প্রহর বেলা হইয়া গেল ; কখন মথুরার হাটে যাইব ? ঘৃত দুধ নষ্ট হইল, দই অম্বল হইয়া গেল। যাহাকে দুধ যোগান দেই, তাহাকেই বা কি বলিব ? শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন ভঞ্জনাদির উদাহরণ দিয়া তিনি যে জগতের ঈশ্বর তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে রাধিকার আলিঙ্গনদানের প্রতিশ্রুতিতে তিনি ভার বহনে স্বীকৃত হইলেন।

ভার লইয়া যাইতে পসার টলিয়া গেল, কিছু দই দুধ ছড়াইয়া পড়িল ; সোনারূপার ভাণ্ড তেরছা হইয়া গেল। ভার বাহকের কাণ্ড দেখিয়া রাই বুকে ঘা দিলেন। শ্রীরাধা কত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যৌবন দান চাহিলেন। রাধার সহিত কৃষ্ণের বহু বিতণ্ডা হইল। রাধা প্রকারান্তরে কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অবশেষে কৃষ্ণ ভার বহিয়া চলিলেন। রাধা কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। রাধার সকল পসার বিক্রয় হইয়া গেল। রাধা গোকুলের পথে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া হাটে শূন্যভার ফেলিয়া রাধার সঙ্গে পথে পথে চলিলেন।

এই ভারখণ্ডের আমি যে একটি নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, এইবার তাহাই বলিতেছি। বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদে পটুয়া নামে একটি সম্প্রদায় আছে। ইহারা না হিন্দু না মুসলমান। ইহাদের পুরুষদের নাম সুরেন্দ্র নরেন্দ্র রামদাস, মেয়েদের নাম রাধা, যমুনা ইত্যাদি। ইহারা হিন্দুর ঘরে দুর্গা অন্নপূর্ণা কালী প্রতিমাদি নির্ম্মাণ করে। আবার মসজিদে যায়, মৃতদেহ কবরও দেয়। ইহারা রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা প্রভৃতির পট দেখাইয়া বেড়ায়। পট দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে রামলীলা কৃষ্ণলীলা গান করে। গানগুলি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতের বিকৃত পয়ার। এই সম্প্রদায় বহু প্রাচীন। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসে, বাণভট্টের হর্ষচরিতে ইহাদের উল্লেখ আছে। সেকালে ইহারা যমপট্টিক নামে পরিচিত ছিল। মহামতি চাণক্য ইহাদিগকে গুপ্তচরের কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহারা যে যমপট্টিক তাহার প্রমাণ এই যে, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা রামলীলাদির পট দেখাইয়া বেড়াইলেও আজিও যমরাজকে পরিত্যাগ করে নাই। প্রত্যেক পটের শেষে যমরাজের, চিত্রগুপ্তের ও পাপীদের নানারূপ শাস্তির চিত্র আজিও তাহারা সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার আউগাঁ পারুলিয়ার একজন পটুয়া গত ভাদ্র মাসে আমাকে দুইখানি পট দেখাইয়া গেল। প্রতি বৎসর এই সময়ে আসে, এবারও আসিয়াছিল। দুইখানি পট এবার আনিয়াছিল ; একখানি চৈতন্যলীলার, অপরখানি কৃষ্ণলীলার। চৈতন্যলীলার পটে একাংশে আছে—নিমাই সন্ন্যাসী হইবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন, শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়ার রমণীগণ কাঁদিতেছেন। পটে দেখিলাম শচীমাতার সধবার বেশ। চিত্রটি পরিবর্ত্তন করিতে বলিলাম। নিমাইএর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বেই যে পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র নিত্যধামে গিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া বলিলাম। ইহা হইতে আমার ধারণা হইল যে ইহারা নূতন কিছু করিতে চাহে না। পটের বিষয়ে বাহিরের লোকের নিকট কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। পুরুষানুক্রমে পূর্ব্বাপর যেমন চলিয়া আসিতেছে, পুরাণো পট দেখিয়া নূতন পটে সেইরূপই আঁকিয়া যায়।

কৃষ্ণলীলার পটে কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলার পর বস্ত্রহরণাদি আছে। ইহার মধ্যে ভারখণ্ড একটি চিত্র, আগে রাধা, মাঝে ভার—স্কন্ধে কৃষ্ণ, তাঁহার পশ্চাতে বড়াই, বড়াইএর পিছনে পসরা মাথায় কয়েকজন গোপী। ভারবহনের চিত্রাংশটি দেখাইবার সময় সে এই পয়ারটি গানের সুরে আবৃত্তি করিতেছিল। আমি তাহার নিকট হইতে লিখিয়া লইয়াছিলাম।

আগে যাই যায় সুন্দরী পাছে যায় বড়াই।
মধ্যখানে যেতেছেন নন্দের কানাই ॥
সুবর্ণের বাঁকখানি বিনানো পাটের শিকা।
কৃষ্ণ নিলেন দধির ভার চলিলা রাধিকা ॥
খেয়েছ রাধার মজুরির কড়ি হয়েছ বেগারি।
আজ কেনে বলছেন ঠাকুর ভার বইতে নারি ॥
যেখানে বিকায় দই দুধ সেখানে লয়ে যাব।
সেখানে মনের সঙ্কেতে শ্যামকে নগরে ফিরাব ॥

ভারখানি নামিয়ে ঠাকুর বলিলেন বনমালী।
মুখে বসন দিয়া হাসে রাধে চন্দ্রাবলী ॥

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল দেখিতেছি। ইহাদের গানেও রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলী। কৃষ্ণ কীর্ত্তনে আছে—

এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞি মনের উল্লাসে।
ভার লএ, উলটিয়াঁ চন্দ্রাবলী হাসে ॥

কৃষ্ণ কীর্ত্তনে মথুরায় যাইবার পথে আগে বড়াই, মাঝে রাধিকা এবং পিছনে শ্রীকৃষ্ণ যাইতেছিলেন। কিন্তু পথে নানা বাকবিতণ্ডার পর মথুরা প্রবেশ মুখে—

আগু করি রাধা চন্দ্রাবলী।
পাছে চলি জাএ বনমালী ॥

পটুয়ার পটে এবং গানেও তাহাই দেখিলাম। বনমালী শব্দটিও পটুয়ার গানে আছে। পটুয়ার গানে "মজুরির কড়ি" ও কৃষ্ণ কীর্ত্তনে "মজুরিয়া" লক্ষ্য করিবার বস্তু। পাটের শিকা কৃষ্ণ কীর্ত্তনেও আছে,পটুয়ার গানেও আছে। আমাদের দেশে শণের বেঁটে দড়ির ও বাবুই দড়ির শিকাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। পাটের শিকা এখন কচিৎ দেখিতে পাই। বীরভূম বর্দ্ধমান মুর্শিদাবাদে নালিচা বা নালিতার খুবই চলন। নালিতাও এক জাতীয় পাট। নালিতা জলে পচাইয়া কাচিয়া তাহা হইতে পাট বাহির করিত। শুকাইয়া পাকাইলে দড়ি হইত। এখনও নালিতার প্রচুর চাষ হয়। তাহার পাতা এদেশের লোকের প্রিয় খাদ্য। লোকে বলে পাটশাক। নালিতার শাকও কেহ কেহ বলে। যত্ন করিয়া জোরালো জমিতে চাষ করিলে ইহার ডাঁটা খুব মোটা এবং বড় হয়। বর্ত্তমান চলিত পাটশাকের উন্নততর জাতিবিশেষের নাম নালিতা। আজকাল ইহা হইতে কাহাকেও শণ বা পাট বাহির করিতে দেখি না। সাধারণ পাট বা শণ গাছ দুই তিন দিন জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। চণ্ডীদাস নালিতাকে জলে বার পহর রাখিয়াই তুলিয়াছেন।

রাঢ়ের পল্লীতে পল্লীতে পুরাণো গাঁথা গান, ছড়া কাহিনী, কিংবদন্তীর প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধান আজিও আরম্ভ হয় নাই। কখনো হইবে বলিয়াও মনে হয় না। ছাত্রের দল ছুটির সময় এদিকে মনোযোগ দিলে সাহিত্য ও ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া যাইত। পল্লীগ্রামের শিক্ষানুরাগী যুবকের দলও এ বিষয়ে অনেক কিছু করিতে পারেন। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্য পরিষদেরও এ বিষয়ে কিছু কর্ত্তব্য আছে।

পরমাণু শক্তির ধারা

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডি-এস্ সি

অনন্ত শক্তির আধার, আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জড় জগৎ। অণু-প্রবিষ্ট চৈতন্যরূপে তড়িদাধান জড়কণায় নিহিত থাকিয়া শক্তিপ্রকাশের যে সামান্য আভাষ বিগত ৮।১০ বৎসরে প্রদান করিয়াছে, তাহাতে ইহাই মনে হয় যে সৃষ্টির অভ্যন্তরেই তাহার উৎকর্ষ বা ধ্বংস সাধনের বীজ স্রষ্টা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। এই জড়-শক্তির সামান্য আভাষ প্রদানই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে পরশ পাথরের অনুসন্ধান চলিয়াছিল। "ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর" কবির লেখায়ও ব্যবহৃত হইয়াছিল। বাস্তবিক, কৃত্রিম কোন প্রক্রিয়ায় কোন মৌলকে মৌলান্তরে পরিণত করার প্রচেষ্টা পূর্বতন কিমিয়া বিদ্যার মূল আদর্শ হইলেও উহার সেবকগণের আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পমূল্য লৌহাদি ধাতুকে বহু মূল্য স্বর্ণে পরিবর্তিত করা। বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড যখন প্রথমে মৌলের রূপান্তর সাধনের উপায় আবিষ্কার করিলেন, তখনই পরশ পাথরের সন্ধানে ধাবমান হওয়া অপেক্ষা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় মৌলের রূপান্তর কার্য-সাধনে যে পরমাণু শক্তি প্রকট হয়—বিজ্ঞানী মহলে তাহার অনুসন্ধানেরই সাড়া পড়িয়া গেল। মৌলের রূপান্তর সাধন পদ্ধতির অনুসন্ধানকেই বর্তমান বিজ্ঞানের এক শাখারূপে আধুনিক কিমিয়া বিদ্যা নামে আখ্যাত করা চলে। বস্তুতঃ তেজষ্ক্রিয় মৌলের স্বতঃ বিকীরণক্রিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া মাত্রই বিজ্ঞানী দেখিতে পাইলেন যে এই ক্রিয়ায় যে শক্তি প্রকাশিত হয় তাহা সমপরিমিত বস্তুর রাসায়ণিক ক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তি অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণে অধিক। প্রত্যেক মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়সে যে শক্তি নিহিত আছে তাহাকে বিমুক্ত করিয়া কার্যে নিয়োগ করিতে পারিলে মানব জাতির যে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে মূল্যের হিসাবে পরশ পাথর সংস্পর্শ সংজাত স্বর্ণ তাহার কাছে নগণ্য।

আমরা এই শক্তির অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব। সেজন্য প্রথমেই বিজ্ঞানী কি ভাবে শক্তির পরিমাপ ও তাহার মূল্য নির্ধারণ করেন তাহা দেখিতে হইবে। পরিমাপ করিতে গেলেই এককের প্রয়োজন। শক্তির পরিমাণ প্রকাশ করিতে যে একক ব্যবহৃত হয় তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করিতে হইবে। এই এককের সাধারণ নাম আর্গ্‌। ইহাকে সহজেই বুঝান যাইতে পারে। যদি দুই গ্রাম্ ভর বিশিষ্ট কোন বস্তু সেকেণ্ডে এক সেণ্টিমিটার গতিবেগে ধাবমান হয়, তাহা হইলে উহাতে যে চলৎশক্তি উদ্ভূত হয় তাহার পরিমাণ এক আর্গ্‌। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই, তাহাদের তুলনায় এই আর্গ্‌ অতি সামান্য শক্তি। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া তেতলায় উঠিতে যে শক্তির অপচয় হয় তাহার পরিমাণ কোটি কোটি আর্গ্‌, কিংবা টেবিল টেনিস খেলায় বলটা যে শক্তিতে ধাবমান হয়, তাহারও পরিমাণ হাজার হাজার আর্গ্‌। কিন্তু একটা পরমাণুর প্রতিক্রিয়ায় যে শক্তি পাওয়া যায় তাহা আবার অতি নগণ্য—আর্গের ১০ লক্ষ অংশ (মাইক্রো আর্গ্‌) বা লক্ষ কোটি অংশ (মাইক্রো-মাইক্রো আর্গ্‌)

দুই বা অধিক বস্তুর মধ্যে যখন রাসায়ণিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখন তাহাদের অণুতে বিপর্যয় ঘটে ও ফলে পরমাণুর এক অভিনব বিন্যাসে এক নূতন যৌলিক বস্তুর অণু পাওয়া যায়। অণুর অভ্যন্তরস্থ পরমাণুর এই নবতর বিন্যাসে যে শক্তি প্রকট হয় তাহাও আর্গের অংশরূপে ক্ষুদ্রতর এককে ব্যক্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কার্বণ ও অক্‌সিজেনের সংশ্লেষণের সময় কার্বণের একটা অণু অক্‌সিজেনের দুইটা অণুর সঙ্গে মিলিত হইয়া (কয়লা পোড়াইবার সময়) কার্বণ ডায়ক্‌সাইড গ্যাসের একটা অণু উৎপন্ন হইলে সঙ্গে সঙ্গেই ৬·৫ মাইক্রো-মাইক্রো ($১০^{-১২}$) আর্গ্‌ শক্তি প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোন মৌলের রূপান্তর সময়ে নির্গত শক্তি এতদপেক্ষা অধিক ও সেই জন্য উহা ব্যক্ত হয় বৃহত্তর একক মাইক্রো ($১০^{-৬}$) আর্গের হিসাবে। শেষোক্ত এককের মাত্রা প্রথমটার ১০ লক্ষ গুণ। পরীক্ষায় দেখা যায়, অ্যালুমিনিয়মের নিউক্লিয়সে আলফা কণা প্রহৃত হইলে, একটা প্রোটন কণা বিতাড়িত হয়; কিন্তু নির্গত কণার শক্তি নিক্রামক কণার শক্তি অপেক্ষা প্রায় ৩·৭ মাইক্রো আর্গ অধিক। আর এই পরিমিত শক্তি আহত প্রতি পরমাণু হইতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন নিউক্লিয়সের রূপান্তর সাধনে অধিকতর শক্তিও প্রকট হয়। বিগত মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত বিখ্যাত অ্যাটম-বোমা ব্যাপারে ইউরেণিয়মের একটা নিউক্লিয়স দ্বিধা বিভক্ত হইতে যে শক্তির বিকাশ হয় তাহার পরিমাণ ৩২০ মাইক্রো-আর্গ্‌।

কিন্তু নিউক্লিয়স-তত্ত্বানুসন্ধান-রত বিজ্ঞানী শক্তির পরিমাণ নির্দ্দেশে "মিলিয়ন-ইলেক্‌ট্রণ ভোল্ট" আখ্যায় এক একক ব্যবহার করেন। উহাকে সংক্ষেপে লেখা হয় "mev"। এই এককের উৎপত্তি বিবেচনা করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, তড়িদাধান মাত্রেই তাড়িদ ক্ষেত্রে সমৃদ্ধবেগে প্রধাবিত হয় ও তজ্জন্য শক্তি অর্জন করে। তাড়িদ বলের এককের নাম ভোল্ট। একটা ইলেকট্রণ, ১০ লক্ষ ভোল্ট বলের তাড়িদক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়া যে শক্তি অর্জন করে তাহাই ১ mev। পূর্ববর্ণিত আর্গের হিসাবে ১ mev = ১·৬ মাইক্রো-আর্গ = প্রায় $১০^{-৬}$ আর্গ্‌। সুতরাং ৫ mev প্রোটন বলিলে সেই প্রোটনকে বুঝায় যাহার শক্তি ৮ মাইক্রো-আর্গ।

নিউক্লিয়সের পরিবর্তন-সংজাত শক্তি গোটা পরমাণু হিসাবে কিংবা একগ্রাম্ বস্তুর হিসাবেও ব্যক্ত করা চলে; এই দ্বিতীয় ধারায় ব্যক্ত হইলে শক্তির অঙ্ক কিরূপ দাঁড়ায়, তাহাও দেখা প্রয়োজন। আলফাকণা প্রহৃত অ্যালুমিনিয়মকেই প্রথমে ধরা যাউক। এই মৌলের পরমাণু ভার ২৭; অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর ভার $১·৬৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম্ ধরিলে অ্যালুমিনিয়ম পরমাণুর ভার $২৭ \times ১·৬৬ \times ১০^{-২৪}$ বা $৪·৫ \times ১০^{-২৩}$ গ্রাম্। সুতরাং এক গ্রাম্ বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়মে $২·২ \times ১০^{২২}$টা পরমাণু থাকে। যদি প্রত্যেক পরমাণুর নিউক্লিয়সই রূপান্তরিত হয় ও ৩·৭ মাইক্রো-আর্গ্‌ শক্তি প্রদান করে তাহা হইলে প্রতি গ্রাম মৌলের রূপান্তর সাধনে ৬×১০^{৬} আর্গ শক্তি লাভ হইবে। এইভাবে অ্যাটমবোমার উপাদান ইউরেণিয়মের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, উহার প্রতি গ্রামে $২·৫ \times ১০^{২১}$টা পরমাণু থাকে ও রূপান্তর সাধন কার্যে প্রতি গ্রাম হইতে ৮×১০^{১৭} আর্গ্‌ শক্তি লাভ করা যায়। এই পরমাণুশক্তি আমাদের পরিচিত তাপশক্তির এককেও ব্যক্ত করা যায়। কারণ ইহা সুবিদিত যে শক্তির রূপ বিভিন্ন হইলেও, উহা মূলতঃ এক। তাপশক্তির একক "ক্যালরি"। ইহা কি? এক গ্রাম্ ওজনের জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রী (সেঃ) বৃদ্ধিসাধন করিতে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাহাই এক ক্যালরি। ইহার পরিমাণ অতি সামান্য ও সেইজন্য উহার এক সহস্র গুণ অধিক মাত্রার একক "কিলো-ক্যালরি" তাপশক্তির একক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই তথ্যও সুবিদিত যে নানাপ্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়ায় তাপ উৎপাদিত হয়। যান্ত্রিক শক্তি ও তৎপ্রয়োগে উৎপন্ন তাপশক্তির তুলনা করিয়া দেখা যায় যে এক ক্যালরি তাপশক্তি $৪·২ \times ১০^{৭}$ আর্গের সমান; অর্থাৎ প্রায় $৪·২ \times ১০^{৭}$ আর্গ্‌ কার্যশক্তির ব্যয় সাধনে এক গ্রাম্ জলের উষ্ণতা ১° সেঃ বর্দ্ধিত হয়। সাধারণ রাসায়ণিক ক্রিয়ায় যে শক্তি বা তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাও এই কিলো-ক্যালরি এককের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক গ্রাম্ কয়লা উন্মুক্ত স্থানে পোড়াইলে ৮ কিলো-ক্যালরি শক্তি বিকশিত হয় ও TNT বোমার বিস্ফোরণে এক নিমিষেই ১ কিলো-ক্যালরি শক্তির বিকাশ হয়। এই এককে পরমাণু শক্তি প্রকাশ করিলে দেখা যায় এক গ্রাম্ অ্যালুমিনিয়ম ও ইউরেনিয়মের রূপান্তর সাধনে যথাক্রমে $১·৪ \times ১০^{৬}$ ও ১৯×১০^{৬} কিলো-ক্যালরি শক্তি বিমুক্ত হয়। ইহা হইতেই রাসায়ণিক ক্রিয়াজনিত শক্তির তুলনায় পরমাণু-নিউক্লিয়সের পরিবর্তন সাধনজনিত শক্তি কত অধিক তাহা অনুমান করা যায়। এক গ্রাম্ ইউরেনিয়মে যে শক্তি নিহিত আছে তাহা প্রায় ১৯ টন TNT বোমার বিস্ফোরণে উদ্ভূত শক্তির সমান।

নিউক্লিয়সে আবদ্ধ এই প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ সাধন ও ব্যবহারে নিয়োজনের পূর্বে এই কথাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন যে—কি কৌশলে ও কোন্ আসক্তিতে তাহার অবয়বের বিভিন্ন অংশ ধারণার অতীত ঘন

স্থানে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ আছে। কারণ এই আসক্তির পরিমাণ হইতেই পরমাণুর নিউক্লিয়স বিদারণে অচিন্ত্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সহজবোধ্য হইবে। কেবলমাত্র তাড়িদশক্তির প্রভাবেই যে নিউক্লিয়সের অংশ সমূহ জমাট বাঁধিয়া আছে, এ কথাও অগ্রাহ্য। কারণ তাহার উপাদান স্বরূপ পাওয়া যায় নিউট্রণ নামক তড়িদ্ধর্মহীন জড়কণা ও প্রোটন নামক + তড়িদ্ধর্মী কণা। সুতরাং তাড়িদ গুণ-ধর্মে এই কণাগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া যাইতেই চাহিবে। অর্থাৎ ইহাদের কার্য প্রকৃতপক্ষে নিউক্লিয়স-বিদারণের অনুকুল। সুতরাং নিউক্লিয়সে অন্য কোন প্রকার বলের ক্রিয়া অবশ্যই বর্তমান, যাহার জন্য তাড়িদ বল অসাড় হইয়া আছে। তুলনা করিয়া দেখিলে এক্ষেত্রে ক্রিয়মান আসক্তি অনেকাংশে তরল পদার্থের অনুসমূহের পরস্পরে ক্রিয়ামান আসক্তির ন্যায় হইবে। এই আসক্তির প্রভাবেই তরল পদার্থের অণুগুলি গায় গায় সংলগ্ন থাকে ও বিখ্যাত পৃষ্ঠটান বলের সৃষ্টি হয়। এই প্রকারের ধারণা হইতেই ১৯৩০ খৃঃ অব্দে বিজ্ঞানী গ্যামো নিউক্লিয়সের গঠন সম্বন্ধে এক তথ্য প্রচার করেন। তাহার মতে একপ্রকার পদার্থ বিদ্যমান যাহাকে ঠিক তরলও বলা যায় না আবার তাহা গ্যাসীয়ও নহে। আমরা এই পদার্থের সাধারণ নাম দিতে পারি কারণ-সলিল। এই সলিলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটাই পরমাণুর নিউক্লিয়স। ইহা এক সমর্থনবস্তুরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত। সুতরাং ফোঁটা বড়ই হউক বা ছোটই হউক, উহার ঘনাঙ্ক সব সময়েই এক। অতএব নিউক্লিয়সের আয়তন পরমাণু ভেদে তাহার ভারের সমানুপাতিক হইবে। যে পরমাণু যত ভারি তাহার নিউক্লিয়সও তত অধিক স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত হইবে। আবার গণিতের নিয়মে কোন গোলকের ভার তাহার ব্যাসার্ধের ৩ ঘাতের সমানুপাতিক। সুতরাং নিউক্লিয়সের ভারও তাহার ব্যাসার্ধের ৩ ঘাতের সমানুপাতিক। এই সত্যে নির্ভর করিয়া কারণ-সলিলের ঘনাঙ্ক নির্ধারণ করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভার ১.৬৬×১০^{-২৪} গ্রাম্। এই পরমাণুতে আছে একটিমাত্র ইলেকট্রণ যাহার ওজন পরমাণুর ভারের প্রায় ১৮৪০ অংশ। সুতরাং এই পরমাণুর ভারকেই উহার নিউক্লিয়সের ভাররূপে ধরা যাইতে পারে। এইভাবে হিসাব করিয়া অক্‌সিজেন ও সীসার নিউক্লিয়স্ দুইটার ভার যথাক্রমে ২.৬৬×১০^{-২৩} গ্রাম্ ও ৩.৪২×১০^{-২২} গ্রাম্ পাওয়া যায়। উপরে বর্ণিত ৩ ঘাতের নিয়মে এই দুই নিউক্লিয়সের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে ৩×১০^{-১৩} ও ৭×১০^{-১৩} সেন্টিমিটার হয় ও বর্তুলাকার ধরিলে ইহাদের আয়তন হইবে ১.১৩×১০^{-৩৭} ও ১.৪৪×১০^{-৩৬} ঘন সেন্টিমিটার। এই পরিমাপ হইতে উভয় ক্ষেত্রেই কারণ সলিলের ঘনাঙ্ক দাঁড়ায় ২.৪×১০^{১৪} গ্রাম্।

এই প্রকার ঘনাঙ্কের কোন পদার্থ কল্পনার অতীত। কারণ, এই কাল্পনিক কারণ সলিল যদি আমাদের আকাশে বাতাসে ফোঁটা ফোঁটা আকারে ব্যাপ্ত থাকে ও এই ফোঁটা তদুপযুক্ত ইলেকট্রণে আবৃত হইয়া যদি দৃশ্য পদার্থরাজি পরিগঠিত হয় তাহা হইলে তাহার এক ঘন সেন্টিমিটারের ওজন হইবে ২৪০০ লক্ষ টন।

এই অচিন্তানীয় ঘনাঙ্কের সঙ্গে সলিলের পৃষ্ঠটানও বিবেচনা করিতে হইবে। কোন তরলের অনাবৃত বক্ষের অণুগুলি যে আসক্তিতে সংবদ্ধ থাকে ও যাহার জন্য তরলের কোন অংশকে সহজে পৃথক করা যায় না তাহাই তাহার পৃষ্ঠটান। এই টান সাধারণ জলের বেলায় প্রতি সেন্টিমিটারে ৭৫ ডাইন, আবার পারদের বেলায় ৪৩৫ ডাইন। এই পৃষ্ঠটান হইতে তরলের উন্মুক্ত পৃষ্ঠে শক্তি সঞ্চারিত হয়। যেমন, জলের পৃষ্ঠশক্তি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭৫ আর্গ। টান ও তজ্জনিত শক্তি একই সংখ্যায় ব্যক্ত হয়। তবে একক ভিন্ন।

এইভাবে কারণ সলিল লইয়া হিসাব করিলে দেখা যায় উহার পৃষ্ঠটান প্রতি সেন্টিমিটারে ৯৩×১০^{১৮} ডাইন্ ও পৃষ্ঠশক্তি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৯৩×১০^{১৮} আর্গ আবার ইহা হইতে নিউক্লিয়সের প্রতি কণার পৃষ্ঠশক্তি হিসাব করা যায়। কারণ, প্রোটন বা নিউট্রণের ব্যাস হইতে দেখা যায় যে পৃষ্ঠতলের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে $১০^{২৫}$ কণা থাকিতে পারে। সুতরাং প্রতি কণায় নিহিত শক্তি প্রায় ৯×১০^{৬} আর্গ্ বা ৫ mev। অতএব কারণ-সলিলের পৃষ্ঠতল হইতে কোন কণা বিচ্যুত করিতে উক্ত প্রকার শক্তি সংজনক বলের প্রয়োগ করিতে হইবে।

সুতরাং গ্যামো কল্পিত নিউক্লিয়ার ফ্লুয়িড—যাহাকে আমরা কারণ-সলিল বলিয়াছি—জড়ের গুণ ধর্মবিচারে এক অভাবনীয়, অচিন্ত্য বস্তু। আমাদের অভিজ্ঞতায় উহার ঘনাঙ্ক বা পৃষ্ঠটানের স্থান না থাকিলেও অন্যান্য জড়ধর্মে উহা এক প্রকার পদার্থ যাহাকে তরল বা গ্যাসীয় বলা যাইতে পারে; আমরা বলিয়াছি সলিল। তাহার মতে জড়ের মূলকণা প্রোটন ও নিউট্রণ উহা হইতেই সংজাত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদে শান্তি অভিযান—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্বাধীনতা লাভের পর বহু স্বাধীন রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে। জুনাগড় তাহা না করায় তাহার পরিণতির কথা সকলেই অবগত আছেন। কাশ্মীরের মহারাজা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত হইলেও পাকিস্তানের সাহায্যে সেখানকার একদল লোক তথায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। সে যুদ্ধে হানাদারগণ নানাভাবে বিপর্য্যস্ত হইতেছে ও সেজন্য কাশ্মীরবাসী জনগণকে বহু

জেনারেল রাজেন্দ্র সিংহজী

দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। হায়দ্রাবাদ রাজ্য মুসলমান শাসকের অধীনে হইলেও সেখানকার শতকরা ৮০জন অধিবাসী হিন্দু। কাজেই হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহা করা ছাড়া হায়দ্রাবাদের গত্যন্তরও ছিল না—কারণ উহার চারিদিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু কাসিম রেজভী নামক একজন দুষ্ট লোক রাজাকর দল গঠন করিয়া জনগণের সে চেষ্টার বিরোধিতা করে। সেই দল হায়দ্রাবাদের নিজামকেও প্রভাবান্বিত করে ও তাহার ফলে ১৩ মাস পূর্ব্বে নিজাম নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে অসম্মত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, দেশরক্ষা-সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, তৎকালীন বড়লাট লর্ড মাউণ্টবেটেন প্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরিয়া এ বিষয়ে নিজামের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াও

মেঃ জেঃ অজিত-অনিল রুদ্র

শেষ পর্য্যন্ত বিফল হন। শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী বড়লাট হইয়া নিজামের সহিত পুনরায় আপোষের চেষ্টা আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই। ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজাকরগণ হায়দ্রাবাদবাসী হিন্দুদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার চালাইতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে হায়দ্রাবাদ সীমান্তস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামসমূহে প্রবেশ করিয়া লুঠ-তরাজ, খুন, অগ্নিপ্রদান প্রভৃতি করিতে

থাকে। নিজাম সর্ব্বদাই রাজাকরদের কার্য্য সমর্থন করিতে থাকেন এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজাকরদিগের কার্য্যে সাহায্য করেন। এইভাবে দীর্ঘ ১৩ মাস ধরিয়া হায়দ্রাবাদ ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলিতে অশান্তি চলিতে থাকে। হায়দ্রাবাদের চারিদিকে মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অবস্থিত—রাজাকরদিগের আক্রমণের ফলে ঐ সকল প্রদেশের শাসকদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। সহসা হায়দ্রাবাদ আক্রমণে নানারূপ অসুবিধা ছিল, কারণ হায়দ্রাবাদ আক্রান্ত হইলেও বোমা বা গোলাগুলিতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুই অধিক সংখ্যায়

সৈয়দ কাসিম রাজভী

নিহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ওদিকে কাশ্মীরে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। সে জন্য পণ্ডিত জহরলাল নিজামের সহিত আপোষের জন্য বহু দিন ধরিয়া বহু প্রকার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিজাম নিজে খুব খারাপ লোক নহেন। কিন্তু পাকিস্তানী নেতাদের সাহায্যে ও প্ররোচনায় এবং কাসিম রেজভীর মন্ত্রণায় নিজাম কিছুতেই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আপোষ করিতে পারে নাই। ইহাতে হায়দ্রাবাদস্থিত ইংরাজগণের কোন হাত ছিল কিনা বলা যায় না। তবে আমরা জানি, কাশ্মীর ব্যাপারে কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেতনভোগী থাকিয়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হানাদারদিগকে সাহায্য দান ও উত্তেজিত করিয়াছিল—সে কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজামও যে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ ও বৃটিশের সাহায্য লাভের আশায় এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আপোষে সম্মত হয় নাই, তাহা বুঝা গিয়াছে। নিজাম প্রভূত টাকার মালিক—সে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বাহির হইতে বিমানযোগে অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া হায়দ্রাবাদে ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা অবস্থিত—সেখানেও গত কয় মাস ধরিয়া বহু অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে—দিন রাত্রি ধরিয়া ঐ কারখানায় কাজ চলিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু ১৩ মাস ধরিয়া আপোষ চেষ্টা করিয়া যখন ব্যর্থ হইলেন, তখন তিনি হায়দ্রাবাদে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছাড়া গত্যন্তর না দেখিয়া গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে হায়দ্রাবাদে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের সেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট জেনারেল মহারাজা শ্রীরাজেন্দ্র সিংহী হায়দ্রাবাদে শান্তি অভিযানের ভার পাইলেন। প্রথম দিনেই ৪ দিক দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করিল—(১) উত্তরে মধ্যপ্রদেশের চন্দা হইতে (২) পশ্চিমে শোলাপুর হইতে (৩) দক্ষিণ-পূর্ব্বে বেজওয়াদা হইতে ও (৪) দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদীর নিকট হইতে। একদিনেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা ৪ দিক হইতে হায়াদ্রাবাদ রাজ্যের মধ্যে বহু দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল। দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবারে দৌলতাবাদ দখল হইল এবং হায়দ্রাবাদের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীরা শান্তি অভিযানে আগত সৈন্যদলকে সর্ব্বত্র সাদর-সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। তৃতীয় দিনে ঔরঙ্গাবাদ দখল করা হইল—ঔরঙ্গাবাদ বিনা সর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করিল। পণ্ডিত নেহরু ১৫ই সেপ্টেম্বর নিজে বোম্বায়ে যাইয়া সর্ব্বদা হায়দ্রাবাদ অভিযানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। চতুর্থ দিন ১৬ই সেপ্টেম্বর জালালাবাদ দখল হইল। বেজওয়াদার দিকে মেজর জেনারেল রুদ্র ভারতীয় বাহিনী পরিচালনা করেন। তিনি একজন বাঙ্গালী। তাঁহার পিতা দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন—নাম সুশীল কুমার রুদ্র। মেজর জেনারেল রুদ্রের নাম—অজিত অনিল

রুদ্র। ১৮৯৬ সালে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯১৯ সালে কমিশন লাভ করিয়া ১৯৪৩ সালে তিনি লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল হন। ১৯৪৭ সালে তিনি মিলিটারী সেক্রেটারী হন ও ১৯৪৮ সালে এরিয়া কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। হায়দ্রাবাদ অভিযানে ভারতীয় বিমান বাহিনী পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন একজন বাঙ্গালী—তাঁহার নম ভাইস-মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় বিমান বাহিনাতে তিনি পূর্ব্বে বহু বড় পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৩৭ বৎসর। ১৯২৯ সালে বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯৩৮ সালে কমিশন প্রাপ্ত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি কোহাট বিমানঘাটি পরিচালনা করেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাস হইতে তিনি 'চিফ-অফ-এয়ার ষ্টাফ্ হইয়াছেন। হায়দ্রাবাদ অভিযানে পশ্চিম রণাঙ্গন পরিচালন করেন মেজর জেনারেল দিগম্বর সিং ব্রার—১৯০৫ সালে পাঞ্জাবে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনিও মেজর জেনারেল এবং এরিয়া কমাণ্ডার নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা প্রতিদিন যে সকল স্থান দখল করিত, সেই সকল স্থানে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে পরদিন অগ্রসর হইত। পঞ্চম দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার নিজাম আত্মসমর্পণ করিয়া যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিলেন। নিজাম স্বয়ং গভর্ণর-জেনারেল শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীকে যুদ্ধ বিরতির কথা জানাইয়া দিলেন। স্বামী রামানন্দ তীর্থ প্রভৃতি ধৃত কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইল ও প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলি পদত্যাগ করিলেন। ওদিকে নিজামের প্রতিনিধিরা প্যারিসে যাইয়া জাতি সংঘের শান্তি কাউন্সিলের নিকট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নিজামের আদেশে তাহাদিগকে সে কার্য্য করিতে নিষেধ করা হইল। সোমবার সকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া শুক্রবার বিকাল ৫টায় তাহা শেষ হইয়া গেল। রাজাকর দল ভাঙ্গিয়া দিয়া ঐ দল বে-আইনি ঘোষণা করা হইল। ভারতীয় সৈন্যদিগকে সেকেন্দ্রাবাদ প্রবেশের অবাধ অধিকার দেওয়া হইল। ১৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার ভারতীয় সৈন্যদল হায়দ্রাবাদ রাজ্যের রাজধানীতে ও সেকেন্দ্রাবাদে প্রবেশ করিলেন। পণ্ডিত নেহরু মেজর জেনারেল জে-এন চৌধুরীকে সমগ্র হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সামরিক-গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন।

মেজর জেনারেল চৌধুরী হায়দ্রাবাদে শান্তি অভিযানের সেনাপতিদের মধ্যে একজন। তাঁহার বয়স মাত্র ৪০ বৎসর। তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিলাতের স্যাণ্ডহার্ষ্টে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৯৩৩ সালে কমিশন প্রাপ্ত হন। সুদান, ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করার পর ১৯৪৩ সালে ভারতে আসিয়া তিনি কোয়েটা কলেজের শিক্ষক হইয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালে তাঁহার নেতৃত্বে এক মাসে একটি সৈন্যদল কোয়েটা হইতে মিকটিলা—৩ হাজার মাইল অভিযান করিয়াছিল।

মেঃ জেঃ জে-এন চৌধুরী

ব্রহ্ম রণাঙ্গণেও তিনি যুদ্ধ করেন ও পরে ফরাসী ইন্দোচীন ও জাভায় কার্য্য করেন। ১৯৪৮এর মে মাস হইতে তিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক পদে কাজ করিতেছেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় নিজামী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল এড্রুজ মেজর জেনারেল চৌধুরীর নিকট আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজাকর নেতা কাসিম রাজভীকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯শে নিজাম এক ইস্তাহার

জারি করিয়া হায়দ্রাবাদবাসী সকলকে সামরিক গভর্ণর মেজর-জেনারেল চৌধুরীর নির্দ্দেশমত চলিতে ও কাজ করিতে আদেশ দিয়াছেন। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পুলিস ও সৈন্যবাহিনীকে সামরিক গভর্ণরের আদেশ মত কাজ করিতে বলা হইয়াছে। রাজ্যের এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজাকরগণ অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে ও বিদ্রোহীদের সর্ব্বত্র গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নিজামের প্রতিনিধিদের সর্ব্বত্র কার্য্যভার ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে ও ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে হায়দ্রাবাদে পুনরায় ভারতীয় মুদ্রা চালু করা হইয়াছে। কি ভাবে হায়দ্রাবাদ ভবিষ্যতে শাসিত হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। শীঘ্রই নির্ব্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গণপরিষদ গঠিত হইবে এবং সেই গণপরিষদই হায়দ্রাবাদের ভবিষ্যত শাসন পদ্ধতি স্থির করিবে।

কায়েদে আজম জিন্না—

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও গভর্ণর-জেনারেল কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না গত ১১ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টা ২৫ মিনিটের সময় করাচী লাটপ্রাসাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ৪ঠা জুলাই তিনি কোয়েটায় যান ও ৬ই সেথান হইতে জিয়ারতে যান। সেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় ১৩ই আগষ্ট কোয়েটায় ফিরিয়া আসেন। ১১ই সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টার সময় তিনি করাচীতে ফিরিয়া আসেন ও সেই রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ২মাস কাল অসুস্থতার জন্য তিনি সরকারী কাজ খুব কমই করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালে করাচীতে এক ধনী খোজা পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। ১৬ বৎসর বয়সে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি বিলাতে যান ও তথায় আইন শিক্ষার সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক স্বর্গত দাদাভাই নৌরজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। তাঁহার নিকট মিঃ জিন্নার রাজনীতি শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৯৭ সালে ভারতে ফিরিয়া তিনি বোম্বায়ে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন ও ১৯০৬ সালে কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে যে কংগ্রেস হয়, তাহাতে যোগদান করেন। ১৯১১ সালে করাচীতে কংগ্রেসে যোগদানের পর সার ফিরোজসা মেটা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে বিলাতে যাইয়া ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সংস্কারের জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে মুসলেম লীগ প্রতিষ্ঠিত হইলেও ১৯১৩ সালের পূর্ব্বে মিঃ জিন্না তাহাতে যোগদান করেন নাই। ১৯২০ হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে রাজনীতি হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। তিনি তখন কংগ্রেস ছাড়িয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু মুসলেম লীগে যোগদান করেন নাই। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার ১৪ দফা দাবী লইয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করিল, কিন্তু মুসলেম লীগের সহিত মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সম্মত হইল না। তখন হইতে জিন্না মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করিতে উদ্যোগী হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ছাড়িয়া দিল ও পরে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কারারুদ্ধ হইলে মিঃ জিন্না বৃটীশের সাহায্যে লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৫ সালে সিমলায় যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা মিঃ জিন্নার জিদের জন্য ব্যর্থ হয়। ঐ বৎসর জুলাই মাসে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব করেন। তাহার পর ২ বৎসর ধরিয়া মুসলেম লীগ ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু নিধন ব্যবস্থা চালায় ও ২ বৎসর পরে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ সম্বন্ধে বৃটীশের ঘোষণা প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর মিঃ জিন্নার চেষ্টা সফল হয় ও ১৫ই আগষ্ট অখণ্ড ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভারতবর্ষে দুইটি স্বতন্ত্র ও পৃথক রাজ্য স্থাপিত হয়। মিঃ জিন্না পাকিস্তান রাজ্যের গভর্ণর জেনারেল ও গণপরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

মিঃ জিন্নার মৃত্যুর সময় তাহার ভগিনী মিস ফতেমা জিন্না তথায় উপস্থিত ছিলেন—তাঁহার কন্যা মিসেস নেভিন ওয়াদিয়া পরদিন সকালে বোম্বাই হইতে করাচীতে যাইয়া পৌছেন। ১২ই সেপ্টেম্বর বেলা ৩টার সময় লাট প্রাসাদ হইতে শব শোভাযাত্রা বাহির হয় ও সন্ধ্যা ৬টা ২৪ মিনিটের সময় করাচী একজিবিসন গ্রাউণ্ডে মিঃ জিন্নার শব কবরস্থ হয়। মিঃ জিন্না সত্যই অসাধারণ শক্তিশালী লোক ছিলেন। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বতন্ত্র মুসলেম রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে কোন প্রকারে তাঁহার আন্দোলন সাফল্য-

মণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গান্ধীজির মত শক্তিশালী ব্যক্তিও তাঁহাকে বহুদিন ধরিয়া স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার আইন জ্ঞান অসামান্য ছিল এবং তাহাতে তিনি বহু কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে বহুবৎসর তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশের মুক্তি সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন।

নূতন গভর্ণর জেনারেল—

মিঃ জিন্নার মৃত্যুর পর সারা রাত্রি ধরিয়া পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক চলিয়াছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে সেই রাত্রিতেই পাকিস্তানের অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী—

খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হইয়া ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবারেই বিশেষ বিমানযোগে করাচী চলিয়া যাওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ নুরুল আমিন পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলায় নুতন সহর—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলপূর্ণ যে স্থানে হিজলী বন্দিনিবাস ছিল, সেই স্থানটিতে একটি উচ্চ শ্রেণীর টেকনলজিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেপ্টেম্বর মাসেই ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই পাশে ১৫০ একর জমী লইয়া একটি আদর্শ সহর নির্ম্মিত হইবে। তথায় ৪শত পরিবার বাস করিতে পারিবে। বাস্তুহারাদিগকে ঐ স্থানে বাসের সুযোগ দেওয়া হইবে। তাহার পাশে একটি পরিত্যক্ত বিমান ঘাঁটিতে বালকগণের জন্য একটি আবাসিক মিলিটারী ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করা হইবে। কলেজের পাশে 'ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেলস' সৈন্যদলের প্রধান কার্য্যালয় নির্ম্মাণেরও আয়োজন চলিতেছে। ফলে ঐ অঞ্চলটি এক সমৃদ্ধ সহরে পরিণত হইবে। বর্ত্তমানে ঐ অঞ্চলে অতি অল্পসংখ্যক লোকই বাস করিয়া থাকে। এইভাবে মেদিনীপুরের মত বাঁকুড়া ও বীরভূমের কতকগুলি জনহীন স্থানকে লোকালয়ে পরিণত করা সম্ভব হইতে পারে।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

গত ২২শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি ও ডেপুটী রিলিফ কমিশনার শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরিয়াদহ (২৪পরগণা) অনাথ ভাণ্ডার পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে সে দিন ভাণ্ডার হইতে বস্ত্র বিতরণ উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। মন্ত্রী মহাশয় ভাণ্ডারের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনের পর এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন! ভাণ্ডার তাঁতশালা পরিচালন,

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি ও ডেপুটী রিলিফ কমিশনার শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুতাবণ্টন প্রভৃতি কাজ ছাড়াও ভাণ্ডারের বিরাট গৃহের দ্বিতলে ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় একটি মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। যাহাতে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ হইয়া সাফল্যের সহিত পরিচালিত হয়, মন্ত্রী মহাশয় সকলকে সে বিষয়ে উদ্যোগী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান দারুণ বস্ত্রসঙ্কটের মধ্যেও সে দিন ভাণ্ডার হইতে কয়েক শত দুঃস্থ ব্যক্তিকে বস্ত্রদান করা হইয়াছে। ভাণ্ডারের প্রাণ-

স্বরূপ কর্ম্মী শ্রীযুত শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় যে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান হইতেছে, তাহাতে সকল সহৃদয় দেশবাসীর অর্থসাহায্য করা কর্ত্তব্য।

পশ্চিম বঙ্গের সম্প্রসারণ—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশকে বৃহত্তর করিবার জন্য বিহারের অন্তর্গত কতকগুলি বাঙ্গালা ভাষাভাষী স্থান যাহাতে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহার দাবী জানাইয়া দিল্লীতে পার্লামেণ্টের একদল বাঙ্গালী সদস্যের স্বাক্ষরিত এক আবেদন প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতির নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐ আবেদনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকল বাঙ্গালী সদস্যই স্বাক্ষর করিয়াছেন। যে কমিশন সম্প্রতি অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র প্রদেশগঠন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন, সেই কমিশন যাহাতে সত্বর পশ্চিম বাঙ্গালার সম্প্রসারণের কথাও বিবেচনা করেন, কর্ত্তৃপক্ষকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে! বিহারের কতকগুলি স্থান যে অন্যায়ভাবে বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে, সেকথা সর্ব্বজনবিদিত। শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত লোকও সেগুলি অন্যায়ভাবে বিহারের মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে চান—বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া দিতে চাহেন না। এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশে যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, আমাদের বিশ্বাস তাহা কখনই বিফল হইবে না।

মোকামাঘাটে নূতন পুল—

বিহারে গঙ্গার উপর কোন পুল না থাকায় গঙ্গা পারাপারে লোকের বিশেষ অসুবিধা হয় বলিয়া আগামী শীতকালে ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মোকামাঘাটে গঙ্গার উপর এক পুল নির্ম্মাণ করা হইবে। পুলের উপর রেলপথ ও রাস্তা উভয়ই থাকিবে। সেখান হইতে একটি রাস্তা সরাসরি আসামে চলিয়া যাইবে। ঐ সঙ্গে ও-টি-রেলের জন্য বারুণী নদীর উপরও একটি পুল হইবে। ইংরাজ এতদিন ধরিয়া তাহাদের দেশরক্ষার প্রয়োজন ভিন্ন জনকল্যাণের জন্য কোন কাজ করে নাই। বর্ত্তমানে দেশে যে সকল ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত জনকল্যাণ কার্য্য সাধিত হইবে, অবিলম্বে সে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইলে দেশ-বাসীর আর্থিক দুর্দ্দশা দূর হইতে পারিবে। স্বাধীন দেশে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র সে সকল কাজ করিতে পারিবেন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

সীমান্তে নেতৃবৃন্দের নির্য্যাতন—

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্গত হইবার পর হইতে তথায় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে নানাভাবে নির্য্যাতন করা চলিতেছে। খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা সীমান্ত-গান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খান ও ঐ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খাঁ সাহেব উভয়কেই গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের অপরাধ, তাঁহারা সারা জীবন ধরিয়া যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করেন নাই। তাহাদের দলের বহু লোককে গুলী বর্ষণের দ্বারা হত্যা করা হইয়াছে ও বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহাদের দান অল্প ছিল না—সেজন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে তাঁহারা অবিলম্বে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন। এ বিষয়ে বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার মহাশয় সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা ভারতের মুক্তির জন্য অকাতরে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের এই দুর্দ্দিনে তাঁহাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা না করিলে ভারতবাসীর কর্ত্তব্যহানি হইবে। আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালকগণকেও এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

অন্নবস্ত্র সমস্যা—

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর ১৩ মাস অতীত হইয়াছে, কিন্তু জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশার হ্রাস না হইয়া ক্রমেই তাহা বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্নবস্ত্র সমস্যা আজ ভারতে এমন প্রবল ভাবে প্রকট হইয়াছে যে সকল মানুষ—কি ধনী, কি দরিদ্র—সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। গত ১৩ মাসে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের মূল্য অপেক্ষা আজ সাধারণ সকল খাদ্য দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। চাউল ও আটা-ময়দা রেশন দ্রব্য—তাহার দাম বাড়ে নাই বটে, কিন্তু তাহার অবস্থা দিন দিন খারাপ

হইতেছে। গত কয়েক মাস ধরিয়া রেশনের চাউলের অর্দ্ধেক আতপ চাউল দেওয়া হয়—পশ্চিম বাংলার লোক আতপ চাউল খাইতে অভ্যস্ত নহে—কাজেই সাধারণের দুঃখ বাড়িয়াছে। আটা ময়দা এইরূপ যে তাহা খাইলেই উদরাময় হইতেছে। যে সকল অঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা বলবৎ নাই—সেখানে গত বৎসর চাউলের মণ ছিল ১৫ টাকা—এখন তাহা হইয়াছে ৩০।৩২ টাকা। কাজেই লোকের পক্ষে চোরা বাজারে চাউল সংগ্রহ করা সাধ্যের বাহিরে গিয়াছে। এই ত চাউল আটার কথা। অন্যান্য সকল খাদ্য তদপেক্ষা অধিক দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। বাংলা দেশের লোক বেশী মাছ খায়। কিন্তু সরকার হইতে মাছের যে দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে লোকের পক্ষে মাছ খাওয়া অসম্ভব হইয়াছে। ৩ টাকা ৪ টাকা সের দরে মাছ ক্রয় করা সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নহে। তরিতরকারীর দামও সেইরূপ। ১৩৫৪ সালে আলুর বীজ সরবরাহে সরকারী বিভ্রাটের জন্য বাঙ্গালার লোক যথাসময়ে আলুর বীজ পায় নাই—কাজেই আলুর চাষও হয় নাই। ফলে এ বৎসর সকল সময়েই আলুর দর অত্যধিক রহিয়াছে। বাংলার বাহির হইতেও আলু আমদানীর সুবিধা করা হয় নাই—হয় ত মালগাড়ীর অভাবে তাহা সম্ভব ছিল না—কাজেই বাংলার প্রধান তরকারী আলু এ দেশে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য থাকিয়া গিয়াছে। দেশে গবাদি পশুপালনের ব্যবস্থা না থাকায় দুগ্ধ ও ঘৃত বা দুগ্ধজাত দ্রব্য ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। কলিকাতা সহরে এক টাকা সের দরেও ভাল দুধ পাওয়া যায় না। ঘৃত এত দুর্লভ যে তাহার কথা না বলাই ভাল। ১৫ টাকা সের দরে ঘৃত ক্রয়ের কথা বিলাস মাত্র—তাহা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে না। চাল, আলু প্রভৃতির মূল্য বেশী থাকায় এবং বোধ হয় চাষও কমিয়া যাওয়ায় অন্য তরিতরকারীও ৪ গুণ মূল্যে সর্ব্বদা বিক্রীত হইয়া থাকে। ডাল বাংলাদেশে কম জন্মায়—বিহার, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ডাল আমদানী করা হইয়া থাকে—কাজেই ডালের সের এক টাকা দর প্রায় বাঁধা হইয়া গিয়াছে। লোক যে ডাল ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে তাহারও উপায় নাই। সরিষার তেল—ভেজালই হউক, আর যাহাই হউক—তাহা ২ টাকা সেরের কমে পাওয়া যায় না। শুনা যায়, তাহাতে অধিক পরিমাণে 'হোয়াইট অয়েল' নামক এক প্রকার খনিজ তেল মিশ্রিত থাকে—ঐ তেল মানুষের খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। দালদা নামক যে পদার্থটি বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা বহু-নিন্দিত হইলেও ঘৃতের অভাবে তাহা সর্ব্বত্রই দরিদ্রের গৃহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুনা যায়, দালদা ব্যবহারের ফলে ব্যবহারকারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে সরকার পক্ষ হইতেও কোন কঠোর ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। বরং দেশের সর্ব্বত্র বড় বড় নূতন দালদার কারখানা খোলা হইতেছে। চিনির দাম রেশনের সময় সাড়ে ১০ আনা ছিল—রেশন উঠিয়া যাওয়ায় এক টাকা বা তদপেক্ষা অধিক মূল্যে ছাড়া ১ সের চিনি পাওয়া যায় না। চিনির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে গুড়ের দামও বাড়িয়া গিয়াছে। গত কয় বৎসর ধরিয়া কলিকাতা ও সহরতলীতে নিয়মিত কয়লা সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই সম্ভব হইল না। নির্দ্দিষ্ট দোকানে কয়লার মণ ২ টাকা হইলেও সে দোকানে প্রায়ই কয়লা পাওয়া যায় না—কাজেই লোক কালবাজারে ৩ টাকা মণ দরে কয়লা কিনিতে বাধ্য হয়। অথচ শুনা যায়, বাঙ্গালা ও তৎসন্নিহিত খনি সমূহে প্রচুর কয়লা তোলা আছে—তাহা আনিবার ব্যবস্থা না থাকায় লোক এত দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। তাহার পর বস্ত্রের কথা। প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গিয়াছিল—এই এক বৎসর কাল জনগণকে ৪ গুণ দাম দিয়া কাপড় কিনিতে হইয়াছে। কারণ কাল-বাজার ছাড়া কাপড় কিনিবার অন্য উপায় ছিল না। এখন বাজারে সামান্য কাপড় আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দাম রেশনিংএর কাপড়ের দামের দ্বিগুণ। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে। কলওয়ালারা কয়লা পায় না। মজুরের বেতন বাড়িয়া গিয়াছে—কাজেই তাহারাও এই সুযোগে কাপড়ের দাম দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছে। এ সমস্তই নাকি মন্ত্রীদের পরামর্শ ক্রমে করা হইতেছে—কাজেই মন্ত্রীরা হয় ত মসনদে বসিবার পর দরিদ্র জনগণের দুঃখ কষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন—এখন তাঁহারা শুধু ধনী কলওয়ালাদের অসুবিধার জন্য অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন। কোন দিক দিয়া দরিদ্রের ক্রন্দন যাহাতে মন্ত্রীদের কান পর্য্যন্ত গিয়া না পৌঁছায়, তাহার ব্যবস্থায় মন্ত্রীপক্ষ রীতিমত তৎপর। দেশে সকল সম্প্রদায়ের

মধ্যে দুর্নীতি এত বাড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে যে তাহার কথা না বলাই ভাল। বহু সরকারী কর্ম্মচারী প্রকাশ্যে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে—দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিগণই এখন তাহাদের প্রধান পরামর্শদাতা—কেহ সে কথা বলিতে যাইলে তাহাকে 'কমুনিষ্ট' আ্যাখ্যা দিয়া গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থারও অভাব নাই। মানুষ ক্রমে সকল দিক দিয়া নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের মনে আশা দিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আশ্রয়হীনদের অবস্থা—

গত কয় মাস ধরিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে দলে দলে বাস্তুত্যাগীরা পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিতেছেন। কি কারণে তাঁহারা সকল সুখসুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া এমন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছেন, আজ আর তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। এ কথা সত্য যে, যাঁহারা দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। দেশে পৈতৃক ভিটায় বাস করিয়া, ২।৪ বিঘা জমীর উপসত্ব ভোগ করিয়া কোন রকমে তাঁহারা জীবিকার্জ্জন করিতেন—এখানে তাহার কোন উপায় নাই। এখানে একজন উপার্জ্জনকারীর নিকট ১০জন বেকার আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহার অবস্থাও চরম হইয়াছে। ফলে এদেশে বাসগৃহ-সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। একখানা ঘর খালি হইলে বাড়ীওয়ালা তাহা নীলামে চড়াইয়া দেয় ও তাহার ন্যায্য ভাড়া ১০ টাকা হইলেও প্রয়োজনের তাগিদে লোক তাহা মাসিক ৩০ টাকা ভাড়ায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও ঐ এক কথা প্রযোজ্য। সহর ও সহরতলীর লোক সংখ্যা অধিকাংশ স্থলে দ্বিগুণ হইয়াছে—কোথাও বা তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কাজেই বাজারে তরকারী বা মাছ আসিলে তাহা লোক প্রয়োজনের তাগিদে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ দাম দিয়া কিনিয়া লইতে বাধ্য হয়—কারণ না কিনিলে তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাকরীর বাজারেও অব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। চিকিৎসক, উকীল, শিক্ষক প্রভৃতির সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ায় একদিকে যেমন ভাল কাজ হইতেছে না—অন্যদিকে তেমনই বেকার সমস্যা সকলকে উৎপীড়িত করিতেছে। হঠাৎ অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানের এত অধিক লোক পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া পড়ায় সরকারও আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার কোন সুসমাধান করিতে সমর্থ হন নাই। সেজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে বটে, কিন্তু এ অবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা লইয়া কাজ করা অসম্ভব হওয়ায় বহু অর্থ অপব্যয় হইতেছে। বিহার ও উড়িষ্যা সরকারও আশ্রয়প্রার্থীকে স্থান দিতে সম্মত হইয়াছেন—তাহার ব্যবস্থা হইলে এবং পশ্চিম বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের সংস্কারের ব্যবস্থা হইলে এই সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে দলাদলি—

পশ্চিম বাঙ্গালায় কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে দলাদলি ও বিবাদ-বিরোধ এত অধিক দেখা যাইতেছে যে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি ও শ্রীযুত অতুল্য ঘোষকে সম্পাদক করিয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় নূতন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বার্থান্বেষীর দল ঐ নেতৃত্ব না মানিয়া নিজ নিজ এলাকায় নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছে। একথা সত্য যে কংগ্রেস কর্ম্মীদের ত্যাগ ও নির্য্যাতন-ভোগের ফলে দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইয়াছে—কিন্তু পুরাতন কর্ম্মীদের মধ্যে বর্ত্তমানে সে ত্যাগ ও সেবার মনোভাব আর নাই—অধিকাংশ লোক স্বার্থান্ধ হইয়া এই সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ আর কংগ্রেসকর্ম্মীদের নির্য্যাতন ভোগের ভয় নাই—কাজেই একদল জুয়াচোর আজ কংগ্রেসকর্ম্মী সাজিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ছলে বলে কৌশলে কয়েকজন কংগ্রেসকর্ম্মীকে হাত করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় স্থির করিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা শুধু ত্যাগী ও সেবাব্রতী কংগ্রেস-সেবকদের লইয়া গঠিত হয় নাই—ঐ দলে ধনী, জমীদার, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক প্রভৃতিরাও স্থান পাইয়াছেন। দেশের জনগণ তাঁহাদিগকে দুর্নীতির উর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া মনে করিতে পারে না—কাজেই সরকারী কাজে গলদ বা গাফিলতী দেখিলে লোক সহজেই মনে করে যে

ইহার মধ্যে দুর্নীতি থাকিয়া গিয়াছে। যেমন একদল প্রকৃত সেবাব্রতী কংগ্রেস-কর্ম্মীকে শাসনকার্য্যের সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তাহার প্রয়োজনও কেহ অস্বীকার করিবেন না, তেমনই একদল স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও কৌশলে শাসনকার্য্যের সাহায্য-কারীরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের অনুষ্ঠিত দুর্নীতি আজ কংগ্রেসের সকল ক্ষেত্রের সকল কর্ম্মীকে কলঙ্কিত করিতেছে—সেজন্য লোক কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছে। দেশে শক্তিমান নেতার অভাবই আজ দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একথা সত্য যে, নিঃস্বার্থ, সেবাব্রতী, ত্যাগী কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি থাকিতে পারে না—কোনরূপ দলাদলি হইবার কারণও নাই। কিন্তু ক্ষমতালোলুপের দল কংগ্রেসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পবিত্র কংগ্রেসকে আজ কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। দেশবাসী জনগণের মধ্যে আজ অধিক মনবলের প্রয়োজন। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, আজিকার এই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও জয়যুক্ত করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু কোন কংগ্রেসকে আমরা গ্রহণ করিব? সে বিষয়ে যেন আমরা সতর্কতার সহিত কাজে অগ্রসর হই। কোনরূপ স্বার্থবুদ্ধি যেন আমাদের পথভ্রষ্ট করিতে না পারে। কংগ্রেসের মধ্যে যে দলাদলি তাহা বন্ধ করার উপায় জনগণের হাতে। জনগণ দলাদলিতে প্রশ্রয় না দিলে নেতারা কখনই দল বাঁধিতে পারিবেন না। আজ দেশের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত। এ দুর্দ্দিনে বাঁচিতে হইলে আমাদের আবার সেই পুরাতন ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের পথই গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

যানবাহন সমস্যা—

কলিকাতা ও সহরতলীর লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইলেও যানবাহনের সংখ্যা তাহা হয় নাই। বরং রেলের-গাড়ী ও এঞ্জিনের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট বা হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান যাতায়াতকারী লোকাল ট্রেণের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বনগাঁ লাইনে বা কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের রেলপথেও সেই একই অবস্থা। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে এঞ্জিন ও গাড়ী তৈয়ার হইয়া আসিত—এখন আর তাহা হয় না। এখানেও এঞ্জিন ও গাড়ী তৈয়ারীর বড় কোন কারখানা হয় নাই। কাজেই গাড়ী ও এঞ্জিনের অভাবই রেল-সমস্যার প্রধান কারণ। আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে সে অভাব দূর করার কোন উপায় নাই। পশ্চিম বঙ্গ কর্ত্তৃপক্ষ নূতন বাস আনিয়া কলিকাতার পথে চালাইয়া কলিকাতাবাসীদের সমস্যা কতকটা সমাধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নূতন সরকারী বাস চলাচলের ফলে দেখা যাইতেছে—কলিকাতা ও সহরতলীর সকল বাস যদি সরকারী পরিচালনাধীন করা হয়, তাহা হইলে অতি লোভী বাসওয়ালাদের অত্যাচার দূরীভূত হইয়া যাত্রীসাধারণ উপকৃত হইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে সরকারী যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সকল বাসই এখন যাহাতে সত্বর সরকারী পরিচালনায় চালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রয়োজন। বাস চলাচলের সুব্যবস্থা হইলে ট্রাম কোম্পানীও সচেতন হইবে এবং তাহার ফলে তাহারা ট্রামযাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানে যত্নবান হইবে সন্দেহ নাই।

প্রবাসী বাঙালীদের আনন্দানুষ্ঠান—

মধ্য প্রদেশের কাটনী সহরে প্রবাসী বাঙালীদের একটি সংঘ আছে—তাহার নাম 'নবীন স্মৃতি সংঘ'—গত ৯ই সেপ্টেম্বর তাহা ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করায় গত ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার সেখানে একটি আনন্দ-উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐ উৎসবে আনন্দ-নাড়ু, কাশীর টোট্‌কা ও দীক্ষা-লাভ নামক তিনখানি নাটিকা অভিনীত হইয়াছিল। বীথিকা, দীপিকা, কণিকা, সুমতি, সীতা প্রভৃতি বালিকারা মূক ও সবাক অভিনয় করিয়া সকলকে বেশ আনন্দদান করিয়াছিলেন প্রবাসী বাঙালীদের সংস্কৃতি রক্ষার এই চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

চ্যারিটি খেলা প্রসঙ্গ ঃ

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পৃথিবীর অলিম্পিক গেম্‌সে শেষ পর্য্যন্ত বর্ম্মী ফুটবল দল যোগদান করেনি। লণ্ডন-যাওয়ার পথে কলকাতায় বর্ম্মাদলের যে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল, আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে তা বাতিল করেন এবং আই এফ এ-র সিদ্ধান্ত যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে এ সংবাদ যথাসময়ে বর্ম্মাদলের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে নাকি পৌঁছায় না, তাঁরা ক'লকাতায় খেলার উদ্দেশ্যে সমস্ত যাতায়াত ব্যবস্থা নাকি ঠিক ক'রে টাকা অগ্রিম দিয়ে ফেলেছিলেন। বর্ম্মাদলকে আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্যই শেষ পর্য্যন্ত নাকি আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষ সৌজন্যের খাতিরে বর্ম্মাদলের প্রদর্শনী-ম্যাচ মঞ্জুর করেন। বর্ম্মাদল কলকাতায় তিনটি ম্যাচ খেলেছিল, তিনটিই আই এফ এ বাছাই দলের সঙ্গে। প্রথম ম্যাচ ড্র যায়, দ্বিতীয় ম্যাচে বর্ম্মা ২ গোলে বিজয়ী হয় এবং শেষ খেলাটিতে উভয়পক্ষে একটি ক'রে গোল হয়। মোটের উপর এ বারে বর্ম্মাদল বিজয়ী হয়েছে—খেলায় কৃতিত্ব দেখিয়ে নয় আই এফ এ-র টীম মনোনয়ন কমিটীর ক্রটীপূর্ণ টিম তৈরীর জন্য। প্রথমতঃ তিনটি ম্যাচই আই এফ এ-র বাছাই দলের সঙ্গে দিয়ে তাঁরা ক্রীড়ামোদীদের কাছে খেলার আকর্ষণ হ্রাস করেছিলেন, তার উপর এলো-মেলো ভাবে টিম তৈরী ক'রে। আই এফ এ বাছাই দলের একটি দলও শক্তিশালী ক'রে গঠন করা হয়নি। ফলে খেলায় জয়লাভ দূরে থাক দর্শকদের কাছে কোন খেলাটিই আকর্ষণীয় হয়নি, অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়েছিল। এ বছরের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী দলের সঙ্গে দু'টি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলিয়ে বাকি একটি যদি আই এফ এ-র অবশিষ্ট দলগুলি থেকে বাছাই খেলোয়াড় নিয়ে দল তৈরী ক'রে খেলান হ'ত তাহ'লে খেলায় উদ্দীপনার অভাব হ'ত না, দর্শকদের খেলা দেখার আকর্ষণের অভাব হ'ত না এবং ক'লকাতায় ফুটবল খেলার সম্মান এভাবে ক্ষুণ্ণ হ'তে কোনদলই সহজে দিত না। বর্ম্মাদের খেলা কোন মতেই উচ্চাঙ্গের হয়নি। অলিম্পিক চীনা দলের খেলা এবং আই এফ এ শীল্ড খেলা শেষ হওয়ার পর এ রকম প্রদর্শনী খেলার তাৎপর্য্য কোন দিক থেকেই উপলব্ধি করা যায় না। খেলা-ধূলার উদ্দেশ্য সাধু। জাতীয় চরিত্র গঠনে খেলা-ধূলার প্রভাব কত বেশী তা পরিমাপ করা যায় না। এই খেলা-ধূলায় দেশের জনসাধারণের আগ্রহ এবং সহযোগিতার প্রকৃষ্টতম উপায় হ'ল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং খেলায় বিজয়ী দলের সাফল্যকে সামাজিক স্বীকৃতি লাভের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা এবং প্রচার থাকা দরকার। তা নাহলে খেলাধূলা জনপ্রিয়তা লাভ করে না; জনসাধারণের কাছে এই জনপ্রিয়তাই হ'ল খেলাধূলার অন্যতম সার্থকতা। যেমন প্রত্যেক সামাজিক গঠন ব্যবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা, ভারসাম্য এবং সীমানা আছে, খেলাধূলার মধ্যেও তা থাকা উচিত। খেলাধূলায় জনসাধারণের অত্যধিক আকর্ষণে সামাজিক জীবনের ভারকেন্দ্র স্থান-চ্যুত হ'লে বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা খুব বেশী। সেই কারণে সামাজিক অপরাপর কঠোর কর্ত্তব্য উপেক্ষা ক'রে আমোদ প্রমোদ এবং খেলাধূলায় যোগদান ক'রে যথেচ্ছ অর্থ ব্যয়ে এবং শারীরিক উত্তেজনায় জনসাধারণ যাতে অমিতব্যয়ী এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী না হয়, তার জন্য সভ্য দেশের সরকার সজাগ থাকে এবং নানাপ্রকার আইন শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ বছর অলিম্পিক চীনা দলের প্রদর্শনী খেলা এবং স্থানীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় একাধিক আকর্ষণীয় ম্যাচে দেশের জনসাধারণ রৌদ্র এবং বৃষ্টিতে ৭।৮ ঘণ্টা শারীরিক ক্লেশ ভোগ ক'রে স্বাস্থ্যনীতির অনেক বিধি নিষেধই অমান্য করেছিলো এবং দেশের বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট যে সময়ে চারি পাশ থেকে সমূহ বিপদের সঙ্কেত জ্ঞাপন করছে সে সময়ে খেলাধূলার উপর জনসাধারণের স্বভাবজাত আকর্ষণের সুযোগ নিয়ে এত বেশী চ্যারিটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলানো সমাজ বিরোধী কাজ বলা খুব অযৌক্তিক হবে না। দেশের মঙ্গল হবে এমন সংগঠনমূলক উদ্দেশ্যে যেখানে অর্থসংগ্রহ হয় না কিম্বা দেশের সাড়া পাওয়া যায় না-অথচ জনসাধারণ খেলাধূলার মাঠে যে অর্থ এবং সময় ব্যয় করে তা অপব্যয় এবং এই বেহিসাবি খরচ দেশের পক্ষে মঙ্গল নয়। চ্যারিটী ম্যাচের যথেষ্ট সার্থকতা আছে কিন্তু তার একটা

সীমা থাকা উচিত। যেখানে সোজাসুজি জনসাধারণের মধ্যে উদার হৃদয়বৃত্তির সাড়া পাওয়া যায় না সেখানে দুর্ব্বলতার মধ্যস্থতায় চ্যারিটি শব্দযোগে অর্থ সংগ্রহ আপাতঃ কার্য্যোদ্ধার হ'লেও প্রকৃত জাতি গঠনের কাজ করা হয় না। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, খেলার মাঠে দর্শক সংখ্যার শতকরা ৯৯জন হ'ল স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটে, পুষ্টিকর এবং পরিমিত খাদ্য ও ঔষধ পথ্যের অভাবে যখন আমরা জর্জ্জরিত সে সময়ে জনসাধারণের দুর্ব্বলতাকে খেলার মাঠে স্বার্থ-সাধনে বা কোন সৎ কাজের নামেও প্রয়োগ করা মোটেই সমীচীন নয়, এ সমস্ত বন্ধ করা উচিত।

অলিম্পিক গেমস: লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসের ১৪শ সংখ্যক অনুষ্ঠানে ৬২টি দেশের ৬,০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে কোন কোন দেশের প্রতিনিধিরা শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ পয়েন্ট লাভ করলো এ জানবার কৌতূহল ক্রীড়ামোদীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। অলিম্পিক খেলার নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত কৃতিত্বই স্বীকার করা হয়, সাধারণত কোন দেশের সাফল্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। অবিশ্যি খেলার কয়েকটি অনুষ্ঠানে এই নীতির ব্যতিক্রম আছে। উদাহরণ-স্বরূপ হকি, ফুটবল, রীলে প্রভৃতির নাম করা যায়। পয়েন্টের দিক বিচার ক'রে অলিম্পিক গেম্‌সের আইন অনুযায়ী কোন দেশকে সরকারীভাবে অলিম্পিয়াড বিজয়ী ঘোষণা করা হয় না। অলিম্পিক গেম্‌সের উদ্‌যোক্তাদের ধারণা এইরূপ স্বীকৃতির ফলে অলিম্পিক যোগদানকারী জাতিগুলির মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ সরকারী স্বীকৃতি না পেলেও ঈর্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব নেই। সংবাদপত্র জগতে জাতির সাফল্যকে স্বীকার করা হয় এবং বর্ত্তমান যুগে এর থেকে বড় স্বীকৃতি বা সম্মান আর কি থাকতে পারে। পৃথিবীর প্রতিষ্ঠাবান সংবাদ-সরবরাহক প্রতিষ্ঠান মারফৎ অলিম্পিক গেম্‌সের অনুষ্ঠানের বিবরণ বিজয়ীদের আলোক-চিত্রসহ সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়। অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এই সংবাদ অনুধাবন ক'রে যোগদানকারী দেশগুলির জনসাধারণ আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা, ঈর্ষা এবং গর্ব্বে চঞ্চল হয়ে উঠে। অলিম্পিক গেম্‌সে শেষ পর্য্যন্ত কোন কোন দেশ কিরূপ পয়েন্ট পেল তার একটি ক্রমপর্য্যায় তালিকা সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ ক'রে পাঠকদের অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করে। এই তালিকা বে-সরকারী-ভাবে প্রকাশ করা হ'লেও এইরূপ স্বীকৃতির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পয়েন্ট অনুসারে নিম্নলিখিত ক্রমপর্য্যায় তালিকায় ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক গেমসে যোগদানকারী দেশগুলির স্থান নিরূপণ করা হয়েছে,।

অলিম্পিকের সমস্ত খেলা ঃ

প্রথম পাঁচটি দেশ :—১ম—আমেরিকা—৪০০ পয়েন্ট (৩৮ স্বর্ণ, ২৭ রৌপ্য ও ১৭ ব্রোঞ্জ পদক); ২য়—সুইডেন —২৬৮ (১৭ স্বর্ণ, ১২ রৌপ্য ও ১৭টি ব্রোঞ্জ পদক); ৩য় ফ্রান্স—১৭২ (৯ স্বর্ণ, ৭ রৌপ্য এবং ১৩টি ব্রোঞ্জ পদক); ৪র্থ—গ্রেট বৃটেন—১৬৪ (৩ স্বর্ণ, ১৪ রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জ পদক); ৫ম—ইটালী—১৫১ (৮ স্বর্ণ, ১১ রৌপ্য ও ৮ ব্রোঞ্জ পদক)।

ভারতবর্ষ হকিতে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে ১টি স্বর্ণ পদক পেয়েছে। ভারতবর্ষের পয়েন্ট সংখ্যা ৬।

আধুনিক কালের অলিম্পিক গেম্‌সের ইতিহাসে দেখা যায় এক একটি জাতি কিছুকাল খেলাধূলায় প্রাধান্য বিস্তার ক'রে পরে স্থানচ্যুত হয়েছে। অলিম্পিক গেম্‌সের প্রথম দিকে ইংরেজ এ্যাথলেটরা খেলাধূলায় প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করে। ইংরেজ এ্যাথলেটদের প্রতিভা ম্লান ক'রে দেয় ফিনিশরা। ফিনিশদের পর আসে আমেরিকান এ্যাথলেটরা। জার্ম্মাণী এ্যাথলেটরা ১৯৩৬ সালের অলিম্পিকে নিজদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। যুদ্ধোত্তরকালে ১৯৪৮ সালের অলিম্পিকে আমেরিকান এ্যাথলেটরা পুনরায় শীর্ষস্থানে এসেছে। একটি লক্ষ্য করার বিষয়, বিজয়ী দেশগুলির সকলেই 'নদার্ণ রেসের' অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া অপর একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে; অলিম্পিক গেমসের এক একটি খেলায় এক একটি জাতি সুদীর্ঘকাল ধরে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে, এ যেন এক একটি জাতির বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ জাতির ভেতর থেকে সব সময়েইশ্রেষ্ঠ middle-distance runner' তৈরী হ'তে দেখা যায়। আমেরিকান জাতির খ্যাতি শ্রেষ্ঠ Sprinter এবং high jumper হিসাবে। Discus এবং Javelin নিক্ষেপে সুইডিস শ্রেষ্ঠ। Long distance দৌড়ে ফিনিশের সুনাম বহুকালের। জাপানীরা hop-step-jump-এ এবং ভারতীয়দের খ্যাতি হকি খেলায়। হপ্‌ ষ্টেপ ও জাম্পে জাপান পর্য্যায়ক্রমে তিনবার (১৯২৮-১৯৩৬) প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯৩৬ সালে অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেছে। এবার জাপানকে অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিলে হপ্‌ ষ্টেপও জাম্পে যদি বিজয়ী হ'ত তাহলে পর্য্যায়ক্রমে চার বার বিজয়ী হয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপন করতো। সাঁতারের ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোকে পর্য্যায়ক্রমে (১৯২৮-৩৬) তিনবার প্রথম হয় এবং ১৯৩৬ সালের অলিম্পিকে উক্ত বিষয় ছাড়া আরও দুটি বিষয়ে জাপান অলিম্পিক রেকর্ড করে। মেয়েদের বিভাগে হল্যাণ্ড এবং আমেরিকান মেয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। সাঁতারে জাপানী ১৯৩৬ সালে ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোকে পৃথিবীর:রেকর্ড ক'রে সভ্য জগতকে চমৎকৃত করে।

খেলা-ধূলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপধ্যায়

মোহনবাগান ও ভারতীয় ফুটবল ঃ

১৯৪৮ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল খেলার পরিসমাপ্তির সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের গৌরব মোহনবাগান ক্লাবের তৃতীয়বার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ের কথা সমগ্র ভারতবর্ষে ঘোষিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের এই শীল্ড বিজয় মোহনবাগান ক্লাবের অগণিত সমর্থকদের মনে দিয়েছে আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা। ১৯১১ সালের ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয়ের সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর পরে ১৯৪৭ সালে পুনরায় মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয়বার শীল্ড বিজয়ী হয়। এইবার নিয়ে হল তিনবার। এইবার তাদের ভাল ভাল খেলোয়াড়রা ভারতীয় ফুটবল দলের হয়ে অলিম্পিকে খেলতে যাওয়ায় মনে হয়েছিল যে এবার বোধ হয় মোহনবাগান শীল্ড বিজয়ী হতে পারবে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমাদের সে আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়নি। প্রথম দিনের অমীমাংসিত খেলার পর দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগান প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভবানীপুর ক্লাবকে অতিরিক্ত সময়ের খেলায় ২-১ গোলে পরাজিত করতে সমর্থ হয়।

মোহনবাগান—১৯১১

দাঁড়িয়ে (বাম থেকে দক্ষিণে)—রাজেন সেনগুপ্ত, নীলু ভট্টাচার্য্য হীরালাল মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন মুখোপাধ্যায়, সুধীর চট্টোপাধ্যায় ও সুকুল।

বসে (বাম থেকে দক্ষিণে)—কালু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয় ভাদুড়ী ও শিবদাস ভাদুড়ী।

এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ছয়বার শীল্ড ফাইন্যালে উঠেছে—১৯১১, ১৯২৩, ১৯৪০, ১৯৪৫, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে। এর মধ্যে ১৯২৩, ১৯৪০ ও ১৯৪৫ সালে মোহনবাগান যথাক্রমে ক্যালকাটা, এরিয়ান্স ও ইষ্টবেঙ্গলের কাছে পরাজিত হয়। ১৯২৩ সালে ক্যালকাটা ক্লাবের কাছে ৩—০ গোলে মোহনবাগানের পরাজয় খুবই বেদনাদায়ক হয়েছিল সত্য, কিন্তু ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স ক্লাবের কাছে পরাজয় মোহনবাগানের সবচেয়ে লজ্জাকর ও নৈরাশ্যজনক হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ফাইন্যালের দিন যখন এই বিরাট উপমহাদেশে মোহনবাগানের অগণিত সমর্থকগণ তাঁদের অতিপ্রিয় মোহনবাগানের উনত্রিশ বৎসর পরে দ্বিতীয়বার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ের সংবাদের আশায় অধীর আগ্রহে, প্রত্যাশিত আনন্দে অপেক্ষা করছিলেন তখন বজ্রাঘাতের ন্যায় মোহনবাগানের ৪-১ গোলে শোচনীয় পরাজয়ের খবর

এসে তাঁদের বিমূঢ় করে দিল। এরিয়ান্সের সমর্থকেরাও যেন এই অপ্রত্যাশিত বিজয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বিশাল অগণিত মোহনবাগান সমর্থকদের শোকসাগর মধ্যে এরিয়ান্সের জয়োল্লাস বুদ্বুদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েছিল। এরিয়ান্সের এই জয়লাভ কিন্তু খুবই কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছিল এবং এরিয়ান্স মোহনবাগান অপেক্ষা অনেক উন্নততর খেলা খেলেছিল। তারপর ১৯৪৫ সালের ফাইন্যালে মোহনবাগান সালের ফাইন্যালে মোহনবাগান পুনরায় তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতরণ করে। কিন্তু এবার মোহনবাগান ১—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে পূর্ব্ব পরাজয়ের শোধ নিয়ে দ্বিতীয়বার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়। কিন্তু এই জয়লাভের সঙ্গে ১৯১১ সালের ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয়ের তুলনা করলে আমরা পাই আশার বদলে নিরাশা, উৎসাহের স্থানে আসে

মোহনবাগান—১৯৪৭

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল স্যার বি. এল. মিত্র ও লেডী মিত্রের সহিত। ফোটো—ডি. রতন

পরাজিত হল ইষ্টবেঙ্গলের কাছে ১—০ গোলে। এ পরাজয় মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে দুঃখজনক হলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত হয়নি। জয়লাভের জন্য বদ্ধপরিকর ইষ্ট-বেঙ্গলদলের খেলোয়াড়দের তুলনায় মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা খুবই নিকৃষ্ট ধরণের খেলা খেলেছিলেন। খুব সম্ভব অতিরিক্ত নার্ভাস হয়ে পড়ার জন্যই মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা খেলার গোড়ার থেকেই পরাজিত দলের মতন নৈরাশ্যজনক খেলা খেলেছিলেন। এরপর ১৯৪৬ সালের শীল্ডের খেলা বন্ধ থাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য। ১৯৪৭ নিস্তেজতা। ১৯১১ সালের ২৯শে জুলাইএর অপরাহ্নে মোহনবাগানের প্রসিদ্ধ ফরওয়ার্ড শিবদাস ভাদুড়ী বাংলার তথা ভারতের ফুটবল ইতিহাসের যে গৌরবময় সূচনা করেছিলেন সেই ইতিহাস, কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে গৌরবোজ্জল হয়ে উঠেনি। যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেড়ে আজ বিশ্ব ফুটবলের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সমান হওয়া উচিত ছিল তা দেখা যাচ্ছে ক্রমশ নিম্নগামী হতে হতে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এই অধোগতি আর না আটকালে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে এই নিম্নগামী ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওঠাবার চেষ্টা না করলে ভবিষ্যতে

অলিম্পিকে বা পাশ্চাত্য ফুটবল দলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

১৯১১ সালের শীণ্ড ফাইন্যালে মোহনবাগানকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হয়েছিল দুর্জ্জয় শক্তিশালী ইংরাজ সৈনিকদল ইষ্ট ইয়র্কসায়ারের সঙ্গে। এই ইষ্ট ইয়র্কসায়ারের সুপ্রসিদ্ধ গোলরক্ষক ক্রেসির মতন খেলোয়াড় আজ পর্য্যন্ত কলিকাতার মাঠে দেখা গেছে বলে মনে হয় না। এই দুর্জয় গোলরক্ষককে পরাজিত করা তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু বীর শিবদাস অপূর্ব্ব ক্রীড়াচাতুর্য্যের সাহায্যে এই অজেয় গোলরক্ষককে পরাজিত করে এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তখন ছিল না আজকার বিজ্ঞান সম্মত ট্রেনিং, ছিল না অনুশীলনের সুব্যবস্থা, ছিল না অর্থের আকর্ষন। কিন্তু তখনকার এই অনামা ভারতীয় দলটি দুর্দ্ধর্ষ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে ভারতীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯১১ সালের ঐ একাদশ বীরের ঐতিহাসিক জয়লাভের জন্য দায়ী ছিল তাঁদের জয়লাভের অদম্য স্পৃহা, অপূর্ব দলগত শক্তি ও লৌহসদৃশ নার্ভ। জয়লাভের জন্য তাঁরা ছিলেন বদ্ধপরিকর, ব্যক্তিগত ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করতে গিয়ে দলগত শক্তি নষ্ট করবার প্রবৃত্তি তাঁদের ছিল না, বিপক্ষ গোল সম্মুখে নার্ভ হারিয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে গোলপোষ্টের বাইরে বল পাঠাবার মত মনের দুর্বলতা ও তাঁরা বোধ করতেন না। সে ১৯১১ সাল আর ফিরে আসবে না। দ্বিতীয় শিবদাস-বিজয়দাসের আবির্ভাবের আশাও আমরা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিখেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের দিকে চেয়ে।

১৯১১ সালের পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর লেগেছে ভারতীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয়বার আই এফ এ শীল্ড বিজয় করতে। ১৯৩৬ সালে ভারতবিখ্যাত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ভারতীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে ফাইন্যালে পরাজিত করে।

১৯৩৬ সালের পর থেকেই দেখা যায় কলিকাতার ফুটবল খেলায় ইউরোপীয় দলগুলির শক্তি ক্রমশ কমে আসছে এবং ভারতীয় দলগুলি আসতে আসতে প্রাধান্যলাভ করছে। ইউরোপীয় দলগুলির শক্তি কমে যাওয়ার প্রধান কারণ ক্যালকাটা, ডালহৌসী প্রভৃতি স্থানীয় দলগুলির খেলোয়াড়দের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড পড়ে যাওয়া। তার ওপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য শক্তিশালী ইউরোপীয় সৈনিক দলগুলির আই, অফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদানও ক্রমশ কমে আসে। ক্যালকাটা, ডালহৌসী, কাষ্টমস্, রেঞ্জার্স প্রভৃতি স্থানীয় ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দলগুলি এবং প্রসিদ্ধ রয়্যাল আইরিশ রাইফেল, স্রপশাসার, নর্থস্ট্র্যাফোর্ড, সাউথ স্ট্র্যাফোর্ড, গর্ডনহাইল্যাণ্ডারস্,ডারহাম, কে আর আর, ব্ল্যাকওয়াচ, কে-ও-এস-বি, ডি-সি- এল-আই প্রভৃতি শক্তিশালী ইউরোপীয় সৈনিক দলগুলি কলিকাতার তথা ভারতীয় ফুটবলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাড়ানোর জন্য দায়ী। স্থানীয় ইউরোপীয় দলগুলির পতন হওয়ায় এবং সৈনিকদলগুলির যোগদান কমে যাওয়ায় ধীরে ধীরে কলিকাতার ফুটবলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্নগামী হতে থাকে এবং বিদেশী দলগুলির এই পড়তি ও অনুপস্থিতির সুযোগে স্থানীয় ভারতীয় দলগুলি লীগ ও শীল্ড প্রতিযোগিতায় ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করে। ভারতীয় দলগুলি প্রাধান্য লাভ করলেও খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতি করতে কিছুমাত্র সক্ষম হয়নি বরং আগের চেয়ে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে গেছে তার অজস্র প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। অতীতে ভারতীয় ফুটবলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে সুস্থ উত্তেজনার মধ্যে খেলোয়াড়দের যে

মোহনবাগান—১৯৪৮

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর সহিত।

ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

অপূর্ব্ব ক্রীড়াকৌশল দেখে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হতেন ও নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করতেন আজ তা কোথায়! ক্যালকাটা বনাম ডালহৌসী, শেরউড ফরেষ্টার বনাম ক্যামেরণ হাইল্যাণ্ডারস্, ডারহাম বনাম কে আর আর, প্রভৃতির যে সব শীল্ড ফাইন্যাল হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তির আশা আজ আর নেই। এখন খেলোয়াড়দের ক্রীড়াকৌশল দেখতে বা খেলার নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করতে দর্শকেরা মাঠে যান না, যান তাঁদের প্রিয় দলগুলির জয় দেখতে। যদি দর্শকদের প্রিয় কোনদল দুর্ভাগ্যবশতঃ বা নিকৃষ্ট ক্রীড়ানৈপুন্যের জন্য পরাজিত হয় তা'হলে খেলোয়াড়দের ভিতরের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যে। প্রথমে বাক্‌যুদ্ধ, পরে হাতাহাতি তারপর রেফারী ও খেলোয়াড়দের নির্য্যাতনের পর খেলা দেখার পরিসমাপ্তি! বাইরের দর্শকেরা ছাড়াও নাম করা ক্লাবের সভ্যরা পর্য্যন্ত আজ এই নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নন। তবে আশার কথা এই যে মোহনবাগান ক্লাব এখনও এই মনোবৃত্তির উর্দ্ধে আছে এবং ভরসা করি মোহনবাগান তাঁদের 'ট্রেডিসন্যাল স্পোর্টিং স্পিরিট' এর দ্বারা বাংলার উচ্ছৃঙ্খল ফুটবল দর্শকদের প্রভাবান্বিত করে খেলার মাঠের সুস্থ আবহাওয়াকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

মোহনবাগান ক্লাবকে যদিও বাংলার তথা ভারতীয় ফুটবলের জনক বলা চলে না তবুও এটা ঠিক যে ১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয় করে মোহনবাগান ক্লাবই ভারতীয় ফুটবলের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং এই মোহনবাগান ক্লাবই বাংলার ফুটবলের শৈশবাবস্থায় তখনকার তরুণ খেলোয়াড়দের মনে যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তারই ফলে আজ ফুটবল খেলা বাংলার জাতীয় খেলায় পরিণত হয়েছে। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে ১৮৮২ সালে হরিদাস শীল প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুলের কয়েকটি ছাত্র নিয়ে সর্ব্বপ্রথম ফুটবলে লাথিমারা আরম্ভ করেন। ইহাই বোধ হয় ভারতীয়দের সর্ব্বপ্রথম ফুটবল খেলা! হেয়ার স্কুলের ছাত্র নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে বাংলাদেশের ফুটবল খেলার প্রথম প্রবর্ত্তক হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়। তবে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র কালীচরণ মিত্রকেই ভারতীয় ফুটবলের জনক বলা হয়। কালীচরণ মিত্রই সর্ব্বপ্রথম ফুটবল খেলাকে আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে সর্ব্বপ্রথম যে বাঙালী ফুটবল দল প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় দল ডালহৌসী ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন তাতে কালীচরণ মিত্র ফুল-ব্যাকরূপে খেলেন এবং প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। এর আগে কিন্তু তিনি আক্রমণ ভাগে খেলতেন। এই সময় কোন ইউরোপীয় দলই কোন ভারতীয় দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিল না। কালীচরণ মিত্র ১৮৮৬ সালে ট্রেডস্ ক্লাবকে একটি ভারতীয় দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে রাজি করান। ১৮৮২ সালে এসোসিয়েশন ফুটবল প্রতিযোগিতাকে জনপ্রিয় করবার জন্য ট্রেডস্ ক্লাব ট্রেডস্ কাপ প্রতিযোগিতার প্রচলন করেন এবং শোভাবাজার ক্লাবই একমাত্র ভারতীয় দল যে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে। কালীচরণ শোভাবাজার ক্লাবে যোগদান করে ক্লাবের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং ১৮৯২ সালে শোভাবাজার ক্লাব ট্রেডস্ কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে ইষ্ট সারে রেজিমেণ্ট দলকে পরাজিত করে। শোভাবাজার ক্লাবের এই বিজয় স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তখন এমন কোন বাঙালী ক্লাব ছিল না যারা কালীচরণের কাছ থেকে উপদেশ, উৎসাহ ও সাহায্য না পেত। কালীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জি, এ, ষ্ট্যাক্‌এর কাছ থেকেই ফুটবল খেলায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৮৮৩ সালে অধ্যাপক ষ্ট্যাক্ তাঁর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের দুইটি ফুটবল ও এসোসিয়েশন ফুটবলের একটি নিয়ম পুস্তিকা উপহার দিয়ে ছাত্রদের ফুটবল খেলায় উৎসাহিত করেন এবং কালীচরণই এই ফুটবল খেলায় সব চেয়ে বেশী আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখায়। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে একটি ফুটবল দল গঠন করা হয় এবং বিপুল উৎসাহের সঙ্গে কলেজের মাঠে এসোসিয়েশন ফুটবল খেলা চলতে থাকে। এই সময় সেণ্ট-জেভিয়ারস্, বিশপস্, লা-মার্টিনের, শিবপুর প্রভৃতি আরও কতকগুলি কলেজেও ফুটবল টীম গঠিত হয়। তারপর ১৮৮৪ সালে বহুবাজারের কয়েকজন যুবক ময়দানে অক্টারলোনী মনুমেণ্টের নিকট 'ওয়েলিংটন ক্লাব' নামে আর একটি ক্লাব স্থাপন করেন। ১৮৮৫ সালে 'ওয়েলিংটন ক্লাব' ভেঙ্গে ঐ ক্লাবেরই কয়েকজন সভ্য বর্ত্তমান 'টাউন ক্লাব'

গঠন করেন। এর পরই শোভাবাজার, মোহনবাগান, ন্যাশানালস্, ডায়না প্রভৃতি ক্লাব গঠিত হয়। তারপর হয় কুমারটুলি, এরিয়ান্স প্রভৃতি। মোহনবাগান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ সালের আগষ্ট মাসে। উত্তর-কলিকাতার 'মোহনবাগান ভিলা' নামক প্রশস্ত ময়দানে মোহনবাগান ক্লাব খেলা আরম্ভ করে এবং এই 'মোহনবাগান ভিলা' থেকেই ক্লাবের নামকরণ হয় মোহনবাগান। দু'বছর পরে মোহনবাগান ক্লাবকে উঠে যেতে হয় শ্যামপুকুর গ্রাউণ্ডে। তারপর শ্যাম-স্কোয়ার নামক পাবলিক পার্কে। এই সময় ক্লাবের সভ্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় উত্তর কলিকাতা ছেড়ে মোহনবাগান ক্লাবের আরও প্রশস্ত ময়দানে উঠে যাবার দরকার হয়। ১৯০০ সালে মোহনবাগান ক্লাব ময়দানের বর্ত্তমান স্থানে উঠে আসে। ময়দানে আসার পর ক্লাবের কার্য্যকারিতা আরও বেড়ে যায় এবং ১৯০৪-৫-৬ সালে কুচবিহার কাপ, ১৯০৫-৬ সালে গ্ল্যাডষ্টোন কাপ এবং ১৯০৬-৭-৮ সালে ট্রেডস্ কাপ লাভ করে। ১৯০৯ সালে মোহনবাগান সর্ব্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করে দ্বিতীয় রাউণ্ডে গর্ডন হাইলাণ্ডারস্ এর নিকট পরাজিত হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ শীল্ড বিজয় করে ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসের নব অধ্যায়ের সূচনা করে। মোহনবাগানের এই শীল্ড বিজয়ে ভারতের সর্ব্বত্র এবং ইংলণ্ডের ফুটবল মহলেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং এর পর থেকেই ভারতীয় ফুটবল দলগুলি বিপুল উৎসাহের সঙ্গে ফুটবল খেলার চর্চ্চা আরম্ভ করে। মোহনবাগানের নাম তখন থেকেই সমগ্র ভারতের ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রাণে অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে। এর পর ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান সর্ব্বপ্রথম ফার্ষ্ট ডিভিশন ফুটবল লীগ লাভ করে। ১৯৪৩ ও ৪৪ সালে উপর্য্যুপরি দুবার প্রথম ডিভিসন লীগ বিজয় করে মোহনবাগান লীগ খেলায় তাদের অসাফল্যের কলঙ্ক মুছে ফেলে এবং ১৯৪৭ সালে সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছর পরে দ্বিতীয়বার আই এফ এ শীল্ড লাভ করে।

বাংলার এবং ভারতের ফুটবল আজ যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ভারতীয় ফুটবলের গৌরব এই মোহনবাগান ক্লাব। বাঙ্গালী যতদিন ফুটবল খেলবে, ভারতবর্ষে যতদিন ফুটবল খেলার প্রচলন থাকবে ততদিন মোহনবাগানের নাম কেউ ভুলবে না—ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে মোহনবাগানের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

মোহনবাগান দীর্ঘজীবি হউক!

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী — কিরাত দম্পতী — ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
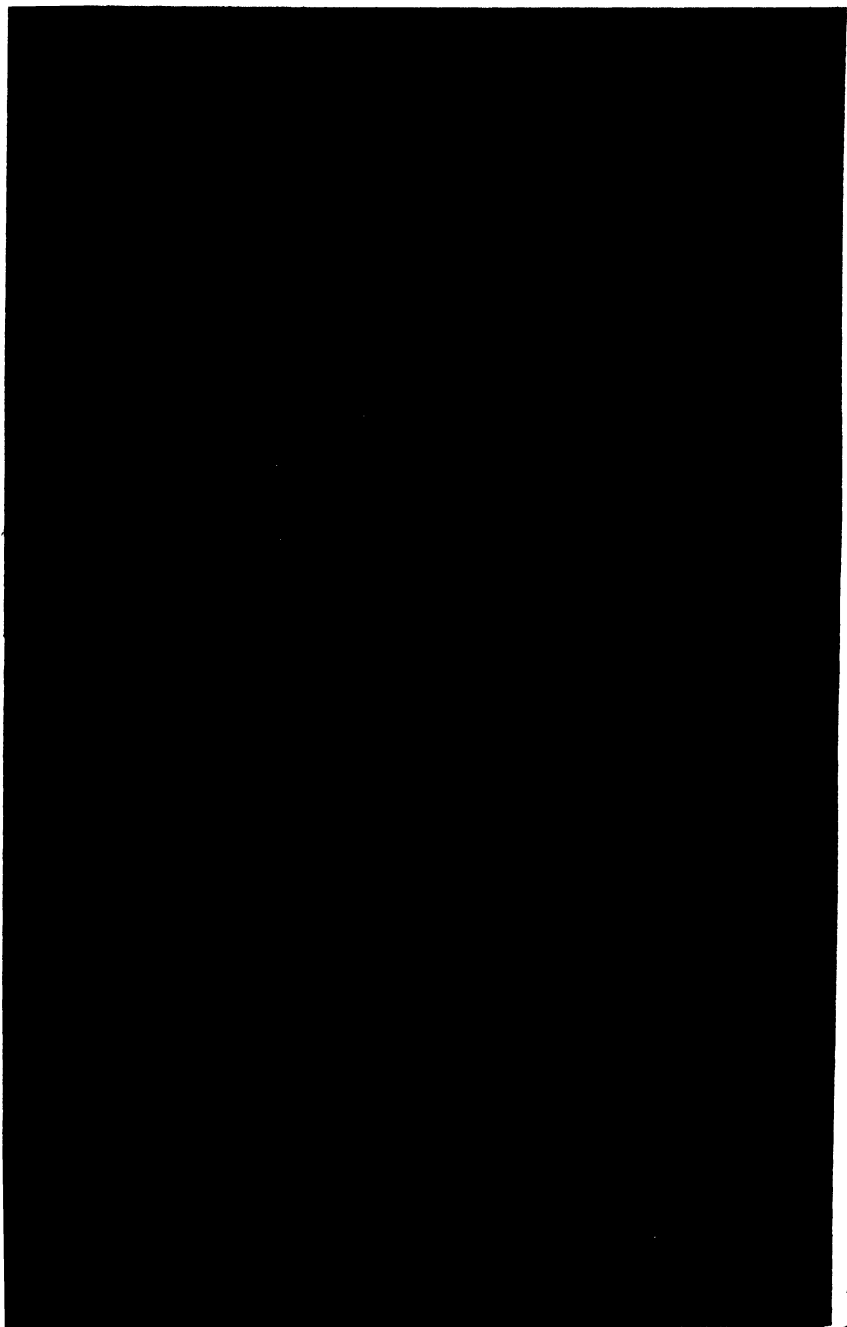
অগ্রহায়ণ—১৩৫৫

প্রথম খণ্ড | ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বৌদ্ধধর্ম্ম ও নারী

শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায়

বৈদিক বা প্রাক্‌ঐতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু নানা বিপর্য্যয় সত্ত্বেও ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে ফল্গুধারার ন্যায় একটি বৈশিষ্ট্যের ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সেই ফল্গুধারা বেদ উপনিষদের ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাধকের সাধনায় অমৃতরসে পুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যখনই সমাজে গ্লানি, অনাচার প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ধর্ম্মলোপ পাইয়াছে ও অধর্ম্ম শির উন্নত করিয়াছে, ফলে মনুষ্য সমাজের অন্তরাত্মা সত্য শিব সুন্দরের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমাজ এমনই ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে সাধারণ লোকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরাদিকেই ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিত। তাহার পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণ যে ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেবগণের আরাধনা করিতেন, সে ভাবের লোপ পাইয়াছিল। প্রাচীন ঋষিগণ বিশ্বব্যাপী দেবতার মহিমা ঘোষণা করিয়া যে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সাধারণ লোকের নিকট তাহা বোধগম্য হইত না। ফলে নানা শ্রেণীর পুরোহিত পরিচালিত বলি, হোম, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি প্রচলিত অনুষ্ঠান এমন অলস, প্রাণহীন ও নীরস হইয়া পড়িল যে সেগুলি কাহারও চিত্তে ধর্ম্মবোধের সঞ্চার করিত না। ফলে সমাজে ধর্ম্মদ্রোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ও চার্ব্বাক প্রমুখ ভোগবিলাসিগণের মতবাদের প্রচারের সুবিধা হইল। কিন্তু ভোগবিলাস লইয়া কোন সমাজ সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। পথভ্রষ্টের মত অসত্যের অন্ধকার যত গাঢ় হইবে, সত্যের আলোকের জন্য আকুলতা ততই বাড়িতে থাকিবে। সেই সুদূর অতীতকালে অনাবশ্যক কর্ম্মকাণ্ডের বোঝা হইতে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের অন্তরাত্মা যখন আকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল, সেই ক্রন্দন হিমালয়ের পাদদেশে শৈলশ্রেণী বেষ্টিত মনোরম রাজপ্রাসাদে রাজসুখে লালিত-পালিত কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, একটি ব্যাধিগ্রস্ত রোগী ও একটি মৃতদেহ দেখিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চোখের সম্মুখে সমস্ত

মানব জাতির ভয়াবহ পরিণাম ভাসিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্ত কঠিন সাধনা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে; মানব সমাজের জর্জ্জরিত দেহে তাঁহাকেই শান্তিসুধার প্রলেপ দিতে হইবে। সত্যের সন্ধান তাঁহাকেই করিতে হইবে ও সেই সত্যের আলোকে তাঁহাকেই সকলকে পথ দেখাইতে হইবে। তিনি যে ব্রহ্মচারীকে একদিন পথে দেখিতে পাইলেন, তিনি নিমিত্ত মাত্র হইলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাঁহার ভাবী জীবন চিত্র মানসপটে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ক্ষুদ্র অপরিসর রাজপ্রাসাদ আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সুন্দরী গুণশালিনী বধূ ও নবজাত পুত্র কেহই তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিল না। মানব জাতিকে মুক্তি পথের সন্ধান দিবার জন্ত তিনি ক্ষুদ্র রাজ-সংসারের গণ্ডী হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন।

সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিক্রমণ করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২৯ বৎসর। তারপর নানাস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে স্বচ্ছসলিলা নিরঞ্জনার তীরে উরু-বিল্ব বনে উপস্থিত হইয়া তিনি পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্য্যে ছয় বৎসর যাবৎ ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এত ক্লেশ, এত যাতনা স্বীকার করিয়াও সিদ্ধার্থ তাঁহার চিরবাঞ্ছিত বোধি লাভ করিতে পারিলেন না; তিনি পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে কৃচ্ছ্রসাধনা, শরীর-শোষণ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতির দ্বারা বাসনার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। এই প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে হতাশ হইয়া পূর্ব্ববৎ যুক্তপানাহার দ্বারা দেহকে বলিষ্ঠ করিয়া মনকে সত্যলোকের সন্ধানে নিযুক্ত করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। কঠোর তপশ্চরণ পরিত্যাগ করিবার জন্ত সেই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাঁহার পঞ্চশিষ্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিকলতার তীব্র জ্বালা একাকী সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর তিনি নিরঞ্জনাতীরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হন। ইহার অব্যবহিত পরেই সেনানীগ্রামের এক ধনবান বণিকের পুণ্যবতী দুহিতা সুজাতা বহু সাধনার ফলে একটি পুত্রধন লাভ করিয়া সুবর্ণপাত্রে পায়সান্ন সাজাইয়া বনদেবতার পূজা দিতে আসিলেন। তিনি তরুমূলে উপবিষ্ট কৃচ্ছ্রসাধনে ম্রিয়মান তপস্বীর ধ্যানমুখর মুখের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন এবং ভক্তি সহকারে সেই দেবতার হস্তে পায়সান্নের পাত্র প্রদান করিলেন। সিদ্ধার্থ হৃষ্টচিত্তে সুজাতার দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই ভাবে পরম সাধ্বী রমণী সুজাতাই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধার্থের আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হন। অতঃপর দুগ্ধপানে শরীরে বল পাইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে যোগাসীন হইলেন। এই সময় 'মার' স্বীয় পুত্র-কন্তা ও দলবল লইয়া নানা প্রকার প্রলোভন ও বিভীষিকা দ্বারা সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ সঙ্কল্প করিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

এই যোগাসনে বসিয়া বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই মানুষের সকল দুঃখের কারণ এবং অবিদ্যার অপগতেই দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। সকল বাসনা, সকল কামনা ও সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধার্থের চিত্ত সত্যের বিমল আলোকে পরিপূর্ণ হইল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী—এই নাম ধারণ করেন। সকল বাসনার ক্ষয় হইবামাত্র তাঁহার চিত্ত নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার সাধনলব্ধ অমৃতান্ন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রথমেই তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন পঞ্চভিক্ষুর কথা স্মরণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার মানসে বারাণসী যাত্রা করেন। প্রথমে শিষ্যগণ সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব তাঁহাদের সমীপে আগমন করিলেন, তখন সিদ্ধার্থের তেজঃপুঞ্জ রূপরাশি দর্শন করিয়া তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সদ্ধর্ম্মের অমৃতরসে নিজেদের হৃদয়ভাণ্ড পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইলেন।

কিছু দিনের মধ্যে বুদ্ধের শিষ্য সংখ্যা ষাট্ হইল এবং তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষের চিত্ত বহুকাল পরে একটি অমৃত উৎসের রস পাইয়া সজীব হইয়া উঠিল। হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মের বিরুদ্ধে মানবচিত্ত যখন বিদ্রোহ হইয়া উঠিল—তখন বুদ্ধ সেই উপনিষদের ঋষি কর্ত্তৃক প্রচারিত উচ্চতত্ত্ব ছাড়িয়া সহজ কথায় তাঁহার অন্তরের পরম সত্য প্রচারপূর্ব্বক জনসাধারণের মন জয় করিয়া লইলেন। তাঁহার ধর্ম্ম কতিপয় পণ্ডিতের ধর্ম্ম হইল না, সকল দেশের সকল মানবের ধর্ম্ম হইল। তাঁহার অপূর্ব্ব করুণা ও মৈত্রীমূলক ধর্ম্ম ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের নানাভাষাভাষীদিগকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার আলোক মানবের গন্তব্যপথ প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। তিনি নিজে প্রবুদ্ধ হইয়া যে মহাসত্য উপার্জ্জন করেন তাহা বেদেরও অনধিগম্য, বেদবাক্য হইতেও উচ্চতর। সেই সত্য বিশ্বজনীন জাতিভেদ বা বর্ণবিচারে সীমাবদ্ধ নহে। বুদ্ধশিষ্যের গৈরিক বসনে রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, নর ও নারী সকলেই একীভূত। একমাত্র উচ্চবর্ণের লোকে যে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী তাহা নহে—উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, আর্য্য-অনার্য্য, সুর, নর—সকলেরই চিত্তে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধের সাধনা ও শিক্ষা এইরূপে জনসমাজের উপর পতিত হইয়া রাজা প্রজা সকলকে কল্যাণবর্ত্মে পরিচালিত করিত।

ছয় বৎসর কঠোর সাধনার ফলে মহাপুরুষ যে সত্যলাভ করেন—উহার আকর্ষণে যাঁহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইলেন তাঁহাদিগকে লইয়া 'সঙ্ঘের' সৃষ্টি হয়। সঙ্ঘের প্রভাব সমগ্র দেশের উপর পতিত

হইল। বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রাচীন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জনসঙ্ঘ। বৌদ্ধযুগে ভারতে যে সভ্যতার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল—সাধনানিরত বৌদ্ধভিক্ষুগণের নিভৃতনিবাস হইতেই সেই ধারা উত্থিত হইয়াছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার সুফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

ভগবান বুদ্ধ নরনারী উভয়কেই তাঁহার সদ্ধর্ম্ম প্রচারের তুল্য অধিকার প্রদান করেন। বুদ্ধসঙ্ঘে প্রথমে রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না। বুদ্ধদেবের বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত শাক্যমহিলা সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বুদ্ধ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাঁহার আশঙ্কা এই—ভিক্ষুণীরা সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে তাঁহার ধর্ম্মের স্থায়ী পবিত্রতা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে। নীতির যাহাতে ব্যতিক্রম না হয়—সেজন্য বুদ্ধের তীব্র উৎকণ্ঠা ছিল। বুদ্ধদেব বৌদ্ধতপস্বিনীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন। মনুর যে বিধান—"শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অধীন, স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না"—ভিক্ষুণীর প্রতি বুদ্ধের অনুশাসন ইহারই অনুযায়ী। সন্ন্যাসিনী হইয়াও স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই। অতঃপর আটটি অনুশাসন পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া রমণীরা সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। এই অনুশাসনগুলি পালনে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল, এইভাবে বহু সাধ্যসাধনার ফলে বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিক্ষুদলে গ্রহণ করিয়া প্রজাপতির মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন এবং স্বীয় স্ত্রী মহাপ্রজাপতিকে তাঁহার প্রথম স্ত্রীশিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও রমণীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনিই মস্তকমুণ্ডন করিয়া পীতবসন পরিধান করেন। ভগবান বুদ্ধ জননী গৌতমীকে ভিক্ষুণী সঙ্ঘের শিরোমণি এবং পরিচালিকা নিযুক্ত করেন। অতঃপর নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা তিনি শীঘ্রই প্রাথমিক এবং বিশ্লেষাত্মক জ্ঞানের সহিত মহত্ত্ব লাভ করেন। যে পাঁচশত ভিক্ষুরমণী তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও যথাসময়ে মহত্ত্ব লাভে সমর্থ হন।

নারী সম্প্রদায়ের ভিতর শাক্যপরিবারের মহিলারাই সর্ব্বাগ্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব জানিতে পারেন। শাক্য নারীদের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া বহুবিবাহপ্রথা তাঁহাদের মধ্যে আইনবিরুদ্ধ ছিল—সেজন্য শাক্যরমণীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতক পরিমাণে অক্ষুন্ন ছিল। বুদ্ধের জ্ঞান, বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত সহস্র-সত্য, বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার তাঁহাদের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এই সকল কারণে তাঁহারা গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মার মুক্তি কামনায় ভিক্ষুণীর জীবন গ্রহণ করিয়া সুকঠোর সংযম ও সাধনার দ্বারা মহত্ত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তথাগতের সঙ্ঘের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। রাজা শুদ্ধোধনের মৃত্যুর পর বুদ্ধের পত্নী যশোধরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। যে সমস্ত ভিক্ষুণী অসাধারণ দৈবশক্তির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যশোধরাকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। বুদ্ধদেবের পুত্র রাহুলও নবধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

যে সকল রমণী বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহাদের পুরুষ ভ্রাতাদের সমকক্ষ ছিলেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধসাহিত্যে শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নারীজাতি কি অসাধারণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন—তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা 'থেরী' অর্থাৎ স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা বলিয়া সকলের গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। প্রাচীন ভারতের থেরী-সঙ্ঘ এক অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান ছিল। শত শত থেরী স্বাধীন চিন্তাশক্তি দ্বারা সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়া লোকের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছেন। ভিক্ষুণী বা থেরীরা ধর্ম্মনিষ্ঠা, মনস্বিতা ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করেন। পালিধর্ম্মগ্রন্থসমূহের মতে থেরীগাথার শ্লোকগুলি ঋষিকল্পা নারীদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। অনেকানেক স্থবিরা তপস্বিনী গৌতমের জীবদ্দশায় থেরীগাথা রচনা করেন। অনেকগুলি গাথা অতি সুন্দর ও লেখিকার সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। থেরী পূর্ণা গৌতমীর মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"পূর্ণে, পূর্ণ কর প্রাণ পূর্ণিমার চন্দ্রসম।
পূর্ণ প্রজ্ঞালোকে দূর কর তুমি অজ্ঞতার তম॥"

থেরীদের স্বরচিত শ্লোকগুলি ধর্ম্মানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করে।

বক্তৃতা করিতে পারিতেন এমন কয়েকটি রমণীর নাম বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায়। রাজা বিম্বিসারের মহিষী ক্ষেমা অতিশয় সুন্দরী, শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল এবং পাঁচশত ভিক্ষু তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। তিনি বিনয়গ্রন্থ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে নারী দেহের সৌন্দর্য্যের অসারতা বুঝাইয়া দিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেন। পরে ক্ষেমা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং গভীর জ্ঞানের জন্য যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন। ভদ্রা চেণ্ডুলকেশা পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তাঁহাদের জ্ঞানপদ্ধতি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। বুদ্ধদেবের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্র ব্যতীত অপর কেহ তর্কে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। ধর্ম্মাশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ত্রিবিধ বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন। বিনয় পিঠকে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অন্য লোককে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিতেন। মহাথেরী সঙ্ঘমিত্রার নিকট সিংহ রাজার পত্নী অনুলা তাঁহার পাঁচশত সহচরী পরিবৃতা হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন এবং প্রজ্ঞালাভে সমর্থ হন। রাজা শ্রীহর্ষের ধর্ম্মসভায় তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রী অপরোক্ষভাবে যোগদান করিতেন। যে সমস্ত ভিক্ষুণী বিনয় পিঠক আয়ত্ত করেন, পটাচারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারিণী। তিনি অতি প্রতিভাশালিনী নারী ছিলেন। পটাচারা থেরী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম

প্রচারে আপনার অনন্যসুলভ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচশত শিষ্যা ছিলেন, তাঁহারা নানা পরিবার ও নানাস্থান হইতে আগমন করেন। বহু শোক-বিহ্বল রমণীকে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে তাঁহার স্বামী, দুই শিশু পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা সকলকেই হারাইয়াছিলেন। পরিশেষে এই শোকোন্মত্তা নারী বুদ্ধের সদ্ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া নবজীবন লাভ করেন।

বুদ্ধের ধর্ম্ম সমাজের সকল স্তরের নরনারীর উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ধর্ম্মের মর্ম্মস্পর্শী বাণী শ্রবণ করিয়া অনেক পতিতা নারী জ্ঞানবৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মের পুণ্যপ্রবাহ অনেক নর্ত্তকী ও বারবনিতার অন্তরের পাপরাশি ধৌত করিয়া শুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দেয়। বৈশালীর সুপ্রসিদ্ধ বারবনিতা অম্বপালীর গৃহে ভগবান্ বুদ্ধ আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি মহাপুরুষের মধুরবাণী শ্রবণ করিয়া নূতন জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড পুরী তিনি শ্রবণদের বাসের জন্য দান করেন। অড্‌ঢকাশী নামে বারাণসীতে আর একজন সুবিখ্যাত বারবনিতা ছিল। সে তাহার শেষ বয়সে ভিক্ষুণীজীবন গ্রহণ করে। এইরূপে একাগ্রচিত্তে বুদ্ধবাণী শ্রবণ করিয়া বহু সুন্দরী স্ত্রীলোকের নশ্বর সৌন্দর্য্যের অহমিকা নষ্ট হয় এবং ক্রমে তাঁহারা অর্হৎ হন। জনসাধারণও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। যৌবনের প্রারম্ভে পতিতা নারীরূপে তাঁহাদের যে জীবন আরম্ভ হয়, জীবনের শেষে তাহাই ঋষির ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠে।

ক্রীতদাসীরা বুদ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের মহিষী শ্যামাবতীর খুজ্জুত্তরা নামে ক্রীতদাসী রাণীর প্রদত্ত অর্থ কাহাপনের মধ্যে প্রত্যহ চারি কাহাপনের ফুল ক্রয় করিয়া অবশিষ্ট চারিটী কাহাপন চুরি করিত, একদিবস সে বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম শ্রবণ করে এবং পবিত্রতার প্রথম সোপানের ফল লাভ করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করে। অতঃপর দাসীর নিকট হইতে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া রাণী শ্যামাবতী সোতাপত্তি ফল লাভ করেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে সকল সাধ্বী কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে, বিশাখা তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। বুদ্ধদেবের দানশীলা নারী ভক্তদের মধ্যে মিগারের মাতা বিশাখাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিতা ছিলেন, ততদিন পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঔষধপথ্য প্রদান, অনুচরবর্গকে অন্নদান, ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষান্ন বিতরণ এবং ভিক্ষুণীদিগকে বস্ত্রদান করেন। ভিক্ষুদের প্রতি বিশাখার অনুগ্রহের অন্ত ছিল না। বৌদ্ধসঙ্ঘ বিশাখার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী ছিল।

সুপ্রিয়া নামে বারাণসীর এক গৃহস্থের পত্নী সর্ব্বথা বিহারে গমন করিয়া ভিক্ষুদের স্বাস্থ্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। একদা একজন ভিক্ষু জোলাপ গ্রহণ করিয়া সুপ্রিয়াকে তাঁহার আহারোপযোগী কোনও মাংস রন্ধন করিয়া দিতে বলেন। তিনি রন্ধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হন বটে—কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইয়াছে এরূপ কোন প্রাণী খুঁজিয়া পাইলেন না। অতঃপর নিজের উরুদেশ হইতে মাংস কাটিয়া তাহাই রন্ধন করিয়া তিনি ভিক্ষুকে আহার করিতে দিলেন। তাঁহার এই আদর্শ ত্যাগের জন্য ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং বুদ্ধদেবের দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহার ক্ষতও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল।

আর একসময় এক রাণী তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তান হারাইয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম কিসাগোতমী, সেই মৃতদেহটি লইয়া তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলেন—"তুমি যদি এরূপ গৃহ হইতে একটি সর্ষপ আনিতে পার যে গৃহে কেহ কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই—তবে আমি তোমার পুত্রকে প্রাণদান করিব।" কিসাগোতমী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর বুদ্ধ তাঁহাকে জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। কিসাগোতমী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া বুদ্ধের চরণে প্রণতা হইলেন।

এইরূপে অনেক দুঃখিতা মাতা, সন্তানহীনা বিধবা এবং অনুতপ্তা বারবনিতা গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মের আকর্ষণী শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখ, তিরস্কার ও অনুশোচনার হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই সকল কোমলদেহা নারী বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিয়মিতরূপ শীলানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র জীবনযাপন করেন। ধনীর স্ত্রী অলস জীবনের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন এবং দরিদ্রের পত্নীরাও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথের অনুসরণ করিতে বাধ্য হন। এইভাবে স্ত্রীলোকেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক নিত্য বিদ্যা, বুদ্ধি ও পুণ্যবলে শ্রমণাপদে আরূঢ় হইতে পারিতেন, এমন কি অর্হৎ হইবারও অধিকারিণী ছিলেন। শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি মার' এই সকল বৌদ্ধ-তপস্বিনীদের প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহারা প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং দুশ্চরিত্র লোকের দ্বারা ইঁহাদের মনে কামলিপ্সা উদ্রেক করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাও অনেক সময় ব্যর্থ হইয়াছে। থেরী শুভাজীবক নামক এক ব্যক্তি আম্রকাননে বেড়াইবার সময় এক ধূর্ত্তের হস্তে পড়িয়াছিলেন। সেই অসচ্চরিত্র লোক তাঁহার সতীত্ব নাশ করিতে চেষ্টা করে। তারপর শুভা তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া ধূর্ত্তের হস্তে প্রদান করেন। ইহা দেখিয়া সেই লোকটি আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এইরূপে ধূর্ত্তের মনের পাপলালসা দূর হয়। শুভা ধূর্ত্তের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া ভগবান্ বুদ্ধের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেও তাঁহার কৃপায় দিব্য-চক্ষু লাভ করেন। অতঃপর তিনি ভগবান্ তথাগতের কৃপাপ্রার্থী হইয়া উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের সময়ে স্ত্রীলোক এইভাবে সাংসারিক জীবনের সুখলালসা পরিহারপূর্ব্বক যতীন্দ্রিয় রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন—বিশেষ করিয়া 'মার' যখন নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-লালসার দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ ও বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিত, তখন তাঁহারাই মুখে মুখে পাণ্ডিত্যভাবময় শ্লোকসকল রচনা করিয়া গান করিতেন।

থেরীগাথা এবং তাহার ভাষ্য হইতে জানা যায়, কি ভাবে স্ত্রীলোকেরা পুনর্জন্মের ভয়ে পিতামাতা, স্বামী এবং প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণীলীলা যাপন করিতেন, অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে নানাপ্রকার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিক দুঃখ-মুক্তির কামনায় রমণীরা সন্তান, পিতামাতা, স্বামী অথবা প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যের পথে অবহেলা করিয়াও সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বহু স্ত্রীলোক সদ্ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক জন্মান্তরে সুখের আশায় বা মৃত ফকীরের কল্যাণকামনায় ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী-দিগকে প্রচুর অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য দান করেন। রমণীসুলভ ধর্ম্মগুলি বিশেষভাবে থেরীদের জীবনের ভিতর দিয়াই উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপে সকল স্ত্রীজাতির উপর কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা, বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারত ইতিহাসের সেই গৌরবময় যুগে গঙ্গাপ্রবাহিত প্রদেশে শত শত থেরী বুদ্ধের অমৃতমধুর ধর্ম্মকথা প্রচার করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিয়াছিলেন। সেই সকল বৌদ্ধতাপসীগণ শীলবতী, বহুশাস্ত্রে পটু, বক্তৃী ও সুগত ধর্ম্মে রতা বলিয়া জনসমাজে বহু মানের পাত্রী ছিলেন। ইঁহারা জ্ঞানগৌরবে ও ধর্ম্মগৌরবে গরীয়সী ছিলেন। তথা অবিবাহিতা বালিকাকে বিদ্যাপীঠে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিনা—সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবারের মধ্যে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ললিতকলায় নারীরা পারদর্শিনী ছিলেন। নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন—তখন তাঁহাদের মধ্যে অবরোধ বা অবগুণ্ঠন ছিল না। ভগবান্ বুদ্ধের চরিত্রের উদারতা এমন বিশ্বব্যাপিনী ছিল যে—তাঁহাকে সকলেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। তিনি নারীজাতিকে ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়া নারীত্বকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

উদ্ভবকাল হইতে প্রায় পনর শত বৎসর ধরিয়া এই সদ্ধর্ম্ম ভারতবাসীর চিত্তে আলোক দান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম কেন তাহার স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষাপূর্ব্বক বিশিষ্ট ধর্ম্মরূপে হিন্দুধর্ম্মের পার্শ্বে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিল না—ইহা ভারত ইতিহাসের এক অমীমাংসিত সমস্যা। বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার কারণ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত পোষণ করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রভাব, মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুত্থান, বৌদ্ধধর্ম্মে ভজন পূজনের অভাব, তান্ত্রিক-কাণ্ডের প্রভাববশতঃ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা, ভিক্ষুদের সহিত ভিক্ষুণীদের এবং ভিক্ষুণীদের সহিত সাধারণ লোকের মেলামেশায় বহুবিধ অশান্তির সৃষ্টি—এইগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি বা অবনতির অনেকগুলি কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এই সদ্ধর্ম্ম এদেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই—ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে স্বীয় সত্তা নিমজ্জিত করিয়া দিয়া ইহাতে নূতনত্ব দান করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণপূর্ব্বক অহিংসা ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করেন। 'প্রাণীহিংসা করিব না'—ইহা একটি বৌদ্ধশীল। সেজন্য কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

> "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
> সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
> কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।—"

বৌদ্ধেরাই সংযম, সাহস, স্বার্থত্যাগ, নিষ্ঠা ও অনন্ত ধর্ম্মানুরাগের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সদ্ধর্ম্মের মহিমা হিন্দুসমাজ হইতে কখনই লুপ্ত হইবার নহে—সেই ধর্ম্ম ভারতে চির-রঞ্জিত থাকিবে। এখনও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও সেই মহাপুরুষের শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সৌরভ ও পবিত্রধর্ম্মের বাণী অসংখ্য নর-নারীর চিত্ত হরণ করিতেছে।

তুমি নারী ঃ কত কথা আজ মনে পড়ে!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অশ্রু সরোবরে মম ফুটেছিলে অনুরাগে বেদনায় শুচি-স্মিতা শতদল সম
মৌনমুগ্ধ অভিসারে পরাণ-হিল্লোলে। সুনীল অম্বরতলে লাবণ্যের সর্ব্বোত্তম
দেখেছিনু রশ্মি তব অশ্রুতে হাসিতে ; উষার নির্ঝর কোলে মায়ামৃগ
ছিল সুখী,
তুমি যে রজনীগন্ধা দুঃখের দুর্য্যোগে মম, আশার উদয়প্রান্তে তুমি সূর্য্যমুখী।
নীরব সম্ভ্রমে তুমি দিগন্তের পরপারে সত্যের অমৃতরূপ লুকানো যেথায়,
সন্ধ্যার তিমির দ্বারে দাঁড়াইয়া নতশিরে তোমায় প্রণাম দিতে ধ্যান মমতায়।
তব মনোহরণের মাধবীকুঞ্জের গীতি রাত্রির প্রতিমা পাশে হইত যে পাওয়া,
তাহারি সম্মুখে ছিল কৃষাণ কুটিরগুলি কৃষাণীর সরমের আবরণে ছাওয়া।
তুমি তো চলিয়া গেলে হৃদয় অতীত করি স্বপ্নে মম দোলে তব সচকিত-ছায়া,
সংসার-সমাজে আমি তৃষিত মরুসম : আমারে ঘিরিয়া আছে মরীচিকামায়া।

তুমি কি দিবে না দেখা ! নিবাত দীপের মত সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
বসে আছি একা,
সকরুণ সুরে পাখীদের ডাক শুনি, তোমার কুটিরে নামে
প্রভাতের রেখা।
তোমার প্রেমের হবে জন্মান্তর জানি, নব নব পুষ্পদলে
সৃষ্টির সুরেটী ঘিরে—
নব নব পেলব-পল্লবে হে কল্যাণী ! আমি হেথা রহিলাম
নিরাশার নদী তীরে।
বিরহে মিলনে ত্যাগে জীবনের উপলব্ধিমত হৃদয়ের সমাধির বক্ষে সবি রাখি
শুভ্র কুসুমের সম। উৎসব ফুরায়ে গেছে, পড়ে আছে শুষ্কমালা,
কাঁদে প্রাণপাখী।

বনফুল

২৩

"এই সেই জায়গা"—স্বয়ম্প্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন এবং ড্রাইভারের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে নিজের বেঁটে ছাতার বাঁট দিয়ে মোটরের জানলার কাচে আঘাত করতে লাগলেন।

"থামাও, থামাও গাড়ি, এই ড্রাইভার, শুনতে পাচ্ছ না না কি। থামতে বল ওকে, ঘুমুচ্ছ না কি তুমি—"

জিতুবাবু ঢুলছিলেন। চমকে উঠে অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "কতদূর এলাম আমরা, ঢুল ধরেছিল একটু।"

"ফৎমোরংপুর। নাব"—বেশ ঝেঁপে জবাব দিলেন স্বয়ম্প্রভা।

জিতুবাবু অবিশ্বাসভরে ড্রাইভারের দিকে চাইলেন।

"আমরা এসে গেলাম নাকি "

ড্রাইভারও ঠিক করতে পারছিল না কিছু। হোটেলের মতো কি একটা সে এই মাত্র অতিক্রম করে' এল। পিছন দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে সেই দিকেই চাইতে লাগল সে।

জিতুবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, "আমরা এসে গেলাম নাকি।"

"তাই তো মনে হচ্ছে"

"বেশ দূর আছে তো। সেই কখন চড়েছি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দূর আছে বই কি। যতটা আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়েও দূর"

"বাংলা দেশ পার হয়ে এলাম না কি"

"আজ্ঞে প্রায় তাই বটে। রাস্তাও দারুণ খারাপ"

"কি কাণ্ড"—অস্ফুট কণ্ঠে বললেন জিতুবাবু।

"তুমি নাববে কিনা"—ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা এবং অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাইলেন ভর্তার দিকে।

"নাবব, কিন্তু একটু সবুর কর। ড্রাইভার গাড়ি ব্যাক করবে এখুনি। ওহে, গাড়িটা ব্যাক করে' ওই হোটেলটার সামনে নিয়ে চল। নাবছি, একটু সবুর কর না। গাড়ি ব্যাক করার সময় নাবতে গিয়ে একজনের পা ভেঙে গিয়েছিল আমি জানি।"

"তা তো জানবেই। যত সব উজবুক গাড়োলের খবরই তো রাখ তুমি"

স্বয়ম্প্রভার চোখের দৃষ্টি থেকে আর এক ঝলক আগুন নির্গত হল।

"দেখো দেখো"—জিতুবাবু ড্রাইভারকে বললেন—"আর একখানা মোটর রয়েছে। ধাক্কা মেরো না যেন"

ড্রাইভার নানা রকম কৌশল করে' অবশেষে গাড়িটা ব্রজেশ্বরবাবুর মোটরের পিছনে এনে লাগালে। স্বয়ম্প্রভা অবতরণ করলেন এবং নাক কুঁচকে এমনভাবে নিশ্বাস টানতে লাগলেন যেন তাঁকে আস্তাকুড়ের মাঝখানে নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনীতাও নাবল। জিতুবাবু ড্রাইভারকে কি যেন বলছিলেন। বলতে বলতে ভীতভাবে একবার স্ত্রীর দিকে চাইলেন। ব্যাপারটা বুঝতে স্বয়ম্প্রভার দেরী হ'ল না।

"কি ? থাকতে চাইছে না ও ? আচ্ছা, আমি ওর সঙ্গে কথা কইছি। গাড়ি থেকে ব্যাগটা নাবিয়ে নাও, আর তুমি দয়া করে' সরে' থাক একটু।"

দৃঢ় পদবিক্ষেপে স্বয়ম্প্রভা এগিয়ে গেলেন মোটরের দিকে এবং সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন ড্রাইভারকে।

জিতুবাবু সরে' এসে ঘাড় উঁচু করে' হোটেলের সাইনবোর্ডটা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অনীতা হোটেলের কপাটটা খোলা দেখে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভিতরে বাঁহাতি একটা ঘর, তার কপাটটাও খোলা। ঘরে ঢুকেই কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল সে, পিছন থেকে কে যেন জড়িয়ে ধরল তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে, দেখে সুশোভন।

"তুমি ! ওঃ—" সুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

"বস, বস, লক্ষীটি—এই চেয়ারটায় বস। ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নিশ্চয়ই, যা রাস্তা। একটু জিরিয়ে নাও আগে, তারপর সব বলছি। চা আনাব ?"

"না,তুমি বস। কোথাও যেও না তুমি"

"ও, আচ্ছা—"

পিছনের দিকের কপাটটি সন্তর্পণে ঠেলে দীর্ঘাকৃতি ব্রজেশ্বরবাবু ঢুকলেন। ঢুকেই বেরিয়ে গেলেন।

"উনি কে"—চোখ বড় বড় করে' জিগ্যেস করলে অনীতা।

"ব্রজেশ্বরবাবু। আমাদের বন্ধু একজন। উনিও প্যাঁচে পড়েছেন। ওঁর স্ত্রীই তো ষ্টেশনে কলার খোলায় পা পিছলে পড়ে যান এবং তাঁকে তুলতে গিয়েই তো ট্রেণটা ছেড়ে গেল। ছি, ছি, কি কাণ্ড"—একটু থেমে—"রাগ করেছ তো খুব ?—"

অনীতার রাগ আর ছিল না। মুখে বরং হাসি ফুটেছিল। যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সুশোভনকে জড়িয়ে কত কথাই না সে ভাবছিল তার সঙ্গে সুশোভনের বন্ধুত্বও যখন অক্ষুণ্ণ আছে তখন ভাববার কিছু নেই।

পিছনের দরজায় দু' তিনটি টোকা শোনা গেল। সুশোভন উঠে গেল এবং দরজা খুলে বললে, "আসুন না আপনি ভিতরে, অনীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই"

"না, আমি জিগোস করতে এসেছি, চা আনাব কি?"

"সে সব পরে হবে এখন। ভিতরে আসুন"

ব্রজেশ্বরবাবু ভিতরে এলেন। অনীতা দাঁড়িয়ে উঠল। নমস্কার বিনিময় হল। কি বলবেন ভেবে না পেয়ে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু। বাম ভ্রূটা ঈষৎ লাফিয়ে উঠল একবার।

"ও! তুমি এখনও এখানে আছ"

স্বয়ম্প্রভা দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বরবপু দিয়ে সমগ্র দ্বার পথটা প্রায় অবরুদ্ধ করে' পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছিলেন। মনে হচ্ছিল হাতে একটা বাইনাকুলার থাকলে আরও যেন মানাতো। তাঁর গাম্ভীর্য কিন্তু অটুট রইল না, মনে হল পিছন থেকে কেউ ঠেলছে তাঁকে।

সুশোভন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

"হ্যাঁ। আপনারা আসছেন খবর পেয়ে ফিরে এলাম আবার এখানে। আপনারা এসে পড়েছেন খুব ভাল হয়েছে, এমন আনন্দ হচ্ছে আমার। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবু—আমার একজন বন্ধু—"

স্বয়ম্প্রভা দু'পা এগিয়ে এলেন এবং গম্ভীরভাবে দায়-সারা গোছ নমস্কার করলেন একটা।

"বাবা কোথায় গেলেন, তাঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দি এঁর"

"ভিতরে এস না তুমি, বাইরে কি করছ"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঢুকতেই পারছি না যে। সর একটু"

স্বয়ম্প্রভা পথ করে' দিতে জিতুবাবু ভিতরে প্রবেশ করলেন।

"কপাট বন্ধ করে' দাও"

"দিচ্ছি দিচ্ছি"

স্বয়ম্প্রভা ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে বললেন—"ইনি আমার স্বামী"

ব্রজেশ্বরবাবু নমস্কার করলেন।

সুশোভন অনীতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"গোড়াতেই একটা কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার"—সুশোভন বললে—"যে মহিলাটির সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে আমার দেখা হয়েছিল এবং যাঁর জন্যে শেষ পর্যন্ত আমাকে ট্রেণ ফেল করতে হল তিনি এই ভদ্রলোকটির স্ত্রী"

এই সংবাদে স্বয়ম্প্রভা একটু মুষড়ে পড়লেন যেন। কি ভাষায় সুশোভনকে তিনি আক্রমণ করবেন তা এতক্ষণ মনে মনে ভাঁজছিলেন। অনেকগুলি তীরই সুশাণিত করে' রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু এই কথা শুনে সব যেন গুলিয়ে গেল তাঁর।

"সুশোভনবাবুর স্ত্রী যে কত অসুবিধায় পড়েছিলেন তা আমি শুনেছি। এ জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত"—এই কথাগুলি উচ্চারিত হল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখ থেকে। আড়চোখে একবার অনীতার দিকে চেয়ে একটু থেমে এবং ঈষৎ হেসে আবার বললেন তিনি—"আমার দিক দিয়ে অবশ্য খুবই সুবিধা হয়ে গিয়েছিল, উনি সাস্ত্বনাকে মোটর করে' নিয়ে এসেছিলেন। সুশোভনবাবু ট্রেণ ফেল করে' একটা ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন—সময় মতো যাতে গিয়ে পড়তে পারেন, মিসেস নন্দী যাতে অপরিচিত স্থানে গিয়ে অসুবিধায় না পড়েন। আমি পরে আর একটা মোটরে এঁদের অনুসরণ করি"

সুশোভন সবিস্ময়ে চেয়েছিল। এই মার্জ্জিত মিথ্যাকটি শুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যাপারটাকে বেশ গুছিয়ে এনেছেন তো। অনীতার চোখ মুখ দিয়েও আনন্দের আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। জিতুবাবুও অস্ফুট ভাঙা-ভাঙা জোড়া-তালি লাগানো বাক্যাবলীর দ্বারা নিজের সন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। স্বয়ম্প্রভা বাম হস্ত উত্তোলন করে' নীরব করে' দিলেন তাঁকে এবং ফোঁস করে' নিশ্বাস টেনে নিলেন সজোরে।

"ও। কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে এলেন না কেন। তিনি তো অপেক্ষা করতে পারতেন একটু"

নিশ্চয় পারতেন। অপেক্ষা করতে চাইছিলেনও, কিন্তু আমারই আসার ঠিক ছিল না যে। এসেম্ব্লীর ব্যাপারে আমাদের কংগ্রেসের পার্টি মিটিং হবার কথা ছিল একটা, যদিও শেষ পর্যন্ত হল না সেটা"

"আপনিই কি বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে!"—জিতুবাবু সসম্ভ্রমে বলে' উঠলেন।

"হ্যাঁ, উনিই"—মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন সুশোভন।

ব্রজেশ্বরবাবু বিনীত ভাবে নমস্কার করে' বললেন—"আমি বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমি কংগ্রেসের একজন কর্ম্মী বটে, অধ্যাপনাও করে থাকি"

জিতুবাবু হঠাৎ কামিজের গলার বোতামটা লাগিয়ে নিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে দেখতে লাগলেন লোকটিকে।

স্বয়ম্প্রভার চিবুক ও স্কন্ধযুগল অস্থির হয়ে উঠেছিল। "ও, আপনি বুঝি শুনলেন তারপর—যে আমার জামাইয়ের সঙ্গে আপনার স্ত্রী চলে এসেছেন"

ঘাড়টি ঈষৎ কাৎ করে' সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এ খবরও পেলাম পরে যে, পথে ওঁদের মোটরে কি একটা 'অ্যাক্সিডেণ্ট' হয়েছে এবং ওঁরা এই হোটেলটায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। শুনে আমিও চলে এলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে"

"ভাগ্যে এসেছেন"—মৃদুকণ্ঠে বলতে হল স্বয়ম্প্রভাকে—যদিও সুশোভনের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি।

সুশোভনের মনে হল তাঁর নাকের ডগাটা কাঁপছে। ঠাণ্ডায় না রাগে গবেষণা করতে লাগল সে মনে মনে।

"কি যে সব কাণ্ড"—জিতুবাবু বললেন—"তখনই বলেছিলাম আমি। হোটেলওলা কোথা ?"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। হোটেলে কেউ নেই"—সুশোভন বললে।

"কে একজন যে উঁকিঝুঁকি মারছিল"

"ও গোকুল। পাশে ওর তাড়ির দোকান আছে। ওকে বসিয়ে রেখে হোটেলের চাকরটা শুদ্ধ বেরিয়ে গেছে"

"কেন, কি করবে তুমি ওকে নিয়ে"—স্বয়ম্প্রভা চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করলেন জিতুবাবুকে।

"না, কিছু নয়। ওকে বলব ভাবছিলাম যে আমাদের কিছু চাই না"

"কি দরকার তা বলবার"

ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে তারপর স্বয়ম্প্রভা বললেন, "দেখুন মেয়েকে নিয়ে আমরা এমনভাবে এসে পড়লাম এখানে"—একটু ইতস্তত করে' থেমে গেলেন তিনি, ঠিক কথাগুলো মুখে জোগাল না। উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

"আমাদের সঙ্গে আছেন ?"—ব্রজেশ্বরবাবু ধীরকণ্ঠে বাক্যটা সম্পূর্ণ করবার প্রয়াস পেলেন। স্বয়ম্প্রভা তথাপি নিরুত্তর হয়েই রইলেন। তিনি ঠিক কেন যে তাঁর মেয়েকে নিয়ে এতদূর ধাওয়া করেছেন তা এই শান্ত গম্ভীর লোকটির কাছে প্রকাশ করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়ছিল।

সুশোভন নীরবতা ভঙ্গ করলে। সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারছিল না।

"এদের সঙ্গে থাকাটা কি গর্হিত বলে' বিবেচনা করছেন আপনি ?"

স্বয়ম্প্রভার ইতস্তত ভাবটা গেল।

"না, বাবা তা মনে করছি না। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম যে তুমি নাকি অনীতাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ট্যাক্সি করে' চলে এসেছ এবং এখানে নাকি রাত কাটিয়েছ। কিছু মনে কোরো না বাবা, কিন্তু তোমার বিষয়ে যে সব কানাঘুসো শুনি তাতে এই খবর শুনে আমাদের—"

"ও"—সুশোভন এর বেশী আর বলতে পারলে না কিছু।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"যাক এখন আপনাদের ভুল ধারণাটা ভেঙে গেছে আশা করি। আমি এখন দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে যেতে চাই। সুশোভনবাবু যদি সস্ত্রীক সেখানে যেতে চান আমার মোটরে আসতে পারেন ?"

এই শুনে অনীতা বললে, "কিন্তু আমি কাপড় চোপড় যে কিছু আনি নি। এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া চলে কি"

"তাতে কি হয়েছে"—সুশোভন বললে—"ফোনে বলে' দিলে কাপড়-চোপড় কালই চলে আসবে। এক রাত্রে এমন আর কি এসে যাবে। কাপড়-চোপড় আনবার জন্যে এখন কোলকাতা ফিরে যাওয়া যায় না তো"

অনীতা সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে একবার ভুরু কুঁচকে। মায়ের সঙ্গে আবার কোলকাতা ফিরে যেতে তারও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে এক কাপড়ে যাওয়া যায় কি ?

"ওপরে ক'খানা শোবার ঘর আছে"—হঠাৎ জিগ্যেস করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দু'খানা"—সুশোভন জবাব দিলে।

"নীচে থেকে দেখে তো মনে হয় না। খুব ছোট ঘর বুঝি"

"খুবই ছোট। শোবার খুব কষ্ট হয়েছে আমাদের"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন।

"হুঁ"

ওষ্ঠ দিয়ে অধরকে পুনরায় নিষ্পিষ্ট করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমাকে এবার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আপনারা যাচ্ছেন না তাহলে"—একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ব্রজেশ্বর।

"না আমাদের যাওয়া হবে না। অনেক ধন্যবাদ"—মৃদু হেসে জবাব দিলে অনীতা।

"আচ্ছা আমি তাহলে ওপর থেকে ঘুরে আসি"

ব্রজেশ্বরবাবু কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

"কোথা গেলেন উনি ? দোতলায় উঠলেন মনে হচ্ছে" সুশোভনকে প্রশ্ন করলে অনীতা।

"দোতলার ভদ্রমহিলাটি কোথাও যেতে পারবেন না এখন। কাল রাত্রে তাঁর একেবারে ঘুম হয় নি, সমস্ত রাত বসে' কেটেছে। তিনি এখনই আবার মোটরে যেতে চাচ্ছেন না। তিনি ব্রজেশ্বরবাবুকে বলছেন—মোটরে করে' দিগ্বিজয়বাবুর কাছে গিয়ে একবার ঘুরে আসতে। একেবারে না গেলে বড় খারাপ দেখাবে। তাঁরা কোনও খবর তো পাননি, ভাবছেন হয়তো। উনি আজ ফিরিয়ে কাল ওখানে যাবেন ঠিক করেছেন"

"সে মাগী এখনও আছে নাকি এখানে ?"—প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আছেন"

"আর তার স্বামী তাকে এখানে ফেলে যাচ্ছে ?"

"উনিই তো ব্রজেশ্বরবাবুকে জোর করে' পাঠাচ্ছেন"—সুশোভন উত্তর দিলে নিরীহভাবে।

"তেমন কিছু অসুখ হয় নি তাহলে"—অনীতা বললে।

"অসুখ তো হয় নি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

"বিছানায় শুয়ে আছে ?"

"হ্যাঁ"

সুশোভনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একটা।

অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করলে—"আচ্ছা, দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে কে কে আছে"

"বিশেষ কেউ না। আমরা আর ব্রজেশ্বরবাবুরা। কেন ?"

"ভাবছি, চল না হয় চলেই যাই তোমার সঙ্গে। ছোট একটা স্যুটকেসে আছে খানকয়েক শাড়ি, তাতেই না হয় চালিয়ে নেব কোনরকমে"

হঠাৎ মত বদলে ফেললে অনীতা। রাগ দুঃখ কিছু ছিল না তার আর। সুশোভন যে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না, এর প্রমাণ সে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে কথা বলার সময় তার মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়বার মানেটা কি ! না, চোখে চোখে রাখাই উচিত। ও ডাকিনীর কাছ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরে সরে' যাওয়া যায় ততই ভালো। এখানে আর একদণ্ড থাকা নয়।

জিতুবাবুরা যে গাড়িতে এসেছিলেন সুশোভন বেরিয়ে গিয়ে সেই গাড়ির ড্রাইভারকে গোপনে বলে এল সে যেন তাড়া দিয়ে স্বয়ম্প্রভাকে নিয়ে চলে যায় এক্ষুণি। ক্রমাগত তাড়া দেয় যেন। ড্রাইভারের নিজেরই ফেরবার তাড়া ছিল, সুশোভনের কাছ থেকে কিছু বখশিস পেয়ে সানন্দে রাজি হয়ে গেল সে।

২৪

স্বামী সমভিব্যাহারে স্বয়ম্প্রভা দেবী বাইরের ঘরটাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোটরের 'গিয়ার' বদলানো হ'ল, হর্ণও শোনা গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। খানিকটা ধোঁয়া এবং ধুলো ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। সুশোভন আর অনীতাকে নিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু মোটরে চলে গেলেন। চেয়ারটায় এসে বসলেন স্বয়ম্প্রভা। গুম হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। পরাজয়ের গ্লানিতে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। গ্লানিটা আরও তিক্ত হয়ে উঠল জিতুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। তাঁর বিরক্ত চোখ মুখ যেন নীরব ভাষায় বলছে—তখনই বলেছিলাম !

"হাসছ ?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"না তো"

"হাতের নখগুলোকে কামড়াচ্ছ কেন। কি যে মুদ্রাদোষ তোমার"

"দেখ সম্পু, আর মাথা খারাপ করে' লাভ নেই। বরং যা হয়েছে তাতে আমাদের আনন্দিতই হওয়া উচিত"

"কে মাথা খারাপ করছে"

"সুশোভন ছেলেটি যে ভালো এ আমি বরাবরই জানি, কিন্তু তোমার ধারণা ঠিক উলটো। তোমার ধারণা যে ভুল তাতো প্রমাণ করেছি, এইবার বাড়ি চল"

"তুমি প্রমাণ করেছ ? আমি না জোর করলে কি তুমি বাড়ি থেকে নড়তে ?"

"বাজে ব্যাপারে অনেকখানি সময় নষ্ট হয়েছে এবার বাড়ি চল"

"আমি একটু চা খাব"

"তাহলে তো ওই গোকুল না কে—তারই শরণাপন্ন হতে হয়। তাড়ির দোকানে চা-ও বিক্রি করে হয়তো। দেখি—"

"এই ছুতোয় তুমি গিয়ে আবার যেন তাড়ি খেও না"

"আমার একটা কিছু খাওয়ার দরকার কিন্তু। শরীর আর বইছে না। এখানে 'বিয়ার' পাওয়া যাবে কি ? তাড়ি জিনিসটাও অবশ্য খারাপ নয়—"

"তুমি কি আপিসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'বিয়ার' খাও না কি !"

"জিনিসটা খারাপ নয়। প্রস্রাব সরল রাখে"

"লজ্জা করে না তোমার !"

"লজ্জার কি আছে এ'তে"—মরীয়া হ'য়ে উঠেছিলেন জিতুবাবু—"দেখি, চা পাওয়া যায় কি না—"

প্রজ্জলিত-দৃষ্টি জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন।

স্বয়ম্প্রভা চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলেন, মনে হল যেন প্রার্থনা করছেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চোখ খুলতে হল। রাস্তায় 'মেশিন্ গান্'এর শব্দ !

"আরে তুমি"

"আরে বাঃ"

জিতুবাবু এবং সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বর যুগপৎ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

"সম্পুও পাশের ঘরে মজুত"—জিতুবাবু বলছেন—স্বয়ম্প্রভা শুনতে পেলেন। 'মজুত'—আহা কথা বলার কি শ্রী, মনে হল তাঁর। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'ল ঈষৎ।

"তুমি এখানে হঠাৎ। কি মনে করে' ? এস ভেতরে এস" সোজা হয়ে বসে' সদারঙ্গবিহারীলালকে আহ্বান করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমি কিন্তু এখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না মশাই। যেতে হয়তো চলুন, আর আপনাদের দেরী থাকে তো ভাড়া মিটিয়ে দিন আমার"

ড্রাইভার জিতুবাবুকে বললে।

"এক্ষুণি যাব আমরা। একটু সবুর কর"—জিতুবাবু মৃদু হেসে বললেন।

"নিশ্চয় সবুর করবে। তাড়া দিতে মানা কর ওকে। আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। ওকে আমরা ভাড়া করে' এনেছি, কাজ শেষ করে' যাব। ওয়েটিং চার্জ যা লাগে তা দেওয়া যাবে। তারপর সদারঙ্গ, তুমি এখানে এলে কোথা থেকে"

সদারঙ্গবিহারীলাল হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন। স্বয়ম্প্রভা সম্পর্কে তাঁর দিদি হন।

"আপনিও এখানে ! যাচ্চলে—বাঃ—আরে রাম রাম—কল্পনাতীত মানে—বাঃ"

"শ্ শ্—শ্ শ্—আস্তে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"—জিতুবাবুর গলা শোনা গেল বাইরে ড্রাইভারকে শান্ত করছেন।

"তুমি এখানে এলে হঠাৎ যে"—পুনরায় প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমি ? অনেকক্ষণ আগেই আসা উচিত ছিল আমার। বাইকটাই গড়বড়িয়ে দিলে। মিঠু যে কেমন করে' সারালে তা জানি না।

একটা না একটা ট্রাবল লেগেই আছে। আজকেরটা বোধহয় স্প্রোকেট্স্ (Sprokets) গুলোর দরুণই প্রধানত। ম্যাগ্‌নেটোর ভিতর কিছু তেলও ঢুকেছিল। ম্যাগ্‌নেটোতে তেল ঢুকলেই ব্যস্। সমস্ত খুলে সাফ করতে হল। তারপর থেকে ক্রমাগত লাফাচ্ছি। এখন এক একটা জার্ক দিচ্ছে—"

"বাইকের কথা থাক। এখানে কেন এসেছ—তাই বল"

ড্রাইভারের গলা আবার শোনা গেল।

"ভাড়া করেছেন বলে' কি সমস্ত দিন থাকতে হবে না কি। মোটর কি আপনার নিজের—"

"আরে চেঁচাচ্ছ কেন বাপু। সম্পু আমরা কতক্ষণ আর—"

"ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে' দাও"

"ও কেবল জানতে চাইছে আমরা কতক্ষণ—"

"তুমি ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে' দাও"

"আসছি। এখুনি আসছি"—ড্রাইভারকে আশ্বাস দিয়ে জিতুবাবু ঘরে ঢুকলেন।

"দেখুন, কিন্তু একটা কথা, আমি আপনাদের আটকাচ্ছি না তো! না, না, তার দরকার নেই মোটেই—যাই হোক, আটকাতে চাই না। আমি আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিনা মেঘে বজ্রপাত গোছ—মানে, প্রায় অ্যাটম বম্—"

"তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে তুমি"—স্বয়ম্প্রভা জিজ্ঞেস না করে' পারলেন না।

"দেখা করতে, মানে, অকপটে বলতে গেলে খোঁজেই এসেছিলাম। একটি ভদ্রলোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ অদ্ভুত গোছের মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকটির সঙ্গে রাউতপুর রুইন্‌সে আলাপ হল। এই হোটেলেই পরশু রাত্রে আর একজন ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁদেরও আলাপ হয়েছিল। তাঁদের কথা প্রথম ভদ্রলোককে বলতেই তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন; তারপর চট্ করে' একটা মোটর ভাড়া করে' ঊর্দ্ধশ্বাসে এইদিক পানে বেরিয়ে এলেন। তাঁরি পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, হয় তো তাঁকে এমন কিছু বলে' থাকব যা হয় তো বলা উচিত ছিল না। একটু কেমন যেন গোলক ধাঁধা গোছ লাগছে। শুনবেন ব্যাপারটা, যদি অবশ্য আপনাদের যাবার তাড়া না থাকে"

"শুনব বই কি। যাবার কিছু তাড়া নেই"—স্বয়ম্প্রভার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এসেছিল—"ওগো, তুমি ব'স না। জানলার দিকে হাত নাড়ছ কেন—"

"ড্রাইভারটা জানলার কাছে এসেছে"

স্বয়ম্প্রভার নাসারন্ধ্র থেকে ফোঁৎ করে' একটা শব্দ বার হল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"[illegible] জন্মেই সমস্ত জীবনটা কাটল তোমার"—এই কথাগুলি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। ড্রাইভার নিজের সীটে গিয়ে বসতে পথ পেল না। কেঁচো হয়ে গেল একেবারে নিমেষের মধ্যে।

"এইবার বল"—স্বয়ম্প্রভা সদারঙ্গবিহারীলালকে আদেশ করলেন।

...কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ড্রাইভারের আত্মসম্মান প্রবুদ্ধ হল আবার। লজ্জাও হল একটু। ছি, ছি, সামান্য একটা মেয়েমানুষের ধমকে ঘাবড়ে গেল সে। নেবে বুকটা একটু চিতিয়ে আবার এগিয়ে গেল সে জানলার দিকে।

...স্বয়ম্প্রভা ঈষৎ ঝুঁকে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা শুনছিলেন। স্মিতমুখে একাগ্র দৃষ্টিতে এমন ভাবে চেয়েছিলেন তিনি, মনে হচ্ছিল যেন কোন অপরূপ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছেন। শুধু প্রত্যক্ষ করছেন না, যেন উপভোগও করছেন সেটা।

জিতুবাবু টেবিলের এক কোণে বসে' নিরুপদ্রবে নিবিষ্টচিত্তে নখ কামড়াচ্ছিলেন। সদারঙ্গবিহারী বক্তৃতা করে চলেছিলেন। হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

"বুঝেছি। তুমি উপরে গিয়ে দেখে এস কেউ আছেন কি না, আর যদি থাকেন, তিনি তোমার সেই সান্ত্বনা দেবী কি না"

সদারঙ্গ একটু আমতা আমতা করে' বললেন, "একজন ভদ্রমহিলার ঘরে উঁকি দেওয়াটা কি ঠিক হবে—মানে—"

"বাজে কথা বোলো না, যা বলছি কর। যাও, দেখে এস"

সদারঙ্গ তাঁর কোটের গলার বোতামটা খুললেন, আবার লাগালেন। আবার খুললেন।

"করছ কি তুমি, যাও না"

"অন্য কোনও উপায়ে যদি"

"যাও বলছি"

অনন্যোপায় সদারঙ্গবিহারীকে যেতে হল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের যে ঘরটিতে গোঁসাইজির অসুস্থা গুরু-ভগ্নীটি হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বন্ধদ্বারে সন্তর্পণে টোকা দিলেন একবার। ভিতর থেকে যে ধরণের শব্দ এল তাতে ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। ভব্যতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল তাঁর পক্ষে। জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন।

...যাবার সময় সদারঙ্গবিহারীলাল ঘরের দ্বারটি ঈষৎ খুলে রেখে গিয়েছিলেন। সেই দ্বার পথে সাহস করে' ড্রাইভারটি এসে ঢুকল। দ্বারের দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন বলে স্বয়ম্প্রভা দেখতে পেলেন না। ড্রাইভারটি কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় দাম্পত্যালাপ শুরু হয়ে গেল। ড্রাইভার কথা না বলে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল সব।

"শুনলে তো এইবার? বলেছিলাম না?"

"ও সব আমি বিশ্বাস করি না। আমি ফিরে যাচ্ছি—"

"ফিরে যাচ্ছ? আমি কিন্তু যাব না। আমি মুচুকুন্দুতে যাব"

"পাগল না কি! সেখানে কি এমন ভাবে যাওয়া যায়—"

"খুব যায়"

"যাও তাহলে। আমি ফিরে যাচ্ছি। সদারঙ্গ সমস্ত ব্যাপারটা

জানে না, কি বুঝতে কি বুঝেছে, কি বলতে কি বলছে, ওর মধ্যে আমি আর নেই"

"পুরুষ মানুষ হয়ে একথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? একটা লম্পটের হাতে নিজের মেয়েকে ফেলে পালিয়ে যাবে তুমি? যেতে চাও যাও, আমি যাব না"

"সুশোভন যে লম্পট তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আর তোমার ওই সদারঙ্গবিহারীও যে অভ্রান্ত যুধিষ্ঠির একথাও মানতে রাজি নই আমি। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল আছে তাই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না"

"সেই গোলমালটা যে কি—তাই জানতেই তো মুচুকুণ্ডে যেতে চাইছি"

"সে ধীরে সুস্থে জানা যেতে পারে, তার জন্তে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে হুড়মুড় করে' যাওয়ার দরকার নেই"

"আছে"

"কি যে পাগলের মতো করছ তুমি সম্পু"

"পাগল আমি নই, পাগল তুমি। শুধু পাগল নয়—পাষাণ। বাপ হয়ে মেয়েকে এমন ভাবে একটা গুণ্ডার হাতে ফেলে পালাতে পার"

"ছি ছি অত চেঁচিও না, লোকে বলবে কি"

"লোকের বলার কি হয়েছে এখন। যখন ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে তখন শুনতে পাবে"

"ছি ছি কি করছ তুমি সম্পু। আচ্ছা, এখন ওই দিগিন্দ্রবাবুর ওখানে গিয়ে কি করতে চাও তুমি শুনি"

"আমি অনীতাকে বলতে চাই যে তার স্বামী ওই ব্রজলালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে। আমি অনেক কিছু করতে চাই সেখানে গিয়ে। আমি সুশোভনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ব্রজলালবাবুর সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে চাই। ওপরের ঘরে যিনি আছেন তিনি যদি ব্রজলালবাবুর স্ত্রী না হন—খুব সম্ভবত নন—তাহলে ব্রজলালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করতে চাই। এদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে যদিও আমরা আমাদের মেয়েকে ভুল করে' একটা পাষণ্ডের হাতে দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু সব কথা জানবার পর আর আমরা তাকে তার কাছে থাকতে দেব না"

"কি করে' যাবে তুমি মুচকুন্দপুরে?"

"ওই মোটরে। ওই ড্রাইভারই নিয়ে যাবে"

"মা আমি যাব না"—নাটকীয়ভাবে বলে' উঠল ড্রাইভার দ্বারপ্রান্ত থেকে।

স্বয়ম্প্রভা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন এবং তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালেন। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'ল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটতে লাগল চোখের দৃষ্টি থেকে।

"আমাদের কথা দাঁড়িয়ে শুনছিলে তুমি?"

"শুনছিলাম"

তারপর জিতুবাবুর দিকে ফিরে সে বললে—"আপনি যদি আমার সঙ্গে আসতে চান আসুন। আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি"

জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

"সম্পু, ব্যাপারটা ভেবে দেখ, বুঝলে—"

"যাও না তুমি। যাও। ব্যাগটা রেখে চলে যাও"

"না, না, আমি যেতে চাইছি না—কিন্তু—"

"হ্যাঁ, তুমি যেতেই তো চাইছ, তাই তো বলছিলে এতক্ষণ। যাও, আমাকে ফেলে রেখে চলে যাও"

"সম্পু, দেখ আমি—"

"আমি মোটর ষ্টার্ট করছি মশাই। এত কৈফেৎ বরদাস্ত হয় না আমার—"

হঠাৎ মনস্থির করে ফেললেন জিতুবাবু।

'বেশ, আমি চললাম তাহলে—"

দ্বারপ্রান্তে একটু ইতস্তত করলেন ভদ্রলোক। গোঁফ ঝুলে পড়েছে, সর্ব্বাঙ্গে ধুলো, চোখে কাতর মিনতি। বড় করুণ দৃশ্য। স্বয়ম্প্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। জিতুবাবুকে একাই চলে যেতে হল।

সদারঙ্গবিহারীলাল নেমে এলেন।

বললেন, "আমি যা আশঙ্কা করছিলাম তাই। বাঃ—এ যে অদ্ভুত মনে হচ্ছে—মানে"—তারপর একটু থেমে হাত দুটো ঘসে, হঠাৎ বলে উঠলেন—"ছি, ছি, যাচ্ছে তাই"

"ওপরে কে রয়েছে দেখে এলে? সান্ত্বনাদেবী?"

"সান্ত্বনাদেবী তো নেই। একটি হাঁপানি রুগী রয়েছেন। আপনারা শুনতে ভুল করেন নি তো"

"ভুল? মোটেই না"

"ওকি, মোটরটা ষ্টার্ট করছে দেখছি। চলে যাচ্ছে নাকি"

"উনি ফিরে যাচ্ছেন"

"ও। আর আপনি?"

"আমি মুচুকুণ্ড যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে'

"মুচুকুণ্ড? মানে, মুচুকুন্দ কুণ্ডলেশ্বরী? দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে?"

স্বয়ম্প্রভা মাথা নাড়লেন।

সদারঙ্গ মাথা চুলকে বললেন, "কিন্তু দেখুন, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না সেখানে"

"আমারও করছে না"—দৃঢ়কণ্ঠে স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু মায়ের কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে, তা সে যতই না কেন অপ্রিয় হোক"

"ও। কিন্তু আমাকে যদি বাদ দেন, ক্ষতি কি"

"তোমাকে যেতেই হবে। উনি তো আমাকে ফেলে চলে গেলেন। আমার প্রতি অনীতার প্রতি তোমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। তা ছাড়া তোমার মুখেই খবর পেলাম যে কতবড় ধড়িবাজ ওরা। তুমিই হলে প্রধান সাক্ষী। তোমাকে যেতেই হবে"

"চিঠি লিখে দিলে কিম্বা অন্ত কোনও উপায়ে যদি—মানে—জনার্দ্দনবাবুকে কথা দিয়েছি ভোটগুলো জোগাড় [illegible]—হনুমানপুরটা সেরে ফেলেছি যদিও—"

"ওসব পরে কোরো। এখন যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের মুচুকুন্দপুরে

পৌঁছতে হবে। ওই মুটো লোক আমাকে ভাঁওতা দিয়ে অনীতাকে নিয়ে সরে পড়েছে। অনীতার বিপদ চরমে পৌঁছবার আগে আমাদের সেখানে পৌঁছতেই হবে, যেমন করে' হোক"

"পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল দেখছি। দেখুন দিদি, মাপ করুন আমাকে, আমি, মানে, এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না"

"এখুনি বললে ওই লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আবার বলছ এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না। বুঝলাম না ঠিক"

"ও ভদ্রলোক যে কে তা তো আমি জানতাম না। এখনও ঠিক জানিনা। আমার বিশ্বাস হয় না যে সান্ত্বনা দেবী—না, এখন মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় আসলে সান্ত্বনা দেবীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে—"

"বুঝেছি। মেয়েটির জাদু করবার ক্ষমতা আছে দেখছি। বেশ, তাকে রক্ষা করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য তা হলেও তো এই সুযোগ। কারণ, আমি তাকেও ছেড়ে কথা কইব না। তুমি যদি রক্ষা করতে চাও তাকে চল আমার সঙ্গে"

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার সাঁকিটায় হাত বুলোতে লাগলেন।

"বেশ"—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজি হয়ে গেলেন অবশেষে।

"তুমি কোথায় থাক এখানে"

"বেশী দূর নয়, পাঁচ মাইল হবে এখান থেকে"

"সেখানেই চল যাই আগে। সেখান থেকে একটা মোটর ভাড়া করতে হবে। তারপর যাওয়া যাবে মুচুকুণ্ড"

সদারঙ্গ ঘাড় নাড়লেন। তিনি যেখানে থাকেন সেখানকার হাল-চাল বেশ ভালো ভাবেই জানা আছে তাঁর।

"কিন্তু অত দূরই বা আপনি যাবেন কি করে'। আমি তো হাঁটতে পারব না। একবার চেষ্টা করেছিলাম। ভয়ানক ক্লান্তিজনক। আপনি যাবেন কি করে! হাঁটতে পারবেন কি?"

"দরকার হলে আমি দৌড়তাম"—স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু এখন দৌড়েও যে কূল পাব না। দৌড়লেও দেরি হয়ে যাবে—"

ঘাড়টা বেঁকিয়ে রাস্তার দিকে চাইলেন তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে'—যেন শত্রুকে নিরীক্ষণ করছেন।

"তোমার পিছনে সেটা নেই?"

"আমার পিছনে? মানে?"

ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছন দিকটা দেখবার চেষ্টা করলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"তোমার বাইকের পিছনে"

"ও, কেরিয়ার। হ্যাঁ, তা আছে একটা চলনসইগোছ। আপনি তার উপর চেপে যাবেন বলছেন? গড! তাকি সম্ভব? তা ছাড়া আমার বাইক মোটে আড়াই হর্স পাওয়ার"

"তোমার বাড়ি পর্য্যন্ত যাব"

"কিন্তু সেটাও কি—"

"জিনিস পত্র এখানেই থাক। রাত্রে এখানেই ফিরে আসব। চল। সময় নষ্ট করলে চলবে না"

"কিন্তু দিদি, শুনুন একটা কথা। সত্যি বলছি—"

"প্রতিবাদ কোরো না, যা ঠিক করে' ফেলেছি তা করবই, কথা বললে সময় নষ্ট হবে খালি। চল। বাইকে চড়। দাঁড়াও তোমার কোটটা খুলে দাও, পেতে বসব তার উপর। দেরি করছ কেন, দাও"

সদারঙ্গ তাড়াতাড়ি কোটটা খুলে দিলেন।

বাইরে বাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।

"আমার কেরিয়ারটা তেমন বড়ও নয় তো, মানে—"

"চড়"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

২৫

শাস্ত্রকারগণ ঠিকই ধরেছিলেন—স্ত্রীলোকেরাই শক্তি। ওঁরাই শক্তির ধারক বাহক—সব। পুরুষরা মাঝে মাঝে যে শক্তির পরিচয় দেন তা স্ত্রীলোকদের গর্ভোদ্ভূত বলেই সম্ভবত। তা না হলে পারতেন কিনা সন্দেহ। হলদিঘাটের যুদ্ধই বলুন আর ক্ষুদিরামের ফাঁসিই বলুন, আসল উৎস নারী।

স্বয়ম্প্রভা মোটর বাইকের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে চলেছিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করে' তিনি যে সুশোভন এবং তার দলকে হাতে নাতে ধরতে যাচ্ছিলেন তার কারণ এ নয় যে তারা ওঁকে একটু আগে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। গোড়া থেকেই তিনি অনুমান করেছিলেন—অনুভব করেছিলেন—যে সুশোভনকে বিয়ে করে' অনীতা একটা গুণ্ডার ষড়যন্ত্রে পড়েছে। সেই গুণ্ডার দলকে তাড়া করে' ছত্রভঙ্গ করে' ছিন্নভিন্ন করে' উৎখাত করে' তবে তিনি থামবেন। তাদের দেখিয়ে দেবেন যে মেয়েমানুষ বলে' তিনি দুর্ব্বল নন এবং এ মুলুক মগের মুলুক নয়। সদারঙ্গবিহারীলালের মোটর বাইক মফঃস্বলের বন্ধুর রাস্তায় লাফাতে লাফাতে ছুটছিল। বাইকের ঝাঁকানিতে স্বয়ম্প্রভার বলিষ্ঠ চোয়াল সংলগ্ন মাংস-মেদ কাঁপছিল থল থল করে'। সমস্ত চোখে মুখে অদ্ভুত রকম ভয়ানক একটা দুর্দ্ধর্ষ শক্তির ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল। সদারঙ্গবিহারীর কোমরটা জাপটে ধরেছিলেন তিনি। এতে যে অসুবিধা বা অশোভনতার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপও ছিল না তাঁর। যে কোনও মুহূর্ত্তে যে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে সে আশঙ্কাও ছিল বলে' মনে হচ্ছিল না। একাগ্রচিত্তে একটি কথাই কেবল তিনি ভাবছিলেন—কেমন করে' কত শীঘ্র তিনি মুচুকুন্দ কুণ্ডলে-শ্বরীতে পৌঁছবেন। যদি কেউ এরোপ্লেনে করে' উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্যারাশুটে করে' তাঁকে সেখানে নাবিয়ে দিত, তাতেও তিনি রাজি হয়ে যেতেন সানন্দে।

...একটু আগে যে জন্যে ওরা হাত ফসকে পালিয়েছে তাতে এক হিসেবে লাভই হয়েছে বলতে হবে। খড়াং। ব্রজলাল লোকটাকে চেনা গেল। ওদেরই দলের লোক নিশ্চয়। সান্ত্বনার স্বামী সেজে এসেছে, কিম্বা...খড়াং...খড়াং...। কিম্বা হয়তো সান্ত্বনাকে নিয়েই হামলা করে সবাই, আজকালকার মেয়েতো কিছুই বলা যায় না—

অসীতাকেও ওই রকম করতে চায়—ভোঁক্—ভোঁক…উঃ ভাবা যায় না…খড়াং…ভোঁ-ও-ও-ক্…মানুষের এত অধঃপতন হতে পারে!

হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা উল্টে গেলেন বোঁ করে' এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ধারে মাঠের মাঝখানে বসে' পড়লেন একটা ঝোপের ভিতর। কাঁটার ঝোপ। সামনে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা গরুর গাড়ি এসে পড়ায় এবং ধাক্কা বাঁচাবার চেষ্টা করায় এই কাণ্ড। গরুর গাড়িতে গোঁসাইজি, কদকা, আর নিতাই বৈরাগী।

সদারঙ্গবিহারীলাল পড়ে' যান নি। তিনি গাড়ি থেকে নেবে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ঝোপটার কাছে।

ইস্! লাগেনি তো? ওই গরুর গাড়িটা, বুঝলেন। আনাড়ি গাড়োয়ান, ষাঁড়ও আনকোরা সম্ভবত। লেগেছে?"

"না"

"যাক। কিন্তু ভারী দুঃখিত আমি। জোরে ব্রেক কসা ছাড়া উপায় ছিল না। দুরন্ত ষাঁড়"

"আমাকে তোল"

"কারও লেগেছে না কি গো"—গাড়ির গাড়োয়ান জিগ্যেস করলে রাস্তা থেকে।

"আমার হাতটা ধরে' নিজেকে একটু টেনে তোলবার চেষ্টা করুন। শক্ত বুঝতে পারছি, ঝোপে আটকা পড়ে গেলে নিজেকে টেনে বার করা খুবই কঠিন। আমার অভিজ্ঞতা আছে। লাগেটাগে নি তো"

"না"—দাঁতে দাঁত চেপে স্বয়ম্প্রভা বললেন এবং নিজেকে টেনে তোলবার নিষ্ফল প্রয়াস করতে লাগলেন।

"ছি, ছি—হ্যাঁ ওই রকম—আবার করুন—হেঁইও—"

"জখম হল না কি কেউ গো"—গাড়োয়ান প্রশ্ন করলে আবার।

"না চোট টোট লাগেনি কারও। এইবার—হেঁইও হেঁইও—"

"না পারছি না। চুপ কর, হেঁইও হেঁইও কোরো না"

"ও আচ্ছা। সত্যি ভারী ইয়ে হ'য়ে গেল তো। ছি, ছি কি মুশকিলে পড়ে গেলেন আপনি। একটু গুঁড়ি মেরে—হামাগুড়ি দেওয়া গোছ—পারবেন?"

"না"

"কি করা যায় তাহলে। কোমরে টোমরে লাগে নি তো? ব্যথা করছে কোথাও? অনেক সময় প্রথমটা 'ফীল' করা যায় না। আচ্ছা এক কাজ করুন, আমার দুটো কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠতে পারবেন কি না দেখুন তো"

"না। দিক কোরো না আমাকে"

"ও আচ্ছা। আচমকা পড়ে গেলে অনেক সময় কিছু জোর পাওয়া যায় না—মানে নার্ভাস গোছের হয়ে যেতে হয়—তা হয় নি তো"

"না"

"তবে? কিছু একটা হয়েইছে নিশ্চয়। চেষ্টা করুন, পারবেন ঠিক উঠতে। উঠতে হবেই, কারণ একটা ঝোপের ভিতর আর কতক্ষণ বসে' থাকবেন। আমাকে একটু চেষ্টা করতে দিন না, আমি টেনে তুলে দি আপনাকে"

"থাম। কোথাও আটকে গেছি মনে হচ্ছে"

"আটকে? ও, থামুন, বুঝেছি, 'জাম' হয়ে গেছে। এক মিনিট। টানাটানি করলে শাড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে—দাঁড়ান। যন্ত্রটন্ত্র জাম হয়ে গেলে তার তলার দিকটা বেশ করে' লুব্রিকেট করে' দিলে খুলে যায় অনেক সময়—কিন্তু আপনাকে—"

"তুমি চুপ কর। ও'দিকে সরে যাও তুমি। আমি নিজেই ঠিক করে' নিচ্ছি। দূরে সরে' যাও। এদিকে দেখো না"

"ও, আচ্ছা, আচ্ছা। মহাবিপদে পড়া গেল তো। ছি ছি"—মুখ ঘুরিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল রাস্তার দিকে চাইলেন।

"আরে গোঁসাইজি যে। নমস্কার, নমস্কার। কি কাণ্ড! আপনি এখানে"

"ওদের এখান থেকে সরে' যেতে বল"—ঝোপের ভিতর থেকে নিদারুণ-কসরৎ-রতা স্বয়ম্প্রভার তর্জ্জন শোনা গেল।

"আরে, বৈরাগী মশাইও যে। নমস্কার। আপনি এ অঞ্চলে হঠাৎ যে আজ?"

"ওই লোকগুলোকে সরে' যেতে বলবে কি না"

"মাঠাকরুণের লেগেছে না কি"

গাড়োয়ানটিও গাড়ি থেকে নেবে এসে দাঁড়াল।

"না লাগেনি। আটকে গেছেন। কিন্তু উনি চান না যে—"

"আটকে গেছেন?"

বলিষ্ঠ ঘোঁতন গাড়োয়ান ঈষৎ ঝুঁকে এমন ভাবে এগিয়ে এল যেন তাকেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। অনেক আটকানো গাড়ির চাকা তুলেছে সে জীবনে।

"আটকে গেছেন? তাতে কি হয়েছে! পাঁজাকোলা করে' টেনে তুলে দিলেই মিটে যায়"

"কিন্তু উনি চান না যে আমরা কোন রকম সাহায্য করি—চটে যাচ্ছেন—ঠিক করে' নেবেন এখন নিজেই বোধহয়—হয় তো একটু সময় লাগবে—কিন্তু—"

"চলে যাও এখান থেকে সব"—আবার চেঁচিয়ে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। নিজেকে মুক্ত করবার প্রয়াসে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর।

ঘোঁতন নীরবে দন্তবিকশিত করে' হাসল একবার। তারপর কোমর বেঁধে মালকোচা মারল। তারপর অগ্রসর হল ধীরে ধীরে।

"ছটফট করবেন না মাঠাকরুণ। সব ঠিক করে দিচ্ছি। বৈরিগি মশাই একটু সরে' দাঁড়ান দিকি"

ঘোঁতনের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না কারও। সসম্ভ্রমে সকলেই সরে' দাঁড়ালেন। গোঁসাইজির মুখে নানা ভাবের সংমিশ্রণে বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছিল একটা।

"সদারঙ্গ! এই—এই গাড়োয়ান—খবরদার—খবরদার, আমার গায়ে হাত দিও না বলছি—এ কি আস্পর্দ্ধা—"

ঈষৎ ঝুঁকে ঘোঁতন খপ করে' স্বয়ম্প্রভার কোমরটা ঝাপটে ধরেছিল। জবাই করবার পূর্ব্বে হাঁস বা মুরগী ঘাতকের মুঠোর মধ্যে যেমন ছটফট করে স্বয়ম্প্রভাও অনেকটা তেমনি করতে লাগলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সদারঙ্গবিহারী ঈষৎ-ব্যাদত আননে ঘোরা ফেরা করছিলেন কেবল চঞ্চল হয়ে।

"ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও"—তারস্বরে আদেশ করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঘোঁতন ছেড়ে দাও বুঝলে—যদিও তুমি ওঁর ভালোর জন্মেই করছ—তবু বুঝলে—উনি যখন সেটা চাইছেন না তখন—বাঃ প্রায় তুলে ফেলেছিলে যে! বাঃ—আর একবার"

সদারঙ্গ যেতে বল ওকে। তুমিও ওকে ওসকাচ্ছ? ছেড়ে দাও, ছাড় বলছি—ছাড়"

"না না করুক। আপনি বুঝছেন না দিদি। ও ঠিক টেনে তুলে ফেলবে। ঘোঁতন আর একবার"

"আমি মেয়েমানুষ, আমার গায়ে একটা পরপুরুষ হাত দিচ্ছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ সেটা—"

"না, না, ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। আপনার ভালর জন্মেই ও করছে—ঝোপের মধ্যে বরাবর বসে' থাকবেন নাকি! ঘোঁতন—হ্যাঁ—ঠিক—টান। হেঁইও—ও না! হয়েছে—হয়েছে—বাঃ—"

"মারো জোয়ান হেঁইও"—ঘোঁতন বলে' উঠল।

"হেঁইও"—বৈরাগী মশাইও বললেন।

"হেঁইও"—কদকাও বললে।

"হেঁইও হেঁইও হেঁইও"—আত্মবিস্মৃত সদারঙ্গবিহারীলাল নৃত্য করতে লাগলেন দু'হাত তুলে।

চর্‌র্‌র্‌র্‌—! কাপড় ছেঁড়ার একটা শব্দ হল এবং পরমুহূর্ত্তেই স্বয়ম্প্রভা ঝোপমুক্ত হলেন। ঘোঁতন তাঁকে পাঁজাকোলা করে' তুলে এনে রাস্তার দাঁড় করিয়ে দিয়ে মাথার ঘাম মুছলে।

"অসভ্য বখাটে গুণ্ডা জানোয়ার"—ক্রোধে স্বয়ম্প্রভার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল—"শাড়িটা ছিঁড়ে ক্যাতাকুঁতি করে' দিলে একেবারে—"

"শাড়ি যে আটকে গিয়েছিল মাঠাকুরুণ। তলার দিকে হাত চালিয়েও বাঁচানো গেল না, ছিঁড়ে গেল কি করব, ওর কোন চারা ছিল না। শাড়ি বাঁচাবার জন্মেই তলার দিকে হাত চালিয়েছিলাম, কিন্তু হল না"

"সরে' যাও এখান থেকে। চলে' যাও সবাই"

স্বয়ম্প্রভার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি বললেন, "গাড়োল কোথাকার"

"আমি কি করব বলুন"

"তুমি ওসকাচ্ছিলে কেন? আমার বলা হচ্ছে কি করব"

"ওসকানো কথাটা ঠিক হচ্ছে না, না—না, ওসকানো—বাঃ। এক্ষেত্রে ওছাড়া উপায়ই বা কি ছিল বলুন। ঘোঁতন না এসে পড়লে সমস্ত দিন ওই ঝোপে বসে থাকতে হ'ত—হয়ত সমস্ত রাত্তও। মারাত্মক আটকে পড়েছিলেন যে"

"ওদের চলে যেতে বল। আমার শাড়ি একেবারে ছিঁড়ে গেছে"

"ওদের ওপর চটবেন না। আমার পরিচিত লোক সব। আর প্রত্যেকটি ভালো লোক। উঁচু দরের। বৈরাগীমশাই ভক্ত লোক একজন। ইনি হচ্ছেন গোঁসাইজি, এঁরই হরিমটর হোটেল, সেইখানেই আজ রাত্রে আপনাকে থাকতে হবে হয়তো"

গোঁসাইজি ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়েছিলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "ক্ষমা করবেন, আপাতত আমি অতিথি সৎকার করতে অক্ষম"

"কিন্তু একটা ঘর তো খালি আছে দেখে এলাম"

"সে ঘরে আমার বন্ধু বৈরাগী মশাই থাকবেন আজ রাত্রে। আমার গুরুভগ্নী অসুস্থা। ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি রাত্রে সেবার দরকার হতে পারে। সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত উনি"

"ও"

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

"শুনছেন দিদি, এ আবার এক প্যাঁচ হল। বেশ, উঁচু দরের প্যাঁচ—"

স্বয়ম্প্রভা সরে' গিয়ে আর একটি ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বীয় শাড়ি পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। এই ছেঁড়া শাড়ি পরে' তাঁকে যে হোটেলে ফিরতে হবে না এ সংবাদে তিনি আশ্বস্ত হলেন কিঞ্চিৎ। এ শাড়ি পরে' ভদ্রসমাজে বেরোন অসম্ভব।

বৈরাগী মশায়ের মনে হল হোটেলের ঘরটি এঁরা যে পেলেন না সে জন্যে পরোক্ষভাবে তিনিই সম্ভবত দায়ী। সুতরাং একটু জবাবদিহি করা প্রয়োজন। এগিয়ে এসে মৃদু হেসে হাত কচলে বললেন, "দেখুন গোঁসাইজির গুরুভগ্নীটি অসুস্থ হয়ে পড়া গতিকেই আমাকে আসতে হল। গোঁসাইজির কথা ঠেলা যায় না, তাছাড়া এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্যও তো বটে—হ্যাঁ, কি বলেন। খালি ঘরও তো মাত্র একটি—তা নইলে না হয়—"

"তা' তো বুঝলাম। কিন্তু আমি কি জবর প্যাঁচে পড়লাম সেটা ভাবুন। গোঁসাইজি, কোন রকমেই কি হয় না?"

"না"—গোঁসাইজি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"প্রকাশ্য দিবালোকে যে স্ত্রীলোক একজন পুরুষের কোমর ধরে' তার বাইসিকলের পিছনে চড়ে' আসতে পারেন তাঁকে কিছুতেই আমি স্থান দিতে পারি না, ঘর খালি থাকলেও পারি না। কেবল পয়সা লোটবার জন্যেই যে আমি হোটেল খুলি নি একথা এ অঞ্চলের সবাই জানে। আমার ওটা হোটেল নয় হিন্দু-পান্থনিবাস"

ঝোপের আড়াল থেকে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "ওখান থেকে চলে এস তুমি"...গোঁসাইজির দল গিয়ে শকটে আরোহণ করলেন। (ক্রমশঃ)

সিংহলের স্বাধীনতা উৎসব

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়ার স্বাধীনতা-আন্দোলন গভীর আকার ধারণ করে। ইন্দো চায়না, ভিয়েটনাম, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল এই স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী হইয়া উঠে। তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত ছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ব্বেই যখন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে তখন কূট রাজনীতি-বিদ ইংরাজ এই আন্দোলনকে হীনবল করিবার বাসনায় ব্রহ্মদেশ ও সিংহলকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতেও ইংরাজ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান সমস্যা ইংরাজেরই সৃষ্টি। এই সমস্যা সৃষ্ট দ্বারা ইংরাজ ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও ভারত এই দুই ইউনিয়নে বিভাগ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশ কঠোর দৃঢ়তা দ্বারা বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া গত ৬ই জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বেই গত ১৫ই আগষ্ট ভারতের ভাগ্যাকাশকে রক্তিম রাগে রঞ্জিত করিয়া প্রায় দুই শতাব্দী পরে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সূর্য্য উদিত হইয়াছে। এশিয়ার এই নবজাগরণে ক্ষুদ্র সিংহল দ্বীপও মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পথে রক্তহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছে। ১৩৩ বৎসর পরাধীনতার পর গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সিংহলের অঙ্গ হইতে কঠিন ও কঠোর লৌহ শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে। আজ সিংহলের বাতাসে মুক্তির হিল্লোল ; আকাশে নানা বর্ণ ও আলোকের ছটা। সিংহলবাসীর হৃদয়ে আজ অসীম উদ্দীপনা, প্রবল উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্য। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে তাহার আত্মার যে অপমৃত্যু হইয়াছিল—তাহারই মুক্তির দিন গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। এই দিনটি সিংহলের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

সিংহলের সহিত বাংলাদেশের সম্পর্ক বহু দিনের। সে আজ দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বের কথা—যে দিন বাংলার উচ্ছৃঙ্খল দুর্দ্দান্ত রাজপুত্র বিজয়সিংহ বাঙ্গালা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সাত শত অনুচর লইয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছিলেন। জাহাজ বঙ্গোপ-সাগরে ভাসিয়া চলিল। পর্ব্বতপ্রমাণ উত্তুঙ্গ তরঙ্গসমূহ অতিক্রম করিয়া, মাসের পর মাস অকুল পাথারে ভাসিতে ভাসিতে, আট শত মাইল দীর্ঘ পর্ব্বতসঙ্কুল উপকূল উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া তাহারা এক দ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। বহুকাল সমুদ্রবাসে অনুচরগণের শরীর অবসন্ন, অন্তর চিন্তাকুল, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দেহ অভিভূত। সমুদ্রতীরে এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—দ্বীপটির নাম লঙ্কা। তারপর বিজয়সিংহ দেখিলেন—এক পরমা সুন্দরী যক্ষিণী—তাহার নাম কুবেনী। তাহাদের অবস্থা শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া যক্ষিণী রাজপুত্রকে বহু পরিমাণে সুখাদ্য আনিয়া দিল। বিজয় সিংহ ও তাঁহার অনুচরগণ আহার ও পানে তুষ্ট হইলেন। পরদিন রাজপুত্র মালা বদল করিয়া যক্ষিণীকে বিবাহ করিলেন।

তখন সেই দ্বীপের রাজা ছিলেন কাল সেন। তাঁহার বিবাহ উৎসব আসন্ন। বিবাহের রাত্রে খুব ধুমধাম নানা উৎসব আয়োজন। সকলেই ব্যস্ত। সেই রাত্রে এক হাতে মশাল ও আর এক হাতে তরবারি লইয়া সাত শত অনুচর সমেত বিজয়সিংহ রাজ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি তখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, প্রহরীরা ঝিমাইতেছে। সকলে আমোদ-প্রমোদ ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাজা কালসেন বিবাহ শেষে নব বধূর হস্ত ধরিয়া বহু পরিচারিকাসহ অন্দরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে বিজয়সিংহ "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া বীরবিক্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিজয়সিংহ রাজার মাথা কাটিয়া ফেলিয়া রাজমুকুটটি নিজের মাথায় পরিলেন। চারিদিকে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য। সকলের ঘুম ছুটিয়া গেল। রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হইল। বিজয়সিংহের সাত শত অনুচর রাজ বাড়ী অধিকার করিয়া বসিল। পরদিন প্রভাতে সকলে জানিল রাজপুত্র বিজয়সিংহ লঙ্কার রাজা। লঙ্কা দ্বীপের নূতন নাম হইল সিংহল।

অনেকে বলেন, বর্ত্তমান সিংহলীগণ বঙ্গের রাজকুমার বিজয় ও তাহার সহচরগণের বংশধর। আর এই জন্যই সিংহলীদের মধ্যে বাঙ্গালীদের সহিত আকৃতিগত ও ভাষাগত সাদৃশ্য এত প্রবল। প্রাচীন সিংহলীর অর্দ্ধেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার শব্দ। সিংহলবাসীগণ বঙ্গদেশবাসীদেরই নিকট আত্মীয়।

ধর্ম্মের দিক হইতে ভারতের সহিত সিংহলের সম্পর্কও গভীর। মহারাজ অশোক সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে পাঠাইয়াছিলেন। তাই আজ সিংহলীরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। কবি সত্যেন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন :—

> ওই শৈশব তার রাক্ষস, আর যক্ষের বশ, হায়
> আর যৌবন তার 'সিংহের' বশ,—সিংহল নাম যায়
> এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায়—প্রান্তর তার ছায়,
> আজ বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অঙ্কিত তার গায়।

সমুদ্রতীর হইতে ২০০০ ফিট উচ্চে কৃত্রিম হ্রদের তীরে অবস্থিত কান্দী নগরী পূর্ব্বে সিংহলের রাজধানী ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরও এই কান্দী নগরীই পুনরায় সিংহলের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। এখানকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দিরের নাম দালাদা মালিগাওয়া বা দন্তবিহার। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত আছে। এই মন্দিরে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে। এখানকার পূর্ব্বতন রাজ-গণের সিংহাসন আরোহণের সময় যে সিংহাসনটি ব্যবহৃত হইত সেই সিংহাসনটি এতদিন লণ্ডনে ছিল। ১৯৩৪ সালে ডিউক অব গ্লাউসেষ্টার যখন সিংহল ভ্রমণে আসেন, তখন এই সিংহাসনটি সিংহলবাসীদের প্রত্যর্পণ করেন।

কান্দী হইতে ৮০ মাইল দূরে অনুরাধাপুর নামে একটি প্রাচীন নগরী আছে। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধগয়ায় যে বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানাসনে বসিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন, এই অনুরাধাপুরে তাহারই একটি শাখা আছে। এই নগরী খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত সিংহলের রাজধানী ছিল। এই বোধিবৃক্ষের একটি শাখা আনিয়া পুনরায় সারনাথে রোপিত হইয়াছে।

সিংহলের কলম্বো নগরী ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ অধিকার করে। কৃষ্টোফার কলম্বাসের নামানুসারে তাহারা এই নগরের নাম রাখে কলম্বো। পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে ওলন্দাজগণ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে এই নগরী কাড়িয়া লয়। তাহাদের নিকট হইতে পুনরায় ইংরাজগণ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর অধিকার করে। এখানকার উৎপন্ন চা, রবার, নারিকেল, দারুচিনি, কোকো প্রভৃতি দ্রব্যের উপর ইংরাজের প্রবল লোভ।

সিংহলের তদানীন্তন রাজধানী ইংরাজ অধিকার করিয়াছিল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। তারপর দীর্ঘ ১৩৩ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংরাজ সিংহলবাসীগণের কণ্ঠে পরাধীনতার নাগপাশ পরাইয়া তাহার দেশকে পিষ্ট ও নিষ্পেষিত করিয়াছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তাহাদের কণ্ঠ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে পরাধীনতার সেই কঠোর নাগপাশ। সিন্দবাদ নাবিকের স্কন্ধ হইতে নামিয়া পড়িয়া দৈত্য তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। আজ সিংহলবাসী মুক্ত—স্বাধীন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, সকাল সাড়ে সাতটা। জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—প্রভাতে এই শুভক্ষণে স্বাধীনতা উৎসব আরম্ভ হইবার সময়। সমগ্র সিংহলবাসী আজ আনন্দে আত্মহারা। চারিদিকে উৎসব ও আনন্দ, মন্দিরে মন্দিরে পূজা ও আরতি, সন্ধ্যায় নগরী অসংখ্য দীপালোকে আলোকিত। চারিদিক আলোকমালায় নববেশ ধারণ করিয়াছে। গগনে ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে আলোক মঞ্জরী।

প্রভাতে উৎসবের আরম্ভে এখানকার গবর্ণর সার হেনরী মঙ্ক-মেসন মুর স্বাধীন সিংহলের গবর্ণর-জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শপথ গ্রহণ করিলেন। রাজপথে লোহিত ভেলভেটের উপর স্বর্ণবর্ণের কারুকার্য্যময় বস্ত্রে সুশোভিত শতাধিক হস্তী শোভাযাত্রা সহকারে প্রাচীন মন্দিরে চলিয়াছে। তাহাদের অঙ্গে আবদ্ধ শত শত রৌপ্য ঘণ্টা হইতে মধুর বাদ্যধ্বনি শোনা যাইতেছে। তাহাদের সম্মুখে চলিয়াছে এক বিরাটকায় সুসজ্জিত বিরদ হস্তী। আর পিছনে চলিয়াছে স্বাধীনতা দিবসে সৃষ্ট একটি হস্তীশিশু। এই শোভাযাত্রার পিছনে চলিয়াছে চারিশত বীভৎসকায় মুখাবরণধারী নর্ত্তক। শত শত বাদ্যযন্ত্র সহকারে তাহারা নৃত্যে রত। শোভাযাত্রা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে কান্দীর হ্রদের মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে নানাবিধ বাজি ও আলোকসজ্জা আরম্ভ হইল। দালদা মালিগাওয়া মন্দিরে ১৩৩ বৎসর পরে স্বাধীন সিংহলের সিংহপতাকা বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডন ষ্টিফেন সেনানায়ক, ডিউক অফ গ্লাউসেষ্টার ও তাঁহার পত্নী ও গবর্ণর জেনারেল ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন করেন।

গবর্ণর ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৬ সালের আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া সিংহলে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইল। গবর্ণর যে প্রাসাদে বাস করেন তাহার নাম 'কুইনস হাউস।' সেইদিন হইতে তাঁহার বার্ষিক বেতন হইল ৮০০০ পাউণ্ড। তিনি এক বৎসর পরে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

এই স্বাধীনতা উৎসব দুই সপ্তাহ ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য ডিউক অফ গ্লাউসেষ্টার ও তাঁহার পত্নী বিলাত হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি ডমিনিয়ন পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করেন। কাউন্সিলের প্রাচীন গৃহে এই উৎসব সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া টরিংটন স্কয়ারে রিজওয়েগস্ক লিঙ্কের উপর এক বিশাল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সিংহলের প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত এই প্রাসাদে ৬০০০ মন্ত্রী, সরকারী কর্ম্মচারী ও নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রাসাদের বাহিরে ১২০০০ ব্যক্তির স্থান সংকুলান হইয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল ১৫০০ ছাত্র। এই প্রাসাদের প্রধান দ্বারের সম্মুখে কান্দির শেষ রাজা শ্রীবিক্রম রাজ সিংহের সিংহ পতাকা উড্ডীন হয়। লাল কাপড়ের উপর হরিদ্রা বর্ণের সিংহ একটি পতাকা ধরিয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্দীবাসীগণের সহিত যুদ্ধের পর ইংরাজ রাজ-সিংহাসন ও পতাকা ইংলণ্ডে লইয়া যায়। উভয়ই সিংহলকে প্রত্যর্পিত হইয়াছে।

ডিউক অফ গ্লাউসেষ্টর রাজার বাণী পাঠ করিয়া পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করেন। কুইনস হাউস হইতে তিনি পার্লামেণ্টে শোভাযাত্রা সহকারে গমন করেন। তথা হইতে ডিউক ও তাহার পত্নী কলম্বো হইতে ৭২ মাইল দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য রাজধানী কান্দীতে ৫ মাইল দীর্ঘ মোটরের শোভাযাত্রা সহকারে উপস্থিত হন। সেখানে ডিউক সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই দিন সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর অফ ল" উপাধিতে ভূষিত করেন। এখানকার দীর্ঘতম নদী মহাকালী গঙ্গার উপর অতি রমণীয় পরিবেশের মধ্যে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইবে।

১২ই ফেব্রুয়ারী ডিউক কান্দী পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা পরাক্রম বাহু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পোলান্নারুয়া এবং নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং অনুরাধাপুর পরিদর্শনে গমন করেন। প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অনুরাধাপুর লঙ্কা দ্বীপের রাজধানী ছিল। ডিউক পুনরায় কলম্বোয় ফিরিয়া আসিয়া লঙ্কার দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস দুইঘণ্টায় নাট্যাভিনয় দর্শন করেন। তাঁহারা ১৭ই ফেব্রুয়ারী এরোপ্লেনে সিংহল ত্যাগ করেন।

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী ডন ষ্টিফেন সেনানায়ক ১৮ বৎসর যাবৎ মিরিগামা হইতে পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি একদিন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি ডন ব্যারণ জয়তিলকের

স্থলের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় বহু অর্থব্যয়ে সিংহলের জঙ্গলাকীর্ণ বহু স্থান চাষের উপযোগী করেন। কয়েকটি স্থানে খনন তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। তিনি মহাবীর পরাক্রমবাহুর প্রাচীন ও জঙ্গলাকীর্ণ পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করেন। ম্যালেরিয়াপূর্ণ অনুর্ব্বরস্থানে তিনি বহুব্যক্তির বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারত, ব্রহ্মদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে সিংহলে প্রধানতঃ খাদ্য আমদানী হয়। যাহাতে অন্য দেশ হইতে খাদ্য আনয়ন করিতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

গত ২৫ বৎসর হইতে মিঃ সেনানায়ক ও তাঁহার দুই ভ্রাতা সিংহলের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। দেশে স্বাধীনতা আজ আসিয়াছে; কিন্তু তাহার ভ্রাতৃদ্বয় আজ জীবিত নাই। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দিনটি মিঃ সেনানায়কের জীবনে এক স্মরণীয় দিন। এই দিবস তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। ৬৩ বৎসরের বৃদ্ধ সেনানায়ক পরাধীন, পিষ্ঠ ও নিপীড়িত সিংহলবাসীগণকে ইংরাজের শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—তাহাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন। ১৯১৫ সালে যখন সিংহলের গবর্ণর স্যর রিচার্ড চেমার্স সিংহলবাসী ও মুসলমানগণের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিয়া তাহাই দমনের নামে দেশে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতেছিলেন, তখন তাহাতে অংশ গ্রহণের জন্য মিঃ সেনানায়ক অল্পের জন্য ফাঁসির হাত হইতে রক্ষা পান।

মিঃ সেনানায়কের মন্ত্রী সভার সদস্য স্যর অলিভার গুণতিলক স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভার লইয়াছেন; মিঃ ভাণ্ডার নায়েক স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ ও কর্ণেল কোটেলাওয়েলা যান বাহন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। আর বাণিজ্য বিভাগের ভার লইয়াছেন মিঃ সি সুন্দরলিঙ্গম্। তিনি পূর্ব্বে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সিংহলী তামিল বংশজাত।

ইংরাজের শতাধিক বর্ষ শোষণের পর ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের ন্যায় সিংহলের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত হীন। অর্থ নৈতিক সমস্যাই আজ সিংহলের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে, সিংহলবাসীর জীবনের মান উন্নত করিতে না পারিলে স্বাধীনতা অর্থহীন, হইয়া পড়িবে। সিংহলের স্বাধীনতা উৎসবে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাই আজ সিংহলবাসী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। আজ উন্নততর উপায়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান, দেশে বহুল পরিমাণে বাণিজ্য বিস্তারের উপর সিংহলবাসীর অন্ন সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। এই আশায় আজ সিংহলের অগণিত দরিদ্র নরনারী মিঃ সেনানায়কের দিকে তাকাইয়া আছে।

মনীষী ডালটন

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

রাসায়নিক ছাত্রদের নিকট ডালটনের নাম অপরিচিত নয়। ইনি রসায়নশাস্ত্রের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত সংজ্ঞাটীর নাম আণবিক সূত্র (Atomic theory); ডালটনের সূত্রটীর উপর দাঁড়াইয়াই নব্য-রসায়ন আজ এতটা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, যদিও বর্ত্তমানে ইহার উপর গুরুত্বপূর্ণ কারুকার্য্য সাধিত হইয়াছে।

ডালটন সাহেব ইংলণ্ডের এক কোয়েকার বংশে ১৭৬৬ খৃঃ জন্মলাভ করেন। তাহার পিতা জোসেব ডালটন একজন তাঁতি ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকাতে ছেলেরা অতি অল্প বয়সে লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হন। ডালটন কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা করিয়া ১১ বৎসর বয়সে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। পাঠশালায় থাকিতেই শিক্ষক মহাশয় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। অঙ্ক শাস্ত্র ও দর্শনের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক প্রীতি দেখিয়া ডালটনের একজন আত্মীয় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। ইনি ছিলেন একজন খনিজ-তত্ত্ববিদ্; এই আত্মীয়ের চেষ্টায় ইঁহার আরও কিছু বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা হইয়াছিল। জন গাফ্ নামক অপর একজন ভদ্রলোকও এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। গাফের কতকগুলি খনিজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পত্রিকা ছিল—ঐগুলি পাঠ করিয়া ডালটন বায়ু ও অন্যান্য গ্যাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করেন। শুনা যায় ঐ সময় বায়ু ও বায়বীয় অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক সংগঠন জানিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয় এবং এই গবেষণার পরিপক ফল ঐ আণবিক সূত্র। ডালটন ঐ সময় নিজহস্তে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পর্য্যন্ত তৈয়ার করিয়াছিলেন। ঐগুলি আজকালকার যন্ত্রপাতির মত ততটা নির্ভুল না হইলেও কাজ চলিয়া যাইত। এমন কি তাঁহার প্রস্তুত যন্ত্রাদি সে সময় বিক্রয় হইত। তাঁহার বন্ধু রবীনসন, ইঁহার নিকট হইতে দুইটী চাপমান যন্ত্র উপহার পাইয়াছিলেন।

সে যুগের অসুবিধার কথা বলার নয়, তাপমান যন্ত্রের পারদ গরম করিতে মোমবাতি ছাড়া অপর কোন ব্যবস্থা ছিল না।

২০।২১ বৎসরে ডালটন বক্তৃতা করিয়া কিছু কিছু রোজগার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে কোন সুবিধা হয় না। কারণ তিনি ভাল বক্তা ছিলেন না এবং তাঁহার পরীক্ষাগুলি প্রায়ই ভুল হইত। এ সময় তিনি কিছুদিন ডাক্তারী পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ এ চেষ্টা হইতে তাঁহাকে বিরত করেন। ১৭৯৩ খৃঃ ডালটন মাঞ্চেষ্টারে গিয়া একটি শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যা পড়াইতেন। স্থানটি তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছিল। বাসস্থানের নিকট একটি বিরাট পুস্তকালয় থাকাতে তাঁহার পড়াশুনারও খুব সুবিধা হইয়াছিল। স্থানীয় লোকেরা ডলটনের ব্যবহারে ও পাণ্ডিত্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়ায় সবদিক দিয়াই তাঁহার দিনগুলি ভাল কাটিতেছিল। লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করিতে পয়সা লাগিত না, বন্ধুগণ অবসরমত নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ ত লাগিয়াই থাকিত। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি অসুবিধা ছিল। স্কুল ও গৃহ-শিক্ষকের কাজ অত্যন্ত বেশী করিতে হইত বলিয়া তিনি নিজে গবেষণা বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সময় পাইতেন না। এজন্য কিছুদিন পর তিনি স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দেন। ইহার পরে তিনি আর কোনদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন নাই।

ডালটনের একটি অদ্ভুত গুণ ছিল। নিজ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অপরের সাহায্য নেওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। আত্মবিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, বায়ু ও অন্যান্য গ্যাস সম্বন্ধে আলোচনার সময় তিনি কখনও পরমতাপেক্ষী হন্ নাই। তিনি যে একমাত্র নিজ চিন্তাশক্তি দ্বারা আণবিক সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার প্রমাণ লিখিত কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায়। ১৮০৩-১৮০৯ খৃঃ এর মধ্যে তিনি লণ্ডনের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনে কয়েকটা বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতাগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বক্তৃতাতে আণবিক সূত্র গ্রহণ করিবার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, সূত্রটা পরিষ্কার প্রকাশিত হয় ১৮০৮ খৃঃ। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি আর একটি বিখ্যাত রাসায়নিক আইন খাড়া করেন।

ডালটন একজন কোয়েকার ছিলেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদে পর্য্যন্ত নিজের সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইত। প্যাণ্ট, মোজা, নেকটাই সবটাতেই কোয়েকার বংশের রূপ ফুটিয়া উঠিত। তিনি সুন্দর একটি ছড়ি হাতে বেড়াইতে বাহির হইতেন। কেহ কেহ বলেন ডালটনের আকৃতিতে নিউটনের সাদৃশ্য ছিল। এমন কি তাঁহার মর্ম্মর-মূর্ত্তি দেখিয়া কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত নিউটন বলিয়া ভুল করিয়াছেন। ইনি সমস্ত জীবন একটি অনাবিল, সহজ, সরল ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বদা উচ্চ-চিন্তায় মগ্ন থাকাতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। এত বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অতি সামান্য আয়ে জীবনাতিবাহিত করিতেন। একজন মহিলা ডালটন সম্বন্ধে সুন্দর লিখিয়াছেন: "ডাক্তারের জীবন এরূপ অনাড়ম্বর ও বৈচিত্র্যহীন ছিল যে তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে গেলে অতি সংক্ষেপেই কাহিনী শেষ করা যায়। রবিবারদিন তিনি একটি অতি পরিষ্কার কোয়েকার পোষাক পরিয়া দুইবার গির্জ্জায় যাইতেন।......তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাঠ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান ও ভগবত্তার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। আমি দেখিয়াছি রবিবার দিন যদি কেহ ধর্ম্ম-কর্ম্মে অবহেলা করিত তিন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন এবং এজন্য তিরস্কার করিতেও দ্বিধা করিতেন না। রবিবার ও বৃহস্পতিবারের বৈকাল ছাড়া তিনি অপর দিনগুলি গবেষণাগারেই অতিবাহিত করিতেন। বৃহস্পতিবার বৈকালে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হইয়া বাহির হইতেন। দলের মধ্যে দেখিতাম তিনি কথা মোটেই বলিতেন না, কেবলমাত্র মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসিতেন এবং অনবরত সিগারেট টানিতেন। ঐ সঙ্গে সময় সময় আরও কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীকে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছি।"

ডালটন সম্বন্ধে কতকথাই মনে হয়। এরূপ চমৎকার জীবন বেশী দেখা যায় না। পৃথিবীর একজন মনীষী জীবনভোর একটি ক্ষুদ্র নগণ্য ঘরে বাস করিয়াছেন এবং ছোট ছোট ছেলেদের পড়াইয়া জীবনধারণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এত বড় বিজ্ঞানীকেও ইংরেজজাতি অতি কৃপণতার সহিত সম্মান দিয়াছেন। মাত্র ১৮২২ খৃঃ তিনি রয়েল সোসাইটীর সভ্য হন। ইহার অনেক পূর্ব্বে ফরাসীজাতি তাঁহাকে সম্মান দিয়াছিলেন।

১৮২২ খৃঃ ডালটন একবার ফ্রান্সএ যান। থেনাউ, গে-লুজাক, এম্পিয়ার প্রভৃতি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করেন। ডালটন বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেকের গবেষণাস্থান পরিদর্শন করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার একজন সঙ্গী লিখিয়াছেন "গাড়ী হইতে নামিলে অতি সমাদরে আমাদের গ্রহণ করা হয়।……খাবার টেবিলে ডালটনের এক পাশে বসিলেন বার্থোলেট, অপর পার্শ্বে ম্যাডাম লাপ্লাস্।…দুইজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। লাপ্লাস্ ও বার্থোলেট্‌কে সঙ্গে নিয়া তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিতেছেন এ দৃশ্য আমি কখনও ভুলিব না।"

ডালটনের চোখে একটি দোষ ছিল। শুনা যায় একবার, তিনি কেনডেল (Kendall) হইতে মায়ের জন্য একটি চমৎকার মোজা কিনিয়া বাড়ী আসেন। মা ইহা দেখিয়া বলিলেন "বাঃ, সুন্দর মোজাটা তুমি আমার জন্য আনিয়াছ, কিন্তু এ রং তুমি কেন পছন্দ করিলে বলিতে পার? আমি যে ইহা পায়ে দিয়া সভায় যাইতে পারি না।" "কেন মা? ইহা যে লাল চেরীফুলের বর্ণ!" প্রকৃতপক্ষে ডালটনের চোখের দোষে তাঁহার বর্ণ ভুল হইয়াছিল। ডালটন ইহা বুঝিতে পারিয়া 'বর্ণ অন্ধতা' সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন।

১৮২৩ খৃঃ রয়াল সোসাইটী ডালটনকে রয়াল পদক প্রদান করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেন। তারপর ১৮৩৩ খৃঃ সরকার তাহাকে ১৫০ পাউণ্ডের ভাতা দেন, ইহাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৩০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৮৩৪ খৃঃ ইনি বিখ্যাত শিল্পী চেটনির (chetney) নিকটে বসিয়া তাঁহাকে নিজ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে অবসর দেন। ঐ মূর্ত্তি আজও ম্যানচেষ্টার টাউন-হলে বিরাজ করিতেছে।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কাল আমি সুলতান মামুদগজনীর ভারতবিজয় কাহিনী আনসারীর কাব্যে পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল :—

মামুদ ভারতে যে রক্তধারা বইয়েছিলেন তার চিহ্ন আজও দেশ থেকে মুছে যায় নি; ভারতভূমি আজও রক্তরঞ্জিত—ভারতের আকাশ এখনও রক্তিমমেঘে আবৃত। মামুদ গঙ্গাতীরের ও থানেশ্বরের সুন্দর বসতিগুলি ধ্বংস করেছিলেন, কারণ সেগুলি ছিল হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র। তিনি দেবমূর্ত্তিগুলি গজনীর প্রবেশ পথের ধুলায় ছড়িয়ে দিলেন, কারণ দেবতা ছিল ভারতের শৌর্য্যের প্রতীক। * * * * * বিস্তৃত ভূমিতে শত্রুর রক্তধারা আরও কত কাল বয়ে যাবে। যে ভয়ার্ত্তা জননী সন্তানের রক্তে রঞ্জিত যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষদর্শিনী—তিনি নতুন সন্তানের মাতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করবেন। আজও গজনীর উষ্ট্র-পদরেখা রক্তরঞ্জিত, গজনীবাসীর তরবারি রক্তরঞ্জিত।

জ্ঞানীগণ চিন্তান্বিত, নারীকুল শোকার্ত্তা—কে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে?—মানুষের অন্তরে রয়েছে ব্যাঘ্রের হিংস্রবৃত্তি।

১০৬৭ খৃঃ জুন—হাজি আহিরা মাসে সম্রাট শাহাজানাবাদে রোগ-শয্যা গ্রহণ করেন। দ্বিপ্রহর রজনীতে আমি পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলাম, আমার মনে হয় যেন আমার শিবিকা বাহকের পদনিম্নে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হচ্ছিল। নানা চিন্তাস্রোত গঙ্গার মতন বয়ে গেল, মনে হল যেন তৈমুরবংশের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

আমি পিতার শয্যাপার্শ্বে নতজানু হ'য়ে কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করলাম—"পিতার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করব না," কারণ আমার সম্রাট পিতা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়েছিলেন, এমন কি আমার ন্যায় হতভাগিনীদের তিনি ভয় করতেন। তিনি জানতেন তাঁর দুঃসাধ্য রোগের সংবাদে সমস্ত দেশব্যাপী কি বিরাট ঝড় উঠবে। তিনি বল্লেন—"আমার করতল চুম্বন করে দেখো আমার হাতে কি আপেলের সুমিষ্ট গন্ধ আছে?" আমার মাতাকে এক সন্ন্যাসী দুটী অকালপক্ক আপেল উপহার দিয়ে-ছিলেন—সেকথা সম্রাট বিস্মৃত হন নি, সন্ন্যাসী ভবিষ্যৎ বাণী করে-ছিলেন—"হে, জগদাশ্রয়! যেদিন তোমার হাত থেকে এই আপেলের গন্ধ চলে যাবে, সেদিন জানবে, তোমার জীবনশক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসছে।" তারপর পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার কোন পুত্র আমার চাগতাই মুঘলসাম্রাজ্য ধ্বংস করবে?" সন্ন্যাসী উত্তর দিয়ে-ছিলেন—"সে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ।" সে ছিল ঔরঙ্গজেব। যদিও তখন তার বয়স মাত্র দশ বৎসর। সেদিন থেকে সম্রাট তাঁর তৃতীয় পুত্রের প্রতি বিষেষ দৃষ্টি ফেল্‌লেন। ঔরঙ্গজেবকে তিনি বলতেন "শ্বেতসর্প।"

রোগের প্রথম দিন হতেই রাজপ্রাসাদ ত্রিশ সহস্র প্রহরীবেষ্টিত করা হয়। সেই প্রহরী ছিল রাজপুত ; কারণ একমাত্র রাজপুতবাহিনী তাঁর বিশ্বাসের পাত্র ছিল। শাহ্ বুলন্দ ইকবাল দারাই একমাত্র রাজপ্রাসাদে সামান্য অনুচর নিয়ে দিনে দুইবার প্রবেশের অনুমতি পেলেন। প্রতি মুহূর্তে পিতার মৃত্যু আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল। দারা পিতার রোগ সংবাদের বিবৃতি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে শূন্যে নিক্ষিপ্ত বীজের মতন মিথ্যা সংবাদ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল—সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে! দামামার শব্দে যুদ্ধের অশ্ব যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে—তেমনি করে মানুষ যুদ্ধের জন্য তরবারি শাণিত করতে আরম্ভ করল। আমীর ওমরাহ্ সকলেই প্রস্তুত। তস্কর দস্যু সকলেই নিজের স্বার্থ-সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনদিন তিনরাত্রি আমরা উদ্বেগে বিমূঢ় হয়ে রইলাম। সমস্ত বিপণি রুদ্ধদ্বার, দোকানপাট বন্ধ ; গোপন পথে সংবাদ চলাচল চলে।

আমার ভগ্নী রোশেনারা গোপনে বার্ত্তা-প্রেরণে অভ্যস্ত, ঔরঙ্গজেব গোপনবার্ত্তা গ্রহণে সুকৌশলী। আমার অন্য দুটী ভগ্নীও তাদের ভ্রাতাদের কাছে গোপন সংবাদ প্রেরণ করতেন। যে স্ফুলিঙ্গ অন্তঃপুরে ভস্মাচ্ছাদিত ছিল—তা' অগ্নিশিখা হয়ে ফুঠে উঠল ভ্রাতৃবিরোধ রূপে। তাজ বেগমের চার পুত্র যুদ্ধধ্বনি করে উঠল—'ইয়া তক্‌ত ইয়া তাবু ত'। হয় সিংহাসন, নয় মৃত্যু। কিন্তু যুবরাজ দারা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তার কাছে সকলেই বশ্যতা স্বীকার করল।

প্রথমে অভিযান আরম্ভ করল সুজা বাঙ্গালা থেকে। দারার নিপুণ সৈন্যদলের একাংশ সুজার সঙ্গে যোগ দিল। সে সংবাদ রটনা করল—সম্রাট শাহ্‌জাহানকে দারা বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছেন, কিন্তু দারার বীরপুত্র সুলেমান শুকো সুজাকে পরাজিত করল।

পিতা অল্প দিনের মধ্যে রোগমুক্ত হলেন। সমস্ত দরবার দিল্লী থেকে আগ্রা চলে গেল—সমস্ত দেশ যেন জানতে পারে—সম্রাট জীবিত। মুরাদ গুজরাট থেকে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। সুচতুর সুকৌশলী মায়াবী ঔরঙ্গজেব মুরাদকে তার দলে টেনে নিলেন। ঔরঙ্গজেব জানতেন, মুরাদ বীর, সাহসী যোদ্ধা, তাঁরা সমবেত শক্তি নিয়ে দারাকে পরাজিত করবেন স্থির করলেন। দারাকে তাঁরা ঘৃণা করতেন কারণ দারা ইসলাম-বিচ্যুত। দারাকে তাঁরা বিধর্ম্মী "কাফের" আখ্যা দিলেন।

আমি দেখলাম, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন বাঙ্গালা দেশ থেকে সর্পের দল ছুটে চলেছে। সম্রাটের জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যৎ বাণী করলেন—রাজ্যের অমঙ্গল কেটে যাবে, সম্রাট নিরোগ হবেন। আমার কিন্তু মনে হল যে কৃষ্ণ সর্পের মস্তকে যে শ্বেত সর্প বসেছিল সে সর্প স্বয়ং ঔরঙ্গজেব, আজ সেই সর্প শির উত্তোলন করেছে, অন্তরগতিতে তৈমুর বংশের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, কিন্তু কোথায় যাবে? আকাশ-পথে নক্ষত্রের গতি অনুসরণ করে কি তার উত্তর স্থির হবে?

বিদ্রোহের সংবাদ পেলাম আমরা বিলোচপুরে—সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনের পথে। তখন সম্রাট আবার ফিরে চলেছেন রাজধানীর দিকে। সুতরাং আমরা সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে চলেছি।

এবার হতভাগ্য সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনের গতি অতি ত্বরান্বিত হলো। "বিলোচপুর"—এই নামটি তীরের মতন আমাদের বিদ্ধ করল। এইখানে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজকুমার শাহ্‌জাহান তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন।

আকাশে সূর্য্য তীক্ষ্ণ কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে, আমরা রাজপথের পার্শ্বস্থিত দীর্ঘ বিটপীশ্রেণীর আচ্ছাদনের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমি পিতার পার্শ্বে বিরাট শকটের অভ্যন্তরে বসে আছি, এই শকটখানি ইউরোপ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ পেয়েছিলেন। ক্রোশের পর ক্রোশ পথ চলেছি—নীরবে। শাহ্‌জানাবাদ ত্যাগ করে মনে হল যেন আমরা পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করছি।

আমি আমার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম—এ যে আমার যৌবনে প্রত্যাবর্ত্তন করার মতন। আমার বিশ্বাস হয়েছিল, যেন দুলেরা রাজধানীতে ফিরে এসেছেন; আওরঙ্গজেবের শিবির থেকে তাঁর পুরাতন পদে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। এই কয়েক বৎসরের ঘৃণা, হতাশা, বিস্মৃতির ব্যবধানে ফিরোজশাহ্ পরিখা তীরসংলগ্ন বনশাখার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত অস্ত-সূর্য্যের কিরণ আমাকে খুব অভিভূত করেছিল। সেখানে আমার মনে হল যেন সব জিনিষই যেমনটি ছিল তেমনটি আছে—যেন কোন কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নি।

মধ্যপথে একটী মর্ম্মর কূপের পার্শ্বে এসে আমাদের বাহিনী বিশ্রাম নিল। আমাদের শ্বেত অশ্বচতুষ্টয়কে স্নান করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সমরখন্দের তরমুজ আহার করলাম, আমার সুরাপাত্র থেকে সরাব পান করলাম। তারপর পিতা খুব দ্রুত শকট পরিচালনার জন্য আদেশ দিলেন।

পিতা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এই প্রথম অনুভব করলাম, পিতা কত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর স্বর্ণগোলাপখচিত রাজভূষণের মধ্যে তিনি যেন কুঞ্চিত হয়ে পড়েছেন—তাঁর পরিচ্ছদে সরাবের ধারা বয়ে পড়েছিল। সম্রাটের আকৃতিতে তাঁর প্রথম জীবনের পৌরুষের চিহ্ন মাত্র ছিল না। তাঁর বিশ্ববিজয়ী চক্ষুর জ্যোতি ম্লান হয়ে গেছে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বুঝলাম যে, এক বিরাট অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়ে গেছে।

সম্রাট মীরজুমলার কথা বলছিলেন—তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল। এই পারস্য-সন্তানকেই না সম্রাট রাজসম্মানে বিভূষিত করেছিলেন, মুয়াজ্জম খাঁন উপাধি মণ্ডিত করেছিলেন? তাঁর আশা ছিল যে হিন্দুস্থানের জন্য কান্দাহার জয় করবেন। আজ সেই মীরজুমলাই সম্রাটকে প্রবঞ্চনা করেছে। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতন কিছু ছিল না। আমরা যতই দিল্লীর পথে অগ্রসর হচ্ছি, আমার মন ততই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল।

এই মীরজুমলাই একদিন গোলকুণ্ডার পথে পাদুকা বিক্রয় করেছিল, তারপর সে অর্জ্জন করল অর্থ ও শক্তি; লাভ হল গোলকুণ্ডার উজিরের আসন, শেষে পেল ঔরঙ্গজেবের বন্ধুত্ব। একদিন মীরজুমলা

গোলকুণ্ডার রাজমহিষীকে বিপথচারিণী করল, রাজা তাঁকে কারাগারে বন্দী করবার উত্তোগ করলেন। মীরজুমলা ঔরঙ্গজেবের সাহায্য প্রার্থনা করল। ঔরঙ্গজেব সাহায্য কর্ত্তে এসে লুণ্ঠন করলেন রাজধানী, সেখানে করলেন প্রাচীন রাজবংশের সমাধির রত্ন অপহরণ। এই করেই ত ঔরঙ্গজেবের শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হল।

আমি বারম্বার সম্রাটকে মীরজুমলার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম। আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম মীরজুমলার বিরুদ্ধে। একদিন ছিল, যখন সম্রাট শাহজাহান আমার পরামর্শ শুনতেন—যেমন শুনতেন আমার মায়ের কথা। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি দূরে সরে গেলেন আমার কাছ থেকে—মার কাছ থেকেও……

আমরা বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করলাম—বাদশাহ, আপনার মনে পড়ে কি ?—আমি ও দারা আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম—ঔরঙ্গজেবকে গোলকুণ্ডা থেকে ফিরিয়ে আনুন—যেন সে খুব শক্তিশালী হয়ে না পড়ে? আপনার মনে পড়ে কি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীতে মীরজুমলা আপনাকে একখণ্ড হীরক উপহার দিয়ে বলেছিল—কান্দাহারের রাজকোষে সে হীরকখণ্ডের সমতুল্য কোন হীরক নেই। যদি মীরজুমলাকে একদল বাদশাহের সৈন্ত দিয়ে সাহায্য করা হয় তবে সে বিজাপুর গোলকুণ্ডা সিংহল করমণ্ডল প্রদেশ জয় করে অগণিত হীরক বাদশাহকে উপহার দিতে পারবে। তারপর আবার মীরজুমলা একমুষ্টি প্রস্তর সম্রাটকে উপহার দিয়েছিল। সম্রাট মীরজুমলার অধীনে সৈন্তের ব্যবস্থা করলেন। আমি আর দারা কত নিষেধ করেছিলাম। আজ সেই সৈন্তের সঙ্গে মীরজুমলা ঔরঙ্গজেবের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছে। পিতা, সে কথা মনে পড়ে কি ? সম্রাট একটু অবহিত হয়ে বসলেন। মনে হল যেন, তিনি অসংখ্য রাজমুকুটের আলোয় মণ্ডিত হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করে আছেন, সে আলোর দীপ্তি তৈমুরের রাজ্যের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। আমার মনে হল, সম্রাট শাহজাহান তাঁর রাজদণ্ড নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসন করছেন। তারপর মুহূর্ত্তের জন্ত সম্রাট নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন—আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করলাম, সম্রাটের উপর পুনরায় আমার অধিকার ফিরে পেতে হবে। আমি আবার বলে উঠলাম :—ফকির ঔরঙ্গজেব এমন লোক নয় যে, বাহিরাভরণের চাকচিক্য দ্বারা মুগ্ধ হবে, আপনার মনে আছে ঔরঙ্গজেব কি উপায়ে তার দরবেশী বন্ধুদের ১লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছিল। একবার ঔরঙ্গজেব বলেছিল তাদের কাছে কিছু মুক্তা খরিদ করবে। কিন্তু তার ওস্তাদ সেখ মীর বক্স বলেছিল—এই মুক্তা অপেক্ষা আরও বৃহৎ মুক্তা আছে হিন্দুস্থানে। যদি সেই মুক্তা লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে এই অর্থ দিয়ে সৈন্ত সংগ্রহ কর, তাতে বৃহৎ মুক্তাখণ্ড তোমার করে এসে পড়বে। ঔরঙ্গজেব তাই করেছিলেন। সেই সৈন্ত দিয়ে আমার সুরাট বন্দর অধিকার করেছে। আগ্রার আমাদের মণিমুক্তার প্রয়োজন নাই—আমরা চাই রক্ত মাংস—সৈন্ত অশ্ব।

এবার আমি নীরব হলাম—আমার ভয় হল, আমার স্বর আবেগে কাঁপছে। পিতা আমার দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর স্নেহবৃত্তি কি কুব্জ হ'য়ে গেছে ? তাঁর নয়নে কি সন্তান বাৎসল্য ফুটে উঠছে ? যেমনটি ফুটে উঠত আমার শৈশবে—যখন খেলতে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম ?

পিতা বল্লেন—"কন্তা জাহানারা। তোমার কি মনে নাই—কে আমাকে অনুরোধ করেছিল ঔরঙ্গজেবকে ক্ষমা করতে, তাকে গুজরাট থেকে দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়ে নিতে। সেই দাক্ষিণাত্যেই ত সে আজ সৈন্ত সমাবেশ করেছে।" আমার কপালে পিতা তাঁর উত্তপ্ত করতল বুলিয়ে দিলেন। পিতা বলে চল্লেন—"তোমার মনে পড়ে ? কতবার তোমায় সাবধান করেছিলাম—বেশী বিশ্বাস করো না। আপাতঃদৃষ্টিতে সাপ খুব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে সাপ বিষ বয়ে বেড়ায়। জন্মের ছয়দিন পরে দারার ললাটে আমি দুর্ভাগ্যের চিহ্ন দেখেছিলাম—কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ললাটে ছিল জয়তিলক—অদৃষ্টের আবরণ যদি কালো সুতো দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে, সমস্ত জলাশয়ের জলধারা তাকে শুভ্র করে দিতে পারে না।" অবনমিত হয়ে আমি পিতার হস্তচুম্বন করলাম। পিতার অভিযোগ যথার্থই সত্য ? কতবার আমি আর দারা ঔরঙ্গজেবের পত্র দ্বারা বিভ্রান্ত হ'য়েছি। পত্রে সে কি ভীষণ প্রবঞ্চনা ছিল—তা বুঝতে পারিনি। কতবার পিতার কাছে ঔরঙ্গজেবকে সমর্থন করে ক্ষমা-প্রার্থনা করেছি।

আমরা বাকশক্তি হারিয়ে ফেল্লাম। আজ মনে হচ্ছে যেন অদ্ভুত গৌরবর্ণ কৃষ্ণচক্ষু রাজকুমার ঔরঙ্গজেব আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—যেমন আসে ব্যাঘ্র লোলুপদৃষ্টিতে শীকারের দিকে। সে কি তৈমুর-বংশের শেষ সন্তানকে আক্রমণ করবার জন্ত অগ্রসর হচ্ছে ? কিন্তু, রাজদণ্ড ত শাহজাহানের হস্তচ্যুত হয়নি।

আমরা আগ্রার অদূরবর্ত্তী সেকেন্দ্রায় প্রবেশ করেছি। পিতা ও আমি—আমরা দু'জনমাত্র সেই বিরাট প্রাচীরের সুবিশাল তোরণ অতিক্রম করলাম। সেখানে আকবর সমাধিতে বিশ্রাম করছেন। আজকের মতন কখনো এই সমাধির শুচিতা আমাকে অভিভূত করেনি। রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত অতুলনীয় বিরাট প্রাসাদের সম্মুখে আমরা নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানালাম। আমি কিন্তু আমার মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করলাম—সেই ছিল সম্রাটের সভার অনুশাসন, তারপর আমরা সমাধির শিলাতলে আরোহণ করলাম। সমাধির চতুষ্পার্শ্বে ছিল বিভিন্ন দিকে প্রসারিত তোরণশ্রেণী, আর বিচিত্র কারুকার্য্যময় মর্ম্মরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র প্রাচীর বেষ্টিত শিবির।

এখানে কোন মানুষ ভারাক্রান্ত নয়, এখানে কোন অত্যাচার নাই। এখানে মানুষ স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নেয়, যতগুলি মানব আত্মা ততগুলি পথ ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে—এই সত্য উপলব্ধি করেছিলাম সেকেন্দ্রার প্রাসাদে।

সম্রাট আকবরের কি অভিলাষ ছিল তাঁর মৃত্যুর পর দীন-ই-ইলাহী সম্প্রদায়ের লোক এখানে এসে সম্মেলিত হবে ? সম্রাট আকবর তাঁর পাঁচমহল সমাধি নির্ম্মাণ করবার সময় কি সম্রাট অশোকের কথা ভেবেছিলেন ? সম্রাট অশোক সুচারু কারুকার্য্যমণ্ডিত বিরাট মন্দিরোপম বৌদ্ধমঠে তাঁর সংঘারামের শ্রমণদের আহ্বান করতেন।

সেখানে সহস্র সহস্র সংযত্রাতা মক্ষিকার মতন প্রকৃতির মধুচক্র থেকে জ্ঞান আহরণ করেন।

আমার সম্রাট পিতা ক্রমশঃ চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন—তোরণের পাশে ইতঃস্তত পদচারণা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি কি তাঁর পিতামহের স্নেহের কথা স্মরণ করলেন? সম্রাট আকবরের মৃত্যুশয্যায় ষড়যন্ত্রের আবর্ত্তে বিদ্রোহী পুত্র সেলিম তাঁর পিতার সম্মুখে উপস্থিত হতে সাহস করেন নি; কারণ তিনি পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

সেই সময় শাহজাহান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যতদিন সম্রাট আকবর জীবিত থাকবেন ততদিন সম্রাটকে ত্যাগ করবেন না। সম্রাট শাহজাহানের কি স্মরণে উদয় হচ্ছিল যে, এই সমাধিতে শায়িত মহাপুরুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন—এই শিশুই ভবিষ্যতে এক বিরাট ব্রত উদ্‌যাপন করবেন।

আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি, আমি উপরের তলে চলে গেলাম—সে তলটী ছিল সম্পূর্ণ শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত। সম্রাট আকবরের সমাধি প্রকোষ্ঠ ছিল প্রস্তর নির্ম্মিত জালের আবেষ্টনীবদ্ধ; দূর থেকে মনে হয় যেন সারিবদ্ধ গবাক্ষের সমাবেশ। গবাক্ষ মধ্য দিয়ে উদ্যানের সবুজ তৃণগুচ্ছ মানুষের দৃষ্টি পথে ধরা দেয়। স্বর্ণমণ্ডিত সমাধির গম্বুজটী আকাশের মতই গোলাকৃতি, শ্বেতমর্ম্মর, পুষ্প, কৃষ্ণমণি রেখাঙ্কিত শবাধারটী দিবসে সূর্য্য কিরণে এবং নিশীথে চন্দ্রালোকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে। নিম্নতলে একটী গহ্বরে শুভ্র মর্ম্মর শবাধারে শায়িত রয়েছেন হিন্দুস্থানের সর্ব্বশেষবীর। উদীয়মান সূর্য্যের দিকে রক্ষিত তাঁর মুখমণ্ডল। প্রাচীর গাত্রের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে স্ফুরিত সূর্য্যালোক তাঁকে উদ্ভাসিত করে তুলছিল।

সেই শুভ্র শবাধারের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে আমি প্রণাম করলাম—আমার নয়ন থেকে ঝরে পড়ছিল তপ্ত অশ্রুবিন্দু মর্ম্মর গোলাপের উপরে। আমি যদি প্রাচীন ঋষিদের মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হতে পারতাম—আমার প্রার্থনা দ্বারা যদি আমি সেই বিরাট পুরুষকে পুনর্জীবন দিতে পারতাম,—তিনি আবার ভারতবর্ষকে অন্ধকার বিমুক্ত করে দিতেন। আমার মনে হল—তিনি সেই প্রস্তর সমাধি ভেদ করে তাঁর বক্ষ উত্তোলন করলেন—তাঁর প্রস্তরখণ্ড বিচূর্ণ হয়ে গেল। তিনি আর্ত্তনাদ করে উঠলেন:—

"আমার সাম্রাজ্যকে চিরন্তন করে দাও—" (ক্রমশঃ)

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

২৪

গণসমিতির হস্তে আমাদের পণ্য কপিষায় সমাবর্ত্তিত সার্থবাহ ও বণিক-গণের মধ্যে বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত হইবার পক্ষান্তের মধ্যেই আমাদের পণ্য-সম্ভার বিক্রীত হইয়া গেল। এইরূপ সত্বর বিক্রয় হেতু আমাদিগকে কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই, বরং আমরা ইহাতে আশাতীত লাভবান হইলাম। প্রতীচ্য হইতে সমাগত বণিক ও সার্থবাহ-গণ আমাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিলেন। আমাদের পণ্যবাহী নৌকাগুলি সম্ভারমুক্ত হইয়া পুরুষপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। ইহাদের সহিত আমাদের অবস্থানের জন্য নৌকাখানিও ফিরিয়া যাইবে এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু আমাদের বাহ্লিকাভিযানের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া নৌকাগুলিকে কপিষার পোতে রাখিতে হইল। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন নৌকর্ম্মীকে নিযুক্ত করিয়া নৌকা-গুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের আদেশ প্রদান করিলাম। বাহ্লিকের অভিযানে আমাদিগকে বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে—সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট, ক্ষুদ্রস্রোতবাহী উপত্যকা প্রদেশ ও উচ্চ অধিত্যকা পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তদুপযোগী যান বাহনের এখনও পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। বাহ্লিকাভিযাত্রী সার্থবাহগণের মধ্যেও অভিযানারম্ভের ব্যবস্থার এখনও শেষ হয় নাই। প্রতীচ্য হইতে এখনও বণিক ও সার্থবাহগণের সমাগম হইতেছে। কপিষার বিপণী সমূহে, সার্থবাহ ও বণিক বীথিতে ক্রয়-বিক্রয় এখনও মন্দীভূত হয় নাই। এখানকার বীথিতে বাণিজ্য স্লথ না হইলে অন্যত্র অভিযান গণ-সমিতির মতে অবিধেয়। অতএব বাহ্লিকাভিযানের জন্য আয়োজনানুষ্ঠানের এখনও বিলম্ব হইবে। অন্ততঃ প্রতীচ্য হইতে সমাগত বণিক ও সার্থবাহগণের অভাব পূর্ণ হইয়া তাহাদের স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন সূচীত না হওয়া অবধি কফেনসের বাণিজ্য স্লথ হইবার সম্ভাবনা নাই।—সুতরাং অন্যত্র অভিযানের চিন্তা আপাততঃ গণ-সমিতির নায়কদিগের মনে স্থান পাইবে না। গণ-সমিতি হইতে বাহিরে আসিয়া স্বতন্ত্রভাবে জন-কয়েক অনুচর মাত্র সঙ্গে লইয়া, বিশেষতঃ প্রভূত অর্থসহ বাহ্লিকগমন কোনও প্রকারেই নিরাপদ নহে।—তাহার পর এই অভিযানের জন্য পার্ব্বত্য পথে গমনাগমনে অত্যন্ত অশ্ব ও অশ্বতর কিংবা উষ্ট্রের প্রয়োজন;—আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আম্বরীর অধিত্যকা প্রদেশ হইতে প্রতিবৎসর এই সময়ে কফেনসের বীথিতে একদল অশ্বপাল, অশ্ব ও অশ্বতর লইয়া বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে অতীত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও তাহারা আসিবে—না আসিবার

কোনও কারণে এ পর্য্যন্ত উদ্ভব হয় নাই। তাহাদের আগমনের এখনও বিলম্ব আছে। ইহাদের অশ্ব ও অশ্বতর সযত্ন পালিত, সবল ও সুশিক্ষিত। অভিযানোপযোগী আমাদের ব্যবহার্য্য অশ্ব ও অশ্বতর আমরা ইহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিব এইরূপ স্থির করিয়াছি। সুবর্ণবিহারের মহাস্থবির বলিলেন, তাহারা প্রতিবৎসরই আসিয়া থাকে—এ বৎসরও আসিবে এবং আমাদের ও সার্থবাহগণের বাহ্লিকাভিযানের পূর্ব্বেই যে তাহারা কপিষায় সমাগত হইবে তাহা সুনিশ্চিত; কারণ পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমনের জন্ম তাহাদের আনীত বহু অশ্ব ও অশ্বতর ক্রীত হইয়া থাকে—অভিযাত্রী বণিক ও সার্থবাহগণ সকলেই অবগত আছে যে ইহাদের আনীত অশ্ব ও অশ্বতর সকল পার্ব্বত্য বন্ধুর পথে যাতায়াতে অভ্যস্ত এবং অধিত্যকা ও উপত্যকায় আরোহণ ও অবরোহণে সুশিক্ষিত।

এই অশ্বপালগণের আগমন প্রতীক্ষায় ও গণ-সমিতির অভিযানারোহণানুষ্ঠান অবধি আমাদের নৌকাগুলির প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইবে না; কারণ, প্রকল্পিত অভিযানের প্রারম্ভ অবধি আমাদিগের সতর্কতার সহিত ও সশস্ত্র হইয়া এই সুরক্ষিত পোতাশ্রয়েই অবস্থান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আমাদের হস্তে এখন প্রচুর অর্থ; উহা লইয়া নগরীতে, অপরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থিতি সুবিবেচিত ও নিরাপদ হইবে না।

সপ্তাহান্তে—আসুর ও মিডিয়া দেশ এবং কস্তপ সাগর তীরের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে, বহু অশ্ব ও অশ্বতরসহ অশ্ব ব্যবসায়ীগণ কফেনসের বাণিজ্যকেন্দ্রে সমাগত হইল। পিতার সহিত যে সকল বাণিজ্য অভিযানে আমি পূর্ব্বে প্রতীচ্যে আসিয়াছিলাম তাহাতে ইহাদের সহিত আমার বিশেষরূপে পরিচিত হইবার সুযোগ হয় নাই ও তাহার আবশ্যকও অনুভব করি নাই। পূর্ব্বে যতবার আমি পিতার সহিত আসিয়াছিলাম, আমরা পুরুষপুর হইতে আমাদের যানবাহন—অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও বলীবর্দ্ধ আনয়ন করিয়াছিলাম; ইহারা আমাদের পণ্যসম্ভার পণ্টস্ অবধি বহন করিয়াছিল। এবার বাহ্লিকের পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনের জন্ম পুরুষপুর হইতে যানবাহন আনয়নের সুবিধা হয় নাই। কপিষায় পোতাশ্রয়ে তাহার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় অভিযানের প্রারম্ভ হইতেই আমাদের ছিল। পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম এবং যে কয়বার ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমি প্রতীচ্যে আসিয়াছিলাম, তাহাতে আমারও ধারণা ছিল যে বাহ্লিক যাত্রার জন্ম যানবাহনের সুবিধা ও সুব্যবস্থা কপিষা পোতাশ্রয় হইতেই হইবে। আমি জানি যে প্রতিবৎসর এই সময়ে আসুরীয় অধিত্যকা প্রদেশ হইতে অশ্বপালগণ, বহু অশ্ব ও অশ্বতর বিক্রয়ের জন্ম কপিষায় আনয়ন করিয়া থাকে; আমাদের নিকট অর্থেরও অভাব নাই; অতএব প্রয়োজনীয় যানবাহনের জন্ম কোনওপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, তাহা সুনিশ্চয়।

এই নবাগত বণিকবাহিনীর সকলেই দেখিতে অতি সুশ্রী ও সুপুরুষ। সকলেরই দেহ সবল ও সুগঠিত। ইহাদের ললাট প্রশস্ত ও সমুন্নত। আয়ত ও সমুজ্জল চক্ষু, তন্মধ্যে শরতের মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় নীলাভ অক্ষিতারকা। সুবিস্তৃত গণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সুগঠিত এবং উন্নত ও ঈষৎ বক্রাগ্র নাসিকা। ইহাদের কেশ তরঙ্গায়িত ও স্বর্ণাভ পিঙ্গল। গুম্ফ শ্মশ্রু পরিশোভিত সুদৃশ্য ও সুসংযত রক্তাভ অধরোষ্ঠ এবং ইহাদের দেহকান্তি হেমাভ গৌর।

পিতার সহিত পূর্ব্বে যখন বাণিজ্যাভিযানে আসিয়াছিলাম, তখন একবার ঘটনার সমাবেশে, এই সকল অশ্বপালগণের মধ্যে জনকয়েকের সহিত আমার আলাপ হইবার সুবিধা হইয়াছিল। ইহারা গন্ধার পুরুষপুরবাসী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং তাহাদিগেরই ন্যায় ইহারা সুরীয়স্ বা সূর্য্য, ইন্দ্র, নাসত্য ও বরুণের উপাসক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অপর কোনও দেবতার স্থান ইহাদের সুরলোকে আছে কিনা তাহা আমি অবগত নহি। ইহাদের ভাষা সুমিষ্ট ও গন্ধারবাসীর নিকট একেবারে দুর্ব্বোধ্য নহে—অনেকগুলি শব্দের প্রয়োগ একই অর্থে উভয় ভাষাতেই দৃষ্ট হয়।

ইহাদের কপিষায় আগমন সংবাদ আমরা শ্রমণ মঞ্জুকান্তির নিকট প্রাপ্ত হইলাম। সুবর্ণবিহারের মহাস্থবির শ্রমণকে এই বার্ত্তা আমাদিগকে জানাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমরা অশ্বপালগণের নেতার নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিলাম যে আমরা নিজেদের ব্যবহারের জন্ম ও দূর পার্ব্বত্য পথে গমনের উদ্দেশ্যে কয়েকটী সবল ও কর্ম্মঠ অশ্ব এবং আমাদের তৈজস ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহনের জন্ম, কয়েকটি অশ্বতর ক্রয়েচ্ছু। তজ্জন্ম আমরা জনৈক অশ্ব ও অশ্বতর বিক্রেতার সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করিতে চাহি। শ্রমণ মঞ্জুকান্তি বিহারে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অশ্বপালগণের অভিযান-নায়ককে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের এই বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

পরদিবস প্রাতে একজন বিরল-শ্মশ্রু কিশোর-বয়স্ক অশ্বপাল আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। তাহার দীর্ঘাকার, সৌম্য, সুগঠিত, সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ বাস্তবিক নয়নানন্দকর। তাহার অপরিস্ফুট যৌবনসুষমা নবোদ্গত কিশলয়ের ন্যায়, তাহার দেহকান্তিকে এক ললিত সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল।

সে আসিয়া পুরুষপুর হইতে আগত থেওডোটস্ ও সফোনিডস্ যবন সার্থবাহদ্বয়ের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমাদের নৌকার সম্মুখে আসিয়া আমাদের অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি আনন্দকে দিয়া তাহাকে আমাদের নৌকায় ডাকিয়া আনিলাম ও আমাদের নিকট বসাইয়া প্রজ্ঞা ও আমি তাহার সহিত, তাহাদের বিক্রেয় অশ্ব ও অশ্বতর সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সে আমাদের প্রয়োজন অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কতদূরে ও কোথায় যাইবেন জানিতে পারি কি?"

আমি বলিলাম, "বাহ্লিক নগরীতে।"

—সে আর বেশী দূর কি? তবে, পথ বন্ধুর বটে। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যে যবন সার্থবাহদ্বয়ের সন্ধানে আসিয়াছি—আপনারাই কি সেই থেওডোটস্ ও সফোনিডস্—আপনারাই কি পুরুষপুর হইতে আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন।" আমি প্রজ্ঞাকে দেখাইয়া বলিলাম, "ইনি সকেনিডস্ এবং আমি থেওডোটস্ নামে পরিচিত।"

অশ্বপাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কিরূপ অশ্ব বা অশ্বতর আপনাদের প্রয়োজন মনে করেন?"

আমি বলিলাম, "আমাদের আবশ্যক কয়েকটি সবল, পার্ব্বত্য পথে গমনে অভ্যস্ত ও কর্ম্মঠ অশ্ব ও অশ্বতর।"

—বেশ; আপনারা, আপনাদের অনুচরসহ, আমাদের এখানকার অশ্বশালায় আগমন করিয়া, আপনাদের আবশ্যক মত অশ্ব ও অশ্বতর পরীক্ষা পূর্ব্বক মনোনয়ন করিয়া লউন। আমার সহিত আমাদের অশ্বশালায় এখন আসিতে পারিবেন কি?"

প্রজ্ঞা ও আমি পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিতেছি যে আমাদের কখন যাইবার সুবিধা হইবে এবং কয়টি অশ্ব ও অশ্বতর আমাদের আবশ্যক, তখন অশ্বপাল আমাদিগকে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আপনাদের অশ্ব ও অশ্বতরের প্রয়োজন চিরদিনের ব্যবহারের জন্য—না, কেবল বাহ্লিকে উপনীত হইবার জন্য?—সে কয়েক দিবসের কথা।—যদি মাত্র কিয়দ্দিবসের জন্যই হয় তাহা হইলে ভাড়াও পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে আপনাদের কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না—বরং ইহাতে সুবিধাই আছে।—প্রতি অশ্ব ও অশ্বতরের পরিচর্য্যার জন্য আমরা একজন করিয়া পরিচারক দিব—তজ্জন্য আমরা স্বতন্ত্রভাবে কোনও অর্থ গ্রহণ করিব না।—আপনারা অশ্ব ও অশ্বতর সম্বন্ধে আপনাদের বিবেচনা ও অভিপ্রায় মত ব্যবস্থা করিবেন।—এখন অশ্বশালায় আগমন করিয়া, অশ্ব ও অশ্বতর পরীক্ষা পূর্ব্বক, মনোনয়ন করিয়া লউন।"

প্রজ্ঞা ও আমি পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম যে অশ্বপালের শেষোক্ত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য এবং কিঞ্চিৎ অর্থদান পূর্ব্বক পরিচারকসহ অশ্ব ও অশ্বতর অভিযানকালব্যাপী ব্যবহার ব্যপদেশে ঋণ গ্রহণই শ্রেয়স্কর।

আমি বলিলাম, "বেশ—আমরা বাহ্লিকে উপনীত হওয়া অবধি পরিচারকসহ অশ্ব ও অশ্বতর ঋণ গ্রহণ করিয়া অভিযান কার্য্যসমাধা করিব—এইরূপই স্থির করিলাম।—এখন, চলুন, আপনার অশ্বশালায় গমনপূর্ব্বক, ঋণগ্রহণযোগ্য অশ্ব ও অশ্বতর মনোনয়ন করিয়া আসি।"

বাহন পরিদর্শন ও নির্ব্বাচন মানসে এবং অভিযানকালব্যাপী তাহাদের সম্যক্ ব্যবহার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ইহারা আমাদিগের নিকট গ্রহণ করিবে তাহা নির্দ্ধারণোদ্দেশ্যে, আমরা উভয়ে অশ্বপালের সহ গমন করিলাম। আমাদিগের প্রস্তাব সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বপালকে দেয় অর্থের কিয়দংশ অগ্রে প্রদান করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে লইয়া চলিলাম। তরুণ অশ্বপাল আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একজন প্রধান ব্যক্তির নিকট গেল। ইনি অশ্বপালগণের অভিযান-নায়ক। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রয়োজন বিজ্ঞাপিত করিলাম। তিনি আমাদের আবশ্যকমত কয়েকটি পার্ব্বত্য পথে গমনযোগ্য কর্ম্মঠ, ও বলিষ্ঠ অশ্ব ও অশ্বতর, পরিচারকসহ—আমাদের বাহ্লিকে উপনীত হওয়া অবধি ব্যবহারের জন্য, ঋণ প্রদানে স্বীকৃত হইলেন এবং আমাদিগকে অশ্ব ও অশ্বতর মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা কতকটা তাঁহার মতানুযায়ী এবং কতকটা আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে চারিটি অশ্ব ও চারিটি অশ্বতর মনোনয়ন করিলাম। স্থির হইল যে আমাদিগকে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সহস্র আথেনীয় সুবর্ণ দ্রাক্‌ম্ প্রদান করিতে হইবে এবং আরও স্থির হইল যে সমুদয় দেয় অর্থ অভিযানের পূর্ব্বে পরিশোধ করিতে হইবে আমরা এইরূপ ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক ইহা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বপালগণের নায়কের হস্তে অগ্রে সহস্র সুবর্ণ দ্রাক্‌ম্ প্রদান করিলাম এবং কথা রহিল যে অভিযান দিবসের প্রাতঃকালে অবশিষ্ট একাদশ সহস্র দ্রাক্‌ম্ প্রদত্ত হইবে। এই অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণের জন্য অশ্বপালগণের নায়ক আমাদের নৌকায় আগমন করিবেন ও তথায় তিনি আমাদিগের নিকট হইতে অভিযান সম্বন্ধে সকল প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ পাইবেন। তিনি আগামী দিবসত্রয়ের মধ্যে একদিন প্রাতঃকালে আমাদের নৌকায় আসিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক অভিযান বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশসমূহ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অশ্বপালগণকে আমাদিগের নির্ব্বাচিত অশ্ব ও অশ্বতর মসীদ্বারা চিহ্নিত করিয়া অশ্বশালায় স্বতন্ত্র স্থানে রক্ষার আদেশ প্রদান করিলেন।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে
অশ্ব ও অশ্বতর নির্ব্বাচন
নামক চতুর্ব্বিংশতি
বিবৃতি

(ক্রমশঃ)

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সুতপার সঙ্গে পরিচয়টা হল এই ভাবেই। কিন্তু পরিণতি যা ঘটল বিস্ময়কর।

একটু একটু করে কী ভাবে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল সেটা মনে পড়ে না। কিন্তু একটা জিনিস বেশ মনে আছে, দেখা হলেই ঠোকাঠুকি বাধত। রঞ্জুকে খোঁচা দিয়ে একটা আশ্চর্য কৌতুক বোধ করত সুতপা।

—কবিরা ভয়ঙ্কর মিথ্যেবাদী।

রঞ্জু ক্যাঁচ করে উঠত : কিসে বুঝলেন ?

—অত সাজিয়ে কথা বলা দেখে। ছন্দ দিয়ে যারা কথা গুছিয়ে তোলে, সত্যের চাইতে গোছানোর দিকেই তাদের নজর থাকে বেশি। অমাবস্যার ঘুটঘুটে আঁধার রাত্তিরে তারা পূর্ণিমা নিয়ে কবিতা লেখে।

—আপনার তো হিংসে হবেই। সম্পাদকেরা লেখা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা।

সুতপা হেসে উঠত। ধারালো ঝকঝকে হাসি।

—তর্ক করতে গিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ ? এটা বে-আইনি।

—বা রে, আপনি যা তা বলবেন তাই বলে ?

আর একদিন।

সুতপা বলে বসল, আপনি কয় মণ ওজন তুলতে পারেন ? বিশ মণ ?

—পাগল নাকি ? কোনো মানুষে তা পারে !

—আপনি পারেন—কবিরা নিশ্চয় পারে।

আক্রমণের গতিটা বুঝতে না পেরে বিস্মিতদৃষ্টিতে রঞ্জু তাকিয়ে রইল : তার মানে ?

—মানে, পরিমল এসেছিল।

—তবু কিছু বোঝা গেল না।

—বোঝা গেল না, না ?—মুখ টিপে টিপে তীক্ষ্ণ হাসি হাসল সুতপা : পরিমল এসে একেবারে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। বললে, রঞ্জু যা একটা কবিতা লিখেছে তা একেবারে প্রলয়ঙ্কর।

মনে মনে পরিমলের ওপর অত্যন্ত চটে গিয়ে বিব্রতমুখে রঞ্জু বললে, যাঃ।

—যাঃ ? তবে এই লাইনগুলো কার ?

'হিমালয় ধরে দেব নাড়াচাড়া, সাগরে তুলব ঘোর তুফান ?'

রঞ্জু রাঙা হয়ে গেল।

সুতপা সকৌতুকে বললে, হিমালয় ধরে যে নাড়াচাড়া দিতে চায় সে বিশ পঁচিশ মণ ওজন তুলতে পারবেনা ?

—বাঃ, ওটা যে কবিতা।

—ওই জন্যেই তো বলছিলাম কবিরা মিথ্যেবাদী।

—কী আশ্চর্য, আপনি—মানে—কী আশ্চর্য—অস্বস্তির আর সীমা রইলনা। এমনভাবে যে লোক কবিতার ব্যাখ্যা করে-তার সঙ্গে তর্ক চলবে কী উপায়ে। একেবারেই অরসিকেষু।

তবু তর্ক চলত। রাগ হয়ে যেত, ভালো লাগত তবু। মিতা নয়, করুণাদি নয়—এ একেবারে আলাদা জাতের মেয়ে। মিতার কাছে গেলে কেমন নার্ভাস হয়ে যেতে হয়, করুণাদির প্রভাব মনকে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে ফেলে। কিন্তু সুতপার কাছে এক ধরণের সমধর্মিতা মেলে—কোথায় যেন খুঁজে পাওয়া যায় মানসিক সংযোগ।

কিন্তু একটা জিনিস মাঝে মাঝে ভারী খারাপ লাগে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় সুতপা। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়। মুখের ওপর স্তব্ধ মেঘাচ্ছন্নতার মতো কী একটা আসে ঘনিয়ে, চোখ দুটো কোথায় যেন তলিয়ে যায় তার। মনে হয় আপাতত তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সে হারিয়ে গেছে কোনো একটা অতলান্ত সমুদ্রের গভীরে, সরে গেছে কোনো এক দুর্লক্ষ্য নীহারিকার আলোক-লোকে। মুখের একপাশে পড়া লণ্ঠনের আলোয় কেমন অসমাপ্ত, খণ্ডিত দেখাচ্ছে তাকে—তার সম্পূর্ণ সত্তাটা চলে গেছে রঞ্জুর বোধের বাইরে, তার বিচারের সীমারেখা পার হয়ে।

আর তখনি উঠে পড়ে সে। তখনি মনে পড়ে সুতপার মুহূর্তগুলোতে এখানে তার প্রবেশ নিষেধ—সে একান্তভাবে অনধিকারী। বলে, আচ্ছা, তবে আমি আজ চলি—

সুতপা জবাব দেয়না—শুধু মাথা নাড়ে। নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যায় রঞ্জু। বুঝতে পারেনা যে এত উজ্জ্বল, এত সহজ—হঠাৎ তার ভেতরে এমনভাবে কিসের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। কোনখান থেকে আসে রাহু—সূর্যের আলোকে আড়াল করে দেয় একটা কালো আবরণ বিছিয়ে দিয়ে ?

মন এলোমেলো ভাবনার জাল বুনতে চায়।

কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল একদিন।

সুতপা একটা বই পড়তে চেয়েছিল ওর কাছে। বইটা জোগাড় করে নিয়ে দুপুরের দিকে এল রঞ্জু।

রোদে ভরা বাড়িটায় স্তব্ধতা। সুতপার দাদা অবনী রায় অফিসে বেরিয়ে গেছেন। অবনী ওদের দলের উৎসাহী কর্মী। বাড়িতে এক বিধবা মাসী থাকেন, তিনি কিছু দেখেও দেখেননা। তাই নানাকারণে এ বাড়িতেই জরুরি সভাসমিতিগুলো বসত।

মাসিমা বারান্দায় বসে টাকুতে পৈতে কাটছিলেন। রঞ্জুকে দেখে বললেন, খুকুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? ওর তো জ্বর হয়েছে।

—জ্বর? কবে থেকে?

—কাল রাত্তিরে। খুব জ্বর এসেছে।

—তাই নাকি?—রঞ্জু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল: একটা বই দিতে এসেছিলাম যে—

—যাও না, শুয়ে আছে ওঘরে—। যদি জেগে থাকে দেখা করে যাও।

সাবধানে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল সে, আস্তে ধাক্কা দিয়ে খুলল ভেজানো দরজাটা।

বালিশের ওপর রুক্ষ চুলগুলো মেলে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে সুতপা। একহাতে কপালটা রেখেছে, আর একটি নিরাভরণ বাহু ক্লান্ত শিথিলভাবে এলিয়ে দিয়েছে পাশে। কোমর অবধি টানা চাদরটা বিস্রস্তভাবে পড়ে আছে—একটা আশ্চর্য করুণতা যেন ঘিরে ধরেছে তার রোগশয্যাকে। তলোয়ারের মতো ধারালো মেয়েটিকে কী অসহায় বলে বোধ হচ্ছে। কী অবিশ্বাস্য দেখাচ্ছে এখন এই করুণ আত্ম-নিবেদনের ভঙ্গিটা! তেমনি সন্তর্পণে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু সামান্য একটু শব্দ হল পায়ের চটিটায়। আর চোখ মেলে তাকালো সুতপা। জ্বরের ধমকে টকটকে দুটো লাল চোখ।

—কে?—দুর্বল গলায় ডাক এল।

—আমি রঞ্জন।

—ওঃ, আসুন।

—নাঃ, আপনি অসুস্থ। আজ আর বিরক্ত করবনা। এই বইটা রেখে চলে যাচ্ছি।

—না—না, যাবেননা—হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনায় সুতপা যেন বিছানা থেকে আধখানা উঠে বসতে চাইল: আপনি যাবেন না। আজকে আপনাকে আমার ভয়ঙ্কর দরকার। বড্ড বেশি দরকার।

জ্বরতপ্ত চোখের দৃষ্টি আর স্বরের উত্তেজনায় রঞ্জুর যেন চমক লাগল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে।

—আসুন—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো রঞ্জু এগিয়ে এল।

—বসুন।

একটা টুল টেনে নিয়ে রঞ্জু দ্বিধাভরে বসল। বললে—আপনি অসুস্থ, এ অবস্থায় আপনাকে বিব্রত করা—

—না, না।—সুতপা মাথা নাড়ল: আমি আপনাকে খুঁজছিলুম, জানেন, আপনাকেই খুঁজছিলুম।

—কেন খুঁজছিলেন আমাকে?

—জানেন, আমি আর বাঁচব না!

রঞ্জু সভয়ে বললে, ছিঃ, ছিঃ, এসব কী বলছেন আপনি। জ্বর হয়েছে, দু-দিন পরেই ছেড়ে যাবে।

—না, যাবেনা।—সুতপার আরক্ত চোখ দিয়ে আগুনের আভার মতো জ্বরের উত্তাপ ঠিকরে পড়তে লাগল: আমি আর বাঁচব না।

রঞ্জুর ভয় করতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল সুতপার কপালে একটুখানি হাত বুলিয়ে দেয় সে, জলের পটি লাগিয়ে দেয় একটা। কিন্তু অগ্নিকন্যাকে ছোঁবার শক্তি নেই, স্পর্ধাও নেই, ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল সে।

ফিস্ ফিস্ করে সুতপা বললে, আপনি কবি, আপনি লেখক। আমি মরে গেলে আপনি একটা গল্প লিখবেন?

—গল্প?

জ্বরের মাতলামিতে সুতপার স্বর কাঁপতে লাগল: হাঁ গল্প। বলুন, লিখবেন আপনি?

বিপন্ন মুখে রঞ্জু বললে, ওসব থাক এখন। পরে আর একদিন হবে না হয়।

—না, না, আর একদিন নয়। আর কোনো দিন হয় তো সুযোগই ঘটবে না। বলুন, আপনি লিখবেন এ গল্প?

রঞ্জু হাল ছেড়ে দিলে। বিশীর্ণ স্বরে বললে, কী গল্প?

জ্বরতপ্ত গলায় পাগলের মতো যেন প্রলাপ বকে গেল সুতপা। শুনতে শুনতে রঞ্জুর সমস্ত শরীর যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রেমের গল্প! আশ্চর্য, সুতপা বলছে প্রেমের গল্প! উজ্জ্বল তলোয়ারের ধারালো ফলকটা মুহূর্তে কোমল আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে রজনীগন্ধার বৃন্তের মতো। মশালের মুখে আগুন জ্বলছে না, ফুলের বুকে টলোমলো করছে ভোরের শিশির!

এ প্রলাপ শোনা উচিত নয়, উঠে যাওয়া উচিত এখান থেকে। এখনি, এই মুহূর্তেই। একটা নিষিদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুভূতি হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডে ধক্ ধক্ করে আওয়াজ হচ্ছে, গরম হয়ে উঠেছে কান দুটো। সুতপার আগুন-ঝরা অমানুষিক রক্ত চোখ দুটোর দিকে চাইতে পারল না রঞ্জু, বসে রইল নত মস্তকে।

সেই পুরোনো রূপকথার গল্প। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। এক সঙ্গে তারা কলেজে পড়ত, এক সঙ্গে তারা আলোচনা করত, এক সঙ্গেও চা-ও খেত মাঝে মাঝে। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই এল প্রেম।

তারও পর একদিন যখন নদীর ওপারে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, বালির চরে কাশ ফুলগুলোকে যখন শেষ আলোর একরাশ সোনার ফেনার মতো মনে হচ্ছে চারদিক নির্জনতার শান্তিতে তলিয়ে আছে, সেই দুর্বল মুহূর্তের অবকাশে ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরল।

সাপের কামড় খাওয়ার মতো মেয়েটি সভয়ে হাত ছিনিয়ে নিলে: না—না।

—না কেন?—ছেলেটি আহত বিস্ময়ে বললে, তুমি তো আমাকে—

—না, না।—মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল।

—এর মানে?

—জানতে চেয়োনা।—অসহায় স্বরে মেয়েটি বললে: তুমি বুঝবে না।

কঠোর হয়ে উঠল ছেলেটির মুখ: তা হলে কি তুমি আর কাউকে?—

দু-হাতে মুখ ঢেকে মেয়েটি বললে, না, তাও নয়।

—তবে কি আমরা বিপ্লবী, সেই জন্যই? কিন্তু মৃত্যুর পথে যদি আমরা পাশাপাশি চলতে পারি, তার চেয়ে বড় আর কী আছে?

—না, ওসব কিছুই নয়।

ছেলেটি অধীর উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল: বলো, সব খুলে বলো আমাকে।

—আমি পারবনা—কান্নার মধ্যে জবাব এল মেয়েটির।

—আচ্ছা বেশ—ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এবারে মেয়েটিই তার হাত চেপে ধরল। চোখের জল মুছে ফেলে আর্তকণ্ঠে বললে, তবে শোনো। আমি বিবাহিত।

—বিবাহিত!—ছেলেটি চমকে উঠল: কই জানতাম না তো! এ কথা তো আমায় বলোনি।

—বলতে পারিনি—মৃতকণ্ঠে মেয়েটি জবাব দিলে।

—আমায় ক্ষমা কোরো—আমি জানতাম না—ছেলেটি চলে যাওয়ার উপক্রম করল।

—না, না, যেয়ো না। যখন শুনেছ, তখন সব কথাই শুনে যাও। তেমনি মৃতস্বরে মেয়েটি বললে, তুমি জানো, আমার স্বামী কে?

—কী হবে জেনে?—শ্রান্ত স্বরে ছেলেটি বললে।

—তবু তোমার জানা দরকার। শোনো, আমার স্বামী নীলমাধব।

—নীলমাধব?

—হ্যাঁ, পাথরের ঠাকুর।

চমকে উঠল ছেলেটি: তুমি কি আমার ঠাট্টা করছ?

—না, ঠাট্টা নয়। এর চাইতে বড় সত্যি কথা আমি জীবনে কখনো বলিনি—ছেলেটির মনে হল কেমন যেন অপরিচিত হয়ে গেছে মেয়েটির গলার স্বর, যেন কোন্ বহুদূর দিগন্তের ওপার থেকে সে কথা কইছে:

—একটা আশ্চর্য কাহিনী শোনো। তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, কিন্তু আমার জীবনে এ কাহিনী সব চেয়ে ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে আছে। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব নিবেদন করে দিয়ে তিনি ধন্য হতে চেয়েছিলেন। তাই ছেলেবেলায় আমাকেও তিনি নীলমাধবের পায়ে সঁপে দিয়েছেন। আমি দেবদাসী, আমার বিয়ে করবার অধিকার নেই।

আকাশ ভেঙে বাজ পড়ল যেন। ছেলেটির কণ্ঠ থেকে শুধু অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ বেরুল একটা। দুর্ভেদ্য কঠিন স্তব্ধতায় চারদিক গেল আচ্ছন্ন হয়ে, উঠল অতি তীব্র ঝিঁঝিঁর ডাক, নদীর ওপারে সূর্যের শেষ আলোও মিলিয়ে গেল।

স্তব্ধতা ভেঙে অবরুদ্ধ স্বরে ছেলেটি বললে, বাজে।

—না।

—এ সংস্কার তুমি মানো?

তেমনি বহুদূরের থেকে, যেন এই চর আর নদীর ওপার থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল: না।

—তা হলে কেন এ সংস্কার ভাঙবে না তুমি?

—পারব না। সে জোর আর আমার নেই—কান্নার চাইতেও মর্মান্তিক বর্ণহীন শীতল প্রশান্তি ফুটল তার স্বরে: মানতে পারি না, ভাঙতেও পারি না।

—বিপ্লবীর সমস্ত শক্তি দিয়েও নয়?

—উপায় নেই।

মেয়েটিই উঠে দাঁড়ালো এবার—মাঠের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল, যেন ছুটে পালিয়ে যেতে চায়।

আগুনভরা প্রলাপ-জড়ানো চোখে সুতপা গল্প শেষ করল।

মন্ত্রমুগ্ধ রঞ্জু যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। যান্ত্রিক স্বরে বলে ফেলল: বেণুদা?

আর সেই মুহূর্তেই সুতপা যেন চেতনা লাভ করল। হঠাৎ যেন বিকার কেটে গেছে তার, যেন চকিতে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে।

তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে সুতপা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: যান্—যান্ আপনি—

রঞ্জু আর অপেক্ষা করল না।

পথ দিয়ে চলতে চলতে নিজের চোখ সে কচলালো বারকয়েক। এ সত্যি নয়, এ স্বপ্ন। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেই সাবানের বুদ্বুদের মতো ভেঙে পড়বে এর রঙ।—সুতপার নিরাভরণ দীপ্তদেহে তলোয়ারের ঝলক; তার চারদিকে আগ্নেয়-বৃত্ত! বেণুদা—লোহায়-গড়া নিষ্ঠুর মানুষ। ভালোবাসা। আর সংস্কারের বেড়ায় বন্দী সুতপা, শপথ নিয়েছে দাসত্বের শিকল ভাঙবার—অথচ যাকে ভালোবাসে সংস্কার ভেঙে তার কাছে এগিয়ে যাওয়ার জোর নেই তার—জোর নেই সুতপার।

তাই কি অত করে সংস্কার ভাঙবার কথাটা বলেছিল সে? শক্ত করে নিতে চাইছিল নিজের দুর্বলতার ভিত্তি? আর—আর এই জন্যেই কি গাড়ির আলো নেবাবার কথায় ভয় পেয়েছিল সে।

একটা অর্থহীন কল-কোলাহলে রঞ্জুর সমস্ত ভাবনাগুলো যেন একাকার হয়ে গেল।

বারো

আরো দু মাস? দু মাস, না আরো কম? ঠিক খেয়াল নেই, ভালো করে মনে পড়েনা এতদিন পরে। নানা রঙের দিনগুলি পাখা মেলেছে, উড়ে গেছে ঝড়ের বাতাসে। উনিশ শো তিরিশ সালের বন্যা—তেরশো তিরিশ সালের বন্যা। জীবনে বন্যার বেগ এসেছে, এসেছে খরপ্রবাহ।

সুতপা! একটা রাত্রির আশ্চর্য স্বপ্ন যেন। এখনো ঠিক বোঝা যায় না সেদিন সে কথাগুলো সে সত্যি সত্যিই শুনেছিল কিনা!

তারপরে আর দেখা হয়নি, দেখা করবার সুযোগও ঘটেনি। টাইফয়েড্ থেকে ওঠবার পরে সুতপা চলে গেছে দেওঘর, সে প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল। কিন্তু বেণুদার দিকে আজকাল সে তাকায় একটা নতুন প্রশ্ন নিয়ে, তাঁর অর্থ বোধ করতে চায় একটা নতুন জিজ্ঞাসার আলোকে। কেন যেন মনে পড়ে যায়—বহুদিন আগেকার

একটা রাত্রির কথা। গোমেজ সাহেবের কুঠিবাড়ি থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ তাঁর সেই গান: "করুণাময়, মাগি শরণ।" সেই অসহায় বেড়ালের ছানাটাকে খানা থেকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নেওয়া, পাথরের আড়াল ভেঙে ফুটে ওঠা একটা ফুলের মতো অপরূপ কোমলতা। মনে হয় সেদিনকার সে ব্যবহারের যেন অর্থ খুঁজে পাওয়া গেছে—যেন কী একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া গেছে তার।

আর স্বতপার সেই আংটি দেওয়া। সেকি শুধু পার্টির জন্যে সর্বস্ব দেবার আকুলতা? অথবা আরো কিছু আছে তার আড়ালে, আরো কোনো গভীরতর আত্ম-নিবেদন? শুধু আংটি দেওয়া, না সেই সঙ্গে—

রঞ্জু নিজের মনকে শাসানি দিলে একবার। এ শুধু অনধিকার চর্চা নয়, পাকামিও বটে। হালে কতগুলো বাংলা উপন্যাস পড়ে এইগুলো আজকাল তাল পাকাচ্ছে তার মগজের মধ্যে। এসব ভুলে যাওয়া উচিত। সৈনিক, শুধু কাজ করো, শুধু নেতার আদেশ পালন করো। যদি ক্লান্ত লাগে, জেনো নিজের দুর্বলতা; যদি কোনো ব্যাপারে সংশয় জাগে, জেনো সে তোমার বুদ্ধির বাইরে।

অনেকদিন কবিতা লেখেনি। আজ আবার কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসল। কিন্তু কিছু আসছে না। দুলাইন লিখল, কেটে দিলে আবার। একটা নতুন ছন্দ গানের সুরের মতো গুনগুনিয়ে উঠছে—

দূর গিরি-সঙ্কট দুর্গম পথরেখা একা পথে শঙ্কিত যাত্রী,
তবু তো উদয় রাগে রঞ্জিত গিরিচূড়া অবসিত দুর্যোগ রাত্রি—

নাঃ—এ শুধু কথা—এতে প্রাণ নেই। শব্দের ঝঙ্কার কানে আনে, মন দোলায় না। দুর্গম পথে একক যাত্রীর মনেও কি তেমন করে দোলা লাগে না আর?

—March on, march on friend—there calls the martyr's heaven—

ভালো কথা, করুণাদি ডেকেছিলেন। আজকাল করুণাদি যেন মন থেকে সরে গেছেন খানিকটা। সরে গেছেন—না নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বলা শক্ত। কোথায় একটা ব্যবধান এসে যেন আড়াল করে ধরেছে শক্ত হাতে। কার দোষ? রঞ্জুর? বেণুদার বোন কি বিপ্লবীর পথচলাকে মেনে নিতে পারেননি মন থেকে?

তবু একবার ঘুরে আসা যাক।

বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করে বৈঠক করছিলেন বেণুদা। দাদারা সবাই এসেছেন—এ আলোচনায় ওরা যোগ দিতে পারে না, এটা ওপরতলার ব্যাপার। একটা থমথমে গাম্ভীর্য সকলের মুখে। রঞ্জু বুঝতে পারে। চারদিক থেকে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে একটা। সেই ডাকাতিটার পরে পুলিশের তাণ্ডব চলছে অবিরাম, এর মধ্যেই বার তিনেক সার্চ হয়েছে বেণুদার বাড়ি। দলের আট দশজন ছেলে হাজতে। বেণুদাকে এখনো ধরেনি, বোধ হয় আরো উদ্যোগ আয়োজন করে জাল গুটোবার মতলব আছে ধরেছে। সবাই সেটা জানে। কাজেই ঘন ঘন জরুরি বৈঠক বসছে আজকাল। কী করা যাবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। টাকা দরকার—দরকার অর্গানাইজেসনকে আরো শক্ত করা। তারই কোনো প্রোগ্রাম দেওয়া হচ্ছে বোধ হয়।

বেণুদা বললেন, ভেতরে যাও।

শীতের রোদে স্নান করা সকাল। মিষ্টি নরম রোদ। বারান্দায় সে রোদ পড়েছে, আর সদ্যোস্নান করা চুল এলিয়ে দিয়ে রোদের দিকে পিঠ করে কী যেন সেলাই করছেন করুণাদি।

—করুণাদি?

—রঞ্জন? এসো—হাসিমুখে অভ্যর্থনা এল।

—আমাকে ডেকেছিলেন?—মাদুরের একপাশে রঞ্জু বসে পড়ল।

—হাঁ, ডেকেছিলাম বইকি। পিঠে করেছি কাল রাত্রে, ভাবলাম ব্রাহ্মণ ভোজন না করালে পুণ্য হবে না।

—তাই বেছে বেছে আমাকে বুঝি ব্রাহ্মণ পেলেন?

—তা বইকি। বেশ ছোটখাটো ব্রাহ্মণ—অগস্ত্যের মতো খায় না, কিন্তু খেয়ে খুশি হয়।

রঞ্জু হাসল: পরিমল শুনলে কিন্তু চটে যাবে।

—ওই হতভাগা?—করুণাদি সস্নেহে বললেন, ওর কথা আর বোলো না। ওকে ডাকতে হয় না, আপনিই এসে জুটে যায়। কাল রাত্রে এসে অর্ধেক সাবাড় করে গেছে।

—বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে? কী বিশ্বাসঘাতক।

—ওই তো। চিনে রাখো কেমন বন্ধু তোমার—হেসে করুণাদি উঠে গেলেন।

রঞ্জু ভাবতে লাগল। এখানে এসে হঠাৎ যেন মনে হল আবার ফিরে পেয়েছে বাড়ির স্নিগ্ধতা, সেখানকার মমতা ভরা নিবিড় আশ্রয়—যা ছিল মা বেঁচে থাকা পর্যন্ত। এখন আর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। ঠাকুরমার কান্না অসহ্য লাগে। সমস্ত একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে, দুমাস থেকে বাবার চিঠিপত্র আসে না, শোনা যায় আজকাল নাকি যোগ-সাধনা শুরু করেছেন তিনি।

আজ বড় ভালো লাগল এখানে। আরো ভালো লাগল—অনেকদিন পরে যেন আবার খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছেন করুণাদি। সেই পুরোনো হাসি, সেই স্নেহের স্নিগ্ধ উত্তাপ, সকালবেলাকার মিষ্টি নরম রোদের মতো কবোষ্ণ মাদক অনুভূতি।

করুণাদি পিঠে নিয়ে এলেন।

—এত?

—খেয়ে নাও।

—পারব না তো।

—আর দর বাড়াতে হবে না—খেয়ে নাও।—করুণাদি ধমক দিলেন।

খেতে খেতে উঠোনের দিকে তাকালো রঞ্জু। এক কোণে কতগুলো গাঁদা ফুল ফুটেছে—এত রাশি রাশি ফুটেছে যে পাতাগুলোকে পর্যন্ত যেন দেখা যায় না। শিশিরে ভিজে ভিজে ফুলগুলো, সকালের রোদ এখনো সে শিশির শুকিয়ে নিতে পারেনি। কতগুলো পায়রা ঝিমিয়ে

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ইঁদারার ধারে একটা পেঁপে গাছ, তিন চারটে শালিক কিচির মিচির করছে তার ওপরে।

শান্তি, বিশ্রাম। যেন করুণাদি তাঁর নিজের চারপাশে একটা মধুচক্র রচনা করে রেখেছেন। আর বাইরের ঘর। এর একেবারে বিপরীত। বাইরের সূর্যের আলোকে রুদ্ধ করে দিয়ে, এই গাঁদা ফুলে ভরা ভোরের শিশিরকে অস্বীকার করে যেখানে একটা আগ্নেয় পরিবেশ। জটিল তর্ক, কুটিল সমস্যা। সুন্দর স্নেহভরা ঘরের মোহ নয়, ঝড়ের ক্ষ্যাপামি-লাগা সমুদ্রের ডাক; পায়রার খুঁটে খুঁটে খুদ খাওয়া নয়, কাঁটার পথ দিয়ে রক্তাক্ত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলা।

—জানো, আমি চলে যাচ্ছি।

গলায় পিঠে আটকে গেল রঞ্জুর, বেরুল একটা অব্যক্ত শব্দ।

—হাঁ, সত্যিই চলে যাচ্ছি।

রঞ্জু চক্ষের পলকে খাবারের থালা থেকে হাত গুটিয়ে নিলে: যাঃ।

—না, মিথ্যে কথা বলিনি। সকালের নরম রোদে ভারী করুণ আর ক্লান্ত মনে হল করুণাদির চোখ: চলে যেতেই হবে ভাই, থাকতে পারব না।

—কিন্তু কোথায় যাবেন?

—কোথায়?—করুণাদি প্রাণহীন একটা নীরক্ত হাসি টেনে আনতে চেষ্টা করলেন ঠোঁটের আগায়: কেন, আমার শ্বশুর-বাড়িতে। মেয়েমানুষকে বিয়ে হলে যেখানে যেতে হয় সেখানেই।

তা বটে। এর ওপর কোনো কথা চলে না, যে কোনো প্রশ্নই অবান্তর মনে হয়। কিন্তু এর জন্যে যেন প্রস্তুতি ছিল না রঞ্জুর বোধের মধ্যে। করুণাদিরও শ্বশুর বাড়ি আছে, যেখানে মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে তাঁকে সংসারের কাজকর্ম করতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে স্বামীপুত্রের, যেখানে করুণাদি অতি সাধারণ—একেবারেই সাধারণ।

—ওঃ, জানতাম না।—নির্বোধের মতো উচ্চারণ করলে রঞ্জু। কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। জ্বলন্ত রৌদ্রের মধ্যে, অতি প্রখর আগুনের কণায় বালুছড়ানো দিগ্‌বিস্তার মরুভূমির পথ দিয়ে আজ যাত্রা শুরু হয়েছে। ক্লান্ত লাগে মাঝে মাঝে, আশ্রয় আর আশ্বাসের আশায় আকুলি-বিকুলি জাগে মনের মধ্যে। সেই আশ্রয় সে পেয়েছিল করুণাদির মধ্যে, মরুভূমির মধ্যে ছায়ার দাক্ষিণ্য দিয়েছিল এই পান্থ-পাদপ।

—রঞ্জন?

ধরা গলায় করুণাদি ডাকলেন।

চোখ তুলতে পারল না রঞ্জু। ওই গলার স্বর সে চেনে, ওর সঙ্গে তার মনের আড়ালে সেই সূক্ষ্ম অপরাধবোধটা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

—আমি চলে যাচ্ছি ভাই। তোমাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু না গিয়ে আর উপায় নেই আমার।

নীরবতা। শিশির-ভেজা গাঁদা ফুলগুলোতে ঝিকমিক করছে সোনার মতো একটা উজ্জ্বল দীপ্তি। তেমনি ধান খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে পায়রারা।

অবশস্বরে করুণাদি বললেন, তোমাকে একটা কথা অনেক দিন ধরে বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারিনি। হয়তো আজ ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু সারাক্ষণ আমার বুক কাঁপে। যে আগুনে সারাক্ষণ আমি জ্বলছি, ভয় করে একদিন সে আগুনে তোমরা জ্বলে না যাও।

সেই পুরোনো কথা। সেই দুর্বোধ্য ইঙ্গিত।

রঞ্জু মাথা নত করে বসে রইল। ব্যথিত একটা জিজ্ঞাসা এসেছে গলার কাছে, আকুলতার একটা আবেগ রণরণিয়ে উঠেছে রক্তের গভীরে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায় না, শুধু আচ্ছন্নের মতো বসে থাকতে হয় চুপ করে।

—কাল আমি চলে যাব। হয়তো কোনোদিন আর দেখা হবেনা তোমার সঙ্গে।—কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠল করুণাদির গলা: কিন্তু কথাটা মনে রেখো ভাই। সব পথ সকলের জন্যে নয়। পারো তো বেরিয়ে চলে এসো—এই আগুনের ভেতর থেকে, বাঁচতে চেষ্টা কোরো গুণীর মতো, শিল্পীর মতো। মরতে পারা সবচেয়ে সহজ কিন্তু মহৎ হয়ে বাঁচতে জানা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন।

বিহ্বলভাবে মাথা নীচু করে তেমনি বসে রইল রঞ্জু। তারপর যখন চোখ তুলল রঞ্জু, তখন দেখল সামনে করুণাদি নেই। কানে এল ঘরের ভেতর কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অসহায় যন্ত্রণায়।

দু কান ভরে সেই কান্না আর বুক ভরে সেই যন্ত্রণা—সেই দুর্বোধ্য যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল: সকালের সোনার আলো চোখের সামনে কালো হয়ে গেছে তার। সামনে মরুভূমির পথটা ধূধূ করছে—পান্থপাদপের বন—ছায়ার চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও।

পরিমল খবর দিলে পরের দিন। করুণাদি চলে গেছেন সকালের ট্রেণে। যাওয়ার আগে আশীর্বাদ জানিয়ে গেছেন রঞ্জুকে, করে গেছেন তার কল্যাণ-কামনা।

মাকে হারানোর ব্যথাটা যেন বুকের মধ্যে আবার মোচড় দিয়ে উঠল তার। যাওয়ার সময় কেন সে একবার দেখা করতে পারল না করুণাদির সঙ্গে, নিতে পারল না তাঁর পায়ের ধুলো?

নাঃ—কিছু না ওসব। 'একলা চলো রে।' কোনো বন্ধন নেই বিপ্লবীর জীবনে। মোহ তুচ্ছ, মায়া অর্থহীন। ঝড়ের গর্জনকে ছাপিয়ে আজ শুধু বিচ্ছেদের হাহাকারই মুখরিত হচ্ছে দিকে দিকে।

'বন্দরের কাল হল শেষ!'

তারও পরের দিন রঞ্জুদের বাসার সামনে সাইকেলের একটা বেল বাজল ক্রিং ক্রিং করে।

ইয়াদ আলী। ছাই রঙের কোট গায়ে সেই লোকটা।

ব্যঙ্গমিশ্রিত একটা কুটিল হাসি হাসলে ইয়াদ আলী: বড়বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। এখুনি আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে আই·বি অফিসে।

ঝড়ের হাওয়া উঠল প্রথম। (ক্রমশ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্ম্মচারী-হত্যার সংস্রবে পুলিশ চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের পুনরায় খোঁজ করিতেছিল—তাই তাঁহারা তিনজনে গুপ্ত জীবন যাপন করিতেছিলেন। চিত্তপ্রিয়ের নামে ছিল হত্যার অভিযোগ। আই. বি. ইন্‌সপেক্টর সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের উৎপাতে বিপ্লবীরা এই সময় অতিশয় অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। নানা কারণে যতীন্দ্রনাথ তাঁহাকে হত্যার আদেশ দেন। বিপ্লবীরা বহুবার তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করেন—কিন্তু বিফল হন। ইহাতে যতীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন এবং একদিন সঙ্কল্প করেন যে সেইদিনই তিনি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের হত্যার সংবাদ না পাইলে আর জলগ্রহণ করিবেন না।

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

তাঁহার এই সঙ্কল্পে বিপ্লবীরা বিচলিত হইয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায়কে হত্যার অভিপ্রায়ে নানা দলে বিভক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বিপ্লবীরা সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বড়লাটের আগমন উপলক্ষে আবশ্যক ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায় সেইদিন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তখন চিত্তপ্রিয় হেদোর নিকট কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর প্রকাশ্য স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন এবং নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন অপেক্ষাকৃত রহিলেন একটু দূরেই। তাঁহাদের আশা ছিল যে, হত্যার অভিযোগ যাঁহার নামে আছে, চিত্তপ্রিয়ের মত সেইরূপ একজন আসামীকে সম্মুখে দেখিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার প্রলোভন সুরেশ মুখোপাধ্যায় সহজে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তখন প্রলুব্ধ হইয়া তিনি সেখানে থামিলে তাঁহারা তিনজনে তাঁহাকে নিহত করিবেন।

সত্যই শিকার ফাঁদে পড়িল। চিত্তপ্রিয়কে দেখিতে পাইয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি চিত্তপ্রিয় কিনা। চিত্তপ্রিয়ের মুখে "হ্যাঁ" উত্তর পাইয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ধরিতে যাইতেই চিত্তপ্রিয়ের পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল; কিন্তু গুলি করিবার পূর্ব্বেই সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলায় গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। তখন নিকট হইতে মনোরঞ্জনও গুলি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাতে সুরেশচন্দ্র ভূতলশায়ী হইলেন। চিত্তপ্রিয়ের নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় গুলিতে সুরেশচন্দ্রের বক্ষ বিদ্ধ হইল। এইভাবে একটি জনবহুল রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গী জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী ভয়ে ডাষ্টবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

সুরেশচন্দ্রের বক্ষশোণিতে পিস্তলের মুখ রঞ্জিত করিয়া লইয়া শূন্যে গুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে বিপ্লবী তিনজন পলায়ন করিলেন এবং যতীন্দ্রনাথের গুপ্ত গৃহে উপস্থিত হইয়া সাফল্যের সংবাদ ঘোষণা করিলেন।

বেলিয়াঘাটা ট্যাক্সি ডাকাতির পর পাথুরিয়াঘাটায় একটি বাড়ীতে সঙ্গিগণসহ যতীন্দ্রনাথ যখন অবস্থান করিতেছিলেন—তখন নীরদ হালদার নামক একজন গোয়েন্দা বাড়ীটির সন্ধান পাইল। ১৯১৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সে যতীন্দ্রনাথের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাড়ীটির ভিতরে প্রবেশ করিল। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন শায়িত অবস্থায় এবং তাঁহার পার্শ্বে দুইজন সঙ্গী উপবিষ্ট ছিলেন। নীরদ হালদারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই যতীন্দ্রনাথ তাহাকে গুলি করিবার আদেশ দিলেন এবং সেই আদেশ তদ্দণ্ডেই পালিত হইল। ইহার পর জিনিষ-পত্র লইয়া অতি দ্রুত সঙ্গিগণসহ যতীন্দ্রনাথ বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নীরদ হালদারের কিন্তু তখনও মৃত্যু হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার প্রদত্ত জবানবন্দীতে সে যতীন্দ্রনাথের নাম বলিয়া যায় এবং তাঁহার সঙ্গীদের চেহারার বর্ণনা দেয়। তাহা হইতে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, ঘটনার সময় চিত্তপ্রিয় ও নীরেন্দ্রই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন এবং নীরদ হালদার সম্ভবতঃ নীরেন্দ্রের গুলিতেই নিহত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, উক্ত ঘটনার পর যতীন্দ্রনাথের কলিকাতা ত্যাগ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করা হইলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অপরাপর সঙ্গীদেরও

কলিকাতা ত্যাগের ও নিরাপত্তার অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে না জানিতে পারিলে তিনি যাইতে পারিবেন না। ইহারই কয়েকদিন পরে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে তিনি পূর্ব্বকথিত চারিজন সঙ্গীসহ বালেশ্বরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। বালেশ্বরের পথে তিনি মেদিনীপুরের এখানে-ওখানেও কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পুলিশ কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহও করিল। তাহারা জানিতে পারিল যে, যতীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও অতুল ঘোষ শ্রমজীবী-সমবায় নামে একটি স্বদেশী বস্ত্রালয়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদার নামক দুইজন মালিকের সহিত তাঁহাদের দোকানে বহু পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র রাখিবার জন্য আলোচনা চালাইতেছেন। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে জাহাজ হইতে অস্ত্রাদি নামাইবার ব্যবস্থার বিষয়ও জুলাই মাসে পুলিশ জানিয়া ফেলিল এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বিত হইল। "মেভারিক" জাহাজ শেষ পর্য্যন্ত আর আসিয়া পৌঁছায় নাই। মাল-পত্র না লইয়াই জাহাজখানি ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে বাহির হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, "অ্যানি লার্সেন" নামক আর একখানি জাহাজ হইতে পথিমধ্যে অস্ত্রাদি তুলিয়া লইয়া উহা বাংলায় আসিবে; কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক "অ্যানি লার্সেন" ধৃত ও উহার অস্ত্রাদি বাজেয়াপ্ত হয়; ইহার ফলে "মেভারিক" জাহাজও আর আসিতে পারে নাই। হেলফারিকের নিকট হইতে পুনরায় সংবাদ পাওয়া যায়—পাঁচ হাজার রাইফেল, গুলি-বারুদ ও এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে প্রেরিত হইতেছে; কিন্তু পুলিশ ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া রীতিমত ধরপাকড় আরম্ভ করিয়া দিল। বাংলার অবস্থা জ্ঞাত করাইয়া হেলফারিককেও সাবধান করিয়া দিবার জন্য বোম্বাই হইতে বিপ্লবীরা তারে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন তাঁহার নিকট। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করিবার মানসে অপর একজন সঙ্গীসহ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাটাভিয়া যাত্রা করিলেন।

ইহার পর সাংহাইস্থিত জার্ম্মাণ কন্‌সাল-জেনারল কর্ত্তৃক আরও দুইখানি অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ রায়মঙ্গল (হাতিয়া ?) ও বালেশ্বরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়—কিন্তু তাহাও শেষ পর্য্যন্ত আসে নাই। "হেনরী এস" নামক আর একখানি জার্ম্মাণ জাহাজ অস্ত্রাদি লইয়া ম্যানিলা হইতে ভারতে যাত্রার পূর্ব্বেই ধৃত হয়। দুইজন চীনাম্যান কাঠের তক্তার মধ্যে গোপনে কতকগুলি পিস্তল ও বহু গোলা-বারুদ লইয়া আসিতেছিল শ্রমজীবী-সমবায়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। নীলসেন নামক একজন জার্ম্মাণের নির্দ্দেশেই তাহারা এই কাজ করিতেছিল। সাংহাই-এর মিউনিসিপ্যাল পুলিশের দ্বারা ধৃত হওয়ায় তাহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চন্দননগরে পলাইয়া যান। রাসবিহারী বসু ও অবিনাশচন্দ্র রায় তখন নীলসেনের বাড়ীতে থাকিতেন; তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাইবার বহু চেষ্টা করিয়াও পাঠাইতে পারেন নাই। যে অবনী মুখোপাধ্যায়কে জাপানে পাঠান হইয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি সিঙ্গাপুরে ধৃত হইলেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যও আমেরিকার "মেভারিক" জাহাজযোগে পলাইয়া যাইবার পর ধৃত হইলেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাটাভিয়া গমন করিলে তাঁহার নিকট হইতে কোনও সংবাদ না পাইয়া বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অপর একজন যুবক পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়া হইতে তারে সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইলেন। ১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে পুণা জেলে ভোলানাথ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

মহানদী যেখানে আসিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে, বালেশ্বরের সেই স্থানের জঙ্গলের মধ্যে জাহাজের প্রতীক্ষায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারিজন সঙ্গীসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দলের সন্ধানে পুলিশ তখন চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান চালাইতেছিল। মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি পুলিশ জানিতে পারিল যে, বালেশ্বরের কোনও স্থানে যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করিয়া আছেন।

নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

ভারত-জার্ম্মাণ ষড়্‌যন্ত্রের তথ্যাদি পুলিশ যাহা জানিতে পারে, তাহার ফলে ১৯১৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় বিপ্লবীদের আড্ডা "হ্যারি এণ্ড সন্স" নামক দোকানটিতে খানা-তল্লাস হয় এবং কলিকাতার একদল গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার বালেশ্বরে গিয়া সেখানে "ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম" নামক "হ্যারি এণ্ড সন্সের" একটি শাখা অফিসেও ৪ঠা সেপ্টেম্বর তল্লাসী করে। এই প্রসঙ্গে জনৈক বাঙ্গালী যুবকও ধৃত হয়। তাহার নিকট পুলিশ সংবাদ পায় যে, ময়ূরভঞ্জের নিকটস্থ পার্ব্বত্য জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করিয়া আছেন। বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলবি কলিকাতার দুইজন পুলিশ

অফিসার মিঃ টেগার্ট ও মিঃ বার্ডকে সঙ্গে লইয়া ময়ূরভঞ্জের মহলদিয়াতে ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে উপস্থিত হইলেন।

লোকের নিকট হইতে জানা গেল যে, কয়েকজন বাহিরের লোক কিছুদিন হইতে ঐ অঞ্চলে বাস করিতেছেন। একজন লোককে সঙ্গে লইয়া তখন সেই বাহিরের লোকদের আস্তানার দিকে পুলিশ অগ্রসর হইল। এক বস্তীর সংলগ্ন একখানি ঘর দূর হইতে দেখাইয়া পথপ্রদর্শনকারী লোকটি এক সময় থামিয়া পড়িল। পুলিশ সাবধানে অগ্রসর হইয়া দেখিল কুটীরের দ্বার রুদ্ধ। বহু তোড়জোড় করিয়া অস্ত্র উঁচাইয়া পুলিশ বিপ্লবীদিগকে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দিলেও দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধই রহিল। তখন দরজা খুলিবার সামান্ত চেষ্টা করিতেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। দেখা গেল, ভিতরে কেহ নাই। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পুলিশ কাপ্তিপদার জঙ্গলে বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করিতে চলিল।

গভীর রাত্রিতে যতীন্দ্রনাথ লোক মারফত সংবাদ পাইলেন, তিনজন সাহেব হস্তীপৃষ্ঠে তাঁহার কুটীর হইতে কাপ্তিপদার দিকে গিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গী-চতুষ্টয় সকলেই একই স্থানে থাকিতেন না। তিনজন থাকিতেন মহলদিয়ায় ও দুইজন থাকিতেন প্রায় বারো মাইল দূরবর্ত্তী তালবাঁধ নামক স্থানে। কাপ্তিপদা বালেশ্বর হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যতীন্দ্রনাথ রাত্রিকালেই সংবাদ দিয়া তালবাঁধে লোক পাঠাইয়া কুটীর ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় তাঁহারা পুনরায় মিলিত হইবেন—তাহাও তিনি লোক মারফত বলিয়া পাঠাইয়া ছিলেন।

কাপ্তিপদায় বিপ্লবীদের ঘাঁটি তল্লাস করিয়া পুলিশ সুন্দরবনের একখানি মানচিত্র এবং পেনাং হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদ-পত্রের কাটিং পায়। উক্ত কাটিং-এ "মেভারিক" জাহাজের খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ৮ই তারিখ সারা দিন ও রাত্রি তাঁহারা আত্ম-গোপন করিয়া পলাইয়া বেড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে তাঁহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া খাদ্য গ্রহণের আশায় একটি দোকানে উপস্থিত হইলে সেখানকার অনেক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেখিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ করিল যে, সেই অঞ্চলে তৎকালে অনুষ্ঠিত ডাকাতিগুলির সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নহে, সুতরাং অবিলম্বে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। যতীন্দ্রনাথের দল আত্মপক্ষ সমর্থনে জানাইলেন, তাঁহারা শিকারী এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কথা অনেকেই বিশ্বাস করিল না। দূরে দূরে থাকিয়া একদল লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

জনতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বন্দুকের আওয়াজে তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মনোরঞ্জন বন্দুক ছুঁড়িলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাতে একজন আহত হইল। ইহার ফলে লোকের সন্দেহ গেল আরও বাড়িয়া এবং মধ্যে অধিকতর ব্যবধান রাখিয়া তাহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে পুলিশও আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোতিষ পাল সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় স্থানান্তরে পলায়নও আর সহজ হইল না। তখন নিরুপায় বাধা যতীন সম্মুখ-সমরের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বালেশ্বর জেলায় বুড়ীবালাম নদী-তীরে চাষাখণ্ড নামক স্থানে পরিখা খনন করিয়া অতি দ্রুত রণক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যগণ লইয়া জঙ্গল ঘেরাও করিয়া ভীষণভাবে আক্রমণ সুরু করিলেন। উভয়পক্ষেই গুলি-বিনিময় চলিতে লাগিল। একদিকে প্রায় তিন শত সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য—আর অপরদিকে সামান্যমাত্র অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পাঁচটি বাঙ্গালী

চাষাখণ্ডের রণক্ষেত্র
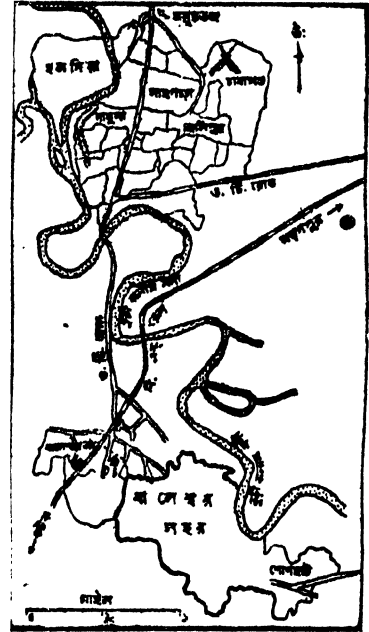
বীর যোদ্ধা! যুদ্ধ চলিল শক্তিশালী ও দুর্ব্বলে—কিন্তু বিক্রমে পাঁচজনই তিন শতের সমকক্ষ হইলেন।

ভীমবিক্রমে যুদ্ধ চলিতে থাকার সময়ই একটি গুলি আসিয়া যতীন্দ্রনাথের উরুদেশে বিদ্ধ হইল; তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াই সমান তেজে লড়াই চালাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চিত্তপ্রিয় সাংঘাতিক-রূপে আহত হইলেন। তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলে আর একটি গুলি আসিয়া যতীন্দ্রনাথের পেটে বিদ্ধ হইল। গুরুতর আঘাতে তিনিও আহত হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সাদা রুমাল উড়াইবার নির্দ্দেশ দিলেন। নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন ইহাতে মৃদু আপত্তি জানাইলেন—এইভাবে আত্মসমর্পণের তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু অবশিষ্ট অমূল্য জীবনগুলিকে বৃথা মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে যতীন্দ্রনাথ অনিচ্ছুক

হইলেন। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে জানাইয়া দিলেন—উহাই তাঁহাদের নেতার আদেশ, সুতরাং তাঁহাদিগকে উহা মান্য করিতেই হইবে। অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে সাদা নিশান উর্দ্ধে তুলিতে হইল। সমাপ্ত হইল চাষাখন্দের সংগ্রাম।

চিত্তপ্রিয় রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আহত অবস্থায় যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ গ্রেপ্তার হইলেন।

হাসপাতালে নীত হইয়া যতীন্দ্রনাথ জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। টেগার্ট সাহেব স্বয়ং একগ্লাস জল লইয়া যতীন্দ্রনাথকে দিতে গেলেন; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ উহা পান করিলেন না। যাঁহার রক্তে তিনি চাহিয়াছিলেন নিহত বিপ্লবীদিগের তর্পণ করিতে—তাঁহার দেওয়া জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

জীবিত সঙ্গীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, সকল কিছুর জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। বাঙ্গালীদের জন্য তিনি তাঁহার বাণী দিয়াছিলেন,—"Tell the people of Bengal that Chittapriya Rai and I sacrificed our lives in vindicating the honour of Bengal."

টেগার্ট সাহেবও এই অধীন দেশের ঐ অসমসাহসী তেজস্বী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই; তাই পুলিশ-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন,—"I had to do my duties, but I have a great admiration for him. He was the only Bengalee who died fighting from a trench."

বালেশ্বরের হাসপাতালে আহত অবস্থায় আনীত হওয়ার কয়েকদিন মাত্র পরেই যতীন্দ্রনাথের দেহাবসান হয়। বিচারে নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির আদেশ হইল এবং সেই আদেশ কার্য্যকরী করা হইল কটক জেলে। জ্যোতিষের হইল যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড। আন্দামানে গিয়া পীড়নে ও পরিশ্রমে জ্যোতিষের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায় এবং তাঁহাকে পুনরায় এদেশে আনা হয়। পরবর্ত্তীকালে বহরমপুর (মতান্তরে রংপুর) জেলে থাকাকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নদীয়া জেলার খোকসা গ্রামে জ্যোতিষের বাড়ী ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বাংলার পাঁচটি বীর সন্তানের ইহাই অতুলনীয় অবদান। বাঙালী ভীরু, বাঙালী কাপুরুষ—এই হীন প্রচারণার বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রমাণ তাঁহারা বুড়ী-বালামের তীরে চাষাখন্দ-রণক্ষেত্রে চিরকালের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহা অনন্তকাল ধরিয়া জাতিকে যোগাইবে দুর্জ্জয় সাহস এবং প্রেরণা। তাঁহাদের অক্ষয় স্মৃতি জাতির নিকট হইয়া থাকিবে চিরন্তন অমূল্য সম্পদ।

যাহা হউক,১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত হইল আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ড। পুলিশ সাব্-ইন্‌সপেক্টর গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় নিহত হইলেন এবং আর একজন হইল আহত। ময়মনসিংহে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষ ও তাঁহার পুত্র প্রাণ হারাইলেন।

১৯১৬ সালে পুলিশের তৎপরতায় বহু বিপ্লবী ধৃত হইলেন এবং বহু ষড়্‌যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হইল।

১৯১৭ সালে বাংলা গভর্ণমেণ্টের দমননীতি যখন চরম হইয়া উঠিল, তখন বিপ্লবীদের পক্ষে বাংলায় অবস্থান আর সম্ভব হইল না। যে সকল বিপ্লবী-নেতা তখনও ধৃত হন নাই, তাঁহারা স্থির করিলেন যে, বাংলার বাহিরের কোনও কেন্দ্র হইতে গুপ্ত-আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে। তদনুযায়ী গৌহাটীতে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইল এবং সেখান হইতেই বিপ্লবীরা কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। পুলিশ খবর পাইয়া একদিন সেই আস্তানাটি ঘেরাও করিয়া ফেলিল। বিপ্লবীরা সুকৌশলে সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিয়া কামাখ্যা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। পুলিশ সেখানেও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাহার ফলে বিপ্লবীদের সহিত পুলিশের বাধিয়া গেল একটি খণ্ড-যুদ্ধ। শেষ পর্য্যন্ত দুইজন বিপ্লবী ব্যতীত প্রায় সকল বিপ্লবীই ধৃত হইলেন। যে দুইজন তখন পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নলিনী বাগ্‌চী ও প্রবোধ দাশগুপ্ত। প্রবোধ পরে ধরা পড়িয়াছিলেন। নলিনী কলিকাতায় আসিয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সতীশচন্দ্র পাকড়াশী তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করিয়া তুলেন। পুলিশের গুলিতে ঢাকায় পরবর্ত্তীকালে নলিনী প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তুর্ক-ইতালী যুদ্ধের সময় তুরস্কের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে অর্থ ও ঔষধাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারত আক্রমণের একটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল এবং উক্ত অভিযানে ভারতীয়গণেরও সাহায্যলাভের আশা করা হইয়াছিল। ঐ উদ্দেশ্যেই মৌলনা ওবেদুল্লা সিন্ধী কয়েকজন সঙ্গীসহ ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাবুলে যে তুর্ক-জার্ম্মাণ মিশন আসিয়াছিল—উহার সহিত তাঁহাদের এই বিষয়ে আলোচনা হয়। হেজাজের তুর্কী সামরিক গবর্ণর গালিব পাশাও এই আলোচনায় যোগদান করেন। স্থির হয় যে, বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাইয়া রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া অস্থায়ী সরকার গঠিত হইবে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন ১৯১৪ সালের শেষের দিকে। তিনি ইতালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং গদর-দলের প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের সহিত জেনেভায় তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জার্ম্মাণীতে কাইজারের সহিতও তিনি আলাপ করিয়াছিলেন। কাবুলে কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

তাঁহাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখিত চিঠি-পত্রাদির কতকগুলি কোনওপ্রকারে বৃটিশের হস্তগত হয়। পত্রগুলি ছিল হরিদ্রাবর্ণের রেশ্‌মী কাপড়ের উপর লিখিত। সেই জন্যই এই ষড়্‌যন্ত্রকে "রেশ্‌মী চিঠি ষড়্‌যন্ত্র" বলা হইয়া থাকে। এই ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় ১৯১৬ সালে ফাঁস হইয়া যায় এবং এই সালের জুন মাসে ষড়্‌যন্ত্রের প্রধান নেতা মক্কার শেরীফ তুর্কীদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করায় এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

(ক্রমশঃ)

বিয়ের আগে

শ্রীনীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ফল্টি লাভ, কোর্ট বদলে বাঁদিকের কোণ থেকে আবার সার্ভ করলে, আমার র‍্যাকেটে লেগে বল চলে গেল বাইরে, গেম্, লাভ্ গেম্, সেট্—হেসে বললে শিপ্রা।

লনের বাইরে ছুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম শিপ্রা আর আমি—শিপ্রা বললে, একেবারে লাভ্ গেম্ খেলে!

হেসে বললাম, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধই তো লাভ্ গেমের লাভ্, পিওর লাভ। শিপ্রার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল; না ব্যারিষ্টারের মেয়ে শিপ্রা, এমন কথা দিনে চল্লিশবার অন্তত শোনে আমার মুখ থেকে।

ড্রাইভার—ডাকলে শিপ্রা। ড্রাইভার এল, শিপ্রা বললে, গাড়ি, এখনি বেরুব। লম্বা এক সেলাম ঠুকে চলে গেল ড্রাইভার।

নির্মল, ঠিক হয়ে নাও, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি—বলে তর তর করে লাফাতে লাফাতে চলে গেল শিপ্রা, ছবির পর্দায় রূপমুগ্ধকে তাক লাগিয়ে নায়িকার হঠাৎ চলে যাওয়ার মত। ফিরে এল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই, মুখে পাউডার, ঠোঁটে রুজ, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পরণে ফিকে সবুজ ভয়েল সাড়ি, পায়ে ভেলভেট স্লিপার, একেবারে সোজা গিয়ে উঠল মোটরে। আমিও বসলাম শিপ্রার পাশে। গাড়ি ছাড়ল।

কোথায় যাবে?—প্রশ্ন করলাম।

কলকাতার বাইরে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে, যেখানে একঘণ্টা শেষ হবে, সেখান থেকেই ফিরব।

গাড়ি গতি নিয়েছে, গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনের উজ্জ্বলতাও বেড়ে চলেছে হুহু করে, বললাম, দি আইডিয়া!

হেমন্তের শেষ, শীতের শুরু, ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক থেকে থেকে এসে লাগছে শিপ্রার অলকগুচ্ছের ওপর, সিঁথির আলগা চুলগুলো উড়ছে এদিক সেদিক। মোটর চলেছে হুহু করে শহর ছাড়িয়ে নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে, হেড্‌লাইটের আলো আগিয়ে চলেছে কালো আঁধারের বুক চিরে।

কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত আমাদের ঢাকা বিলিতি কম্বলে, মাথা এলিয়ে পড়েছে সিটের ওপর, শিপ্রারও, আমারও। শিপ্রার উড়ন্ত চুলের পরশ থেকে থেকে লাগছে আমার গালে, চোখে, মুখে। অনাত্মীয় সঙ্গীর ছোঁয়াচ এড়িয়ে দেহের শুচিতা রক্ষার আড়ম্বর শিপ্রার নেই, শিপ্রা বলে, শুচিতা মনে···তাই লজ্জায় রাঙাও হয়ে ওঠে না কথায় কথায়। মুখে কোন ভাবান্তর নেই, একেবারেই স্বাভাবিক।

আমার দিকে তাকিয়ে শিপ্রা বললে, আমি এখন কি ভাবছি জান?

জানি।

কি বল তো?

যদি কেউ এখন বাদাম ভাজা বেচতে আসত!

মানে?

মানে, ভাবছ গাড়ি থামিয়ে তাহলে চারপয়সা কিনে খেতে কেমন মজা লাগত। তারপর বাদামগুলো ছাড়িয়ে খোসাগুলো দিতে উড়িয়ে চলন্ত গাড়ির বাইরে, চেয়ে থাকতে তাদের পানে, দেখতে বাতাসে উড়ে চলেছে তারা, কোথায়, কোন অজানায় কে জানে! শেষের কথাগুলো বললাম আবৃত্তির সুরে।

হাসল শিপ্রা, বললে, তুমিও কি ভাবছ আমি জানি। তুমি ভাবছ পথে যদি কোথাও মেলা বসত, গাড়ি থামিয়ে, নেমে, নাগরদোলায় কয়েক পাক দোল খেয়ে নিতে। আর সেই দোলার ছোঁয়াচ লাগত তোমার মনে, তোমার গানে, তোমার প্রাণে, কেমন? শিপ্রার শেষের কথাগুলোর মধ্যে আবৃত্তির সুর।

হেসে উঠলাম দুজনেই।

একটু থেমে গম্ভীর হয়েই শিপ্রা বললে, সত্যি, আমি কি ভাবছি জান? পৃথিবীর যদি কারও দুঃখব্যথা না থাকত, সবাই যদি হোত সুখী!

হঠাৎ এই অহেতুক উদারতা?—জিজ্ঞাসা করলাম।

অহেতুক নয়, বললে শিপ্রা। তুমি হয়তো বুঝবে না—গাড়ির গতি যখন আনে মনের মাঝে গতির দোলা, মনটা আপনা থেকেই হয়ে ওঠে উদার, অন্তের হয় কিনা জানিনে, আমার তো হয়। একটু থেমে আবার বললে, বাড়িতে,

স্নাবে, কলেজে মনটা থাকে পঙ্গু হয়ে, বাড়তে পারে না। এই যে চলেছি, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, মনটা আপনা থেকেই বড় হয়ে যায়। পায়ে হেঁটে যখন চলি, নিজের ক্লান্তিতেই শ্রান্ত, পরের দুঃখ দুর করব কি। বাড়িতে কেউ দুঃখের কথা জানালে হাত ওঠে না, গাড়ির গতির মধ্যে হাতের চুড়িও খুলে দিতে পারি।

একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশের গায়, শীতের কুহেলি-মাখা আবরণ ঠেলে রাস্তা মাঠ গাছপালার আঁধার এখনও কাটেনি, আকাশের বুকে কালো নীলের ওপর শুভ্রতার একটু আভাষ শুধু।

কৌতুক করেই হেসে বললাম, বড়লোকের মর্জি, মোটরের স্পাড্ থামলে, লোকটাকে ডেকে চুরি করার অপরাধে জেলে দেবে না তো?

না—অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললে শিপ্রা।

দুজনেই মৌন, পাহাড়ের গুহায় ঝরণার উচ্ছলতা হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার মত। গাড়ি চলেছে উদ্দাম গতিতে, কত দুর এসেছি জানি না, নির্জন রাস্তার বুক কাঁপিয়ে চলেছে গাড়ি, পাশ দিয়েই সমান্তরাল হয়ে চলেছে রেলের লাইন, দূরে সিগন্যালের লাল আলো ক্রমেই আসছে নিকটতর হয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, রাগ করেছ?

তোমার ওপর রাগ করার মত মনের অবস্থা এখন নয়।

অনুরাগ? আবহাওয়াটাকে হাল্কা করার উদ্দেশ্যে বললাম।

না।

তোমার মাকে আজই বলে দেব—তোমাকে আর যেন মোটরে বেড়াতে না দেন!

অপরাধ? অবজ্ঞার সাথে ঠাট্টা মিশিয়ে বললে শিপ্রা।

হাতের চুড়িগুলো তাহলে একগাছাও অবশিষ্ট থাকবে না।

তাতে তোমার ক্ষতিটা কি?

ক্ষতি? তা একটু আছে বৈকি! ভাবী-পত্নীর ওপর দায়িত্ব ভাবী-স্বামীর থাকা স্বাভাবিক শুধু নয়, প্রয়োজনীয়।

সে যখন তোমার পত্নী হয়ে তোমার মোটরে চড়ে চুড়ি বিলিয়ে বেড়াব তখন বোলো, এখন বলা শুধু অস্বাভাবিক নয়, অনধিকার চর্চাও।

শিপ্রার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, এটাও কি অনধিকার চর্চা?

জানিনে—বললে শিপ্রা।

তোমার রাগ এখনও পড়েনি তাহলে। একটু থেমে আবার বললাম, তোমার সাড়ির পাড়টা বেশ।

তোমার সার্টের কলারটা কিন্তু পাড়াগাঁয়ের পরিচয় দেয়, সেদিন কলেজে তন্দ্রাও বলছিল।

কি বলছিল?

তোমার মধ্যে পাড়াগাঁয়ের ভাব আছে।

চোখের তন্দ্রা টুটে গেলে আর বলবেনা।

ও না বললেও আমি বলব।

তুমিও বলবে না।

কি করে জানলে?

স্বামীর নিন্দে কি স্ত্রী করে, তাছাড়া তুমি আমায় ভালবাস।

ভালবাসি বলে খুঁৎ থাকলে বলতে পারব না?

শ্রদ্ধা না থাকলে ভালবাসা যায় না।

শিপ্রা নিরুত্তর, বাইরের দিকে চেয়ে কি ভাবছে যেন। মুখ ফিরিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে ছোট্ট মেয়েটির মতই শিপ্রা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তুমিও শ্রদ্ধা কর আমায়?

করি না? তুমি আমার শিপ্রারাণী—বললাম আমি।

চাঁদের হাসির কণাগুলো এতক্ষণে গাছের মাথা থেকে পিছনে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, রাস্তায়, মাঠে। শিপ্রার আঁচল উড়ছে বাতাসে, চুলের মিষ্টি গন্ধ মনটাকে উদাস করে দিচ্ছে!

ড্রাইভার, ফিরে চল—আস্তে আস্তে বললে শিপ্রা, হাতঘড়িটা আর একবার দেখে নিলে।

দুবছর আগের কথা। কলকাতার বাইরে ছোট শহর, কলেজে পড়ি, থাকি হোষ্টেলে। কলেজের বাৎসরিক উৎসব, গান, আবৃত্তি, তর্কের সভা। কলকাতা থেকে মিষ্টার সেন, বার-এ্যাট-ল এসেছেন সেদিন—এক চাঞ্চল্যকর মামলায় আসামী পক্ষের ব্রীফ নিয়ে। ডাকবাঙলায় গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করা হোল আমাদের তর্কসভার বিচারক হতে। রাজি হলেন তিনি।

সজ্জিত কলেজ প্রাঙ্গণ, মিষ্টার সেন এলেন। কলেজের

অধ্যক্ষ অভিনন্দন জানালেন তাঁকে। শুরু হোল তর্ক, ইংরিজিতে। বিষয়, বিভিন্ন দেশের নারী-জাগরণ ও তার ফলাফল। নারী-জাগরণের শুভদিকটার প্রধান বক্তা আমি। আমার বক্তৃতা শুনে মিষ্টার সেন বলেছিলেন, এ রকম বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও বলার ভঙ্গী কোন ছাত্রের তিনি শোনেন নি। আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, তোমার ভবিষ্যত গড়ে উঠবে হাইকোর্টে, আমিই তার ভার নেব, ওয়াণ্ডারফুল্ তোমার বলার ষ্টাইল্। আবার ঠিকানা নিলেন, পত্রালাপ চলল, তারপর একদিন সে কলেজ ছেড়ে ভর্তি হলাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। থাকবার স্থান হোল সেন সাহেবের বাড়ি, একেবারে বাড়ির ছেলের মত। মিষ্টার সেন—শিপ্রার পিতা।

বন্ধুর বোন মালতী। সেই শহরের কলেজে পড়বার সময় তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, রূপও আছে, রুচিও আছে।

একদিন সন্ধ্যায় মালতী বললে, আপনি ভয়ানক ইয়ে।

ইয়েটা কি?—জিজ্ঞাসা করলাম হেসে।

লজ্জা নেই আপনার একটুও।

কেন?

আমার সামনে মাকে কি বলে বললেন—বিয়ে করবেন আমাকে!

বাঃ, তোমার মা যখন বলেন, নির্মলের সঙ্গে মালতীর বিয়ে হলে বেশ হয়!

মা বলে বোলে আপনিও বলবেন?

কেন, বিয়ে তো হবে, তুমিও জান, আমিও জানি।

জানি বলেই বুঝি বেহায়ার মত—যান, আপনি ভয়ানক ইয়ে—

বেশ, আমি খুব ইয়ে, করবনা তোমার বিয়ে, হোল তো?—বলে হেসে তার হাত ছুটো ধরে বসিয়ে দিলাম সামনের চেয়ারে। আজ পড়া বুঝে নিলে না, কাল বুঝি মারের ভয় নেই ইস্কুলে?

পরণে নীলাম্বরী সাড়ি, গায়ে ঘন লাল ব্লাউজ, খোঁপায় করবীর মালা। মুখে লজ্জার দাগ এখনও মিলায়নি। সন্ধ্যা আসছে নেমে ধীরে—চোখে আমার স্বপ্ন, মালতীর স্বপ্ন। আবৃত্তির সুরে বললাম—

"কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী,
কদম্ব রেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁক নয়নে।"

তারপর বললাম—দেখ, বিয়ের পর একদিন ঠিক ঐ কবিতার ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে কেতকীর পরাগে সুরভি হবে তোমার কালো চুল, কটিতে দুলবে করবীর মালা, বিছানায় কদম্বের রেণু, আর চোখে কাজল! দেখব, তোমার দেহের ছন্দে কবিতার ছন্দ।

আলগাভাবে বন্ধ দুয়ার আচম্‌কা বাতাসে খুলে যাওয়ার মত আবৃত্তির উচ্ছ্বাস আর তার ভাষ্যে মালতীর মনের দুয়োরটা একটু খুলল যেন। ছলছল চোখে চেয়ে মালতী বললে, নির্মলদা, এত সুন্দর আপনি বলতে পারেন, আমি কি আপনাকে সুখী করতে পারব?

আমি মালতীর হাতটা হাতে নিয়ে শুধু ডাকলাম, মালতী।

মালতী চোখ তুলে তাকালে।

দিদি, দিদি—ঘরে ঢুকল শান্তি, মালতীর ছ' বছরের বোন। উৎসাহের সুরে বললে—দিদি, বাবা আমায় ছবির বই দেবে বলেছে। তোমাকে দেবনা কিন্তু! শান্তিকে কাছে ডেকে আদর করে বললাম—দিদিকে দেবেনা, আমাকেও দেবেনা?

না, আপনাকেও না—জোর দিয়েই বললে শান্তি।

মালতীকে বললাম—বাবা, ছবির বই দেবে তাতেই শান্তির কত আনন্দ, আর মা তোমাকে আমার মত বর দেবেন, তাতেও তুমি ঝগড়া করছ আমার সঙ্গে।

বেশ করছি, ভারি ইয়ে আপনি, শান্তি রয়েছে না!

শান্তিকে ডেকে বললাম—শান্তি, মাকে গিয়ে বলতো, দিদি তোমার নির্মলদার সঙ্গে ঝগড়া করছে। ছুটল শান্তি, মালতীর মানা শুনলেনা।

মা এলেন। তখনি নয়, একটু পরে। ঝগড়া মেটাতে নয়, উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে। হেসে বললাম, দেখুনতো মা, মালতী ঝগড়া করছে আমার সঙ্গে। বিয়ের কথা বলেছি—আপনার কাছে তাই আমায় বলছে বেহায়া।

আবদারে ছেলের মত মালতীর মার সঙ্গে ব্যবহার করতাম। নিজের মার মতই দেখতাম তাঁকে।

মা হেসে বললেন, মালতীর কপালে এখন হলে হয়, উনি তো বলছিলেন, শ্রাবণেই যাতে হয়। তোমার বাবার মত হবে তো বাবা ?

হবে না ? বললাম আমি, এমন মেয়ে পাবেন কোথায় ? আর মাতো বলেই দিয়েছেন, বিয়ে হবে আমার পছন্দ মত।

তাই যেন হয় বাবা—মনে মনে বোধ হয় আশীর্ব্বাদ করে মা চলে গেলেন।

লাফিয়ে উঠল মালতী—যান, আপনি ভয়ানক ইয়ে, আপনার সঙ্গে কথা বলব না।

বিয়ে হলেও না ?

না।

ফুলশয্যার রাতেও না ?

না।

ভালই হবে, শ্রাবণের সেই বৃষ্টি-ভেজা রাতটিতে তুমি হবে মূক, আমি হব মুখর—বলে তার খোঁপার মালাটা টান দিয়ে খুলে নিয়ে পরলাম নিজের গলে। কেউ দেখে ফেলার আতঙ্কে শিউরে উঠে মালতী বললে—যান, আপনি ভয়ানক ইয়ে !—ঘর ছেড়ে চলে গেল মালতী।

শ্রাবণের আগেই এল কলেজের বাৎসরিক উৎসব, এলেন মিষ্টার সেন, গেলাম শিপ্রার সান্নিধ্যে।

আরও দু বছর আগে।

গাছপালা, পুকুর, মন্দির ঘেরা আমাদের গ্রাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনিয়ে আসেনি, গোধূলিরও আগে, আকাশের বুকে ভেসে যাওয়া সাদা মেঘগুলোর গায় আবির মাখানো যেন।

মা বললেন—নিমু, অনাদি ঠাকুরপোকে একবার দেখে আয়, কাল থেকে জ্বর হয়েছে। অনাদি ঠাকুরপো বাবার আত্মীয়, দূরসম্পর্কের ভাই।

নিমুদা, নিমুদা—হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল নন্দা। এ সময় ঘরে মার উপস্থিতির কথা ভাবেনি নন্দা। মাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাম তার নন্দরাণী। আমি আর মা ডাকি নন্দা বলে।

কিরে নন্দা, হাঁপাচ্ছিস কেন, কি হোল ?—মা জিজ্ঞাসা করলেন হেসে। একটু স্নেহের চোখেই মা নন্দাকে দেখেন।

কিছু নয়।—মার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে দাঁড়িয়ে রইল নন্দা।

আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে অনাদি কাকাকে দেখতে যাবার জন্যে, পিছু পিছু এল নন্দা। রাস্তায় এসে বললে, নিমুদা, চলতো আমাদের বাড়ি, মা বলে কি, বড় হয়েছিস, রাতদিন ধেই ধেই করে নেচে বেড়ানো আর চলবে না।

বড় হয়েছে নন্দা! এতদিন লক্ষ্য করিনি তো! তাকালাম তার দিকে, দেখলাম মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত, চোখ এসে একটু যেন থমকে আটকে গেল তার বুকের প্রান্তে, চোখেও ভাষা ফুটেছে যেন! এমনিতে অবিশ্যি চোখে পড়ে না—চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে না দিলে।

হেসে বললাম, তার জন্যে তোর মার সঙ্গে ঝগড়া করতে যেতে হবে নাকি ?

হবেই তো!

মেটে রাস্তা, লোকজন নেই, সন্ধ্যার মায়া বুলানো গ্রামের পথ। দূরের কুটীর থেকে ভেসে আসছে মিটি-মিটি প্রদীপের রেখা। নন্দার হাতটা ধরে বললাম, শোন, লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে দিনকতক থাক না! নাইবা বেড়ালি পাড়ায় পাড়ায় ? শুধু আমাদের বাড়ি আসিস, আর কোথাও যাসনে।

তুমি আসবে না আমাদের বাড়ি ?

যাব না ? নন্দার চোখে চোখ রেখে বললাম।

ঘনায়মান সন্ধ্যার শান্ত আকাশের নীচে এত আদরের ভাষণ নন্দা কখনও পায়নি আমার কাছে। চোখে তার লাগল উৎসাহের চমক, আমার চোখে তার বড় হওয়ার হঠাৎ দেখা ছবি!

মুহূর্ত্তের জন্যে চোখটা নামিয়ে নন্দা বললে, কি দেখছ আমার চোখে ?

দেখছি, সত্যিই বড় হয়েছিস তুই!

সেটা বুঝি চোখে লেখা থাকে ?

চোখেই তো আসে তার প্রথম আভাষ।

অত কবিত্ব তোমার বুঝিনে নিমুদা—মানে, তুমিও মার সুরে সুর মিলিয়ে বলতে চাও, নেচে বেড়ানো আর চলবে না, এই তো ?

খুব যে কথা শিখেছিস ? এখন যদি নাচতে হয়, নাচবি শুধু আমার সামনে, বুঝলি ?

মাথাটা সে দুলিয়ে দিলে 'না' বলার ভঙ্গিতে, চোখেই প্রকাশ করলে ভাবটা, মুখে বললে, উঁহু। মাথা দুলিয়ে উঁহু বলাটা বড় সুন্দর লাগল চোখে, হাতটা ধরে আলগা-ভাবে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, দুষ্টুমি হচ্চে ?

আবার মাথা দুলিয়ে বললে, উঁহু! মুখে সেই মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি। নন্দাকে দেখলাম নতুন রূপে, রূপকথার ঘুমন্ত মেয়েটা যেন সাড়া দিয়ে জেগে উঠল। কাছে টানতে গেলাম, দূরে সরে গেল, মুখে সেই দুষ্টুমি-মাখা হাসির সঙ্গে মাথা দুলিয়ে বলা, উঁহুঁ।

আগে হলে হয়তো বলত—ধ্যেৎ, এখন হাসির সঙ্গে উঁহুঁ, ধরা দিতে আপত্তি নেই, ধরা পড়তে আপত্তি! বড় তাহলে সত্যিই হয়েছে নন্দা!……

নন্দা আরও বড় হওয়ার আগেই গ্রামের পাঠ সাঙ্গ করে করে এলাম ছোট শহরের বড় কলেজে।

শিপ্রার সাথে মোটর অভিযানের দু বছর পর।

শিপ্রার মন-তটে কুটীর বেঁধে বিলাত-ফেরত নবাগত তরুণ জয়ন্ত। মালতীকুঞ্জে গুঞ্জন করে কলেজ হতে নবাগত কমলেশ। আর নন্দা অভিনন্দন জানালে রমাপ্রসাদকে, জেল হতে নবাগত দেশভক্ত রমাপ্রসাদ।

আমি মালা দিয়েছি মিলার গলে, অপরিচয়ের অন্তরাল হতে নবাগতা শিক্ষিতা তরুণী মিলা।

বিছানায় ছড়ানো ফুলের রাশি—বেলা, যুঁই, রজনীগন্ধা, গোলাপ, আরও কত কি। মিষ্টি একটা সৌরভ। ফুলশয্যার রাত। অপরিচয়ের আড়াল মনের আড়ালে কখন কি ভাবে খসে পড়ল—জানা গেল না। শিহরণ সমস্ত দেহে, স্বপ্নের আবেশ মনে। মিলা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, বিয়ের আগে ভালবাসতে না কাউকে ?

মিলাকে বুকের নিবিড়তায় টেনে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, নাঃ।

প্রশ্ন করলাম, তুমি ?

একই উত্তর, নাঃ।

শঙ্খ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সিন্ধুতলের গহন গুহায়
কবে তুমি জন্ম নিলে,
বাল্যে তুমি ইন্দিরা যার
সান্ধ্য খেলায় সঙ্গী ছিলে।
কোথায় গভীর সিন্ধুপুরী
যারে রবির কর না চুমে।
কোথায় শ্যামল বঙ্গীযেরা
পল্লীভবন বঙ্গভূমে।
কে আনিল হেথায় তোমা
এলে তুমি কিসের তরে ?
মৃত্যু পথের দুঃখে দহি
এলে যে এই লোকান্তরে।
রাঙা ঠোঁটের চুমায় তোমায়
অঙ্গে আবার শিহর লাগে।
রক্ত পরশ পেয়ে ও শ্বেত
কঙ্কালে কোন জীবন জাগে।

অম্বুনিধির সুগভীরা
সুপ্ত ধ্বনি আনলে বয়ে,
ও পঞ্জরে কম্বু তোমার
জাগে আবার পূর্ণ হ'য়ে।
বধূর মণিবন্ধ দুটি
বাঁধলে তুমি শ্রীবন্ধনে,
সেবা শোভা শুভের মাঝে
লক্ষ্মী মায়ের আবাহনে।
শঙ্খ তুমিই জানিয়ে দিলে
সিন্ধু-ভবন ছেড়ে এসে,
গৃহে গৃহে রাজেন হেথা
পদ্মালয়া হৃদয় দেশে।
লক্ষ্মী-ছাড়া হ'তে মরেও
চাওনি তুমি। কেউ না জানে
কেন এলে, কেউ জানে নি
এলে তুমি প্রাণের টানে।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

সানফ্রান্সিসকোতে চীনেদেরও বেশ একটি বড় ঘাঁটি আছে—তাকে বলা হয় China Town। এই চীনে পল্লীর বাড়ীগুলি চীনদেশের

সানফ্রান্সিসকোর চায়না টাউন

ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিভার্সিটি (ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিয়ন)

শিল্পানুকরণেই তৈরী। পল্লীর ভেতরে ঢুকলে মনে হয় চীনদেশে এলাম। চীন দেশের স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প এখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাড়ী, ঘর, দোকান, রেষ্টুরেন্ট সবই তাদের দেশীয় কায়দায় সাজানো। আমেরিকায় বিভিন্ন দেশের লোক তাদের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন পল্লী-গঠন করে বসবাস করছে এবং সবাই মিলে হয়েছে "আমেরিকান" জাতি। আমরা সমুদ্র-সৈকতে এসে নামলাম। প্রশান্ত মহাসাগর তীরে বালির
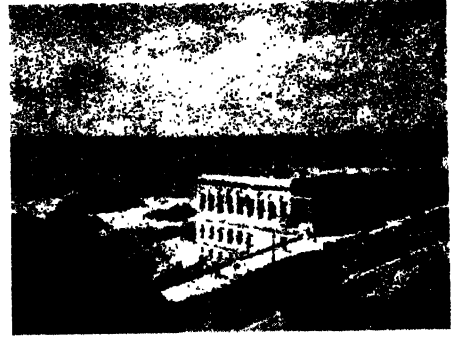
সানফ্রান্সিসকো ক্লিফ হাউস ও শীলশৈল, (সমুদ্রগর্ভের এই ছোট ছোট পাহাড়গুলিতে সর্ব্বদা শীল মাছ থাকে)

ওপর দাঁড়িয়ে মনে হলো—ঐতো ও পারেই আমাদের দেশ, আমরা ঘুরতে ঘুরতে ভারতবর্ষের কত কাছে এসে পড়েছি। মাঝখানে এই সাগরটুকুই যা ব্যবধান। সমুদ্রের পাড়ের কাছে অর্দ্ধজল-মগ্ন দুটী-শীলা-খণ্ডের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। বড় শীলাস্তুপটির উপর অসংখ্য শীল মাছ শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কতকগুলি আবার পাথরের গা-বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে জলে নামছে। পাশের আরেকটি শীলায় এক ঝাঁক Seagulf বসে আছে। শীতকালে শীল মাছগুলি জলের তলায় চলে যায় এবং পাখীর ঝাঁকও উড়ে পালায়; আবার গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হয়। এই সাগর তীরে বেড়াতে বেড়াতে কত নূতন দেশের মানুষের সাথে আলাপ পরিচয় হ'লো। আমেরিকার দক্ষিণ ষ্টেটেরও লোক দেখলাম। আমাদের এই ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি তাদের কৌতুহল একটু অতি মাত্রায় দেখা যাচ্ছিল। সাঁচ্চা জরির সূক্ষ্ম কাজ ও সাঁচ্চা সিল্কের শাড়ী দেখে তারা অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। এদেশে ক্যারেট গোল্ডের গহনাই বেশী দেখা যায়। নকল মুক্তা ও নকল

পাথরের ছড়া ছড়ি। মেয়েরা যথেষ্টই গহনা পরে থাকে। গলায় পরে মোটা শিকল প্যাটার্ণের হার, আর হাতে জড়ানো 'বিজ্ঞাপনের' মালা—

সানফ্রান্সিস্‌কো য়ুনিয়ন স্কোয়ার

অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানীর মার্কামারা জিনিষগুলি ছোট ছোট খেলনার মত তৈরী করে এই মালায় ঝোলানো। অনেকের সঙ্গেই যথেষ্ট আলাপ পরিচয় হ'লো, ছবি তোলা ও নাম ঠিকানার পালা শেষ হ'লে হোটেলের দিকে রওনা হ'লাম। আজ রাত ৮টায় Rotaryর প্রথম উদ্বোধন উৎসব দেখতে Civic Auditoriumএ গেলাম। হল ঘরে ঢুকে লোক দেখে অবাক। প্রায় বিশ হাজার লোক আসন অধিকার করে বসে আছে। সামনে একটা বিরাট ষ্টেজ, ষ্টেজের ওপরে ঝুলছে প্রকাণ্ড একখানি চক্রচিহ্নিত পতাকা। জমকালো পোষাক-পরা কণসার্ট পার্টির বাজনা শেষ হ'লে নাচগানের পালা সুরু হ'লো। শেষে California Pagentry দেখান হোলো। কিছুক্ষণ যেন আমরা Californiaর প্রাচীন যুগের জীবন ধারার মধ্যে এসে পড়লাম। এই নিভৃতকোণের অজ্ঞাত স্থানটি কেমন করে সুসভ্য মানব সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ আবাস ভূমিতে পরিণত হ'ল তারই জীবন্ত ছবি চোখের সামনে যেন রূপায়িত হ'য়ে উঠলো। রাত প্রায় ১১টায় আমরা ফিরে এলাম।
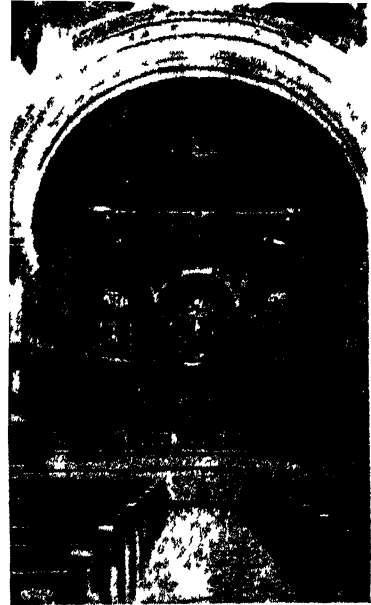
১০ই জুন। San Franciscoতে আসার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল Californiaর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিন কয়েক বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করা। Rotary conventionএর উৎসবে যোগ দিয়ে দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটছে। সকালে বেড়াতে বেড়িয়েছি, একটা সুন্দর পার্কে এসে দেখি পার্কের নীচে মাটীর তলায় (underground) মস্ত বড় একটি গাড়ীর গ্যারেজ রয়েছে। সেখানে প্রায় ২০০০ গাড়ী রাখা যায়। এই সব গাড়ী নিয়ন্ত্রণের জন্য ভিতরে রীতিমত সকল রকম বন্দোবস্ত রয়েছে। হোটেলে ফিরে এসে অলস নিদ্রায় দুপুরটা কাটানো গেলো। বিকেলে শহর ঘুরতে বেরোলাম। এ কয়দিন সকাল সন্ধ্যা Rotary convention এর নানারকম প্রোগ্রাম চলছে। বেড়িয়ে হোটেলে এসে সান্ধ্য আহারের জন্যে Coffee Shopএ যাচ্ছি, এমন সময় একজন Rotarian সেইখানেই আলাপ জমিয়ে একরকম জোরকরে ডিনার খাবার জন্যে একটি ইটালিয়ান Rendezvousএ নিয়ে গেলেন। এঁরা সব Oakland অধিবাসী। রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে দেখি বড় একটি টেবিল সুন্দর সাজানো রয়েছে; বুঝলাম পূর্ব্বেই রিজার্ভ করা ছিল। সুন্দর Italian Serenade বাজছে; আমরা টেবিল ঘিরে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে লাউড স্পীকার মারফৎ হোটেল ম্যানেজার, "ভারতীয় Rotariun মিত্র পরিবারকে সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি" বলে ঘোষণা করলেন। Song of India গানটী বাজানো হ'লো। একব্যক্তি মাইক্রোফোণের

উপাসনা মন্দিরের অভ্যন্তর

সামনে এসে গান ধরলেন। টেবিলে খাবার এলো—লাল বড় বড় কাঁকড়ার দাঁড়া সেদ্ধ একটি ডিসে সাজানো, তার সঙ্গে রয়েছে ভিন্ন

ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিভার্সিটির
যাদুঘর

ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিভার্সিটির
লাইব্রেরী

ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিভার্সিটির স্মরণী
গির্জ্জা বা উপাসনা মন্দির
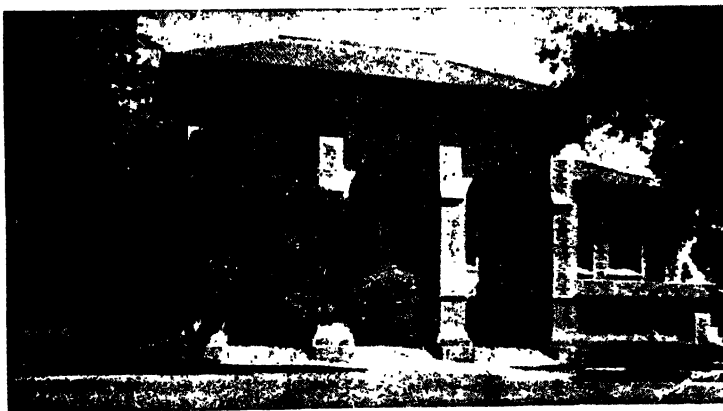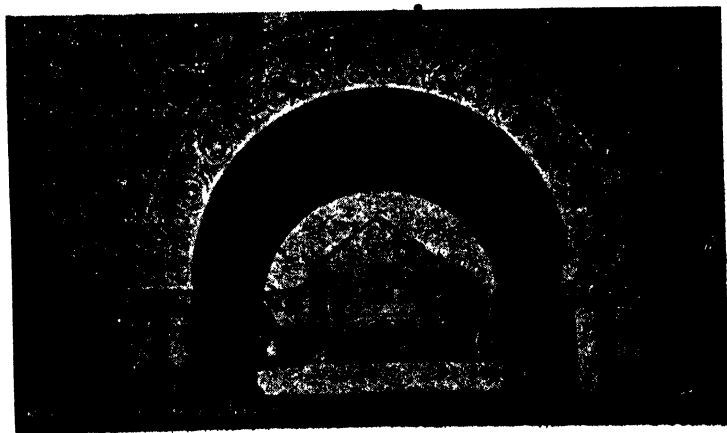
কাঁচা সবজি ও চাটনি। আস্ত বড় বড় কাঁকড়াগুলি এমন সুন্দর করে ভাজা যে হাতে ধরে খোলা খুলে অনায়াসে কাঁটার সাহায্যে মাছ বার করে খাওয়া যায়। খুব খুশী হ'য়ে আমি আর খুকু কাঁকড়া খেতে লাগলাম। বন্ধুরা নৃত্য সুরু করলেন; আমাদের জাতীয় সঙ্গীত শোনাবার জন্তে লাউড্‌স্পীকার মারফৎ অনুরোধ এলো। কি করি, ভীষণ অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হয়ে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হলো—"বন্দেমাতারম্‌" সঙ্গীতের এককলি গেয়ে ফিরে এলাম। কয়েকটি ইটালিয়ান গান শুনে আমার খুবই ভালো লাগলো। সুরের ঝঙ্কার তুলে দ্রুতগতির গানগুলি বেশ মাতিয়ে তুলেছিল। Waiter বিল নিয়ে এলো, আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একমুঠো ডলার তুলে বিলের ওপর ফেলে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। গোনাগুন্তির বালাই নেই। উনি উঠলেন বিল দেবার জন্তে, ভদ্রলোক ওর হাত ধরে বল্লেন "আপনারা আমাদের অতিথি, আমরা যখন আপনাদের দেশে যাবো আপনারাও আমাদের খাওয়াবেন।" তারপর সবাই মিলে Civic Auditorium এ গেলাম। সেখানে সেদিন রেটারিয়ান পরিবারদের উৎসব চলেছিল। আমরা Balconyতে বসে দেখতে লাগলাম। হাজার হাজার লোক এক সঙ্গে নেচে চলেছে। চারিদিকেকালো কালো মাথাই ঘুরছে, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

বুধবার ১১ই জুন। আজ আমরা Standford university দেখতে যাবো। সেখানে একজন প্রফেসারের সঙ্গে ওঁর কিছু কাজও রয়েছে। সকালের আহার সেরে Bus ষ্টেশনে গেলাম। Standford university san Foransisco থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। দূরে যাতায়াতের জন্ত এই বাস ষ্টেশনগুলিতে অতি সুন্দর বন্দোবস্ত রয়েছে। আমরা Loud speakerএর নির্দ্দেশমত বাসে গিয়ে উঠলাম। সমুদ্রের ধারে ধারে চলেছি, একদিকে পাহাড় আর একদিকে জল—মাঝখানের সরু পথ দিয়ে চলেছে আমাদের বাস। খুকু আর উনি একদিকে বসেছেন, আমার পাশের সিটটি খালি। মাঝ পথে একটি নিগ্রো পুরুষ ও মহিলা উঠলো। মহিলাটি আমার পাশে এসে বসলো, নিগ্রো পুরুষটি জনৈকা আমেরিকান মহিলার পাশে একটি খালি সিটে গিয়ে বসলো। আমেরিকান মহিলাটি বেশ উসখুস করে উঠলেন। Coloured People পাশে বসেছে, অসোয়াস্তির সীমা নেই, অবশেষে আমার পাশের সেই নিগ্রো মহিলাটিকে ডেকে গদগদ ভাবে বললেন "তোমরা দুজনে একজায়গায় বসতে পেলে নিশ্চয় খুসী হবে। আমার মনে হয় তুমি আমার জায়গায় এসে বসো, আমি তোমার সিটে গিয়ে বসি।"

নিগ্রোমহিলাটি এর অর্থ বুঝেছিলো; সে উত্তর দিলো, "Seat makes no difference to me" আমার কাছে সিটের স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই, তুমি যদি ইচ্ছা করো তো অন্ত সিটে উঠে যেতে পার।" মুখের উপর উত্তর পেয়ে আমেরিকান মহিলাটি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলেন। নিরুপায় হ'য়ে তিনি চুপ করে বসে রইলেন। Coloured People এর (নিগ্রোজাতি) ভাগ্যে এদেশে নিত্য এই রকম বহু অসম্মানকর ঘটনা ঘটে। অপমানে ও অমর্য্যাদায় দিন কাটানো এদের জন্মকাল থেকেই অভ্যাস করে নিতে হয়। সামান্ত পথে ঘাটে চলাফেরা থেকে আরম্ভ করে ইউনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্ক ও সাবধান হ'য়ে স্বতন্ত্র আইন কানুনের নিষেধাজ্ঞা পালন করে চলতে হয়। বড় বড় সিনেমায়, থিয়েটারে, হোটেলে,—রেষ্টুরেন্টে, হাসপাতালে, স্কুল কলেজে এমন কি ইউনিভার্সিটিতে পর্য্যন্ত এদের প্রবেশ নিষেধ। এদের খাবার ঘর, স্কুল কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি সবই স্বতন্ত্র। তবে মুটে মজুর ও দাসদাসীর কাজে এদের সর্ব্বত্রই দেখা যায়—সেখানে এরা একান্ত অপরিহার্য্য। এমনও দেখা গিয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ গুণী ও বিদ্বান নিগ্রোর সঙ্গে আমেরিকানদের কোন অফিসে কাজ করতে হলে অফিসের দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে তাঁরা নিগ্রো সহকর্ম্মীকে চিনতেই পারেন না এবং পরিচয়ও অস্বীকার করে থাকেন। অথচ এই আমেরিকানরাই ভারতের Caste System নিয়ে সমালোচনায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন। এ দেশে এখন নিগ্রোর সংখ্যা খুব কম নয়, প্রায় ১ কোটী ৩০ লক্ষ। প্রতি দশ জনের একজন হল নিগ্রো।
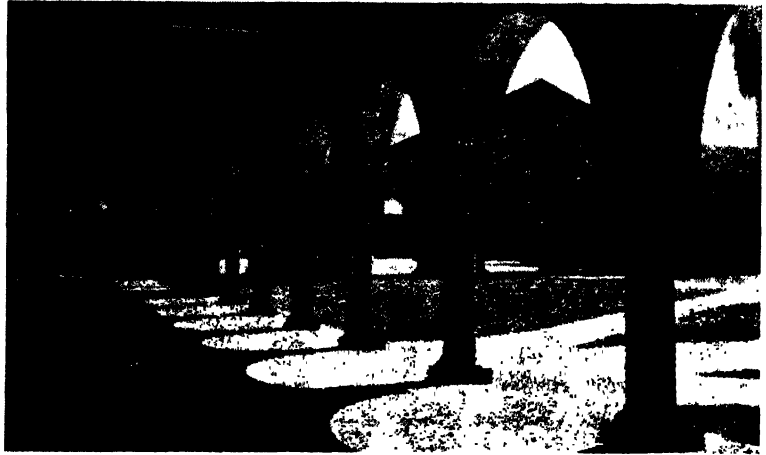
উপাসনা মন্দিরের দীর্ঘ প্রশস্ত অলিন্দ

বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

মহাত্মা গান্ধী বলতেন—যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা এবং শত্রুর দ্বারা নিহত হওয়া সাহসের পরিচায়ক ; কিন্তু শত্রুর আক্রমণ সহ্য করা এবং সে জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করা, তার চেয়েও বড় সাহসের কাজ।

মহাত্মার এই মহৎ বাণীকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট বিপ্লবের সময় কাজে রূপ দিয়েছিলেন, তাঁরই মন্ত্র-শিষ্যা বাঙ্গলার এক বীর রমণী। এক হাতে রণশঙ্খ, অপর হাতে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জাতীয় পতাকা নিয়ে, হাসিমুখে তিনি শত্রুসৈন্যের প্রচণ্ড বুলেট ললাটে বরণ ক'রে প্রাণ দিয়েছিলেন। ভারতের গৌরব বাঙ্গলার এই মহিয়সী মহিলার নাম মাতঙ্গিনী হাজরা।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত হোগলা গ্রামে ১২৭৭ বঙ্গাব্দে এক মাহিষ্য-পরিবারে মাতঙ্গিনীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস মাইতি। ঠাকুরদাসের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তবে মাতঙ্গিনী ভিন্ন তাঁর আরও দুইটি কন্যা ছিল। ঠাকুরদাসের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। গরীব পিতার গৃহে সাধারণ আর পাঁচজন মেয়ের ন্যায়ই মাতঙ্গিনীরও শৈশব অতিবাহিত হয়।

হোগলা গ্রামের নিকটবর্তী আলিনান গ্রামের ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে বাল্য বয়সেই মাতঙ্গিনীর বিবাহ হয়। মাতঙ্গিনী ছিলেন ত্রিলোচন হাজরার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ত্রিলোচন হাজরার প্রথম পক্ষের স্ত্রী, মহেন্দ্র নামে একটি পুত্র সন্তান রেখে মারা গেলে, তিনি দ্বিতীয়বারে মাতঙ্গিনীকে বিবাহ করেছিলেন। ত্রিলোচনবাবু অবস্থাপন্ন এবং গ্রামের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করার অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মাতঙ্গিনী দেবীর বয়স তখন মাত্র ১৮ বৎসর। তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। তবে তিনি মহেন্দ্রকে নিজের পুত্র ব'লেই মনে করতেন এবং মহেন্দ্রও বিমাতাকে নিজের মায়ের মতই দেখতেন।

বিধবা হবার পরই মাতঙ্গিনী দেবী তাঁদের কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেন এবং অতি শুদ্ধভাবে বিধবার জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি এক বেলা মাত্র আতপ চালের অন্নগ্রহণ করতেন এবং নিয়মিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতেন। ইষ্টমন্ত্র জপ না ক'রে তিনি কখনও জলগ্রহণ করতেন না। এইভাবেই নিজের ধর্ম-কর্ম ও সংসারের কাজকর্ম নিয়েই মাতঙ্গিনীর জীবনের অনেক বছর কেটে যায়।

এরপর আসে ১৯৩০ সাল। এই বছরের প্রথম দিকেই মহাত্মা গান্ধী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেসকে আইন অমান্যের নির্দেশ দিলেন। মহাত্মা গান্ধী নিজে লবণ-আইন অমান্য করবার জন্য পদব্রজে বেরুলেন তাঁর আশ্রম থেকে দু'শ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডী অভিমুখে। মহাত্মার ডাণ্ডী-অভিযানের প্রতিপদক্ষেপে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল, আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারত। এই আন্দোলনের এক প্রবল বন্যা এল, ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রদূত মেদিনীপুরেও। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, মেদিনীপুরের বীর সন্তান দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে সমগ্র মেদিনীপুর ঝাঁপিয়ে পড়ল এই আন্দোলনে।

মাতঙ্গিনী দেবীর শ্বশুরালয় আলিনান গ্রামেও এই বন্যার একটা ঢেউ এসে পৌঁছল। আলিনানের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই গা ভাসালেন এই স্রোতে। মাতঙ্গিনী দেবীর বয়স তখন প্রায় ৬০ বছর। বিধবা মাতঙ্গিনী কিন্তু এই সময়েও তাঁর ধর্মকর্ম ছেড়ে তেমন সক্রিয় ভাবে যোগ দিলেন না এই আন্দোলনে। তবে আন্দোলনের সুরু থেকেই তিনি এর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং একটা যোগসূত্র বজায় রেখে-ছিলেন। কারণ এই আন্দোলনকালে আলিনানের যুবকরা যে স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গঠন করেছিলেন, সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শিবির স্থাপিত হয়েছিল, মাতঙ্গিনী দেবীর দেওয়া তাঁরই জায়গায় এবং শিবিরটি ছিল আবার তাঁরই বাড়ীর ঠিক সম্মুখে।

১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে, কংগ্রেসের লবণ-আইনে অনেকাংশে জয় হ'লে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং এই সময়েই তিনি ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে বিলাতে গেলেন গোলটেবিল বৈঠকে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ইংরাজের কূট চালে গোলটেবিল বৈঠক বিফলতায় পর্যবসিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী তখন শূন্যহস্তেই ভারতে ফিরে এলেন। মহাত্মার ভারতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার দিকে দিকে আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। এটা তখন ১৯৩২ সাল।

সমগ্র দেশের সঙ্গে আলিনানের কংগ্রেস কর্মীরাও পুনরায় সেই আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন। এই বৎসর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীনতা দিবসে আলিনানের কর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক'রে ও স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ ক'রে এক শোভাযাত্রা বা'র করলেন। সেদিন ঐ শোভাযাত্রায় কোনও মহিলা ছিল না, শুধু মাত্র কয়েকটি বালিকা শঙ্খধ্বনি করতে করতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছিল।

এই শোভাযাত্রাটি যখন মাতঙ্গিনী দেবীর কুটীরের কাছাকাছি এল, মাতঙ্গিনী দেবীও তখন একটা শাঁখ নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করে দিলেন এবং শঙ্খধ্বনি করতে করতেই এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। তারপর শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে শঙ্খধ্বনি করতে করতে সকলের সঙ্গে সমগ্র ইউনিয়ন প্রদক্ষিণ করলেন।

এই দিনটি মাতঙ্গিনী দেবীর জীবনের এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। এইদিন হতেই তিনি কংগ্রেসে একরূপ পুরাপুরিভাবেই যোগ দিলেন, এবং তাঁর গুরুর দেওয়া ইষ্ট-মন্ত্রের ন্যায় স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ ক'রে কংগ্রেসের অহিংসা মন্ত্রেও দীক্ষা নিলেন। তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিনটিতে তিনি আর একটি ব্রত নিয়ে ছিলেন। সেটি ছিল মহাত্মা

গান্ধীর নির্দেশিত গঠনমূলক কর্ম পদ্ধতির অন্যতম নির্দেশ মাদক-বর্জন। মাতঙ্গিনী দেবী বার্ধক্যে বাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বাতের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য একটু একটু আফিং খেতেন। মাদক-বর্জন নীতি হিসাবে তিনি এই দিন হতেই বরাবরের জন্য আফিং ছেড়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরপর থেকে তিনি আর কোনও দিনই বাতে আক্রান্ত হন নি।

কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে মাতঙ্গিনী দেবী ১৯৩২ সালেই কয়েক স্থানে আইন অমান্য করলেন এবং ঐ বৎসর শেষের দিকে তিনি তমলুক থানা ও তমলুক দেওয়ানী আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। আইন অমান্যকালে পুলিস প্রতিবারেই তাঁকে গ্রেপ্তার করল, তবে বৃদ্ধা ব'লে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ক'রে আটক রেখে তাঁকে ছেড়ে দিল।

১৯৩৩ সালে বাঙ্গলার সেই সময়কার গবর্ণর তমলুকের এক সরকারী সভায় তমলুকবাসীদের শান্ত করবার জন্য বক্তৃতা দিতে যান। এই সময় মাতঙ্গিনী দেবী কালো পতাকাসহ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের এক শোভা-যাত্রা পরিচালনা ক'রে "গবর্ণর ফিরে যাও" ধ্বনি করতে করতে সভার নিকটবর্তী হন। সেই সময় পুলিস বাধ্য হয়ে মাতঙ্গিনী দেবীকে গ্রেপ্তার করেছিল। এই গ্রেপ্তারের ফলে মাতঙ্গিনী দেবীর ছ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

জেল থেকে বেরিয়ে মাতঙ্গিনী দেবী এবার কংগ্রেসের কাজে আরও নিবিড় ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের একজন সেরা সৈনিক হিসাবেই কাজ ক'রে গেলেন। ১৯৩২ সালের পর থেকে তমলুক কংগ্রেসের সকল কাজে ও অনুষ্ঠানেই তিনি যোগ দিতেন।

স্বল্পায়ু বাঙ্গালীর জীবনে, যারা বা কদাচিৎ সত্তর বাহাত্তর বৎসর বয়সে গিয়ে পৌঁছায়, তাদের প্রায় সকলেই এই বয়সে বার্ধক্যে অকর্মণ্য হয়ে, মরণের জন্য দিন গণতে থাকে। কিন্তু মাতঙ্গিনী দেবী তাঁর এইরূপ বয়সেও দশ পনর মাইল পর্যন্ত গেঁয়ো মেঠো পথ হেঁটে গিয়ে কংগ্রেসের সভায় ও কাজে যোগ দিতেন। ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুর শহরে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের মহিলা শাখার যে অধিবেশন হয়, তাতেও তিনি তমলুক থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

মাতঙ্গিনী দেবী কংগ্রেসের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানার চেষ্টা করতেন। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর থেকে তিনি মহাত্মার নির্দেশানুযায়ী অতি নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন চরকায় সূতা কাটতেন এবং নিজের হাতেকাটা সূতার বোনা কাপড় পরতেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এই বৃদ্ধার এমনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল যে, কখন যদি তাঁর অসুখ করত, তিনি আদৌ ওষুধ খেতেন না ; মহাত্মা গান্ধীর নামে "সিন্নিজল" খেতেন এবং তাতেই নাকি তাঁর অধিকাংশ ব্যাধিও সেরে যেত। মহাত্মার প্রতি এত শ্রদ্ধা ছিল ব'লে মেদিনীপুরের লোকে তাঁকে "গান্ধীবুড়ী" ব'লে ডাকত।

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীকুমারচন্দ্র জানা, তমলুকের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা প্রায়ই মাতঙ্গিনী দেবীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী দেবী স্বহস্তে পাক ক'রে তাঁদের খাওয়াতেন। অতিথি সেবা করা এই বৃদ্ধার যেন এক ব্যাধি বিশেষ ছিল। তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গেও মাতঙ্গিনী দেবীর বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি নিজে মাঝে মাঝে নানা রকমের খাদ্য প্রস্তুত ক'রে আশ্রমের সাধুদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। এই সব বিশিষ্ট অতিথি ছাড়াও পাড়ার কি গ্রামের কেউ অভুক্ত থাকলে, তিনি তাকে ডেকে এনে খাওয়াতেন, অথবা তার খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। কেউ কাপড়ের অভাবে পড়লে, তিনি তাকে কাপড়ও কিনে দিতেন। এসব ছাড়াও তিনি নিজের গ্রামে অথবা আশ পাশের কোন গ্রামে কারও কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ হলেও সেবা করতে যেতেন।

বৃদ্ধ বয়সে মাতঙ্গিনী দেবীর একবার কঠিন আমাশয় হয়। সকলেই তাঁকে ওষুধ খেতে বললেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ওষুধ খেতে চাইলেন না। "গান্ধীজল" খেয়েই পড়ে রইলেন। তিনি সকলকে বললেন—রোগে আমি কখনই মরব না। রোগে আমার মৃত্যু নেই। আমি দেশের জন্য প্রাণ দোব।

মাতঙ্গিনী দেবীর এই বিশ্বাস সত্য সত্যই কাজে পরিণত হয়েছিল। তিনি কঠিন আমাশয় থেকে সেরে উঠলেন এবং দেশের মুক্তি-সংগ্রামে ১৯৪২ সালের আগষ্ট-বিপ্লবে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট বোম্বাই অধিবেশনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারতের সুমহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে ইংরাজদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। কংগ্রেস কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লে, পরদিন সকালেই ভারতের বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীসহ কংগ্রেসের সকল নেতাকেই গ্রেপ্তার করল। কংগ্রেস-নেতাদের এই আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল এবং তারই ফলে ভারতের দিকে দিকে সঙ্গে সঙ্গেই এক ভীষণ আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলনই ভারতের ইতিহাসে আগষ্ট-আন্দোলন নামে খ্যাত।

কর্ণধারহীন তরণী যেমন প্রবল বাত্যায় নিজ ইচ্ছায় এদিকে ও ওদিকে ঘুরতে থাকে, আগষ্ট আন্দোলনে ভারতের বিক্ষুব্ধ জনগণও তেমনি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাভাবে নিজেরাই নিজেদের পথ প্রদর্শক হয়ে আন্দোলনে মেতে উঠেছিল। তাই এই আন্দোলন কোন কোন স্থানে কংগ্রেসের অহিংসার নীতি ত্যাগ ক'রে হিংসার পথও নিয়েছিল ; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণ অহিংস পথেই আন্দোলন চালিয়েছিল। কিন্তু সরকারের অত্যাচার ও দমননীতি সর্বত্রই অমানুষিক আকার ধারণ করেছিল।

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পরই আগষ্ট-আন্দোলন একপ্রকার যুগপৎ সমগ্র ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। তবে যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, বিহার এবং পশ্চিম বাঙ্গলাতেই এই আন্দোলন দ্রুত গতিতে বিস্তার

লাভ করেছিল। বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী সমগ্র মেদিনীপুরেই, বিশেষ ক'রে এই জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বাঙলা দেশের মধ্যে অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা তমলুকেই অধিকসংখ্যক লোক পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল। প্রথম থেকেই এখানে আন্দোলন সুরু হয়েছিল এবং এই আন্দোলনে তমলুক জয়ীও হয়েছিল। তমলুকবাসীরা এখানে দুই বৎসরকাল স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। যে সব শহীদের জীবনের বিনিময়ে এই জয় সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুকে বিপ্লবীদের ৫টি বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা সুপরিকল্পিত উপায়ে ৫টি বিভিন্ন স্থান থেকে আরম্ভ ক'রে তমলুকের আদালত ও থানার দিকে যেতে থাকে। এই ৫টির মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেটি শহরের উত্তর পথ দিয়ে প্রবেশ করে। এই দলেরই পরিচালিকা ছিলেন ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। এই দলে আরও কয়েকজন মহিলা ছিলেন। মাতঙ্গিনী দেবী একহাতে শঙ্খ আর একহাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে শোভাযাত্রা পরিচালনা ক'রে নিয়ে চলেছিলেন।

এই শোভাযাত্রায় প্রায় ৮হাজার লোক ছিল এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মিলিত এই শোভাযাত্রা ছিল। শোভাযাত্রাটি আদালতের অদূরে "বানপুকুরের" নিকটবর্তী হ'লে প্রথম পুলিসের কাছে বাধা পেল।

এই সময় গোরা ও দেশী সৈন্যে তমলুক শহর ভর্তি ছিল এবং শহরটিকে যেন একটি দুর্গে পরিণত করা হয়েছিল। প্রতি সড়কেই লাঠি নিয়ে সিপাহীরা পাহারা দিচ্ছিল এবং সিপাহীদের পিছনে পিছনে সর্বত্র রাইফেলধারী সৈন্য ছিল।

মাতঙ্গিনী দেবীর পরিচালনায় যে শোভাযাত্রাটি বানপুকুরের কাছে এল, পুলিস তাতে প্রচণ্ডভাবে লাঠি চালাতে আরম্ভ করল। অহিংস ও শান্ত শোভাযাত্রা লাঠি উপেক্ষা ক'রেই অগ্রসর হতে লাগল। দুএকজন যারা লাঠির আঘাতে ইতস্ততঃ হয়ে পড়েছিল, মাতঙ্গিনী দেবী চীৎকার ক'রে তাঁদের বলতে লাগলেন—ভাই সব ভয় পেও না কেউ। মেদিনীপুরের বীর সন্তান তোমরা। এগিয়ে এস। একদিন ত মরতেই হবে, আজ বীরের মতই মরি এস।

দু একজন যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, মাতঙ্গিনী দেবীর আহ্বানে তারা আবার ফিরে দাঁড়াল। এই সময় রণরঙ্গিণীর ন্যায় মাতঙ্গিনী দেবী বীরদর্পে আগিয়ে চললেন শোভাযাত্রা নিয়ে। বামহাতে তাঁর যে রণশঙ্খ ছিল, তাতে তিনি ধ্বনি করতে লাগলেন এবং তাঁর ডান হাতের জাতীয় পতাকা বাতাসে উড়তে লাগল পত্ পত্ করে।

এই সময় লাঠি চালনা ব্যর্থ হ'ল দেখে সেনাবাহিনীর কর্তা অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য বেপরোয়া গুলি চালাতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ পেয়ে এগিয়ে এল রাইফেলধারী সৈন্যদল। মাতঙ্গিনী দেবী ছিলেন শোভাযাত্রার পুরোভাগে; তাই প্রথমেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করা হ'ল। প্রথম গুলি এসে লাগল তাঁর বামহাতে। ফিনিক দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল। তবুও ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধার চলার গতি বন্ধ হ'ল না। কারণ এক অপূর্ব প্রেরণা নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি আজ।

"ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণকালে মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশবাসীকে এক মন্ত্র দিয়েছিলেন—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"—হয় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করব, না হয় মরব। মাতঙ্গিনী দেবী সেই মন্ত্র আজ সফল করার পণ নিয়ে বেরিয়েছেন। শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুবার সময় তিনি ব'লে বেরিয়েছিলেন—আজ আমি আর ফিরছি না। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" মন্ত্র সফল করবই।

তাই গুলিবিদ্ধ হয়েও মাতঙ্গিনী দেবী ফিরলেন না, বা এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করলেন না। শোভাযাত্রা নিয়ে যেমন চলেছিলেন তাঁর চলার গতি তেমনিই অব্যাহত রইল। বরং গুলির আঘাত খেয়ে তাঁর প্রেরণা আরও দ্বিগুণ বর্ধিত হ'ল। ঠিক এই সময়ে সৈন্যদের বন্দুক থেকে আর একটা গুলি গর্জন ক'রে ছুটে এল। সেটা এসে বিঁধল তাঁর ডানহাতে। মাতঙ্গিনী দেবী গুলিবিদ্ধ হয়েও জাতীয় পতাকা কিছুতেই হাত থেকে ছাড়লেন না। হাতের ঝরা রক্তে জাতীয় পতাকার দণ্ড লাল হয়ে উঠল। মাতঙ্গিনী দেবী তবুও এগিয়ে চললেন তাঁর লক্ষ্য পথে। অন্তরে আজ যেমনি তাঁর দেশপ্রেমের এক অপূর্ব প্রেরণা, প্রকৃত অহিংস সৈনিকের ন্যায় মুখে তাঁর তেমনি হাসি ও বিনীত অনুরোধ। তিনি ভারতীয় সৈন্যদের বিনীতভাবে অনুরোধ ক'রে বলতে লাগলেন বৃটিশের সৈন্য-বিভাগ ছেড়ে দিয়ে আপনারা দেশের কাজে যোগ দিন। মাতঙ্গিনী দেবীর এই অনুরোধের উত্তর এল কিন্তু আর একটা প্রচণ্ড বুলেট। এই বুলেট এসে ভেদ করল বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী দেবীর কুঞ্চিত ললাট।

৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী এবার নিজের ললাটের রক্তে তাম্রলিপ্তের মাটি রঞ্জিত ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখনও কিন্তু তাঁর ডানহাতে জাতীয় পতাকা তেমনিভাবেই ধরা রইল এবং বাতাসেও উড়তে লাগল। এই সময় একজন সৈন্য "বীরদর্পে" ছুটে এসে মাতঙ্গিনীর হাতে পদাঘাত ক'রে জাতীয় পতাকা দূরে ফেলে দিল।

মাতঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে ঐদিন সৈন্যদলের বেপরোয়া গুলিতে আরও ৪জন সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ দিলেন এবং বহু ব্যক্তি আহত হলেন। শহর অভিমুখে ঐদিন আরও যেকটি শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, সেগুলিও পুলিসের লাঠি এবং সৈন্যদের গুলির হাত থেকে রেহাই পায়নি। তার ফলে সেখানেও কয়েকজন হতাহত হলেন।

দেশের মুক্তি সংগ্রামে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের অনেক বীর রমণীই জীবনদান ক'রে গেছেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে বোধ করি মাতঙ্গিনী হাজরার তুলনা নাই। মহাত্মা গান্ধীর তথা কংগ্রেসের অহিংস আদর্শকে এই বৃদ্ধার ন্যায় এমনভাবে গ্রহণ ক'রে আর কেউ জীবন উৎসর্গ করেছেন ব'লে কেউ কোনদিন শোনে নি। জনসাধারণের দেওয়া "গান্ধীবুড়ী" নাম সত্যই সার্থক ক'রে গেছেন তিনি।

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জয়পুর

২

কুশল পরের দিন কলেজ যাবার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। আমরা কাল জয়পুর যাবো শুনে নিষেধ করলে। বললে শহরের বাইরে দু'দিন পরে যেও। এখানে হিন্দু মুসলমানে একটা ভীষণ 'টেন্‌শান' চলছে। মোস্‌লেম লীগের হেডকোয়ার্টার থেকে মহারাজাকে 'আল্টিমেটাম্' দিয়েছে। তিনদিনের মধ্যে সেনাপতি মেজর ভরত সিংহকে মহারাজা বরখাস্ত না করলে ওরা জয়পুরে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে দেবে।

জয়পুর রাজপ্রাসাদে (পুরাতন)

প্রশ্ন করলুম—সে ভদ্রলোকের উপর এদের এত রাগ কেন?

কুশল বললে—কিছুদিন আগে এখানে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মৃত্যুতে এক বিরাট শোক সভা হয়। সেই শোক সভায় পৌরোহিত্য করতে গিয়ে মহারাজের খুড়ো মেজর ভরত সিং তাঁর বক্তৃতায় প্রসঙ্গ-ক্রমে বলেন—বাংলা দেশের কলকাতা শহরে ও নোয়াখালিতে যে সব কাণ্ড হয়েছে জয়পুরে যদি সেরকম কিছু হ'ত, তাহ'লে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমি জয়পুর মুসলমান শূন্য করে ফেলতুম! ব্যস্! আর যাবে কোথা? খবর চলে গেল লীগের হেডকোয়ার্টারে। সেখান থেকে মহারাজার উপর টেলিগ্রামে চরম পত্র এসে হাজির! এখনি প্রকাশ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ভরত সিংকে

কিতাব খানা (লাইব্রেরী)

বরখাস্ত করো। সাতদিন মাত্র সময় দেওয়া হল। লীগের দাবী পূর্ণ না হলে জয়পুরে আগুন জ্বলে উঠবে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম ৭ দিনের আর কদিন বাকী? কুশল বললে, হ'য়ে এসেছে। আর দু'দিন। এই তারিখে ওদের' ডাইরেক্ট

দরবার হল

এ্যাক্‌শন শুরু হবার কথা। সুতরাং ৯ই ১০ই দুটো দিন দেখে ১১ই বেরিয়ো।

বললুম—মহারাজ, আল্টিমেটামের কী জবাব দিলেন?

কুশল বললে—ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন এবং সেনাপতিকে-ডেকে হুকুম দিলেন—এখনি 'ষ্টেট্‌ফোর্স' এবং 'মিলিটারী-

পুলিশ গিয়ে সমস্ত মোসলেম পল্লী ঘেরোয়া করে ফেলুক এবং শহরের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কুচ্‌কাওয়াজ করে রুট মার্চ্চ চলুক প্রত্যহ।

—তারপর?

—কুশল বললে—তারপর আর কি! এইতেই ঠাণ্ডা। খুব সম্ভব ৯ই তারিখে কিছুই হবে না, তবু একটু সাবধানে থাকাই ভালো, তোমাদের বিদেশী দেখে সুযোগ নিতে পারে। তোমরা একদিন পুরাণো রাজপ্রাসাদ, হাওয়া মহল, এলবার্ট মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, গোবিন্দজীর মন্দির, আর্ট স্কুল, রামবাগ, মেয়োহাসপাতাল, ষ্টেট্‌ লাইব্রেরী, সংস্কৃত কলেজ—এই গুলো দেখে নাও। তারপর যাবে অম্বর প্রাসাদ ও দুর্গ দেখতে। গলতার পবিত্র প্রস্রবণ ও সূর্য্য মন্দিরও দেখে এসো। আর একদিন যেও সিঙ্গারায় প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির দেখে আসতে। সেই পথেই পড়বে মহারাজার নব নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ। সেও একটা দেখবার মতো, তবে অনেকটা ইংরিজী ষ্টাইলে তৈরী।

অগত্যা আমরা প্রথমেই শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির এবং পুরাতন

জয়পুর মানমন্দির (যন্ত্র)

রাজপ্রাসাদ ও কেতাবখানা দেখতে গেলুম। কুশল বা ধীরেন কেউই আমাদের বলে দেয়নি যে বাঙালীর বেশে অর্থাৎ লম্বা কোঁচা আর খোলা মাথায় জয়পুর প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ। দ্বার পথে প্রহরী বাধা দিলে। অগত্যা মালকোঁচা বেঁধে এবং দুটি মাড়োয়ারী টুপী ভাড়া করে বাবাজী ও আমি মাথা ঢেকে একটি গাইড সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলুম। প্রাসাদ প্রাঙ্গণেই একধারে জয়পুরের প্রসিদ্ধ মান-মন্দির! এরা বলে 'যন্ত্র'! জয়পুরের এই মানমন্দিরটিই সবচেয়ে বড়। দ্বিতীয় জয়সিংহ ভারতের আরও নানা স্থানে এই রকম 'যন্ত্র' বা মানমন্দির নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। দিল্লী, মথুরা, উজ্জয়িনী ও বারাণসীতে তাঁর তৈরী আরও চারটি মানমন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। রাজপ্রাসাদের সুরক্ষিত উদ্যানটি দেখে মনটা খুশী হল। প্রাসাদ এমন কিছু অপরূপ নয়। বাইরের জড়টাই খুব চিত্তাকর্ষক। এক একটা কটক দোতোলায় সমান। রাজার 'দরবার হল'টি ভাল লাগলো ভালো লাগলো জেনানা মহল। আর প্রাসাদ প্রাঙ্গণের 'মেঘমহল' খুব সম্ভব

—হুগলীর বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার বিদ্যাধর কালিদাসের মেঘদূত থেকে অলকার প্রেরণা পেয়ে এই 'মেঘ মহল' বানিয়েছিলেন। শোনা গেল মহারাণা সন্ধ্যায় এখানে রাণীদের নিয়ে বিহার করতেন। চারিদিকের জলযন্ত্র থেকে উৎস ধারায় জলতরঙ্গ বাজতো। তোরণে তোরণে নহবতে পূরবীর সুর ভেসে আসতো, সে এক নন্দন বিলাস! এই অন্দরের বাগান খানি মনে হল যেন আট রাণীদের চেয়েও সুন্দরী! স্নিগ্ধ হরিৎ তৃণ কুঞ্জবনের আশে পাশে স্তবকে স্তবকে ফুটে আছে অসংখ্য বর্ণে গন্ধে অনিন্দ্য পুষ্প রাশি! তারই কোলে গোবিন্দজীর মন্দির। কোনও বৈচিত্র্য নেই, কারু কার্য্য নেই, চূড়া নেই, ধ্বজা নেই। অত্যন্ত সাদাসিধা আমাদের দেশের নিঃস্ব জমিদারদের বাড়ীর ঠাকুর দালানের মতো শ্রীহীন। ও বিবর্ণ! উঁচু নয় কিন্তু, একেবারে মাটির সঙ্গে প্রায় সমান। শোনা গেল মোগোল আক্রমণের ভয়ে এঁকেও না কি নিরাপত্তার জন্ম বৃন্দাবন থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরতির সময় অন্তঃপুরচারিণী রাণীরা প্রাসাদ থেকেই গোবিন্দজীকে দর্শন করবেন বলেই এইখানে তার বাস। বাঙালী পুরোহিত পূজা করেন। আমাদের সঙ্গে তিনি অনেক আলাপ করলেন। আরতি

জেনানা মহল

দেখে কীর্ত্তন শুনে প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। গোবিন্দজীর অবস্থা ভাল বলে মনে হল না। যেন পড়তি দশা! পুরোহিত বললেন—কী করে হবে? বর্ত্তমান মহারাজা শাক্ত, তিনি যশোরেশ্বরী কালীর ভক্ত। এখন মা-কালীর অবস্থা খুব ভাল যাচ্ছে। গোবিন্দজী অবহেলিত। আগের মহারাজা ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁর আমলে এলে দেখতে পেতেন গোবিন্দজীর কী বোলবোলাও ছিল। এখন ভোগ ঢাকতে ছেঁড়া চটের পর্দ্দা জোটে না, তখন দামী রেশমী পর্দ্দা দেওয়া হত। ভোগও তেমন আর নেই! গোবিন্দজীর দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ হল। ইনি এখানে বাস্তহারা ঠাকুর কিনা? বৃন্দাবন ছেড়ে এসে এই হাল হয়েছে বেচারার! পরদিন গেলুম মিউজিয়ম আর চিড়িয়াখানা দেখতে রামবাগে। মিউজিয়মের বাড়ীখানি ভারী সুন্দর। স্থাপত্যকলার একটি চমৎকার নিদর্শন। বহু মূল্যবান ও দ্রষ্টব্য দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। চিড়িয়াখানা আমাদের

আলিপুরের চেয়ে ভালো। কারণ এখানে দেখলুম, সমস্ত পশু-পক্ষীদের স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে। রামবাগ এক বিরাট পার্ক। এর মধ্যে গাড়ী নিয়ে বেড়াতে হয়। প্রশস্ত পথ আছে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের উদ্ভিদ সংগ্রহ করে এখানে রাখবার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটি ছোট সংস্করণ বলা চলে। 'হাওয়া মহল' অনেকটা ফাঁকা আওয়াজের মতো! পর পর ৯তলা খুব পাতলা এক কারুকার্য্য খচিত দালান। তিনতলা পর্য্যন্ত কোনওরকম বসবাস চলে, বাকী ছ'তলা শুধু বাহার! হাওয়া ভিন্ন আর কিছুর প্রবেশ অসাধ্য। সুতরাং 'হাওয়া মহল' নামটা বেশ লাগসই হয়েছে!

ইতিমধ্যে একদিন পুষুমার বাড়ী আমাদের রাত্রে ভোজের নিমন্ত্রণ হ'ল। আমরা বলে পাঠালুম, এই খাদ্য নিয়ন্ত্রণের যুগে ওসব হাঙ্গামা কোরো না। আমরা বরং তোমার ওখানে আজ বিকেলে চা খাবো এবং ওখান থেকে তোমাদের নিয়ে একসঙ্গে বেড়াতে বেরুবো। পুষুমা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চায়েরই ব্যবস্থা করলে। কিন্তু সে কি 'চা'! রীতিমত জলযোগ ও চা পান মিলে এক 'চা-খানা' ব্যাপার! শুনলুম সমস্ত রকমারী খাবার আমাদের পুষুমা নিজের হাতে তৈরী করেছে। সেই সব সুস্বাদু খাবারের আস্বাদ পেয়ে ধীরেন বাবাজীকে বললুম, মিউনিসিপ্যালিটির চাকরী ছেড়ে দিয়ে একটি 'জয়পুরী-বঙ্গীয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' খোলো। দুদিনে দ্বারিক ঘোষের মতো লক্ষপতি হয়ে উঠবে।

চা' পানের পর আমরা সেদিন সারা জয়পুর শহরের ভাল ভাল অঞ্চল রাত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ালুম। বেশ লাগলো সেদিনের রমণীয় সন্ধ্যাটি বিদেশে আত্মীয়দের সঙ্গে কাটিয়ে।

লাল দাগ দেওয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ৯ই তারিখ নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তারপর ১০ই। কিছু হল না। তারপর ১১ই। কিছু হল না। জয়পুর শান্ত ও স্বাভাবিক কর্ম্মরত। আমরা দুর্গা বলে ১২ই তারিখে অম্বর প্রাসাদ ও দুর্গ দর্শনে রওনা হয়ে গেলুম। আমাদের গাড়োয়ান ও গাইডের পরামর্শ মতো সকালেই বেরিয়ে পড়লুম। গাড়োয়ান আমাদের দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললো—এই সব মৃত রাজাদের সমাধি মন্দির—এই সব মৃতা রাণীদের সমাধি মন্দির। দেখাতে দেখাতে বোঝাতে বোঝাতে সে গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছে অম্বরের পথে। এই যে সরোবর দেখছেন—সারা জয়পুর শহরের জলসরবরাহ হয় এখন থেকে। ঐ দেখুন 'পাম্পিকল' (ওয়াটার পাম্পিং এণ্ড ফিলটারিং ষ্টেশন) গাড়ী চলেছে—আমরাও অপলক দৃষ্টিতে চারপাশের দৃশ্য ও দ্রষ্টব্য যেন গিলছিলুম। ঐ লেকের ধারে ঐ যে প্রাসাদ দেখছেন—ওটা রাজার শিকার মহল। মহারাজা বাহাদুর এখানে পাখী শিকার করতে আসেন। গাড়ী চলেছে ধীরে ধীরে—দূরে পর্ব্বতচূড়া দেখা যাচ্ছে! চোখে পড়লো পাহাড়ের গায়ে একটি নির্জ্জন উদ্যান-বাটিকা। গাড়োয়ান বল্লে—এইটি মহারাজের প্রমোদ-বাটিকা বা গুপ্ত-নিবাস! এখানে যা কিছু হয় সে সবই নাকি সমাজ-বিরুদ্ধ বে-আইনী ও বেলেল্লা ব্যাপার!

অম্বরের পার্ব্বত্য গিরিপথে গাড়ী এসে উঠলো। গাড়োয়ান বল্লে—এপথ নতুন তৈরী হয়েছে মহারাজার মোটরে আসার সুবিধার জন্য। নইলে হাতীর পিঠে ছাড়া অম্বরে আসা যেত না আগে।

মেঘমহল

গোবিন্দজীর মন্দির (পিছনে দেখা যাচ্ছে)

এরা 'অম্বর' বলে না। এরা বলে 'আমের'! হাতী যাবার রাস্তাও এই পথেরই পাশ দিয়ে চলেছে। পথ শেষ হল। পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকে। পাশেই গাড়ী রাখবার একটি ঘেরা জায়গা আছে। গাড়োয়ান বল্লে—এইখানে গাড়ী থাকবে। আপনারা নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান উপরে। অম্বর রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ অনেকক্ষণ থেকেই আমাদের দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করছিল। মহাউৎসাহে আমরা সেই পর্ব্বত সোপান অতিক্রম করে প্রাসাদে প্রবেশ করলুম। প্রাসাদ দেখাবার একজন গাইডও জুটে গেল। সেই 'প্রবেশ পত্র' কিনে এনে দিলে আমাদের। অম্বর প্রাসাদ ও দুর্গ ঘুরে ঘুরে দেখে কেবলই মনে হ'তে লাগলো, এ যেন আমরা মোগল আমলের আগ্রা বা দিল্লীর বাদশাহী মহলে এসে ঢুকেছি। সেই দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম, দরবার হল, জেনানা মহল—সেই মর্ম্মর স্থাপত্যের অপূর্ব্ব কারুকলা! গাইড বল্লে জানেন হুজুর, মানসিংজী এসব বানায়ছি। তিনি ওই [illegible] থাকতেন। এই

প্রাসাদটি বানিয়েছিলেন অম্বরপতি প্রথম জয়সিং। প্রথম জয়সিং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অম্বরের অধিপতি ছিলেন। অম্বর প্রাসাদ তৈরী হবার পর তিনি গর্ব্ব করে বলেছিলেন, দিল্লী আগ্রার বাদশাহী মহল এর কাছে তুচ্ছ! কেমন করে এ সংবাদ মোগল সম্রাটের কানে গিয়ে উঠলো। গৃহশত্রু বিভীষণের তো অভাব ছিল না। দিল্লী থেকে ফৌজ এলো এ প্রাসাদ সমভূমি করে দেবার জন্ত। মহারাজ জয়সিংহ এ খবর আগেই পেয়েছিলেন। রাতারাতি লোক লাগিয়ে এমন ভাবে সব কারুকার্য্য চুণের পলেস্তারা দিয়ে ঢেকে ফেললেন যে ফৌজদার সাহেব এসে দেখে শুনে খবর মিথ্যা বলে বাদশাহকে জানালেন, তবেই না এই 'আমের' রক্ষা পেয়েছে! নইলে আজ কিছুই দেখতে পেতেন না। সব গুঁড়ো করে দিয়ে যেতো!

কথাটা মিথ্যা নয়। হিন্দুর কত কীর্ত্তিই যে মোগল পাঠানের হাতে ধ্বংস হয়েছে তার সংখ্যা হয় না!

দুর্গ ও প্রাসাদ দেখে আমরা অম্বর প্রাসাদ সংলগ্ন যশোরেশ্বরীর মন্দিরে প্রবেশ করলুম। মানসিংহ যখন বাংলার গৌরব মহারাজা

অম্বরের পথে
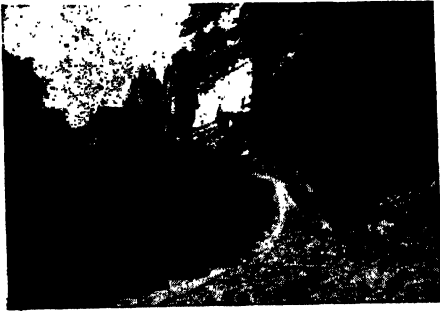
প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে নিয়ে আসেন সেই সময় যশোরেশ্বরী ভবানী কালিকাকেও তুলে নিয়ে এসেছিলেন। দেখলুম এ মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ নূতন সংস্কার হচ্ছে। বাহিরে এখনও কাজ চলেছে। এখানেও বাঙালী পূজারী। তবে তাঁর কথাবার্ত্তায় একটু হিন্দী টান এসে গেছে। তাঁরা পুরুষানুক্রমে এই যশোরেশ্বরীর পূজা করেন। মানসিংহ নির্ব্বোধ নন। মাকে আনবার সময় পূজারীকেও ধরে এনেছিলেন। এঁরা আজও বাংলা দেশে গিয়েই বিবাহ করে আসেন। পূজারীর মুখে শুনলুম, যশোরেশ্বরীর মন্দির ভেঙে পড়েছিল। বড়ই দুর্দ্দশায় দিন কাটতো। কোনও রকমে নমনম করে পূজা সারা হ'ত। বর্ত্তমান মহারাজা কি জানি কেন হঠাৎ গোবিন্দজীর পরিবর্ত্তে মায়ের ভক্ত হয়ে উঠেছেন। প্রতি সপ্তাহে পূজা দিতে আসেন। তাঁরই দৌলতে মায়ের অবস্থা ফিরে গেছে! কারুকার্য্যখচিত দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি-উৎকীর্ণ রজত মন্দির দ্বার। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ মূল্যবান মর্ম্মর শিলায় মণ্ডিত। মন্দিরেও অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। জয়পুরী পাথরের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শনপূর্ণ স্তূপ, সবীর্থ ডাব ও কদলী বৃক্ষ মায়ের দুয়ারের দু'পাশে শোভা পাচ্ছে! তোরণের পর্দ্দা সাঁচ্চা জরীর কাজ-করা ভেলভেটের তৈরী! সমস্ত পূজার আসবাব ও সিংহাসন সোনা রূপার মোড়া। সত্যই মায়ের কপাল ফিরেছে বটে! অনেকক্ষণ বসে পূজারীর সঙ্গে আরও অনেক গল্প করে আমরা যখন হোটেলে ফিরলুম তখন একটা বাজে! কুশল এসেছিল, দেখা পায়নি। লিখে রেখে গেছে, তার বাড়ী আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ! বিকেলে ধীরেন এসে বলে গেল যে, একখানা প্রাইভেট মোটরের ব্যবস্থা করেছে। কাল সকালে আমাদের সিঙ্গারায় জৈন-মন্দির দেখতে নিয়ে যাবে। ধীরেন সঙ্গে এনেছিল একথালা সন্দেশ! জয়পুরে তখন ছেট নিষিদ্ধ। শুনলুম পুতুমা কাল রাত থেকে আয়োজন করে এই অসাধ্য সাধন করেছে। তৎক্ষণাৎ আস্বাদ নিয়ে দেখা গেল ভীম নাগ কোথায় লাগে! চমৎকার সন্দেশ করেছে পুতু।

অম্বর প্রাসাদ ও দুর্গ

সন্ধ্যানাগাদ আমরা কুশলের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলুম। রাজকীয় প্রাসাদতুল্য সুন্দর অট্টালিকা, টেনিস কোর্ট, বাগান, ল্যন। মোটর গ্যারেজ ও সার্ভিস কোয়াটার সবই আছে। বললে—ষ্টেট থেকে দিয়েছে। ভাড়া লাগে না। শুনে আনন্দ আরও বেশী হল। শিল্পীর বাড়ী যেমন হয়। আগাগোড়া দামী কার্পেট-মোড়া নানা মূর্ত্তি ও চিত্র সজ্জিত প্রত্যেক ঘরখানি। শিল্পীর প্রিয়তমার সঙ্গে পরিচয় হল এই প্রথম। তিনি যেন শিল্পীর প্রিয়তমা হবার জন্যই আবির্ভূতা হয়ে-ছিলেন এই পৃথিবীতে! ধীরগতি মৃদুভাষিণী হাস্যোজ্জ্বলা সুদর্শনা মহিলা। একটা স্বাভাবিক আভিজাত্য যেন তার সর্ব্বাঙ্গে জড়িত। কুশলের বাড়ীর অতিথি ছিলেন তাঁরই ভগ্নী অর্থাৎ কুশলের এক শ্যালিকা। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী আমাদের খুবই আদর যত্ন করলেন। কতরকম খাওয়ালেন। জয়পুরী ডিশও বানিয়েছিলেন আমাদের জন্ত। বন্ধু-পত্নীও শিল্পী ও সুলেখিকা। তাঁর হাতের তৈরী অনেক কারুকার্য্য দেখলুম এবং দেখে মুগ্ধ হয়ে এলুম। জয়পুরে বসে আঁকা কুশলের হাতের অনেকগুলি বড় বড় তৈলচিত্রও দেখবার সৌভাগ্য হল। গানে গল্পে আলাপে হাস্যপরিহাসে ও মুখরোচক খাদ্য পানীয়ে সন্ধ্যা কাটিয়ে ফিরে এলুম হোটেলে।

পরদিন সকালে বীরেনের পাঠানো মোটর এসে হাজির। আমরা সকাল সকাল পরিবর্তন করে বেরিয়ে পড়লুম সাঙ্গানীরের প্রসিদ্ধ জৈন-মন্দির দেখতে। মন্দিরটি জয়পুর থেকে ২৮ মাইল দূরে। যাবার পথে আমরা নূতন রাজপ্রাসাদ দেখে গেলুম। মহারাজ এখন প্রাসাদে রয়েছেন, কাজেই ভিতরে প্রবেশ করা গেল না। বাইরে থেকেই যাকি দর্শন করা গেল।

সাঙ্গানীরে পৌঁছে আমরা সেখানকার প্রাচীন জৈন মন্দির দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একেবারে হুবহু আবু পাহাড়ের
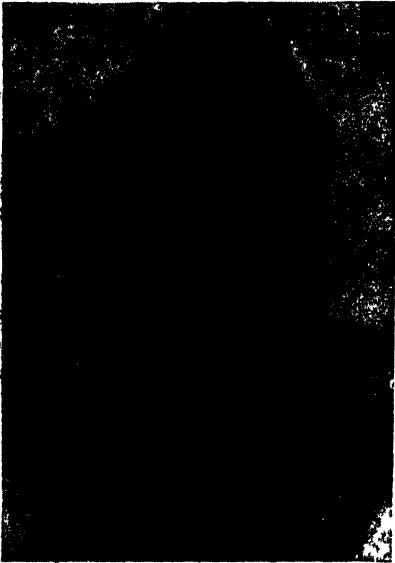
কুশল-প্রিয়া শ্রীমতী সুশীলা দেবী

দেলওয়ারা মন্দিরের মতো কারুকার্য্য! এ মন্দিরটিকে দেলওয়ারার চেয়েও প্রাচীন বলে মনে হ'ল। সম্ভবতঃ অযত্নে পড়ে আছে বলে। কিন্তু কী অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। বার বার মনে এ সংশয় এসে উঁকি দিচ্ছিল এরই অনুকরণে দেলওয়ারা না দেলওয়ারার অনুকরণে এটি তৈরী হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে মন্দিরটি দেখে এবং আশে পাশের আরও কয়েকটি মন্দির দেখে আমরা ফিরে এলুম। দেখি কুশল এসে হাজির। বললে, আজ সন্ধ্যায় তোমাদের বায়োস্কোপ দেখতে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আমরা বললুম, জয়পুর যে ছেড়ে যাবো আজ। কুশল বললে, আজ নয়। তোমাদের জন্য গাড়ী রিজার্ভ করিয়েছি কাল। আমাদের দিল্লী নেমে লক্ষ্ণৌয়ে বন্ধুবর শিল্পী অসিতকুমার হালদারের নিমন্ত্রণ রেখে কলকাতায় ফেরবার কথা ছিল। কুশল বললে—ক্যান্‌সেল করে দাও সমস্ত ট্যুর-প্রোগ্রাম। দিল্লীতে ভীষণ 'রায়ট্' হচ্ছে। সোজা কলকাতা চলে যাও। তোমাদের একেবারে শুধু ক্যালকাটা রিজার্ভ করিয়ে দেবো, যাবার পথে অমুক অমুক ষ্টেশনে একটু সতর্ক থেকো, ভয় নেই বিশেষ।

শুনে একটু মনটা মুষড়ে গেছলো, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রি ৯টায় শোতে সিনেমা দেখতে গিয়ে মনটা খুশী হয়ে গেল। কুশল শিল্পী কিনা—ছবি বেছেছিল ভালো। আমরা দেখে এলুম 'সুভদ্রা-হরণ'। বলা বাহুল্য হিন্দী ছবি—কিন্তু প্রযোজনা, অভিনয়, সঙ্গীত, আলোক চিত্র, বাণী সবগুলিই ছিল নির্দোষ।
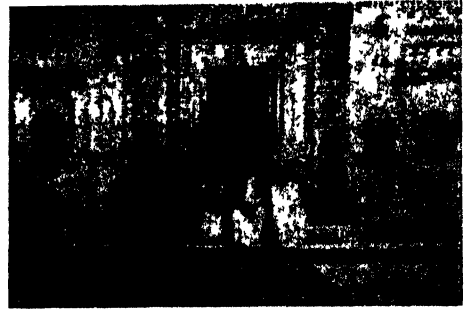
প্রাচীন জৈনমন্দিরে (সাঙ্গেনী)

পরদিন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা জয়পুর ছাড়লুম। কুশল এসে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। ষ্টেশন মাষ্টারকে বলে সে আমাদের যাত্রার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু এসে দিল্লীতে আমাদের রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে দেখি বৈমাত্র ভায়েরা দখল করে বসে আছেন। রেলের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাতে তাঁরা এসে কনকতককে বলপূর্ব্বক নামিয়ে দিলেন বটে কিন্তু বয়োবৃদ্ধরা নামতে চাইলে না। মিনতি করে বললো দুঘণ্টার জন্য মাফ করুন। আলিগড়ে নেমে যাবো আমরা। কথায় কথায় জানা গেল তাঁরা দাঙ্গার ভয়ে দিল্লী ছেড়ে আলিগড় পালাচ্ছেন। আলিগড়ে গাড়ী খালি করে দিয়ে নেমে গেলেন। আমরাও আবার শুয়ে কলকাতায় ফিরে এলুম।

শেষ

ত্রিশ বছর পরে

শ্রীপূর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ

—"প্রায় শেষ করে এনেছি"

—"কি ?"

—"পথ।"

—"যা কেউ পারলে না, তাই তুমি শেষ করলে ?"

—"পারে না তারা, যারা মনে করে সব পথটাই তাদের"—

—"তাহলে আমিই শুধু পড়ে থাকবো এই পথের পাশে"—

—"যদি মনে করো তোমার চলা শেষ হয় নি"—

—"তোমার এরই মধ্যে শেষ হলো ?"—

—"তুমি যখন এলে তখন তো আমি পথের মাঝে—সেজন্যে এগুতে, আর শেষ করতে বেশী দেরী হলো না"—

—"তাহলে কি করবে এখন"—

—"দেখব কোন নূতন পথেব সন্ধান—যদি মেলে সেখানে কোন অপরিচিতের দর্শন"—

—"কেন, পরিচিত বুঝি আন্‌লো বিরক্তি"—

—"তা তো বলি নি, বল্‌ছি অপরিচিত নবীনের সঙ্গে পরিচিত হবো—প্রাচীনকে ত্যাগ কববো বলিনি তো"—

—"তোমার কথা বুঝতে পারি না"—

—"চেষ্টা কর না"—

—"চেষ্টা করি, কিন্তু গুলিয়ে ফেলি"—

—"নিজের জীবনে অনেক গোলযোগ ব'লে"—

অমিতাভ একটু হাসলো।

রাণু চুপ ক'রে রইলো গম্ভীর হোয়ে। চঞ্চল একটা হাওয়া যেন সহসা বন্ধ হোয়ে গেল।

—"রাগ করলে ?"—(অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলো অমিতাভ।)

—"না"—(সংক্ষেপে বললো রাণু।)

—"সত্যিই আশ্চর্য্য, তোমরা এতো ঠুন্‌কো ? সামান্যতেই ভেঙে পড়ো"—

—"ভাঙি না গড়ি ?"—

—"কি জানি, জিজ্ঞাসা ক'রো নিজেকে ?"

—"তবু তোমার ধারণা ?"—

—"নাই বা শুন্‌লে"—

"—ক্ষতি কি ?"—

—"যদি আরও ক্ষতি হয় !"—

—"যে ক্ষতি হোত—তুমি বাঁচিয়েছ, তার চেয়েও ক্ষতি"—

—"হোতেও তো পারে !"—

—"বিশ্বাস হয় না"—

—"কাকে ?"—

—"তোমার কথাকে ?"—

—"এতখানি পথ চলার পরেও ?"—

বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলো অমিতাভ

—"আমি আর চললুম কৈ ? তুমিই তো টেনে নিয়ে এলে"—

—"হয় তো চালিয়ে এনেছি, কিন্তু চলার ইচ্ছে তো তোমার হোয়েছিল"—

—"হ্যাঁ, তবে ভয় হোয়েছিল সেই সেদিন"

—"কবে বল তো ?"—

—"সেই দুর্যোগের রাত্রি, যেদিন ওরা আমায় টেনে নিয়ে গেল, আমার স্বামীকে খুন করে"—

—"সে কথা মনে করে রেখেছো !"—

—"রাখবো না ! সেদিন উদ্ধার করলে তুমি, তোমার মাঝে দেখলাম পুরুষকে, তার বিজয়ীরূপকে—সেজন্যেই ভালবাসলাম তোমাকে"—

—"তারপর"—

—"তারপর, সবই তো জানো"—

—"জানি, তবু মনে হয় যেন অনেক ভুলে গেছি"—

—"সমাজ তোমাকে চিনল না—তার শাসন এলো তোমার উপর—তুমি আমাকে বিয়ে করলে বলে"—

—"সেটাকে তুমি সমাজ বলে মেনে নিতে পার মন দিয়ে"—

—"মন দিয়ে মানি নি, তবু তো দেখেছি তার রুদ্র ভীষণ রূপ"—

—"কিন্তু তাতে ভয় পাইনি, কারণ জানতুম ভূতের যে ভয় সেটা তো মৌলিক নয়"—

—"ভয় তুমি করতে না, কিন্তু আমি কোরতুম"—

—"সেটুকু তোমার দুর্বলতা, কিংবা হয় তো পারনি আমাকে বিশ্বাস করতে, ভালবাসতে"—

—"অনেক দিনের কথা, ভুলে গেছি, তবু মনে হয়, হয় তো তাই"—

—"তখনকার দিন, তোমার আমার পথ ছিলো নূতন, সেজন্যেই ভয় হোয়েছিল। কিন্তু তারপর সেই পথে কত লোক চলেছে, এখন সে পথে এসেছে সমারোহ আনন্দের মেলা—কত নবীন প্রাণের আসর"—

—"তাই তো এ পথ ছাড়তে মায়া লাগছে"—

—"এ পথের কাজ তো শেষ করে এনেছি। যে সমাজকে আমরা ভয় করতাম, সেই ক্ষীণ সঙ্কীর্ণ সমাজ আমাদের ভয় করে—কেননা আমরা আবার গড়ে তুলেছি একটা পরিপুষ্ট সমাজ, একটা গোষ্ঠী—একটা নতুন জগৎ"—

—"আগামী কাল জানবে তাদিকে যারা আমাদের বংশধর"—

—"আদর করে নেবে প্রভাতের সোনালী কিরণের মতো—যারা নেবে না তারা থাকবে অন্ধকারে জীবনের পঙ্কিল আবর্ত্তে—দুনিয়া এগিয়ে চলবে কালকে এড়িয়ে, অতীতকে পিছনে ফেলে"—

—"যাক্ চল—অনেক রাত হোয়ে গেছে।"—

রাণু অনুরোধ করলে। সামনের আকাশের একটা তারকাও যেন তাদের সঙ্গে চলতে লাগল।

কয়েকটা দিন পরে……আকাশে এলোমেলো মেঘের যাওয়া-আসা। যেন সারি সারি বলাকা পাখা মেলে উড়ে চলেছে কোন অজানা দেশে। বন্ধনহীন মন, রাণু ভাবছিলো ফেলে-আসা তিরিশটা বছরের কথা।

অমিতাভ জিগ্‌গেস করলেন—

"ভাবছ, রাণু ?"

—"ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা"—

—"এতদিন পরে ?"—

—"কি জানি কেন মনে হলো আবার সেই ভীষণ রাত্রির কথা"—

—"রাতকে যদি ডেকে আনো দিনের আলোর সামনে—তোমাকে কি বলবে জানো ?"—

—"পাগল:তো ?"—

—"হ্যাঁ"—

—"আমার তাতে দুঃখ নেই। ভাবনা হয় আলোককে নিয়ে—আর আমার নিজেকে নিয়ে"—

—"কেন ?"—

—"আলোক পাবে সেই সম্মান ?"

—"চোখ মেলে চেয়ে দেখো—দেখতে পাবে ভুল আমরা করিনি"—

—"কি ভুল বাবা ?"

সহসা আলোক এসে প্রশ্ন করলে ?

—"এই তোমার মা'র পাগলামী"—

—"সত্যি বাবা, মা যেন বড় রক্ষণশীল"—

—"কতকটা তাই, এখনও খাপ খাওয়াতে পারলে না চলতি পথের ও কালের সঙ্গে" —

—"আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আজ হোতে তিরিশ বছর আগে তখনকার সমাজকে তুচ্ছ ক'রে তুমি এগিয়ে এসেছিলে কি করে ?"

—"যা সত্য তাকে অবলম্বন করে—আর আদর্শকে সামনে রেখে। তোমার মাকে যখন বিয়ে কোরলাম—প্রথম ভাবলাম বুঝি আমি ভুল কোরলাম, তোমার মা'র মনকে জয় করতে পারিনি"—

আলোক শুনে যেতে লাগলো পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে। অমিতাভ বলে যেতে লাগলো—

হয়তো ভাববে আমি তোমার মা'র সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হোয়েছিলাম, কিন্তু বাইরেকার সৌন্দর্য্যই তো সব নয়—শুধু মনের অন্ধকারকে ঘুচিয়ে যে আলোক দেখতে পেলাম তাকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। বিশেষত তখনকার সমাজকে বাঁচাবার জন্যই বিয়ে কোরলাম তোমার মা'কে—

—"এটুকু তোমার উদার মনের স্বচ্ছ পরিচয়, বাবা"—

—"এটাকে উদারতা বললে ভুল করা হবে আলোক, এটা ছিলো আমার কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যেটাকে আশুতোষ বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন ঠিক, সেটাকে আমি অন্যায় করবো কোন যুক্তিতে"—

—"আমাদের সমগ্র হিন্দুসমাজ তখনও তো তা ভাবতে পারেনি"—

—"অনেকগুলো ব্যাপার আছে আলোক, যেগুলো আমরাও সব সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে, তাই বলে সেগুলোকে অস্বীকার করতে তো পারিনে"—

—"তুমি মনের দিক থেকে আমার চেয়ে এগিয়ে আছো"—

—"আমি তোমার চেয়ে এগিযে নেই—এগিযে আছো তুমিই আলোক। তবে তোমার ভেতর এসেছে তোমার মা'র দেওয়া রক্ষণশীলতার অন্ধকার—সেটুকু তোমাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে—তবেই দেখা দেবে তোমার সামনে নূতন পথ—যে পথে আমার চলবার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি নেই"—

—"কেন ?"—

—"জীবনের অপরাহ্ণ। এই অবেলায় আর মন চায় না অনির্দ্দিষ্টের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে"—

—"তবুও তো তুমি ছেড়ে চলে যেতে চাও এই তিরিশ বছরের চলা পথ"—

রাণু বললে

—"কেন জানো রাণু? আলোককে পথ দেখিয়ে দিতে—আমার আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে। মনে পড়ে তোমাকে আমি বিয়ে করবার আগেকার কথা—তোমার মন ছিলো আমাদের প্রাচীন কোলকাতার মতো শুধু অন্ধকার আর সঙ্কীর্ণতা। সেখানে এনে দিলাম আলো, যার জন্য পেলে আলোককে—সমাজে হলো

—"সেজন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ"—

—"ঠিক তেমনিভাবে আমি চাই আলোকের প্রতিষ্ঠা বৃহত্তর মানুষের সমাজে"—

—"কিন্তু তাহলে তো হারাবো আমরা তাকে"—

—"ক্ষতি কি যদিই হারাই তাকে ? আমাদের নাইবা হোল লাভ—তুমিও তো এমনি করে একদিন হারিয়েছিলে সমীরকে"—

—"যখন আমার মন্দিরে এলে তুমি, তোমাকে অভ্যর্থনা করে নিলাম আমার সমস্ত কিছু দিয়ে"—

—"আলোককে যদি তেমনি করেই কেউ চেয়ে থাকে আমি বাধা দিয়ে [illegible] রাখ"—

—"কিন্তু [illegible]

—"এর ভেতর কোন "কিন্তু" নেই [illegible] বা জন্য তাকে উপেক্ষা আমি কোনদিন করিনি এবং কোরবও না"—

—"তাহলে আলোকও আমাদের ছেড়ে যাবে"—

—"যদি আমরা খাপ-খাওয়াতে না পারি, তার ভাব-ধারার সঙ্গে"—

—"তা আমি দোব না"—

রাণু একটু কাতরতার সহিত বলল

—"সে তো ভালো কথা, শিক্ষা যদি পেয়ে থাকো তোমার মনকে আধুনিক কালের উপযোগী করতে—তবে তো তুমি হবে দুঃখজয়ী, আনন্দের প্রতীক"—

—"তুমি আমাকে সেই আশীর্বাদই করো"—

—"আবার নূতন করে"—

অমিতাভ হেসে উত্তর দিল

আরও কয়েকটা দিন পরে। শীতের সকাল। সবুজ ঘাসের [illegible] শিশিরের শুভ্র আস্তরণ। অমিতাভ বসেছিলো সামনের [illegible] কা'র অপেক্ষায়। সঙ্গে স্নাতা মিত্রা। আলোক, অমিতাভের পাশে বসে দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিল। অমিতাভ বললে

—"সত্যি রাণু আজ তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে"—

—"নূতন ক'রে"—

স্মিত হাস্যে প্রশ্ন করলে মিত্রা

—"না, তা নয় রাণী, এই স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীন সন্তানের মা হিসেবে"—

—"সত্যি মা, তোমাকে এই বেশেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে"—

আলোক মুখে তুলে বললে

প্রশংসমান দৃষ্টিতে অমিতাভ আলোকের দিকে চেয়ে রইলো। রাণু বললে

—"তাহলে বাপ আর ছেলের জন্যে এবার রোজ সকালেই আমাকে চান করে গরদের কাপড় পরতে হবে—কিন্তু আলোক, তোর মা যদি তাতে অসুখ করে ম'রে যায়" —

—"আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না মা"

একটু স্নেহের সহিত আলোক বললে

—"যাক আর একটা চেয়ার নিয়ে এসে ব'সো দিকি এখন"—

অমিতাভ আদেশ করলে মিত্রাকে

—"কেবল গল্প শুনলেই পেট ভরবে তো ?"—

—"আহারের প্রয়োজন তখনই হয় রাণু, যখন মন থাকে উপবাসী—আজ শুধু আমার মনে হয় যদি আমি এখন জন্মাতাম। ঝাঁপিয়ে পড়তাম কল্লোস্রোতে—সমাজের, দেশের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এনে দিতাম নূতন সঙ্গীত, নূতন রক্তস্রোত"—

—"সত্যিই এটা আমাদের সৌভাগ্য, পরাধীনতার বেদনা আমাদিকে পেতে হয় নি। যখন কল্পনা করি তখন মনে হয় সে যেন একটা বিপুল অন্ধকার—যার মধ্যে ভারত হারিয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য, তার আত্মা ও তার প্রাণকে"—

আলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে কথা কয়টা বলে। অমিতাভ বললে

—"স্বাধীন হোয়ে আমরা দেখলাম জগৎ অনেক দূর এগিয়ে। তাকে ধরবার জন্তে আমরা ছুটেছি প্রাণপণে—তবু এমনও অনেক জায়গা আছে আমাদের মনে ও সমাজে, যেখানে সত্যকার আলোক পৌছতে পারে নি—সেখানটার আলোক এনে দেবার ভার দিয়েছে দেশ তোমাদের উপর"—

—"আমরা জন্মাবার পরই দেখেছি আলো—শুধু আলো—সেজন্তেই বুঝতে পারেনি এতো আলোর মাঝে অন্ধকার কোথায় আছে?"—

—"সে নির্দ্দেশ দোব আমরা—যারা বয়ে এনেছে দুঃখময় অতীতের বেদনাময় স্মৃতি—আর দেবে এই চলমান মহাকাল ও তোমাদের বিবেক, যার উপর গড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতের উজ্জ্বল ইতিহাস"—

—"তিরিশ বছরের আগেকার ইতিহাস তুলনা করলে দেখতে পাই তোমরা সব শূন্সতাই পূর্ণ করেছ"—

—"তার বিচার করবে তোমরা আর বিশ্বের ইতিহাস। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় একটা মস্ত বড় দিক আমরা অবহেলা করে এসেছি—সেটা হোলো আমাদের সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা"—

—"ওটা তোমার একটা চিরকেলে খেয়াল"—

রাণু একটু যেন অন্তমনস্কতার সঙ্গে বলল

—"না, মা। বাবা নিজের জীবনে যেটার অভাব উপলব্ধি না করতে পারেন, সেকথা বাবা খেয়ালবশতঃও বলেন না"—

আলোক যেন একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়ল

—"আমি চাই আলোক, আমাদের সমাজে প্রকৃত সাম্য। এখনও হয়তো আমরা অনেককে দূরে রেখেছি, কেবলমাত্র আমাদের অহঙ্কার। আমরা ভাবি, আমরা তাদের চেয়ে বড়"—

—"তাহলে তোমার ইচ্ছে মুড়ি-মুড়কী সব এক হোয়ে যাক্"—

রাণু একটু শ্লেষের সহিত বলল—

—"একদিন তো তাই ছিলাম রাণু—যেদিন আমরা কয়েকটা মানুষ পৃথিবীতে এলাম। সেদিন ছিলো কোন প্রভেদ—ঐ ওবাড়ীর নীলিমাতে আর তোমাতে?"—

অমিতাভ প্রশ্ন করলে

—"হয় তো ছিল না, কিন্তু আজ যে ব্যবধান এসেছে ওদের ও আমাদের ভেতর সেটুকু ওদের বৃত্তির জন্তে—এ কথা স্বীকার করতো?"—

রাণু উল্টে প্রশ্ন করলে

—"স্বীকার করি আমাদের এই জাতিভেদের প্রাচীন ইতিহাসকে। কিন্তু আজ যদি দেখি নীলিমা পেয়েছে শিক্ষা, সভ্যতা, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই—কেন আমি নেবোনা তাকে আপনার কোরে?"—

অমিতাভ দৃঢ়তার সহিত বললে

—"তুমি পারবে বাবা নীলিমাকে আশীর্বাদ ক'রে ঘরে তুলে নিতে?"—

আলোক একটু চঞ্চল হোয়ে প্রশ্ন করলে

—"কেন পারব না। আমি যে জানি আমাদের সঙ্কীর্ণ সমাজ একদিন মিশে যাবে সমগ্র বিশ্বের মানুষের বৃহত্তম সমাজের মাঝে। বিশেষতঃ যদি দেখি নীলিমার মধ্যে আছে সেই মানুষের রক্ত, সেই আত্মা, যা অনাদিকাল হোতে প্রকাশিত হবার জন্তে ব্যগ্র হোয়ে রয়েছে"—

—"তোমার মনে ঘৃণা হবে না বাবা। সে জন্ম নিয়েছে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মাঝে"—

আলোক প্রশ্ন করলে

—"সমাজের এই অন্ধকারের কথাই বলছিলাম আলোক—যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন রয়ে গেছে। কি ক্ষতি যদি আমাদের ভেতরকার ছোট ছোট জাতগুলো ভেঙ্গে একটা বিরাট জাত হোয়ে পড়ি।"—

অমিতাভ উত্তর দিলে।

—"তবে আমার একটু অনুরোধ আলোক, নীলিমাকে খুলে বলতে হবে তোমার জন্ম-ইতিহাস এবং নিজের বিবেকের কাছে জেনে নেবে যে, তাকে তুমি পবিত্রভাবে নিতে পারবে কি না ?"—

রাণু একটু গাম্ভীর্য্যের সহিত বললে

—"নীলিমার বাবার কি মত জানো, মা ? তিনি বলেন, বিবাহ আইনসঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত হোলেই হোলো—শাস্ত্র তো আমাদের নিজেদের তৈরী, সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ ?"—

আলোক উত্তর দিলে

—"আমি শুধু দু-একটা দৃষ্টান্ত চাইনে, আলোক। ভারত চায় তোমাদের মত তরুণের কাছে এক নূতন সমাজ। যেখানে থাকবে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার যুগ্ম-স্রোত। এর পরে আবার যখন আমরা জন্মাব তখন ইতিহাসের পাতা উল্টে যেন বুঝতে না পারি যে তোমাদের গড়া সমাজে এসেছে পাশ্চাত্য উচ্ছৃঙ্খলতা এবং হারিয়েছে ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সংযম"—

আলোক চলিয়া গেল। অমিতাভ মিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল—

—"খুব ভয় পেয়েছিলে রাণু, তিরিশ বছর আগে যখন এ-পথে আমরা পা দিয়েছিলাম প্রথম"—

—"ভয় হোয়েছিল কেন জানো ? মনে হতো যদি সমাজ ব্যবস্থা না বদ্‌লায় আমরা হোয়ে যাবো অতি নিঃসঙ্গ"—

রাণু বললে—

—"তা হোতে পারে না মিত্রা। যা সত্য তা একদিন প্রকাশিত হবেই তার নিজের উজ্জ্বলতা নিয়ে। সেদিন তোমায় বলেছিলাম একদিন মানুষ তার ভুল বুঝবে। আমার এখনও দুঃখ এই ভেবে যে শুধু আমাদের কাপুরুষতার ও বিবেচনার অভাবে তোমার মত কত মেয়ে—যারা গ'ড়ে তুলতে পারতো সুন্দর শান্তিপূর্ণ ঘর, তাদের জীবন বৃথা হোয়ে গেছে অবহেলায়"—

অমিতাভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

—"সংসারের একটা জীবনের সুরকেও তো তুমি মধুর করে তুলেছো—কিন্তু আরও তোমার মত অনেকে ছিলো—তারা ?"—

—"সেখানেই আমাদের বড় ভুল মিত্র', যখন আমরা ভাবি আমিই বুঝি লোকসান কোরলাম সংসারের কেনা-বেচায়, আর সবাই হোল লাভবান"—

—"এখন তো তোমার লাভের আশাই বেশী"—

রাণু একটু স্মিত হাস্যের সঙ্গে বলল।

—"সেইটুকুই আমার পুরস্কার মিত্রা—ভগবানের কাছ হোতে"—

রাণু ও অমিতাভ উঠিয়া পড়িল। সামনের গোলাপ-কুঞ্জে তখনও ভ্রমরের মেলা। বাগানের ছোট পৃথিবীতে শুভ্র-শেফালীর আলিপনা।

বুদ্ধ ও যুদ্ধ

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধ বলেন—"যুদ্ধ ক'রোনা, হিংসা ক'রোনা, শান্ত হও।"
হেসে মরি—"ওগো ভগবন্! তুমি আমার মতন মানুষ নও…
শান্তির কথা বলো যাহা কিছু, সব জানি, সব বুঝি—
তবুও প্রকৃতি নীরমান আমি স্বার্থের তরে যুঝি।

শক্তিমানের দাপটে কাঁপিছে ডরে দুর্ব্বল চিত্ত,
তাই তো আমার শক্তি সাধনা, কামনা অর্থ-বিত্ত!
শান্তিপ্রিয় হবো সেই দিন, ভীরু কাপুরুষ যারা—
রুখিয়া দাঁড়ায়ে বলিবে, "তোমারে করিব শক্তি-হারা!"
শক্তির ভার-কেন্দ্র যদি না সাম্য করিতে পারো,
শক্তিমানেরা শান্ত হবে না, যত উপদেশ ঝাড়ো।

দুর্ব্বল যদি সবলের পায়ে নিজে করে মাথা নত—
পদাঘাত হবে ন্যায্য পাওনা, হবে তারা হতাহত।
বাঁচিবার সম-অধিকার দাও—ফেলি' ভিক্ষার ঝুলি
সমানে সমানে সম্ভব হবে—শান্তির কোলাকুলি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

অপেয়ং, অদেয়ং, অগ্রাহ্যম্। প্রবচনটি বহুকাল হইতে প্রচলিত হইলেও মদ্যপান ও শৌণ্ডিকালয়ে গমন সরাসরি কখনও বন্ধ হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত প্রাচ্যের পার্থক্য এই যে, মদের প্রশস্তি কথা এদেশে কখনও সমাদৃত হয় নাই।

মদ ও সুরার ন্যায় অহিফেন, গঞ্জিকা, চরস প্রভৃতি উৎকট মাদক —একাধারে বিষ ও অমৃত। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত মাত্রায় এই সকল মাদক দ্রব্য, ঔষধ, অমৃত প্রসবিনী ; কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রাণীর নিকটে নরকের দ্বার। অনিয়মিত ও অপরিমিত ব্যবহার মানুষকে কুক্রিয়াশক্ত করে এবং পশুর স্তরে নামাইয়া দেয়, জাতির অধিকাংশ নরনারী নির্বিচারে নেশার বশীভূত হইয়া পড়িলে তাহার অমৃত-সঞ্জীবনী শক্তি হইয়া পড়ে ব্যাহত, শুদ্ধসত্ত্বগুণবিবর্জিত নরনারী বামাচারী, শক্তিহীন, নিস্তেজ ও নির্জীব। দারিদ্র্য ও অনাচারে দেশ পূর্ণ হওয়ায় স্বাধীনতা বিকাইয়া যায়, বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী।

জীবন্ত সমাজ মদ ও মাদক দ্রব্যের অনিয়মিত ব্যবহার কখনও সমর্থন করে নাই ! জাতি যখনই নবীন আদর্শে ডগমগ হইয়া উঠিয়াছে তখনই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে এই পুরাতন দুষ্ট ব্যাধির বিরুদ্ধে। কুসুম সুষমামণ্ডিত, কিন্তু কুসুমের অন্তঃস্থলেই কীট বাস করে। বর্ণ-সুষমায় পুষ্পের শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথেই কুসুম কীটের অভিসার সুরু হয়। মানব সভ্যতার কাহিনী অনেকটা অনুরূপ, তাহার রাজপথ কখনও কুসুমাস্তীর্ণ হয় নাই। আদিম বন্যতার অভিশাপ তাহার সহযাত্রী, জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকাকালে এই অভিশাপ থাকে রক্তের মধ্যে ঘুমাইয়া নিস্তেজ হতচেতন অবস্থায়। সভ্যতার সমৃদ্ধির সাথে সাথে এই আদিম বন্যতা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের নির্মম ও জঘন্যাকার অভিযান সুরু হয়। সময় সময় রাষ্ট্র আসিয়া যোগ দেয় এবং এই মর্মান্তিক অত্যাচারকে বিচারের প্রহসনে অসহনীয় করিয়া তোলে, নির্মমতার সকল মাধুরী লুপ্ত হয়, অত্যাচার যতই তীব্র হয় অনন্ত-মানব-অন্তঃকরণে সুধারস ধারার ক্ষরণ অলক্ষে তত বেশী বৃদ্ধি পায়। একদল ঘরভোলা দরদী মানুষ আত্মার এই অপমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, বিদ্রোহ ঘোষণা করে ; বজ্রদহনে আপন পাঁজরা জ্বালাইয়া দিয়া সকলের জন্য আলোকের সমারোহ সৃষ্টি করে। এই বিভিন্নমুখীন, দোটানা স্রোতের কলকাকলী সংক্ষেপে সংস্কৃতির ইতিহাস।

সম্প্রতি বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ায় মানুষের আদিম বন্য চরিত্রের এক নির্মম কাহিনী অবগত হওয়া যায়। অখণ্ড ভারতে গাঁজার চাষ হইত পূর্ব পাকিস্তানে, কিন্তু অহিফেন পাকিস্তানে উৎপন্ন হয় না। ভারত বিভক্ত হওয়ায় এক অংশের গঞ্জিকা-সেবীর তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তি বন্ধ হয়, কিন্তু অপরাংশের অহিফেন-সেবীর জীবন হয়ে পড়ে মরুভূমি। মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তি তৃপ্তির অসুবিধা বিদূরিত করিবার জন্য একদল মানুষ গাঁজা অহিফেন বিনিময়ের বাজার খোলে। ভারত ব্যবচ্ছেদের লক্ষ লক্ষ বেদনাময় কাহিনীর কারণ্য বিপর্যস্ত করিয়া সর্পিল পথে উভয় সম্প্রদায়ের এই মিলন-মধুর কাহিনী, অসামাজিক উপায়ে নিজেদের রুজিরোজগার গুছিয়ে লওয়া, আদিম বন্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নহে কি ?

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় ভারতবাসী মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে। সর্বোদয় মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল গান্ধিজীর শুদ্ধসত্ত্ব রাজনীতির লক্ষ্য। কালিমাময় নোংরা জীবন পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক বিশুদ্ধতায় পবিত্র জীবন যাপনে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেশী, বিদেশী মদ, গাঁজা, ভাং, চরস ও আফিমের দোকানে 'পিকেটিং' করিবার অপরাধে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সাজা হইয়াছে, তবুও তিনি নিরস্ত হন নাই, পবিত্র চেতনাসম্পন্ন জাতির উদয় ছিল তাঁহার কল্পনা। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন মদ, গাঁজা, তাড়ি ও অহিফেনের অবাধ ব্যবহারে, মানুষের মনুষ্যত্ব ও জাতির মণিকোঠা গ্রাম্যজীবন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। অস্পৃশ্যতা, ধর্মের নামে বুজরুগি এবং সামাজিক বিদ্বেষ এই সর্বগ্রাসী ধ্বংসযজ্ঞে হাতে হাত মিলাইয়াছে, তাই কয়েক সহস্র নগরের সহিত ছয়লক্ষ গ্রামের কথা ছিল তাঁহার সমুদয় চিন্তার অগ্রে। জাতির মণিকোঠা, গ্রাম, এতকাল জাগ্রত ছিল বলিয়াই শক, হুণ, যবন, তাতার ও আরব আক্রমণে ভারতের আত্মার মৃত্যু হয় নাই। বৈদেশিক প্লাবনে নগর পুনঃ পুনঃ ধ্বংস হইয়াছে, গ্রামীণ সভ্যতা বৈদেশিক আক্রমণ আত্মস্থ করিয়া পুনরায় ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে নগরের পুনরুত্থানে সাহায্য করিয়াছে, যুগে যুগে মদগর্বিত বিজয়ী আগন্তুক উচ্চচেতনাসম্পন্ন বিজিত জাতির সংস্কৃতির নিকটে পরাভূত হইয়া কালে এই দেশের জাতির দেহে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহারা কেবলমাত্র ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। বহুক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী তাহারাই দেশ বিদেশে বহন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই গ্রামীণ সভ্যতা ধ্বংস হওয়ায় চিরমুখর ভারত স্তব্ধ হইয়া পড়িল, বৈদেশিক বিজয় দূরের কথা—ঘরে বাইরে পরাজয় ও বিপর্যয় তাহার নিত্যদিনের সাথী হইয়া পড়িল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালক তাই এই গ্রামকে, শতাব্দীর অভিশাপে উৎপীড়িত গ্রামীণ সভ্যতাকে, পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সামাজিক বিপ্লব আনিতে চাহিয়াছিলেন। লবণকর ও আবগারীতে সরকারের কোটি কোটি টাকা লাভ হয়, সকলেই জানে জাতি গঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু কেবলমাত্র অর্থে জাতির উন্নতি হয় না, বিপুল স্বার্থত্যাগ ব্যতীত জাতি আত্মস্থ হয় না, নবজীবনের প্রভাতে তিতিক্ষা ও ত্যাগধর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করাই ছিল জাতির পিতার

আকাঙ্ক্ষা। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে প্রদেশে প্রদেশে মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম এবং তাড়ির উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করা হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সরকার জাতিকে ব্যসন ও নৈতিক দুর্নীতিতে আসক্ত করিয়া বিপুল অর্থ রোজগার করিত, বর্ত্তমান আজাদী সরকার ঐ বিপুল অর্থের বিনিময়ে জাতির সম্বিত ফিরাইয়া নববিধানের গোড়াপত্তন করিতে চাহিতেছেন। ঠিক এই সময়ে আমাদের দেশে মদ ও মদ্যপের বিরুদ্ধে যুগে যুগে যে সকল অভিযান চলিয়াছিল এখানে তাহার উল্লেখ হয় তো অস্বাভাবিক হইবেনা।

অতীত যুগে কপিলার উষর প্রান্তরে সোমরস আর্য্যদিগকে সুরবিবাদে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সোমরসে আচ্ছন্ন নরনারী আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অজানার পথে পাড়ি দিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই মদিরা চিরদিন তাহাদের তনুমনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। অনুসন্ধিৎসা ও সংগ্রাম তাহাদিগকে নবজীবনের প্রভাতে বাস্তবের ও জ্ঞানের আলোকে প্রভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সমুদ্রমন্থনে হলাহলের সহিত সুধাও উঠিয়াছিল। মোহিনীর বিলোল কটাক্ষ ও কোমলতায় সুরগণের অভীষ্ট সাধনে সহায়তা করিলেও হলাহল হইতে ত্রিভুবন রক্ষা করে কে? দেবকুলনন্দিত একবারে উমাপতি সেই হলাহল পান করিয়া জগৎ রক্ষার কারণ হইয়া গেল। আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদে সোমরসের প্রশস্তি পাওয়া গেলেও সোমরসের সুধাধারায় আর্য্য নরনারী যে দেবগুণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। সোমলতা মন্থন হইতে সেবন অবধি প্রক্রিয়া একটি ধর্ম্মীয় অনুশাসনে নিষ্পন্ন হইত। সম্ভবতঃ ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল বলিয়া মদ্যপের বাড়াবাড়ির খবর বিশেষ জানিতে পারা যায় না। ইন্দ্রের রাজসভা কিম্বা নৃত্য-পটিয়সী অপ্সরাদের কথা সাধারণ নরনারীদের বেলায় উঠে না। মদে আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র বুদ্ধির দেবতা হলধারী বলরাম প্রায়শঃ সোমরসে আচ্ছন্ন থাকিতেন। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে মদিরা ব্যতীত ধর্ম্মচর্চা শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যাপার ছিল। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে চক্রে মাংস, মদ ও নারী পূজার অঙ্গ বিশেষ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। সাধারণের মধ্যেও যাঁহারা শক্তি চর্চা করিতেন কিম্বা যুদ্ধজীবী ছিলেন মদ তাঁহাদের প্রিয় ছিল। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রকার, স্মৃতি, বৌদ্ধ, জৈন, ও বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা মদ ও মদ্যপদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। স্বাধীন, অনাড়ম্বর ও পবিত্র অন্তঃকরণই অসীমের ধ্যান ধারণা করিবার অধিকারী, সমাজদেহ বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক স্তরের জনসাধারণের দৈনন্দিন আহার বিহার ও মানসিক অনাবিলতা অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার। সৌভাগ্যের বিষয় পুরাকাল হইতে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পানদোষের আধিক্য খুবই অল্প ছিল। বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে দৈনিক জীবনে অষ্টশীল পালন অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য ছিল। জৈন মতাবলম্বীরাও অহিংসা এবং কঠোর চারিত্রিক বিশুদ্ধতার উপরে জোর দিতেন। শঙ্করের আবির্ভাবের পরে নব্য হিন্দু সংগঠনে অষ্টাদশ পুরাণ বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারতের অবদান যথেষ্ট। প্রত্যেক ধর্ম্মমণ্ডলী এই সকল রত্ন ভাণ্ডার হইতে দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষা ও সুষমা গ্রহণ করিত। এই কারণে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে সুরাপান অপেয়ং, অদেয়ং, অস্পৃশ্যম্ হইয়াছিল। নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃত পংক্তি হইতে আলোচ্য বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

রামায়ণ আমাদের এক অতি পুরাতন ও পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি, সবার উপরে মানুষের সত্যিকার সরল কাহিনী জানিতে পারা যায় বলিয়া ধর্ম্মপুস্তক হওয়া সত্ত্বেও সর্বকালের সর্ব স্তরের সর্ব নরনারীর ইহা প্রিয়। এই রামায়ণের যুগে সাধারণ নরনারী মদ ও মদিরাকে অস্পৃশ্য মনে করিত। কিন্তু রণদুর্ম্মদ ও যুদ্ধপ্রিয় লোকেরা আসব প্রিয় ছিল, বিশেষতঃ যুদ্ধের পূর্বে উত্তেজক মদ্য পান করান হইত। তখন ভাষায় এই উত্তেজক আসবকে 'বীরপান' বলা হইত (১) রাজদরবারে মদ একেবারে অপাংক্তেয় ছিল ইহাও বলা যায় না, রাজা দশরথের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে শ্রীরামচন্দ্র যখন সানুজ লক্ষ্মণ ও পত্নী সমভিব্যাহারে বন গমন করিলেন তখন শোকার্ত্ত রাজা দশরথ রাজ্যের যাবতীয় খাদ্য দ্রব্যাদি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য সুমন্ত্রকে আদেশ দিয়াছিলেন, কৈকেয়ী সেই আদেশ শুনিয়া বলিয়াছিলেন,

> রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব
>
> নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে।

মহারাজ, সব ধন যদি চলেই যায় তবে পীতসার আস্বাদহীন সুরার ন্যায় শূন্য রাজ্য ভরত নেবে না (২) রাজা-রাজড়াদের মধ্যে সুরার প্রচলন না থাকিলে মহাকবি বাল্মীকী রাণীর শ্রীমুখে সুরার উপমা দিলেন কেন? কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালির মৃত্যুর পরে সুগ্রীব রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কৃতজ্ঞতায় অধীর সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে বানর কটক দিয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত, কিন্তু মদ্য রাজ্য এবং মহারাণী তারাকে পাইয়া তিনি প্রতিজ্ঞার কথা সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ অনুযোগ দেওয়ার জন্য সুগ্রীবের প্রাসাদে গমন করিলে রাণী তারা অসময়ে তাহাদের কামভোগে বাধা দেওয়ায় যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানের প্রমত্তযৌবনমদমত্তা নারীর মুখেও বেমানান মনে হয়।(৩)

ভরত রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সসৈন্যে শ্রীরামের অনুগমন করেন; পথে ভরদ্বাজ আশ্রমে সসৈন্য ভরতকে আপ্যায়িত করা হয়। সেই মধুর আপ্যায়ন সভায় ভরতের অনুগামী সৈন্য, সামন্ত, দাস-পরিচারকদের জন্য পায়স ও মাংস ব্যতীত নারী ও সুরার ব্যবস্থা ছিল। এক একজন পুরুষকে সাত আটজন সুন্দরী স্ত্রী নদী তীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গ সংবাহন করে মদ্যপান করাইতে থাকে। পান ভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত হয়ে বলিতে লাগিল—

---

(১) শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় অনূদিত রামায়ণ।

(২) শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় অনূদিত রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৯৭ পৃঃ।

(৩) রামায়ণ ২৩৩ পৃঃ,

নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্।

কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথাসুখম্॥ (৯১।৫৯)

আমরা অযোধ্যায় যাবো না, দণ্ডকারণ্যেও যাবো না, ভরতের মঙ্গল হোক, রামও সুখে থাকুন (৪)। হনুমান লঙ্কা বিধ্বস্ত করিয়া সদম্ভে মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরে সমস্ত বানর কটক নেতার বিজয় আস্ফালনে পুলকিত হইয়া উঠিল। কিষ্কিন্ধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে এই শুভ সংবাদ ভেট দেওয়ার জন্য তাহারা সদলে প্রত্যাবর্ত্তন করে। রাস্তায় মধুবনের নিকট উপস্থিত হওয়ার পরে মধুচক্র দর্শনে তাহাদের পদযুগল গতিহীন হইয়া পড়ে। প্রধান নেতা অঙ্গদ বানরদের অবস্থা বুঝিয়া মধুপান ও সুগন্ধ ফলমূল খাইতে অনুমতি দিলেন। মধুপানে তাহাদের নেশার লক্ষণ সুরু হইল। মহানন্দে ভূতলে, ভূতল হইতে বৃক্ষের অগ্রশাখায় উঠিয়া মধুপান চলিতে লাগিল। মহাকবি লিখিয়াছেন, মূত্রের সহিত মধু নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা মধুপানে ক্ষান্ত হয় নাই (৫)।

কুম্ভকর্ণের কথা আরও বিচিত্র। প্রচুর মাংস, শোণিত এর সহিত দুই সহস্র কলস মদ্যপান না করিয়া তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিতেন না। উদাহরণ না বাড়াইয়া সংক্ষেপে বলা যায় রামায়ণের যুগে অন্ততঃ-পক্ষে যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে মদ্যপান প্রথা ছিল। কিন্তু রামচন্দ্র ছিলেন ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয়, আদর্শ নিরাসক্ত গৃহী। রামায়ণকার সকল রকম হিংসা, জিঘাংসা, লোভ ও মাৎসর্য্যের উপরে শ্রীরামচন্দ্রের কঠোর কর্ত্তব্যময় অনাবিল আদর্শ গৃহী জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন। মহাভারতেও দেখি রামায়ণের পুনরাবৃত্তি, অধর্ম্মের উপরে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে নিযুক্ত পার্থসারথি—সঙ্কল্পে দৃঢ়, কর্ত্তব্যে কঠোর, অথচ দয়ায় বিগলিত প্রাণ। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে জ্ঞাতি ধ্বংসে নিরুদ্বিগ্ন ও ভয়লেশহীন। কর্ত্তব্যের খর্পরে পাপ সমূলে ধ্বংস করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে নিযুক্ত। কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারাবতী, মদ্যপ যদুকুল-ধ্বংস সর্ব্বত্র একই শিক্ষা। পাপের বধ্যভূমির উপরে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও জয়যাত্রা।

হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির ন্যায় ইসলামের ধর্ম্মশাস্ত্র, কোরাণশরীফে সুরাপানের তীব্র নিন্দাবাদ আছে। কোরাণের এই বাণী, এই নির্দেশ লোকের অনেক সাধারণ জীবনেও পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। বিখ্যাত সুফী ও সাধকদের জীবন-আলোচনা করিলে এই পরিচয়—সাধনার তীব্র আলো, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাদশাহ, ওমরাহ আমীর প্রভৃতি সাধারণ সংসারী জীবনে কোরাণের বয়াৎ গোঁড়ামী ব্যতীত সামান্য পরিবর্ত্তনই আনিতে পারিয়াছে। অনেকেই অত্যন্ত সৌখীন, মদ, মাংস ও বারবিলাসিনীপ্রিয় ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা বাদশাহের দরবারে বেশী যাতায়াত করিতেন কিম্বা যে সকল হিন্দু বাদশাহের অধীনে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইতে বাসনা রাখিতেন তাঁহারা অলক্ষ্যে বেশভূষায় কিম্বা নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর সামাজিক জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সমাজের উচ্চস্তরে রাজা মহারাজা কিম্বা নবাবের বিশ্বস্ত আমলাদের জীবনে মদ্যপান সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এই সময় সামাজিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং হিন্দু সমাজে নবজাগরণ সুরু হয়, বাংলাদেশে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য জাতির অসাড় দেহে নূতন ভক্তিপ্রবাহে প্রাণ সঞ্চার করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারা যায়, বহু জগাই মাধাই প্রেমধর্ম্মের সুশীতল বারি পান করিয়া নব-জীবন লাভ করেন। অবধূত নিত্যানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সখা। বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহার প্রেমানুরাগ মত্ত মাতালের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইলে সংসার ধর্ম্মে রুচি থাকে না, দৈনন্দিন নাওয়া-খাওয়া জীবনে অরুচি আসিয়া যায়। মদমত্ত মানুষেরও স্বাভাবিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, এষণাবৃত্তি লুপ্ত হওয়ায় ক্রমে তাহারা মানুষের অযোগ্য হইয়া যায়, কাজেই দুই বিপরীত মত্ততায় প্রভেদ আছে। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা নরনারী অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দে পাগল। শক্তিবাদী কাপালিক কিম্বা তান্ত্রিক সাধু ত্যাগী বৈষ্ণবের এই প্রেমময় জীবন ধারণায় আনিতে অসমর্থ। ইসলাম বিজয় সত্বেও এই দেশে যাহারা পতিত ও নীচ বলিয়া ঘৃণ্য হইত, তাহাদের জীবনেও চৈতন্যের নীতিধর্ম্ম বিরাট পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থান যুগে যুগে এই ভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে কয়েকটি রত্ন কণিকা এইখানে উদ্ধৃত হইল। *

শাক্ত বলে চলো ঝাট মঠেতে আমার
সভেই আনন্দ আজি করিব অপার
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে আনন্দ
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ

* * *

সন্ন্যাসী সভায় যদি হয় নিন্দাকর্ম্ম
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে
পরচর্চ্চাকে গতি কভু নাহি ভালে।

* * *

বৈষ্ণব সভার কেনে মহা মাতোয়াল
ঝাট নাহি পলাইলে না হইবেক ভাল

* * *

উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যের মণিমঞ্জুষা হইতে তৎকালীন আদর্শ চরম নীতিধর্ম্মের কথা বুঝিতে পারা যায়। বিজাতীয় আদর্শ ধীরে ধীরে আমাদের সমাজের অস্থি পঞ্জর চূর্ণ করিয়া

(৪) রামায়ণ ৩২ পৃঃ।

(৫) 'মধু'র এক অর্থ মিষ্টমদ্য, রামায়ণ ২৯৬ পৃঃ।

* শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত।

আনিতেছিল। শক্তি পূজার নামে বিকৃত তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি নীতি-ধর্ম্মের স্থলে সুরা ও পরদার পূজা বৈদেশিক শক্তির সহিত হাত মিলাইয়া ধ্বংশকে পূর্ণতাপ্রদান করিতেছিল, এই সময় চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম, সাম্যের এই নববিধান রাজনৈতিক অসুবিধা সত্বেও দেশ তথা জাতিকে রক্ষা করিল। রাজাধিরাজের ও রাজা আছে, ইহজগতের পরেও এক জগৎ আছে, মানুষের পাপ পুণ্যের যেখানে বিচার হয়। আত্মিক শক্তি যে রাজনৈতিক শক্তির চেয়েও বলশালী। সুখ দুঃখে প্রপীড়িত নরনারী এই নূতন বার্ত্তার সন্ধান পাইয়া দলে দলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ত্যাগ ও নীতিধর্ম্মের আলোকে দেশ ও সভ্যতা রক্ষা পাইল।

কিন্তু মানুষের মন একই প্রবাহের ধারায় চিরদিন স্নাত হয় না। সুখানি দুঃখানি চ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে। লোভ ও হিংসার মত্ততা যখন প্রবল হয় তখনই যুগে যুগে আসে পরিবর্ত্তন। মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তবিপ্লবে পলাশীর আম্রকাননে ক্লাইভ বিজয়ী হইল। কপট পাশার নূতন দানে ক্রমে ক্রমে ভারতের রাজশ্রী ইংরাজের হাতে চলিয়া গেল। লোকে অবাক হইল, গুটিকয়েক মানুষ বাণিজ্য করিতে আসিয়া বিশাল দেশের রাজা হইয়া গেল। নূতন চিন্তা জাগিল। সাগর পারের এই সাদা বাইবেলপূজক লোকগুলি ত কম নহে! মদগর্বিত পাঠান, মোগলকে কেবল বুদ্ধির প্যাঁচে একেবারে ঘায়েল করিয়া দিল। য়ুরোপে তখন বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হইয়াছে—বাষ্পীয় পোত, রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আস্তে আস্তে এদেশেও দেখা দিল। এদেশের পালওয়ালা জাহাজ, সিপাহীদের ফিতাওয়ালা বন্দুক, ঘোড়ার ডাক ও গোযান একেবারে অবাক হইয়া গেল! প্রাচীন আদব-কায়দা বাঁচাইয়া ধীরে সুস্থে হাঁচি, টিকটিকি মানিয়া দিন-গুজরাণ অভ্যাসের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বণিকদের সহিত বাণিজ্যের বিনিময়সূত্রে কতকগুলি এদেশীয় লোক সাহেবদের বাঁধাধরা বুলি মূলধন করিয়া বিপুল রোজগার করিতে আরম্ভ করিল। দোভাষীর বৃত্তি অবলম্বনের জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত :হইল। এই সকল বিদ্যালয়ে রাজভাষা শিক্ষা দেওয়ার সহিত ইংরাজদের আচার ব্যবহার, চালচলন এমন কি তাহাদের ধর্ম-প্রচার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হইয়া দাঁড়াইল। সকল দেশেই ঔপনি-বেশিকদের মধ্যে চারিত্রিক পদস্খলন সাধারণ ঘটনা। তৎকালীন ইংরাজ চরিত্র কিম্বা তাহাদের সামাজিক রুচি ইংলণ্ডীয়•সাহেবদের অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। এদেশীয় যুবক সম্প্রদায় ইংরাজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য শিখিবার সুযোগ না পাইয়া স্থানীয় স্খলিত-চরিত্র সওদাগরের বিকৃত সভ্যতা অনুকরণ করিতে লাগিল। এই সময় ডিরোজীও নামক একজন অ্যাংলোইণ্ডিয়ান্ যুবক হিন্দুস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ডিরোজীও খাস বিলাতী সাহেব না হইলেও শিক্ষিত এবং উদার-নৈতিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি এ দেশীয় ছেলেদের সহিত বন্ধুর মত মিশিতেন এবং খাস বিলাতী সভ্যতার নবারুণে এদেশীয় যুবজনচিত্ত বিভোর রাখিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক বিজয়ের সহিত সাংস্কৃতিক অভিযানও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ডিরোজীওর নব প্রচেষ্টায় "ইয়ং বেঙ্গল" দলে বিপ্লব আরম্ভ হইল * দেশীয় যুবকদল কায়মনে শাসক সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ, সুরাপান, দেশীয় আচার নিষ্ঠা উল্লঙ্ঘন—তাহাদের প্রিয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে দেশীয় পিতাপিতামহদের আচার সভ্যতা জলাঞ্জলি দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই হয়তো এতদিনে নিগ্রোদের ন্যায় ঠোঁট মোটা কালা সাহেব বনিয়া যাইত! কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ভাবে এই অন্ধ অনুকরণে ভাটা পড়িল। প্রাচীন দেশীয় সংস্কৃতির উপরে আক্রমণ যতই তীব্র আকার ধারণ করিল, ততই ফল্গু নদীর ধারার ন্যায় ইহার অন্তর্নিহিত শুভ বুদ্ধির নির্গমন আরম্ভ হইল। রাজা রামমোহন বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের বীচিমূলে দাঁড়াইয়া উদাত্ত সুরে, বজ্রনাদে ঘোষণা করিলেন। "বৈজ্ঞানিক নিকষ প্রস্তরে পরীক্ষা না করিয়া তোমাদের ভাল মন্দ কিছুই গ্রহণ করিব না।" ক্রমে ক্রমে চিন্তাশীল জনসাধারণের নিকট হইতে এই নিছক বিলাতীপণার বিরুদ্ধে আসিল প্রচণ্ড বাধা। ভারতীয় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত শাসক জাতির বৈদগ্ধগুণ আত্মস্থ করিতে যাহাদের আগ্রহ ছিল 'তত্ত্ববোধিনী' সভা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অসংখ্য মনীষী এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। † রাজভাষা শিক্ষার সহিত রাজ সভ্যতার মিথ্যা অনুকরণ, দাস-সুলভ অনাচার ও দেশীয় সংস্কৃতির উপরে প্রচণ্ড অবহেলা, নির্বিচারে মদ্যপান এবং অখাদ্য ভক্ষণ, এই সকল সমস্যার সামনে তত্ত্ববোধিনীর ক্ষুরধার তীব্র কশাঘাত দৈববাণীর মতন উপস্থিত হওয়া সত্বেও তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্বকথা শিক্ষিত জনসাধারণের একাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিল। সমাজের সকল স্তরেই তখন সুরা রাক্ষসীর প্রবল রাজত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাষ্ট্র যেখানে অনুকূল নহে, সেখানে কঠোর পরিশ্রম ও বহুল ত্যাগ ব্যতীত সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন আন্দোলনে কিছুকাল অতিবাহিত হইল; তারপরে যিনি আসিলেন তাঁহার নাম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁহার সহিত আসিয়া জুটিলেন হেয়ার স্কুলের তদানীন্তন হেডমাষ্টার প্যারীচরণ সরকার, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সেবাব্রতী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। স্বামী দয়ানন্দ, মহামতী রাণাডে, গোখেল ও কেলকার প্রভৃতি ইহার পুরোভাগে ছিলেন, মদ্যপানের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র যে সমিতি স্থাপন করেন তাহার নাম "মদ্যপান নিবারণী সমিতি।" এই সমিতির মুখপত্রের নাম ছিল "মদ না গরল।" বিদ্যালয়ের

---

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ছাত্রদের মধ্যে যে সমিতি কাজ করিত তাহার নাম ছিল "আশা বাহিনী" "BAND OF HOPE।" প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সমিতির নাম ছিল "সুরাপান নিবারণী সমিতি।" সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য তিনি ইংরাজী ভাষায় "ওয়েল্ উইশার" এবং বাংলা ভাষায় "হিত সাধক" নামক দুইখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। কেশববাবুর মৃত্যুর পরে প্রধানতঃ প্যারীচরণ সরকার মহাশয় মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন।* ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রমজীবীদের মধ্যে কাজ করিতেন। বাংলা দেশে তিনিই শ্রমজীবী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। এই আন্দোলনে তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য তিনি শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন করেন (Barahanagor Working man's Institute)। শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষা ও সুনীতি প্রচারই ছিল এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ। এই জন্য তিনি ব্যক্তিগত পরিশ্রম ব্যতীত নিজস্ব পৈতৃক গৃহ, জমি ও অর্থ দান করেন। শ্রীকেশবের নেতৃত্বে মদ্যপান নিবারণী সমিতির প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। বিপুল শ্রোতার মধ্যে এই সভায় রাজপ্রতিনিধি সহ শতাধিক ইয়োরোপীয়ও যোগদান করেন। আন্দোলন তীব্রতর করিবার জন্য কেশবচন্দ্র ভারতের প্রধান প্রধান সহরে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মুঙ্গের, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া যায়, এবং সর্ব্বত্র শাখা সমিতি স্থাপিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র বিলাতে ভ্রমণে গেলে সেখানকার নানাবিধ কাজের মধ্যেও মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন তিনি বিস্মৃত হ'ন নাই। বহু সভা সমিতিতে ব্রিটিশ শাসনের এই কলঙ্ক ও কুফল তিনি প্রদর্শন করেন। ১১শে মে তারিখের সেণ্ট্ জেম্‌স্ হলের বক্তৃতা আজও বিখ্যাত হইয়া আছে †।

"আমাদের দেশের লোক মদ চায় না। তবুও মদ্য ব্যবসায়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এত উৎসাহ ও আগ্রহ কেন? পল্লীবাসী হিন্দুদের ঘরে গিয়া দেখুন কি সহজ ভাব, শুদ্ধ-সত্ব জীবন, কিন্তু সভ্যতার নামে সভ্যতার অত্যাচারে এই শুদ্ধভাব আর টিকিতে পারিতেছে না। ব্রিটিশ জাতি ভারতের জনগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়ার ও মিল্টন্ শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে বিয়ার বোতল ও ব্রাণ্ডিপান করাইতে শিখাইয়াছেন। এই পাপে কত শত যুবক প্রাণ দিয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষ আর নেই।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন "মদের বাণিজ্য যদি লাভের জন্য না হয় তবে যে কর্ম্মচারী মদের আয় বাড়াইতে পারে সরকার তাহাকে পুরস্কৃত করেন কেন?"

২৯শে মে অপর এক সভায় বলেন, "যেখানেই ব্রিটিশ যান সেখানেই তাঁহারা তাঁহাদের সাথে মদ্যপান পাপ লইয়া যান। ব্রিটিশগণকে যদি কোনদিন আমাদের দেশ হইতে চলিয়া আসিতে হয় তাহা হইলে ব্রাণ্ডির বোতলগুলি তাহাদের সমাধিলিপি হইয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিবে।" স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে "সুলভ সমাচার" পত্রিকায় অগ্নিবর্ষী ভাষায় জনমত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে তাঁহার উদ্যোগে একটি শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে সাধারণ ভাষা, নীতিশিক্ষা, সূত্রধর কার্য্য, ঘড়ী মেরামত, মুদ্রাঙ্কণ, প্রস্তরলিপি এবং খোদন কার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। শ্রমজীবীদের জীবনে যাহাতে দুর্নীতি না প্রবেশ করে তাহাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ১৮৭৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী আলবার্ট বিদ্যালয়ের বালকদিগকে লইয়া আশাবাহিনী গঠিত হয়, প্রতি বৎসর এই বাহিনীর শোভাযাত্রা হইত, সুসজ্জিত বালকগণ গলায় লাল ফিতা, রক্তবর্ণ জয় পতাকা হাতে বীর বেশে সুরা রাক্ষসী বধ করিবার জন্য গান গাহিতে গাহিতে কলিকাতার বহু রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া "কমল কুটীরে" উপস্থিত হইত। এই শুভ কার্য্যে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া বালকদিগকে কেশববাবু আশীর্ব্বচন করিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রতিজ্ঞা করো, সুরা স্পর্শ করিবে না। বলো জীবনে সুরার মুখ দেখিবে না, সকলকে সমস্বরে বলিবে, ওরে, মদ ছাড়ো, মদ ছাড়ো, তোমাদের প্রতিজ্ঞাতে আগুন জ্বলিবে, দেশের সকলে মদ ছাড়িয়া দিবে।" এই আশাবাহিনীর কাজ বহু বৎসর চলিয়াছিল এবং ছাত্র সমাজে দারুণ উৎসাহ আনিয়াছিল।

[এই ভাবে যুগে যুগে আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান মানুষ ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া চলিয়াছে। মানুষই বারবার মানুষকে সুরার সর্পিল পথে নামাইয়া দিয়াছে। আপাততঃ মানুষের মনে হয় এই যুদ্ধের যেন শেষ নাই, বিরাম নাই। মানুষের বস্তুতা তাহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ থাকিতে দেয় না, তাই বারবার সে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলে, আর বিধাতার উদ্যত খড়্গের আঘাতে আহত হইয়া আপন আলয়ে ফিরিয়া আসে। দুঃখের তিমিরে হারাণ সম্বিত ফিরিয়া পায়। পুনরায় আরম্ভ হয় শক্তিসঞ্চয়ের পালা। ঠিক এই ভাবে সভ্যতার মুক্ত ধারায় বন্ধন পড়িয়াছে বারংবার, কিন্তু শিকল ছেঁড়া যাহাদের কাজ, তাহারা কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না। মহা-ভৈরব যখন জাগ্রত হয় তখন হাতের দড়ি পায়ের দড়া সবই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ শিকল ভাঙ্গার অভয় নৃত্য যাহাদের কানে ভাসিয়া আসে তাহারা অন্ধের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারে না, সুযোগ পাইলেই জন্মের ঋণ পরিশোধের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে, সভ্যতার রাজপথ তাই এত বৈচিত্র্যময়, গতি কভু শ্লথ, কভু দ্রুত, যুগ যুগ ধরিয়া সংস্কৃতির অভিযান এই ক্ষুরধার পথেই অগ্রসর হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, কুশিক্ষা ও সমাজগত দৈন্য যতকম থাকিবে, সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শ যতদিন উজ্জ্বল থাকিবে, মানুষের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ ততদিনই রহিবে অটুট। এই ঐক্যময়, কল্যাণময় পবিত্র যৌথ বিশ্বরাষ্ট্র হইবে গান্ধিজীর সর্ব্বোদয় সমাজের গোড়া পত্তন।]

---

* প্যারীচরণ সরকারের অপর পুস্তিকা "মদ খাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়?"

† উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত আচার্য্য কেশবচন্দ্র ৬৭২-৭৩ পৃঃ।

‡ উপাধ্যায় প্রণীত আচার্য্য কেশবচন্দ্র ৬৮৯ পৃঃ।

* অহিফেন বাণিজ্য ও চীন দেশ ৭২৮ পৃঃ।

† উপাধ্যায় প্রণীত আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১১৭৩ পৃঃ।

আয়ুর্ব্বেদ ও জাতীয় সরকার

কবিরাজ শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী বি-এ, এল্-এম্-এস্

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। এই স্বাধীনতায় ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের আনন্দ করিবার অবসর কই? বিদেশী শাসনের গুরুভারক্লিষ্ট ও অবহেলিত আয়ুর্ব্বেদ আজ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার হৃতগৌরব পুনরায় উদ্ধার করিয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনলাভে সহায়তা করিতে পারিবে বলিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের আয়ুর্ব্বেদের ব্যাপক শক্তির কোন সাহায্যই গ্রহণ করিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যে কতখানি মলিন হইয়া পড়িয়াছে তাহা স্বাধীন ভারতের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের মনোবৃত্তির অভিব্যক্তির দ্বারা খানিকটা প্রতিফলিত হইতেছে। পাশ্চাত্যভাবাচ্ছন্ন বিদেশীসংশ্লিষ্ট জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ-বিরোধী সুবিধাবাদীগণের সুর-বদলান অভিনয়ে জাতির সুশিক্ষিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্ত্তৃপক্ষ যে চালিত হইবেন তাহা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। পৃথিবীর সভ্যসমাজে ভারতবর্ষ এক শ্রদ্ধা ও সম্মানজনক স্থান অধিকার করিয়া আছে ও ভবিষ্যতে এক নূতনতর আলোকে বিশ্ববাসীর হৃদয় আলোকিত করিবে এ আশাও রাখে। এই শ্রদ্ধার আসন অন্যান্য দেশের ন্যায় মারণাস্ত্র আবিষ্কারে বা অন্য কোন জাতিকে কোণঠাসা বা পরাস্ত করিয়া অর্জ্জন করে নাই। এই শ্রদ্ধার উৎস যে কোথায় এবং কি করিয়া একটা পরাধীন জাতির পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইল তাহা কি দেশনায়কগণ একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বেদ, উপনিষদ, আয়ুর্ব্বেদ স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ তন্ত্র, জ্যোতিষ, স্থাপত্য, সাহিত্য, সাধুজনবাণী প্রভৃতিকে বাদ দিয়া আজ তাঁহারা একবার বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখুন যে তাহাদের এ স্থান কোন নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। আজ দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে কিন্তু দেশের এই গৌরবের মূলসূত্রটি কোথায় এখনও কি তাহা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না? যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহায়তায় এই পরাধীনতার অভিশপ্ত জীবনে এক পরম কৃতিত্বের পরিচয়ে পৃথিবীর বুকে ঢক্কা নিনাদ করিতেছেন, কোন অধিকারে তাহাদের উন্নতি ও সংস্কার না করিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া প্রাগৈতিহাসিক হিসাবে তাহাদিগকে যাদুঘরে স্থান দিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে বঞ্চিত করিবেন?

আজ ভারতের এ যুগসন্ধিক্ষণে যাহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী বলিয়া দাবী করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাহারা বিভিন্ন রং বদলান প্রাণীবিশেষের ন্যায় উপদেষ্টার পরামর্শে যদি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হন, তবে তাহার অনুষ্ঠান পর্ব্বেই জাতীয় সরকার; বরেণ্য নেতৃগণকে সাবধান হইবার জন্য আবেদন জানাইবার প্রয়োজন দেশবাসী অবশ্যই বোধ করিবে। পরাধীন ভারতে তাহাদের এই আবেদন অগ্রাহ্য ও অনাদৃত হইয়াছে তাহাতে দুঃখ ছিল না, কারণ তাহারা এই সুদিনের অপেক্ষায় ছিল। আজ যদি দাসসুলভ মনোবৃত্তির পুনরভিনয় চলে তবে ভারতের জাতীয় মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে বেশী দেরী হইবে না।

আয়ুর্ব্বেদসেবীগণ পুঞ্জীভূত বেদনা, অপমান ও ত্যাগ বরণ করিয়া বিশেষ প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যেও ভারতীয় অন্যতম কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষীণবর্ত্তিকা আজও জ্বালাইয়া রাখিয়াছে এই দিনের অপেক্ষায়। ভারতীয় চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ব ও বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব বুঝিবার ইচ্ছা যাহাদের নাই, যাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইবার অনুপযুক্ত তাহাদের সহায়তায় আয়ুর্ব্বেদকে বাদ দিয়া জাতির স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিলে আমাদের জাতীয় জীবনীশক্তি নিঃসন্দেহে কমিয়া যাইবে!

আপাতদৃষ্টিতে বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ কোন কোন অংশে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত যুগোপযোগী চাহিদা মিটাইতে অক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আমরাও তাহা অস্বীকার করি না ও ইহা যে কোন অগৌরবের কারণ তাহাও মনে করিবার যুক্তি নাই। চিকিৎসা-শাস্ত্র কোনদিনই স্বাস্থ্যের ও রোগচিকিৎসার নিয়ম চিরতরে বাঁধিয়া দিতে পারে না। যুগের পরিবর্ত্তন অনুযায়ী তাহাকে কালোপযোগী করিতে বাধ্য করিবে। চিন্তাশীল আয়ুর্ব্বেদসেবীগণ বহুদিন হইতে এ বিষয় সচেতন আছেন এবং বাংলাদেশের বর্ত্তমান ষ্টেট ফ্যাকাল্টি অফ্ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিনের শিক্ষাপ্রণালী তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত দ্বারা উক্ত প্রণালীতেই কলেজগুলিতে আয়ুর্ব্বেদ পাঠ্য ও শিক্ষণীয় ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে উভয়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছাত্র পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে সরকারী স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানে কোন স্থান পান নাই বা পাইতেছেন না। ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদের ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষার মান যে হ্রাস পাইতে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সরকারের সাহায্য ভিন্ন সাধারণ সাহিত্যের কলেজগুলিতেই উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিতে পারা যায় না। তাহাতে সরকারের সহানুভূতিহীন চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা কি করিয়া বর্ত্তমান প্রতিকূল অবস্থায় সম্ভব তাহা সুধীজনমাত্রেই বুঝিবেন।

কোন চিকিৎসাশাস্ত্রই রাজশক্তির সাহায্য ছাড়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। বিদেশী মনোবৃত্তির সাহায্যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী বর্ত্তমানে অচল বা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু জাতীয় সরকারের সহায়তায় ইহা যে কতখানি দেশ ও কালোপযোগী হইতে পারে তাহা অনুধাবন ও প্রয়োগ না করা জাতীয় সরকারের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে। আয়ুর্ব্বেদ আমাদের জাতীয় গৌরব ও পৃথিবীর অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্মদাতা। ইহার চিকিৎসাপ্রণালী

ও ঔষধাদি দেশবাসীর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল এবং সহজে ও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। স্বল্পবৃত্ত, রসায়নচিকিৎসা প্রচলনে রোগোৎপত্তি, রোগের প্রসার, স্বল্পায়ু ও হীনবলের প্রাচুর্য্য কমিয়া যাইবে। হয়ত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক হিসাবে আর জীবাণু বা জীবাণুর সাংঘাতিক বিষ অথবা পরীক্ষামূলক বিজাতীয় ঔষধাবলী শরীরে প্রবেশ করাইয়া সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না। প্রকৃতিজাত প্রাণী হিসাবে প্রকৃতির সুস্থ ও সুন্দর দানকে আবার আমরা বরণ ও বিশ্বাস করিতে পারিব। এত বড় একটা আয়ুর্ব্বিজ্ঞানকে বুঝিবার ও কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা না করিয়া সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদেশী মনোভাবাপন্ন সুবিধাবাদী দেশহিতৈষী ও একচক্ষু হরিণের মত তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী প্রকৃত অবৈজ্ঞানিক অনুশাসন জাতীয়-সরকারকে প্রভাবান্বিত করিয়েছে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ আজ রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ ও সাহায্যের অভাবে বিভক্ত ও নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া বাঁচিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। উপরন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা এমন কতকগুলি সংস্কারের অধীন হইয়া চলিতেছেন যে তাহাতে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি দার্শনিক মতবাদের প্রাধান্যেই পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে। রোগের যন্ত্রণা ও মৃত্যু বাস্তব, ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই চিকিৎসা-শাস্ত্রের সৃষ্টি। পৃথিবীর যেখানেই রোগোপশমের উপাদান পাইবে, মানুষ মাত্রেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা করিবে ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি বাস্তব। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে সেই সকল উপাদান দেশকাল পাত্রবিশেষে পরিণামে অকল্যাণকর হইতে পারে কিন্তু রোগক্লিষ্ট মন ও দেহের চাহিদায় তাহার উপস্থিত কার্য্যকরী ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইয়া থাকে ও লইবে—যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সে তাহার পরিবর্ত্তে অধিকতর শক্তিশালী স্থায়ী উপকারী উপাদানের সন্ধান পায়। এই কারণেই উন্নতিশীল নূতনত্বের সন্ধানেই যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের প্রচেষ্টা। কোন কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বা সম্প্রদায় বলেন যে অনেকক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি খুব শীঘ্রই উপকার দর্শাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু পরিণামে ইহাতে রোগীর জীবনীশক্তি কমাইয়া দেয় কিম্বা অন্য রোগ উৎপাদন করিয়া রোগ জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তোলে। এ কথার সত্যমিথ্যা বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র। কারণ বর্ত্তমান যুগের বিমিশ্রিত জীবনধারায় বিভিন্ন জাতি ও দেশের মনীষীবৃন্দের সংস্পর্শে ভারতবাসী আর তার সংস্কৃতিকে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া রাখিতে চাহে না। সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আদান প্রদানে পক্ষপাতী—এ সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই জন্যই ভারতীয় রোগক্লিষ্ট জনসাধারণ অন্যান্য দেশের চিন্তাপ্রসূত ফলকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা দেখিয়া,—নিজের আপাত ক্লেশ ও মৃত্যুকে অসহনীয় মনে করিয়া যাহাকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের থাকিবার আশা করা ভুল।

পূর্ব্বতন ভারতীয় চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদকে কোনদিনই একটা গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া রাখেন নাই। যদি রাখিতেন তবে পারদ, আফিং, নাড়ীজ্ঞান প্রভৃতির অভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় বর্ত্তমান অবস্থায়ও যাহা আছে তাহাও পাওয়া যাইত না।

মানুষের সামাজিক জীবন কালস্রোতে অবশ্য পরিবর্ত্তনশীল এবং চিকিৎসাশাস্ত্রও সেই সামাজিক জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ অধিকার করিয়া আছে বলিয়াই ইহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই কালের আহ্বানকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কাহারও নাই। জোর করিয়া চাপিয়া রাখার চেষ্টা শুধু আত্মশক্তির ক্ষয়েই পর্য্যবসিত হইবে।

আজ দেশের চিন্তাশীল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের সম্মুখে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে সম্যক্‌ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আমি সমস্যাগুলি সংক্ষেপে জানাইতেছি :—

১। বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে তিনটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে—

(ক) যাহারা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদকে আধুনিক বিজ্ঞানের কোন সাহায্য না লইয়া দেশের সমগ্র স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধান করিতে উপযুক্ত মনে করেন, কিন্তু সরকারের সাহায্য ভিন্ন তাহা সম্ভব হইতেছে না।

(খ) দ্বিতীয় দল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বহু প্রাচীন,—কালস্রোতে মানবসমাজের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও বহু নূতনত্বের সন্ধানের সুযোগ আসিয়াছে। উপরন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে ও দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে আয়ুর্ব্বেদের কোন কোন অংশ লুপ্ত বা অস্পষ্ট রহিয়াছে—এমতাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতির কোন কোন বিষয় বর্ত্তমান যুগোপযোগী চাহিদা মিটাইতে অক্ষম হওয়া অস্বাভাবিক নয় ও সেইজন্য তাহার প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা উন্নতিশীল জাতি হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন যুগেও আয়ুর্ব্বেদ-মনীষীগণ প্রয়োজন ও সুবিধামত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। অতএব আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

(গ) তৃতীয় দলের মতবাদ বড়ই অদ্ভুত রকমের। তাহারা অন্তরে দ্বিতীয় দলের সহিত একমত, কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন বিরুদ্ধ জনমতের ভয়ে নিজ নিজ স্বার্থ বিপন্ন হইবে বলিয়া এমনভাবে নিজেদের অভিভূত রাখিয়াছেন যে সেকথা জোর করিয়া বলিবার সাহস রাখেন না। উপরন্তু অনেকক্ষেত্রেই আধুনিক জ্ঞানের বা উদারতার অভাবে আয়ুর্ব্বেদও তাহার ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিকূল পরিবেশে চঞ্চল না হইয়া পারিতেছে না।

প্রত্যেক চিন্তাশীল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাবিয়া দেখিয়া কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিতে অনুরোধ করি :—

(১) জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের মধ্যে বহু পণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহারা জগতের এই বাস্তব পরিবর্ত্তনকে মানিয়া লইলে অনায়াসেই তাঁহারা শিক্ষা ও জ্ঞানসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও জনগণকে আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে পারিবেন।

(২) যাহারা যেভাবে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারেন

তাঁহাদিগকে সেইভাবেই বুঝাইতে বা গ্রহণ করাইতে হইবে—এই জন্ম অভিমান বা ক্রোধ করিয়া অথবা আত্মপরায়ণ হইয়া বর্ত্তমান জীবনধারার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা না করিলে চিরকালই আয়ুর্ব্বেদ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

(৩) সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে জাতীয় সরকারের পরিচালকগণ দেশহিতৈষী ও জনগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাদিগকে যদি আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষ বুঝাইতে পারি তবে তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির যথাযোগ্য চেষ্টা না করিয়া পারিবেন না।

(৪) আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের অনতিবিলম্বে সংগঠন কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে ও এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে—

(ক) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি কি ভাবে, কোথায়, কখন রোগোপশম ও রোগবিস্তার নিবারণ করিতেছে তাহার নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ প্রমাণ সংগ্রহ।

(খ) আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিচ্ছিন্ন ও বিভক্তদলীয় চিকিৎসার সামঞ্জস্য রক্ষা।

(গ) সমবেত চেষ্টায় একটী গবেষণাগার স্থাপন ও এতদুপলক্ষে আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ।

(ঘ) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুর্ণবিকাশ ও প্রয়োগ করার কার্য্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইবার উদার মনোভাব সৃষ্টি করা ও এতৎসঙ্গে ইহাকে দেশ ও কালোপযোগী করিয়া তোলা।

(ঙ) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানী ও উৎসাহী চিকিৎসারত ব্যক্তিকেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া গণ্য করিবার ব্যবস্থা।

(চ) আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের দেশ ও কালোপযোগী সরল ও প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ব্যবস্থা ও প্রচার এবং অন্যান্য প্রদেশের চিকিৎসা প্রণালীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন।

(৫) পরাধীনতার ফলেই হউক বা নিজেদের দোষত্রুটীর জন্যই হউক বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ কায়-চিকিৎসা (Medicine) লইয়াই আছেন। কিন্তু সাধারণ্যে চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে যুগধর্ম্মানুযায়ী রোগের সকল অবস্থা ও পরিণতি আয়ত্তে আনিবার জ্ঞান ও কৌশল চিকিৎসক মাত্রেরই নিকট হইতে জনসাধারণ পাইবার দাবী রাখেন। সেইজন্য প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও হাসপাতালে রোগের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রতিকার সম্বন্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থার বিষয় জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

(৬) আয়ুর্ব্বেদের শল্যচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, চক্ষুরোগ, রোগ-প্রতিষেধ প্রভৃতির প্রচলন বর্ত্তমানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এইগুলি আয়ুর্ব্বেদ হইতে অনুসন্ধান করিয়া পুনঃস্থাপন করিতে বহু সময় লাগিবে, কিম্বা সম্পূর্ণভাবে দেশ ও কালোপযোগী হইবে কিনা তাহাও বলা যায় না। এমতাবস্থায় সকল প্রকার রোগের চিকিৎসার জন্য আপাততঃ প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মর্য্যাদা দিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসক হিসাবে পরিগণিত হইতে হইবে।

জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য :—

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদের বিরাট দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই ও সুযোগ আসিলে ভবিষ্যতে হয়ত আরও কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের রোগক্লিষ্ট জনগণের মহান উপকার দর্শাইতে পারে। ইহা একমাত্র জাতীয় সরকারের সহায়তায় সম্ভব। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন ও সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গপ্রদেশে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির গুরুদায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় সরকারের উপর বর্ত্তাইয়াছে। স্বর্গীয় গঙ্গাধর, গঙ্গাপ্রসাদ, দ্বারিক, বিজয়রত্ন, যামিনীভূষণ, মাধব, হরিনাথ, পঞ্চানন, নিশিকান্ত, শ্যামাদাস, হারাণ, গণনাথ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কি অসামান্য প্রতিভা ও জ্ঞান লইয়া সমগ্র-ভারতে জাতির সেবা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বহু রাজামহারাজা, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় ইঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও অর্থ দিয়া নানারূপ দুরারোগ্য ও জটীল রোগে উপকার পাইয়াছেন। ইহারা ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। জাতীয় সরকার এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন যে আজও আয়ুর্ব্বেদের জনপ্রিয়তা জনসাধারণের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে আমাদের প্রাদেশিক সরকারের দুইটী প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে—

(১) বর্ত্তমান চিকিৎসারত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের অভাব-অভিযোগ নিরাকরণ ও তাহা দূরীকরণের ব্যবস্থা।

(২) ভবিষ্যতে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা ও চিকিৎসাপদ্ধতি নির্দ্ধারণ ও তাহা দেশ ও কালোপযোগী করিয়া জনস্বাস্থ্যে প্রয়োগ।

(ক) প্রথমটীর বিষয় সরকারের কিছু করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান- ষ্টেট ফ্যাকাল্টী অফ্ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিন কর্ত্তৃক রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণের মধ্য হইতে উক্ত ফ্যাকাল্টীর সহায়তায় উপযুক্ত লোককে বাছাই করিয়া তাহাদিগকে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও বিশেষক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রোগনিবারণ ও চিকিৎসাপদ্ধতি অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসর কাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ও এই সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে সার্টিফিকেট দেওয়ার বিষয়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত ডাক্তারের ন্যায় সমমর্য্যাদা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রতি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে অন্ততঃপক্ষে দুইটী ইউনিয়নে দুইজন পূর্ব্বোক্তভাবে শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে সরকার-পরিচালিত দশটী বেডের হাসপাতাল ও আউট-ডোরের ব্যবস্থা করিয়া তাহার এক একটীতে একজনকে নিয়োগ করিতে হইবে। চিকিৎসার ফলাফল নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয় সমস্যা সমাধানে সরকারের একটী সুচিন্তিত বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ সরকারের এই নীতির উপর আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ও এতৎসঙ্গে সরকারের আয়ুর্ব্বেদের উপর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিভঙ্গী সরাইয়া জাতীয় সম্পদ হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়া সহানুভূতি লইয়া ইহার উন্নতির প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বিদেশী শাসনের আওতায় বিচ্ছিন্ন এবং সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে বাহির হইবার মনের অবস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন; উপরন্তু বিদেশী শাসকের সহানুভূতি ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে বহু অনুপযুক্ত লোক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদার লাঘব করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসককে লোকচক্ষে হেয় বা অচল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া জাতীয় সরকারকে প্রভাবান্বিত করিতেছেন। অতএব সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে অনুপযুক্ত লোক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না ও আয়ুর্ব্বেদের বিরুদ্ধ প্রচার বন্ধের সহায়তা করিবে।

(৩) কলিকাতায় চারিটী আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু নিদারুণ অর্থাভাবে ও ইহাদের নিরুপায় কর্তৃপক্ষ ও শক্তিহীন ফ্যাকাল্টীর পরিচালনায় তাহাদের অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। সরকারের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত তাহা হইতে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিমূলক কোন প্রচেষ্টা পাওয়ার আশা করা সম্ভব নয়। উহাদের একটী জাতীয় সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতালে পরিণত করিয়া অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ, গবেষণাগার ও কলেজ প্রভৃতি খুলিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রণালীর কতখানি দেশ ও কালোপযোগী হইবার উপযুক্ত, সরকার তাহা বুঝিতে পারিবেন।

(৪) সরকারের অধীনে কয়েকজন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক থানাতে বা ইউনিয়নে নিযুক্ত হইলেই মেধাবী ছাত্রের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার আগ্রহ হইবে।

(৫) উক্ত সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার জন্য পাঁচ জন বিশেষ ভাবে শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ও এক জন বোটানিষ্ট, এক জন কেমিষ্ট, এক জন বায়োকেমিষ্ট ও এক জন প্যাথোলজিষ্ট নিযুক্ত করিয়া ধারাবাহিকভাবে গবেষণায় নিযুক্ত থাকিবেন ও গবেষণার ফলাফল সরকারের তত্ত্বাবধানে একখানি পত্রিকায় প্রতি মাসে প্রকাশ করিবেন। এই ভাবে স্বল্পকালেই একটী ভারতীয় ফারমাকোপিয়া রচনা ও চিকিৎসাপ্রণালী বিধিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করার সুবিধা হইবে।

৬। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন কোন চিকিৎসা পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে দেশোপযোগী হইতে পারে না; এই জন্য যাহারাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হইতে চান তাহাদের আয়ুর্ব্বেদের সহিত প্রত্যেককেই ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, বোটানি, বায়োলজি, এনাটমি, ফিজিয়লজি, মেটেরিয়ামেডিকা, প্যাথোলজি সারজারি, মিডওয়াইফারি, টক্সিকোলজি ও জুরিস্ বনিয়াদী শিক্ষা হিসাবে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) বিভিন্ন মতবাদসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম প্রচেষ্টার পথনির্দ্দেশক সম্মিলিত অভিমত লাভ করা বর্ত্তমানে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় ও এই বিষয়ে অযথা সময়ক্ষেপ না করিয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে আপাততঃ জাতীয় সরকারকে স্বহস্তে এই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দুইজন, প্রাচীনপন্থী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক দুইজন ও সরকারের প্রতিনিধি এক জন এই পাঁচজনকে লইয়া সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের অধীনে একটী সাবকমিটী গঠন করিয়া তাহার উপর আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য যথা প্রয়োজন ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ ষ্টেট ফ্যাকাল্‌টি তাহার অভাব অভিযোগ ও মন্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে এই কমিটীর মধ্য দিয়া সরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে—চিকিৎসা শাস্ত্র মাত্রেই রোগোপশমের জন্য সৃষ্ট ও কোন চিকিৎসাশাস্ত্রই সম্পূর্ণ বলিয়া দাবী করিতে পারে না এই জন্য রোগোপশমের উপাদান মানুষ যেখানেই পাইবে সেখানেই তাহাকে সে আপন করিয়া লইবে। আয়ুর্ব্বেদে অনেকক্ষেত্রে যুগোপযোগী চাহিদা মিটাইতে পারে না, পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা শাস্ত্রও বহুক্ষেত্রে বিফল হইয়া থাকে। এমত ক্ষেত্রে উন্নতিশীল জাতির প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় সরকার ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে কি আছে ও কি নাই ও ইহার কতখানি মানবের রোগমুক্তির সন্ধান দিতে পারে এবং কোন বৈশিষ্ট্যে এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আজও এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কোটী কোটী ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আছে—আন্তরিকতার সহিত তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিসা-পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করিবা আয়ুর্ব্বেদের ত্রিদোষতত্ব, পঞ্চমহাভূততত্ব, রস, বীর্য্য বিপাক ও ন্যায়দর্শন সাংখ্য দর্শন ও বৈশেষিকদর্শন (Atomic theory of Kanad) ইত্যাদির রোগচিকিৎসা ব্যাপারে উপযোগীতা কতখানি সে সম্বন্ধে অযথা উপহাস না করিয়া উপযুক্ত মনীষীগণ দ্বারা তথ্যানুসন্ধানে যত্নবান হওয়া জাতীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়কই হইবে। আমরা ভারতবাসী—আমরাও যুগের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি কামনা করি কিন্তু বর্ত্তমান ভারত ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা নহে। এখনই যদি আমরা তাহাদের মত একই চালে চলিবার চেষ্টা করিয়া তাহাদের জ্ঞান প্রসূত দ্রব্যাদি অবাধে চালাইবার চেষ্টা করি ও নিজেদের জ্ঞান সম্পৎ অবহেলা বা ঘৃণা করি তবে এই দরিদ্র ও দীর্ঘকাল অভ্যস্ত পরাধীন দেশবাসীর উদ্ভাবনীশক্তি আত্মনির্ভরতা ও আত্মগৌরব কোন কালেই আসিবে না। জাতীয় অর্থ ও আত্মচেতনা অজ্ঞাতসারে অবলুপ্ত হইবে। ভারতের আদর্শ, চিন্তাধারা ও ঐতিহ্য যে মহান মানবতার মধ্যে ফুটিয়াছে আজ স্বাধীন ভারতে সেই গুলিকে অধিকতর মহান করিবার দায়িত্ব জাতীয় সরকারে উপর পড়িয়াছে। দলগত বা ব্যক্তিগত মতামতে জনমতকে উপেক্ষা করিয়া জাতীয় সরকার আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির আগ্রহ ও চেষ্টা করিবেন না—ইহা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবিভাগের ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তান হইতেই অসংখ্য অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাহ্নে একটা চুক্তি বা বোঝাপড়া হইবার সুযোগ ঘটায় পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তবু কিছুটা ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইঁহাদের এবং পূর্ব্বপাঞ্জাব সরকারের সমবেত চেষ্টায় আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকাংশেরই অন্ততঃ একটা সাময়িক গতি হইয়াছে, পূর্ব্বপাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। পূর্ব্বাঞ্চলের এই আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। মোটামুটি ৫০ লক্ষ লোক পশ্চিমপাকিস্তান হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে। পূর্ব্ব-পাঞ্জাব সরকার এবং ভারতসরকার অত্যন্ত উদারতার সহিত ইহাদিগকে পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। স্থির হইয়াছে পূর্ব্বপাঞ্জাব এবং পূর্ব্বপাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যে (সহর এলাকা) ১৩ লক্ষ, বোম্বাই প্রদেশে ৫ লক্ষ, যুক্তপ্রদেশে ৪ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশে ৩ লক্ষ, দিল্লীপ্রদেশে ২ লক্ষ ৫০ হাজার, মধ্যভারত সংরাষ্ট্রে ২ লক্ষ, মৎস্য সংরাষ্ট্রে ১ লক্ষ, উদয়পুরে ১ লক্ষ এবং আজমীর, বিকানীর, যোধপুর ও বিন্ধ্যপ্রদেশের প্রত্যেকটিতে ৫০ হাজার করিয়া আশ্রয়প্রার্থীর পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। পূর্ব্বপাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যাও গুরুতর কিন্তু ইহাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য এ পর্য্যন্ত খুবই সীমাবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। বড় রকমের স্থানান্তর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই দারুণ ভয়ের দিনগুলি কাটাইবার পর এখনও নানা কারণে বাধ্য হইয়া যাহারা পূর্ব্বপাকিস্তান ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। সরকারী হিসাবেই প্রকাশ, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ জন, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৫৬৭ জন, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৩১১ জন ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৪৮১ জন বাস্তুত্যাগী পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থী-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব গত ২০শে অক্টোবর সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন যে, বিগত একমাসে প্রায় ২২ হাজার আশ্রয়প্রার্থী শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়াছে। বাস্তুত্যাগীর এই সংখ্যা হইতেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে গত ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৩,৬৮,৭৮৩ জন আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ ছাড়া আরও অনেকে পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা সরকারের অজ্ঞাতে নিজেরাই কোনক্রমে আশ্রয় সংগ্রহ করিয়া বা আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে। মনে হয় সব জড়াইয়া আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বেশী নয়, এ সম্পর্কে কর্ত্তব্য প্রায় সবটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে করিতে হইতেছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের অসংখ্য সমস্যার ভারে প্রপীড়িত। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ব্বপাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয়-শিবিরে স্থানদান এবং স্থায়ীভাবে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা একরূপ অসম্ভব। তবু যাঁহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া এবং অনেক আশা লইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন, তাঁহারা বাঙ্গালী এবং তাঁহাদের কাহাকেও বিমুখ করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য। অবস্থাগতিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কর্ত্তব্যপালনে অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার জন্য পশ্চিমবাঙ্গলার সহরগুলিতে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, অগণিত নিঃস্ব আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম হইয়া সহরগুলির খাদ্যপরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্য নিদারুণ বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোট শরণার্থীর একাংশকে আশ্রয় দিয়াছেন, বাকী সকলকেই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া শূন্যে ভাসিতে হইতেছে। ২২শে অক্টোবর পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশ্রয়প্রার্থী শিবিরের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩০ এবং এইগুলিতে আশ্রয় পাইয়াছে মোট ৬৬,৩০৪ জন। বর্ত্তমান অবস্থায় স্থান সংগ্রহ করা কঠিন, তবু সরকার আরও কয়েক সহস্র আশ্রয়প্রার্থীর ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পুনর্বসতি-সচিব শ্রীযুক্ত মাইতির বিবৃতিতে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৫১ হাজারের কিছু বেশী এবং পশ্চিমবাঙ্গলার জেলাসমূহে ১,৫৪,৪৫৯, একুনে ২,০৫,০০০ জন শরণার্থীকে খয়রাতি সাহায্য দিতেছেন। এই হিসাবে সরকারের মাসিক ব্যয় হইতেছে ২৫ লক্ষ টাকার উপর। বলা বাহুল্য, এই সরকারী সাহায্য খাতে ব্যয় কমাইবার প্রশ্ন তো বর্ত্তমান অবস্থায় উঠিতেই পারে না, বরং ইহা বহু পরিমাণে বাড়িলেই ভাল হয়। সকল দিক বিবেচনা করিলে আর্থিক অসচ্ছলতা ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার হিসাবে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই চেষ্টার মূল্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কিন্তু সমস্যার বিশালতার বিবেচনায় এই ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য্যও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাছাড়া পরিস্থিতি এখনই চূড়ান্ত নয়। পূর্ব্বপাকিস্তানে এ পর্য্যন্ত যে ৯০ লক্ষের মত অমুসলমান রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আরও কতজন পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় খুঁজিতে আসিবেন, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে জটিলতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়াই কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বনিয়াদ অত্যন্ত দুর্ব্বল, ইতিমধ্যেই আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা এই দুর্ব্বল বনিয়াদে বেশ একটি বড় ফাটলের সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিপুল সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গে যে স্থায়ীভাবে স্থান হইতে পারে না, একথা পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার সহিত

পরিচিত সকলেই জানেন। পশ্চিমবাঙ্গলার যা সম্পদ, তাহাতে এখানকার স্থায়ী অধিবাসীদেরই চলে না। বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি আসিতেছে না, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে শীঘ্র বেশী যন্ত্রপাতি আসিবারও সম্ভাবনা নাই, কাজেই এখানে নূতন শিল্পে প্রচুর কর্ম্ম-সংস্থানের আশা সুদূরপরাহত। পশ্চিমবাঙ্গালায় যে সব শিল্প চালু আছে সেগুলিতে প্রায়ক্ষেত্রেই অবাঙ্গালী শ্রমিকের রাজত্ব। কৃষির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি প্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গে মোট ভূমির পরিমাণ ১,৭৯,৪১,:২০ একর অথবা ৫,৩৮,২৩,৩৬০ বিঘা। লোকের বাস্তু বাদ দিলে কর্ষিত এবং কর্ষণযোগ্য পতিত জমি ধরিয়াও এখানে মাথাপিছু চাষের জমি দাঁড়ায় ০·৫৭ একর বা ১·০৭ বিঘা। পতিত জমিতে চাষ করা সময়সাপেক্ষ এবং চেষ্টা হইলেও সব জমিতে চাষ করা হয় তো শেষ পর্য্যন্ত সম্ভবই হইবে না। প্রদেশের অধিকাংশই কৃষিজীবী, কাজেই জমির পরিমাণের এই স্বল্পতার জন্য প্রদেশের আর্থিক দৈন্য চিরস্থায়ী হইয়া উঠিতেছে। বিভাগের ফলে ২ কোটি ১২ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। এ হিসাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৭৫৬ জন। গ্রেট ব্রিটেনের মত সর্ব্বদিক হইতে সমৃদ্ধ দেশেও প্রতি বর্গমাইলে এই ঘনত্ব ৬৮৫ জনের বেশী নয়। দেশবাসীর কর্ম্মসংস্থানের সুযোগের হিসাবে গ্রেটব্রিটেনের সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনাই চলে না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে আবার নূতন জনতার চাপ আসিলে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত নিঃসন্দেহে অন্ধকার হইয়া যাইবে।

এইজন্যই আশ্রয়প্রার্থীদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাহাদের অন্ততঃ একটি বড় অংশকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এভাবে এইসব বিপন্ন হতভাগ্যের জীবনরক্ষার মোটামুটি আয়োজন হইলে আশ্রয়প্রার্থীগণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সকলেই বাঁচে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই যুদ্ধোত্তর বেকারসমস্যা দেখা দিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি এবং পণ্যমূল্যবৃদ্ধির চাপে এই প্রদেশের অবস্থা এখন শোচনীয়। অথচ আশ্রয়প্রার্থীদের হাহাকার এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, পশ্চিমবাঙ্গলার নিজস্ব ক্রমবর্দ্ধমান দুর্দ্দশা কাহারও দৃষ্টিই আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পূর্ব্ব পাকিস্তানের একাংশের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিবার কথা গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। আন্দামান ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের কয়েদখানা ছিল, কয়েদীদের আবাসভূমি এবং জঙ্গলাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থান রূপেই আন্দামান এদেশের অধিকাংশ লোকের নিকট পরিচিত। কাজেই আন্দামানে আশ্রয়প্রার্থী পাঠাইবার কথা উঠিতে না উঠিতেই অনেকে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ সুরু করিয়াছেন। অবশ্য যাঁহারা জোরগলায় আন্দামানকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহাদের প্রায় সকলেই যে আন্দামান সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহা না বলিলেও চলিবে। ইহারা শুধু শোনা কথায় এবং হৃদয়াবেগে অত্যন্ত জরুরী একটি সমস্যার গুরুত্ব কমাইয়া দিতেছেন। তা ছাড়া এই সব প্রতিবাদকারী পশ্চিম বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্যাগ স্বীকারের সীমা, আশ্রয়-প্রার্থীদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত প্রভৃতি সম্পর্কেও যথোচিত চিন্তা করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য পূর্ব্ব পাঞ্জাবের উপর চাপ বেশী পড়িলেও এই আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দানের ব্যাপারে ভারত সরকারের মধ্যস্থতায় অনেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য লক্ষণীয় ভাবে আগাইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের সমস্যাও গুরুতর, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, অন্যান্য প্রাদেশিক বা দেশীয় রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যকরী আগ্রহ মোটেই যথেষ্ট নয়। এদিকে পশ্চিমবঙ্গেরও এমন অবস্থা নয় যে এত বহিরাগতকে আশ্রয় দিয়া সকলের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করে। ইয়োরোপে জনবাহুল্যের জন্যই একদিন আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজ পশ্চিমবাঙ্গলার অসম্ভব জনবাহুল্যের চাপ কমাইয়া সর্ব্বহারা ও সকল দিক হইতে অসহায় অন্ততঃ কয়েকলক্ষ আশ্রয়-প্রার্থীকে যদি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মানুষের মত বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা আশার কথা বলিয়াই আমরা মনে করি। সব খবর না লইয়া শুধু জনশ্রুতি ও সংস্কার বশে আপত্তি জানান নিরর্থক, বর্ত্তমান দুঃসময়ে সকলেরই আন্দামানে আশ্রয়প্রার্থী প্রেরণের প্রশ্নটি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা দরকার। আন্দামানে যদি একটি বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহা আশ্রয়প্রার্থী ও বাঙ্গালী সমাজের ভবিষ্যতের দিক হইতে কল্যাণকরই হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে আন্দামানে নূতন বাঙ্গালী উপনিবেশ গঠনের সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। প্রয়োজনের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ভারত সরকার এখন আন্দামানে বাঙ্গালী উপনিবেশ গঠনে আগ্রহ দেখাইতেছেন, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই বিশাল বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিলে এবং ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহাতে সবদিক দিয়াই পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ বাড়িবে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ, এখানে জাহাজ ও বিমান ঘাঁটি আছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্তিক ভূমিভাগ পশ্চিমবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিটি দখলে থাকা ভাল। পশ্চিমবঙ্গ আন্দামানে আত্মপ্রসার করিতে না পারিলে মাদ্রাজের ইহাকে গ্রাস করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আন্দামান হইতে মাদ্রাজের দূরত্ব পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমান, পোর্টব্লেয়ার মাদ্রাজ সহর হইতে মাত্র ৭৪০ মাইল দূর। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীরা আছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ যুগে এত বড় কুমারী ভূমিভাগ বেকার পড়িয়া থাকিতে পারে না। অজ্ঞানতাবশতঃ আন্দামান সম্পর্কে আমাদের মনে নানা আতঙ্ক আছে, অচেনা নূতন জায়গায় স্থায়ী বসবাসের জন্য যাইতে মানুষের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। এই সব কারণেই পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র লোকেরা এখন

আন্দামানে যাইতে চাহিবে না। পূর্ব্ব পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীরা নিরুপায় ও নিঃস্ব, উদারতার সহিত কর্ত্তৃপক্ষ যদি চেষ্টা করেন, এই আশ্রয়প্রার্থীদের একাংশকে আন্দামানে লইয়া যাওয়া যাইবে। অবশ্য ইহাদের খাদ্য বা জীবিকার নিশ্চিত দায়িত্ব কর্ত্তৃপক্ষকেই লইতে হইবে। অধিকতর প্রয়োজনের তাগিদে আশ্রয়প্রার্থীদের একদল যদি আন্দামানে গিয়া জীবিকার সুযোগ পায়, তখন এই নিরন্ন দেশ হইতে আন্দামানে যাইবার লোকের অভাব হইবে না। মিথ্যা ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে শুধু পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থী নয়, পশ্চিমবঙ্গের অনেক লোকও আন্দামানে পাড়ি জমাইবে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ আগে ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে ইহা ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত হইলে ভারত সরকার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই নির্জ্জন দ্বীপটিতে দ্বীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের রাখিবার বন্দোবস্ত করেন। বাহিরের লোক এই দ্বীপে আসুক এবং দ্বীপপুঞ্জের উন্নতি হোক, ভারত সরকারের কোনদিনই এরূপ ইচ্ছা ছিল না। নিজেদের কর্ম্মচারীদের স্বার্থে শুধুমাত্র পোর্টব্লেয়ার সহরটিকে তাঁহারা ভদ্রলোকের বসবাসযোগ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাকী সমস্তই অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া আছে। সারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের যা কিছু উন্নতি, প্রায় সবই এই পোর্টব্লেয়ার সহরে সীমাবদ্ধ। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা ৩৩,৭৬৮ জন, ইহার মধ্যে একমাত্র আন্দামান সহরেই ৪১১১ জন বাস করে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপের সংখ্যা ২০৪টি, এতগুলি দ্বীপে ভারত সরকারের আমলে মোট ১৮২টি গ্রাম (বা সহর) গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব গ্রামের মধ্যে আবার পোর্টব্লেয়ারই উল্লেখযোগ্য, এই গ্রামেই (সহর) চার হাজারের বেশী লোক বাস করে, এ ছাড়া ৪টি গ্রামের মিলিত লোকসংখ্যা ৪৮০৮ জন, এবং অপর ১২টি গ্রামের মিলিত লোকসংখ্যা ৭৫৩৩ জন,—এই ১৭টি গ্রামেই লোকসংখ্যা পাঁচশতের বেশী ; দ্বীপপুঞ্জের বাকী ১৬৫টি গ্রামে পাঁচশতের কম লোক বাস করে। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের হিসাবে এখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে এখন মাত্র ১১ জন বাস করে। পশ্চিম বাঙলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৭৫৬ জন, কাজেই জীবিকার সংস্থান হইলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডে (ইহা আয়তনে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রায় ⅓ ভাগ) বহুলোকের স্থান অনায়াসেই হইতে পারে। জীবনধারণের অসুবিধা না থাকিলে এখন আন্দামানে যাইবার লোকের অভাব হওয়ার কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গে যে সব নিঃস্ব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন, বাঁচিয়া থাকাটাই এখন তাঁহাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা। এই বাঁচার সুব্যবস্থা অন্যত্র হইলে আপেক্ষিক সুবিধার লোভে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের বিপদ সৃষ্টিতে তাঁহাদের উৎসাহ না থাকাই উচিত। অবশ্য এই সূত্রে কর্ত্তৃপক্ষকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে আন্দামানে বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিলে এখনকার তুলনায় আন্দামানের সহিত বাঙ্গলা প্রদেশের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। আন্দামান ও বাঙ্গলার মধ্যে যাতায়াত সহজসাধ্য হইয়া যোগাযোগ উন্নত হইলে আন্দামানস্থ বাঙ্গালীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বাঁচাইয়া রাখা কঠিন হইবে না। আন্দামানের দূরত্বও এমন কিছু বেশী নয়, দ্বীপপুঞ্জের প্রধান সহর পোর্টব্লেয়ার হইতে কলিকাতার দূরত্ব মাত্র ৭৮০ মাইল। এখন কলিকাতা ও আন্দামানের মধ্যে যে ষ্টীমার সারভিস চলিতেছে, তাহা ব্যবসায় হিসাবে চলিতেছে না, ক্ষতি হইলে ভারত সরকার সেই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব লন বলিয়া এবং যাত্রীদের তাগিদ নাই বলিয়া ষ্টীমার কোম্পানী উন্নত ধরণের জলযানের সাহায্যে দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন না। আন্দামানে লোকজন এবং ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িলে এই সারভিসটিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আরও ভাল করিয়া চালানো অবশ্যই সম্ভব হইবে। মনে হয়, একটু ভাল সারভিস হইলেই কলিকাতা হইতে দুই দিনের মধ্যে আন্দামান যাওয়া চলিবে। এই ভাবে দুই দিনে আন্দামান যাওয়া সম্ভব হইলে এবং আন্দামানে নূতন উপনিবেশ গড়িয়া উঠিলে বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান আন্দামান-আতঙ্ক অবশ্যই বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইবে।

আশ্রয়প্রার্থীদের পাঠাইবার আগে কর্ত্তৃপক্ষকে দেখিতে হইবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে জীবিকা সংস্থানের সুযোগ কতখানি। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আন্দামান ভারত সরকারের কয়েদঘাঁটি ছিল, তখন সরকার দ্বীপের কোন উন্নতিই করেন নাই। কৃষি বা শিল্প কোনটিই আন্দামানে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিশাল উপকূলভাগে যে কর্দ্দমাক্ত জলাভূমি পড়িয়া আছে, তাহাতে বাঁধ দিয়া সুন্দরবনের ন্যায় প্রচুর ধান্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। এখন অবশ্য আন্দামানে বেশী ধান হয় না, দ্বীপগুলিতে বহমান নদী খুব কম, তবে মাটি খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায় বলিয়া এখানকার জমি নিঃসন্দেহে উর্ব্বর। এ ক্ষেত্রে খাল কাটিয়া সেচ ব্যবস্থার একটু সুবিধা করিয়া দিলেই আন্দামান দ্বীপ-পুঞ্জে উন্নত ধরণের চাষ হইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এ অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে গড়ে বৃষ্টিপাত হয় ৬০ ইঞ্চি, এ তুলনায় আন্দামানে বৃষ্টিপাত হয় বৎসরে গড়ে ১১০ ইঞ্চি। কাজেই কর্তৃপক্ষ ও দ্বীপবাসীরা সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে আন্দামানে কৃষি ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে।

নারিকেল আন্দামানের সম্পদ। এখনই আন্দামান হইতে প্রচুর নারিকেল বাহিরে রপ্তানী হয়, একটু চেষ্টা হইলে এই ব্যবসা আরও প্রসারিত হইবে। নারিকেল চালানের সঙ্গে আন্দামানে নারিকেল তৈল, দড়ি, মাদুর প্রভৃতি নারিকেল সম্পর্কিত পণ্যের শিল্পও ভালই চলিতে পারে। এই সব শিল্পে অনেক লোকের কর্ম্ম সংস্থান হইবে। চর-নিকোবর নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপ, একমাত্র এখান হইতেই এখন বৎসরে ৮৫ লক্ষ নারিকেল বাহিরে চালান যায়। সুপারীও এই দ্বীপপুঞ্জের বড় বাণিজ্য পণ্য। আন্দামানের প্রায় সবটাই জঙ্গল, এখানে নানা প্রকার কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যদিও জঙ্গল-গুলি সরকারী বন বিভাগের সম্পত্তি, তথাপি এই দ্বীপে বেসরকারী উদ্যমে কাঠের ব্যবসা প্রসারে বাধা নাই। গর্জ্জন প্রভৃতি মূল্যবান কাঠের

সারা পৃথিবীতেই বাজার আছে। কাঠের সুবিধার জন্য ইতিমধ্যে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী (উইমকো) আন্দামানে দেশলাইয়ের কাঠি তৈয়ারীর একটি কারখানা স্থাপন করিয়া সেই কাঠি ভারতবর্ষে পাঠাইতেছে। আন্দামান দ্বীপেই বৃহদাকার দেশলাই-শিল্প গঠনের প্রভূত সুযোগ আছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর বাঁশ জন্মায়। এই সব বাঁশের জঙ্গল উচ্চতায় ৩০।৩৫ ফুট পর্য্যন্ত হয়। উপস্থিত নদী কম থাকায় সুবিধা নাই বটে, তবে খাল খুঁড়িয়া এখানে চাষ আবাদের যেমন প্রসার করা যায়, তেমনি এই খালের ধারে প্রচুর বাঁশের সাহায্যে কাগজের কল গড়িয়া তোলা যাইবে। মনে হয় এই দ্বীপে কাগজের অন্যতম উৎকৃষ্ট উপাদান সবাই ঘাসের ভাল চাষ হইতে পারে। চেষ্টা করিলে হয় তো দ্বীপের অসমতল ভূমিভাগে কিছু তুলাও উৎপন্ন হইতে পারে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উর্ব্বরা মাটিতে প্রায় সকল প্রকার ফলই প্রচুর জন্মায়, এই ফলোৎপাদন সুপরিচালিত করিয়া এখানে বৃহদাকার ফল সংরক্ষণ শিল্প গড়িয়া তোলা কঠিন নয়। আন্দামানের উপকূলভাগের খাড়িগুলিতে ভাল মাছের চাষও হইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত আন্দামানের চাষ আবাদের প্রায় সবটুকু উন্নতিই কয়েদীদের দ্বারা হইয়াছে। স্থানীয় কৃষি বিভাগ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, তবে এই বিভাগ এখনও উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করে নাই। কয়েদীদের বুদ্ধিবিবেচনা সীমাবদ্ধ, আর্থিক কোন দায়িত্ব নেওয়াও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কৃষিকার্য্য যতখানি সমৃদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল, তাহারও একাংশও হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই দ্বীপপুঞ্জের কয়েদী উপনিবেশ উঠিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে এখনই এখানে শ্রমিক-সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং শ্রমিকদের মজুরীর হার বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই আন্দামানে অবিলম্বে কিছু আশ্রয়প্রার্থীর কর্ম্ম সংস্থান একরূপ নিশ্চিত।

আশ্রয়প্রার্থী শুধু পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে আসিতেছে না, পশ্চিম পাকিস্তানের অসংস্থাপিত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা এখনও অগণ্য। বাঙ্গালী আশ্রয়প্রার্থীরা মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য যদি আন্দামানে যাইতে রাজী না হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীতে আন্দামান অবশ্যই অধ্যুষিত হইবে। বোধ হয় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টে এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কয়েদী উপনিবেশ উঠিয়া যাইবার পর হইতে ৬৫০ জন ভারতবাসী আন্দামানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে গিয়াছে। ইহারা সম্ভবতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থী। পূর্ব্ব পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের সম্মুখে আন্দামানে উপনিবেশ গড়িবার সুযোগ আসিলে সেই সুযোগ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এদিক হইতেও পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করা দরকার।

অবশ্য এ কথা না বলিলেও চলিবে যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নাই, কেবলমাত্র কেতাবী বিদ্যা হইতেই এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে। এই পুঁথিগত বিদ্যা ত্রুটিশূন্য হইবে, বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় সে কথা জোর করিয়া বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো চেষ্টা করিলেও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একাংশমাত্র সভ্য মানুষের বসবাসযোগ্য করিয়া তোলা যাইবে, বাকী অংশ এখনকার মতই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। কাজেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত দায়িত্ব সরকারী কর্তৃপক্ষকেই লইতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের বাঁচাইবার আইনগত দায়িত্ব তাঁহাদের নাই সত্য, কিন্তু এই অসংখ্য অসহায় নর-নারীর জীবন রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব যখন তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন ইহাদিগের পুনর্ব্বসতির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দিক হইতে সহানুভূতির এতটুকু অভাব মারাত্মক হইবে। আন্দামানে আশ্রয়প্রার্থী পাঠাইবার আগে দ্বীপপুঞ্জের স্বাস্থ্য ও আর্থিক ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক।

সভ্যতার অভিনয়

শ্রীশান্তশীল দাস

অর্থহীন জীবনের প্রতিদিন আসে আর যায় ;
কোন মতে বেঁচে থাকা, দিন গোনা শুধু মরণের :
এর বেশী নাই কিছু, পথ-চলা পাথেয় বিহীন,
সৃজনের ব্যর্থতা, শ্রেষ্ঠতার মিছে অভিমান।

সভ্যতার অভিনয় : আজিও সে আদিম মানুষ,
যুগ যুগ ধরি' শুধু চলে নানা বিফল প্রয়াস ;
দেহের নগ্নতা ঢাকা পড়েছে সে আবরণ মাঝে,
বিনাশ হয়নি আজো পশুতার—আছে সেই মতো।

সেই মতো হানাহানি, কামনার বিকট উল্লাস,
হিংসা, দ্বেষ, প্রবঞ্চনা, ব্যতিক্রম কিছু নাই তার ;
স্বার্থমগ্ন মানুষের তামসিক বিকৃত জীবন ;
শয়তানের মুখে হাসি : বিধাতার পূর্ণ পরাজয়।

ক্লেদাক্ত ধরণী বুকে, দিকে দিকে জাগে হাহাকার,
তমিস্রার বুক চিরে আলোকের লাগি আর্ত্তনাদ ;
মরণের তীরে বসে জীবনের যাচে অবসান ;
নিভে যাক্ দীপশিখা, শ্রেষ্ঠতার রূঢ় পরিহাস।

গুপ্তি ছোঁয়া

বন্ধু : অমন করে ট্রেনের ভীড়ে কেউ বই পড়ে ? মহিলাটির গায়ে এসে পড়েছিলে যে।

পাঠক : সবই তো বোঝ বন্ধু, তবে কেন মনকে চোখ ঠারো।

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু উক্ত পরিষদের তরফ হইতে জনসাধারণের নিকটে অর্থসাহায্যের আবেদন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিকে মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না, তাহাদিগকে জনসমাজের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে হইবে। বিজ্ঞানের প্রসার বলিতে ইহাই বুঝায়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। পরিষদের কাজের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য বিশ হাজার টাকা আবশ্যক। কিছুকাল আগে পরিষদের হইয়া অধ্যাপক বসু মহাশয় উক্ত টাকার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় আবার তাঁহাকে আবেদন করিতে হইয়াছে। আমরা সাধারণের দৃষ্টি পরিষদের আবেদনটির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। —পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

* * *

আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিতে বাধ্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও প্রান্তে যে লক্ষ লক্ষ অনক্ষর লোক ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করার দায়িত্ব আজ সরকারকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এই দায়িত্ব পরিহার করিয়া অন্য দায়িত্ব গ্রহণের কথা চিন্তাও করা যায় না। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে যাহারা অক্ষরজ্ঞানযুক্ত নহে, তাহারা শুধুমাত্র অক্ষর জ্ঞানের অভাবেই অদক্ষ শ্রমিক ও অপটু কৃষকের পর্য্যায়ে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া অনায়াসেই তাহাদিগকে দক্ষ শ্রমিক কৃষকের পর্য্যায়ে উন্নীত করা যায়। সাময়িক স্বার্থের দিক হইতে তাহাতে জাতিরও সমূহ লাভ। শিক্ষাহীনতার দ্বারা আমাদের জাতীয় উদ্যম কিভাবে এবং কতদূর অপচিত হইয়েছে তাহা পরিমাপ করিবার যদি কোন উপায় থাকিত আমরা অপচয়ের পরিমাণ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতাম। শিক্ষাহীনতা মানুষকে শুধু মনের দিক হইতেই পঙ্গু করে না, তাহার উদ্যমের উৎসকেও বিশুষ্ক করে; ফলে তাহাকে শারীরিক দিক হইতেও নির্বীর্য্য করিয়া তোলে। শিক্ষাহীনতার অভিশাপ হইতে জাতিকে মুক্ত করার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তবেই সমস্তান্তরে মনোযোগ আরোপ করা চলে। —স্বরাজ

* * * *

বিনা টিকিটে রেল-ভ্রমণ এক শ্রেণীর লোকের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এই বদভ্যাস দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। কারণ ইহা দ্বারা শুধু রেল কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি হয় না, সাধারণ লোকের অসাধুতা প্রশ্রয় পায় এবং যাহারা টিকেট করিয়া যায় তাহাদের অসুবিধা বাড়ে, রেলকর্ত্তৃপক্ষ কিছুকাল ধরিয়া এই দুর্নীতিদমনে সচেষ্ট ছিলেন। ইহার ফলে শুধু ই-আই-রেলপথেই একমাসে দুই লক্ষ দুই হাজার সাত শত উনসত্তর টাকা আদায় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাত্রীদের নিকট হইতে টিকেট বাবদ আদায় হইয়াছে ৬০ হাজার ১৮৯ টাকা এবং মালের মাশুল বাবদ আদায় হইয়াছে ৯৭ হাজার ৫৬৬ টাকা। যাত্রীরা ফাঁকি দিবার চেষ্টায় ধরা পড়িয়া বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছে ৯৫ হাজার ১৩ টাকা। এক মাসে শুধু ই-আই-আর-এ আঠারো হাজার ২৬২ জন যাত্রী বিনা টিকেটে ভ্রমণ করিয়া ধরা পড়িয়াছে। যাহারা ধরা পড়ে নাই তাহাদের সংখ্যাও অবশ্যই তুচ্ছ নহে। লোকাল ট্রেণে বিনা টিকেটে কত যাত্রী যে ভ্রমণ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। জনস্বার্থে এবং জাতীয় স্বার্থেই যাত্রী ও জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই শ্রেণীর দুর্নীতি দমনে সহযোগিতা করা উচিত। —হিন্দুস্থান

* * * *

জগতের সত্তরটি দেশ উপনিবেশ হিসাবে আটটি সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অধীন। এই উপনিবেশগুলির রুধির শোষণ করিয়াই এই সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে; কাজেই এগুলিকে হাতছাড়া করিতে যে ইউরোপীয় জাতিগুলি কেন অনিচ্ছুক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় জাতিগুলি বলিয়া থাকেন যে, সভ্যতা বিস্তার ভিন্ন তাঁহাদের আর অন্য কোন লক্ষ্যই নাই; কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যকলাপের ধারা পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সভ্যতা বিস্তার একটি বেশ লাভজনক ব্যবসায়। সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘে রুশিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিরা যেন এই সমস্ত উপনিবেশগুলিতে গিয়া সেখানকার শাসনপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পায় এবং এই উপনিবেশগুলির আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের অছিদিগকে এক একখানি বাৎসরিক রিপোর্ট দাখিল করিতে বাধ্য করা হয়। বলা বাহুল্য, বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং ফলে এই প্রস্তাবটি সম্মিলিত রাষ্ট্র-পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয়। সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বরূপ যে কি, তাহা এই ব্যাপার হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। —বিশ্ববার্ত্তা

* * * *

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব্ববঙ্গ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করিয়াছেন। হঠাৎ এই প্রকার ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড়ের কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ও বাস্তুত্যাগবৃদ্ধির সম্ভাবনা কি পূর্ব্ববঙ্গ সরকার অস্বীকার করেন? ভারতীয় ইউনিয়নের কথা ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের নিকট এ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিবার যে একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে, তাহা কি পূর্ব্ববঙ্গ সরকার মনে করেন না? এইরূপেই কি তাঁহারা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষা করিবেন? পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু

সমস্যার প্রতিক্রিয়া নানারূপে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়াছে এবং একটা তিক্ত ও বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেছে। এই বিষ কোন না কোনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে: বিষের ক্রিয়া কখনও প্রীতিপদ হয় না; পরিণামে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। ইহার আশু প্রতিকার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। —পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

* * * *

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট পাশ করিবার সময় যৌথ ব্যবসায়ের ট্যাক্স বৃদ্ধির এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে জানান যে, ভারতশাসন আইন অনুসারে ব্যবসায়ে সর্ব্বোচ্চ ট্যাক্সের পরিমাণ ৫০৲ টাকার অধিক বৰ্দ্ধিত করা যায় না। কাজেই এখন ট্যাক্স বাবদ আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৫০৲ টাকার নীচে ট্যাক্সের হার পরিবর্ত্তন করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। সুপারিশটি এইরূপ—ভাড়ার পরিমাণ ৬০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ, কিন্তু ১০০৲ টাকার কম হইলে ট্যাক্সের পরিমাণ হইবে ৪০৲; ভাড়া ৩০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ অথচ ৬০৲ টাকার কম হইলে ২৫৲ টাকা; ভাড়া ২০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ অথচ ৩০৲ টাকার কম হইলে ১৫৲ টাকা; ভাড়া ১৫৲ টাকা কিন্তু ২০৲ টাকার কম হইলে ট্যাক্স হইবে ১০৲ টাকা। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। আয় বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ইহার জন্য ছোট ব্যবসায়ীদের করভার না বাড়াইয়া বড় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সঙ্গত কর আদায়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সর্ব্বোচ্চ ট্যাক্সের পরিমাণ ৫০৲ টাকা ধার্য্য করিয়া বড় ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" হইয়াছে, তাহা বাতিল করিবার জন্য আইনের সংশোধন আবশ্যক। আমরা এদিকে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। ইহা ছাড়া নানা উপায়ে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যেসব ব্যবসায়ীর অভ্যাস, তাহারা নিশ্চয়ই কর্পোরেশনকেও রেহাই দিতেছে না। স্বল্পপুঁজি ছোট ব্যবসায়ীদিগের করভার বৃদ্ধির পূর্ব্বে এই প্রতারক শ্রেণীর বিরুদ্ধেও ব্যাপক অভিযান প্রয়োজন।

—স্বরাজ

* * *

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উপনিবেশ এবং অছিকমিটির ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ বি শিবরাও সাম্রাজ্যিক শক্তি-সমূহের শাসন এবং শোষণ ব্যবস্থার সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। জাতিসঙ্ঘের সনদ অনুসারে উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং গঠনতান্ত্রিক ব্যাপারে উক্ত সঙ্ঘের হস্তক্ষেপের অধিকার নাই, ইহাই বৃটেনের অভিমত। বৃটেনের মতে উপনিবেশগুলির শাসন ব্যবস্থার জন্য সাম্রাজ্যিক শক্তিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী এবং তাহারই নির্দ্দেশ মতো নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপনিবেশগুলি স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিবে। এক কথায় ইহা একটি ঘরোয়া ব্যাপার, ইহা লইয়া জাতিসঙ্ঘের মাথা ঘামাইবার কারণ নাই। মিঃ বি, শিবরাও এই অভিমত মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি প্রস্তাব করেন যে, কোন সাম্রাজ্যিক শক্তি যদি কোন পূর্ব্বতন উপনিবেশকে স্বায়ত্তশাসন দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে ঐ উপনিবেশের শাসন-ব্যবস্থায় কি কি রূপান্তর সাধিত হইয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ জাতিসঙ্ঘের নিকট পেশ করিতে হইবে। বৃটেনের প্রতিনিধি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উপনিবেশগুলির অবস্থা জাতিসঙ্ঘের আলোচনার বহির্ভূত রাখার এই চেষ্টা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। মনে হয়, মালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটেনের কার্য্যকলাপ গোপন রাখার জন্যই ব্রিটিশ প্রতিনিধি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

—পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

* * *

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের আলোচনার ফলে কমনওয়েলথ যদি এইরূপ একটি নূতন রূপ পরিগ্রহ করে, যাহাতে ভারত তাহার স্বাধীন সার্ব্বভৌম সত্তা রক্ষা করিয়া ও জগতের অন্য দেশগুলির সহিত তাহার স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া অন্তর্গঠনের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে কমনওয়েলথে যোগদানের প্রশ্ন আমাদের ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আজ ইহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, বর্ত্তমান জগতে বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতার নীতি খুব বেশী দিন চলিবে না। আন্তর্জ্জাতিক ঘূর্ণিপাক হইতে সতর্কতার সহিত আত্মরক্ষা করিয়া গঠন-মূলক ও সৃজনশীল নীতি অবলম্বন করিতে হইবে—নেতি, নেতি করিয়া আত্মঘাতী বিচ্ছিন্নতার নীতি আঁকড়াইয়া থাকিলে বিপদ অনিবার্য্য। মোট কথা, ভারত—কমনওয়েলথের ভিতরে থাকিবে, কি বাহিরে যাইবে, সে প্রশ্ন কেবল ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক দিয়া দেখিয়া এবং ভবিষ্যতের বিশ্ব রাজনীতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া স্থির করিতে হইবে। ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা এই জীবনমরণ প্রশ্ন মীমাংসিত হওয়া উচিত নহে। —হিন্দুস্থান

* * *

কোন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতে ভাষার ভিত্তিতে হায়দরাবাদ রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে তাহার সন্নিহিত ভারতীয় প্রদেশের সহিত যুক্ত করা উচিত। ইহাতে কিন্তু এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ভারতের রাজ্যবিস্তারের লোভ আছে। হায়দরাবাদের জনগণের যে অংশ হিন্দু তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখিতে চাহিবে—অবশ্য বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতির মত মন্ত্রীসভা-যুক্ত প্রদেশপালের অধীনে ভারতের সহিত যুক্ত থাকিতেই তাহারা চাহিবে না। শতকরা ৮৬ জন লোক হিন্দু বলিয়া সেখানকার হিন্দু প্রদেশপাল এবং লোকায়ত্ত শাসন পাইলে খুশী হইবে।

এইসব কথা মনে করিয়া কাশ্মীরের মহারাজাকে নূতন হায়দরাবাদ প্রদেশের শাসনভার লইবার জন্য আহ্বান করা হউক। তাহা হইলে হায়দরাবাদের লোকেদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

বিপরীতমুখে, কাশ্মীরের জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা নিজামকে কাশ্মীরের

প্রদেশপাল নিযুক্ত করুক। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে, পাকিস্থানের গাত্রদাহ শান্ত হইবে এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভাল সম্পর্ক স্থাপনের পথ পরিষ্কার হইবে। —'হরিজন পত্রিকা'

* * *

সর্ববিধ ব্যবসায়ের মতো পুস্তকের ব্যবসাও ইদানীং বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা বিভক্ত হওয়ায় বঙ্গভাষাভাষী মুলুকের বৃহত্তর অংশ পাকিস্থানে পড়িয়াছে এবং তথাকার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ধারা অব্যাহত নাই। প্রধানত: এই কারণে বইয়ের বিক্রী আশাতীতভাবে কমিয়াছে, দ্বিতীয়ত: অন্নবস্ত্র ও জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যেরূপ অবিশ্বাস্য হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে প্রাত্যহিক দিন-যাপনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বই কেনা অনেকেরই সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া বইয়ের উৎপাদন ও প্রকাশের পথও সঙ্কট সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। নানা কারণে—কাগজ খোলা বাজারে দুষ্প্রাপ্য, চোরাবাজারে যথেচ্ছ দামে কাগজ বিক্রী হয়। ছাপার মূল্য পাঁচ ছয় গুণ বাড়িয়াছে, তৎসত্ত্বেও কোন ছাপাখানা নির্দ্ধারিত সময়ে বই বাহির করিয়া দিবার দায়িত্ব লয় না। এত অধিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বই প্রকাশ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না—হইলেও তাহার পর বই বেচিয়া তাহাতে কিছুই লাভ হয় না ; কাজেই নানা কার্য্যকারণ-বিপাকে বইয়ের ব্যবসা বাঙ্গলায় আজ মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছে। লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, দপ্তরী, পুস্তকবিক্রেতা...নানা পর্য্যায়ের লোকই ইহার ফলে যেমন বিপন্ন হইয়াছেন, তেমনি ইহার ফলে দেশের সংস্কৃতি প্রভৃত ক্ষতির সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে, শিক্ষা জগতেও সবিশেষ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। বহু পাঠ্য-পুস্তকই মুদ্রিত হইতে পারিতেছে না, অথবা কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে এমন সমস্ত বইয়ের অবশিষ্টাংশ আর শেষ হইতেছে না। ইতিপূর্ব্বে এই শেষোক্ত প্রয়োজনে কিছু পরিমাণ নিউজ প্রিন্ট বাজারে ছাড়ার কথা হইয়াছিল—তাহা হইয়াছে কি এবং তাহাতে সঙ্কটের কিছু আসান হইয়াছে কি ? —গায়ত্রী

* * *

লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্য বা আধুনিক "কমনওয়েলথ" সংজ্ঞাভুক্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির প্রধান মন্ত্রীদের লণ্ডন বৈঠকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল যোগ দিবার পর হইতে স্বদেশে ও বিদেশে একটা উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ দেখা দিয়াছে, ভারত ঐ মণ্ডলীর মধ্যে থাকিবে, না বাহিরে চলিয়া যাইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ মহল হইতে ভারতকে পাকে-চক্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির আওতায় রাখিবার জন্ম কৌশলপূর্ণ প্রচার-কার্য্যও হইতেছে। জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয় গভর্ণমেন্টের শত্রুরা ঐ উদ্দেশ্যমূলক প্রচারকার্য্যের সূত্র ধরিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এমন কথা রটাইতেছেন যে, দিল্লী গভর্ণমেন্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবার জন্ম গোপন চুক্তি ইত্যাদি করিতেছেন। এমন কি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের নেতা জওহরলাল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প ঘোষণাকারী লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলালের প্রতিও আজ বক্র কটাক্ষের অভাব নাই।

এই দুই প্রকার প্রচারকার্য্যের সমুচিত উত্তর দিয়াছেন ভারতীয় পার্লামেন্টের সভাপতি শ্রীযুক্ত মবলঙ্কর। জাতীয়তাবাদী ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি লণ্ডনে ঘোষণা করিয়াছেন,—"ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে যাইতে আদৌ ভীত নহে।" ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আশায় বা আশঙ্কায় আজ দলবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি করিবার জন্ম যে দুইটি পৃথক শিবির রচিত হইতেছে, সেই কূটনৈতিক চাতুরী-জালের বাহিরে থাকাই ভারতের লক্ষ্য—একথা মবলঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া কোটি কোটি ভারতবাসীর চিত্ত হইতে বৃথা সন্দেহ নিরসন করিয়াছেন।

"যদি কোন কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইতে হয় তাহা হইলে যে কমনওয়েলথ সমগ্র বিশ্বের ঐক্য কামনা করে, ভারত তাহাতেই যোগদান করিবে।"

"যদি কমনওয়েলথ সমগ্র বিশ্বমানবের রক্ষক হয় তবে ভারত তাহাতে যোগদান করিবে, কিন্তু যদি ইহা বিশ্ব সাম্রাজ্য স্থাপনের ছলনা হয়, তবে আমরা তাহার প্রতি নিস্পৃহ হইব এবং কিছুতেই উহার মধ্যে থাকিব না। পাকিস্থান বা সিংহল কি সিদ্ধান্ত করিবে তাহা আমাদের বিবেচ্য নহে।"

আরও অগ্রসর হইয়া মিঃ মবলঙ্কর বলিয়াছেন, "বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে না থাকার অর্থ ইহা নয় যে, আমরা তাহার বিরোধী হইব। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিশকোটী ভারতবাসী নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিতে পারিব না, একথা ভাবিতেও আমার ক্লেশ হয়। যদি আমাদের এই অবস্থা, তাহা স্বাধীন জাতি হইবার কোন অর্থ থাকে না।" —স্বরাজ

* * *

আসামের সীমান্তে পাকিস্থান অঞ্চল হইতে একদল সশস্ত্র পাকিস্থানী সৈন্য বাজারে মৎস্য বিক্রয়রত জেলেদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে হতাহত করে এবং ভারত সীমান্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আহতদের পাকিস্থানে লইয়া যায়। অন্য আর এক স্থানে ডাক ও তার বিভাগীয় কতিপয় মেরামত, কার্য্যরত কর্ম্মীর উপর গুলীবর্ষণ করিয়া অনুরূপভাবে আহতগণকে লইয়া পাকিস্থানী সৈন্যগণ সরিয়া পড়িয়াছে। আসামের প্রদেশপাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, পাকিস্থানী সৈন্যগণ রাজাকরনীতি অনুসরণ করিতেছে। তবে পাকিস্থান সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সভ্য, সুতরাং এখানে পুলিশী শাসন করিবার অবসর নাই। পাকিস্থান সরকারের নিকট হয়ত কড়া চিঠি যাইবে ; তাহারা সব ব্যাপার অস্বীকার করিবে ; তারপর সব চুপ চাপ। যশলমীরে পাকিস্থানী বাহিনী ঢুকিয়া অনেক উৎপাত, নরহত্যা প্রভৃতি করিয়াছিল, ভারত হইতে কড়া চিঠিও গেল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হইল, তাহা অদ্যাবধি জানা গেল না। —হিন্দুস্থান

মানভূমবাসী বাঙ্গালীদের দুরবস্থা—

স্বাধীনতা লাভের পর কয়েকটি প্রদেশে প্রাদেশিকতার ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সে সকল প্রদেশে দারুণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। উড়িষ্যার এক শ্রেণীর অধিবাসীরা তথায় বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিল—কিন্তু বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাবের চেষ্টায় ফল অন্যরূপ হইয়াছে। উড়িষ্যায় এখন আর বাঙ্গালী বিদ্বেষ ত নাই, অধিকন্তু উড়িষ্যা সরকার ২৫ হাজার পূর্ব্ববঙ্গাগত আশ্রয়প্রার্থীকে স্থান দানে সম্মত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত শত শত বাঙ্গালী চিকিৎসক ও শিক্ষক উড়িষ্যায় চাকরী পাইতেছেন। আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচারের ফলে পাণ্ডুতে যে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। সে জন্য শ্রীহট্ট, কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি লইয়া নূতন পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠনের আন্দোলন চলিতেছে। আসামের শতকরা ৩০ জন অধিবাসী মুসলমান—আসামবাসী বাঙ্গালীরা (শতকরা প্রায় ৩০ জন) মুসলমানদের সহিত একত্র হইয়া অসমীয়া-দিগকে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ে পরিণত করিলে আসামীদের অসুবিধা যে বাড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী সে কথা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন ও আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার বন্ধ করার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু বিহার প্রদেশের অবস্থা অন্যরূপ। ১৯১২ সালে যখন পূর্ব্ববঙ্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত করিয়া নূতন প্রদেশ গঠন করা হয়, তখন বিহারের সন্নিহিত বাঙ্গালী-প্রধান স্থানগুলি বিহারের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়া দেখিয়া কেহ তাহাতে আপত্তি করেন নাই। ফলে পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলাগুলি এখন বিহারের মধ্যে রহিয়াছে। ঐ সকল স্থানে বাঙ্গালী অধিবাসী সংখ্যায় অধিক—বর্ত্তমানে ১৯৪৭ সালে বাঙ্গালা দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত ছোট প্রদেশ হইয়াছে—পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান দিবার জন্য পর্য্যাপ্ত ভূমি বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নাই—এই সব নানাকথা চিন্তা করিয়া এখন ঐ সকল বাঙ্গালী-প্রধান স্থান বিহার হইতে বাহির করিয়া লইয়া পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার আন্দোলন চলিতেছে। তাহার ফলে বিহার প্রদেশে বাঙ্গালীর অবস্থা—পূর্ব্বপাকিস্থানের হিন্দু অধিবাসীদের অবস্থার প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া মানভূম জেলার প্রায় সকল অধিবাসীই বাঙ্গালী, ঐ জেলাটি যাহাতে পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়—সে জন্য স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই মানভূমের অধিবাসীরা চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ২৮শে জুন পুরুলিয়া টাউন হলে এক সভা করিয়া বাঙ্গালীরা ঐ মনোভাব প্রকাশ করেন ও পরে মানভূম-জেলা-উকীল সমিতির সভাতেও ঐ মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর গণপরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাটনায় এক সভায় বিহার গবর্ণমেণ্টকে মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি জেলায় যাহাতে হিন্দী প্রচারে জোর দেওয়া হয়, সে জন্য অনুরোধ করেন। ফলে ১৯৪৮ সালের প্রথম হইতেই বিহার গভর্ণমেণ্ট এমনভাবে মানভূমে হিন্দী প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে-সকল বাঙ্গালী শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে, তাহাদের বালক-বালিকারা বর্ত্তমানে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সহসা সকল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের নামের সাইনবোর্ড পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দী ভাষায় লিখিত বোর্ড দেওয়া হইয়াছে। সকল সরকারী কার্য্যালয়ে শুধু হিন্দী ভাষায় নোটীশ দেওয়া হইতেছে। জেলার সকল পথের মাইল-পোষ্টের সংখ্যাগুলি ইংরাজির পরিবর্ত্তে হিন্দী করা হইয়াছে—অথচ পাশের জেলা রাঁচী ও হাজারীবাগে এখনও সকল মাইল-পোষ্টে ইংরাজিতেই সংখ্যা লেখা আছে। এক জন বাঙ্গালী মানভূম জেলার স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন, তাঁহাকে সরাইয়া একজন বিহারীকে সেই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যে সকল বিদ্যালয় বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত—যে সকল বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী

শিক্ষকের সংখ্যা অধিক, সে সকল বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিয়া নূতন হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা-সম্বলিত বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। আদিবাসীদের জন্য স্থাপিত ৭২টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে এতকাল ধরিয়া বাঙ্গালার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইত—ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কখনও হিন্দী ভাষায় কথা বলে না—তথাপি নূতন আদেশ জারি করিয়া ঐ সকল বিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী বিহারে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে শুধু হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা থাকিবে। যে সকল আদিবাসীর নিজস্ব কোন লিখিত-ভাষা ছিল না—অথচ তাহারা বাঙ্গালাতেই কথা বলিত—তাহাদের হিন্দী 'নিজস্ব ভাষা' বলিয়া ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হইতেছে। অথচ মানভূমবাসী উড়িয়া, কনোজিয়া, মৈথিলী ও মাদ্রাজী—সকলেই বহুকাল ধরিয়া মানভূমের মাতৃভাষা 'বাঙ্গালা' ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। গণপরিষদে জাতির জন্মগত অধিকারের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে ও তাহাতে বলা হইয়াছে, ভারতের সকল স্থানের সকল লোক নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করিবেন। বিহারের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা সে নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন সদস্য বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলে সভা করিয়া নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া লোককে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের সে প্রচারকার্য্য সরকারী অনুগ্রহ লাভেও বঞ্চিত হয় না। অথচ গত মার্চ্চ মাসে পুরুলিয়ায় যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছিল, মানভূমের ডেপুটী কমিশনার তাহার কর্ম্মকর্ত্তা-দিগকে অসম্মানজনক সর্ত্তে সম্মত হইতে বলায়, সে সম্মিলনের অধিবেশন সম্ভব হয় নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঝালদা (মানভূমের অন্তর্গত) হাই স্কুলে জেলা ছাত্র কংগ্রেসের এক সভায় ছাত্ররা ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালাই তাহাদের মাতৃভাষা। তাহার ফলে ছাত্রকংগ্রেসের সভাপতি, উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা হইয়াছে। পুরুলিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় সিভিল সার্জ্জেন প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী সরকারী কর্ম্মচারীকে অকারণে মানভূম জেলা হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে—ফলে মানভূম জেলায় এখন আর বাঙ্গালী সরকারী কর্ম্মচারী নাই। যাহারা বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, পুলিসের বড়-কর্ত্তারা তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সকল পুলিস কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ দিয়াছেন এবং তাহার ফলে ঐরূপ কর্ম্মীরা নির্য্যাতীত হইতেছেন। মানভূম জেলায় গত ২৮ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী নেতারাই কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালন করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সারা ভারতে সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহারা এই সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করার ফলে লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং জেলাকংগ্রেস কমিটীর সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য্যকরী সমিতির ৩৮ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পুরুলিয়ার নূতন কলেজকে পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় এই সর্ত্তে তালিকা-ভুক্ত করিয়াছেন যে, কলেজে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করিতে হইবে। যতদিন মানভূম বিহারের অন্তর্গত থাকিবে, ততদিন মানভূমবাসী বাঙ্গালীদের হিন্দী শিক্ষা করিতে কোন আপত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু এই ভাবে বাঙ্গালা ভাষাকে উপেক্ষা ও বর্জ্জন করিয়া লোককে হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করার ব্যবস্থাকে কেহই সমর্থন করিতে পারেন না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে যথাসময়ে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বিহারের অন্তর্গত বাঙ্গালী-প্রধান স্থানসমূহের বাঙ্গালীদের সংস্কৃতি-রক্ষার ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে কোন নির্দ্দেশ প্রদান করেন নাই। আমরা উপরে শুধু মানভূম জেলার অবস্থার কথাই বলিয়াছি। সিংহভূমেও বাঙ্গালীদের ঐ একই অবস্থা। টাটানগরের মত বাঙ্গালী-প্রধান স্থানেও সকলকে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে। সেরাইকোলা ও খরসোয়ান নামক দুইটি রাজ্য উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল ঐ দুইটি রাজ্যেই বাঙ্গালা ভাষাভাষী লোক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল—কিন্তু তাহা সত্বেও রাজ্য দুইটিকে জোর করিয়া বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, ফলে তথায় অসন্তোষ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। হাজারীবাগ জেলার গিরিডি

অঞ্চল, সাঁওতাল পরগণার সমস্ত স্থান, পূর্ণিয়ার কয়েকটি অঞ্চলেও এই ভাবে জোর করিয়া লোককে হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিয়া তাহাদের হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া ঘোষণার চেষ্টা হইতেছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ব্যবস্থার কার্য্যটি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা করা হইলে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে বিহার গভর্ণমেণ্ট সকল বাঙ্গালী অধিবাসীকে জোর করিয়া হিন্দী ভাষাভাষী করিয়া তুলিয়া বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলগুলি হইতে বাঙ্গালার সংস্কৃতি নষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবেন। সে জন্য এখন হইতে আমাদের অবহিত হইয়া এ বিষয়ে প্রবল অন্দোলন চালাইয়া যাওয়া উচিত। যাহাতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদের সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারে অবহিত হন, সে জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ফটো—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা—

গত ২ মাস যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রত্যহ ৩।৪ শত করিয়া আশ্রয়প্রার্থী চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের আগমনের কারণ বহুবিধ। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে বহু স্থানে হিন্দুদের পক্ষে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণ সাধারণভাবে ধীরে ধীরে হিন্দুবর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দু ডাক্তারের নিকট মুসলমান রোগী আসে না, হিন্দু উকীলের নিকট মুসলমান মক্কেল আসে না, হিন্দুর দ্বারা মুসলমান ছাত্র শিক্ষালাভ করিতে চাহে না, হিন্দুর জমী চাষ করিবার জন্য মুসলমান কৃষক পাওয়া যায় না। বাজারে মুসলমান ব্যবসায়ী হিন্দুর নিকট অধিকমূল্যে জিনিষ বিক্রয় করে। তাহার উপর বালিকা ও যুবতীদের লইয়া ঘরে বাস করা অসম্ভব। মুসলমান যুবকগণের অনাচারের ফলে তাহাদের পবিত্রতা রক্ষা করা যায় না। ইতিপূর্ব্বেই বহু হিন্দু দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে; কাজেই যে অল্পসংখ্যক হিন্দু এখনও পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেছিল, তাহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। সেই কারণে লোক সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও পিতৃ-পুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল কারণ ছাড়া অর্থনীতিক অবস্থাও সেখানে চরমে উঠিয়াছে—পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে চাউলের মণ ৫০।৬০ টাকা, সরিষার তৈলের সের ৫ টাকা, চিনির সের ৪ টাকা, কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না, কাপড় অসম্ভব অধিক দরে বিক্রীত হয়—একখানা ধুতির দাম ১২ টাকা, একখানা শাড়ীর দাম ২০ টাকা। এ অবস্থায় লোকের সেখানে বাস করা প্রকৃত পক্ষেই কষ্টকর। প্রচুর মাছ পাওয়া গেলেও তেলের অভাবে তাহা খাইবার উপায় নাই। নূতন আয়ের পথ বন্ধ হওয়ায় সেখানের লোক সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া এতদিন কোনরূপে কায়ক্লেশে দিন কাটাইতেছিল, এখন এই দারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্যে সেখানে বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পরিচিতদের ও হিন্দুদের মধ্যে তিলে তিলে মরণের পথে অগ্রসর হওয়াও লোক অধিক কাম্য মনে করিতেছে। কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদেরও দুর্দ্দশা বাড়িয়া গিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করাও সাধ্যাতীত হইয়াছে। সে জন্য সম্প্রতি ভারত-গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সাকসেনা কলিকাতায়

আসিয়া বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ সভা করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে উক্ত তিনটি প্রদেশের খালি স্থানগুলিতে বাস করানো যায়, সেজন্য চেষ্টা চলিতেছে। তাহা ছাড়া আন্দামান দ্বীপেও আশ্রয়প্রার্থীদের দ্বারা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট এতদিন কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য দান করিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বেকার-দিগকে খাদ্য ও বস্ত্রাদি দান করা হইয়াছে; লোক যাহাতে কাজকর্ম্ম পায় সে জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় দান এত অল্প যে তাহা সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ কাজ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় ৩০ কোটি লোক এ দেশে আসিয়াছে। তাহাদের বাসস্থান বা খাদ্যপ্রদান করা কোন গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভব নহে। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাবস্থা এমন যে—যে কোন সময়ে রেশন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে এখানেও চাউলের মণ ৫০।৬০ টাকায় উঠিয়া যাইবে। এখনই কলিকাতা সহরে কালো বাজারে ৪০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। পশ্চিম বাঙ্গালায় এত অধিক আশ্রয়প্রার্থী সহসা চলিয়া আসায় এ দেশের খাদ্য-সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। বাজারে সুলভ খাদ্যগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় হইয়া যায়—থোড়, মোচা, কাঁচকলা, শাক প্রভৃতি পাওয়ার উপায় নাই। তাহা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে লোকের ক্রয় শক্তি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। অধিক মূল্যের জিনিষ—যথা আলু, কপি, বেগুন প্রভৃতি কিনিবার ক্ষমতা লোকের চলিয়া গিয়াছে। মাত্র কয়েকজন ধনী কর্ত্তৃকই সেগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই খাদ্যাবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইলে লোক নানাবিধ রোগে ভুগিয়া মারা যাইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যে এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন তাহা বলা যায় না—কিন্তু তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও ইহার প্রতীকারের কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না। ফলে পথে ঘাটে সর্ব্বত্র মন্ত্রীদের কার্য্যের নিন্দা শুনা যাইতেছে। মানুষ, তাহার প্রথম প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্য না পাইলে যে উন্মাদ হইয়া যাইবে ও যাহা খুসী তাহা বলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এখন প্রত্যেক দেশবাসীর নীরব থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অবহিত হওয়া উচিত। আমরা প্রত্যেকে কি ভাবে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া এই দুর্দ্দশার অবসান ঘটাইতে পারি, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সে কথা চিন্তা করিয়া দেখিবার ও কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে। নচেৎ সকলকে একযোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বস্ত্র সমস্যা—

বাঙ্গালাদেশে বস্ত্রসমস্যা গত প্রায় এক বৎসরকাল দেশবাসীকে ভীষণভাবে বিব্রত করিতেছে। কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠিয়া গেলে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের হাতে সমস্ত কাপড় চলিয়া যায় ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ গাঁট কাপড় পাকিস্তানে চলিয়া যায়। তাহার ফলে এদেশে বস্ত্রমূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। গত ২।৩ মাস গভর্ণমেণ্ট বস্ত্র সমস্যা সমাধানের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কোনটাই সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ১লা নভেম্বর হইতে পুনরায় কাপড়ের রেশনিং হইবার কথা ছিল, তাহাও হয় নাই। শুনা যাইতেছে, রেশনিং হইতে আরও ২ মাস সময় লাগিবে। শীত আসিয়াছে, বস্ত্র না হইলে লোকের চলিবে না। কালোবাজার পুরাদমে চলিতেছে, সেখানে কাপড় ক্রয় করা দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষমতাতীত। এ অবস্থায় কেন যে রেশনিং প্রথা পিছাইয়া দেওয়া হইল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মানুষ ক্রমে সব দিক দিয়া নিরুপায় হইতেছে। কাজেই তাহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়া সম্পদ প্রদর্শনী—

কলিকাতা করপোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়মে এই প্রদর্শনী ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিম-বাঙ্গালার দেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাট্‌জু। প্রদর্শনী দেখিয়া সকলে প্রীত হইয়াছেন। মামুলী প্রদর্শনী হইতে ইহার রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ছিল। এইরূপ প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সকলে স্বীকার করিবেন। আমাদের নেতৃস্থানীয়েরা যখন বিভিন্ন সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছেন সেই সময়ে এইরূপ একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া কমার্শিয়াল মিউজিয়াম সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এই উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা "আমরা ও আমাদের প্রতিবাসী" সময়োপযোগী হইয়াছে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ইহাতে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি বিভাগ ও কলিকাতাস্থিত চীনের রাষ্ট্রদূত ও চৈনিক বাণিজ্যিকসংঘের সভাপতি এই প্রদর্শনীতে বহু মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক দ্রব্য এবং জ্ঞাতব্য মানচিত্র ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শন করেন। বে-সরকারী কয়েকটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানও এই প্রদর্শনীতে নানাবিধ দর্শনীয় জিনিষ রাখিয়া প্রদর্শনীর শ্রীবৃদ্ধি করেন। এই উপলক্ষে কমার্শিয়াল মিউজিয়াম যে সমস্ত তথ্যপূর্ণ প্রাচীর-পত্র ও মানচিত্র তৈয়ারী করিয়াছে তাহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির সম্বন্ধে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ বিষয়ে বিশেষ তথ্যপূর্ণ। মোটের উপর প্রদর্শনীতে দেখিবার শিখিবার ও ভাবিবার খোরাক প্রচুর ছিল।

নূতন রাষ্ট্রপতি—

আগামী ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইবে তাহার সভাপতি পদের জন্য নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশবাসী শ্রীপুরুষোত্তম দাস টাণ্ডনকে ১৫০ অধিক ভোটে পরাজিত করিয়া মাদ্রাজের ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া নূতন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই প্রবীণ কংগ্রেসকর্ম্মী। জীবনের গত ৩০ বৎসরকাল উভয়েই মুক্তি সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং এই ভোটাভুটি না না হইলেই দেশের লোক সন্তুষ্ট হইত। কংগ্রেসের প্রধান পরিচালকগণ এই দ্বন্দ্বে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ডাঃ সীতারামিয়া বহু বৎসর যাবৎ
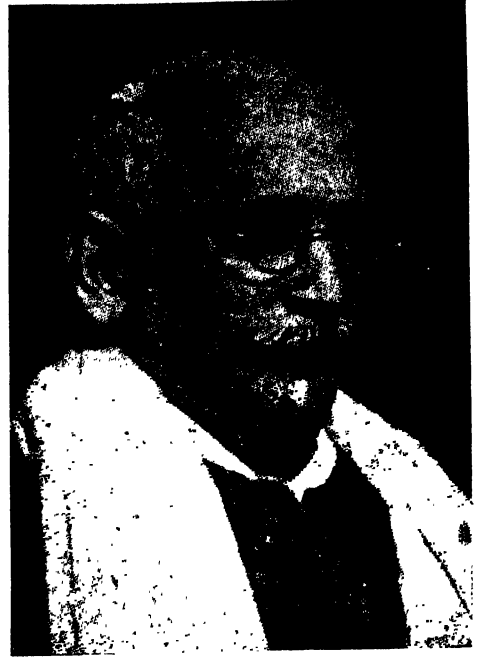
শ্রীযুক্ত পট্টভি সীতারামিয়া

দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদের মঙ্গল বিধানের জন্য কাজ করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদের ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ লোকের ভোট পাইয়াই ডাঃ সীতারামিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন।

বিপ্লববাদ—

দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের সকল রাজনীতিক দল এই স্বাধীনতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সকল দলের লোক লইয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কোন বিশেষ দলের লোক নানা অজুহাত দেখাইয়া মন্ত্রিসভার সদস্য হন নাই। তাঁহাদেরই নেতৃত্বে দেশে বিপ্লববাদ চলিতেছে। একদল কর্ম্মী শ্রমিকদের মধ্যে

আন্দোলন করেন—তাহার ফলে গত এক বৎসরে দেশে শ্রমিকদের মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হইয়াছে—দেশের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে ও লভ্যাংশ কমিয়া গিয়াছে। আমরা গান্ধীজির সর্ব্বোদয় সমাজের আদর্শ সমর্থন করি। তবে যে ভাবে লোককে ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের অবহিত না করিয়া শুধু তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করা হইতেছে, তাহার ফল কখনই দেশের পক্ষে সম্মানজনক হইবে বলিয়া মনে করি না। ঐ দল শুধু দেশের ধনিকদের বিরুদ্ধে নহে, বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে নানারূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন এবং গোপনে শাসনযন্ত্র অচল করার নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল—তাহা অবশ্য ব্যর্থতায় পরিণত হয়। সম্প্রতি কলিকাতার টেলিফোন একস্‌চেঞ্জে আগুন লাগিয়া গভর্ণমেণ্টের কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে ও কলিকাতার ব্যবসার বাজার অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার কারণ অবশ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই। ইতিমধ্যে দেশে যে একদল বিপ্লববাদী নানাভাবে দেশবাসীকে, দেশের কলকারখানাগুলিকে ও দেশের শাসনব্যবস্থাকে অচল করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। যাহাতে বিপ্লববাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়, এখন হইতে তাহার ব্যবস্থা না করিলে দেশে বিপ্লব অনিবার্য্য। একদিকে ধনিকগণ, আর এক দিকে বিপ্লববাদীদল—উভয় পক্ষই শাসন ব্যবস্থা অচল করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ধনিকদলকেও দুর্নীতির জন্য কঠোরভাবে দমন করা প্রয়োজন। দুর্নীতির জন্য গভর্ণমেণ্ট মাত্র কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন বা কয়েকটি মাত্র ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন ইহা সত্য। কিন্তু ব্যাপকভাবে এই কার্য্য না করিলে দেশ হইতে দুর্নীতি দূর করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। এই কার্য্যে দেশের জনসাধারণ অবশ্যই গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবে। উভয় পক্ষকে দমন না করিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে দেশের শাসন-ব্যবস্থা সচল রাখা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। প্রয়োজন হইলে, উভয় কার্য্যেই দেশবাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতায় অগ্রসর হইবে। উভয় পক্ষকে দমন না করিলে দেশে যে অশান্তির উদ্ভব হইবে, তাহার ফল শুধু গভর্ণমেণ্টকে নহে, শান্তিপ্রিয় দেশবাসীকেও ধ্বংস করিবে।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

গত ৩রা অক্টোবর সকালে ৯টার সময় পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এবং ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার সময় মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আরিয়াদহ

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ

অনাথ ভাণ্ডার (২৪পরগণা) পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিমলবাবুকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ২৪পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয় এবং ২৪পরগণার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিজয়-কৃষ্ণ আচার্য্য আই-সি-এস তথায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। উৎসব-প্রাঙ্গণে স্থানীয় ও কলিকাতার বহু লোক উপস্থিত হইয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া-ছিলেন। মন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার জনাব সাত্তার, সেক্রেটারী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি আগমন করিয়াছিলেন। মন্ত্রী সেন মহাশয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার প্রাণবন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। সকলের সমবেত চেষ্টায় অনাথ

আড়িয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন

ভাণ্ডার গৃহের দ্বিতলে সুবৃহৎ শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অনাথ ভাণ্ডারের বহুমুখী জনকল্যাণ কর্ম্মধারা দেখিয়া সকলেই আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রাচ্য বাণীমন্দির—

কলিকাতার প্রাচ্য বাণীমন্দিরের নয়াদিল্লীতে একটি শাখা আছে। গত ১৭ই অক্টোবর নয়াদিল্লীর ওয়াই-এম-সি-এ হলে তাহার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। 'মাদাম আর্জ্জিনা' সভায় 'রুশরাষ্ট্রে প্রাচ্য গবেষণাগার' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার শ্রীনিশিকান্ত সেন সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। দিল্লীতে বাঙ্গালীদের পরিচালিত এই কৃষ্টিকেন্দ্র তথায় বাঙ্গালার গৌরব প্রচার করিতেছে।

নরেন্দ্রনাথ শেঠ—

কলিকাতা ৭৮ বীডন ষ্ট্রীট নিবাসী স্বনামখ্যাত দেশকর্ম্মী নরেন্দ্রনাথ শেঠ গত ১৫ই অক্টোবর ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার পুরাতন শেঠ পরিবারে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ ও পরে আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট হন। ১৯০৫ সাল হইতে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন ও তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা শক্তি দ্বারা জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। ১৯০৮ সালের অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবক গঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন। বিপ্লব আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার জন্য তিনি ও তাঁহার পরিবারের বহু লোক ধৃত ও নির্য্যাতীত হইয়াছিলেন। অপর ভ্রাতাদের সহিত নরেন্দ্রনাথ অন্তরীণ হন

৺নরেন্দ্রনাথ শেঠ

এবং সন্দীপের সর্পময় দ্বীপে তাঁহাকে আটক রাখা হয়। সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় ও ১৯১৯ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তিনি একাধারে ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে ও প্রবন্ধাদি লিখিতে পারিতেন। সারাজীবন তিনি কোন না কোন পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। দেশের সকল জনহিতকর আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি নির্ভীকভাবে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার মত অসাধারণ পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের চিফ কেমিষ্ট ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ভারতসরকারের

বাণিজ্য দপ্তরের আহ্বানে দেশের রাসায়নিক শিল্প উন্নয়নের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বৃটীশ ও আমেরিকা অধিকৃত জার্ম্মাণীতে গমন করিয়াছেন। তিনি শিল্প-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও ভারতবর্ষে তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা দিতেন। খাদ্য সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহের অন্যতম। তাঁহার নবলব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশকে তিনি আরও সমৃদ্ধ করুন, ইহাই আমরা কামনা করি।

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা ১১২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিবাসী খ্যাতনামা ব্যবসায়ী অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১শে আশ্বিন ৯৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১২৬৫ সালের ১১ই চৈত্র বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাটে তাঁহার জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি ব্যবসায়ে মন দেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি ধর্ম্ম ও সাহিত্য চর্চ্চায় সময় যাপন করিতেন। তাঁহার লিখিত 'ভট্টাচার্য্য পরিবার' 'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ। তিনি পরলোকগতা পত্নীর নামে দাঁইহাটে 'ত্রাণদাসুন্দরী মাতৃ সদন' নামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিতেন। ৮০ বৎসর বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ৫ পুত্র, ২ কন্যা প্রভৃতি বর্ত্তমান।

২৪ পরগণায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ আচার্য্য আই-সি-এস

ফটো—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোকে হেমন্তকুমারী দেবী—

যশোহর, মাগুরার অন্ধ ঔপন্যাসিক ও স্বদেশসেবক ৺যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের পত্নী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপৃথ্বীশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মাতা হেমন্তকুমারী দেবী গত ১লা আশ্বিন সকাল ৬টায় হুগলী—চাঁপদানীতে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দয়াশীলা, ধর্ম্মপ্রাণা তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, চার কন্যা ও অনেকগুলি নাতি-নাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাই।

অগ্নিময়ী

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়

অগ্নিময়ি! অন্তরে মোর আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো,
তিমিরহরা মূর্ত্তিতে আজ ঘুচাও মনের সকল কালো।
মিথ্যা মনের অহংকারে,
আঘাত করো বারে বারে,
কমল-সম উঠুক ফুটে, যা' কিছু মোর আছে ভালো।

রক্তে আমার দাও গো দোলা, অগ্নিরূপা বিজয়িনি!
অনল জ্বালার তীব্র দাহে আপন ভুলে তোমায় চিনি।
বাজাও বিষাণ গুরু গুরু,
প্রলয় নাচন হউক সুরু,
নাচের তালে জ্বালাও তুমি, জ্বালাও আমার প্রাণের আলো।

আফ্রিকায় দুর্গাপূজা ও হিন্দু সম্মেলন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে পূর্ব্ব-আফ্রিকার অন্যতম প্রসিদ্ধ নগরী মাউণ্ডার শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা ও মাউণ্ডা প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের তিনটি অধিবেশন সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘ প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ নিজেরাই একখানি বৃহৎ প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে সমগ্র পূর্ব্ব-আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুগণ আমন্ত্রিত হন এবং বহু প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ ট্রেণ ষ্টীমার, মোটর ও বিমানযোগে এই উৎসব ও সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রথম অধিবেশনে মাউণ্ডা প্রাদেশিক হিন্দু ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুত হরিলাল এম, সংথবী সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি হিন্দু ধর্ম্মে শক্তি সাধনা ও স্বামী প্রণবানন্দজীর নির্দ্দেশ বাণী উল্লেখ করিয়া বলেন—এ যুগে স্বামীজী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, যে ধর্ম্ম শক্তিদান করে না, যে ধর্ম্মের আচরণে হৃদয়ে বিদ্যুদ্বীর্য্যের সঞ্চার ঘটে না তাহা হিন্দুর ধর্ম্ম নহে—ইহা হইতে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় হিন্দু ধর্ম্মে কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতার স্থান নাই। আজ আমরা ধর্ম্মের নামে যাহা আচরণ করি তাহা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম নহে। (সনাতন ধর্ম্ম সতত জ্ঞান ও শক্তির প্রেরণা যোগায়)। মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—"শ্রীশ্রীদুর্গাই ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিমূর্ত্তি। ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ। অন্যায় অত্যাচারকে দমন করাই হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। হিন্দু কোনদিন রাষ্ট্র ও ধর্ম্মকে পৃথক করিয়া দেখে নাই। বর্ত্তমানে যে সংকীর্ণ ধর্ম্মের প্রভাব জাতির উপর আসিয়া পড়িয়াছে তাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—ইহা হিন্দু ধর্ম্মের অন্যতম শিক্ষা। রাষ্ট্রবাদ, শক্তিবাদ, সংগঠনবাদ, সেবা ও সমন্বয়বাদের ভিত্তিতে আজ পুনরায় প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জাতি যখন স্বাধীনতা হারাইয়া দুর্ব্বল হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল তখনই দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল—সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। দুর্গা পূজার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া স্বামীজী বলেন—যে চারিটী শক্তি জাতীয় জীবনে একান্ত অপরিহার্য্য দেবী প্রতিমার মধ্যে আমরা সেই চারিটী শক্তিই দেখিতে পাই। সরস্বতী জ্ঞানশক্তি, লক্ষ্মী ধনশক্তি, কার্ত্তিক ক্ষাত্রশক্তি, গণেশ জনশক্তি বা গণ-শক্তির প্রতিমূর্ত্তি এবং এই চারি শক্তির সমন্বয়েই দুর্গামাতা আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ রূপ। গত যাট বৎসরের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে আমরা উক্ত মহাশক্তিরই জাগৃতি কামনা করিয়া আসিয়াছি। স্বামী পরমানন্দজী ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া বলেন—"ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন করিতে যখন আসুরিকতার উদ্ভব হইয়াছিল তখন দেবীর আবির্ভাব। আজ জগতের বুকে যে ভাবে আসুরিকতার তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনঃ প্রচারের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য লইয়াই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই মিশন প্রেরণ করিয়াছেন।"

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃক দুর্গোৎসব

পূর্ব্ব আফ্রিকায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়

ফটো—ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতা শ্রীযুত শিবাভাই এস, প্যাটেল এবং তৃতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীযুত রাঘবজী কাণজী সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুত জে, এন, পাণ্ডে (বার এট-ল), শ্রীযুত গিরিধরলাল সংঘনী, শ্রীযুত কৃপালজী, শ্রীযুত এম, ডি, আচার্য্য এবং

আরও কতিপয় বক্তা কয়েকটা প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক দিন সভার প্রারম্ভে লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু, তলোয়ার প্রভৃতি আত্মরক্ষা-মূলক ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। সভার পরে শ্রীশ্রীদেবীর বীর ভাবোদ্দীপক আরতি, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বহু ইউ-রোপীয়ন এবং আফ্রিকান এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীতে শোভাযাত্রা সহকারে দেবী প্রতিমা ভিক্টোরিয়া হ্রদে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আফ্রিকায় এই জাতীয় অনুষ্ঠান ইহাই সর্ব্বপ্রথম। সম্মেলনে নিম্ন-লিখিত তিনটী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

১। জগত আজ দ্রুত ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহাকে ধ্বংসের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু সংস্কৃতির উদার মতবাদ প্রচারের আবশ্যক। মাউঙ্গা প্রদেশের হিন্দুজনগণের এই সম্মেলনে ভারত সরকার তথা ভারতীয় জনসাধারণকে এই সংস্কৃতির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষ শোভাযাত্রা

২। ভারতীয় রাষ্ট্র নেতাগণের সমর্থনে এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে যে সাংস্কৃতিক মিশন আফ্রিকা মহাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহার প্রচার কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে এই সম্মেলন ভারতীয় নেতৃগণকে তথা সঙ্ঘকে অনুরোধ করিতেছে।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ডার এস সালেম শহরে শংকরাশ্রম

ফটো—ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)

৩। আফ্রিকাবাসীগণের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তাহার জন্য এই সম্মেলন আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণকে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছে।

পূর্ব্ব আফ্রিকার ডার-এস্ সালেম শহর

ফটো—ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন হ'ল ফুটবল খেলার মরসুম শেষ হয়ে গেছে। ফুটবল খেলা পরিচালনার কর্ম্মব্যস্ততা এবং খেলায় আধিপত্যলাভের উত্তেজনা বহুদিন আগে প্রশমিত হয়ে গেছে। আগামী ফুটবল মরসুমের জন্য তোড়জোড় এখনও আরম্ভ হয়নি। এই দীর্ঘ শান্তপূর্ণ অবসর সময়ে জনসাধারণ এবং আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু গঠনমূলক কাজের প্রস্তাব করা যাক্। জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এবং উভয়ের শুভবুদ্ধির জাগরণের উপর বাংলার ফুটবল খেলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে আলোচ্য প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। পাঠকদের কাছ থেকে অভিমত এবং প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

আমাদের দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করা যায় না। লাখে একটা মিলে কিনা সন্দেহ যা অব্যবস্থা এবং দুর্নীতিতে নিমজ্জিত নয়। পঙ্কোদ্ধার করা একেবারে যেন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনহিতকর কাজে কিছু দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বহু প্রশংসাপত্রধারী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবে—কিন্তু হিসাব নিয়ে সৎ এবং প্রকৃতকাজের প্রতিষ্ঠান খুঁজতে গেলে দেশ উজাড় হয়ে যাবে। অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, মানুষের দানের হাত হতাশা, সন্দেহ এবং পূর্ব্বের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সঙ্কুচিত হয়ে কঞ্জুস সেজে আছে। আই-এফ-এ-কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর লীগ এবং শীল্ডের গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলি স্থানীয় চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে পরিচালনা ক'রে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। এই অর্থ সৎ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই যে ব্যয়িত হয়, সে সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ নিরসন এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাধারণের আস্থাভাজনের নিমিত্ত এবং নৈতিক দায়িত্ব পালনের দিক থেকে আই-এফ-এর অধিকতর সতর্ক এবং কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন মনে করি। চ্যারিটি ম্যাচ খেলায় যে দুই ফুটবল দল যোগদান করে তাদের সভ্যদের দেয় ক্লাবের বার্ষিক চাঁদা ছাড়া চ্যারিটির জন্য সভ্যদের পৃথক খেলার টিকিট কিনতে হয়। এটা সভ্যদের অতিরিক্ত ব্যয়। চ্যারিটি কথাটির যথার্থ মর্ম্ম ধরলে বুঝায়, যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ফুটবল খেলার চ্যারিটি ম্যাচে সভ্যরা যে অতিরিক্ত খরচ হিসাবে টিকিট কিনেন এবং দর্শকরা দ্বিগুণ মূল্যে যে টিকিট কিনতে বাধ্য হন, তা প্রকৃতপক্ষে দর্শকদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে চাপ দিয়ে আদায় করা ছাড়া অপর কিছুই নয়। কেউ যদি মনে করেন, জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মহৎ উদ্দেশ্যে চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট কিনে থাকেন তাহলে লীগের নিম্নদিকের কোন দুটি দলের সঙ্গে চ্যারিটি ম্যাচ খেলানোর ব্যবস্থা ক'রে ফলাফল উপলব্ধি করতে অনুরোধ করি। আই-এফ-এর চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট কিনে জনহিতকর সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান করাই যদি ক্লাবের সভ্য এবং জনসাধারণের প্রধান অভিপ্রায় থাকে, তাহলে কখনই তাঁরা খেলার গুরুত্ব বিচার না ক'রে যে কোন ধরণের খেলায় টিকিট কিনে অর্থ সাহায্য করবেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা একথা জোর ক'রে বলা চলে যে, দর্শকরা খেলার গুরুত্বের উপরই টিকিট কিনে থাকেন, অর্থ সাহায্যদানের জন্য নয়। সুতরাং একথা বলা ভুল হবে না যে, গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলাগুলিকে চ্যারিটি হিসাবে ঘোষণা ক'রে সভ্য এবং দর্শকদের টিকিট কিনতে বাধ্য করা হয়; ঐ খেলাগুলি চ্যারিটি হিসাবে ঘোষণা না করলে খেলায় যোগদানকারী ক্লাবের সভ্যরা টিকিটের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় না ক'রে সভ্য

হিসাবে দেখতে পেতেন এবং সাধারণ দর্শকেরা কম মূল্যের টিকিটে খেলা দেখার সুযোগ পেতেন। চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহ করাও কম হায়রাণি নয়। ক্লাবের সভ্যদের থেকে সাধারণ দর্শকদের হায়রাণি বেশী। চ্যারিটি খেলার দিন খেলা আরম্ভের দশ এগার ঘণ্টা পূর্ব্বে খেলার মাঠে টিকিট ঘরের মুখে-লম্বা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় প্রচণ্ড রোদ এবং প্রবল বারি-বর্ষণের মধ্যেও। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি—লাইন দিয়ে দীর্ঘ ঘণ্টা দাড়ানোর পর সার্জেন্ট এবং ঘোড়সোয়ারা পুলিস এসে চার্জ ক'রে তা ভেঙ্গে দিয়ে দর্শকদের হায়রাণি করেছে এবং খুশীমত ব্যবস্থা অনুসরণে দর্শকদের বাধ্য করেছে। তাই যদি পূর্ব্বাহ্নেই একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা পালনের নির্দ্দেশ থাকতো, তাহলে দীর্ঘঘণ্টাব্যাপী লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ভাগ্যবিড়ম্বনায় পড়ে আহত হয়ে দর্শকদের বাড়ি ফিরতে হ'ত না। পুরাতন দিনের সংবাদপত্রের ফাইল খুঁজলে দর্শকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী পাওয়া যাবে; সমস্ত বাধাবিপত্তির ঝুঁকি নিয়ে যে ভাগ্যবান ব্যক্তি মাঠে প্রথম প্রবেশ ক'রে খেলা দেখার অদম্য উৎসাহ চরিতার্থ করতো তার নামের একটা সাংবাদিক সৌজন্য সুলভ স্বীকারোক্তি সংবাদপত্রে থাকতো। বর্ত্তমানে পূর্ব্বের অব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। অল্প আয়াসে আই-এফ-এর পরিচালক-মণ্ডলী আরও সুব্যবস্থা করতে পারেন। তাঁরা যদি খেলার দিন সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণকে জানিয়ে দেন—খেলার মাঠে টিকিট বিক্রী আরম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময় এবং কি পরিমাণ টিকিট দর্শকদের বিক্রীর জন্য সংরক্ষিত আছে তাহলে দর্শকদের সুবিধা হয়। টিকিটের সংখ্যাটী পূর্ব্বাহ্নে জানতে পারলে লোক অনুমান করতে পারবে লম্বা মানুষের সারিতে কোনস্থান পর্য্যন্ত টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেইমত অবস্থা বুঝে দর্শকেরা আপন আপন বিচারমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সারিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা এবং শেষ পর্য্যন্ত টিকিট না পাওয়ার জন্য হতাশ হওয়ার যে ঝুঁকি তা দর্শকদেরই হাতে; কর্ত্তৃপক্ষ বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত থেকেই মুক্ত হবেন না, কর্ত্তব্যপরায়ণ হিসাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হবেন। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষও জনসাধারণকে প্রভূত সহযোগিতা করতে পারেন—কি ভাবে লাইন দিতে হবে তার নির্দ্দেশ দিয়ে এবং একদিন লাইনের লোক গণনা ক'রে লাইনের কোন স্থান পর্য্যন্ত টিকিট পাওয়া যেতে পারে তা চিহ্নিত ক'রে। লোকের সারিতে দীর্ঘকাল রোদ এবং বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে বহু দর্শক বিশেষ করে ছোট ছেলেদের সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে অসুস্থ হ'তে দেখা যায়। সুতরাং তাদের শুশ্রূষার জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন। কয়েক বছর আগে জনসাধারণকে জল বিতরণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা পুনঃপ্রবর্ত্তন করলে সাধারণের কষ্টের যথেষ্ট লাঘব হয়। এই দুটো কাজ খুব সোজা ব্যাপার নয়। অনেকগুলি শিক্ষিত এবং কর্ম্মঠ স্বেচ্ছাসেবক দলের দরকার। দর্শকেরা যে দীর্ঘ সময় মাঠে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তা খুবই পীড়াদায়ক। খেলার একঘণ্টা আগে থেকে যদি সারি দিতে আরম্ভ করা যায় তাহলে কেবল সময়ের অপব্যয় হয় না, শারীরিক দুর্ভোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এরজন্য সাধারণের মধ্যে সহযোগিতা এবং মনের এ দৃঢ়তা প্রয়োজন যে, খেলা আরম্ভের ৭।৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে সারি না দিয়ে মাঠের চারিপাশের ছায়াশীতল গাছতলায় বরং বিশ্রাম করা এবং খেলা আরম্ভের ঠিক একঘণ্টা পূর্ব্ব থেকে শান্তি-রক্ষকদের নির্দ্দেশমত সুশৃঙ্খলভাবে সারিতে দাঁড়ানো। খেলা আরম্ভের এক ঘণ্টা সময়ের বেশী পূর্ব্বে খেলার মাঠের চারিপাশে যাওয়া নিষিদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ করার সামিল বলে যদি সকলেই মনে করেন এবং আইনভঙ্গ থেকে বিরত থাকেন তাহলে মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষকেই কেবল যথেষ্ট সহযোগিতা করা হয় না, পরস্পরের যথেষ্ট সুবিধা করা হয়।

চ্যারিটি ম্যাচে কি পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় তার একটি আনুমানিক হিসাব চ্যারিটি খেলার বিবরণের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া জনসাধারণ আর কিছু জানতে পারে না। চ্যারিটি ফণ্ডে দেয় অর্থ কি কি বাবদ ব্যয় করা হচ্ছে তার পূর্ণ বিবরণ জানবার কৌতূহল জন-সাধারণের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক; যেমন এ সম্পর্কে হিসাব তলব করার অধিকার জনসাধারণের আছে, তেমনি নৈতিক দিক থেকে আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণকে হিসাব জানাতে বাধ্য আছেন। সুতরাং বার্ষিক বিবরণীতে

চ্যারিটি ম্যাচে সংগৃহীত অর্থের বিস্তৃত বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন।

চ্যারিটি খেলার দিন মাঠের আনাচে কানাচে এক একজন লোকের হাতে গোছা গোছা টিকিট এবং তা দ্বিগুণ কখনও বা চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রী হতে দেখা গেছে। এরা ব্যবসাদার লোক; সিনেমার টিকিট আগে যেমন বে-আইনী ভাবে বিক্রী হ'ত এ ঠিক সেই ধরণের ব্যাপারই। এই ঘটনা থেকে লোকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, যেক্ষেত্রে আই-এফ-এ অফিসে টিকিট বিক্রী বন্ধ অথবা নিঃশেষ হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে এত টিকিট এসব অশিক্ষিত লোভী ব্যবসাদারদের হাতে কি ভাবে এলো। এর উত্তর দুইভাবে জনসাধারণ পেতে পারে—হয় এই টিকিটসব আই-এফ-এ-র কোন ভিতরের লোকের সহযোগিতায় এসেছে, কিম্বা আই-এফ-এ-কে প্রবঞ্চনা ক'রে জাল ছাপা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ এবং আই-এফ-এ অফিসের কর্ম্মকর্ত্তাদের চোখের সামনে এ টিকিটের অবাধ ব্যবসা কি ক'রে চলতে পারে জনসাধারণ তার উত্তর খুঁজে পায় না। আই-এফ-এ-র সুনাম প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্চ মূল্যে বে-আইনী টিকিট কেনা থেকে জনসাধারণকে রক্ষার জন্য এবং চ্যারিটি ম্যাচের প্রভূত আয় থেকে এই ভাবে আই-এফ-এ-কে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। ফুটবল মাঠে আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ ছাড়া অপর কারও টিকিট বিক্রী নিষিদ্ধ করা উচিত। যদি কোন দর্শক কোন কারণে খেলা দেখতে অক্ষম হ'ন এবং সেই টিকিটখানি বিক্রীর প্রয়োজন হয়, তাহলে মাঠে আই-এফ-এ-র টিকিট বিক্রেতাদের মারফৎ তা বিক্রী করা উচিত। টিকিট বিক্রী এবং বিলি ব্যবস্থার জন্য আই-এফ-এ-র একটি নতুন চ্যারিটি ম্যাচ সাবকমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিতে থাকবেন যে দুইদল চ্যারিটি ম্যাচ খেলবে তাদের থেকে একজন ক'রে দুইজন প্রতিনিধি, আই-এফ-এ-র সভাপতি এবং সম্পাদক। টিকিট মুদ্রণ সম্পর্কে সতর্কতা, টিকিট বিক্রী ব্যবস্থা, সংগৃহীত অর্থের হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে এই সাবকমিটির পরামর্শ এবং নির্দ্দেশ দানের ক্ষমতা থাকবে। আই-এফ-এ-র কর্ম্মসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংযোগসাধন আশা করি অযৌক্তিক হবে না। (১) আই-এফ-এ-র নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক চাঁদা দিয়ে যেসব ক্লাব সভ্যপদ লাভ করে তাদের মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য আর না রেখে আই-এফ-এ পরিচালনায় তাদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করা (২) এদেশের ফুটবল খেলার পদ্ধতির উন্নতির জন্য ইংলণ্ডের এফ-এ কর্তৃক গৃহীত 'Instructional Film'টি করে উৎসাহী খেলোয়াড়দের প্রদর্শনের ব্যবস্থা (৩) প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র মারফৎ কি পরিমাণ টিকিট বিক্রী হবে তার সংখ্যা এবং বিক্রয়ের সময় ঘোষণা (৪) চ্যারিটি ম্যাচের সংগৃহীত অর্থ কি ভাবে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বণ্টন করা হয়েছে, তার পূর্ণ তালিকা বার্ষিক হিসাব-নিকাশ পুস্তকে প্রকাশের ব্যবস্থা (৫) খেলার মাঠে উচ্চ মূল্যে চ্যারিটি টিকিট বিক্রী বন্ধের জন্য পুলিসের সহযোগিতায় উপযুক্ত ব্যবস্থা (৬) মাঠ থেকে মাইক মারফৎ জনসাধারণের উদ্দেশে যে উপদেশ বিতরণের ব্যবস্থা আছে সেই সঙ্গে ফুটবল খেলার জটিল আইনগুলির ব্যাখ্যার ব্যবস্থা (৭) মাঠ থেকে আহত খেলোয়াড় বহনের জন্য আই-এফ-এ-র নিজস্ব ষ্ট্রেচার, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ ব্যবস্থা (৮) জনসাধারণের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য চ্যারিটি ম্যাচে যোগদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের দুইজন প্রতিনিধি এবং আই-এফ-এ-র দুইজন প্রতিনিধিসহ একটি চ্যারিটি ম্যাচ সাব-কমিটি গঠন; এই কমিটির ক্ষমতা থাকবে ন্যায্য টিকিট বণ্টন করা এবং বিক্রীত টিকিটের হিসাব রক্ষা করা (৯) ফুটবল খেলোয়াড়-দের স্বাস্থ্য এবং সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার যে গুরুদায়িত্ব ক্লাবগুলির আছে তাদের সাহায্যের জন্য চ্যারিটি ও অন্যান্য ম্যাচে যোগদানকারী দুই দলকে খেলায় সংগৃহীত অর্থের মোটা অংশের বিলি ব্যবস্থা (১০) ফুটবল খেলোয়াড়দের অর্থ-নৈতিক সঙ্কট থেকে রক্ষার জন্য এবং খেলার ষ্টাণ্ডার্ডের উন্নতির জন্য এ দেশে অবিলম্বে পেশাদারী ফুটবল খেলা সরকারীভাবে স্বীকার করা (১১) আই-এফ-এ-র নিজস্ব গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত লোক নিয়ে একটি কমিটি গঠন (১২) জনসাধারণের খেলা দেখার সুবিধার জন্য একটি ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আই-এফ-এ-র অংশ গ্রহণ।

আই-এফ-এ-র পরিচালক মণ্ডলীর প্রধান কাজ হ'ল নাম-করা প্রতিযোগিতার খেলা পরিচালনা করা এবং ফলাফল ঘোষণা করা। একমাত্র খেলা পরিচালনার মধ্যেই যদি আই-এফ-এ-র কার্য্যসূচী সীমাবদ্ধ এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড রক্ষার কাজ ক্লাবগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে খুবই ভুল করা হবে। ফুটবল খেলার জন্মভূমি ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের কার্য্যতালিকা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় সে দেশের ফুটবল খেলার মানবৃদ্ধির এবং জনপ্রিয়তার জন্য কি ভাবে বিবিধ গঠনমূলক কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছে। ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের ফুটবল এসোসিয়েশনগুলির নাম এবং সরকারী প্রচেষ্টারও উল্লেখ করা যায়।

খেলার মাঠে দর্শকদের ফুটবল খেলা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য যে বিক্ষোভ দেখা দেয় কর্তৃপক্ষ তা অখেলোয়াড়োচিত ব্যবহার বলে নিন্দা ক'রে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু এ অজ্ঞতার কারণ আমাদের দেশে গত ৭।৮ বছর ধরে আই-এফ-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ফুটবল খেলার আইন পুস্তকখানি অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকার জন্যই কি নয়? যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের এফ-এ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকখানি বহুদিন এ দেশে আমদানি হয়নি, সম্প্রতি বাজারে এসেছে। এই বইখানি আই-এফ-এ প্রকাশিত বই অপেক্ষা অনেক ভাল; বিবিধ আইনের সুন্দর ব্যাখ্যা এবং নির্দ্দেশ সন্নিবেশিত করা আছে। কিন্তু যে দেশে শতকরা মাত্র ১৪ জন লোক কোনপ্রকারে মাতৃভাষায় একখানি পোষ্টকার্ড লিখতে বা পড়তে পারে সেদেশে ইংরাজি ভাষায় লিখিত পুস্তক জনসাধারণের আইন জ্ঞান কতটুকু বৃদ্ধি করতে পারে! ফুটবল খেলার আইন জ্ঞানের অজ্ঞতার জন্য দর্শকদের বিক্ষোভ তিরস্কৃত করার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন উঠে—এরজন্য আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষের কম কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটেনি; কারণ নিয়মিতভাবে খেলার আইন প্রকাশের ব্যবস্থা না ক'রে তাঁরাই কি জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখেন নি? আই-এফ-এ কর্ত্তৃক লীগ খেলার এবং শীল্ড খেলার যে বই প্রকাশিত হয় অনায়াসে এই বই দুইখানিতে বাংলায় এবং ইংরাজিতে ফুটবল খেলার আইনগুলি সন্নিবেশিত করা যায়; কিন্তু সে চেষ্টা তাঁদেরও তো নেই। আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ যদি জনসাধারণের অবগতির জন্য খেলার আইন পুস্তক প্রচারে যথাযথ ব্যবস্থা করতেন তাহলে সে ক্ষেত্রে আইন-অনভিজ্ঞ দর্শকদের বিক্ষোভ অপেক্ষা আই-এফ-এ-র ত্রুটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—এ কথা তখন আর কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলতেন না।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত